অধ্যাপিকা ডঃ নারায়ণী বসু
অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন দে

উচ্চতর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

ক্যালকাটা বুক হাউস

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত আবশ্যিক গৃহবিজ্ঞান (Elective Home Science) বিষয়ক পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্রেণীর জন্ম লিখিত

উচ্চতর
গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

[নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য]

ELECTIVE HOME SCIENCE
PAPER I & II

ডঃ নারায়ণী বসু, এম. এ., ডি. ফিল.,
অধ্যাপিকা, সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ, বিহারীলাল গৃহ-বিজ্ঞান কলেজ ;
ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা, হাওড়া গার্লস্ কলেজ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ।
ও
অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন দে, এম. এস্-সি.,
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বিহারীলাল গৃহ-বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা ;
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ।
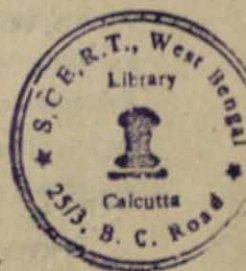
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট্ : : কলিকাতা-১২

প্রকাশক :

শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল

ক্যালকাটা বুক হাউস

১।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

চতুর্থ সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৬৯

শিল্পী—অমল দাশগুপ্ত

১০/২এ, মানিকতলা স্ট্রীট্

গ্রন্থন—নিউ ক্যালকাটা বাইণ্ডার্স

৫, নবীন পাল লেন

ব্লক—প্রসেস্ সিণ্ডিকেট

৫০, ভোলানাথ পাল লেন,

স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

মুদ্রাকর :

শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল

মুদ্রণ ভারতী প্রাইভেট লিঃ

২, রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯

মূল্য—৮·৫০

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

স্কুলগুলিতে এতকাল যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ১৯৬০ সাল থেকে তার আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। স্কুলগুলিতে একাদশ-শ্রেণী যুক্ত হয়েছে এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞানকে ঐচ্ছিক এবং আবশ্যিক দুই ভাবেই একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয়েছে। 'Men for the field and women for the hearth'—এই প্রাচীন সমাজ-বিধান গ্রহণ করতে আর আমরা রাজি নই, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে পুরুষ এবং নারীর কর্মের ক্ষেত্রে কখনই সম্পূর্ণভাবে এক হতে পারে না। কারণ, মেয়েদের বাইরের কাজের আগে সামলাতে হয় ঘর। এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই মেয়েদের পাঠ্যসূচীতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়েছে এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বিহারীলাল কলেজ' নামক গৃহ-বিজ্ঞান কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। গার্হস্থ্যতত্ত্বকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করা এবং গৃহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মেয়েদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়াই গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য। বস্তুত জাতির স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ গড়ে তোলেন জননীরা। তাই একদিকে তাঁদের যেমন গৃহ-সজ্জা, রন্ধন, বস্ত্রধৌতি প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য থাকা দরকার, তেমনি দরকার স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত জ্ঞান, খাদ্য সংক্রান্ত জ্ঞান, বস্ত্র-বিষয়ক জ্ঞান। যিনি রুচির সঙ্গে পুষ্টির, সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও উপযোগিতার সমন্বয় ঘটাতে পারেন তিনিই সার্থক গৃহ-পরিচালিকা।

ঐচ্ছিক পাঠ্য-সূচী অনুসারেই পুস্তকখানি লেখা হল। খাদ্য ও বস্ত্রধৌতির অধ্যায় কটি একটু বিস্তৃত করে বলা হয়েছে এবং পাঠ্য-সূচীবহির্ভূত কয়েকটি অতিরিক্ত প্রসঙ্গও আলোচনা করা হয়েছে যাতে গৃহ-বিজ্ঞানকে যারা আবশ্যিক হিসাবে নেবে তারাও আংশিক উপকৃত হয়। ছাত্রীদের সুবিধার জন্য পুস্তকের প্রারম্ভে পাঠ্য-সূচীর তালিকা এবং শেষে মধ্যশিক্ষা পর্ষতের প্রশ্ন দেওয়া হল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শ্রেণীর শেষে কতকগুলি অতিরিক্ত প্রশ্ন দেওয়া হল। বইখানিতে কিছু ছাপার ভুল থেকে গেল। সংশোধনী পত্রে তার কিছু কিছু সংশোধন করে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। গত বৎসরই বইটি প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। অনিবার্য কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের নিকট এখন বইখানি সমাদৃত হলে পরিশ্রম সার্থক বলে জানব। ইতি—

১লা ডিসেম্বর, '৬২
কলকাতা

গ্রন্থকারদ্বয়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত এবং পরিবর্ধিতরূপে প্রকাশিত হল। বইখানি ছাত্রীদের প্রয়োজন মেটাবে আশা রইল। ইতি—

২রা জানুয়ারী, '৬৪
কলকাতা

গ্রন্থকারদ্বয়

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হল। এতে Food-Value Chart দেওয়া হল; ছাত্রী ও শিক্ষকদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে বলে আশা করি।

২রা নভেম্বর, '৬৬
কলকাতা

গ্রন্থকারদ্বয়

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, WEST BENGAL

SYLLABUS

for

ELEMENTS OF HOME-SCIENCE (Elective)

PAPER I—Health and Household Management.

Group A—**Health**

Class IX

Theoretical : Good health—what it is. Importance of personal hygiene and cleanliness and fresh air and sunshine. Importance of developing good habits with regard to exercise, rest, sleep, bath and food. Study of proper heights and weights according to age.

Class X

Theoretical : An elementary study of community sanitation. Dangers of spitting and throwing garbage everywhere. Protection against infection—inoculation, vaccination and segregation or isolation. Causes and prevention of diarrhoea and malaria and of common contagious and infectious diseases like measles, chicken-pox, small-pox, tuberculosis, dysentery, cholera, typhoid, influenza, scabies, ringworm and other similar infectious skin diseases.

Principles of home nursing—qualities essential for nursing the sick and duties of the nurse. The sick room and its equipments. Details of nursing and taking care of the sick including principles of feeding the sick.

Class XI

Theoretical : Study of household pests and how to get rid of them—mosquitoes, bed-bugs, lice, rats, fleas, cockroaches, silver-fish, moths and white ants. Purification of drinking water. First-aid—burns, cuts and bruises; shocks, drowning, convulsions, bleeding, injuries, sprains and strains, fractures, artificial respirations, bites and stings, fits and faintings, foreign bodies.

Group B—Household Management

Class IX

Theoretical : Study of the house—site, locality, structure, ventilation, lighting, drainage, water supply and sanitation. Household furnishing—selection and arrangement of suitable furniture, fittings and simple articles for decoration in different rooms—colour combination. Selection, care and storage of household equipment—brass, glass, porcelain, aluminium, enamel, copper, iron, bell-metal (kansa), silver and earthenware vessels—their cost and suitability for Indian homes. Cleaning of the house and household equipments—cleaning of metals, glass, cane, wood and leather. Essential qualities for good management in home-makers and their duties. Human relationship—with other family members and domestic helpers. The girl in her family, her duties and responsibilities. Choosing friends and maintaining them.

Class X

Theoretical : Honsehold accounts and budget. Planning the use of income to meet the requirements for food, clothing, house-rent, health, education, recreation, taxes and saving. Methods of savings and benefits of savings. Hobbies for supplementing family income and wise use of leisure

Class XI

Theoretical : Planning for good management—division of work among family members. Labour-saving devices—Saving of time, effort and movement by planning—a knowledge of the use of various types of mechanical devices.

PAPER II {GROUP A—Food, Nutrition and Cookery.
GROUP B—Textiles, Clothing and Laundry.

Group A—Food, Nutrition and Cookery

Class IX

Theoretical : Food—its importance and functions. The kitchen—arrangement of well-equipped kitchen—safety in the kitchen—cooking utensils—different types of fuels and ovens—smokeless chula. Use of weight and measures required for cooking. Reasons for cooking food and simple methods of cooking

boiling, steaming, stewing, frying, roasting and baking. Cleanliness in food-handling. Planning of recipes for simple dishes like rice, dal, luchi, puri, chapatti, khitcyedi, bhaja and a vegetable curry. The principles and the art of serving food. Kitchen-garden.

Class X

Theoretical : Classification of food—their values and sources. Daily requirement of each food constituent. Calorie-value of food. Balanced diet. Effects of cooking on food.

Class XI

Theoretical : Planning of balanced diets for different age levels. Planning of meals for morniug, midday and evening—planning for tea and tiffin. Principles of food preservation in the home—causes of food deterioration.

Group B—Textiles, Clothing and Laundry

Class IX

Theoretical : Classification of fibres—their origin, sources, supply and nature. Laundry—the laundry room and equipments necessary for laundry and their care.

Class X

Theoretical : Water—hard and soft water—Methods of softening hard water. Cleansing agents—soaps, flakes, soap-powders, detergents, washing soda, rita nuts. Removal of stains—(1) vegetable, (2) animal and (3) mineral—and methods. Washing and finishing of articles—cotton, linen, silk, rayon (artificial silk), woollens—Rubbing, rinsing, starching, blueing, drying, ironing, folding and storing. Care of the sewing machine—oiling and cleaning it.

Class XI

Theoretical : Simple identification tests of textiles—physical and chemical properties, such as, elasticity, shrinkage, durability—finish and colour fastness. Nature of artificial silk. Simple dry cleaning methods in the home.

সূচীপত্র

নবম শ্রেণী

প্রথম পত্র

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়—খাদ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়—বস্ত্রশিল্প

দশম শ্রেণী

প্রথম পত্র

প্রথম অধ্যায়—স্বাস্থ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়—গৃহ-পরিচালনা

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়—খাদ্য-তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়—বস্ত্রধৌতিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

একাদশ শ্রেণী

প্রথম পত্র

প্রথম অধ্যায়—স্বাস্থ্য-তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রাথমিক প্রতিবিধান

তৃতীয় অধ্যায়—সুপরিকল্পিত গৃহ-পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়—খাদ্য-তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়—বস্ত্রশিল্প

উচ্চতর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

গৃহবিজ্ঞানের তাৎপর্য

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের (UNO) খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার (FAO) উদ্যোগে ১৯৫৬ সালে টোকিও শহরে একটি গৃহবিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারত, জাপান, কোরিয়া, মালয়, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েৎনাম, হাওয়াই, আকিনাওয়া এবং ইন্দোনেশিয়া এই দশটি দেশের প্রতিনিধিরা উহাতে যোগ দেয়। এশিয়ার দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে গৃহ-বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা এবং গার্হস্থ্যতত্ত্বকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করাই ছিল এই সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য। প্রাচ্যদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহবিজ্ঞান প্রচারের চেষ্টা এই বোধ হয় প্রথম। কিন্তু প্রথম হইলেও ভারতের ভূমিতে গার্হস্থ্যতত্ত্বটি কোনদিনই অবহেলিত হয় নাই। বহু বৎসর পূর্বে শাস্ত্রকার মনু আমাদের দেশের মেয়েদের বিবাহের প্রস্তুতি হিসাবে চৌষট্টিটি শিল্প শিক্ষার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে আমাদের দেশে গৃহবিজ্ঞানের গুরুত্ব ছিল কত বেশী। তবে তখনকার দিনে গৃহবিজ্ঞানের কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল না। মেয়েরা শুধু অভ্যাসের দ্বারা এবং অপরকে অনুকরণ করিয়া গৃহস্থালীর কাজগুলি আয়ত্ত করিত।

টোকিও শহরে গৃহবিজ্ঞান সম্মেলন

বর্তমানে শিল্পের প্রসার এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দানের ফলে গার্হস্থ্য-জীবনে অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে বটে, তবে গৃহের মূল কাঠামো আগে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি রহিয়া গিয়াছে। সমাজবেত্তারা পরিবারের কাজগুলিকে মুখ্য এবং গৌণ এই দুইভাগে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে গৌণ কর্মগুলি অর্থাৎ বিত্তোৎপাদন, সমাজশাসন, শুশ্রূষা, শিক্ষা, ধর্মাচরণ এবং আমোদ-প্রমোদ-সংক্রান্ত কাজ এখন আর পরিবারের দ্বারা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থা উহাদের ভার লইয়াছে। পরন্তু পরিবারের মুখ্য কর্মগুলি অর্থাৎ সন্তানধারণ ও সন্তানপালন এবং গৃহের সকল পরিজনদের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এখনও পরিবারের। প্রাচীন যুগের মত গৃহ তাই আজও সমাজের একক বলিয়া পরিচিত, সমাজে গৃহের ভূমিকা আজও

পরিবারের মুখ্য ও গৌণ কর্ম

সর্বজনস্বীকৃত। এলোমেলো, অগোছাল গৃহিণীর তাই ঘরে-বাইরে কোথাও সমাদর নাই।

আমেরিকার গার্হস্থ্য অর্থনীতির (অন্যত্র যাহা গৃহবিজ্ঞান নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর এলেন এইচ. রিচার্ডস্ গৃহবিজ্ঞানের চারিটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। সেগুলি এই :—

(১) বস্তুতন্ত্রের প্রাধান্য হইতে গৃহকে মুক্ত করিয়া তাহাকে আদর্শানুগ করা;

গৃহবিজ্ঞানের ৪টি লক্ষ্য

(২) বিজ্ঞানের সম্পদকে ঘরোয়া কাজে লাগান;

(৩) জীবনযাত্রাকে যথাসম্ভব সরল করিয়া তুলিয়া সমাজের অন্যান্য মূল্যবান এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী স্বার্থের কাজে ব্যক্তিকে আত্মনিয়োগের সুযোগ দেওয়া;

(৪) বর্তমানকে অতীতের ঐতিহ্যের শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আদর্শ জীবনের প্রতিষ্ঠা করা।

গৃহবিজ্ঞানের লক্ষ্য যে বিরাট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহবিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকের মনে তবু একটা সংশয় থাকিয়া যায়। স্বভাবতই মনে একটা প্রশ্ন জাগিতে পারে যে প্রাচীন যুগের মেয়েরা যদি তাহাদের মা দিদিমাদের নিকট হইতে এই বিদ্যাটি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন তবে আমাদের যুগেই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? গৃহবিজ্ঞানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা কি? অত্যন্ত সংক্ষেপে ইহার জবাব এই যে সমাজব্যবস্থা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। বিজ্ঞানও জীবনযাত্রার মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে। মানুষ আজ যেভাবে প্রগতির পিছনে ছুটিয়াছে ইতিমধ্যে তাহা অনেক দেশের পারিবারিক জীবনকে আঘাত করিতে শুরু করিয়াছে। যেসব সামাজিক মূল্য-বোধগুলি (Social values) এতকাল পর্যন্ত পারিবারিক সম্বন্ধকে সচল রাখিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই আজ শিথিল হইয়া আসিতেছে নয়ত একেবারে অবলুপ্ত হইয়াছে। সমস্ত সমাজ যেখানে এক বিপুল পরিবর্তনের সম্মুখীন সেখানে গৃহবিজ্ঞানকে কোনরূপ সংস্কারের চেষ্টা না করিয়া শতাধিক বৎসর পূর্বে যে অবস্থায় ছিল উহাকে ঠিক সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে অদূর ভবিষ্যতে পারিবারিক জীবনকে হয়ত একেবারেই টিকাইয়া রাখা যাইবে না।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের সামনে জীবিকার কোন পথ খোলা ছিল না। তাছাড়া স্বাধীনতা বলিতেও তাঁহারা কিছুই ভোগ করিতেন না। আজ মেয়েদের

সামনে বহির্বিশ্বের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়াছে। স্বভাবতই তাঁহারা গৃহের কোণে নিজেদের আর আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন না। অনেকের আবার আর্থিক প্রয়োজনেও বাহিরে কাজ নিতে হইতেছে। অথচ ঘরকেও তাঁহারা কোনমতেই অবহেলা করিতে পারেন না। ঘর এবং বাহির নারীর জীবনে সক্রিয় এই দুইটি বিপরীতমুখী শক্তির মধ্যে যাহাতে সংঘাত না বাধে সেইদিকে দৃষ্টি দেয় গৃহবিজ্ঞান।

মেয়েদের জীবনে ঘর ও বাহির

তবে মেয়েদের আর্থিক কিংবা প্রাক্ষোভিক চাহিদা মিটানোতেই গৃহবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সীমাবদ্ধ নয়, ইহার তাৎপর্য আরও গভীর। আমরা প্রত্যেকে জানি শিশু অর্থাৎ সন্তানের জীবন মায়েদের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু শিশুদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে, কিশোরদের মানসিক পরিণমনে গৃহের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই। ব্যক্তির জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ নির্ভর করে বংশগতি (heredity) এবং পরিবেশের (environment) উপর। পরিবেশ বলিতে আবার বুঝায় গৃহ, বাপমা, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ অর্থাৎ ব্যক্তির জীবনে যাহা কিছু প্রভাব বিস্তার করে একাধারে সব। জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব এত বেশী জটিল যে উহা অনুধাবনের জন্য বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। গৃহবিজ্ঞান আমাদের সেই বিশিষ্ট জ্ঞান দিয়া পরিবেশ অনুশীলনে সাহায্য করে।

শিশুপালনে গৃহবিজ্ঞানের ভূমিকা

শিক্ষিত গৃহিণী খাদ্যের সঙ্গে পুষ্টির সম্পর্ক কি তাহা জানেন। তাই বুঝিতে পারেন বাড়ীর প্রত্যেকে কি পুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে, না কেবল রুচিকর খাদ্যই খাইতেছে ; প্রত্যেকের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা হইতেছে, না কাহারো ভাগ্যে জুটিতেছে অখণ্ড অবসর আর কাহারো ভাগ্যে অবিশ্রান্ত খাটুনি ; ছোট শিশুটি যত্নের নামে কেবল প্রশ্রয় পাইতেছে, না তাহার কিছু সদভ্যাসও গঠিত হইতেছে। গৃহে যে পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র আসিতেছে তাহা কি সত্যই প্রয়োজনীয় এবং আরামপ্রদ, না অপরের কাছে শুধু বড়মানুষি প্রকাশের চেষ্টা।

গৃহপরিচালনার সাফল্যের উপর নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা। বর্তমান সমাজে পারিবারিক চেহারার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যেমন যৌথপরিবার প্রথায় ভাঙন ধরিয়াছে, পরিবারগুলি আকারে অনেক ছোট

হইয়াছে, বাড়ির লোকেদের উপর গৃহকর্তার সেই কর্তৃত্ব আর নাই, মেয়েরাও স্বাধীনতা পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিতেছে। পরিবারের এই রূপান্তর সমাজে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। গৃহবিজ্ঞানের শিক্ষা এইসব সমস্যা সমাধানে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে।

আধুনিক পরিবারের সমস্যা

সুগৃহিণীর লক্ষ্য হইবে এমন একটি আদর্শ-পরিবেশ রচনা করা,

(১) যেখানে বাড়ির প্রত্যেকটি লোক নিরাপত্তা এবং আপন আপন গুরুত্ব অনুভব করে এবং প্রত্যেকের আব্রু রক্ষিত হয়;

আদর্শ গৃহের বৈশিষ্ট্য

(২) যেখানে ছোট বড় প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ঘটে;

(৩) যেখানে প্রত্যেকের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে খেয়াল রাখা হয়;

(৪) যেখানে প্রত্যেকের বন্ধুবান্ধবকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনা যায়;

(৫) যেখানে প্রত্যেকেই শ্রম ও বিশ্রামের ছন্দ মানিয়া চলিতে পারে;

(৬) যেখানে স্নেহ এবং সদিচ্ছার প্রাচুর্য রহিয়াছে।

পৃথিবীতে হয়ত এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মানুষের এই চাহিদাগুলির কোন কোনটি পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু গৃহই হইল একমাত্র স্থান যেখানে জীবনের উপরোক্ত সকল চাহিদাগুলি মিটিতে পারে।

গৃহবিজ্ঞান আমাদের যেসব বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় সেগুলি এই :—

(১) খাদ্যতত্ত্ব ও পুষ্টি; (২) শিশুপালন; (৩) স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক প্রতিবিধান; (৪) গৃহসজ্জা; (৫) পোশাক নির্মাণ; (৬) গৃহপরিকল্পনা; (৭) গার্হস্থ্য অর্থনীতি; (৮) সমাজসেবা। তাছাড়া গৃহপরিচালনার জন্য মৌলিক বিজ্ঞান ও শিল্পকলারও সাধারণ জ্ঞান থাকা চাই। এই সকল বিষয়ের উপযুক্ত জ্ঞান গৃহিণীকে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে, অপচয় নিবারণে এবং গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে সাহায্য করিবে।

গৃহবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

মানুষই হউক আর অর্থই হউক হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায় তাহার যথাযথ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে সার্থক গৃহপরিকল্পনা। আর তাহার জন্য চাই গৃহের প্রত্যেকটি লোকের সহযোগিতা, প্রত্যেকের একসঙ্গে কাজ করার সদিচ্ছা। সকলে যদি একসঙ্গে মিলিয়া গৃহজীবনের লক্ষ্য স্থির করে এবং তাহাকে সফল করিবার জন্য আপন আপন সাধ্যমত চেষ্টা করে তবেই গৃহ প্রকৃত গৃহ হইয়া উঠিতে পারে।

অর্থ ও শ্রমের সদ্ব্যবহার

গৃহিণীর দায়িত্ব প্রচুর। পুষ্টিকর খাদ্যকে রুচিকর করিয়া পরিবেশন করা, খাদ্য সম্বন্ধে গৃহের সকলের সদভ্যাস গঠন করা—এই সবই তাহাকে জানিতে হয়। তাছাড়া পোশাক নির্বাচন, পোশাক প্রস্তুতি এবং সর্বোপরি উহা সংরক্ষণের কৌশলটিও তাহার দখলে থাকা চাই। কিন্তু তাহার সবচেয়ে বেশী নজর দিতে হয় শিশুপালনের দিকে। অবহেলিত এবং বিশৃঙ্খলভাবে প্রতিপালিত শিশু কখনই সুনাগরিক হইয়া উঠিতে পারে না। গৃহিণীকে তাই শিশুদের পরিচর্যার কাজে সুদক্ষ হওয়া চাই। শিশুদের দৈহিক প্রয়োজন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধেও তিনি অবহিত হইবেন। শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, তাহার আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা সব কিছুই গৃহিণীর মনোযোগের অপেক্ষা রাখে।

গৃহিণীর দায়িত্ব

গৃহপরিচালনার কাজে যেমন বিচিত্র বিষয়ের জ্ঞান থাকা দরকার পৃথিবীর আর কোন বৃত্তিতেই বোধ হয় তেমন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। পরিবারের কাছে গৃহিণী একাধারে চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারিণী, সূপকার, মনস্তাত্ত্বিক, পোশাকনির্মাতা, শিক্ষয়িত্রী, অর্থনীতিবিদ্ এবং সমাজসেবিকা, সর্বোপরি তিনি স্নেহশীলা জননী, জায়া এবং গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির বন্ধু ও সহচরী।

গৃহবিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা আমাদের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়া জীবনকে পূর্ণতা দানের চেষ্টা করিতেছে। তাছাড়া গৃহবিজ্ঞান আজ মেয়েদের সামনে নতুন একটি বৃত্তির পথও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। গৃহবিজ্ঞানের শিক্ষা লইয়া মেয়েরা শিক্ষকতা এবং সমাজসেবার কাজে নামিতে পারিতেছে। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় আজ প্রত্যেক মেয়েরই গৃহবিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা চাই। পৃথিবীর সকল মেয়েকে আপন সন্তান নাও মানুষ করিতে হইতে পারে কিন্তু গৃহবিজ্ঞানের পাঠ লইয়া শিক্ষকতার কাজে নামিলে গৃহ অনায়াসে বিস্তৃত হইতে পারে সমাজে।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমন্বয়

বৃত্তি হিসাবে গৃহবিজ্ঞান

প্রথম পত্র

প্রথম ভাগ—স্বাস্থ্য

দ্বিতীয় ভাগ—গৃহ-পরিচালনা

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য কাহাকে বলে? যাহার শরীরে রোগ আছে সে অসুস্থ এবং যাহার শরীরে কোন রোগ নাই তাহাকে সুস্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সুস্থ থাকা এক কথা এবং স্বাস্থ্যবান হওয়া আরেক কথা। কারণ যখনই কোন রোগ হইল তখন আমরা অসুস্থ হইয়া পড়ি, আবার যখনই রোগমুক্ত হই তখন আমরা সুস্থ থাকি। এইরূপ সুস্থ থাকা না-থাকা নির্ভর করে কোন আকস্মিক রোগভোগ কিংবা রোগ উপশমের উপর। স্বাস্থ্য বলিতে কেবল কোন রোগের অভাব বা অনুপস্থিতি বুঝায় না। স্বাস্থ্য হইল আমাদের দেহ ও মনের এমন একটি স্থায়ী সুখানুভূতি যাহা রীতিমত অভ্যাস ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করিতে হয়। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি প্রথমত নীরোগ হইবেন কিন্তু তাহার দেহে আরও কতকগুলি লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে।

স্বাস্থ্যের লক্ষণ—(১) জাতি, দেশ, কাল ও বয়স অনুযায়ী প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির দেহের গঠনে সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য থাকিবে, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য থাকিবে এবং সমগ্র দেহে স্বাস্থ্যের লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিবে।

(২) দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মশক্তি দেহে সর্বদা সঞ্চিত থাকিবে; অপরের তুলনায় সুস্থ ব্যক্তির রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতাও স্বভাবত বেশী থাকিবে। সাধারণ অনিয়ম কিংবা সামান্য অসাবধানতাতেই সে তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িবে না।

(৩) দৈহিক শক্তিক্ষয়ের মাত্রা অত্যন্ত বেশী কিংবা খুব দ্রুত হইবে না। কর্মশক্তি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকিবে এবং স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি কখনও শ্রমবিমুখ হইবে না।

(৪) দেহ সর্বদা রোগহীন বলিষ্ঠ ও স্ফূর্তিযুক্ত হইবে। পরিমিত দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তি আসিবে না। স্বাস্থ্যবানের লক্ষণই হইল কর্মে অফুরন্ত উৎসাহ ও আনন্দ।

(৫) সর্বোপরি স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি হইবে দীর্ঘায়ু। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ সুগঠিত ও কর্মক্ষম হইবার ফলে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকে জরা সহজে কাবু করিতে

পারে না। দেহে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা সঞ্চিত থাকিবার ফলে সুস্থ ব্যক্তিকে রোগ সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। দেহের সঙ্গে মনের এক নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। দেহ সুস্থ থাকিলে মনও স্বভাবতই স্ফূর্তিযুক্ত হয়। এই সমস্ত কারণেই স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

সুস্থ থাকার উপকারিতা—(১) প্রথমত, দেহ সুস্থ থাকিলে রোগভোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। রোগযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি কম কথা নয়। ইহাতে দেহে কর্মশক্তি বাড়ে, শরীর পুষ্ট হয় এবং জীবনে সাফল্য আসে।

(২) দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্য কেবল ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। ইহা আসলে জাতীয় সম্পদ। ব্যাধি-প্রপীড়িত দেশের লোকেরা কখন শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি ও সম্পদে উজ্জ্বল জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ এইসব দেশে কেবল অকর্মণ্য লোকের সংখ্যা বাড়ে, জাতির সমস্ত শক্তি ও অর্থ ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করিতেই ফুরাইয়া যায়।

(৩) তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যই সম্পদ এবং দেহ সুস্থ থাকিলে মানুষ জীবনের সকল সুখ আকণ্ঠ পান করিতে পারে। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির অর্থ না থাকিলেও ক্ষতি নাই কারণ সে খাটিয়া খাইতে পারে। তাহার দেহে রহিয়াছে কর্মশক্তি এবং মনে অফুরন্ত আনন্দ আর উৎসাহ।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কাহাকে বলে ?—বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হইল বিশেষ জ্ঞান। যে বিদ্যা পাঠ করিয়া আমরা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সকল তথ্য অবগত হইতে পারি তাহাই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আবার তিন ভাগে বিভক্ত—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য। এই তিনটি আবার ওতপ্রোত। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সমষ্টিকে বলা হয় জনস্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন দেশের জনগণের উপর নির্ভরশীল আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য।
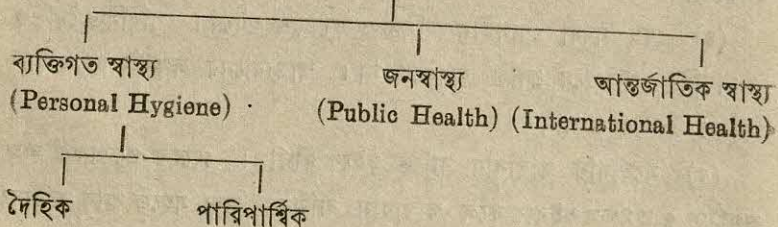
(১) **ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব** (Personal Hygiene)—প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাস্থ্যের যে বিধানগুলি পালনের দ্বারা নিজেকে সুস্থ, সবল, নীরোগ ও কর্মক্ষমরূপে গড়িয়া তুলিতে পারে তাহাই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব নামে পরিচিত। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্বের আবার দুটি দিক—**দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক**। দৈহিক স্বাস্থ্য বলিতে বুঝায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা এবং পারিপার্শ্বিক বলিতে বুঝায় গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও রোগজীবাণু সম্বন্ধে সতর্কতা।

(২) **জনস্বাস্থ্য** (Public Health)—সমষ্টিগতভাবে সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে, দূষিত খাদ্যজনিত নানারূপ অসুস্থতা ও অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা-ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্যের অন্তর্গত। জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের জন্য প্রয়োজন :—

(ক) প্রথমত, সকলের জন্য বিশুদ্ধ ও ভেজালবর্জিত খাদ্য ও পানীয়ের (food and water) ব্যবস্থা করা। প্রথমেই দেখা দরকার ধনি-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই যাহাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইতে পারে, সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে কাহাকেও যেন দূষিত জল পান করিতে না হয়। খাদ্য সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। বাজারে যাহাতে দূষিত কিংবা ভেজাল খাদ্য বিক্রয় বন্ধ হয় সে ব্যবস্থাও করা দরকার। এগুলি কাহারও একক প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। সরকারকেই ইহার প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে চাই জনগণের সহযোগিতা।

(খ) দ্বিতীয়ত, সকলের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত গৃহ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ (shelter) সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে বস্তি অঞ্চলের উন্নতিবিধান করা, শহরের মাঝে মাঝে পার্ক স্থাপন করা, রাস্তাঘাট, নর্দমা ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নিয়মিত ময়লা নিকাশের ব্যবস্থা করা দরকার। পৌরসভাই সচরাচর এইসব কাজের দায়িত্ব লইয়া থাকে। তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমাদেরও কর্তব্য স্থানীয় পৌরসভার কাজে সাহায্য করা এবং প্রয়োজনমত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা।

(গ) তৃতীয়ত, সকলকে সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করা (protection)। কোথাও কোন সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ রোগীকে সুস্থ ব্যক্তিদের নিকট হইতে সরাইয়া ফেলিতে হয়। কলেরা, বসন্ত কিংবা টাইফয়েড রোগের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে জনসাধারণকে টিকা কিংবা ইনজেকশান দিয়া রোগ প্রতিরোধ করা দরকার। এই সমস্ত কাজই গণস্বাস্থ্যবিভাগের হাতে থাকে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য গণস্বাস্থ্য-

বিভাগের কাজে সহযোগিতা করিয়া চলা। নতুবা শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় রোগ প্রতিরোধ করা কিংবা রোগসংক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব নয়।

(ঘ) চতুর্থত, প্রসূতি ও সন্তানদের জীবন নিরাপদ করা। উপযুক্ত যত্নের অভাবে আমাদের দেশে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী। ইহার জন্ম গণস্বাস্থ্যবিভাগ এবং আমাদের দেশের অজ্ঞ জনসাধারণ সমভাবে দায়ী। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা এই অকাল মৃত্যু-জনিত লোকক্ষয় বন্ধ করা সম্ভব।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের সম্পর্ক—ব্যক্তির সমষ্টিকে নিয়াই সমাজ। জনস্বাস্থ্য তাই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যেরই সমষ্টিমাত্র। কোন দেশের জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে সেই দেশের লোকেদের স্বাস্থ্য কেমন তাহা জানা দরকার। ব্যক্তির স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য একেবারে ওতপ্রোত জড়িত।

জনস্বাস্থ্যের উপর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। যে গ্রাম কিংবা শহরে বাস ব্যক্তি যদি সেখানকার স্থানীয় পরিবেশের স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হয়, বাসগৃহের নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখে, বাড়ির আশেপাশে জঞ্জালের স্তূপ জড় না করে, ঘরগুলিতে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করে, স্নানাদির জলনিকাশ এবং পায়খানার স্ববন্দোবস্ত রাখে তবে উহা প্রত্যক্ষভাবে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। পরন্তু ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতাই আমাদের দেশে সচরাচর সংক্রামক ব্যাধিগুলি ছড়াইয়া থাকে এবং জনস্বাস্থ্য কলুষিত করিতে সাহায্য করে। পূর্বে আমাদের দেশে গ্রামগুলিতে যে কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীর আকার ধারণ করিত তাহার মূলে ছিল ব্যক্তিগত অজ্ঞতা। ব্যক্তির স্বাস্থ্য এইভাবে যেমন জনস্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে তেমনি শহরে কিংবা পল্লী অঞ্চলগুলিতে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা, আবর্জনা ও জলনিকাশনের পদ্ধতি, সংক্রামক রোগ মারীর আকার ধারণ করিবার পূর্বে জনসাধারণকে টিকা দিবার ব্যবস্থা, প্রসূতিদের যত্ন প্রভৃতি জনস্বাস্থ্যহিতকর বিধিগুলির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য।

জনস্বাস্থ্য যাহাতে উন্নত হয় তাহার জন্য দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি আজ শিক্ষা দিতে হইবে। নতুবা ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতার ফলে জাতীয় স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে পারে। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যদি স্বাস্থ্যের বিধানগুলি মানিয়া চলে তবেই একটি জাতির পক্ষে সুস্থ সবলরূপে গড়িয়া ওঠা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য—সমুদ্র এবং বিমানপথে এক দেশ হইতে আরেক দেশে সংক্রামক ব্যাধিগুলি বিস্তার লাভ করিতে পারে। বাণিজ্যিক জাহাজগুলি সচরাচর কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধিগুলির জীবাণু বহন করিয়া চলে। রোগবিস্তার প্রতিরোধের জন্য বন্দরে যানবাহনাদির গতি নিয়ন্ত্রণ করা, জাহাজে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া লওয়া এবং প্রয়োজন বোধে তাহাদের সঙ্গরোধ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাখা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধির অন্তর্গত।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য (Personal Hygiene)

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ছয়টি মুল নীতির উপর নির্ভর করে, যথা—(১) সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতা, (২) ব্যায়াম, (৩) বিশ্রাম ও নিদ্রা, (৪) স্নান, (৫) পরিমিত ভোজন ও (৬) সদভ্যাস গঠন।

দেহ সুস্থ থাকা নির্ভর করে সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতার উপর। সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতাকে আমরা দুই পর্যায়ে ভাগ করিতে পারি—**দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক**।

(ক) **দৈহিক পরিচ্ছন্নতা**—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম সূত্র হইল দৈহিক পরিচ্ছন্নতা। অপরিচ্ছন্ন দেহে রোগজীবাণু সহজেই বাসা বাঁধে। রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা মনেরও শুচিতা আনে। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচ্ছন্ন না রাখিতে পারিলে সত্যকার পরিচ্ছন্ন হওয়া যায় না। সুতরাং চুল হইতে নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দৈহিক পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে আবার স্নান, মলমূত্রত্যাগ প্রভৃতি নিত্যকর্মগুলি এবং পোশাকপরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা জড়িত। দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পোশাকপরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা, নিদ্রা, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও খাদ্যপানীয় সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের অন্তর্গত। উপযুক্ত সদভ্যাস গঠনের দ্বারা মানুষমাত্রই নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারে। এখানে প্রথমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার আলোচনা করা হইল।

চক্ষু—চক্ষু আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়। অক্ষিগোলক দুইটি অক্ষিকোটরের মধ্যে অবস্থিত। এই অক্ষিকোটরটি দুর্গ-প্রাচীরের মত অক্ষিগোলক দুইটিকে বাহিরের সমস্ত আঘাত হইতে রক্ষা করে।

(১) **নেত্রপক্ষ**—ইহারা অক্ষিগোলকের বহিরাবরণ। নেত্রপক্ষদ্বয় ধুলিকণা ও কীটপতঙ্গের হাত হইতে সর্বদা চক্ষু দুইটি রক্ষা করে।

(২) **অক্ষিগোলক**—অক্ষিগোলক তিন প্রস্থ পর্দা দিয়া গঠিত। বাহিরের পর্দাটির নাম (ক) **শ্বেতমণ্ডল** (Sclera)। চোখের যে সাদা অংশ আমরা দেখিতে পাই তাহাই শ্বেতমণ্ডল। একটি মসৃণ ঝিল্লী ইহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। শ্বেতমণ্ডলের সম্মুখভাগের স্বচ্ছ অংশটির নাম অচ্ছোদপটল (Cornea)। (খ) **কৃষ্ণমণ্ডল** (Choroid)—অক্ষিগোলকের মাঝের পর্দাটির নাম কৃষ্ণমণ্ডল। কৃষ্ণমণ্ডল শ্বেতমণ্ডলের একেবারে গা ঘেঁষিয়া রহিয়াছে। ইহার সম্মুখভাগটি একটি ক্ষুদ্র পেশী। এই পেশী স্ফটিক কাচটি (Lens) ধারণে সাহায্য করে। আচ্ছাদপটলের পশ্চাতে কৃষ্ণবর্ণের পর্দাটির নাম কণীনিকা (Iris)। কণীনিকার মাঝখানের ছিদ্রটির নাম অক্ষিতারকা বা চোখের মণি (Pupil) ; অক্ষিতারকার সম্মুখভাগে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (Anterior Chamber) আছে। উহা জলীয় পদার্থে (Aqueous Humour) পূর্ণ থাকে। (গ) **অক্ষিপট** (Retina)—অক্ষিগোলকের অন্তরতম পর্দাটির নাম অক্ষিপট। ইহা দৃষ্টিবহ স্নায়ুর শাখাপ্রশাখাদ্বারা গঠিত।

(৩) **স্ফটিক কাচ** (Crystalline Lens)—চোখের মণির ঠিক পিছনেই স্ফটিক কাচটি অবস্থিত। এই কাচের স্বচ্ছভাব নষ্ট হওয়ার নাম চোখে ছানি পড়া।

(৪) **Vitreous Humour**—স্ফটিক কাচের পিছনের গাঢ় তরল পদার্থ। এই তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ বলিয়া অক্ষিগোলকটি স্ফীত হইয়া থাকে।
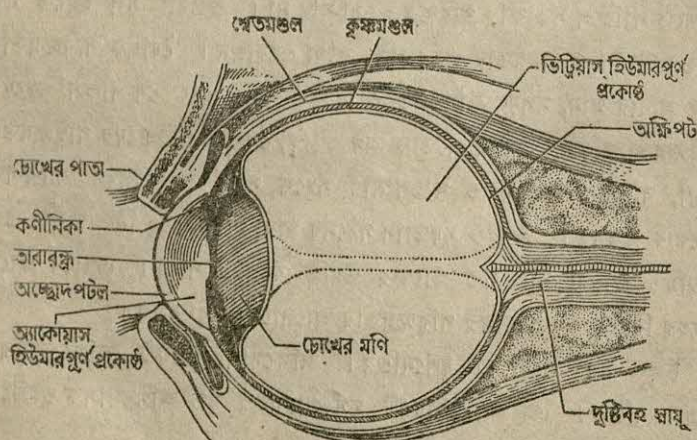
চোখের যত্ন—আজকাল আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মধ্যে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা দেখা যায়। সাধারণ স্বাস্থ্যহীনতার ফলেই এইরূপ ঘটিতেছে।

দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত রাখিতে হইলে প্রত্যেকেরই কতকগুলি নিয়ম পালন করা উচিত।

(১) প্রত্যহ প্রত্যুষে ঠাণ্ডা জল দিয়া চোখ খুব ভাল করিয়া ধুইবে। তাছাড়া দিনে অন্তত কয়েকবার চক্ষুদ্বয় ধুইয়া ফেলিবে এবং লক্ষ্য রাখিবে চোখে যেন পিচুটি জমিয়া না থাকে।

(২) স্বল্পালোক কিংবা অত্যুজ্জ্বল আলোকে পড়াশুনা করিলেও চোখ নষ্ট হয়। প্রখর বৈদ্যুতিক আলোর নীচে লেখাপড়া করা চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। চোখের কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপকারী হইল সূর্যালোক।

(৩) দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার আরেকটি কারণ চোখকে অত্যধিক খাটান। অধিক সময় বসিয়া পড়াশুনা কিংবা কোন শিল্প কাজ করিতে হইলে মাঝে মাঝে চোখকে বিশ্রাম দিবে এবং কিছুক্ষণ অন্তর সবুজ গাছপালার দিকে তাকাইয়া দৃষ্টি স্নিগ্ধ করিয়া লইবে।

(৪) চোখের খুব কাছে আনিয়া বই পড়িতে নাই। অন্তত ১ফুট দূরে বই রাখিয়া পড়া উচিত। অধিকক্ষণ ধরিয়া খুব ছোট অক্ষরের ছাপা বই পড়িলেও চোখ নষ্ট হইতে পারে। পুস্তক নির্বাচনের সময় তাই উহার অক্ষরের দিকে নজর রাখা উচিত।

(৫) সোজাসুজি চোখে আলো লাগিলে চক্ষু ঝাপসাইয়া যায়। তাই পড়ার টেবিলে যাহাতে বাম দিক হইতে আলো আসে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে।

(৬) দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা প্রকাশ পাইবামাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইবে এবং তাহার পরামর্শ চাহিবে।

চক্ষুর নিবার্য ব্যাধি ঃ

(১) জন্মের অব্যবহিত পরেই বোরিক লোশন দ্বারা প্রত্যেক শিশুর চক্ষু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত নতুবা চক্ষু ওঠা রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এই রোগটির কবলে পড়িয়া অনেক শিশু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে।

(২) আমরা সচরাচর যে চক্ষু-ওঠা রোগ দেখিতে পাই তাহা সংক্রামক। রোগীর চোখে পিচুটি পড়া এবং চোখ জড়াইয়া যাওয়া এই রোগের প্রধান উপসর্গ। রোগীর সংস্রবে আসিলে কিংবা কীটপতঙ্গাদির দ্বারা এই রোগ ছড়ায়। রোগীর সংস্পর্শ এড়াইয়া চলা এবং কীটের হাত হইতে চোখকে রক্ষা করাই এই রোগ প্রতিরোধের উপায়। আক্রান্ত ব্যক্তিদের চশমা দ্বারা চক্ষু আবৃত করা উচিত এবং সাধারণের মধ্যে মেলামেশা বন্ধ করা অবশ্য কর্তব্য।

(৩) চোখের আরেকটি রোগ Trachoma ; এই ব্যাধিতেও বহু লোক অন্ধ হইয়া যায়।

কর্ণ—চক্ষু যেমন আমাদের দৃষ্টিযন্ত্র, কর্ণ তেমনি আমাদের শ্রবণযন্ত্র। সমস্ত শব্দ গ্রহণ করিয়া কান মস্তিষ্কের শ্রবণযন্ত্রে পাঠাইয়া দেয়। কানের যত্ন নেওয়া আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্বের অন্তর্গত।

কান তিনটি অংশে বিভক্ত—

(১) বহিঃকর্ণ,

(২) মধ্যকর্ণ,

(৩) অন্তঃকর্ণ,

বহিঃকর্ণ—কর্ণপত্র এবং কর্ণকুহর লইয়া বহিঃকর্ণ গঠিত। সমগ্র বহিঃকর্ণ অস্থিদ্বারা গঠিত এবং চর্মদ্বারা আবৃত। কর্ণকুহরের একেবারে শেষপ্রান্তে কর্ণপটহ অবস্থিত। কর্ণপটহ কর্ণকুহরের শব্দতরঙ্গগুলিকে গ্রহণ করে।

মধ্যকর্ণ—কর্ণপটহের পরেই মধ্যকর্ণ শুরু হয়। ইহা করোটির টেম্পোরাল অস্থির একটি কক্ষ। তিনখানি হাড় দিয়া এই কক্ষটি প্রস্তুত। হাড় কয়খানিকে একত্রে অসিক্‌লস্‌ (Ossicles) বলা হয়। এই কক্ষের সামনের দিকে শ্রবণনালী (Eustachian Tube) অবস্থিত। মধ্যকর্ণের বাইরের দিকে কর্ণপটহ এবং ভিতরের দিকে অন্তঃকর্ণ।

অন্তঃকর্ণ—ইহাও করোটির টেম্পোরাল অস্থিতে অবস্থিত। ইহার অপর নাম গোলকধাঁধাঁ। অন্তঃকর্ণের অভ্যন্তরে শম্বুকনালী নামে একটি আড়াই পাক যন্ত্র আছে। উহাই আসল শ্রবণযন্ত্র। শম্বুকনালীর পাকের মধ্যে যে জলপ্রণালী আছে তাহার মাঝামাঝি একটি তন্তুময় পর্দা রহিয়াছে। এই তন্তুময় পর্দাটি ঠিক হারমোনিয়ামের চাবির মত সাজান। এইগুলি বিভিন্ন শব্দ গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্কে পাঠায়। ইহা ব্যতীত অন্তঃকর্ণের মধ্যে আরো তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নল আছে।

কানের রোগ—কানের সুড়ঙ্গপথে যে স্নেহগ্রন্থি রহিয়াছে সেই গ্রন্থিনির্গত স্নেহপদার্থ কানে আসিয়া খইল সৃষ্টি করে। অধিক দিন খইল জমিয়া থাকিলে কান ব্যথা হয়, এমন কি শ্রবণশক্তি পর্যন্ত কমিয়া যাইতে পারে।

কানের আরেকটি রোগ হইল পুঁজ জমা। বেশীদিন পুঁজ জমিলে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। কানে পুঁজ জমিতে থাকিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

কানের যত্ন—কানে যাহাতে খইল জমিতে না পারে সেজন্য নিয়মিত কান পরিষ্কার করা দরকার। খইল বেশী শক্ত হইয়া গেলে কর্ণরন্ধ্রে দুই এক
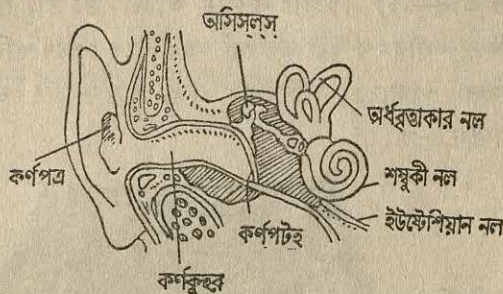
ফোঁটা তেল ফেলিয়া দিলে খইল নরম হইয়া সহজেই বাহির হইয়া আসিবে। প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের সাহায্যে সিরিঞ্জ দিয়া কানের অভ্যন্তর ভাগ ধুইয়া ফেলিবে।

নাক—নাক আমাদের ঘ্রাণযন্ত্র এবং শ্বাসপথের বহির্দ্বার। নাকের সকল অংশই ঘ্রাণ গ্রহণের কাজ করে না। নাসা-গহ্বরের মধ্যে বাদামী রঙের ঘ্রাণ-ঝিল্লী আছে। ঐ ঝিল্লী ঘ্রাণকোষে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি ঘ্রাণকোষের একেকটি শুঁড় আছে। শুঁড়গুলি নাসিকারসের মধ্যে সর্বদা ডুবিয়া থাকে। কোন বস্তুর গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া প্রথমে ঐ নাসিকারসের মধ্যে পৌছায়। তারপর ঘ্রাণকোষের শুঁড়গুলিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। ঐ উত্তেজনার চেতনা মস্তিষ্কের ঘ্রাণকোষে গিয়া পৌছায় এবং আমরা ঘ্রাণ অনুভব করি।

নাকের যত্ন—নাসারন্ধ্রে অনেক সময় ধুলা ও ধূমজনিত ময়লা জমিয়া থাকে। প্রতিদিন স্নানের সময় নাসারন্ধ্রে এক ফোঁটা সরিষার তেল (শিশুদের ক্ষেত্রে অলিভ অয়েল) ফেলিয়া দিয়া পরিষ্কার রুমাল কিংবা কাপড়ের খুঁট দিয়া মুছিয়া লইলে নাক পরিষ্কার হইয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত শ্লেষ্মা আসিলে নাক ঝাড়িয়া পরিষ্কার জল দিয়া নাক ও হাত ধুইয়া ফেলিবে। যখন তখন নাক খোঁটা, যেখানে সেখানে সর্দি ফেলা, সর্দি ঝাড়িয়া হাত না ধোওয়া—এ সকল অত্যন্ত বদ অভ্যাস এবং সর্বদা পরিত্যাজ্য।

জিহ্বা—জিহ্বা আমাদের রসনেন্দ্রিয়। ইহা মুখগহ্বরে অবস্থিত এবং মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত। পেশীগুলি প্রয়োজনমত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করা যায়। পাতলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা আমাদের জিহ্বা আবৃত জিহ্বার

উপরিভাগে সূক্ষ্ম দানার মত গুটি আছে। এইগুলি আমাদের স্বাদযন্ত্র। ইহাদের সাহায্যে আমরা বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি।

জিহ্বার কার্য—(১) জিহ্বার সাহায্যে আমরা বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করি।

(২) জিহ্বা সঞ্চালন করিয়া খাদ্যদ্রব্য অন্ননালীতে প্রেরণ করি।

(৩) জিহ্বা আমাদের বাগিন্দ্রিয়। ইহা শব্দোচ্চারণে ও বাক্যকথনে আমাদের সাহায্য করে।

জিহ্বা

জিহ্বার যত্ন—প্রতিদিন দাঁত মাজিবার সময় জিব-ছোলা দিয়া জিহ্বার ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

জিহ্বায় ঘা হইলে মধু সহযোগে সোহাগার খই কিংবা বরিক পাউডার প্রয়োগ করিবে। তাহাতে উপকার না হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

দন্ত—খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া খাইবার জন্য আমাদের মুখগহ্বরে দুই পংক্তি দাঁত থাকে। প্রত্যেক পংক্তি দাঁত ডান ও বাম দিকে সমভাবে সজ্জিত। জীবনে দুইবার দাঁত উঠিয়া থাকে। জন্মের পর ছয় মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে কুড়িটি অস্থায়ী দাঁত। তারপর ছয় হইতে বিশ, কিংবা তদূর্ধ্ব বৎসরের মধ্যে ঐ দাঁত পড়িয়া গিয়া ৩২টি নতুন স্থায়ী দাঁত ওঠে। দাঁত চার রকমের—কর্তন

(Incisors), ছেদন (Canines), চর্বণ (Premolars) এবং পেষণ দন্ত (Molars)।

উপরে নীচে দুই পংক্তিতে ডান ও বামদিকে যে সকল স্থায়ী দাঁত থাকে তাহাদের নাম ও উদ্গমকাল দেওয়া হইল :—

দাঁত	ডান ও বামে দুই পংক্তি	উদ্গমকাল
কর্তন	(২+২)×২=৮	৭।৮ বৎসর
ছেদন	(১+১)×২=৪	১১ বৎসর
চর্বণ	(২+২)×২=৮	৯ বৎসর
পেষণ	(৩+৩)×২=১২	১ম ৬ বৎসর ২য় ১২ বৎসর ৩য় ১৪-২০ কিংবা তদূর্ধ্ব বৎসর

দাঁতের কাজ—খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় বিভক্ত করাই দাঁতের কাজ। খাদ্য যতই চিবানো যায় ততই উহা লালার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া সুপাচ্য হইয়া ওঠে।

গঠন—গঠন অনুযায়ী দাঁতের তিনটি অংশ—(১) দন্তমূল (root), দন্তগ্রীবা (neck) ও (৩) মুকুট (crown)। দাঁতের যে সাদা কঠিন অংশ দ্বারা আমরা খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া থাকি তাহার নাম মুকুট। দন্তমূল মাড়ির মধ্যে প্রোথিত থাকে এবং দন্তমূল ও মুকুটের সংযোগস্থলটি হইল দন্তগ্রীবা।

দাঁতের উপাদান—দাঁতের বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। মুকুট হইতে গ্রীবা পর্যন্ত দাঁত যে সাদা কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে উহার নাম মীনা বা এনামেল। এই এনামেল দাঁতের গ্রীবায় শেষ হইয়াছে। দন্তমূলে এনামেল নাই। সেখানকার পাতলা আবরণটির নাম সিমেন্ট। এনামেলের নীচের অংশ প্রস্তরীভূত চুনের জমাট পদার্থ, এই পদার্থটিকে বলে ডেন্টাইন।
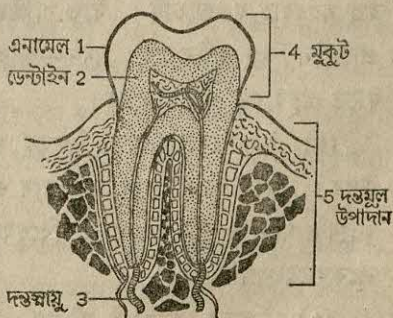
ডেন্টাইনের গোড়া একেবারে মাড়ির ভিতরে প্রোথিত। মাড়ির ভিতরে দাঁত

যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে কতকগুলি নার্ভ ও শোণিতধমনী অবস্থিত। এই সকল ধমনীর সাহায্যে মাড়িতে রক্ত সরবরাহ হয়।

দাঁত পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা—অপরিষ্কার রাখিলেই দাঁত খারাপ হয়। আমরা যখন খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া খাই তখন দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খাদ্যকণা প্রবেশ করে। আহারের পর ভাল করিয়া মুখ না ধুইলে দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা জমিয়া এবং অবশেষে পচিয়া মুখে অম্ল সৃষ্টি করে। এই অম্ল ধীরে ধীরে দাঁতের এনামেল ক্ষয় করিয়া দন্তক্ষত (Caries) সৃষ্টি করে। এতদ্ব্যতীত দাঁতের গোড়ায় লালা ও খাদ্যকণা মিশিয়া বাদামী রঙের পাথরের মত (tarter) শক্ত বস্তু জন্মে। উহা দাঁতের গোড়া আল্‌গা করিয়া দেয়।

দাঁতের যত্ন—দাঁত পরিষ্কার রাখিতে হইলে প্রতিদিন প্রত্যূষে এবং রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে দিনে অন্তত দুইবার দাঁত মাজা উচিত। তাছাড়া প্রতিবার খাইবার পর ভাল করিয়া মুখ ও দাঁত ধুইয়া ফেলা উচিত। নতুবা দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা জমিয়া অম্ল সৃষ্টি করিবে এবং দাঁত নষ্ট করিবে। দাঁতের যত্ন লইবার নানা পদ্ধতি আছে।

(১) নিম, বাবলা, আম, বকুল প্রভৃতি দাঁতন দিয়া দাঁত মাজা যাইতে পারে। দাঁতন চিবাইবার সময় মাড়িতে যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং উহারা মুখের দুর্গন্ধ দূর করিতে সাহায্য করে।

(২) টুথব্রাশ ব্যবহার করিলে উহার সঙ্গে ভাল মাজন কিংবা পাউডার ব্যবহার করিতে হয়। খারাপ মাজন দাঁতের এনামেল নষ্ট করিয়া ফেলে। কয়লা কিংবা ঘুঁটের ছাই দিয়া দাঁত মাজিতে নাই।

(৩) দাঁত সুস্থ রাখিতে চাহিলে প্রত্যহ দাঁতে ও মাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত সরবরাহ হওয়া চাই। দাঁত মাজিবার সময় আঙ্গুল দিয়া মাড়ি ঘষিলে এবং প্রতিদিন কিছু কঠিন দ্রব্য, যেমন—আক, ডাঁটা, মটর ভাজা ইত্যাদি চিবাইলে দাঁতে প্রচুর রক্ত সরবরাহ হয়।

(৪) সমগ্র দেহের মতই দাঁতের পুষ্টিও নির্ভর করে উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের উপর। দেহে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ধাতব লবণাদির অভাব হইলে দাঁতের যথাযথ গঠন ও পুষ্টি হয় না। বিশেষত এ ও ডি ভাইটামিন দাঁতের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য।

(৫) দাঁতের এনামেল জীবাণু-প্রতিরোধক স্তর। ইহা নষ্ট হইয়া গেলে দাঁত সহজেই জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া শীঘ্র নষ্ট হয়। এনামেল ক্যালসিয়াম

দ্বারা গঠিত। রুগ্ন দেহে এবং গর্ভাবস্থায় শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটে। রোগী এবং গর্ভবতী নারীর খাদ্যে তাই ক্যালসিয়াম-প্রধান বস্তু থাকা উচিত।

(৬) শিশুদের দাঁত যাহাতে ভাল হইতে পারে এইজন্য তাহাদের প্রচুর পরিমাণে ফলের রস পান করিতে দেওয়া উচিত।

দাঁতের রোগ—

(১) **দন্তক্ষত** (Caries)—দাঁতের এনামেলের জীবাণু প্রতিরোধের ক্ষমতা রহিয়াছে। এনামেল যদি কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায় তবে ভিতরকার ডেন্টাইন জীবাণুদ্বারা দুষ্ট হয় এবং দাঁতে গর্ত হইয়া দাঁত ক্রমশ খারাপ করে।

(২) **স্পঞ্জি গাম** (Spongy Gum)—এই রোগে সামান্য আঘাতেই মাড়ি হইতে রক্ত বাহির হয়। ভাইটামিন সি'র অভাব এই রোগের প্রধান কারণ। সাইট্রাসজাতীয় ফলের রস পান করিলে এই রোগের উপশম হইতে পারে।

(৩) **পাইওরিয়া** (Pyorrhoea)—অনবরত পুঁজ ও রক্ত পড়া পাইওরিয়ার প্রধান উপসর্গ। দাঁত অপরিষ্কার থাকার ফলে দাঁতে যে টার্টার জমে উহা দাঁতের গোড়া ও মাড়ি নষ্ট করিলে জীবাণু-সংক্রামিত হইয়া পাইওরিয়ার সৃষ্টি হয়। নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার রাখা এবং ভাইটামিনবহুল খাদ্য গ্রহণের দ্বারা এই রোগ নিবারণ করা যায়।

ত্বক্—ত্বক্ আমাদের বহিরাবরণ। ইহা আমাদের সমস্ত দেহকে আবৃত রাখিয়া বাহিরের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত হইতে দেহকে রক্ষা করে। ত্বকের দুইটি স্তর—বহিস্ত্বক্ (Epidermis) ও অন্তস্ত্বক্ (Dermis)।

বহিস্ত্বক—বহিস্ত্বকের আবার দুইটি স্তর। উপরের স্তরটি মৃতকোষদ্বারা নির্মিত। আগুনে পুড়িয়া গেলে উহাই ফোস্কা হইয়া ভাসিয়া ওঠে। মৃতকোষ দ্বারা নির্মিত বলিয়া উহাতে ব্যথা অনুভূত হয় না। বহিস্ত্বকের নীচেকার স্তরটি জীবন্ত কোষে পূর্ণ। এই কোষগুলিতে একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকে। এই রঞ্জক পদার্থের রং অনুযায়ী কাহারো রং গৌর, কাহারো বা শ্যাম। বহিস্ত্বকের জীবন্ত কোষের স্তরে বহু সূক্ষ্ম জালকনালী ও নার্ভের প্রান্তগুলি ছড়াইয়া থাকে।

অন্তস্ত্বক—অন্তস্ত্বকের উপরিভাগে কতকগুলি নরম নরম শৃঙ্গের মত অংশ বহিস্ত্বক পর্যন্ত উঠিয়া আসিয়াছে। এইগুলির নাম প্যাপিলা। উহাতে অসংখ্য স্পর্শকোষ থাকে। এই স্পর্শকোষের সাহায্যে আমরা স্পর্শচেতনা লাভ করি। অন্তস্ত্বকের নীচে স্নেহময় কলার স্তর।

তৈলগ্রন্থি—অন্তস্ত্বকে তৈলগ্রন্থী নামেএকপ্রকার গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থিগুলি হইতে লোমকূপের ভিতর দিয়া একপ্রকার তৈলজাতীয় পদার্থ (sebum) নিঃসৃত হয়। উহা দ্বারা ত্বক্ ও চুল নরম ও চিক্কণ থাকে।

ঘর্মগ্রন্থি—অন্তস্ত্বকের স্নেহময় কলার স্তরে ঘর্মগ্রন্থিগুলি পাকানো থাকে। ঘর্মগ্রন্থিগুলি একপ্রকারের ছাঁকন-যন্ত্র। ইহারা রক্ত হইতে লবণ, জল, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি পদার্থ ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লইয়া ঘর্মকূপের মুখ দিয়া ঘাম আকারে বাহির করিয়া দেয়। ত্বকের দ্বারা এই ঘাম নিঃস্রাবের গুণ এই যে ইহাতে কেবল শরীরের অভ্যন্তরস্থ ময়লাই বাহির হইয়া যায় না, সেই সঙ্গে দেহের উত্তাপও কমিয়া যায়।

ঘর্মকূপ ও লোমকূপ—ত্বকের উপরে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহাকেই বলে লোমকূপ। লোমগুলি যে গর্তের মধ্যে প্রোথিত তাহাদের নাম লোমকূপ। ভয়ে, শীতে কিংবা রাগে লোমকূপের মাংসপেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে। তাহার ফলে লোমকূপগুলি খাড়া হইয়া পড়ে। লোমকূপেও প্যাপিলা রহিয়াছে।

চর্মের গঠন
1. ঘর্মগ্রন্থির নালী; 2. স্পর্শকণিকা, 3. ঘর্মগ্রন্থি, 4. ধমনী, 5. স্নায়ু, 6. স্নেহময় কলা, 7. অন্তস্ত্বক, 8. বহিস্ত্বক্

ত্বকের কাজ—ত্বকের কাজ নানাবিধ।

(১) ত্বক্ আমাদের রক্ষণাবরণ। বাহিরের সমস্ত আঘাত হইতে ত্বক্ বর্মের মত দেহের অভ্যন্তরকে রক্ষা করে। ত্বক্ ভেদ করিয়া কোন রোগের জীবাণু শরীরের ভিতরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।

(২) **তাপ নিয়ন্ত্রণ**—দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করাও ত্বকের অন্যতম কাজ। গ্রীষ্মকালে ত্বকের ধমনী প্রসারিত হইয়া দেহ হইতে প্রচুর ঘাম বাহির করিয়া দেয় এবং এইভাবে দেহ শীতল রাখে। আবার গ্রীষ্মকালে

ঐ ধমনী সঙ্কুচিত থাকিয়া ভিতরের উত্তাপকে বাহিরে আসিতে দেয় না এবং দেহ উত্তপ্ত রাখিতে সাহায্য করে।

(৩) **ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়**—ত্বকে যে প্যাপিলা রহিয়াছে তাহাতে অনুভূতি-স্নায়ুসকল বর্তমান। এই সকল স্নায়ুর সাহায্যে ত্বক্ তাপ, ব্যথা, স্পর্শ প্রভৃতি অনুভব করিয়া দেহকে সতর্ক করিয়া দেয়। এই হিসাবে ত্বক্ আমাদের সজাগ-প্রহরী।

(৪) **ক্লেদ-নিষ্কাশন**—ত্বক্ আমাদের দেহের অনেক সঞ্চিত ক্লেদ বাহির করিয়া দেয়। এক হিসাবে ইহা আমাদের ছাঁকন-যন্ত্রস্বরূপ। কুকুর প্রভৃতি যেসব জন্তুর আমাদের মত ত্বক্ কিংবা ঘর্মকূপ নাই উহাদের সর্বদা হাঁপাইতে হয়।

(৫) এতদ্ব্যতীত সূর্যরশ্মি হইতে রঙ্গোত্তর রশ্মি গ্রহণ করিয়া ত্বক্ তাহা দিয়া ডি ভাইটামিন প্রস্তুত করে। ডি ভাইটামিন মানবদেহের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবে শিশুদের হাড় পুষ্টিলাভ করিতে পারে না।

ত্বকের রোগ—

(১) **দাদ ও চুলি**—ত্বকের প্রধান ব্যাধি দাদ ও চুলি। চুলকানি উহাদের প্রধান উপসর্গ। ত্বক্ ও জামাকাপড়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে এই দুইটি ব্যাধি দমন করা যায়।

(২) **একজিমা**—ইহাও ত্বকের অন্যতম ব্যাধি।

(৩) **Phrynoderma বা toad-skin**—ত্বকের গায়ে পদ্মকাঁটার মত একপ্রকার কাঁটা দেখা দেয় কিংবা ব্যাঙের ত্বকের মত ত্বক্ খসখসে হইয়া যায়। ভাইটামিন 'এ'র অভাবই এই রোগের কারণ। সাধারণত শিশু ও বালক-বালিকারা এই রোগের কবলে পড়ে এবং উরু, হাঁটু ও কনুই ইত্যাদি আক্রান্ত হয়। গাজর সিদ্ধ, কডলিভার অয়েল, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য গ্রহণের দ্বারা এই রোগ নিবারণ করা যায়।

ত্বকের যত্ন—ত্বক্ ভাল রাখিতে হইলে এবং চর্মের ধর্ম বজায় রাখিতে চাহিলে (১) প্রত্যহ রৌদ্রস্নান করা এবং প্রচুর মুক্তবায়ু সেবন করা উচিত। (২) রক্ত নির্মল রাখিবার জন্য দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, ফলমূল, শাকসবজি ভক্ষণ করা, পর্যাপ্ত জল পান করা এবং কোষ্ঠশুদ্ধি রাখা দরকার।

(৩) ত্বক্ পরিষ্কারের জন্য আরও চাই ব্যায়াম এবং নিত্যস্নান। ব্যায়ামের ফলে রক্ত চলাচল ভাল হয় এবং ঘর্মকূপ হইতে প্রচুর ঘাম নিঃসৃত হয় এবং

নিয়মিত স্নানের ফলে ত্বকের সমস্ত ময়লা দূর হইয়া যায়। স্নানের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইল।

স্নান—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রত্যহ স্নান করা দৈনিক পরিচ্ছন্নতার এক বিশেষ বিধি। স্নানের উদ্দেশ্য প্রধানত দুইটি—(১) প্রথমত গায়ের ময়লা দূর করিয়া দিয়া ইহা ঘর্মকূপের পথ পরিষ্কার রাখে এবং ঘাম বাহির হইতে সাহায্য করে। স্নানের সময় বেশ গা রগড়াইয়া স্নান করিলে দেহের ময়লা দূর হয় এবং ত্বকের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচলও ভাল হয়। (২) স্নানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দেহের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করা। সুস্থ অবস্থায় আমাদের দেহের তাপ থাকে ৯৮·৪ ডিগ্রী। উত্তাপের পরিমাণ স্থির রাখার জন্য মস্তিষ্কে একটি উত্তাপ-নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র আছে। এতদ্ব্যতীত স্নানের মাধ্যমেও দেহের উত্তাপের সমতা রক্ষিত হইতেছে। গ্রীষ্মকালে অনেকেই দিনে দুই-তিনবার স্নান করিয়া থাকে। অত্যধিক গ্রীষ্মে এইরূপ কয়েকবার স্নান করিলে দেহ খুব শীতল থাকে। প্রত্যহ স্রোতস্বিনী নদীতে অবগাহন করা অনেক রকম রোগের পক্ষেও উপকারী। এই দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছাড়া স্নানের আর একটি গৌণ উদ্দেশ্যও আছে—স্নান মনের শুচিতা আনিয়া দেয়।

স্নান সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই তিনটি নীতি মানিয়া চলা উচিত। (১) অসময়ে খাদ্যগ্রহণ যেমন অপকারী, অসময়ে স্নানও তেমনি অপকারী। প্রাতেই হউক আর দুপুরেই হউক কিংবা বৈকালেই হউক প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্নানের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকা বাঞ্ছনীয়। (২) কখনো খাওয়ার পরে স্নান করিবে না। যাহাদের দিনে দুইবার স্নান করা অভ্যাস তাহারা দিনে একবার এবং রাত্রিবেলা ঠিক আহারের পূর্বে আর একবার স্নান করিবে। ইহাতে ঘুম ভাল হয়। শীতের সময় নৈশ স্নানের জল ঈষৎ গরম করিয়া লওয়া উচিত। শিশু ও বৃদ্ধদের স্নানের জলও ঈষদুষ্ণ কিংবা সূর্যপক্ব হইলে ভাল হয়। (৩) স্নানের সময় গাত্রমার্জনা করিয়া লইবে—নতুবা স্নানের উদ্দেশ্য অনেকখানি ব্যর্থ হয়। শীতের সময় তেল কিংবা বেসন এবং গ্রীষ্মকালে স্নানের সময় সাবান মাখা ভাল। সাবান ঘামের গন্ধ দূর করিতে সাহায্য করে। তবে অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারের ফলে ত্বক্ রুক্ষ হইয়া যায়।

চুল—চুল আমাদের দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। চুল নিয়মিত পরিষ্কার না রাখিলে এবং উহার অযত্ন করিলে চুল রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

গঠন

(১) **কেশদণ্ড** (shaft)—চুলের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই তাহার নাম কেশদণ্ড।

(২) **কেশ-গহ্বর** (hair follicle)—চুলের গোড়ার কিছু অংশ ত্বকের ভিতর প্রবিষ্ট থাকে, উহা কেশ-গহ্বর। কেশ-গহ্বরের মধ্যে কেশটি দণ্ডায়মান থাকে। ইহার উপরের অংশ বহিস্ত্বক্ দ্বারা নির্মিত কিন্তু নীচের অংশ অন্তস্ত্বক্ পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।

(৩) **বালব** (bulb)—চুলের গোড়ার মোটা অংশটির নাম বাল্ব।

(৪) **প্যাপিলা**—বালবের শেষ প্রান্তে যে শিরা ও স্নায়ুমণ্ডলী থাকে তাহা দ্বারা চুল পুষ্ট হয় এবং তাহাকেই বলে প্যাপিলা। প্যাপিলা হইতে চুলের উৎপত্তি।

(৫) **তৈলগ্রন্থি**—প্রত্যেক চুলের গোড়ায় তৈলগ্রন্থি থাকে। এই তৈল চুলকে মসৃণ ও চিক্কণ রাখে।

চুলের গোড়া যে গর্তের মধ্যে প্রোথিত থাকে তাহার রঞ্জকের দ্বারা চুল কালো বা বাদামী হয়। বার্ধক্যে এই রঞ্জক দ্রব্যের অভাব ঘটে বলিয়া চুল সাদা হইয়া যায়। 'পাকা চুল' মানে রঞ্জকের অভাব। এক একটি চুলের মেয়াদ সাধারণত দুই হইতে চারি বৎসর। তারপর চুল ঝরিতে থাকে। চুলের গোড়া যদি সর্বদা পরিষ্কার রাখা যায় তবে পুরান চুলগুলি ঝরিয়া গিয়া সেইস্থানে নতুন চুল গজায়।

চুল পরিষ্কার ও সতেজ রাখিবার উপায়

(১) চুল পরিষ্কার রাখিতে হইলে প্রত্যহ উহা আঁচড়ান দরকার। চিরুনির সঙ্গে চুলের ময়লা উঠিয়া আসে। চুল আঁচড়াইবার জন্য ব্রাসও ব্যবহার করা চলে।

(২) তৈলগ্রন্থি হইতে যে তেল নিঃসৃত হয় উহাই চুলের পক্ষে যথেষ্ট। তবে চুল মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখিবার জন্য তেল ব্যবহার করা যায়। চুলের গোড়ায় খুব ভাল করিয়া ঘষিয়া তেল মাখাইলে রক্ত চলাচল ভাল হয় এবং উহাতে চুলের পেশীগুলি সবল ও পুষ্ট হইয়া ওঠে।

(৩) চুল পরিষ্কার রাখিবার জন্য সপ্তাহে অন্তত একবার বেসন, মশুর ডাল বাঁটা, অথবা সাবান দিয়া চুল ধুইয়া ফেলিতে হয়। চুলে সোডা কিংবা অত্যধিক ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করিতে নাই। চুল ধুইবার জন্য অনেকে শ্যাম্পুও ব্যবহার করেন।

চুলের শত্রু—চুলের শত্রু প্রধানত তিনটি—উকুন, মরামাস ও কেশদাদ।

উকুন—উকুন একরকমের ডানাবিহীন ষট্‌পদী কীট। চুলের গোড়ায় থাকিয়া উহা আমাদের দেহের রক্ত শোষণ করে। ইহাদের দ্রুত বংশবিস্তার করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে চুল নোংরা থাকিবার জন্য উকুন জন্মায় না। কিন্তু যদি কোন রকমে একটি উকুন আসিয়া চুলে প্রবেশ করে তবে নোংরা চুল পাইলে দ্রুত বংশ বিস্তার করিতে থাকে। উকুন দূরে রাখিতে চাহিলে নিয়মিত চুল পরিষ্কার করা দরকার।

প্রতিকার—উকুন হইলে মাথার চুল কামাইয়া ফেলাই শ্রেষ্ঠ। তবে মেয়েদের পক্ষে সব সময় তাহা সম্ভব না হইলে ডি. ডি. টি., গ্যামাক্সিন পাউডার কিংবা পারক্লোরাইড অব মার্কারী লোশন প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উকুন দূর করা যায়।

মরামাস—চুলের গোড়ায় তৈলগ্রন্থি হইতে যে তেল নির্গত হয় উহা মৃত শুষ্ক চর্মের সহিত মিলিয়া মরামাস সৃষ্টি করে। অনেকের মাথায় নির্গত তেলের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া মরামাসও খুব বেশী দেখা যায়। ইহা চুলের গোড়া দুর্বল করিয়া দেয়। ফলে চুল ঝরিতে থাকে।

প্রতিকার—কর্পূর চূর্ণ নারিকেল তেলে মিশ্রিত করিয়া নিয়মিত চুলের গোড়ায় ঘষিয়া দিলে মরামাস দূর হয়।

কেশদাদ—কেশদাদ অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলে এই রোগের আক্রমণ ঘটে। চিকিৎসক দ্বারা এই ব্যাধিটির চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

নাক—নাকের সাহায্যে আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করি। এতদ্ব্যতীত নাক আমাদের ঘ্রাণযন্ত্র। নাসা-গহ্বরের মধ্যে বাদামী রঙের ঘ্রাণ-ঝিল্লী থাকে। ঐ ঝিল্লী ঘ্রাণকোষে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি ঘ্রাণকোষের এক একটি শুঁড় আছে। শুঁড়গুলি নাসিকারসের মধ্যে সর্বদা ডুবিয়া থাকে। কোন বস্তুর গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া প্রথমে ঐ নাসিকারসের মধ্যে পৌছায়। তারপর ঘ্রাণকোষের শুঁড়গুলিকে উত্তেজিত করিয়া তেলে। ঐ উত্তেজনার চেতনা মস্তিষ্কের ঘ্রাণ-কোষে গিয়া পৌছায়। ঘ্রাণের সঙ্গে বস্তুর স্বাদের এক নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে।

নাক পরিষ্কার রাখিবার উপায়—শ্লেষ্মা আসিলেই নাক ঝাড়িয়া পরিষ্কার জল দিয়া নাক ও হাত ধুইয়া ফেলিবে। যখন-তখন নাক খোঁটা, যেখানে-

সেখানে সর্দি ফেলা, সর্দি ঝাড়িয়া হাত না ধোওয়া—এ সকল অত্যন্ত বদ অভ্যাস এবং সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত।

হাত—দৈনন্দিন সমস্ত কাজে আমরা হাত দুইখানিকেই বোধহয় সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করি। হাত দিয়া আমরা সবকিছু ধরি এই জন্য হাতে আমাদের সর্বদাই কিছু-না-কিছু ময়লা লাগিয়া থাকে। এদিকে খাদ্য গ্রহণ কাজটিও এই হাতের সাহায্যেই সমাধা হয়। তাই আমাদের হাত দুইখানি সর্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। প্রত্যেকবার আহারের পূর্বে হাত খুব ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। সাবান দিয়া হাত ধুইলে আরও ভাল হয়। ছেলেবেলা হইতেই ছেলেমেয়েদের এই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া উচিত। নোংরা হাতে খাইলে হাতের সঙ্গে অনেক রোগের জীবাণু পেটের মধ্যে চলিয়া যায়।

নখ—আমাদের দেহচর্মের বাহিরের স্তরটির কিয়দংশ ভাঁজ ও কঠিন হইয়া নখের সৃষ্টি করে। নখ কখনও বাড়িতে দিতে নাই। নখ বাড়িলেই উহার কোণে ময়লা জমিতে থাকে। এই ময়লা নখ লইয়া আহার করিলে নখের ময়লা আহার্যদ্রব্যের সঙ্গে পেটের মধ্যে চলিয়া যায়। শুধু আপনি আহার করা নয়, ময়লা নখযুক্ত হাতে অপরকে পরিবেশন করাও উচিত নয়। সপ্তাহে অন্তত একবার করিয়া নখ কাটিয়া ফেলিবে। নখ কাটিবার সময় সর্বদা নখকাটা ছুরি ব্যবহার করিবে। দাঁত দিয়া নখ কাটা, নখ দিয়া ঘামাচি মারা বা গা চুলকান বিপজ্জনক।

মলমূত্র—প্রত্যহ আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাহার কিয়দংশ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া দেহ গঠনে সাহায্য করে এবং বাকী পদার্থ মলের আকারে দেহে সঞ্চিত হয়। এই মল বাহির হইয়া না গিয়া পেটে জমা হইতে থাকিলে নতুন খাদ্য আসিয়া দেহে স্থানলাভ করিতে পারে না। দেহের পুষ্টিলাভের জন্য নিয়মিত সময়ে মলত্যাগের অভ্যাস করা উচিত। সকলের শরীরের গঠন একরূপ নয়। কাহারো দিনে একবার মলত্যাগ করার অভ্যাস, কাহারো বা দুই-তিনবারও যাইতে হয়। কিন্তু যেমন অভ্যাসই থাকুক না কেন মলত্যাগ সম্বন্ধে একটা নিয়ম থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। নিয়মের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, আর নিয়ম থাকিলে নির্দিষ্ট সময়ে মলের বেগ আসিয়া পড়ে। বালক-বালিকাদের ছেলেবেলা হইতেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে মলত্যাগ করিতে অভ্যাস করান উচিত। মূত্রত্যাগ সম্বন্ধে অবশ্য কোন অভ্যাসের দরকার নাই, কারণ মূত্রাধার পূর্ণ হইয়া গেলে আপনিই বেগ আসিয়া পড়ে।

বেশভূষার পরিচ্ছন্নতা—বেশভূষার পরিছন্নতার কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মনে হয় দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেশভূষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। (১) প্রথমত, বেশভূষা বাহিরের ময়লা ও কীটাদির দংশন হইতে আমাদের দেহকে রক্ষা করে। (২) শ্লীলতা রক্ষা করাও পোশাক-পরিচ্ছদের একটি প্রধান কাজ। (৩) দেহের সৌন্দর্যবর্ধন করা এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তোলা পোশাকের অন্যতম লক্ষ্য। (৪) দৈহিক উত্তাপের সমতা রক্ষা করে আমাদের এই পোশাক।

পরিধেয় বস্ত্র গুণাগুণ—(১) পরিচ্ছদের প্রধান গুণ হইল যে ইহা তাপ পরিচালনা করিতে সক্ষম। (২) পোশাকের দ্বিতীয় গুণ হইল ইহার তাপ-সংরক্ষণ ক্ষমতা। আমাদের দেহচর্ম ও পোশাকের মধ্যে একটি বায়ুস্তর থাকে। দেহ-নিঃসৃত উত্তাপ ঐ মধ্যবর্তী বায়ুস্তরকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। ঐ বায়ুস্তর পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না বলিয়া পোশাক পরিধানে আমাদের দেহ উত্তপ্ত হয়। এইজন্যই আঁটসাট পরিচ্ছদের চেয়ে ঢিলা জামায় শরীর বেশী গরম থাকে কারণ দেহচর্ম ও ঢিলা জামার মধ্যে এক প্রস্থ বায়ুস্তর আটকান থাকে কিন্তু আঁটসাঁট জামায় সেইরূপ থাকে না। (৩) পরিচ্ছদের তৃতীয় গুণ হইল ইহার ঘাম শোষণ করিবার ক্ষমতা। ক্রমশ-কম-শোষক হিসাবে পোশাকের উপাদানগুলির নিম্নরূপে শ্রেণীবিভাগ করা যায়—চর্ম, পশম, লোম, পালক, রেশম, শন ও তূলা। তুলার পোশাক সর্বাপেক্ষা বেশী ঘাম শোষণ করিতে সক্ষম বলিয়া গ্রীষ্মকালে তুলানির্মিত এবং শীতকালে রেশম, পশম ইত্যাদি বস্ত্রের পোশাক পরিধান করা উচিত। (৪) বায়ু এবং সূর্যের রঙ্গোত্তর রশ্মির অনুপ্রবেশ শক্তি পরিচ্ছদের পঞ্চম গুণ। তবে প্রত্যেক পরিচ্ছদের অনুপ্রবেশের শক্তি একপ্রকার নয়। কাপড়ের রং অনুযায়ী সূর্যের আলোক অথবা উত্তাপ-রশ্মি যথাক্রমে প্রক্ষিপ্ত ও আত্মস্থ হয়। সাদা রং সূর্যের উত্তাপ-রশ্মি আত্মস্থ করে না। তাই ইহা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। পরন্তু অন্যান্য রঙিন বস্ত্র সূর্যের উত্তাপ-রশ্মি আত্মস্থ করে। তাই ইহারা গরম। তবে সকল বর্ণের মধ্যে আবার কৃষ্ণবর্ণটির সূর্যরশ্মি আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। এইজন্য শীতের সময় ঘন রঙের পোশাক পরিধান করা বাঞ্ছনীয়। (৫) মসৃণতা বস্ত্রের সর্বশেষ গুণ। যে বস্ত্র যত মসৃণ তাহা পরিধানে তত আরাম। গ্রীষ্মকালে মসৃণ বস্ত্র পরিধান করাই উচিত।

পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা—শরীর সুস্থ রাখার জন্য দৈহিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা যেমন একান্ত প্রয়োজন সেইরূপ পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করাও একেবারে অপরিহার্য। আমরা প্রত্যহ যে পোশাক ব্যবহার করি তাহাতে শরীরের ঘাম ও রাস্তার ধুলাবালি সঞ্চিত হইতে থাকে। ঘামযুক্ত পোশাক দুর্গন্ধযুক্ত হয় ; এতদ্ব্যতীত রাস্তার ধূলিতে অনেক রোগের জীবাণুও লাগিয়া যায়। এই সকল কারণে বস্ত্রাদি প্রত্যহ কাচিয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া ব্যবহার করা উচিত। বিশেষত গেঞ্জি প্রভৃতি যে সকল পোশাক দেহের সঙ্গে লেপটাইয়া থাকে তাহা কখনই একবার ব্যবহারের পর না কাচিয়া পুনর্বার পরিধান করা উচিত নয়। ঐ সমস্ত পোশাক অন্তত রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করা উচিত।

পোশাক সম্বন্ধে অবশ্য পালনীয় কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

কোনরকম আঁটসাট জামা পরিধান করিবে না কিংবা কোমরে কষিয়া কাপড় পরিবে না। খুব আঁট কাপড় পরিলে পেটের বহু যন্ত্রে অযথা চাপ পড়ে, কখনও বা উহারা স্থানভ্রষ্ট হয়। ইহার ফলে ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অর্শ, হার্নিয়া বা শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। বেশী আঁট গার্টার পরিলে পায়ের শিরা ফুলিয়া যায়, গলায় আঁট কলার পরিলে নাকের ডগা লাল হয়, ত্বকে যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালন হয় না। শিরস্ত্রাণ কষা হইলে টাক পড়ে এবং অকালে চুল পাকে। বুকে আঁট জামা পরিলে ফুসফুসের দোষ ঘটে। পরিচ্ছদ ব্যবহারের সময় উপরোক্ত নিষেধবাণী কয়টি মনে রাখিয়া চলিবে।

পারিপার্শ্বিকের পরিচ্ছন্নতা

পারিপার্শ্বিকের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে।

গৃহ সম্বন্ধে—আমাদের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রথমেই পড়ে গৃহ। বাসগৃহে যাহাতে প্রচুর সূর্যালোক এবং মুক্তবায়ু প্রবেশের সুযোগ থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাসগৃহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা চাই। এতদ্ব্যতীত বাসগৃহ ধূলি ও ধূমবর্জিত রাখাও একান্ত প্রয়োজন। ধূলির মধ্যে নানারূপ জৈব ও অজৈব পদার্থের গুঁড়া, নিষ্ঠীবনের গুঁড়া ইত্যাদি অনেক অস্বাস্থ্যকর জিনিস বর্তমান থাকে। এই সকল ধূলি আমরা প্রত্যহ বস্ত্রাদি ও জুতার সঙ্গে বাড়িতে লইয়া আসি। ধূলি নানারূপ জীবাণুর আশ্রয়স্থল। গৃহ ধূলিমুক্ত রাখিতে

চাহিলে প্রত্যহ ঘর ঝাটাইয়া জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলা উচিত। ধুলির মত ধূমও অত্যন্ত অনিষ্টকর পদার্থ। ইহার মধ্যে অঙ্গার, দূষিত বাষ্প, গন্ধকচূর্ণ, আলকাতরার তেলচিটা ইত্যাদি থাকে। বিশেষত কলকারখানা হইতে যে সকল ধোঁয়া নির্গত হয় উহা নাকের ভিতর দিয়া দেহে প্রবেশ করিলে শ্লেষ্মাঘটিত রোগ, এমনকি যক্ষ্মা পর্যন্ত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ধোঁয়া বাড়িঘরের আসবাব ও বিছানাপত্র পর্যন্ত নোংরা করে। এই সকল কারণে কলকারখানা হইতে দূরে গৃহ নির্মাণ করাই সমীচীন।

জীবাণু সম্বন্ধে—পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য পরিবেশকে জীবাণুমুক্ত রাখা। সকল প্রকার রোগের উৎস হইল এই জীবাণু। জীবাণুরা তিন উপায়ে আমাদের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে:—খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে মুখবিবরের মধ্য দিয়া, ধুলি ও ধোঁয়ার সঙ্গে নাসাপথ দিয়া এবং চর্মের মধ্য দিয়া। এইজন্য খাদ্য, পানীয়, ধূম ও ধুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সর্বদা বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করিবে এবং ধুলি ও কীটপতঙ্গ হইতে খাদ্য দূরে রাখিবে। রোগ জীবাণুরা হাঁচি কাশি এবং পায়খানার সঙ্গে আমাদের দেহ হইতে নির্গত হইতেছে। তাই রোগ সংক্রমণ এড়াইতে চাহিলে অনাময় ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন দরকার। শুধু গৃহেরই নয়, স্কুল, কলেজ, অফিস, কাছারি প্রভৃতি যে সকল স্থানে জনসাধারণের নিত্য যাতায়াত আছে সেই সকল স্থানেরই খাদ্য, পানীয় ও অনাময় ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। জীবাণুদের প্রধান বাসস্থান হইল পচা ডোবা, গলিত পশুর মৃতদেহ এবং আলোবাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে জায়গা। তাই লোকালয়ের আশেপাশের সমস্ত ডোবা, পতিত জমি ইত্যাদি ভরাট করিয়া ফেলা উচিত। এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আমাদের পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

স্বাস্থ্যের উপরে সূর্যকিরণ ও বায়ুর প্রভাব

সূর্যকিরণ—সূর্যালোক আমাদের প্রাণশক্তিস্বরূপ। পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত সূর্য হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া জীবদেহে শক্তি সঞ্চার করিতেছে। প্রতিনিয়ত আলোক বিকিরণ করিবার ফলে সূর্যের জীবনীশক্তি ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা একদিন যখন সূর্যের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইবে তখন পৃথিবীকে আলোক ও উত্তাপ যোগাইবার জন্য অপর কোন সূর্যের সৃষ্টি না হইলে পৃথিবী একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সূর্যকিরণ তিনভাগে বিভক্ত—(১) আলোকপ্রদ রশ্মি, (২) উত্তাপদায়ক রশ্মি (Infrared ray), (৩) রঙ্গোত্তর রশ্মি (ultra-violet rays)।

আলোকরশ্মি—আলোকরশ্মি ব্যতীত সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যাইত। আলোকরশ্মি না হইলে আমাদের যে এক মুহূর্তও চলিতে পারে না একথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

উত্তাপরশ্মি—উত্তাপরশ্মির প্রভাবে পৃথিবী শুষ্ক হইয়া ওঠে। সমস্ত রোগের জীবাণু মরিয়া যায়, গলিত ও পচনশীল পদার্থগুলি শুকাইয়া দুর্গন্ধবিহীন হইয়া ওঠে।

রঙ্গোত্তর রশ্মি—সূর্যের রঙ্গোত্তর রশ্মির অভাবে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে রঙ্গোত্তর রশ্মিটিই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। সূর্যরশ্মিতে সাতটি মৌলিক বর্ণ আছে, যথা—বেগুনী, নীল, ধূসর, সবুজ, পীত, কমলালেবুর রং ও লোহিত বর্ণ (VIBGYOR)। এই সকল বর্ণ সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু Spectroscope নামক যন্ত্রের সাহায্যে এই সাতটি রং একসঙ্গে মিলাইলে শ্বেতবর্ণ উৎপাদিত হয়। এই সাতটি বর্ণের মধ্যে বেগুনী রংটিকেই বলে রঙ্গোত্তর রশ্মি বা অতিবেগুনী আলো। সূর্যরশ্মির এই অদৃশ্য বর্ণগুলির দ্বারা চিকিৎসকগণ অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতেছেন।

সূর্যালোকের দ্বারা আমাদের সাধারণ স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। সূর্যালোক আমাদের দেহের স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াইতে সাহায্য করে। সূর্যালোক না পাইলে শিশুদের দেহে ডি ভাইটামিনের অভাব হয় এবং হাড়-গুলি পুষ্ট হইতে না পারায় রিকেটস্ রোগ জন্মায়। শিশুদের পক্ষে সূর্যালোক এরূপ অপরিহার্য বলিয়া আমাদের দেশে নবজাত শিশুকে সরিষার তেল মাখাইয়া সকালবেলার মিঠে রৌদ্রে রাখিবার বিধি আছে। প্রচুর সূর্যালোকের অভাবে যক্ষ্মার আক্রমণ ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। পুরু শ্বেত বস্ত্র, রঙিন পোশাক, সাধারণ সার্সির কাচ সূর্যরশ্মিকে বাধা দেয়। কাজেই নগ্নদেহে প্রত্যহ কিছুক্ষণ সূর্যালোক লাগাইলে অনেক ব্যাধি, যেমন—বাত, সর্দিরোগ, নার্ভের রোগ ইত্যাদি সারিয়া যায়। পাশ্চাত্ত্যদেশে অনেকে সমুদ্রের তীরে সূর্যালোক সেবন করিয়া থাকে।

জীবাণুনাশক হিসাবে সূর্যালোক অতুলনীয়। প্রখর সূর্যালোকে কোন জীবাণুই বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে না। রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

সূর্যালোকে রাখিলে সহজেই জীবাণুমুক্ত করা যায়। আমাদের শীত বস্ত্রাদি এবং রেশমী পশমী বস্ত্র ও শয্যাদ্রব্য মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিয়া জীবাণুবর্জিত করিয়া লওয়া উচিত। কাঁচা ফল পূর্বাহ্ণে ঘরে তুলিয়া রাখিয়া পাকাইয়া খাওয়ার চেয়ে সূর্যপক্ব করিয়া খাওয়া অনেক উপকারী। সূর্যপক্ব ফল খাইতেও বেশী সুস্বাদু। শুধু মানুষই নয়, জীবজন্তু ও গাছপালার জন্যও সূর্যালোকের প্রয়োজন।

সূর্যরশ্মির অহিতকর প্রভাব—সূর্যালোক যতই উপকারী হউক না কেন অধিক পরিমাণে তীব্র সূর্যালোক লাগান দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। সূর্যালোকে চামড়া ঝলসাইয়া যায়। যাহারা রৌদ্রে বেশী ঘোরাঘুরি করে তাহাদের দেহের উন্মুক্ত স্থানগুলি সহজেই তামাটে ও রুক্ষ হইয়া যায়। তীব্র সূর্যালোক চোখের পক্ষেও অনিষ্টকর। অত্যন্ত প্রখর উত্তাপে তাত লাগিয়া (sun stroke) লোক মারা যাইতে পারে। আমাদের দেশে আজকাল প্রতি বৎসর তাত লাগিয়া কিছু লোক মারা যায়। প্রখর তাপে বাহির হইলে চোখে কালো চশমা (sun glass) পরা উচিত ও মাথায় ছাতা কিংবা টুপি ব্যবহার করাই স্বাস্থ্যসম্মত।

বায়ু—পৃথিবীর চারিদিকে একটি গ্যাসীয় আবরণ আছে—ইহাকেই বলে বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর বুক হইতে শুরু করিয়া উর্ধ্বে প্রায় তিনশত মাইল পর্যন্ত এই বায়ুমণ্ডল। বায়ু পৃথিবীর একটি আচ্ছাদন বিশেষ। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ইহা পৃথিবীর সঙ্গে লাগিয়া আছে। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল বায়ু একটি মৌলিক পদার্থ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। বায়ুতে প্রধানত অক্সিজেন (Oxygen) ও নাইট্রোজেন (Nitrogen) নামে দুইটি পদার্থ রহিয়াছে। অক্সিজেনের ফলে শ্বাসক্রিয়া ও দহনক্রিয়া চলে। নাইট্রোজেনের এইরূপ নিজস্ব কোন কাজ নাই। তবে উহা অক্সিজেনের কাজে সাহায্য করিয়া থাকে।

আয়তন হিসাবে বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ

অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ব্যতীত বায়ুতে আরও কতকগুলি গ্যাসীয় পদার্থ আছে। উহাদের পরিমাণ একেবারে সুনির্দিষ্ট না হইলেও মোটামুটিভাবে বায়ুতে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ এইরূপ :

অক্সিজেন	শতকরা	২০.৬০ ভাগ
নাইট্রোজেন	,,	৭৭.১৬ ,,
কার্বন ডাই-অক্সাইড	,,	.০৪ ,,
জলীয় বাষ্প	,,	১.৪০ ,,
ক্রিপটন, নিয়ন, যেনান, হিলিয়াম ও আরগণ	,,	.৮০ ,,
		১০০.০০ ভাগ

এই সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ ব্যতীত বায়ুতে স্থানীয় আবহাওয়া অনুযায়ী নানাপ্রকার গ্যাস, ধূলিকণা ও জীবাণুও দেখা যায়।

স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা বায়ু প্রয়োজন—বায়ুস্থিত অক্সিজেনই মানুষের প্রয়োজন। নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা বায়ুর শতকরা চারভাগ অক্সিজেন টানিয়া লইয়া প্রায় ততখানি কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে ঢালিয়া দেই। অক্সিজেনের মাত্রা যদি শতকরা চার ভাগ নামিয়া যায় তবে ঐ বায়ুসেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অক্সিজেনের মাত্রা শতকরা সাত ভাগ নামিয়া গেলে কিংবা কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা শতকরা ত্রিশ ভাগ বাড়িয়া গেলে মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে।

মুক্ত বায়ুতে প্রচুর অক্সিজেন থাকে বলিয়া আমরা প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাইয়া থাকি, কিন্তু বদ্ধ গৃহে যেখানে স্বভাবতই বায়ু চলাচল কম হয় এবং একসঙ্গে বহু লোক বাস করে সেখানকার বায়ু শীঘ্রই দূষিত হইয়া পড়ে। এইজন্য গৃহের মধ্যে থাকাকালীন একজন মানুষের পক্ষে কতখানি বায়ু প্রয়োজন তাহা আমাদের জানা দরকার। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে মানুষ এক ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট বায়ুকে দূষিত করিতে পারে। সুতরাং বদ্ধ গৃহে থাকিতে হইলে প্রত্যেকটি লোকের ৩০০০ ঘনফুট বায়ু পাওয়া দরকার। এই হিসাবে সাধারণ বাসগৃহে প্রত্যেকটি লোকের জন্য প্রায় ৫০ বর্গফুট পরিমাণ জমির ব্যবস্থা থাকা দরকার। তবে বায়ু চলাচলের যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত থাকিলে এই নিয়মটির অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম হইলে ক্ষতি নাই।

স্বাস্থ্যের উপর মুক্ত বায়ুর প্রভাব—মুক্ত বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহা শরীরকে শীতল রাখে, তাছাড়া স্নায়ুমণ্ডলীকে সতেজ করিয়া মনে প্রফুল্লতা আনিয়া দেয়। দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চালিত

করিয়া হজম শক্তি ও মেটাবলিজম বাড়ায়। যাহারা সচরাচর মুক্ত বায়ু সেবন করে তাহারা অপরের তুলনায় দীর্ঘ জীবনলাভের অধিকারী হয়।

মুক্ত বায়ুর অহিতকর প্রভাব ও গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুর গুণ—মুক্ত বায়ু সকল অবস্থায়ই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। হাঁড় কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় কিংবা গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতে গেলে জ্বর হওয়া কিংবা সর্দিগর্মি বা তাত লাগা বিচিত্র নয়। পরন্তু গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুমাত্রই অপকারী একথা ভাবিবারও কারণ নাই। গৃহ আমাদের শীতাতপ হইতে রক্ষা করে। প্রবল শীতে গৃহ আমাদের উত্তপ্ত করে, প্রখর রৌদ্রে গৃহে পাই শীতলতা এবং প্রবল বর্ষায় মাথার উপর আচ্ছাদন। তথাপি গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুর দোষ এই যে এখানে বায়ু চলাচল স্বভাবতই ব্যাহত হয় এবং ফলে সহজেই বায়ু দূষিত হয়।

গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ু কিরূপে দূষিত হয়?—মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বারা, কখনও বা ঘরে আগুন জ্বালিয়া রাখার ফলে গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ু দূষিত হয়।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা বায়ুর তিন রকমের পরিবর্তন ঘটে—

(১) রাসায়নিক, (২) ভৌত এবং (৩) জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ।

(১) **রাসায়নিক পরিবর্তন**—নিঃশ্বাসবায়ুতে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাহা নিম্নরূপ :—

মুক্ত বায়ুর উপাদান		নিঃশ্বাসবায়ুর উপাদান
অক্সিজেন	২০.৬০	১৬.৪০
কার্বন ডাই-অক্সাইড	.০৪	৪.২৪
নাইট্রোজেন	৭৭.১৬	৭৭.১৬
জলীয় বাষ্প, জৈব পদার্থ, উত্তাপ	অল্প	বেশী

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে মুক্ত বায়ুর চেয়ে নিঃশ্বাস-বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা চারভাগ কম এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ঠিক ততখানি বেশী। আগেই বলিয়াছি অক্সিজেনের মাত্রা শতকরা সাত ভাগ কমিয়া গেলে কিংবা কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা শতকরা ত্রিশ ভাগ বাড়িলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

(২) **ভৌত পরিবর্তন**—(ক) নিঃশ্বাস-বায়ুর অপর বৈশিষ্ট্য হইল ইহা বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বাড়াইয়া দেয়। লোকের নিঃশ্বাস হইতে উত্তাপ ও জলীয় বাষ্প বাহির হইয়া ঘরের বায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র করে। ফলে মানুষের দেহ ক্রমশ উষ্ণ হইতে থাকে কিন্তু বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়া যাইবার ফলে ঘাম শুকাইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় প্রায়ই সর্দিগর্মি হয়। ভিড়ের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হইয়া পড়ে একই কারণে।

(খ) বদ্ধ গৃহের বায়ু স্থির এবং উহাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী বলিয়া বদ্ধ বায়ুর সঞ্চরণশীলতা গুণটিও মুক্ত বায়ুর তুলনায় অনেক কম।

(৩) **জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ**—নিশ্বাস বায়ু এবং হাঁচি কাসির সঙ্গে রোগের জীবাণু ও বিভিন্ন জৈব পদার্থ বাহির হইয়া বায়ুকে দূষিত করে।

বায়ু সঞ্চালন—বায়ু সততই প্রবহমান কিন্তু এই প্রবাহের বেগ কখনো এতই ক্ষীণ যে উহা প্রায় স্থির বলিয়াই বোধ হয়। বায়ু স্থির হইয়া থাকিলে আবহাওয়া গুমোট আকার ধারণ করে এবং আমাদেরও দেহে একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে। আমাদের স্বাস্থ্যের কারণেই বায়ু-সঞ্চালন আবশ্যক। কোন স্থানের অপেক্ষাকৃত স্থির, উষ্ণ, আর্দ্র ও কার্বনিক অ্যাসিড-যুক্ত বায়ুকে বিতাড়িত করিয়া সেইস্থানে অপেক্ষাকৃত শীতল, শুষ্ক ও বিশুদ্ধ বায়ু আনয়ন করার নামই বায়ু-সঞ্চালন (Ventilation)। বায়ু-সঞ্চালনের সময় একদিকে ঘরের বায়ু-সঞ্চালন (internal ventilation) এবং অপরদিকে ঘরের বাহিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু চলাচলের (external ventilation) প্রতি নজর রাখা উচিত। গৃহের অভ্যন্তরে অবাধ বায়ু-সঞ্চালনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য :—

(১) বাহিরের বায়ু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলে আমরা তাহার ভিতর হইতে অক্সিজেন টানিয়া লইতে পারি।

(২) আমাদের শরীর হইতে সর্বদাই উত্তাপ ও ঘাম নির্গত হইতেছে। ইহার ফলে ঘরের বায়ু সহজেই উত্তপ্ত ও আর্দ্র হইয়া পড়ে। বায়ু-সঞ্চালনের সাহায্যে ঘরের উত্তাপ ও আর্দ্রতা বাড়িয়া না গিয়া স্বাভাবিক মাত্রায় থাকিতে পারে।

(৩) বায়ু-সঞ্চালনের ফলে গৃহাভ্যন্তরস্থ ধূম, কালি গ্যাস ও রোগের জীবাণু ইত্যাদি বাহিরে উড়িয়া চলিয়া যায়।

দুই উপায়ে বায়ু সঞ্চালন করা যায়—**নৈসর্গিক** ও **কৃত্রিম**।

নৈসর্গিক উপায়ে বায়ু -সঞ্চালন (Natural Ventilation)—নৈসর্গিক যে সকল উপায়ে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে তাহা এই—(১) সূর্য-কিরণ দ্বারা, (২) গাছপালার দ্বারা, (৩) বৃষ্টির দ্বারা, (৪) ঝড়ের দ্বারা এবং (৫) বায়ু আগম-নির্গমের পথের দ্বারা।

(১) **সূর্যকিরণ দ্বারা**—(ক) প্রখর সূর্যকিরণে জীবাণুরা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া রৌদ্রযুক্ত স্থানের বায়ু জীবাণুশূন্য ও বিশুদ্ধ থাকে। (খ) বিশেষত দূষিত পদার্থসকল সূর্যকিরণের তাপে ধ্বংস হইয়া বা শুকাইয়া যায় বলিয়া বায়ু দুর্গন্ধমুক্ত থাকে। (গ) এতদ্ব্যতীত সূর্যকিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া ওঠে বলিয়া বায়ু পাতলা ও হাল্কা হইয়া উপরে চলিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও শীতল বায়ু আসিয়া সেইস্থান দখল করে।

(২) **গাছপালার দ্বারা**—(ক) দিনের বেলায় গাছের পাতা হইতে 'ক্লোরোফিল' নামক একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ বায়ু হইতে অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে টানিয়া লইয়া পরিবর্তে বায়ুতে অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। (খ) বৃক্ষলতাবহুল স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটে এবং বৃষ্টি বায়ুর ভাসমান পদার্থসমূহ ধোয়াইয়া লইয়া গিয়া বায়ু বিশুদ্ধ করিয়া তোলে। (গ) নিম, তুলসী, ইউক্যালিপ্‌টাস, পাইন, শাল ও কর্পূর প্রভৃতি গাছ এবং নানা সুগন্ধ পুষ্প বায়ু বিশুদ্ধ করে।

(৩) **বৃষ্টির দ্বারা**—ধূম, ধূলি, রেণু, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, ভাসমান কঠিন পদার্থসমূহ, রোগের জীবাণু প্রভৃতি বৃষ্টিধৌত হইয়া মাটিতে পড়ায় বায়ু বিশুদ্ধ হয়। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হইলে ওজোন নামক গ্যাস সৃষ্টি হইয়া বায়ু বিশুদ্ধ করে।

(৪) **ঝড়ের দ্বারা**—(ক) ঝড় উঠিলে আকাশের বায়ু তরঙ্গায়িত হইয়া ওঠে। কয়েক রকমের বায়বীয় পদার্থ একত্র হইলে যতক্ষণ না সব উপাদানগুলি সমভাবে মিশিতে পারিতেছে ততক্ষণ বায়বীয় পদার্থগুলি সঞ্চালিত হইতে থাকে (diffusion) ; এই ধর্মবশে ঘরের উষ্ণ বায়ু বাহিরে যাইতে চায় এবং বাহিরের শীতল বায়ু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করে। (খ) ঝড়ের সময় বাহিরের বিশুদ্ধ হাওয়া সবেগে তাড়িত হইয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘর হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে ঘরের দূষিত বায়ু টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যায় (perflation)।

(৫) **বায়ু আগম-নির্গমের পথের দ্বারা**—বায়ুর আগম-নির্গমের পথের উপরও বায়ু-সঞ্চালন নির্ভর করে। আগমপথের বায়ু কক্ষে প্রবেশ করে এবং নির্গমপথে বাহির হইয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দরজা জানালার মধ্য দিয়াই বায়ু-সঞ্চালন হয়। যেখানে দরজা জানালাই বায়ু-সঞ্চালনের প্রধান অবলম্বন সেই সকল স্থানের প্রত্যেক ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচলের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বড় ও রুজু রুজু জানালা চাই যাহাতে বায়ু এক দ্বার দিয়া ঢুকিয়া অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

ঘরের উত্তপ্ত বায়ু হাল্কা বলিয়া উপর দিক দিয়া বাহির হয় এবং বাহিরের শীতল বায়ু নীচের দিক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। কাঁচাবাড়িতে খড় কিংবা টিনের চালের মধ্য দিয়া উত্তপ্ত বায়ু সহজেই বাহির হইতে পারে। কিন্তু পাকা বাড়িতে বায়ু বাহির হইবার ঘুলঘুলি বা বাতায়ন থাকা দরকার।

কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন (Artificial ventilation)—নৈসর্গিক উপায় ব্যতীত কয়েকটি কৃত্রিম উপায়েও বায়ু-সঞ্চালন করা যায়। কৃত্রিম উপায় দ্বিবিধ—**যান্ত্রিক** ও **রাসায়নিক**।

যান্ত্রিক পদ্ধতি—কৃত্রিম উপায়ে বায়ু চলাচলের মধ্যে যান্ত্রিক পদ্ধতি অন্যতম। বিদ্যুতের আবিষ্কারের পরে বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে বায়ুচলাচল
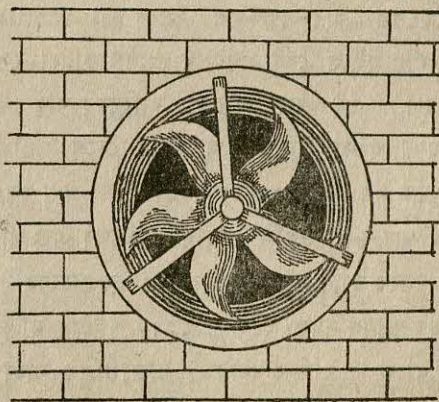
প্রপেলার

করান হয়। শীতপ্রধান দেশে কলকারখানায় বা মাটির নীচে খনির মধ্যে বায়ু-বিতাড়ক (propeller) ও বায়ু-আকর্ষক (blower) পাখা বসাইয়া কিংবা

ছাতে ধূম নির্গমনের নল বসাইয়া তাহারই নিকটে আগুন জ্বালাইলে সেই উত্তাপ ঘরের উষ্ণ দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দেয় এবং মেঝের কাছাকাছি ঘুলঘুলির সাহায্যে বাহিরের শীতল বায়ু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করে।
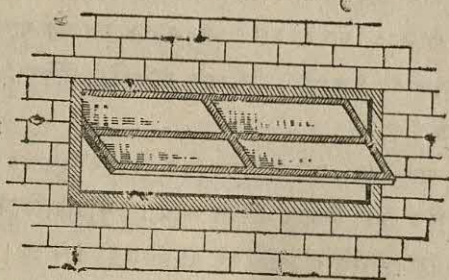
বায়ু চলাচলের জন্য জানালা

রাসায়নিক পদ্ধতি—ঘরে চুন কিংবা কাঠকয়লা চূর্ণ রাখিলে উহা বায়ুর দুর্গন্ধ শুষিয়া লয়। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বায়ুর আর্দ্রতা দূর করে। সুগন্ধ ফুল রাখিলে বা ধূপধুনা পোড়াইলে উহাদের সুবাস বায়ুতে ছড়াইয়া বায়ু বিশুদ্ধ করে। ফিনাইল কিংবা তার্পিন তেল দিয়া ঘর মুছিলেও ঘরের বায়ু শোধিত হয়।

ঘরের বাহিরের বায়ু-সঞ্চালন External ventilation)—ঘরের বাহিরের বায়ু নির্মল হইলে সেই বায়ু ঘরে প্রবেশ করিয়া সেখানকার বায়ুও বিশুদ্ধ করিয়া তোলে। এই কারণে ঘরের বাহিরের বায়ু সঞ্চালনের প্রতিও আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত। আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলে ঘরের বাহিরের বায়ু-সঞ্চালন খুব একটা গুরুতর সমস্যা বলিয়া গণ্য হয় না। পল্লীগ্রাম-গুলি ঘনবসতিপূর্ণ নয়,—বাড়িগুলি সাধারণত ফাঁকা এবং মাঠঘাটও সেখানে প্রচুর রহিয়াছে। তবে কাঁচা নর্দমা ও পায়খানা সেখানকার বায়ু দূষিত করে। কিন্তু বায়ু-চলাচলের আসল সমস্যা হইল শহরে। শহরের বাড়িগুলি সাধারণত গায় গায় সংলগ্ন থাকে। বাড়ির মধ্যবর্তী রাস্তাগুলিও সাধারণত এত সঙ্কীর্ণ যে সেখানে বায়ু-চলাচল হয় না বলিলেই চলে। এইজন্য বাড়িগুলিকে যথেচ্ছ উঁচু করিতে দিতে নাই, রাস্তাঘাটগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত করা উচিত, মাঝে মাঝে বাগান, পার্ক, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত জমি রাখা দরকার। ধূলা উড়াইয়া রাস্তা ঝাঁট না দিয়া প্রথমে জলসেচন করিয়া ভ্যাকুয়াম ক্লীনার

দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। রাস্তা পীচ ঢালা হইলে আরও ভাল হয়। কলকারখানা থাকিবে শহরের বাহিরে। যেখানে সেখানে ময়লা, রান্নাঘরের আবর্জনা, তরিতরকারির খোসা ইত্যাদি ফেলিবে না কিংবা থুথু ছিটাইবে না। কারণ এই সকল বস্তু পচিয়া বায়ু দূষিত করে। থুথুর ভিতরে অনেক রোগজীবাণু থাকে বলিয়া যেখানে সেখানে থুথু ছিটাইলে রোগজীবাণুগুলি অদৃশ্যভাবে বায়ুতে মিশিয়া থাকে।

বায়ু-সঞ্চালনের উপকারিতা—বায়ু-সঞ্চালনের ফলে আমরা বায়ু মধ্যের নতুন টাটকা অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ যদি কোন স্থানের বায়ুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত তবে সেখানকার অক্সিজেন গ্যাস ফুরাইয়া যাইত কিন্তু বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া আমরাও বায়ুর মধ্যে নতুন অক্সিজেন পাই। বায়ু-সঞ্চালনের আর একটি উপকারিতা এই যে ইহা বাহিরের তাপের সঙ্গে আমাদের দেহের তাপের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া চলে। বায়ু চলাচল বন্ধ হইলে আবহাওয়া গুমোট হইয়া ওঠে—দেহে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেও একটা ক্লান্তি, একটা অবসাদ আসিয়া জুড়িয়া বসে। আবার বায়ু সঞ্চালিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাজে আমরা নতুন করিয়া উৎসাহ বোধ করি।

বায়ু-বাহিত ব্যাধি—যে সকল রোগ বায়ুর সাহায্যে একজনের দেহ হইতে অপরের দেহে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সঙ্গে প্রবেশ করে সেগুলিকেই বলে বায়ুবাহিত ব্যাধি। বায়ু চার উপায়ে আমাদের দেহে রোগ বিস্তার করে—(১) হাঁচিতে, কাশিতে ও কথা বলিতে যে নিষ্ঠীবন (droplets) রোগীর নাক মুখ দিয়া বাহির হয় তাহার মধ্যে রোগের জীবাণু থাকে। এই জীবাণুগুলি বায়ুবাহিত হইয়া সুস্থ ব্যক্তির নাকের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে। সর্দিকাশি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, হাম, হুপিং কাশি, ডিপথিরিয়া ; নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিশ ও যক্ষ্মা এইভাবে থুথুর মধ্য দিয়া ছড়ায়। এইগুলিকে বলে droplet diseases. (২) ধূলিকণার মধ্যে রোগজীবাণু কিছুকাল জীবিত থাকে। এই জীবাণু বায়ুতাড়িত ধূলির সঙ্গে আমাদের অনাবৃত খাদ্য ও পানীয়ে বসে এবং রোগ ছড়ায়। (৩) কলকারখানার ধূম কালি প্রভৃতি বায়ুর সঙ্গে লোকের প্রশ্বাসের মধ্য দিয়া বুকে গিয়া প্রবেশ করে ও পীড়া জন্মায়। (৪) অনবরত নর্দমা হইতে উত্থিত পচা গ্যাস শুঁকিলেও পীড়া হয়।

বায়ু পরিশোধন (Purification)—দুই উপায়ে বায়ু পরিশোধিত হইতে পারে—একটি স্বাভাবিক, অপরটি কৃত্রিম।

(1) **স্বাভাবিক উপায়**—কতকগুলি প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ফলে বায়ু আপনাআপনি পরিশোধিত হয়, যেমন (ক) বৃষ্টির দ্বারা—বৃষ্টি হইলে বায়ুর সব আবর্জনা ধুইয়া মাটিতে পড়ে। বৃষ্টির জলই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। তবে প্রথম পশলা বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ নয় কারণ তখন বায়ুতে প্রচুর ধুলাবালি থাকে। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে দেখা যায় বায়ু অত্যন্ত নির্মল হইয়া গিয়াছে। (খ) গাছপালাও বায়ুশোধনে প্রচুর সহায়তা করে। গাছপালাতে ধুলাবালি আটকায়। এতদ্ব্যতীত দিনের বেলা গাছপালা বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড টানিয়া লইয়া অক্সিজেন ছাড়িতে থাকে। এইভাবে বায়ু বিশুদ্ধ হয়। অবশ্য রাত্রিবেলা গাছপালা হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাষ্পই নির্গত হয়। এই কারণে রাত্রে গাছের নীচে থাকিতে নাই। (গ) বায়ুর অন্যতম উপাদান হইল ওজোন (Ozone)। বায়ুতে ওজোন থাকিলে উহা বায়ুস্থিত সমস্ত জৈব পদার্থ নষ্ট করে ও বায়ুর দুর্গন্ধ দূর করে। সমুদ্রতীরের বায়ুতে প্রচুর ওজোন থাকে। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হইলে বায়ুতে ওজোনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। (ঘ) নিত্য বায়ুচলাচলের দ্বারাও বায়ুর আবর্জনার মাত্রা বিক্ষিপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে কমিয়া আসে।

(2) **কৃত্রিম উপায়**—বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া বায়ু শোধিত করা যায়। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে এক নতুন উপায়ে বায়ু বিশোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাকে বলে Air conditioning ; এই যন্ত্রটি গৃহের ভিতরকার বায়ুকে শীতল ও বিশুদ্ধ রাখিতে পারে।

এয়ার কনডিশনিং—কক্ষের সংলগ্ন যন্ত্রের মধ্যে বরফ-শীতল জলের প্রস্রবণের ব্যবস্থা থাকে। বাহিরের উত্তপ্ত ও আর্দ্র বায়ুকে ঐ প্রস্রবণের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং উত্তপ্ত বায়ু শীতল জলের সংস্পর্শে আসিয়া শীতল ও বিশুদ্ধ হয়। এই শীতল বায়ুকে একটি নলের মধ্যে প্রেরণ করিয়া প্রয়োজনমত উহার আর্দ্রতা টানিয়া লওয়া হয়। এই বায়ুকে তারপর ঘরে পাঠান হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটি এইরূপে চলিতে থাকে—গৃহের মেঝের কাছে একটি পথ দিয়া শীতল বায়ু ঘরে পাঠান হইতেছে এবং অন্য একটি পথ দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইতেছে। আবার সেই বায়ুকেই অর্থাৎ যে বায়ু বাহির হইয়া আসিতেছে

উহাকেই নতুনভাবে শীতল করিয়া গৃহে পাঠান হইতেছে। অত্যন্ত গ্রীষ্মেও এয়ার কনডিশনড ঘরে থাকিয়া মানুষ বাহিরের উষ্ণতা মোটেই টের পায় না এবং ফলে তাহাদের কর্মক্ষমতা বাড়ে। তবে বহুক্ষণ এইরূপ শীতল কক্ষে থাকিয়া বাহিরের আর্দ্র ও উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে সর্দিগর্মি লাগিয়া যাইতে পারে। ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে আজকাল এয়ার-কনডিশনিং এর ব্যবস্থা করা হইতেছে।

কৃত্রিম উপায়ে বায়ু পরিশোধনের আরও একটি উপায় আছে—উহাকে বলে **রাসায়নিক পদ্ধতি**। যে সকল রাসায়নিক পদার্থের দুর্গন্ধনাশক গুণ রহিয়াছে সেই সকল পদার্থ ব্যবহার করিয়া বায়ু বিশুদ্ধ করা যায়। এই সকল রাসায়নিক পদার্থগুলি আবার তিন ভাগে বিভক্ত—কঠিন, জলীয় ও বাষ্পীয়। অঙ্গার-চূর্ণ, শুষ্ক মাটি, ছাই, সাজিমাটি, আলকাতরা ইত্যাদি কঠিন রাসায়নিক পদার্থ বলিয়া গণ্য। এই সকল দ্রব্যগুলি দ্বারা কোন দূষিত বস্তু ঢাকিয়া রাখিলে উহার দোষ নষ্ট হইয়া যায় এবং বায়ু এইভাবে পরোক্ষে রোগজীবাণুমুক্ত হইতে পারে। বায়ু বিশোধক জলীয় রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে ফ্লুইড, ফর্মালিন, আইজল, লাইসল, ক্লোরাইড অব জিঙ্ক, পারক্লোরাইড লোশন ও তার্পিন তেল অন্যতম। আবার ওজোন, ক্লোরিন এবং সালফিউরিয়ম্ অ্যাসিড প্রভৃতি বাষ্পীয় রাসায়নিক পদার্থের অন্তর্গত। ইহাদের উপস্থিতির ফলেও বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

ব্যায়াম, বিশ্রাম, নিদ্রা, স্নান ও খাদ্যগ্রহণে সদভ্যাস গঠনের গুরুত্ব

সদভ্যাস ও তাহার প্রয়োজনীয়তা—বাংলাতে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে 'মানুষ অভ্যাসের দাস'। স্বভাবতই এই অভ্যাস জিনিসটি কি জানিতে কৌতূহল হয়। **যে ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা সহজ হইয়াছে, যাহা চিন্তাভাবনা ব্যতীত নির্ভুল ও যান্ত্রিকভাবে করা যায় তাহাই সদভ্যাস**। গোড়াতে অভ্যাস সৃষ্টির জন্য চেষ্টার দরকার কিন্তু বারে বারে কাজটি করার ফলে উহা এমনভাবে আয়ত্ত হইয়া যায় যে পরে বিনা আয়াসে কিংবা বিনা চিন্তাতেই সম্পাদন করা যায়। অভ্যাস তাই 'দ্বিতীয় স্বভাব' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সু-অভ্যাস যেমন জীবনের পক্ষে সহায়ক কু-অভ্যাস তেমনি বাধা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলি অর্থাৎ ব্যায়াম, বিশ্রাম, নিদ্রা ও খাদ্য গ্রহণের সদভ্যাস গঠন করা উচিত। কারণ এইসব ব্যাপারে সদভ্যাসের উপর নির্ভর করে ব্যক্তির পরিশ্রম করার

ক্ষমতা, স্বাস্থ্য, আয়ু এবং জীবনের শান্তি। অভ্যাসের পথে একটা আরাম আছে। তাই একবার কু-অভ্যাস আয়ত্ত হইয়া গেলে তাহা বর্জন করা কঠিন হইয়া পড়ে। শৈশবই তাই সদভ্যাস গঠনের উপযুক্ত বয়স। এখন আমরা ব্যায়াম, বিশ্রাম, স্নান ও খাদ্যপানীয় গ্রহণ সম্বন্ধীয় সদভ্যাসগুলি নিয়া একে একে আলোচনা করিতেছি।

ব্যায়াম

ব্যায়াম কাহাকে বলে ?—আমাদের দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক মাংসপেশীগুলির মধ্যে একটি ছন্দ ও সামঞ্জস্য আনিবার জন্য যে বিশেষ রকমের নিয়মিত ও প্রাত্যহিক শিক্ষা তাহারই নাম ব্যায়াম। নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা স্নায়ুগুলি সবল ও পুষ্ট হয় এবং পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা বাড়ে। হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, ইত্যাদি অনৈচ্ছিক পেশীসমূহের ক্রিয়া সর্বদা আপনাআপনি চলিতেছে। উহাদের জন্য কোনরূপ ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐচ্ছিক পেশী-সমূহকে সঞ্চালনের দ্বারা সর্বদা পুষ্ট করিয়া তুলিতে হয়। আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মের ভিতর দিয়া উহারা কিছুটা সঞ্চালিত হয় বটে কিন্তু উহাই যথেষ্ট নয়। কারণ তাহাতে দেহের সমস্ত অঙ্গের সুসঙ্গত চালনা হয় না। কোন বিশেষ পেশীর উপর অত্যধিক খাটুনি পড়ে কিন্তু অন্যান্য পেশীসমূহ নিষ্ক্রিয় থাকিয়া যায়। এই কারণে মানুষমাত্রেরই প্রত্যহ কিছু-না-কিছু ব্যায়াম করা উচিত।

ব্যায়ামের শ্রেণীবিভাগ—পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যায়ামকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) গঠনমূলক ব্যায়াম (Developmental Exercise)—
যথা : ডন, বৈঠক, ড্রিল ইত্যাদি।

(২) ক্রীড়ামূলক ব্যায়াম (Recreative Exercise)—
যথা : সাঁতার, নানাবিধ দৌড়ঝাপের খেলা।

(৩) ব্যবহারিক ব্যায়াম (Applied Exercise)—
যথা : ডাম্বেল, কুস্তি ইত্যাদি।

(৪) কসরতমূলক ব্যায়াম (Acrobatic Exercise)—
যথা : নৃত্য, অশ্বারোহণ, নৌকা চালনা ইত্যাদি।

(৫) নিরাময় ব্যায়াম (Therapeutic Exercise)—
যথা : বাত কিংবা নার্ভের রোগ সারাইবার জন্য অঙ্গমর্দন।

(৬) যৌগিক ব্যায়াম (Yogic Exercise)—

যথা ঃ আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর ব্যায়ামের ক্রিয়া

(১) **শ্বাসতন্ত্র**—ব্যায়ামের দরুন ফুসফুসের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে। ফলে বেশী পরিমাণ অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায় এবং রক্তকে দ্রুত বিশোধিত করে। ব্যায়ামের সময় ফুসফুসের ক্রিয়া যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য ব্যায়ামকালে আঁটসাট পোশাক পরিধান করা নিষেধ।

(২) **হৃৎপিণ্ড**—ব্যায়ামের ফলে হৃৎপিণ্ডের সঞ্চালন দ্রুততর হয়। এক-জন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ডের সঞ্চালন ঘটে ৭২ বার। ব্যায়ামের দ্বারা এই সঞ্চালন বাড়িয়া গিয়া ৯০ হইতে ১০০ বারের মধ্যে দাঁড়ায়। হৃৎপিণ্ডের এইরূপ দ্রুত উত্থান-পতনের ফলে দেহের সর্বত্র অধিকতর রক্ত সঞ্চালন হয়, কোথাও মেদ জমিতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের পেশীতে মেদ জমিয়া গেলে উহা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সহসা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এই যন্ত্র-সভ্যতার যুগে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম, এমন কি হাঁটা-চলার পরিমাণও এত কমিয়া গিয়াছে যে বুদ্ধিজীবীদের প্রায়ই হৃদ্‌রোগে মৃত্যু ঘটে। উপযুক্ত ব্যায়ামের দ্বারা হৃৎপিণ্ড ক্রমশ দৃঢ় ও সক্ষম করিয়া তোলা এবং এইরূপ মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

(৩) **পেশী**—মাংসপেশীসমূহ সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা অধিকতর কার্যকরী হয়। এতদ্ব্যতীত ব্যায়ামকালে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় উহারা সবল ও পুষ্ট হয়।

(৪) **ত্বক্**—ব্যায়ামের দ্বারা প্রসারিত কৈশিক রক্তনালীগুলিতে দ্রুত রক্ত সঞ্চালিত হয়। ফলে ঘর্মকূপ ও লোমকূপগুলির ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং দেহের ক্লেদ নিঃসরণে সহায়তা করে।

(৫) **রেচনতন্ত্র**—রেচনতন্ত্রের উপর ব্যায়ামের সুফল প্রত্যক্ষ। ব্যায়ামের ফলে ঘাম, মলমূত্র ইত্যাদি নিষ্কাশিত হয় এবং দেহ নীরোগ থাকে।

(৬) **স্নায়ুমণ্ডলী**—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের পরে মাথায় যখন রক্ত-চাপ বৃদ্ধি পায় তখন স্বভাবতই আমরা ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করি। ব্যায়ামের দ্বারা মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলিতে প্রচুর অক্সিজেন আমদানী হইলে সহজেই এই অবসন্নভাব দূর হইয়া যায়।

(৭) **পরিপাক যন্ত্র**—দেহের অন্যান্য আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহের মত পরিপাক যন্ত্রেরও রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। দেহে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন আমদানী হওয়ায় মেটাবলিজম্ বাড়ে, খাদ্য ভালভাবে পরিপাক হয়, ফলে ক্ষুধা ও হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৮) **সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর ব্যায়ামের প্রভাব**—ব্যায়ামেই দেহ প্রকৃত শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে। মেদবহুল দেহের মেদ ঝরিয়া গিয়া দেহকে সুঠাম ও লঘু করিয়া তোলে। রোগা লোকদের আবার পেশীসমূহ পুষ্ট ও দৃঢ় হইয়া ওঠে বলিয়া শক্তি ও কর্মসহিষ্ণুতা বাড়ে। পরিপাক ক্রিয়া ভাল হয় বলিয়া খাদ্য দেহ গঠনের কাজে লাগে। ব্যায়াম আমাদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও বাড়ায়। দেহের স্বাভাবিক শক্তি যখানে বেশী রোগ জীবাণু আসিয়া সহজে সেখানে ঠাঁই করিতে পারে না। রীতিমত ব্যায়ামের ফলে অনেক নার্ভের রোগ ও বাত ইত্যাদি সারিয়া যায়। ব্যায়াম মানুষকে দীর্ঘজীবী করে। উপযুক্ত ব্যায়ামের ফলে দেহ পরিশ্রান্ত হয় বলিয়া সুনিদ্রা হয়, মলমূত্র ও ঘাম নিষ্কাশিত হয়। এই সমস্ত কারণে মানুষ অল্প বয়সে বার্ধক্যের কবলে পড়ে না এবং দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

ব্যায়াম কেবল আমাদের দেহকেই সুগঠিত করে না, মেধাও তীক্ষ্ণ করে। বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যহ কিছু ব্যায়াম করা উচিত। ইহাতে তাহাদের দেহ যেমন নীরোগ ও শক্তিশালী হয় তেমনি জীবনে এক বৈচিত্র্য আনিয়া দেয় ও মেধা বাড়ায়। ব্যায়াম বুদ্ধির প্রাচুর্য আনে, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও সংযমশক্তি বাড়াইয়া তোলে, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে মানুষকে অনেকখানি সাহায্য করে।

অতি ব্যায়ামের কুফল—ব্যায়ামের অভাবে মানুষ যেমন স্বাস্থ্যবান্ হইতে পারে না তেমনি অতিরিক্ত ব্যায়ামেও আবার মাংসপেশী ও নার্ভগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, শরীরে তীব্র ক্লান্তি আসে, নিদ্রা ও ক্ষুধার ব্যাঘাত হয়, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা আসে, বুকে হাঁপ লাগে, দম কমিয়া যায়, কোনো দুরূহ চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে না এবং দেহ অচিরে রুগ্ন হইয়া পড়ে।

ব্যায়াম সম্বন্ধে সদভ্যাস—ব্যায়াম সম্বন্ধে সদভ্যাস গঠন করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিয়া চলিবে :—

(১) **সর্বদা নির্ধারিত সময়ে ও উন্মুক্ত স্থানে** ব্যায়াম করিবে—কারণ উন্মুক্ত বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা সবচেয়ে বেশী থাকে।

(২) আহারের ঠিক পূর্বে কিংবা অব্যবহিত পরে ব্যায়াম করিবে না।

(৩) ব্যায়ামের সময় দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমভাবে সঞ্চালিত হইবে।

(৪) ব্যায়ামের পরেই ঠাণ্ডা লাগাইবে না।

(৫) বয়স ও শারীরিক সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যায়াম করা চাই।

(৬) ব্যায়াম চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই।

বিভিন্ন বয়সের উপযোগী ব্যায়াম

(১) **শৈশবের উপযোগী ব্যায়াম**—ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে ছয় বৎসর কাল পর্যন্ত খেলাই হইল উপযুক্ত ব্যায়াম।

(২) **ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর** পর্যন্ত খেলাধুলার সঙ্গে দেহের কিছু কসরত শিখান উচিত। এই বয়সে ছেলেদের পক্ষে ড্রিল, ডন, বৈঠক, কুস্তি, হাডুডু ও সাঁতার উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। মেয়েরা স্কিপিং করিতে ও সাঁতার কাটিতে পারে। নাচও তাহাদের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম।

(৩) **চৌদ্দ হইতে চল্লিশ বৎসর** পর্যন্ত ব্যায়ামের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। খেলাধুলা ব্যতীত পাহাড়ে চড়া, দাঁড় টানা, অশ্বারোহণ ও আসন এই বয়সের উপযোগী ব্যায়াম।

(৪) **চল্লিশের পর** হইতেই কঠিন পরিশ্রমের মাত্রা একটু একটু কমান উচিত। পঞ্চাশের পরে ভ্রমণ এবং লঘু আসনই উপযুক্ত ব্যায়াম।

(৫) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পেশা ও শারীরিক সামর্থ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখিয়া ব্যায়াম করা উচিত। দিনের অধিকাংশ সময় যাহারা কেবল বসিয়া থাকেন তাহাদের পক্ষে অশ্বারোহণ, নৌকাচালনা ও সাঁতার অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ব্যায়াম কারণ এইসব ব্যায়ামে মনও কিছুটা নিবিষ্ট হয়। পরন্তু স্নায়বিক রোগীদের ক্ষেত্রে স্নায়ুচালনা যত কম হয় ততই শ্রেয়।

নারীর ব্যায়াম—নারী এবং পুরুষের ব্যায়ামের উদ্দেশ্য বস্তুত একই। পুরুষের মতই নারীরও দেহকে সুঠাম, কমনীয় ও কর্মক্ষম করিয়া তোলার জন্যই প্রত্যহ কিছুটা ব্যায়াম করা উচিত। তথাপি পুরুষ এবং নারীর দেহের গঠন ও কার্য এক নয়। প্রকৃতি পুরুষকে দিয়াছে শ্রম করার নির্দেশ আর নারীকে দিয়াছে সন্তান পালনের দায়িত্ব। কঠিন পরিশ্রমের উদ্দেশ্যে ব্যায়াম করিয়া ছেলেরা দেহকে পেশীবহুল করিয়া তোলে। ইহাতে পুরুষের দেহের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দেহের গঠন ঐরূপ পেশীবহুল করিতে গেলে নারীর দেহের কমনীয়তা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। উপরন্তু নারীর ঐ প্রকার পেশীবহুল

দেহের প্রয়োজনও নাই তাই ভারোত্তোলন করা কিংবা ডাম্বেল, মুগুর ভাজা ইত্যাদি শ্রমসাধ্য ব্যায়াম নারীর পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত। পরন্তু উহা তাহার মাতৃত্বের পক্ষে প্রতিকূলও বটে। এতদ্ব্যতীত নারীর জীবনে কতকগুলি সময় আসে যখন তাহার শারীরিক বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতির নির্দেশেই তখন তাহাকে সকল প্রকার শ্রমবহুল কাজ হইতে বিরাম লইতে হয়। যুবতী নারীর পক্ষে দৌড় ঝাঁপের চেয়ে সাঁতার কাটা, মসলা পেষা, কাপড় কাচা ইত্যাদি ব্যায়ামগুলি অধিক ফলপ্রসূ। ইহাতে ঘরের কাজও হয় এবং ব্যায়ামের উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। দ্রুত ভ্রমণ কিংবা পদচালনাও নারীর পক্ষে চলিতে পারে। কিশোরীদের পক্ষে আবার সাঁতার কাটা, স্কিপিং করা, দৌড় ঝাঁপের খেলা ও নৃত্যই প্রশস্ত ব্যায়াম।

বিশ্রাম

পরিশ্রম ব্যতীত জীবন যেমন সবল, সুস্থ ও কর্মপটু হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না, বিনা ব্যবহারে দেহযন্ত্র সহজেই বিকল হইয়া পড়ে, তেমনি উহাকে আবার যথারীতি বিশ্রাম না দিয়া অনবরত খাটাইতে থাকিলেও উহা শীঘ্রই ক্ষয় হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে দেহে ও মনে যে ক্লান্তি এবং অবসাদ আসে, ক্ষণিকের বিশ্রাম সেই অবসাদ একেবারে দূর করিয়া দিয়া মনকে প্রফুল্ল ও সতেজ করিয়া তোলে। এই কারণেই বিশ্রাম বা নিদ্রার পরে আমাদের মন দ্বিগুণ সতেজ হইয়া ওঠে, কাজে আবার নতুন করিয়া উৎসাহ লাভ করি। লক্ষ্য করিয়া দেখিবে সারাদিনের পরিশ্রমের পরে রাত্রিতে যে ক্লান্তি লইয়া আমরা বিছানায় যাই পরদিন প্রত্যূষে আর তাহার চিহ্নমাত্র থাকে না—ইহার একমাত্র কারণ রাত্রির পূর্ণ বিশ্রাম। যে দিন রাত্রে সুনিদ্রা হয় না তাহার পরদিন স্বভাবতই শরীর ম্যাজম্যাজ করে, সকালবেলা বিছানা ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।

বিশ্রাম কেবল অবসাদই দূর করে না, সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে দেহের যে ক্ষয়সাধন হয়, তাহাও পূরণ করিতে সাহায্য করে। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে যে ব্যক্তির দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসক উপযুক্ত খাদ্য ও পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের নির্দেশ দিয়া থাকেন। তবে বহুদিন ধরিয়া অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে বিশ্রাম ও নিদ্রাও সেই ক্ষয় পূরণ করিতে পারে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মারাত্মক ব্যাধির

কবলে পড়িয়া ক্লান্ত ব্যক্তির জীবনের অবসান ঘটে। তাই সময় থাকিতেই দেহকে অতিরিক্ত না খাটাইয়া উপযুক্ত বিশ্রাম দেওয়া উচিত। দেহ ও মন সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে শ্রম ও বিশ্রাম উভয়ের ছন্দ মানিয়া চলিতে হয়।

বিশ্রামের সাধারণ নিয়ম—সাধারণ অর্থে বিশ্রাম বলিতে আমরা পূর্ণ কর্মবিরতি বুঝি। সারাদিনের ক্লান্তির পরে দেহ ও মন সমস্ত কাজ, চিন্তা ও উদ্বেগ হইতে অবসর লইতে চায়। তখন একটি আরামদায়ক শয্যা অথবা একখানি ডেক চেয়ারে হাত পা এলাইয়া দিতে পারাটাই সবচেয়ে কাম্য বলিয়া বোধ হয়। দেহ ও মন যখন একেবারে অবসাদগ্রস্ত তখন একমাত্র বিশ্রামই শরীরকে সতেজ করিয়া তুলিতে সক্ষম।

তবে পূর্ণ কর্মবিরতিকেই শুধু বিশ্রাম বলা চলে না। অনেক সময় দেখা যায় একঘেয়ে কাজ করিতে করিতে দেহে কিংবা মনে বিরক্তি আসিয়া গিয়াছে কিন্তু ইহাদের কেহই কাজ হইতে একেবারে ছুটি চাহিতেছে না। এই ক্ষেত্রে পূর্ণবিরতি ব্যতীত কর্মান্তরে মনোনিবেশ করিলেও তখন বিশ্রামসুখ উপভোগ করা যায়। সাধারণত যাঁহারা সারাদিন মস্তিষ্ক কিংবা কলম চালনা করেন তাঁহাদের পক্ষে অবসর সময় একটু কায়িক পরিশ্রম, যেমন শখের বাগান করা কিংবা একটু পায়চারির মধ্য দিয়া বিশ্রাম আসে। পরন্তু যাঁহারা সারাদিন কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁহারা যদি অবসরকালে আপন আপন রুচি অনুযায়ী গল্প, নাটক অথবা কোন চিন্তাশীল প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করেন তবে তাঁহাদের মস্তিষ্ক চালনাও হয়, আবার বিশ্রামও হয়। অবশ্য সর্বদাই মনে রাখিবে দেহ কিংবা মন কোনটিই যদি অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ত থাকে তবে পূর্ণ কর্মবিরতিই একমাত্র খাঁটি বিশ্রাম দিতে পারে।

নিদ্রা—দেহের ক্ষয়পূরণের জন্যই বিশ্রামের দরকার এবং শুধুমাত্র নিদ্রাই আমাদের পূর্ণ বিশ্রামের সুযোগ দেয়। আমরা দেখিয়াছি কর্মান্তরে মনো-নিবেশও একপ্রকারের বিশ্রাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঐ নতুন কর্মটিও আর ভাল লাগে না। দেহ মন শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন নিদ্রাই একমাত্র সমস্ত ক্লান্তি দূর করিতে পারে। জাগিয়া বিশ্রাম করিলে আংশিকভাবে দেহের অবসাদ কাটে কিন্তু মনের অবসাদ দূর করিতে নিদ্রার আর দ্বিতীয় জুড়ি নাই। বস্তুত নানা দুঃখবেদনায় ভরা এই পৃথিবীতে নিদ্রা আমাদের অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া দেয়। দীর্ঘকাল কঠিন রোগে ভুগিতেছে এরূপ ব্যক্তি কিংবা পুত্র-শোকাতুরা জননীর কাছে নিদ্রা ঈশ্বরের এক পরম আশীর্বাদ।

নিদ্রাই উৎকৃষ্ট বিশ্রাম, কারণ, নিদ্রার ফলে দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কও বিশ্রাম পায়। বিশেষ করিয়া আমরা যেরূপ ব্যস্ততার যুগে বাস করিতেছি তাহাতে রাষ্ট্রপ্রধান হইতে শুরু করিয়া সাধারণ মুটে মজুর পর্যন্ত সকলেই সর্বদা এক স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্য দিয়া চলিতেছে। নিদ্রা দেহকে সকল রকম কাজ ও চিন্তা হইতে মুক্তি দেয় আর সেই সুযোগে দেহের ক্ষয়ক্ষতিগুলি পূরণ হইয়া সেখানে আবার নতুন উদ্দীপনা ফিরিয়া আসে।

নিদ্রার নিয়ম—প্রত্যহ নিয়মিত সময়েই ঘুমানো উচিত। সমস্ত দিন ও রাত্রিতে কতক্ষণ ঘুমাইবে তাহার একটা নির্দিষ্ট সময় ও পরিমাণ ঠিক থাকিলে কেবল যে শরীরই সুস্থ থাকে তাহা নয়, সেই সঙ্গে প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যেও একটা নিয়ম, একটা শৃঙ্খলা আসে। বলাবাহুল্য রাত্রিবেলাই ঘুমাইবার পক্ষে প্রশস্ত সময়। দিনের বেলা ঘুমাইয়া কাটাইয়া অধিক রাত্রি জাগিয়া কাজ করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়, কারণ, অধিক রাত্রি জাগিয়া থাকিলে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়, সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, হজমের গোলমাল উপস্থিত হয়, উপরন্তু পরের দিনের কাজগুলিও মাটি হইবার উপক্রম হয়। রাত্রিবেলা তাড়াতাড়ি শয্যাগ্রহণ এবং প্রত্যুষে শয্যাত্যাগই স্বাস্থ্যসম্মত বিধি বলিয়া গণ্য। শয়নের পূর্বে যথাসম্ভব গুরুতর আলোচনা পরিহার করিয়া চলাই উচিত এবং ঠিক বিছানায় যাইবার পূর্বে হাতে পায় ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া লইলে সুনিদ্রায় সাহায্য ঘটে।

অত্যধিক গরমে যাহাদের ঘুম আসিতে চায় না, তাহারা নৈশ আহারের ঠিক পূর্বে শীতল জলে স্নান করিয়া লইবে। শীতকালে রাত্রিবেলা ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাই উচিত। সমস্ত দেহে বেশী পরিমাণ রক্ত চলাচল করাইতে পারিলে মাথার রক্ত নামিয়া আসিবে এবং সত্বর ঘুম আসিবে। দেহে অধিক রক্ত সঞ্চালনের জন্য শীতকালের রাত্রে মাঝে মাঝে ফুট-বাথ লওয়া যাইতে পারে। সমস্ত দেহ ঢাকিয়া এক বালতি উষ্ণ জলের মধ্যে শুধু পা দুখানি ডুবাইয়া রাখিবে। ইহাকেই বলে 'ফুট-বাথ' লওয়া।

নিদ্রাকালে যতদূর সম্ভব ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া শুইবে যাহাতে বায়ু চলাচল করিতে পারে। সারাদিনের ক্লান্তির পর ঘরে যদি প্রচুর অক্সিজেন আসিতে পারে তবে সহজেই ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। বায়ু চলাচলের যথাযথ ব্যবস্থা করিলে তবেই এই অক্সিজেন পাওয়া সম্ভব। এক মশারির মধ্যে একই কারণে একাধিক ব্যক্তির শয়ন নিষেধ। নির্জন, নিরালা, বায়ুবাহিত কক্ষ ও আরামপ্রদ শয্যা সুনিদ্রার সহায়ক। নিদ্রাকালীন গায়ে যত স্বল্প পরিচ্ছদ থাকে

ততই মঙ্গল। গ্রীষ্মকালে শিশুদের একেবারে গা খালি করিয়া শোয়াইবে। শীতের সময় একটি আচ্ছাদন থাকা অবশ্যই দরকার কারণ শিশুরা সাধারণত লেপ বা কম্বল গায় রাখিতে চায় না।

উপযুক্ত খাদ্য বা জাগিয়া বিশ্রাম কোনটিই নিদ্রার সমকক্ষ নয়। নিদ্রার অভাব হইলে শুধুমাত্র খাদ্য দেহের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিতে পারে না। খুব ছোট ছোট শিশুদের দিনে ১৮ হইতে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমানো দরকার। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা ঘুমাইবে। যুবকদের ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমানো উচিত। বৃদ্ধ বয়সে স্বভাবতই ঘুম কমিয়া আসে। তখন দৈনিক ৫ হইতে ৭ ঘণ্টা ঘুমাইলেই যথেষ্ট।

স্নান—স্নান সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তোমরা জান চর্ম পরিষ্কার রাখাই স্নানের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের দেহে প্রত্যহ কিছু-না-কিছু ময়লা জমিতেছে এবং ঘামের সহিত শরীরে লাগিয়া যাইতেছে। ঐ ময়লার মধ্যে দূষিত জীবাণুও থাকে। এই ময়লা অপসারণের উদ্দেশ্যেই আমরা প্রত্যহ স্নান করি। গ্রীষ্মকালে স্নান চর্ম পরিষ্কার রাখা ভিন্ন শরীর শীতল রাখিতেও সাহায্য করে। স্নান করা মানে কেবল গায় কিছুটা জল ঢালিয়া দেওয়া নয়। স্নানের সময় সুষ্ঠুভাবে গাত্রমার্জনা করিয়া লওয়া উচিত। গাত্র মার্জনার ফলে ঘর্মকূপগুলি বুজিয়া যাইতে পারে না। স্নান তাই ঘর্ম নিঃস্রাবে সাহায্য করে। গ্রীষ্মের সময় সাবান মাখিয়া স্নান করিলে ঘামের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং শরীরও বেশ তাজা ও শুচি বোধ হয়। গ্রীষ্মের সময় সাবান যেমন উপকারী, শীতকালে আবার তেমনি তেল দেহের পক্ষে বিশেষ হিতকর। শিশুকাল হইতেই উত্তমরূপে দেহ রগড়াইয়া স্নান করিবার অভ্যাস আয়ত্ত করিবে এবং স্নানের সময় শরীরের সমস্ত ময়লা তুলিয়া ফেলিবে। এতদ্ব্যতীত স্নানের একটি নির্দিষ্ট সময় স্থির রাখিবে।

খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে সদভ্যাস—প্রাণিদেহে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতের মত দরিদ্র দেশে শত শত লোক উপযুক্ত খাদ্যাভাবে দুর্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এই দেশে অধিকাংশ ব্যাধির মূলে থাকে উপযুক্ত খাদ্যাভাব. ইঞ্জিন যেমন কয়লা ও জল না পাইলে চলে না, মানুষের দেহও সেইরূপ খাদ্যের অভাবে বিকল হইয়া পড়ে। খাদ্য সম্বন্ধে তাই আমাদের যথেষ্ট অবহিত থাকা দরকার।

অল্পাহার বা অনাহারে দেহ যেমন শীর্ণ হইয়া যায় তেমনি প্রয়োজনের বেশী আহার করিলেও দেহ সেই খাদ্যের সারাংশ গ্রহণ করিতে পারে না। খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের কতকগুলি নিয়ম অবশ্য পালন করিয়া চলা উচিত।

(১) প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আহার করিবে। প্রত্যেকটি লোকেরই আপন আপন অভ্যাস ও সুবিধা অনুযায়ী খাইবার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। যে ব্যক্তিকে প্রত্যহ সকাল সকাল খাইয়া অফিসে ছুটিতে হয়, ছুটির দিনে সে যদি তাহার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত করিয়া অনেক বিলম্বে আহার করে তবে তাহার হজমের গোলমাল দেখা দিবে। অসময়ে সুখাদ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য পাইলেও খাইতে নাই।

(২) সর্বদাই সুপাচ্য খাদ্য খাইবার অভ্যাস করিবে। তাছাড়া যে ব্যক্তি প্রত্যহ যে ধরনের খাদ্য খাইতে অভ্যস্ত তাহার সেই খাদ্যই বরাবর খাইয়া যাওয়া উচিত। কঠিন ও গুরুপাক খাদ্য বর্জন করিয়া চলাই বিধেয়। আমাদের দেশে অনেকের তেল, ঝাল ও মসলা সহযোগে গুরুপাক খাদ্য খাইবার অভ্যাস আছে। বহুদিন ধরিয়া এইরূপ খাদ্য ভোজন করিলে আলসার (ulcer) হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) খাইবার সময় কখন তাড়াহুড়া করিয়া খাইতে নাই। উত্তমরূপে চিবাইয়া খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত। খাদ্যদ্রব্য ভালভাবে চিবাইয়া খাইলে উহাতে জিহ্বার লালা মিশ্রিত হয় এবং দ্রুত হজম হইয়া যায়।

(৪) আহারের মাত্রা সর্বদা একরূপ রাখিবে। প্রয়োজনের চেয়ে কম খাইলে যেমন শরীর খুব দুর্বল হইয়া পড়ে সেইরূপ প্রয়োজনের বেশী আহার করিলেও দেহ মোটা ও চর্বিযুক্ত হইয়া পড়ে। সর্বদা পেটের এক-চতুর্থাংশ খালি রাখিয়া ভোজন করা উচিত। অনেকেরই অভ্যাস আছে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া বেশী খাইয়া ফেলা। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

(৫) দেহের পুষ্টি-সাধনই যদিও আহারের প্রধান লক্ষ্য তথাপি জিহ্বার স্বাদকেও আমরা একেবারে অবহেলা করিতে পারি না। এইজন্য খাদ্যদ্রব্য যাহাতে সুস্বাদু ও রকমারি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রত্যহ একঘেয়ে খাবারে আহারে অরুচি আসে, লালারস নিঃসৃত হয় না, ফলে হজমও সব সময় ভাল হইতে চায় না।

(৬) এতক্ষণ আমরা কেবল খাদ্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। এইবার পানীয় সম্বন্ধেও কিছু জানিয়া রাখ। খাদ্যের মত পানীয় দ্রব্য গ্রহণেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। পানীয় সম্বন্ধে প্রধান কথা হইল, যেখানে সেখানে রাস্তাঘাটে জল বা শরবত ইত্যাদি পান করিবে না। রাস্তার ধারে যে খোলা শরবত ইত্যাদি বিক্রি হয় সেগুলির মধ্যে যত ধুলা-বালি মিশ্রিত হইতেছে। এই রকম পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিলে সহজেই টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের আক্রমণ হইতে পারে। ডাবের জল, সোডা ওয়াটার কিংবা চা, কফি প্রভৃতি গরম পানীয় গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। অবশ্য কারখানার কর্মচারীরা নোংরা হইলে সোডা ওয়াটার বা আইসক্রীমে রোগের জীবাণু থাকা বিচিত্র নয়।

দেহভঙ্গী

দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, আহার সম্বন্ধীয় নিয়মগুলির উল্লেখ করিয়াছি। ব্যক্তিগত জীবনে ঐগুলির যথাযথ প্রয়োগই সদভ্যাস বলিয়া অভিহিত। এখানে কেবলমাত্র সুষ্ঠু দেহভঙ্গী লইয়াই আলোচনা করিব।

দুষ্ট অঙ্গভঙ্গীর কুফল—দুষ্ট অঙ্গভঙ্গী একদিকে স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল এবং অন্যদিকে ইহা দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ব্যাহত করে। কোমর বাঁকাইয়া দাঁড়াইলে কিংবা পিঠ কুঁজা করিয়া চলিলে ঐ সমস্ত অংশগুলি দুর্বল ও বিকৃত হয়। রক্ত চলাচলও ঠিকমত হয় না, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ফুসফুস ঠিকমত প্রসারিত হয় না, হাড়গুলি বাঁকিয়া যায়। দুষ্টভঙ্গী আমাদের সাধারণ-স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করে। দৈহিক সৌন্দর্যও এইরূপ দুষ্টভঙ্গীর ফলে ফুটিয়া ওঠে না। একটি কুব্জ মেয়ে দেখিতে যে কত কুশ্রী তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। শৈশব হইতেই সুষ্ঠু অঙ্গ-বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কারণ, দেহের হাড় শৈশবে নমনীয় থাকে। তখন কোন দুষ্ট অঙ্গভঙ্গী আয়ত্ত হইয়া গেলে তাহা আর কিছুতেই স্বাভাবিক করিয়া তোলা যায় না।

দাঁড়াইবার ভঙ্গী—দাঁড়াইবার ভঙ্গীর উপর মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকখানি ফুটিয়া ওঠে। দাঁড়াইবার ভঙ্গী ঋজু, উন্নত, সহজ ও স্বচ্ছন্দ হওয়া উচিত। পা দুইখানি সমান্তরাল ভাবে স্থাপন করিয়া, নিম্নাঙ্গ ঋজু রাখিয়া, স্কন্ধদ্বয় সমান সমান করিয়া, চিবুক সামান্য নামাইয়া, গোড়ালিতে ভর দিয়া উন্নত গ্রীবা ও

সোজা সম্মুখে ন্যস্ত দৃষ্টি নিয়া দাঁড়াইবে—ইহাই দাঁড়াইবার স্বাস্থ্যসম্মত বিধি। লক্ষ্য করিয়া দেখিবে কোন কোন লোকের হাঁটার মধ্যে কেমন একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে! ইহার কারণ আর কিছুই নয়। লোকটি কেবল সুষ্ঠু ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়াছে। এই ভঙ্গীটির দ্বারা সে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বসিবার ভঙ্গী—দাঁড়াইবার মত বসিবার ভঙ্গীও হওয়া উচিত স্বাস্থ্যসম্মত, আরামজনক ও স্বচ্ছন্দ। অনেকের দেখিবে পড়ার টেবিলে বই-এর উপর
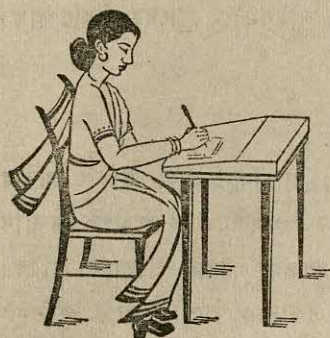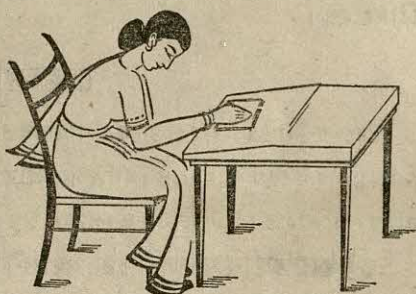
এইভাবে বসিবে এইভাবে বসিবে না

ঝুঁকিয়া পড়া অভ্যাস। ইহাতে পিঠ কুব্জ হয়, রক্ত চলাচল ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হয়, এবং উপবেশনকারীকে দেখিতেও বড় কুৎসিত লাগে। পিঠ সোজা রাখিয়া স্কন্ধদ্বয় সমান উঁচু করিয়া, বুক সামান্য চিতান এবং ঘাড় ও মাথা সোজা রাখিয়া বসিবে।

শয়ন—শয়নেরও একটি নিজস্ব সুষ্ঠু ভঙ্গী রহিয়াছে। সমান উঁচু বালিশে মাথা রাখিয়া ঘাড় ও পিঠের শিরদাঁড়া সমরেখায় রাখিয়া শয়ন করা উচিত। শুইবার সময় দেহ বেশ এলানো কিন্তু ঋজু অবস্থায় থাকিবে। কুকুর-কুণ্ডলী হইয়া শোয়া উচিত নয়। ইহাতে সমগ্র দেহে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। চিত বা উবুড় হইয়া শোওয়াও ভাল নয়।

দুষ্ট ভঙ্গীতে শুইবার ফলে দেখিবে অনেকে নাক ডাকায়। কাহারো বা আবার 'বোবায় ধরে'। 'বোবায় ধরা' অত্যন্ত কষ্টকর। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হইবার ফলেই এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বয়স অনুসারে উচ্চতা এবং ওজন

বংশগতি (Heredity), জলবায়ু (Climate) এবং জীবনধারণের মান (Standard of living) এই তিনটি উপাদানের উপর প্রত্যেক দেশের লোকের উচ্চতা এবং দেহের ওজন নির্ভর করে। ভারতেরই বিভিন্ন প্রদেশে আমরা বিভিন্ন রকমের উচ্চতা-বিশিষ্ট লোক দেখিয়া থাকি। দার্জিলিং অঞ্চলে নেপালী এবং পাঞ্জাব অঞ্চলের শিখদের মধ্যে উচ্চতায় অনেকখানি পার্থক্য দেখা যায়। আবার মহারাষ্ট্র প্রদেশের গুজরাটিরা ঐ প্রদেশেরই অন্যান্য জাতির তুলনায় বেঁটে। ইহাতে প্রমাণ হয় একদিকে জলবায়ু যেমন ব্যক্তির উচ্চতা নির্ধারিত করে তেমনি বংশগতিরও উচ্চতা নির্ধারণে অনেকখানি অবদান রহিয়াছে। বংশানুক্রমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে পারিলেও আবার ব্যক্তির উচ্চতা আংশিকভাবে বাড়ান যাইতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী ফ্রান্স বোয়াসের (Franz Boas) মতে জীবনযাত্রা ব্যক্তির জীবনের উচ্চতাকে বহুগুণে প্রভাবিত করে। তাহার মতে যে সকল ইহুদী এবং জাপানী শিশুরা আমেরিকার উন্নত পরিবেশে জন্মাইয়াছে তাহারা তাহাদের পিতামাতার তুলনায় গড়ে দুই ইঞ্চি বেশী লম্বা হইয়াছে। এখানে বাঙালী হিন্দুদের উচ্চতা এবং ওজনের গড় দেওয়া গেল। ফুট এবং ইঞ্চি হিসাবে উচ্চতা এবং পাউণ্ড হিসাবে ওজন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

ওজনের চার্ট প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ মাত্রই স্বাস্থ্য কামনা করে। ওজন ও উচ্চতা দেখিয়া একটি লোকের স্বাস্থ্য ভাল কি মন্দ অনুমান করা যায়। সুতরাং যাহারা নিজ নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে চান, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি ওজনের চার্ট রাখা উচিত। জন্মের পরে প্রথম দুই-তিন বৎসর এবং তারপর বিদ্যালয়ে গমনকালে অর্থাৎ কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে দ্বিতীয়বার মানুষের দেহের বৃদ্ধি ও গঠনের কাজ সর্বাপেক্ষা অধিক চলিতে থাকে। নবজাত শিশু তাহার দেহের প্রয়োজনীয় খাদ্য পাইলে প্রথম বৎসরে প্রায় ১২ হইতে ১৪ পাউণ্ড ওজন লাভ করিতে পারে। দ্বিতীয় বৎসরে তাহারা আরও প্রায় ৬ পাউণ্ড ওজন লাভ করে। তারপর আবার তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে বালক-বালিকাদের উচ্চতা ও ওজন বাড়িতে থাকে। প্রত্যেক বালক-বালিকা

বাঙালী হিন্দু

— উচ্চতা অনুযায়ী ওজন —

বয়স	৪-১০"	৪-১১"	৫-০"	৫-১"	৫-২"	৫-৩"	৫-৪"	৫-৫"	৫-৬"	৫-৭"	৫-৮"	৫-৯"	৫-১০"	৫-১১"	৬-০"
২০	৯৪	৯৭	১০০	১০৩	১০৭	১১০	১১৩	১১৭	১২১	১২৪	১২৮	১৩২	১৩৭	১৪১	১৪৫
২৫	৯৮	১০১	১০৪	১০৭	১১০	১১৩	১১৭	১২১	১২৫	১২৮	১৩২	১৩৬	১৪১	১৪৫	১৫০
৩০	১০২	১০৫	১০৮	১১১	১১৪	১১৭	১২০	১২৪	১২৮	১৩২	১৩৬	১৪০	১৪৫	১৪৯	১৫৪
৩৫	১০৬	১০৯	১১২	১১৫	১১৮	১২১	১২৪	১২৮	১৩২	১৩৬	১৪০	১৪৪	১৪৯	১৫৪	১৫৯
৪০	১০৯	১১২	১১৪	১১৭	১২০	১২৩	১২৭	১৩১	১৩৫	১৩৯	১৪৪	১৪৯	১৫৫	১৬১	১৬৭
৪৫	১১১	১১৪	১১৬	১১৯	১২২	১২৬	১৩০	১৩৪	১৩৮	১৪৩	১৪৮	১৫৩	১৫৯	১৬৫	১৭১
৫০	১১৩	১১৬	১১৮	১২১	১২৪	১২৭	১৩১	১৩৫	১৩৯	১৪৪	১৪৯	১৫৫	১৬১	১৬৮	১৭৪

যদি নিজ নিজ ওজন ও উচ্চতার একটি করিয়া চার্ট রাখে তবে তাহার স্বাস্থ্য মানসম্মত কিনা সে নিজেই বুঝিতে পারিবে এবং স্বাস্থ্যের মান অত্যধিক

বয়স	বালক		বালিকা	
	উচ্চতা	ওজন	উচ্চতা	ওজন
	ইঞ্চি	পাউণ্ড	ইঞ্চি	পাউণ্ড
জন্মের সময়	২০.৬	৭.৬	২০.৫	৭.২
৩ মাস বয়সে	২৩.৫	১৩.০	——	——
৬ ,, ,, ...	২৬.৫	১৮.০	২৫.৯	১৬.৮
৯ ,, ,, ...	২৮.১	২০.৪	২৭.৬	১৯.১
১২ ,, ,, ...	২৯.৪	২১.৯	২৮.৯	২০.৮
১৫ ,, ,, ...	৩০.৮	২৩.৬	৩০.১	২১.৯
১৮ ,, ,, ...	৩১.৮	২৪.৬	৩১.৩	২৩.৪
২১ ,, ,, ...	৩২.৯	২৫.৮	৩২.৩	২৪.৮
২৪ ,, ,, ...	৩৩.৮	২৭.১	৩৩.৪	২৬.৪
২৭ ,, ,, ...	৩৪.৮	২৯.০	৩৩.৯	২৭.৩
৩০ ,, ,, ...	৩৫.৪	২৯.৫	৩৪.৯	২৮.৩
৩৩ ,, ,, ...	৩৬.১	৩০.৬	৩৫.৬	২৯.১
৩৬ ,, ,, ...	৩৭.১	৩২.৩	৩৬.৮	৩০.৫
৩৯ ,, ,, ...	৩৭.৯	৩৩.১	৩৭.৩	৩১.৬
৪২ ,, ,, ...	৩৮.৬	৩৩.৮	৩৮.০	৩২.৫
৪৫ ,, ,, ...	৩৯.০	৩৪.৫	৩৮.৫	৩৩.৩
৪৮ ,, ,, ...	৩৯.৫	৩৫.৯	৩৯.০	৩৩.৮
৫ বৎসর ,, ...	৪১.৬	৪১.১	৪১.৩	৩৯.৭

উপযুক্ত খাদ্য পাইলে ভারতের শিশু ও বালক-বালিকাদের দেহের স্বাভাবিক ওজন ও উচ্চতার গড় কি হইতে পারে এবং তাহাদের বাৎসরিক বৃদ্ধির হারই বা কি সেই সম্বন্ধে এখনও বিশেষ গবেষণা হয় নাই। প্রয়োজনীয় উপাত্তের অভাবে পাশ্চাত্ত্য বালকবালিকাদের উচ্চতা ও ওজনের হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

নীচু হইয়া যাইতে থাকিলে উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইতে পারিবে।

টেবিল নং ১ বেঁটে, মাঝারি ও লম্বা বালিকাদের ওজন

	বয়স												
	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	ওজন (পাউণ্ডে)												
বেঁটে........	৩৯.৫	৪৪.১	৪৮.৬	৫২.৮	৫৭.৮	৬৩.৪	৬৯.৩	৮০.৯	৯২.৭	১০১.৯	১১০.১	১১০.৪	১১১.৭
মাঝারি.......	৪৬.০	৫০.৯	৫৬.৮	৬৩.০	৬৯.০	৭৬.৪	৮৫.৬	৯৯.৬	১০৮.৯	১১৫.৫	১১৯.৪	১২১.৪	১২১.৬
লম্বা........	৫৩.৪	৫৮.৯	৬৬.৫	৭৫.২	৮৩.৬	৯৪.২	১০৬.৮	১১৮.৫	১২৫.১	১২৮.৬	১৩২.৮	১৩২.৬	১৩৪.৯

টেবিল নং ২ বেঁটে, মাঝারি ও লম্বা বালিকাদের উচ্চতা

	বয়স												
	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	উচ্চতা (ইঞ্চিতে)												
বেঁটে	৪৩.৫	৪৫.৫	৪৭.৫	৪৯.০	৫০.৫	৫২.৫	৫৪.৫	৫৭.৫	৫৯.৫	৬০.৫	৬১.৫	৬১.৫	৬১.৫
মাঝারি	৪৩.৫	৪৫.৫	৪৭.৫	৪৯.০	৫০.৫	৫২.৫	৫৪.৫	৫৭.৫	৫৯.৫	৬০.৫	৬১.৫	৬১.৫	৬১.৫
	৪৭.৪	৪৯.৪	৫১.৯	৫৪.৪	৫৬.৪	৫৮.৪	৬০.৯	৬৩.৪	৬৪.৯	৬৫.৪	৬৫.৯	৬৫.৯	৬৫.৯
লম্বা	৪৭.৪	৪৯.৪	৫১.৯	৫৪.৪	৫৬.৪	৫৮.৪	৬০.৯	৬৩.৪	৬৪.৯	৬৫.৪	৬৫.৯	৬৫.৯	৬৫.৯

টেবিল নং ৩ মেয়েদের বাৎসরিক ওজন বৃদ্ধি

	বয়স											
	৬-৭	৭-৮	৮-৯	৯-১০	১০-১১	১১-১২	১২-১৩	১৩-১৪	১৪-১৫	১৫-১৬	১৬-১৭	১৭-১৮
	ওজন বৃদ্ধি (পাউণ্ডে)											
বেঁটে	৪	৪	৪	৫	৬	৬	১২	১২	৯	৮	১	১
মাঝারি	৫	৬	৬	৬	৭	৯	১৪	৯	৭	৪	২	১
লম্বা	৬	৮	৯	৮	১১	১৩	১২	৭	৪	৪	১	১

টেবিল নং ৪ বেঁটে, মাঝারি ও লম্বা বালকদের ওজন

	বয়স												
	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	ওজন (পাউণ্ডে)												
বেঁটে	৪১.২	৪৩.৪	৪৬.৭	৫৩.১	৫৮.৬	৬৪.৬	৬৭.২	৭৫.২	৮৪.২	৯৪.১	১০৫.৫	১১৮.৬	১২৬.৫
মাঝারি	৪৮.৩	৫৩.১	৫৮.২	৬৩.৯	৭০.১	৭৬.৫	৮২.৯	৯১.৭	১০৪.৯	১১৭.৩	১২৯.০	১৩৬.২	১৪১.৩
লম্বা	৫৭.৮	৬৩.৭	৭৫.০	৭৬.৩	৮৪.৭	৯২.২	১০২.৩	১১৩.৩	১২৮.৩	১৪০.৭	১৪৬.৪	১৫২.৬	১৬০.১

টেবিল নং ৫ বেঁটে, মাঝারি ও লম্বা বালকদের উচ্চতা

	বয়স												
	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	উচ্চতা (ইঞ্চিতে)												
বেঁটে	৪৩.৫	৪৫.৫	৪৭.৫	৪৯.৫	৫১.৫	৫৩.৫	৫৪.৫	৫৬.৫	৫৯.০	৬১.০	৬৩.০	৬৫.০	৬৬.০
মাঝারি	৪৩.৫	৪৫.৫	৪৭.৫	৪৯.৫	৫১.৫	৫৩.৫	৫৪.৫	৫৬.৫	৫৯.০	৬১.০	৬৩.০	৬৫.০	৬৬.০
	৪৮.৪	৫০.৪	৫২.৪	৫৪.৫	৫৬.৪	৫৮.৪	৬০.৪	৬২.৯	৬৫.৯	৬৮.৪	৬৯.৯	৭০.৯	৭১.৪
লম্বা	৪৮.৪	৫০.৪	৫২.৪	৫৪.৫	৫৬.৪	৫৮.৪	৬০.৪	৬২.৯	৬৫.৯	৬৮.৪	৬৯.৯	৭০.৯	৭১.৪

টেবিল নং ৬ বেঁটে, মাঝারি ও লম্বা বালকদের বার্ষিক ন্যূনতম ওজন বৃদ্ধি

	বয়স											
	৬-৭	৭-৮	৮-৯	৯-১০	১০-১১	১১-১২	১২-১৩	১৩-১৪	১৪-১৫	১৫-১৬	১৬-১৭	১৭-১৮
	ওজন (পাউণ্ডে)											
বেঁটে	২	৩	৬	৬	৬	৩	৮	৯	১০	১১	১৩	৮
মাঝারি	৩	৫	৬	৬	৬	৬	৯	১৩	১২	১২	৭	৫
লম্বা	৬	৭	৬	৮	৮	১০	১১	১৫	১২	৬	৬	৭

১ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বালিকাদের ওজন বৃদ্ধির হার

১ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বালিকাদের উচ্চতা বৃদ্ধির হার

১ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বালকদের ওজন বৃদ্ধির হার
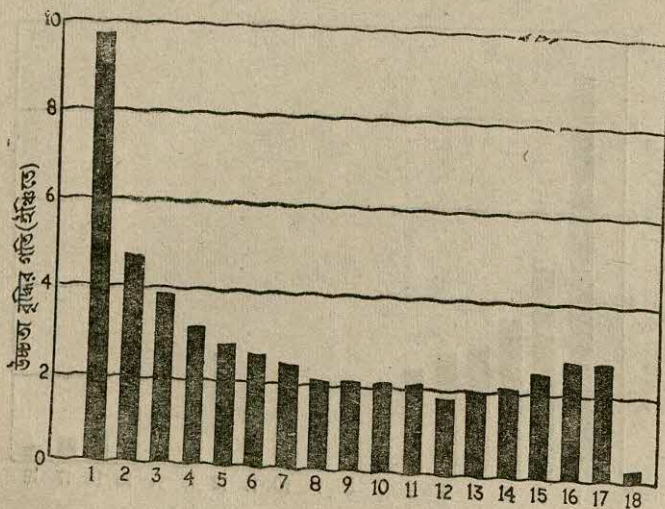
১ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বালকদের উচ্চতা বৃদ্ধির হার

ওজনের চার্ট প্রস্তুত করিবার প্রণালী

ওজনের চার্ট প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে একটি কাগজে গ্রাফ পেপারের অনুকরণে কতকগুলি চতুষ্কোণ ঘর কাটিয়া লও। এইবার উহার বাম দিকে নীচ হইতে উপরে পাউণ্ডের সংখ্যা বাড়াইয়া যাও এবং তলদেশে মাসের নাম লিখিয়া যাও। যে মাস হইতে ওজন লইতে শুরু করিয়াছ সেই মাসে তোমার ওজন কত ছিল তাহা চার্টের উপর একটি চিহ্নের সাহায্যে নিধারণ কর এবং প্রতি মাসে ওজন কিরূপভাবে ওঠানামা করে তাহা পর্যবেক্ষণ কর। নিম্নে ওজনের একটি মাসিক চার্ট দেওয়া হইল।

বালিকার নাম—শ্রীমতী কমলা রায়

বয়স—১৫ বৎসর

উচ্চতা—৫ ফুট ৩ ইঞ্চি
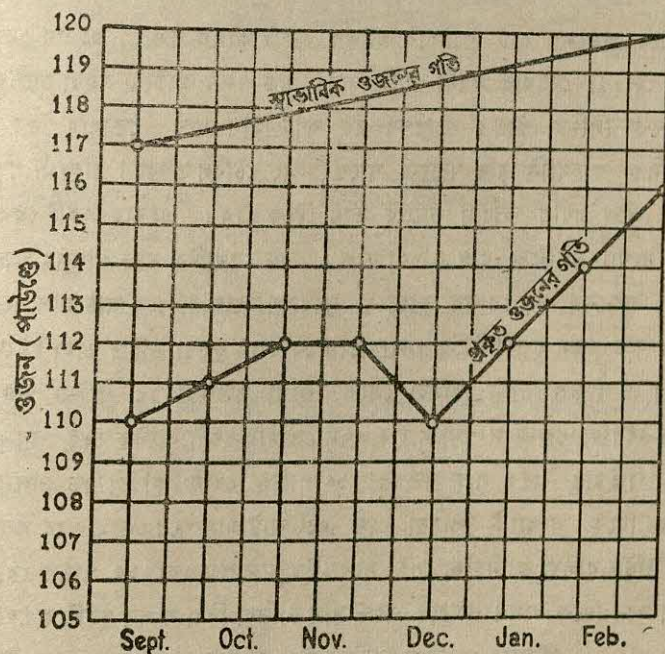
সেপ্টেম্বর মাসে কমলার ওজন ১১০ পাউণ্ড। ফেব্রুয়ারী মাসে উহা বাড়িয়া ১১৪ পাউণ্ড হইয়াছে।

প্রতি মাসে ওজন না লইয়া তিন মাস কিংবা ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ওজন লওয়া চলিতে পারে।

একটি ওজনের চার্ট তৈয়ারী করাই যথেষ্ট নয়। চার্ট তৈয়ারীর সময় ওজন মানসম্মত কিনা তাহাও স্থির করা দরকার। আমাদের দেশে মানসম্মত ওজন-বিশিষ্ট লোক খুবই কম আছে। উচ্চতা এবং বয়সের অনুপাতে লোকটির ওজন হয়ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে নতুবা প্রয়োজনের চেয়ে ওজন অনেক কম ভারতে এরূপ লোকের সংখ্যাই বেশী। ওজন মানসম্মত রাখিতে চাহিলে একটি স্বতন্ত্র চার্ট প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এই চার্টে প্রথমে ওজনের গড়-রেখা (average weight line) বাহির করিয়া লইয়া উহার সাহায্যে তোমার ওজনের সর্বোচ্চ সীমা (upper limit) এবং সর্বনিম্ন সীমা (lower limit) নির্ণয় কর।

ওজনের গড়-রেখা (Average weight line)—

প্রথমে ওজনের চার্ট করিবার অনুরূপ একটি কাগজ লও। এইবার ১নং টেবিল দেখিয়া তোমার বয়সী বালিকাদের গড় ওজন জানিয়া লইয়া চার্টের বাম দিকে লিখিয়া রাখ। তারপর ধর আট মাস পরে তোমার ওজন আনুমানিক কতখানি বৃদ্ধি পাইতে পারে (৩নং টেবিল দ্রষ্টব্য) তাহা ঐ গড় ওজনের সঙ্গে যোগ করিয়া চার্টের ডান দিকে রাখ। এইবার একটি রেখা টানিয়া সংখ্যা দুইটিকে যোগ করিয়া দাও। এই রেখাটির নাম ওজনের গড়-রেখা। ওজনের গড়-রেখার সাহায্যে তুমি জানিতে পারিবে আট মাস পরে তোমার কত ওজন হওয়া উচিত। আমাদের যে ওজন হওয়া উচিত তাহা হইতে শতকরা ৭ পাউণ্ড ওজন কমিয়া গেলে কিংবা শতকরা ১৫ পাউণ্ড ওজন বাড়িলে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। এখন তোমার বয়সী বালিকাদের ওজনের যে গড় পাইয়াছ উহার সঙ্গে শতকরা ১৫ পাউণ্ড যোগ করিয়া গড় ওজনের উপরের দিকে সংখ্যাটি লিখিয়া রাখ এবং আট মাস পরে তোমার যে ওজন হওয়া উচিত বলিয়া জানিয়াছ, সেই সংখ্যাটির সঙ্গে শতকরা ১৫ পাউণ্ড যোগ করিয়া ডান দিকে রাখ। এইবার একটি দাগ টানিয়া দিয়া সংখ্যা দুইটিকে যোগ করিয়া দাও। এইভাবে যে রেখা টানিলে উহা তোমার ওজনের সর্বোচ্চ সীমা (upper limit) নির্ধারণ করিবে। অনুরূপভাবে গড় ওজনের পরিমাণ হইতে শতকরা ৭ পাউণ্ড বিয়োগ করিয়া লইয়া গড় ওজনের নীচের দিকে সংখ্যাটি

লিখিয়া রাখ। তারপর আবার আট মাস পরে তোমার যে ওজন হওয়া উচিত তাহা হইতে শতকরা ৭ পাউণ্ড বিয়োগ করিয়া ডান দিকে সংখ্যাটি লিখিয়া রাখ। এইবার দুইটি সংখ্যাকে একটি রেখা দ্বারা যুক্ত কর। এই রেখাটি ওজনের সর্বনিম্ন সীমা (lower limit) নির্দেশ করিবে। গড় ওজনকে কেন্দ্রে
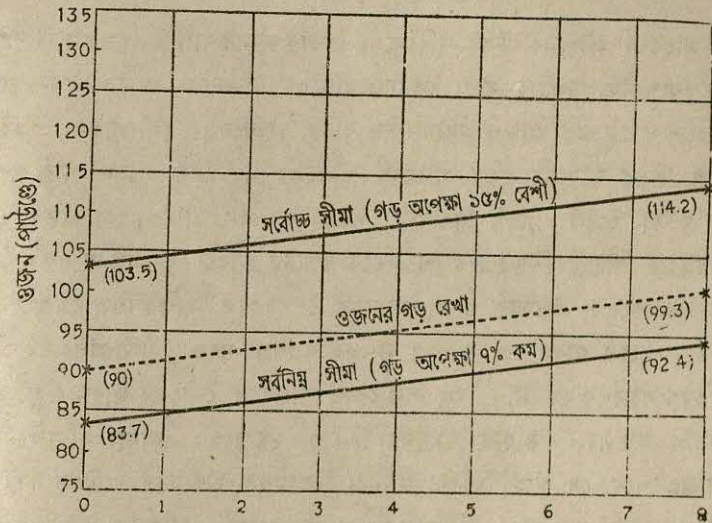
একটি বালিকার গড় ওজন ৯০ পাউণ্ড। বর্তমানে তাহার ওজন এই গড় ওজনের চেয়ে ১৫% পাউণ্ড বেশী অথবা ৭% পাউণ্ড কম অর্থাৎ ১০৩·৫—৮৩·৭ পাউণ্ডের মধ্যে নির্ভয়ে ওঠানামা করিতে পারে। ৮ মাস পরে এই বালিকার ৯·৩ পাউণ্ড ওজন বাড়িয়া গড় ওজন ৯৯·৩ পাউণ্ডে দাঁড়াইবে। তখন তাহার ওজন ১১৪·২—৯২·৪ পাউণ্ডের মধ্যে ওঠানামা করিতে পারে।

রাখিয়া ওজনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সীমার মধ্যে তোমার ওজন নির্ভয়ে ওঠানামা করিতে পারে। উপরের চার্টের সাহায্যে সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহ-পরিচালনা

মানুষের জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব অনেকখানি। বস্তুত পরিবেশ এবং বংশগতি উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি মানুষের জীবনকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এই প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, গৃহই হইল শিশুর জীবনের প্রথম পরিবেশ। জন্মের পর শিশু গৃহের পরিবেশে বড় হইয়া ওঠে। গৃহের অবস্থিতি, গঠন এবং পারিপার্শ্বিক, প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা শিশুর দেহ ও মনকে সুগঠিত করিয়া তুলিতে অনেকখানি সাহায্য করে। প্রত্যেক দেশে মানুষের শৈশবকাল অতিবাহিত হয় গৃহে। সুতরাং গৃহের আবহাওয়া অনুকূল না হইলে শিশুর সহজাত বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ সম্ভবপর হয় না। শুধু শিশু কেন, প্রাপ্তবয়স্ক লোকের জীবনেও গৃহের প্রভাব কম নয়। তাহার কর্মমুখর দিন শুরু হয় গৃহে। আবার সারাদিনের ক্লান্তির পরে সে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে চায়। গৃহের পরিবেশের উপর নির্ভর করে তাহার স্বাস্থ্য, কর্মক্ষমতা ও মানসিক শক্তি। জীর্ণ সমাজকে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে হইলে খাদ্যবস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাসগৃহের সংস্কারসাধন করাও একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত সভ্য দেশগুলি আজ বাসগৃহের সমস্যার সমাধান খুঁজিতেছে।

গৃহের অবস্থান (Location)—গৃহ নির্মাণের প্রথমেই স্থির করিয়া লইতে হয় কোন্ অঞ্চলে বাসগৃহ স্থাপিত হইবে। গৃহের অবস্থান নির্ধারণে আঞ্চলিক পরিবেশের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য পাওয়া উচিত। তবে অধিকাংশ লোকই আপনার রুচি অনুযায়ী গৃহ নির্বাচনের সুযোগ পায় না। এই সুযোগ লাভ করিলে সকলেই বোধহয় বড় শহর ছাড়িয়া ধূলিধূমবর্জিত শহরের উপকণ্ঠে বাসভূমি নির্মাণের ব্যবস্থা করিত। এইরূপ বাসস্থলের প্রধান সুবিধা এই যে ইহাতে শহরের সকল সুবিধাই ভোগ করা যায় অথচ কল-কারখানার শব্দ, ট্রাম-বাসের ঘর্ঘরানি কানে আসে না। ছেলেমেয়েরা পুকুরে সাঁতার কাটিয়া, মাঠে খেলাধুলা করিয়া, ক্ষেতের তাজা শাকসবজি ও টাটকা দুধ খাইয়া বাঁচে। প্রকৃতির কোলে মানুষ হইয়া তাহাদের মনগুলিও হইয়া

ওঠে সতেজ ও সুন্দর। কিন্তু গ্রাম ও শহরের সুবিধা একসঙ্গে ভোগ করিতে পারে এইরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি বাস করিতে হয়। কখনও বা পয়সার অভাবে শহরের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর অঞ্চল ছাড়িয়া বহু পরিবারকে অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি জায়গায় গিয়া বাড়ি ভাড়া লইতে হয়। কাহারও বা আপন ইচ্ছা ও রুচির বিরুদ্ধে পৈতৃক গৃহেই আজীবন কাটাইয়া যাইতে হয়। বাড়ি ভাড়া ও যাতায়াতের সুবিধা, কর্মক্ষেত্রের নিকটত্ব প্রভৃতিও বাসগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে ব্যক্তির মনকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। তবে গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে সর্বদা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখিয়া নির্মাণ করা উচিত। পরিবেশ বলিতে শুধু প্রাকৃতিক অবস্থান বুঝায় না, সামাজিক পরিবেশও ইহার অন্তর্গত। শিক্ষিত ভদ্র পল্লীতে বাসভূমি তৈয়ারী করিলে ছেলেমেয়েদেরও আচার-ব্যবহার উন্নত হয়।

ভূমি নির্বাচন (Selection of Site)—কোন্ অঞ্চলে গৃহ নির্মাণ করিবে তাহা স্থির করিয়া লইয়া ভূমি নির্বাচনের কাজে হাত দিবে। ভূমি নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভূমির সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের এক নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। তোমরা জান মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর আছে। বৃষ্টিপাতের পরে ভূভাগের উপরের জল নদী ও পুষ্করিণীর মধ্যে গিয়া সঞ্চিত হয় এবং কিছুটা জল আবার মৃত্তিকা ভেদ করিয়া মাটির অশোষক স্তরে (non-pervious layer) গিয়া সঞ্চিত হয়। অশোষক স্তরে গিয়া পৌছিলে জলের গতি রুদ্ধ হয় এবং তখন উহা ঢালু ভূমির অভিমুখে চলিতে থাকে। এই জল ভূ-পৃষ্ঠের খুব কাছে সঞ্চিত থাকিতে পারে কিংবা অপেক্ষাকৃত গভীর প্রদেশেও চলিয়া যাইতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠের অব্যবহিত নীচে জল জমিয়া থাকিলে সেখানকার ভূমি স্যাঁতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর হয়। এইজন্য কর্দমাক্ত বা এঁটেল মাটিতে গৃহ নির্মাণ করিতে নাই।

অতিরিক্ত নীচু জমিতে বর্ষার জল দাঁড়াইয়া থাকিতে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই ভাবে বহুদিন জল জমিয়া থাকিলে সহজেই মশা, মাছি জন্মিয়া থাকে। নীচু জমি তাই স্বভাবতই নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তিস্থল হইয়া দাঁড়ায়। স্যাঁতসেঁতে ভূমির মত নীচু জমিও বাসগৃহ নির্মাণের অনুপযুক্ত।

আবর্জনাপূর্ণ ভরাট জমি এবং শ্মশান ও গোরস্থানের নিকটবর্তী জমিতেও বাসস্থান নির্মাণ করিতে নাই। ভরাট জমির আবর্জনাগুলি মাটির ভিতরে

ক্রমশ পচিতে থাকে, তারপর সেই স্থানে দূষিত গ্যাসের সৃষ্টি করে। উপরন্তু ভরাট জমি নীচে বসিয়া যাইতে চায়। পুষ্করিণী কিংবা ডোবা প্রভৃতি জলা-ভূমি ভরাট করিলে ঐরূপ জমি স্যাঁতসেঁতে হয়। ভরাট জমিতে একান্তই বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হইলে জমি ভরাট হইবার পরে অন্তত দশ বৎসর অপেক্ষা করা উচিত। ততদিনে আবর্জনা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং উহার দুর্গন্ধ ও দূষিত গ্যাসও আর থাকে না। শ্মশানে মৃতদেহ পোড়াইবার সময় এক দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে। এই দুর্গন্ধ বায়ুর বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। গোরস্থান আবার কাক, চিল, শকুন ও শৃগালের বাসভূমি।

কলকারখানার নিকটবর্তী অঞ্চল বাসের পক্ষে উপযুক্ত নয়। কলকারখানা হইতে সর্বদা ধূলি ও ধুম নির্গত হইতে থাকে। ঐসব ধূলাবালি প্রশ্বাসের সঙ্গে ও খাদ্যের সঙ্গে আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত কারখানার কলকব্জার ঘর্ঘরানি ব্যক্তির মানসিক শান্তি ও স্থৈর্য নষ্ট করে।

শুষ্ক, উঁচু জমিই বাসগৃহ নির্মাণের পক্ষে আদর্শ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শিলাময় প্রস্তরভূমি ও বালুকাপূর্ণ জমিও গৃহ নির্মাণের পক্ষে প্রশস্ত। শিলাময় ভূমিতে গর্ত দেখিলে উহা অবিলম্বে ভরাট করিয়া লইবে নতুবা উহাতে জল জমিবার সম্ভাবনা থাকে। প্রস্তরময় ও বালুকাময় ভূমিতে জল দাঁড়াইতে পারে না বলিয়া জমি শুষ্ক থাকে। তবে বালুকাময় ভূমিতে অবস্থিত বাড়ির ভিত সর্বদা উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গৃহের সংস্থিতি (Aspect of the house)—সংস্থিতির অর্থ গৃহের অবস্থিতি অর্থাৎ বাড়ির দরজা জানালাগুলি কোন্ দিকে মুখ করিয়া অবস্থিত। সূর্যের অবস্থান ও বায়ুর গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গৃহের অবস্থান নির্ধারণ করিতে হয়। আমাদের দেশের পক্ষে দক্ষিণ ও পূর্বমুখী ঘরই সবচেয়ে প্রশস্ত। পূর্বদিকে সূর্য ওঠে বলিয়া পূর্বমুখী ঘরগুলিতে সকালবেলার রোদ পড়ে। শীতকালে তাই পূর্বমুখী ঘরগুলি খুব আরামদায়ক। আবার সূর্য পূর্বদিকে উঠিয়া যখন দক্ষিণের আকাশে যায় তখন দক্ষিণের ঘরে লম্বভাবে সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া দক্ষিণের ঘরগুলি সারাদিনই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে। বায়ু চলাচলের দিক হইতেও দক্ষিণমুখী ঘরগুলি মনোরম। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক হইতে হাওয়া বহিতে থাকে। উত্তর ও পশ্চিমের ঘরে শীতকালে রোদ পড়ে না। শীতকালে আবার উত্তুরে হাওয়া বহে

বলিয়া উত্তরের ঘরগুলি তখন খুব ঠাণ্ডা হয়। শীতকালে ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মের সময় অত্যধিক রৌদ্রের উত্তাপবশত গরম—উত্তরের ঘরের এই দুইটি অসুবিধাই বর্তমান থাকে। গৃহের সংস্থিতির সাধারণ নিয়মগুলি বলা হইল। তবে সংস্থিতি সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম খাটে না। যেমন, কোন জমির উত্তরের দিকে যদি নদী কিংবা সমুদ্র থাকে তবে ঐ জমিতে উত্তর দিকে মুখ করিয়াই বাড়ি নির্মাণ করা উচিত।

বাড়ীর গঠন (Structure of the house)—সর্বত্রই বাড়ীর উপাদান ও গঠন নির্ভর করে গৃহকর্তার সঙ্গতি, রুচি ও স্থানীয় আবহাওয়ার উপরে। সাধারণত ইট, কাঠ, পাথর অথবা বাঁশ, দরমা, মাটি, খড় ইত্যাদি দিয়া বাড়ি তৈয়ারী হয়। যে সমস্ত দেশে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় সেই সকল দেশের লোকেরা নিরাপত্তার জন্য কাঠের বাড়ি নির্মাণ করে। আবার উন্মুক্ত প্রান্তরে আগুন লাগিবার ভয় থাকে বেশী। সেইজন্য খোলা জায়গার বাড়ি পাকা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রাকৃতিক অসুবিধাগুলি না থাকিলে অধিকাংশ লোকেই পাকা বাড়ি পছন্দ করে। পাকা বাড়ির নিরাপত্তা অনেক বেশী। প্রথমত পাকা বাড়িতে চোরের ভয় কম। দ্বিতীয়ত পাকা বাড়ি অন্য বাড়ির তুলনায় মজবুতও বেশী। একবার তৈয়ারী করিতে পারিলে প্রতি বৎসর সংস্কার করাইবার ঝঞ্ঝাট হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

কাঠের বাড়িগুলিও দেখিতে সুন্দর। ভাল কাঠ হইলে বাড়ি বেশ মজবুত করিয়া তৈয়ারী করা যায়। পাহাড় অঞ্চলে কাঠ সস্তা বলিয়া অনেকে কাঠের বাড়ি তৈয়ারী করিয়া থাকে। তবে কাঠের বাড়ির প্রধান অসুবিধা এই যে ইহাতে উই, আরশুলা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের উপদ্রব দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত কাঠের বাড়ির একতলা রৌদ্র এবং বৃষ্টিতে সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। একতলার মেঝে ব্যতীত অন্যান্য তলার মেঝেগুলি কাঠের পাটাতন দিয়া তৈয়ারী করিলে ক্ষতি নাই। পাকা বাড়ির দরজা জানালাগুলিতে অবশ্যই কাঠ ব্যবহার করা হয়। কাঠের বাড়ির একতলার মেঝে ভূমি হইতে অনেক উঁচুতে নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরূপ বাড়িতে সিঁড়ি বাহিয়া একতলায় যাইবার ব্যবস্থা করিবে।

পাকা বাড়ির সঙ্গে অন্যান্য বাড়ির প্রধান পার্থক্য এই যে পাকা বাড়িতে মাটির নীচে একটি মজবুত ভিত তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। অন্য উপাদানে নির্মিত বাড়িতে সেরূপ ভিত স্থাপনের কোন প্রয়োজন হয় না। তবে মাটির

নীচেই যদি বিস্তৃত শিলাখণ্ড থাকে তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। শিলাখণ্ডের উপরে ভিত স্থাপন না করিয়া পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতে পার। তবে আমরা সচরাচর মাটির উপরে বাড়ি প্রস্তুত করি বলিয়া ভিতের প্রয়োজন হয়। বাড়ি যত উঁচু হইবে ভিতও তত মজবুত চাই, কারণ, উপর তলার সমস্ত ভার এই ভিতকেই বহন করিতে হয়। ভিত স্থাপনের নিয়ম এই, প্রথমে মাটির নীচে বাড়ির চারিপাশ ঘুরাইয়া প্রায় তিন ফুট গভীর এবং যত ইঞ্চি দেওয়াল (বাড়ি যত উঁচু হইবে এই দেওয়াল তত গভীর ও পুরু হইবে) হইবে উহার চারগুণ চওড়া খাদ কাটিয়া লইয়া কংক্রিট দিয়া খাদ গাঁথিয়া দিবে। ইহাকে বলে মাটির তলার ভিত বা foundation ; মাটির উপরেও অনুরূপভাবে খানিকটা ভিত প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। প্রথম ভিতের প্রস্থ হইবে দ্বিতীয় ভিতের দ্বিগুণ। মাটির উপরকার ভিতকে বলে base ; মাটির প্রকৃতি অনুসারে এই ভিত উঁচু করিয়া লইতে হয়। স্বভাবতই শুষ্ক মাটির চেয়ে সাঁতসেঁতে মাটির উপরকার ভিত হইবে অনেক বেশী উঁচু। দেশে বন্যার আশঙ্কা থাকিলেও এই ভিত খুব উঁচু করিয়া লইতে হয়। ভূমির আর্দ্রতা যাহাতে গৃহকে স্পর্শ করিতে না পারে এইজন্য উপরকার ভিতের অভ্যন্তরভাগ চুন, সুরকি, সিমেণ্ট ইত্যাদি অচ্ছিদ্র উপাদান দিয়া গাঁথিয়া তুলিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি বর্ষার জল চুয়াইয়া মাটির ভিতরে চলিয়া যায়। তারপর এই জল অশোষক স্তরে বাধা পাইয়া আবার সচ্ছিদ্র স্তর বাহিয়া উপরে উঠিতে থাকে। প্রত্যেক তরল পদার্থেরই এইরূপ চুয়াইবার ধর্ম থাকে। তরল পদার্থের এই ধর্মকে বলে কৈশিক ক্রিয়া (capillary action)। জলের এই কৈশিক ক্রিয়া রোধ করিবার জন্যই মাটির ভিত অচ্ছিদ্র উপাদানে (non-porous building material) তৈয়ারী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় ভিতের উপরিভাগকে বলে প্লিন্থ্ (Plinth)। এই প্লিন্থের উপরে সিমেণ্ট বা পাথর ঢালাই করিয়া মসৃণ মেঝে প্রস্তুত হয়।

ঘরের ভিত ও দেওয়ালের পরে দরজা, জানালা ও ছাতের গঠন-সংক্রান্ত প্রশ্ন দেখা দেয়। সমস্ত পাকা বাড়ির দরজা জানালা হইবে কাঠের। বাঁশ, কাঠ ও মাটির বাড়িতে টিন কিংবা খড়ের চাল দেওয়া থাকে। পাকা বাড়িতেও কখন কখন টালি, এসবেসটাস (asbestos) ও টিনের চাল দেখা যায়। এসবেসটাস ও টিন মজবুত হইলেও সহজেই গরম হইয়া ওঠে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐরূপ চাল মোটেই আরামদায়ক নয়। টালির ছাত গৃহে

কুটিরের স্নিগ্ধ পরিবেশ আনিয়া দেয়, টালি দেখিতেও সুন্দর এবং ঘরও ঠাণ্ডা রাখে। তবে টালির বাড়িতে কাঠবিড়ালি, ইঁদুর ও আরশুলার উৎপাত থাকে এবং টালি সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে চায় বলিয়া প্রায় প্রতি বৎসরই উহা মেরামত করা প্রয়োজন। এই সকল কারণে চুন, সুরকি ও সিমেণ্ট দিয়া পাকা ছাত তৈয়ারী করাই প্রশস্ত। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের বাড়ির ছাত হইবে ঢালু (slanting)।

গৃহের আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা (Plan of the house)—প্রত্যেক গৃহেরই একটি আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা থাকে। প্রত্যেক গৃহের পরিকল্পনাতেই সচরাচর দুইটি জিনিসের প্রাধান্য থাকে—প্রথমটি গৃহকর্তার রুচি ও সৌন্দর্য-বোধ ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা, দ্বিতীয়টি গৃহের পরিজনদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইবার প্রয়াস। বাড়ির গঠন যদি বাস্তবিকই সুন্দর হয় তবে বাড়িটি যে সকলের নিকট মনোরম ও প্রিয় হইয়া ওঠে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বাহিরের সৌন্দর্য কিংবা গঠনের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়া লক্ষ্য রাখিবে যেন পরিবারের লোকদের কিংবা প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটে। গৃহের পরিকল্পনায় অবশ্যই বায়ু চলাচল, জল, আলো এবং অনাময় ব্যবস্থার প্রাধান্য থাকিবে। প্রত্যেক শহরে পৌরসভার নিকটে বাড়ির নক্‌শা পূর্বাহ্ণে দাখিল করিতে হয়। ইহার প্রধান কারণ বাড়িটি যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয় এবং প্রতিবেশীদের কোন রকম অসুবিধার কারণ হইয়া না দাঁড়ায়। পৌরসভার অনুমোদন পাইলে তবেই বাড়ি করা সম্ভব হয়।

প্রত্যেক বাড়িতেই বৈঠকখানা, শয়ন ঘর, রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর, শিশুদের ক্রীড়া-কক্ষ, ভোজনঘর, স্নানাগার ও পায়খানা থাকা উচিত। বাড়িতে কয়টি শয়ন ঘর থাকিবে তাহা নির্ভর করে পরিবারের সভ্যসংখ্যার উপরে। বাড়িতে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জন্য একটি স্বতন্ত্র পড়ার ঘর থাকা উচিত। ঐ ঘরে তাহাদের উপযোগী একটি লাইব্রেরীও থাকিতে পারে।

গৃহ পরিকল্পনার মূল নীতিগুলি সর্বত্রই এক, বিভিন্ন কক্ষের প্রয়োজনীয়তা সর্বত্রই সমান। তথাপি গ্রামের পরিকল্পনা ও শহরের পরিকল্পনা ঠিক একরূপ হইতে পারে না। গ্রামের বাড়িগুলি স্বভাবতই অনেক জায়গা জুড়িয়া নির্মিত হয়। বাড়ির সম্মুখে একটি সুন্দর ফুলের বাগান, ভিতরে একটি প্রশস্ত আঙিনা, গোশালা, সবজির ক্ষেত, কোথাও বা আবার পুষ্করিণীও দেখা যায়।

পল্লীগ্রামের একটি আদর্শ বসতবাটির নকশা

শহরের বাড়ির পরিকল্পনা

শয়নঘর

শয়নঘর

হলঘর

রান্নাঘর

খাইবারঘর
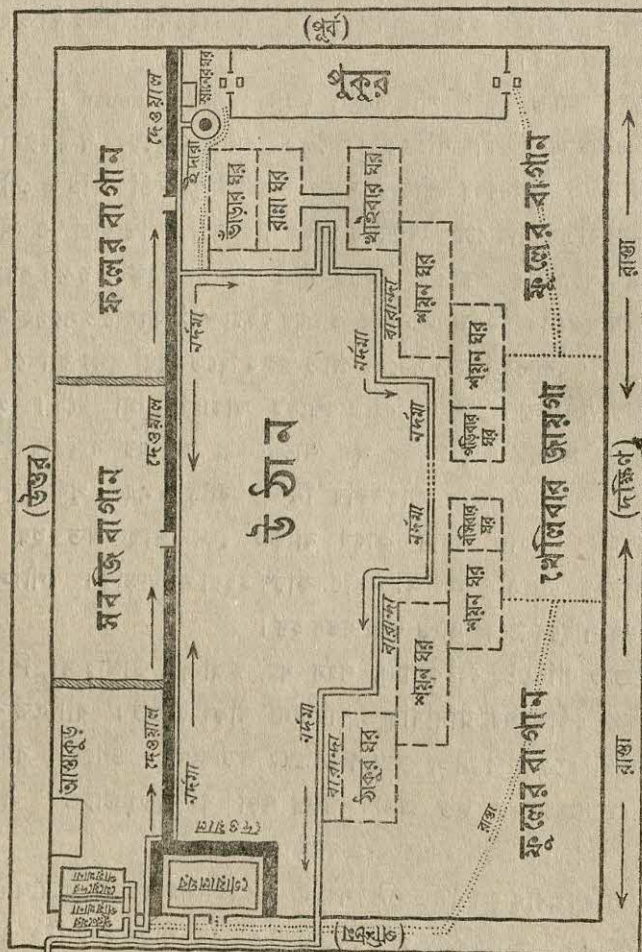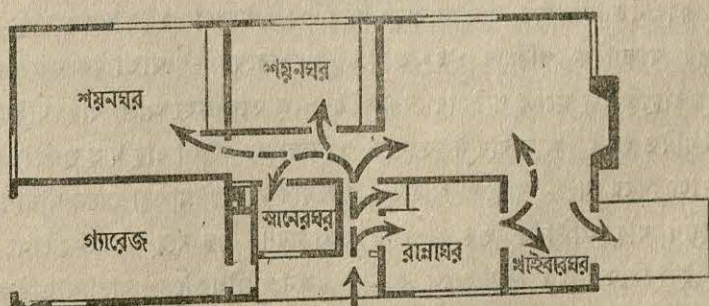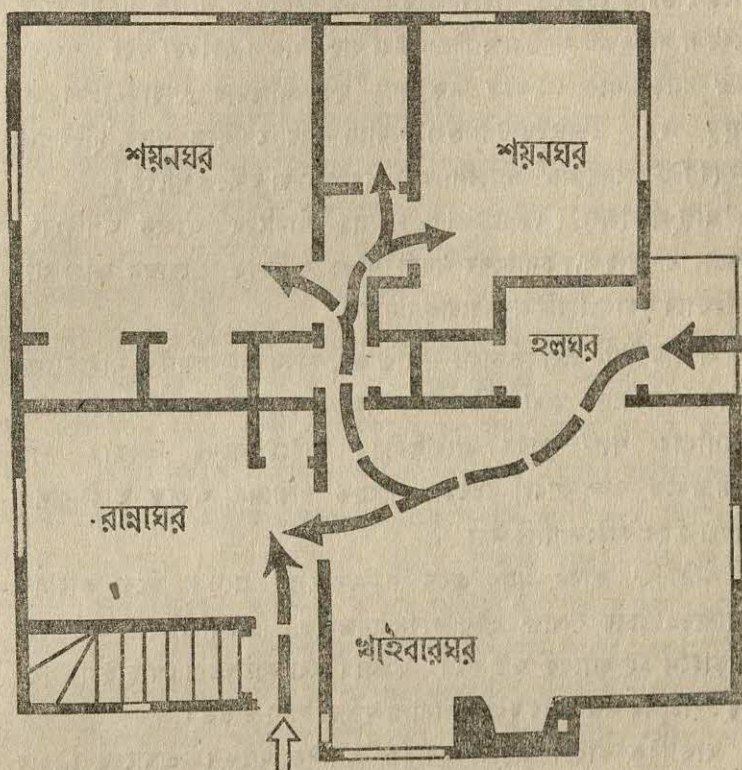
আঙিনা—আঙিনা একাধারে গৃহের শ্রীবৃদ্ধি করে এবং পরিবারের লোকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাইতে সাহায্য করে। কি শহরের বাড়ি, কি গ্রামের বাড়ি, গৃহের সংলগ্ন একটি আঙিনা থাকিলে উহা বায়ু-চলাচলে সহায়তা করে। শহরের ঘিঞ্জি বাড়িগুলিতে এইজন্যই একটুখানি ক্ষুদ্র আঙিনার প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হয়। ছোট ছোট শিশুরা ওখানে বসিয়া খেলিতে পারে, গৃহিণীরাও অবসর বিনোদনের জন্য সন্ধ্যাবেলা আঙিনায় আসিয়া বসিতে পারেন।

বায়ু-সঞ্চালন (Ventilation)—বায়ু আমাদের জীবনে অপরিহার্য। সুতরাং বাসগৃহে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা থাকা যে একান্ত প্রয়োজন তাহা আর বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

বায়ুর উপাদান প্রধানত চারটি—অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ও জল। ইহাদের মধ্যে অক্সিজেনই আমাদের দেহের পক্ষে উপকারী, যদিও গাছপালার পক্ষে কার্বন প্রয়োজনীয়। নাইট্রোজেনের একমাত্র কাজ অক্সিজেনকে তরল করিয়া দেওয়া। বিশুদ্ধ অক্সিজেন অত্যন্ত ভারী বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

অতিরিক্ত কার্বন গ্যাস গ্রহণ করিলে প্লীহা বাড়ে। তবে কার্বনিক অ্যাসিডের চেয়ে বিষাক্ত হইল কার্বন-মনক্সাইড। কয়লা কিংবা কাঠকয়লা পোড়াইলে এই গ্যাসের সৃষ্টি হয়। কয়লা কিংবা কাঠকয়লা পোড়াইবার সময় বায়ু চলাচলের জন্য ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া রাখা উচিত।

স্বাভাবিক কারণে বায়ুতে কার্বনিক অ্যাসিড থাকে। প্রশ্বাসের ক্রিয়ার দ্বারা আমরা বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দিই। প্রশ্বাস-বায়ুর চেয়ে নিঃশ্বাস বায়ুতে তাই কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী থাকে। আগুন জ্বালাইলেও বায়ুস্থিত অক্সিজেন কার্বনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

কার্বনিক অ্যাসিড ব্যতীত বায়ুর আর একটি উপাদান হইল জল। বায়ুতে জলের স্বাভাবিক পরিমাণ ১'৪০ ভাগ। জলধারণের এই স্বাভাবিক ক্ষমতার চেয়ে বায়ুতে যদি জলের পরিমাণ বেশী হইয়া পড়ে তবে উহা আর্দ্র বায়ু বলিয়া পরিগণিত হয়। আর্দ্র বায়ু স্যাঁতসেঁতে ও ভিজা। এইরূপ বায়ু ঘাম শুকাইতে সাহায্য করে না। বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া যেমন খারাপ, সেইরূপ বায়ু অতিরিক্ত শুষ্ক হওয়াও ভাল নয়। শুষ্ক বায়ু আমাদের চামড়া শুকাইয়া দিতে চায়। শীতকালে, কখনও কখনও গ্রীষ্মকালেও বায়ু অতিরিক্ত শুষ্ক হইয়া পড়িলে চামড়ায় খড়ি উঠিতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুরু করে।

বায়ুসঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ শুষ্ক বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা বেশী থাকে। এক ঘরে বহু লোক ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিলে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। বদ্ধ ঘরের বায়ুতেও তাড়াতাড়ি অক্সিজেন ফুরাইয়া যায় এবং বাহির হইতে নতুন অক্সিজেনপূর্ণ বায়ু আসিবার সুযোগ পায় না বলিয়া বহুক্ষণ বদ্ধ ঘরে বসিয়া থাকিলে শরীর ক্লান্ত লাগে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা, হাই তোলা, বমি-বমি ভাব বোধ হইতে থাকে। যাহারা বহুদিন ধরিয়া বদ্ধ ঘরে বাস করে তাহাদের কর্মক্ষমতা কমিয়া যায়, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা, চর্মরোগ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বাড়িয়া এই সকল উপসর্গের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। শ্বাসের সঙ্গে উষ্ণ বা আর্দ্র বায়ু গ্রহণ করিলে কোন অনিষ্ট হয় না। উষ্ণ এবং আর্দ্র বায়ুর কুফল সর্বাপেক্ষা ত্বকের উপর বেশী অনুভূত হয়। আমাদের শরীর হইতে সর্বদাই তাপ উৎপন্ন হইতেছে। ঘামের সাহায্যে ত্বক্ এই তাপ বাহির করিয়া দিয়া দেহকে স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ ৯৮'৪ ডিগ্রীতে রাখিতে চেষ্টা করে। উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু ত্বকের এই কাজ ব্যাহত করে কিন্তু উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুকেই সঞ্চালিত করিতে পারিলে উহার কুফল অনেকাংশে দূরীভূত হয়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ গুমোট দিনের চেয়ে যেদিন বাতাস বহিতে থাকে সেদিন কাপড় কত তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। একই কারণে বায়ু-সঞ্চালনের ফলে আমাদের ঘাম দ্রুত উবিয়া যায়, শরীর শুষ্ক থাকে এবং দেহের তাপ স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়।

বায়ু আর এক উপায়ে আমাদের দেহের অনিষ্টসাধন করিতে পারে। বায়ুতে নানাপ্রকার রোগজীবাণু মিশিয়া গিয়া বায়ু দূষিত হয়। এইরূপ বায়ু প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করিলে আমরা নানারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে পারি। উন্মুক্ত স্থানের বায়ু অপেক্ষা বদ্ধ বায়ুতেই এই রোগজীবাণু থাকার সম্ভাবনা বেশী। এই ক্ষেত্রেও বায়ুকে যদি সঞ্চালিত করা যায় তবে ঘরের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু আনিয়া উহার স্থান অধিকার করিবে। গৃহে **বায়ুসঞ্চালনের প্রয়োজন অনুভূত হয় তিনটি কারণে**—গৃহের বায়ুর, (১) অতিরিক্ত উষ্ণতা এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা দূর করিবার জন্য, (২) বায়ুকে জীবাণুমুক্ত রাখিবার জন্য এবং (৩) বায়ু যাহাতে একস্থানে অধিকক্ষণ আবদ্ধ হইয়া না থাকিতে পারে তাহার জন্য।

বায়ু-সঞ্চালনের বিবিধ উপায়—প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম এই দুই উপায়ে বায়ু সঞ্চালিত হয়। গৃহে বায়ু সঞ্চালন অব্যাহত রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা—(১) বায়ু কতকগুলি গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র। গ্যাসীয় পদার্থের ধর্ম এই যে একটি অপরটির সংস্পর্শে আসিবামাত্র উহারা পরস্পরের সঙ্গে মিশিতে চায়। এই কারণে ঘরের এক কোণে একটি ধূপকাঠি জ্বালাইয়া রাখিলে দেখিবে ঘরের অন্য কোণগুলি হইতেও ঐ গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বায়ুর সংমিশ্রণ ধর্ম আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব এবং এই ধর্মবশেই বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের দূষিত বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া শেষোক্ত বায়ুকে বিশোধিত করে। প্রাকৃতিক উপায়ে গৃহে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্বদা বাসগৃহের প্রত্যেক কক্ষে প্রশস্ত এবং ঋজু ঋজু জানালা রাখিবে যাহাতে বাহিরের বায়ু একদিক হইতে প্রবেশ করিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

(২) বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং বাহিরের ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া সেই স্থান দখল করে। জলের মধ্য দিয়া কিভাবে তাপ-চলাচল করে লক্ষ্য করিয়াছ কি ? উনুনের উপর একটি হাঁড়িতে জল চাপাইলে নীচের জল প্রথমে গরম হয়। তারপর উপরকার জল নীচের দিকে যাইতে থাকে এবং নীচের জল উপরে উঠিয়া আসিতে শুরু করে। ইহার কারণ নীচের জল উত্তপ্ত হইয়াছে বলিয়া হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া আসে। একই কারণে গৃহের উত্তপ্ত বায়ু হাল্কা হইয়া উপরে চলিয়া যায় এবং বাহিরের ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া উহার স্থান দখল করে। গৃহের বায়ু চলাচলের পথ সুগম করিবার জন্য কক্ষের উপরিভাগে সর্বদা ঘুলঘুলি (ventilator) রাখিবে। এই ঘুলঘুলি দিয়া গৃহের উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারিবে।

(৩) নৈসর্গিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন ও বায়ু বিশোধনের তৃতীয় উপায় হইল গাছপালা। গাছপালা বায়ু হইতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস টানিয়া লইয়া বায়ুতে অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। বায়ু-বিশোধনের জন্য গৃহে সর্বদা কিছু গাছপালা থাকা বাঞ্ছনীয়। গৃহ নির্মাণের পূর্বেই বাড়ির নকশা স্থির করিয়া লইয়া কিছু গাছপালা লাগাইয়া দিবে।

কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা—তোমরা জান উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। বায়ুর শীতলতা রক্ষা করিতে পারিলে আমাদের দেহ

সুস্থ থাকে। বায়ুর শীতলতা রক্ষা করা বায়ু-সঞ্চালন সমস্যার অন্তর্গত। তিনটি উপায়ে আমরা বায়ুর শীতলতা রক্ষা করিতে পারি :—

(১) উষ্ণ বায়ু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া ; (২) বায়ুর উষ্ণতা কমাইয়া দিয়া এবং (৩) বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া।

(১) উষ্ণ বায়ু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিবার উপায়—দিনের বেলা সূর্যের তাপ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষগুলি যখন গরম হইতে শুরু করে ঠিক তখন দরজা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিবে। বন্ধ ঘরে বায়ু-চলাচলের জন্য ঘুলঘুলির ব্যবস্থা রাখিবে। স্মরণ রাখিও বন্ধ কক্ষে পাখা চালাইলে বদ্ধ বায়ু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে না। পাখা কেবল কক্ষে বায়ু সঞ্চালিত করিতে পারে কিন্তু বায়ু বিতাড়িত করিতে পারে না।

(২) বায়ুর উষ্ণতা কমাইবার উপায়—গ্রীষ্মকালে সমস্ত কক্ষের দরজা জানালা যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় তবে স্বভাবতই বায়ু-চলাচল ব্যাহত হইবে। এইজন্য দুই একটি জানালা উন্মুক্ত রাখিয়া তাহাতে খসখস টাঙ্গাইয়া দিয়া খস-খসে জল ছিটাইবার ব্যবস্থা করিলে ঘরের বায়ুর উষ্ণতা কমিবে।

(৩) বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া কিংবা ঘরে এয়ার কনডিশনের ব্যবস্থা করিয়া কৃত্রিম উপায়ে কক্ষে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিবে। যে অঞ্চলে গৃহ নির্মাণ করিবে সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকিলে টানা পাখা নতুবা হাত-পাখার ব্যবস্থা করিতে পার।

জল-সরবরাহ (Water-supply)—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জলের প্রয়োজনীয়তা কতখানি এবং কোন্ কোন্ উপায়ে আমরা জল পাইয়া থাকি তাহা পরে বর্ণিত হইবে। গৃহ নির্মাণের সময় বিশুদ্ধ জল সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া লইয়া গৃহ নির্মাণের কাজে হাত দিতে হয়। একমাত্র বিশুদ্ধ জলই পানীয় জলরূপে ব্যবহারের উপযুক্ত। শহরের বাড়িতে বিশুদ্ধ জল পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ, পৌরসভা এই জল-বিশোধন ও জল সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে।

গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। সাধারণত পুষ্করিণী, কূপ বা টিউবওয়েলের জলই গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হয়।

পুষ্করিণী—গ্রামাঞ্চলে যদি বাড়ি তৈয়ারী করিয়া থাক এবং পুষ্করিণীর জল ব্যতীত অপর কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকে তবে সর্বপ্রথমে শুধুমাত্র

পানীয় জলের জন্য একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া লইবে। পুষ্করিণীতে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, মানুষ ও গোমহিষাদির স্নান ইত্যাদি কোন কাজই করা চলিবে না। পুষ্করিণীর চারপাশ খুব ভাল করিয়া বাঁধাইয়া চতুর্দিকে বেড়া দিয়া দিবে যাহাতে বৃষ্টি বা বন্যার জল আসিয়া গড়াইয়া পড়িতে না পারে কিংবা কোন পশুপাখী আসিয়া জলে মুখ ডুবাইতে না পারে। পুষ্করিণীর আশেপাশে কোন রকম গাছপালা রাখিবে না। গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়া জলে পচিলে জল দূষিত হইবে। এতদ্ব্যতীত পুষ্করিণীতে কোনরূপ ঘাট রাখিবে না, শুধু একটি উঁচু প্লাটফরম করিয়া দিবে। ঐ প্লাটফরমের উপর
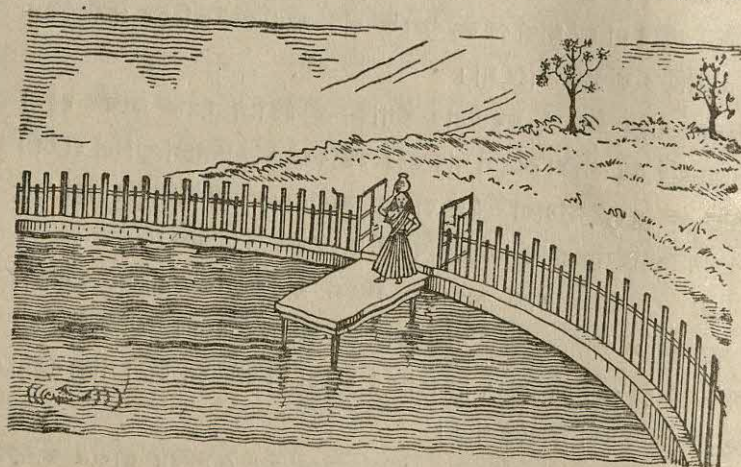
পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত পুষ্করিণী

দাঁড়াইয়া সকলে জল তুলিবে এবং জলে কেহ আর হাত পা ডুবাইবার সুযোগ পাইবে না। বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুষ্করিণীতে সর্বদা মাছ রাখিবে। জলের অনেক ময়লা ও রোগজীবাণু খাইয়া ফেলিয়া মাছ জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সহায়তা করে। পল্লীগ্রামে এইরূপ একটি পানীয় জলের পুষ্করিণী থাকিলে এক সঙ্গে বহু পরিবারের পানীয় জলের সংস্থান হয়। একক প্রচেষ্টার চেয়ে যৌথ উদ্যমে এইরূপ একটি পুষ্করিণী কাটাইবার ব্যবস্থা করা ভাল।

কূপ—পানীয় জলের অন্যতম উৎস হইল ইঁদারা বা কূপ। পানীয় জলের কূপ খুব গভীর হওয়া উচিত। কূপের অভ্যন্তর ভাগ সিমেণ্ট কংক্রিট ইত্যাদি কোন অচ্ছিদ্র উপাদানে নির্মিত হওয়া চাই। কূপের গায় কোন ফাটল থাকিবে না। গভীর কূপেও যদি ফাটল থাকে তবে ঐ ফাটলে গাছপালা জন্মিয়া এবং

কূপের জলে গাছের পাতা পচিয়া জল দূষিত হইতে দেখা যায়। একই কারণে কূপের নিকটে কোন গাছ রাখিবে না। গাছের পাতা পচিয়া জল দূষিত করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত কাক, চিল ইত্যাদি পাখীও গাছের উপরে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারে। কূপের নিকটে বসিয়া কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজ বন্ধ করিয়া দিবে। কূপের চারিপাশ পাকা এবং ঈষৎ ঢালু করিয়া বাঁধাইয়া দিবে এবং উহার চতুর্দিকে একটি পাকা নর্দমা তৈয়ারী করিয়া দিবে যাহাতে জল গড়াইয়া ঐ নর্দমা দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। একটি গভীর পাকা কূপ বহু পরিবারের প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

নলকূপ—পানীয় জলের জন্য নলকূপের বহুল প্রচলন দেখা যায়। নলকূপ খুব গভীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। অগভীর নলকূপের জল অগভীর কূপের জলের মতই দূষিত।
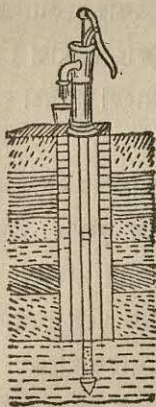
নলকূপ

বিশুদ্ধ জল ভাবিয়া যে জল গ্রহণ করিবে তাহা পানের পূর্বে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া লইবে।

পরীক্ষা: জলে পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশ্রিত করিয়া দেখ জলের বর্ণ ঈষৎ গোলাপী দেখাইতেছে কিনা। গোলাপী না হইয়া যদি বাদামী বর্ণ ধারণ করে তবে বুঝিবে জল বিশুদ্ধ নয়।

জল ফুটাইয়া দেখ নীচে কোন তলানি পড়িয়া রহিয়াছে কিনা। তলানি থাকিলে বুঝিবে জল বিশুদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ জল অনেক সময় বস্ত্রাদি কাচিবার অনুপযুক্ত থাকে। এইরূপ জলকে কঠিন জল বলে। জলের কাঠিন্য বুঝিতে হইলে জলে সাবান গুলিয়া দেখ ফেনা হইতেছে কিনা। জলে যদি ফেনা দেখা না যায় তবে জল কঠিন বলিয়া জানিবে।

গৃহের অনাময় ব্যবস্থা (Sanitation)—পরিবারের লোকদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে গৃহের অনাময় ব্যবস্থার উপর। বাড়ির এখানে ওখানে খানিকটা আবর্জনা জমিয়া থাকিলে উহা যে কেবল গৃহের সৌন্দর্যহানি করে তাহা নয়, এরূপ আবর্জনা নানারূপ রোগজীবাণুর আশ্রয়স্থল। অনেক বাড়ির গৃহিণীরা নিজেদের চোখের সামনে আবর্জনা দেখিতে না পাইলেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাহারা উনুনের ছাই, মাছের আঁশ, তরকারির খোসা রাস্তায় নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। রাস্তায় চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই অনেক সময় ডিমের খোসা, ফলের

খোসা তোমাদের নজরে পড়িয়া থাকে। এই সকল আবর্জনা রাস্তায় ফেলা অত্যন্ত বদ অভ্যাস। গৃহ নির্মাণের সময় বাড়িতে অনাময় ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া লইবে।

গৃহের ময়লাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করিতে পারি—(১) শুষ্ক ময়লা যথা—মাছের আঁশ, তরকারির খোসা, উনুনের ছাই ইত্যাদি; (২) তরল ময়লা অর্থাৎ ঘর ধোওয়া, বাসন মাজা, কাপড় কাচা জল; (৩) মানুষের মলমূত্রাদি।

শুষ্ক আবর্জনা—আবর্জনা জমিতে থাকিলে অবশেষে দুর্গন্ধ হয় এবং স্বভাবতই মশা, মাছি, আরশুলা ও ইঁদুরের উৎপাত বৃদ্ধি করে। শুষ্ক আবর্জনা অপসারণের সর্বাপেক্ষা সহজ ও কার্যকরী পদ্ধতি হইল পোড়াইয়া ফেলা। বাড়ি নির্মাণের সময় আবর্জনা রাখিবার জন্য একটি ঢাকনাওয়ালা চৌবাচ্চা তৈয়ারী করিয়া লইতে পার অথবা একটি কাঠের বাক্স কিংবা ঝুড়িও রাখা চলিতে পারে। সমস্ত আবর্জনা উহাতে জমাইয়া রাখিয়া সপ্তাহ কিংবা পক্ষকাল পরে পোড়াইয়া ফেলিবে।

তরল আবর্জনা—তরল ময়লা জল বলিতে আমরা রান্নাঘরের বাসন মাজা, তরকারি ও ঘর ধোয়া জল, স্নানের জল, কাপড় কাচা জলকে বুঝি। মাদ্রাজ, কলিকাতা, বম্বে ইত্যাদি বড় বড় শহরে জলবাহিত প্রণালীর সাহায্যে তরল ময়লা এবং মলমূত্রাদি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক গৃহে তরল ময়লা (sullage) এবং মলমূত্রাদি (sewage) নিষ্কাশনের জন্য পাইপ থাকে। এই পাইপগুলি রাস্তার নীচের মোটা পাইপে গিয়া পড়ে। সেখান হইতে আবর্জনা নদীতে কিংবা সমুদ্রে নিয়া ফেলা হয়। তরল আবর্জনা ফেলিবার পাইপে কোন প্রকার শুষ্ক আবর্জনা ফেলিতে নাই। তবে পাইপের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ময়লা নিঃসরণে ব্যাঘাত ঘটিবে। তরল আবর্জনা নিষ্কাশনের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা হইল জলবাহিত প্রণালী।

পল্লী অঞ্চলে কিংবা ছোট ছোট শহরে যেখানে জলবাহিত প্রণালীর সুবিধা নাই সেখানে নর্দমার সাহায্যে জল নিকাশের ব্যবস্থা করিবে। নর্দমা কাঁচা এবং পাকা দুই প্রকারই করা যায়। তবে কাঁচা নর্দমাতে বর্ষার জল দাঁড়াইয়া গেলে বাড়িতে সহজেই মশা মাছির সৃষ্টি হয়। একান্তই কাঁচা নর্দমা তৈয়ারী করিতে হইলে উহার পাড় যাহাতে ধ্বসিয়া না পড়ে এইজন্য শক্ত মাটি দিয়া পাড় তৈয়ারী করিয়া দিবে। পাকা নর্দমাও অত্যন্ত গভীর হইলে এবং জল ব্যতীত অন্য কোন রকম আবর্জনা ফেলিলে উহা ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত ও

অস্বাস্থ্যকর হয়। কাঁচা নর্দমা মাঝে মাঝে কাটাইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

জলবাহিত প্রণালী
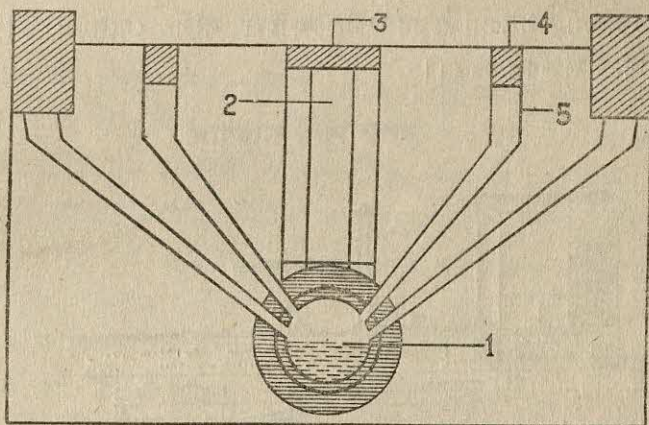
1. স্থয়ার অর্থাৎ এখানে ময়লার সমস্ত পাইপ আসিয়া মেশে;
2. ম্যানহোল; 3 এবং 4. ঝাঁঝরি; 5. নর্দমা

মলমূত্রাদি নিষ্কাশন—বড় বড় শহরে তরল ময়লার মত মলমূত্রাদিও জলবাহিত প্রণালীর সাহায্যে নিষ্কাশন করা হয়। যে অঞ্চলে গৃহ নির্মাণ করিবে সেখানে এইরূপ জলবাহিত প্রণালীর স্থবিধা না থাকিলে মলশোধনী পায়খানার ব্যবস্থা করিতে পার। মলশোধনী পায়খানায় প্রত্যহ প্রচুর জল ঢালিবে এবং কোন প্রকার নির্বীজক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ জলবাহিত প্রণালীর মত মলশোধনী পায়খানায় মল অপসারণের স্থবিধা নাই। পায়খানার চৌবাচ্চায় মলগুলি সঞ্চিত হইয়া থাকে। তারপর ধীরে ধীরে উহাতে একপ্রকার পোকা জন্মায়। পোকাগুলি ময়লা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। নির্বীজক ঔষধ ঢালিলে ঐ পোকা জন্মিতে পারে না কিংবা জন্মিলেও ঔষধের গুণে মরিয়া যায়। তখন চৌবাচ্চা শীঘ্রই মলে ভর্তি হইয়া যায় এবং পায়খানা অকেজো হইয়া পড়ে।

কোন কোন অঞ্চলে খাটা পায়খানার ব্যবস্থা থাকে। মেথর আসিয়া পায়খানা হইতে মলমূত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। গৃহে এইভাবে মলমূত্র অপসারণের ব্যবস্থা করিলে পায়খানাটি খুব উঁচু করিয়া এবং শয়নগৃহ হইতে

অনেকখানি দূরে নির্মাণ করিবে। বসিবার স্থানটি মল ধরিবার পাত্র হইতে অনেক উপরে থাকিবে। মলের পাত্রটির চারিধার দেওয়াল দিয়া খুব ভাল করিয়া গাঁথিয়া দিবে এবং মেথর যাহাতে মল সংগ্রহ করিতে পারে এইজন্য একটি দরজা রাখিবে। সারাদিন ঐ দরজা বন্ধ থাকিলে এবং মেথর আসিয়া প্রত্যুষে কিংবা সন্ধ্যাবেলা ঐ মল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলে এইরূপ খাটা পায়খানা অস্বাস্থ্যকর হয় না।

মলশোধনী পায়খানা
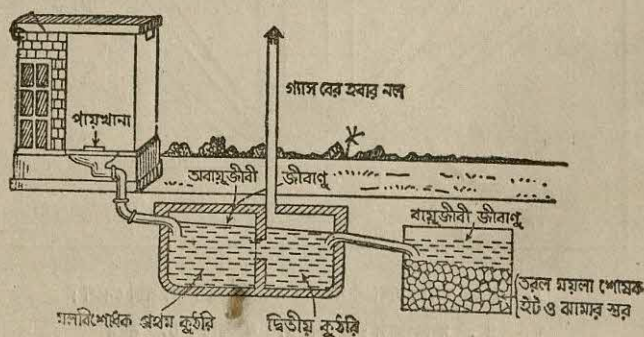
পায়খানার মল আসিয়া মলবিশোধক কুঠরি অর্থাৎ চৌবাচ্চায় জমা হইয়া থাকে।

পল্লী অঞ্চলে গৃহ নির্মাণ করিতে গিয়া যদি দেখ তোমার মলশোধনী পায়খানা করিবার মত সঙ্গতি নাই, অথচ মেথর আসিয়াও মল লইয়া যায় না, সেরূপ ক্ষেত্রে বাড়িতে খাদ বা গর্ত পায়খানা নির্মাণ করিয়া লইবে। এইরূপ পায়খানার বসিবার আসনটি মাছি নিবারক (fly proof) হইলেই ভাল হয়। প্রত্যহ মলত্যাগের পর পায়খানায় খানিকটা চুন কিংবা মাটি ঢালিয়া দিবে। পায়খানা ভরাট হইয়া আসিলে গর্ত বুজাইয়া দিয়া নতুন গর্ত কাটিয়া লইবে।

আলোর বন্দোবস্ত (Lighting)—আলোর সমস্যাও একটি কম বড় সমস্যা নয়। সব রকম আলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোকই সবচেয়ে সুবিধানজক। বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলোকের সুবিধা থাকিলে পাখা, হিটার, বিদ্যুৎচালিত ইস্ত্রি রাখা যায়। এতদ্ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের সাহায্যে সমস্ত বাড়িতে জল সরবরাহেরও বন্দোবস্ত করা যায়। বিদ্যুতের সুবিধা

ভোগকরা যায় এইরূপ অঞ্চল বাছিয়া লইয়া গৃহনির্মাণ করাই সঙ্গত। উহা না পাইলে লণ্ঠন ও প্রদীপের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

গৃহ প্রসাধন

শিল্প-সৃষ্টি মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ হাতের কাছে যাহা পায় তাহাকেই সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। কুম্ভকার মাটির গায় কয়েকটি আঁচড় কাটিয়া সুন্দর ঘট পট তৈয়ারী করে, চিত্রকর কাগজের গায় রেখা টানিয়া দৃষ্টিমধুর চিত্রাঙ্কন করে, ছুতার কাঠ কাটিয়া চমৎকার আসবাব তৈয়ারী করে, স্থপতি পাথর খুঁদিয়া মূর্তি গড়ে, মানুষের স্বভাবই হইল অতি সাধারণ জিনিসকে সুন্দর করিয়া তোলা। যে গৃহে আমরা বাস করি আমাদের পরিবেশের মধ্যে সেই গৃহই হইল সবচেয়ে পরিচিত এবং নিকটতম বস্তু। একটুখানি প্রসাধনের সাহায্যে উহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে পারিলে সমস্ত জীবনযাত্রা মনোরম হইয়া ওঠে। সব সময়ই যে মানুষ তাহার রুচিমাফিক গৃহ পায় তাহা নয়। অতি নোংরা, অপরিচ্ছন্ন গলিতে তাহার বাসগৃহ হইতে পারে, বাড়ির নকশা ও পরিকল্পনা একেবারে রুচিবিগর্হিত হইতে পারে কিন্তু তবুও ঠিকভাবে বাড়িটি সাজাইতে পারিলে আভ্যন্তরীণ পরিবেশটি অন্তত চক্ষু ও অন্তরের তৃপ্তিদায়ক হইতে পারে।

গৃহসজ্জা কারুশিল্পের (fine arts) অন্তর্গত নয়। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত কিংবা সাহিত্য রচনা, স্থাপত্য বিদ্যা ইত্যাদি সকলই কারুশিল্পের অন্তর্গত, কেননা এই সব ক্ষেত্রে শিল্প শিল্পীর অন্তরের অনুপম সৃষ্টি। পরন্তু গৃহসজ্জা আলঙ্কারিক শিল্প (decorative art) বলিয়া গণ্য। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পবস্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ উহা আপনাতে আপনি পূর্ণ। দর্শকের লক্ষ্যস্থল ঐ শিল্পদ্রব্যটি। আলঙ্কারিক শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক্। শিল্পী এখানে নতুন জিনিস সৃষ্টি করেন না, অপরের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য উহাতে কতকগুলি আলঙ্কারিক বস্তু সংযোগ করেন মাত্র। এই বস্তুগুলি সুন্দর বটে তবে উহাদের উদ্দেশ্য অন্য বস্তুর সৌন্দর্য বাড়ান। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে একজন চিত্রকর অনেক চিত্র আঁকিতে পারেন এবং প্রত্যেকটি চিত্রই হয়ত শিল্প হিসাবে অতুলনীয় কিন্তু তাই বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ঐরূপ অনেক চিত্র রাখিলে স্বভাবতই কক্ষের সৌন্দর্য ব্যাহত হইবে। শুধু চিত্র

সন্নিবেশের ক্ষেত্রে নয়, আসবাবপত্রের নির্বাচন, পুষ্পবিন্যাস, পর্দার রং নির্বাচন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই গৃহ-প্রসাধনকারীর নিকটে গৃহই হইবে মুখ্য বস্তু এবং গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় অলঙ্কার সংযোগ করা হইবে উহারা সর্বদাই গৌণ ভূমিকা অবলম্বন করিবে।

আলঙ্কারিক শিল্পের মূল নীতি—কারুশিল্পের সঙ্গে প্রত্যেক আলঙ্কারিক শিল্পের একটি ব্যাপারে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের মূল নীতিগুলিই এক। কারুশিল্পের মতই অলঙ্কার শিল্পের মূল নীতি হইল পাঁচটি—সঙ্গতি (proportion), সামঞ্জস্য (balance), সমন্বয় (harmony), ছন্দ (rhythm) ও বর্ণ (colour)। এই পাঁচটির সমাবেশ না ঘটিলে প্রত্যেক শিল্পসজ্জাই ব্যর্থ হইয়া যায়।

(১) **সঙ্গতি** (Proportion)—দুইটি জিনিসের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে মিত্রতা বা মিলনের নামই সঙ্গতি। এই মিত্রতা পূর্ণের সঙ্গে অংশের কিংবা অংশের সঙ্গে অংশের মধ্যেও সংঘটিত হইতে পারে। গৃহ-প্রসাধনে এই সঙ্গতি বা মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলা উচিত।

(২) **সামঞ্জস্য** (Balance)—কারুশিল্পের ক্ষেত্রেই হউক কিংবা আলঙ্কারিক শিল্পের ক্ষেত্রেই হউক শিল্পবস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকিলে সমস্ত জিনিসটির সৌন্দর্য যথাযথ ফুটিয়া ওঠে না। গৃহ-প্রসাধনের সময় যখন আসবাব বা অন্যান্য আকর্ষণীয় বস্তু সমাবেশের বাহুল্যে সমস্ত মনটা একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তখন তাহার বিপরীত অংশে কিছু রাখিয়া কক্ষের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়। এই ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সর্বদা যে দুই দিকে একই মূল্যের বা একই ওজনের বস্তু সমাবেশ করিতে হইবে এরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। দুই দিকে দ্রষ্টার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একদিকে ভারী বস্তু এবং বিপরীত দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু সমাবেশ করিয়াও এই সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। সামঞ্জস্য রক্ষার দুই জাতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

(ক) চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য (formal balance)

(খ) অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সামঞ্জস্য (informal balance)

চাক্ষুষ সামঞ্জস্য (Formal balance)—কেন্দ্র স্থির রাখিয়া দুই দিকেই যদি সমান গুরুত্বের জিনিস রাখা যায় তবে তাহাকেই বলে চাক্ষুষ সামঞ্জস্য। যেমন ছেলেদের একটি পড়ার ঘরে যদি ঠিক একই ওজনের একই নক্শার চারখানি চেয়ার সাজান থাকে কিংবা একটি টেবিলের উপর কেন্দ্র ঠিক করিয়া সমান

দূরত্ব বজায় রাখিয়া যদি একই নক্‌শার সমান মাপের সমান ওজনের দুইটি ফুলদানী সাজান হয় তবে উহাদের আমরা প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য বলিব। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুই দিককার বস্তুর গুরুত্ব সমান দেওয়া হইয়াছে।

অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সামঞ্জস্য (Informal balance)—গৃহ প্রসাধনের বেলায় যখন সমান গুরুত্বের জিনিস দিয়া ঘর না সাজাইয়া একদিককার প্রসাধনে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি ঐ দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং অন্যদিকে সাদামাটা কিছু রাখিয়া কক্ষের ভারসাম্য বজায় রাখা হয় তখন তাহাকেই বলে অপ্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য। গৃহ-প্রসাধনে যদিও প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য রক্ষার রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে তবু এই প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্যের নীতি যদি সমস্ত বাড়িটিতে মানিয়া চলা হয় তবে তাহা নিতান্তই ছাঁচে ঢালা সাজ বলিয়া প্রতিভাত হয়। ছাঁচে ঢালা একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন সজ্জা একঘেয়ে খাদ্যের মতই বিরক্তিকর।

(৩) **সমন্বয়** (Harmony)—সমন্বয় শিল্পতত্ত্বের অন্যতম মূলনীতি। গৃহে শুধুমাত্র কতকগুলি দামি দামি আসবাব, নামজাদা চিত্রকরের আঁকা তৈলচিত্র ইত্যাদি থাকিলেই গৃহ-প্রসাধনের পক্ষে যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে ভাবা ভুল। আলঙ্কারিক শিল্পের আসল কৃতিত্ব যাবতীয় সামগ্রীর একত্র সন্নিবেশে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় বা ঐক্য সাধনে।

সমন্বয় ও সঙ্গতির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা কঠিন। ইহারা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল এবং উভয়ের পরিপূরক। তবে সঙ্গতির চেয়ে সমন্বয়ের সূত্রটি আরও ব্যাপক এবং আরও গভীর। একটি বস্তুরই পূর্ণের সঙ্গে অংশের কিংবা এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের মিত্রতার নাম সঙ্গতি, পরন্তু গৃহে যতগুলি শিল্পবস্তুর সমাবেশ ঘটিয়াছে উহাদের প্রত্যেকের মিত্রতার নাম সমন্বয়। গৃহে গঠনের সঙ্গে উপাদানের, আসবাবপত্রের সঙ্গে বাড়ির কাঠামো ও আয়তনের, পর্দার রং-এর সঙ্গে দেওয়ালের রং ও আলোর রং-এর, গৃহের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে গৃহের কাঠামো ও নকশার সঙ্গতি, এক কথায় সকলের সঙ্গে সকলের মিত্রতা ও সাযুজ্যকেই বলে সমন্বয়। এই সমন্বয়ের অভাবে গৃহ-প্রসাধনের অঙ্গহানি ঘটে।

(৪) **ছন্দ** (Rhythm)—গৃহ-সজ্জার আর একটি লক্ষ্য হইল ছন্দ রক্ষা। এই ছন্দগতি বা ছন্দলীলা ঠিক কি জিনিস তাহা কথায় প্রকাশ করা বড় কঠিন। সঙ্গীত ও নৃত্যের ছন্দ আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। নানা বিচিত্র

ভঙ্গীতে, নানা তাল এবং বিরামের মধ্য দিয়া ছন্দ আপনাকে প্রকাশ করে। ছন্দের এই উচ্চ-নীচ গতি, এই নতুনত্বই ছন্দের প্রধান আকর্ষণ। গতি (movement) এবং পুনরাবৃত্তি (repetition) হইল ছন্দের প্রাণ।

চলিতে চলিতে ছন্দের গতি স্থির হইয়া যায়। ইহার নাম যতি। যতির শেষে আবার গতির পুনরাবৃত্তি ঘটে, অর্থাৎ গতির শেষে কিছুক্ষণ বিরাম, আবার গতি। গতি এবং যতি উভয়ে মিলিয়া ছন্দ। এই ছন্দ কারুশিল্পে এবং প্রত্যেক আলঙ্কারিক শিল্পেই অনুভূত হয়। গৃহ-প্রসাধনের বেলাতেও উহার চিত্রসন্নিবেশে, আসবাবপত্র সংস্থানে এই ছন্দ মানিয়া চলা দরকার। সমস্ত কক্ষে যতগুলি বস্তু সাজান হইবে একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং উহাদের মধ্যে পরিমিত ব্যবধান রাখিয়া চল। এই যতির নিয়ম মানিয়া চলিলে গৃহের কোন এক স্থানে দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিবে না। সমস্ত কক্ষটি যেন একটি ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইবে এবং কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চোখ নাচিয়া বেড়াইবে। প্রত্যেক বার যতির পরেই একটি নতুন কিছু দেখার জন্য মন প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাঝখানের এই যতি বা বিরাম না থাকিলে এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্য অনুভব করা যায় না এবং সৌন্দর্যবোধ পীড়িত হয়। যতি আছে বলিয়াই বিভিন্ন বস্তুর সৌন্দর্য বিশেষভাবে উপভোগ করা যায়।

(৫) **বর্ণ** (Colour)—চিত্রশিল্পের মতই গৃহ-প্রসাধনেও বর্ণ বা রং এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মানুষ যে কোন প্রসাধনের মূল্য নির্ণয়ের পূর্বে বর্ণের শক্তি অনুভব করে। শিশুরা অল্প বয়সেই বর্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। মানুষের উপর বর্ণের প্রভাব বেশী। গানে সুর সংযোগ করিলে যেমন নতুন মূল্য পাইয়া উহা উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, গৃহ-প্রসাধনে তেমনি উপযুক্ত বর্ণবিন্যাস করিতে পারিলে উহা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া তোলে। কক্ষের মেঝে, দেওয়াল হইতে শুরু করিয়া আসবাবপত্র, পর্দা, বাতি প্রভৃতির রং নির্বাচনে মুন্সিয়ানার দরকার।

বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যরশ্মির মধ্যে সাতটি বর্ণ লুকানো রহিয়াছে। এই সাতটি বর্ণ হইল—বেগুনী (Violet), তুঁতে (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হরিদ্রা (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red)। এই সাতটি বর্ণের মধ্যে প্রথম তিনটিকে বলা হয় মূল বর্ণ বা শুদ্ধ বর্ণ (Primary colour), কারণ ইহারা অপর কোন বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় না। বাকী

চারিটিকে বলা হয় গৌণ বর্ণ (Secondary colour), কারণ ইহারা অন্য বর্ণের মিলনে উৎপন্ন হয়, যেমন লাল এবং নীল বর্ণের মিশ্রণে বেগুনী বর্ণ, হরিদ্রা ও নীল বর্ণের মিশ্রণে সবুজ বর্ণ, নীল ও সবুজবর্ণের মিশ্রণে তুঁত বর্ণ এবং লাল ও হরিদ্রা বর্ণের মিশ্রণে কমলা বর্ণ উৎপন্ন হয়। সাত বর্ণের একত্র সংযোগে শ্বেত বর্ণ উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত বর্ণের অভাবে কৃষ্ণবর্ণ উৎপন্ন হয়। উচ্চ স্বরের শুদ্ধ বর্ণকে বলে উত্তপ্ত বা তেজী বর্ণ (Warm colour) এবং নীচু স্বরের মিশ্র বর্ণকে বলে স্নিগ্ধ বা শীতল বর্ণ (Cool colour)। সাধারণত তেজী বর্ণ আমাদের চোখ ঝলসাইয়া চক্ষুকে পীড়িত করিয়া তোলে এবং স্নিগ্ধ বর্ণ আমাদের চক্ষু জুড়ায়, অন্তর তৃপ্ত করে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন বর্ণকে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা থাকে। বস্তু যে বর্ণটি আত্মসাৎ করিতে পারে না সেই বর্ণই বস্তুর দেহে প্রতিফলিত হয়। গাঁদাফুল সমস্ত বর্ণ আপনাতে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, কেবল হরিদ্রা বর্ণটি পরিপাক করিবার ক্ষমতা উহার নাই তাই গাঁদা ফুল আমাদের চোখে হলুদ দেখায়। যে বস্তু কোন বর্ণই আত্মসাৎ করিতে পারে না উহাকে সাদা দেখায় এবং যে বস্তু সব বর্ণ আত্মসাৎ করিয়া বসে উহাকে আমরা কালো দেখি। সাত বর্ণের নানা অনুপাতের মিশ্রণে আমরা শত শত বর্ণ দেখি।

বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে নানাজাতীয় সম্বন্ধ আছে। কতকগুলি বর্ণের মধ্যে মিত্রতার (harmony) সম্পর্ক এবং কতকগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্যের (contrast) সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্ক অনেকটা সঙ্গীত শাস্ত্রের বাদী বিবাদী স্বরের মত। মিত্রভাবাপন্ন বর্ণগুলি পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে, আর বিপরীত বর্ণগুলি একে অপরকে বিদ্বেষ করে, একের প্রভাবের বিরুদ্ধে অপরে বিরুদ্ধাচরণ করে।

বিবাদী বর্ণগুলি পরস্পরের বিরোধিতা করিলেও বিবাদী বর্ণের সমন্বয়ে ও সম্মিলনে পরস্পরের বিবাদ তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাহারা একে অপরের পরিপূরক বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপ রক্তবর্ণ নীলাভ সবুজ বর্ণের পূরক, কমলালেবু বর্ণ সবুজাভ নীল বর্ণের পূরক, হলুদ বর্ণ ঘন নীল বর্ণের পূরক, সবুজাভ হলুদ বর্ণ বেগুনী বর্ণের পূরক, সবুজ বর্ণ পিঙ্গল বর্ণের পরিপূরক। এইখানে পরিপূরক বর্ণের স্বল্প কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিচক্ষণ শিল্পীরা বর্ণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আপনার রুচিমত গৃহ প্রসাধন করিবেন। গৃহপ্রসাধনে রং-এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

অলঙ্কার শিল্পের মূল নীতিগুলি আলোচিত হইল। এইবার গৃহপ্রসাধনের কয়েকটি বিশেষ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

উপরোক্ত নীতিগুলি কারুশিল্প এবং আলঙ্কারিক শিল্পের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। ইহাদের স্মরণ রাখিয়া সব রকমের অলঙ্কার শিল্পের কাজে হাত দিতে হয়। তবে গৃহপ্রসাধনের আবার নিজস্ব কতকগুলি নিয়ম রহিয়াছে। সেগুলি হইল বর্জন (elimination), পুনর্বিন্যাস (rearrangement) ও গোপন (concealment)

বর্জন—গৃহ প্রসাধনের প্রথম সূত্র হইল বর্জন। প্রত্যেক বাড়িতেই কিছু না কিছু প্রাচীন ঐতিহ্যমূলক জিনিস থাকে যাহার সঙ্গে বাড়ির লোকদের একটা আবেগ জড়িত থাকে। ঘর সাজাইবার সময় তাহারা সচরাচর এইসব জিনিসগুলি বাদ দিতে চান না। কিন্তু উহারা যদি কক্ষের সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক না হয় তবে নির্মম হস্তে এইসব জিনিসকে বর্জন করিতে হয়।

পুনর্বিন্যাস—বরাবর একইভাবে জিনিসপত্র সাজাইয়া রাখিলে প্রসাধন একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। তাই মাঝে মাঝে বাড়ির জিনিসপত্র অদলবদল করিয়া সাজাইলে চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হইয়া ওঠে।

গোপন—গৃহপ্রসাধনের তৃতীয় এবং শেষ নীতিটি হইল গোপন। গৃহের কোন গঠনগত ত্রুটি কিংবা দৈন্য গোপন করা প্রসাধনকারীর অন্যতম দায়িত্ব। যেমন, ঘরে ভাঙাচোরা দেওয়াল থাকিলে ওয়ালপেপার দিয়া ঢাকিয়া দিয়া, পুরাতন কিংবা বাড়তি জিনিসগুলি পর্দা দিয়া আড়াল করিয়া গৃহে অনাড়ম্বর সৌন্দর্য ফুটান যায়। বস্তুত কি বর্জন করিব, কি গোপন করিব এবং হাতের কাছে যে সব প্রসাধনসামগ্রী রহিল উহাদের কিভাবে পুনর্বিন্যাস করিব তাহারই উপর নির্ভর করে গৃহপ্রসাধনের সাফল্য।

রং নির্বাচন—শীতপ্রধান দেশের অনেক পাকা বাড়িতে কাঠের মেঝে দেখা যায়। বাড়ির ভিতের উপরে উঁচু করিয়া কাঠের পাটাতন তৈয়ারী করিয়া মেঝে প্রস্তুত হয়। এইভাবে ভিত এবং মেঝের ভিতরে যে ফাঁক থাকিয়া যায় উহাকে অনায়াসে গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহার করা চলে। এতদ্ব্যতীত গৃহ গরম রাখিবার জন্য সেখানে বৈদ্যুতিক চুল্লীও রাখা যায়।

কাঠের স্বাভাবিক রং যদি সুন্দর হয় তবে অপর কোন রং লাগাইবার দরকার নাই। মেঝে শুধুমাত্র বার্নিশ করিয়া লইলেই চলে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে কাঠের মেঝে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কারণ, কাঠের ফাঁকের ভিতর

দিয়া পোকামাকড় ঢুকিয়া সহজেই বাসা বাঁধে। সেইজন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বাড়িগুলির মেঝে সাধারণত পাকা হয় এবং ঐরূপ মেঝে রং করা দরকার। রং নির্বাচনের পূর্বে কোন রংএর কি প্রভাব তাহা জানিয়া লওয়া উচিত। পূর্বেই বলিয়াছি উচ্চ স্বরের শুদ্ধ বর্ণকে তেজী বলা হয়। তেজী বর্ণ সর্বদা উত্তাপসূচক। ইহারা মানুষের স্নায়ুগুলিকে সহজেই পীড়িত করিয়া তুলিতে চায়। মিশ্র বর্ণগুলি আবার স্নিগ্ধ আবহাওয়া সৃষ্টি করে। তবে নীল বর্ণ তেজী বর্ণগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হইলেও হাল্কা নীল স্নিগ্ধ এবং তৃপ্তিকর। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মেঝে ও দেওয়ালের রং হওয়া উচিত হাল্কা, শান্ত ও স্নিগ্ধ। কক্ষের উপযোগিতা অনুযায়ীও রং নির্বাচন করিতে হয়। যেমন শয়নকক্ষ ও রোগি কক্ষের রং হওয়া উচিত হাল্কা ও স্নিগ্ধ। পরন্তু শিশুদের ক্রীড়াগারের রং হইবে উজ্জ্বল ও সজীব। ধূসর কিংবা কালো রং সহজেই বিষন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, শিশুর মনে কর্মের প্রেরণা আনে না। তবে গৃহের রং নির্বাচনের ব্যাপারে কোন একটি নীতি অনুসরণ করা যায় না। ব্যক্তিগত রুচিই হইল আসল কথা। তা ছাড়া কোন্ কক্ষে কতখানি সূর্যালোক পড়ে তাহার উপরেও বাড়ির রং অনেকখানি নির্ভর করে। প্রচুর সূর্যালোকযুক্ত কক্ষের রং হইবে হাল্কা ও স্নিগ্ধ, আবার ছায়াঘেরা স্বল্পালোকযুক্ত কক্ষের রং হওয়া উচিত সাদা। অন্ধকার আলোকহীন কক্ষে সাদা ভিন্ন অপর কোন রংই ফোটে না। সারাদিনের ক্লান্তির পরে মন যখন ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত তখন একমাত্র সাদা রংই কক্ষে একটুখানি ঔজ্জ্বল্য আনিয়া দেয়।

চারি দেওয়াল ও সিলিংএ সর্বদা একই রং ব্যবহার না করিয়া একাধিক রং ব্যবহার করা চলে। কোন কোন গৃহের অভ্যন্তরে দুইরকম রংএর মিশ্রণও দেখা যায়। দুই রকম রং প্রয়োগ করিবার সময় সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রথমত সিলিং এবং সিলিং-এর ঠিক নীচে প্রায় এক ফুট পরিমিত স্থানে একপ্রকার রং, তারপর দেওয়ালের নীচ পর্যন্ত আর এক-প্রকার রং। সিলিং-এর এক ফুট নীচে যেখানে আসিয়া রং বদল হইয়াছে সেখানে স্টেনসিলের নকশা করা চলিতে পারে। দ্বিতীয়ত সিলিং হইতে জানালার ঠিক উপর পর্যন্ত যেখানে ছবি টাঙ্গান থাকে সেই পর্যন্ত এক প্রকার রং এবং চারি দেওয়ালের বাকী অংশে অন্য আর এক রং। তৃতীয়ত দেওয়ালের নীচের দিক হইতে প্রায় একগজ পরিমিতি স্থানে একপ্রকার রং কিংবা কোন নকশা এবং তারপর সিলিং পর্যন্ত অন্য আর একপ্রকার রং লাগাইতে দেখা যায়।

আসবাব নির্বাচন—আসবাবপত্র নির্বাচনের ব্যাপারে কোন একটি নিয়ম সমস্ত পরিবারের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন পরিবারের প্রকৃতি, অভ্যাস, রুচি, আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক পদমর্যাদা ও প্রয়োজন অনুসারে আসবাব নির্বাচন করিতে হয়।

(১) প্রথমেই মজবুত ও উপযোগী দেখিয়া আসবাব ক্রয় করা উচিত। যে জিনিস অল্পতেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং নিত্য সারান প্রয়োজন সেরূপ আসবাব কিনিবে না।

(২) পরিবারের লোকেদের প্রকৃতি আসবাব নির্বাচনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করে। যে সমস্ত গৃহের লোকেরা বাহিরের লোকেদের সঙ্গে মুক্ত বায়ুতে বসিয়া পানাহার ও গল্পগুজব ভালবাসেন স্বভাবতই তাহাদের এক প্রস্থ বেতের হাল্কা আসবাব থাকা বাঞ্ছনীয়। হাল্কা আসবাব সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়।

(৩) ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন অনুযায়ীও আসবাব নির্বাচিত হইয়া থাকে। অধ্যাপক ও ছাত্রদের গৃহে পড়ার চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি থাকা একান্ত প্রয়োজন। আবার যাহারা শান্ত নির্জন জীবন ভালবাসেন, লোকের ভিড় এড়াইয়া চলেন এবং দিনের অধিকাংশ সময় লেখাপড়া নিয়া অতিবাহিত করেন তাহাদের গৃহে বড় বড় ডেস্ক, বুককেস, আলমারি থাকা চাই। দিনান্তের খাটুনির পরে অনেকে আবার সোফার উপরে হাত পা ছড়াইতে ভালবাসেন। এইরূপ ব্যক্তির গৃহে একখানি ইজিচেয়ার অপরিহার্য।

শারীরিক গঠন অনুযায়ী আসবাব নির্বাচন করিতে হয়। ছয় ফিট লম্বা দেহধারী ব্যক্তির জন্য স্বভাবতই প্রশস্ত খাট চাই।

(৪) আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ীও আসবাব নির্বাচন করা হয়। ধনী, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আসবাব একরূপ নয়। ধনীরা ডানলপের চেয়ার, গডরেজের দামি আলমারি, মেহগিনি কাঠের অন্যান্য আসবাব কিনিতে পারেন, মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা সাধারণ গদি আঁটা কিংবা স্প্রিংএর সোফা সেট, পিতলের বাতিদান ইত্যাদি পছন্দ করিবেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে আবার অল্প দামের কাঠের আসবাবই যথেষ্ট।

(৫) সামাজিক পদমর্যাদা ও জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী আসবাব নির্বাচিত হইয়া থাকে। যে পরিবারের গৃহস্বামী সরকারী দূতাবাসের কর্মচারী কিংবা সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, যাহার বাড়িতে পার্টি লাগিয়াই থাকে, তাহাদের

স্বভাবতই বড় খাবার ঘর এবং প্রশস্ত ড্রইং রুম রাখিতে হয় এবং সেই অনুযায়ী আসবাব নির্বাচন করিতে হয়। হাসিখুশি আমুদে লোকেদের বাড়িতেও অতিথি অভ্যাগত লাগিয়া থাকে। তাহাদের বাড়ির বসিবার কক্ষেও পরিবারের সভ্যসংখ্যার অতিরিক্ত চেয়ার টেবিল রাখা দরকার।

(৬) চাকুরির প্রকৃতি অনুসারেও আসবাব নির্বাচন করা উচিত। যাহারা অনবরত একস্থান হইতে অন্যস্থানে বদলি হইতেছেন তাহাদের আসবাব হইবে হাল্কা ও অল্প দামি। ভাঁজ করা যায় সর্বদা এরূপ টেবিল চেয়ার তাহাদের কেনা উচিত।

বিভিন্ন কক্ষের উপযোগী আসবাব—আমরা বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি। শয়ন ঘর, বসিবার ঘর, শিশু কক্ষ, পাঠাগার ইত্যাদি প্রত্যেকটি ঘরের উদ্দেশ্য পৃথক্, সুতরাং প্রত্যেকটি কক্ষের উপযোগিতা অনুসারে আসবাব ক্রয় করা উচিত।

শয়ন ঘর—শয়ন ঘরে খাট ব্যতীত, ড্রেসিং টেবিল, চেস্ট অব ড্রয়ার্স, গুটি দুই চেয়ার, স্বতন্ত্র পাঠাগার না থাকিলে বইএর আলমারি, লিখিবার একখানি টেবিল রাখা যাইতে পারে। এমনভাবে আসবাব সাজাইয়া রাখিবে যাহাতে লোক চলাচলে বাধা না ঘটে কিংবা অন্ধকারে কেহ হোঁচট না খায়। শয়ন ঘরে রেডিও, ছাইদান, গহনার বাক্স এবং প্রসাধন সামগ্রী রাখা চলে।

শিশু কক্ষ—শিশু কক্ষের জন্য হাল্কা, মসৃণ, উজ্জ্বল এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধক (accident proof) আসবাব চাই। শিশু কক্ষে কখনও আসবাবের বাহুল্য থাকা ভাল নয়, কারণ, তাহাতে উহাদের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়। সেখানে একটি খাট, ছোট টেবিল, নীচু চেয়ার রাখিলেই চলে। খেলনা ও বই রাখিবার জন্য যথেষ্ট স্থান চাই। আসবাবপত্রে ও কক্ষে যাহাতে ধুলা-বালি না জমিতে পারে এইজন্য আসবাব পত্রে কোন নকশা না থাকাই সঙ্গত। শিশু কক্ষের মেঝে পরিষ্কার রাখিবার জন্য মেঝেতে কোন মাদুর বা কার্পেট রাখিতে নাই।

গৃহের অন্যান্য কক্ষ—বয়স্ক ও শিশুদের জন্য নির্ধারিত কক্ষ ব্যতীত গৃহে বসিবার ঘর, খাবার ঘরও থাকে। বসিবার ঘরে সমস্ত লোকের বসিবার মত, উপরন্তু অতিথি অভ্যাগতদের বসাইবার মত উপযুক্ত সোফা সেট কিংবা গদি আঁটা চেয়ার আরামদায়ক। প্রত্যেকটি চেয়ার এমনভাবে সাজাইবে যাহাতে নাগালের মধ্যে টেবিল পাওয়া যায়। টেবিলের উপর সিগারেটের

ছাই ঝাড়িবার জন্য ছাইদান রাখিবে। ভারতীয় পদ্ধতিতে বসার ঘর সাজাইতে চাহিলে মেঝেতে ফরাস কিংবা কার্পেট পাতিয়া দিতে পার। অনেকে আবার বসার ঘরের একটি খাটের উপর তাকিয়া সাজাইয়া রাখা পছন্দ করেন। বসিবার ঘরে লম্বা ধরনের কোন আসবাব যেমন আলমারি কিংবা পিয়ানো রাখা প্রয়োজন হইলে সর্বদা দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া রাখাই যুক্তিযুক্ত। সম্ভব হইলে বসিবার ঘরের সমস্ত আসবাব সংস্থানে চাক্ষুষ সামঞ্জস্যের (formal balance) নীতি মানিয়া চলিবে।

আসবাব বিন্যাসের রীতি—কোন ঘরেই বেশী আসবাব রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। ইহাতে গৃহে জঞ্জাল বাড়ে, বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে এবং লোকদের স্বচ্ছন্দ চলাচলও ব্যাহত হয়। অতিরিক্ত আসবাব বাড়ির শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নয়।

একটি কক্ষে যথাযথভাবে আসবাব বিন্যাসের পূর্বে একখানি কাগজে কোথায় কোন্ আসবাব রাখা হইবে তাহার একটি চিত্র আঁকিয়া নেওয়া ভাল। কক্ষ এবং প্রত্যেকটি আসবাবের আয়তন গাণিতিক হিসাবে কাগজে ছোট করিয়া মাপিয়া লইয়া (প্রতি বর্গ ফুট স্থানকে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি হিসাবে ধরা যাইতে পারে) কোথায় কোন্ আসবাব রাখা সম্ভব কিংবা কোথায় কোন্ বস্তুটি রাখিলে ভাল মানাইবে মনে মনে সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইবে। ইহাতে ঘর সাজাইবার সময় ঘরের সমস্ত আসবাব নিয়া এদিক ওদিক টানাটানির পরিশ্রম লাঘব হয়।

আলোক সজ্জা—গৃহসজ্জায় আলোরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। দিনের আলো যখন নিভিয়া আসে তখন কোন কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করিয়া কাজকর্ম অব্যাহত রাখিতে হয়। পূর্বে আমাদের দেশে মাটির প্রদীপই ছিল আলোর প্রধান উপকরণ। ঘৃত, সরিষার তেল কিংবা অন্য কোন স্নেহপদার্থ জ্বালাইয়া প্রদীপ জ্বালান হইত। তারপর ক্রমে ক্রমে অবশ্য মোমবাতি, কেরোসিনের বাতি, গ্যাসের আলো ইত্যাদি নানা রকমের আলোর প্রচলন ঘটে। বর্তমান যুগ আবার বিদ্যুতের যুগ। যেখানে সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হইতেছে সেখানেই আজ বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

সাধারণত কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আলোর ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রথমেই ধর বসিবার ঘর। এখানে আমরা অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া আলাপ আলোচনা করি। গৃহের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কক্ষখানিই
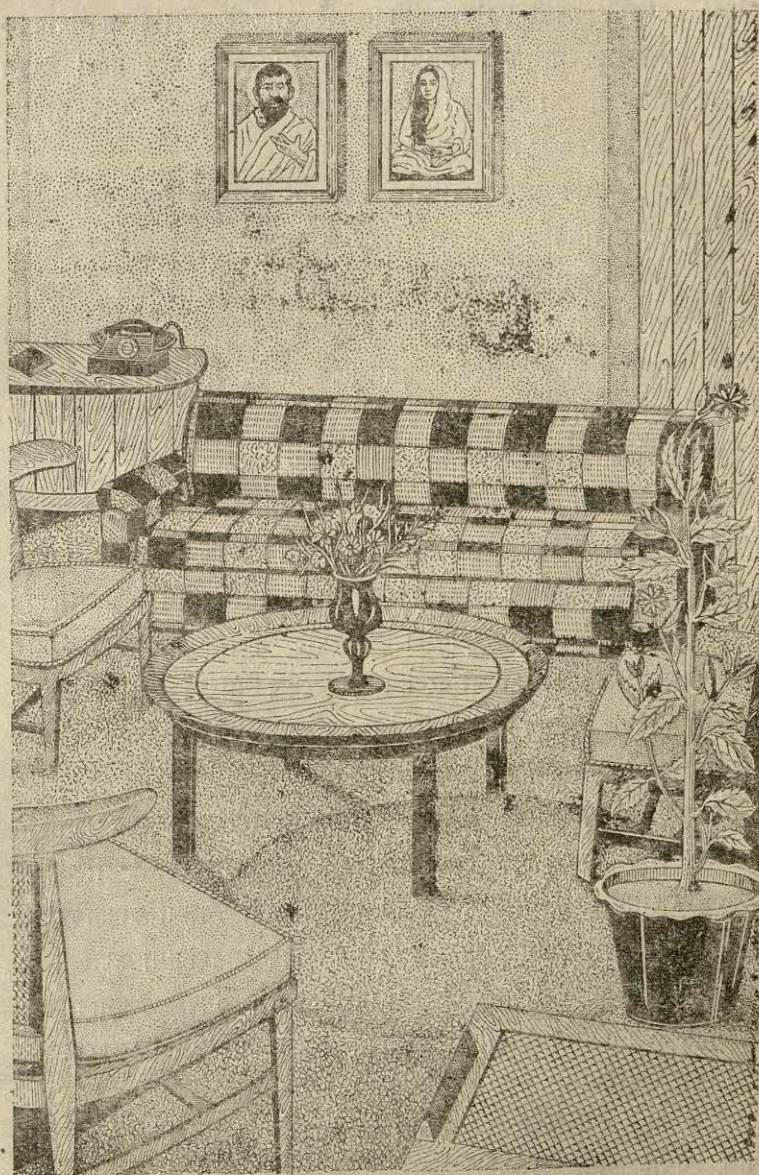
বৈঠকখানার আসবাব বিন্যাস

আমরা লোককে দেখাইতে ভালবাসি। এই কারণেই বসিবার ঘর সাধারণত একটু বিশেষভাবে সাজানো গোছানো থাকে। বসার ঘরে সর্বদা উজ্জ্বল আলোকের ব্যবস্থা করা দরকার। নিয়ন আলো বসার ঘরের শোভা বাড়ায়, উপরন্তু সমগ্র কক্ষটিও যথেষ্ট আলোকিত করে।

ছেলেদের পড়ার ঘরের আলোও হইবে উজ্জ্বল তবে সাদা স্নিগ্ধ রংএর। রঙিন স্বল্পালোকবিশিষ্ট কক্ষে বসিয়া পড়িলে চোখের স্নায়ুগুলি পীড়িত হয় এবং সহজেই চোখ খারাপ হইতে পারে। খাবার ঘর ও রান্না-ঘরের আলোও উজ্জ্বল সাদা রং-এর হওয়া উচিত। রাত্রিবেলা পোকামাকড় বা চুল উড়িয়া আসিয়া খাদ্যদ্রব্যে পড়িতে পারে। স্বল্পালোকে মাছের কাঁটা বাছিয়া খাইতেও অসুবিধা হয়। সিঁড়ির আলো হইবে উজ্জ্বল নতুবা নবাগত আগন্তুক সিঁড়িতে হোঁচট খাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অনেক গৃহের সোপানে গ্যালারীর মত ধাপে ধাপে নানারকমের ছবি সাজান থাকে। যাহাদের এইরূপ সুসজ্জিত সোপানশ্রেণী রহিয়াছে তাহারা বিভিন্ন বিচিত্র রংএর আলো দিতে পারেন। প্রসূতিকক্ষ এবং শয়নকক্ষের আলো হইবে স্নিগ্ধ এবং হালকা। যাহাদের রাত্রিবেলা বাতি জ্বালিয়া ঘুমাইবার অভ্যাস তাহারা ফিকে নীল অথবা সবুজ রং-এর আলো রাখিবেন। অনেকের আবার বিছানায় শুইয়া গল্পের বই কিংবা খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস আছে। তাহাদের জন্য শয়নকক্ষে স্বতন্ত্র উজ্জ্বল আলো রাখা দরকার।

গৃহের আচ্ছাদন (Covering)—স্থানীয় আবহাওয়া, গৃহের উপাদান ও রংএর উপর নির্ভর করে গৃহের আচ্ছাদন। শীতপ্রধান দেশের বাড়িগুলির মেঝেতে কার্পেট, র‍্যাগ, গালিচা, শতরঞ্জি, মাদুর কিংবা লিনোলিয়াম বিছানো হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এরূপ কোন আবরণ ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ ধুলাবালি জমিয়া সহজেই ঘর নোংরা হয়। উপরন্তু ঐ ধুলাবালিতে পোকামাকড় বাসা বাঁধে। বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চাহিলে মেঝেতে কোন কিছু বিছাইবে না।

মেঝে ব্যতীত দেওয়ালেরও আচ্ছাদন চাই। কাঠের বাড়ির পক্ষে দামি ওয়াল পেপার হইল উৎকৃষ্ট দেওয়াল আচ্ছাদন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে ওয়াল পেপারের অভ্যন্তরে কীটপতঙ্গ বাসা বাঁধিতে পারে। বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে ওয়াল পেপার সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। কোথাও কোথাও আবার হাতে বোনা নকশা করা দেশী কাপড়
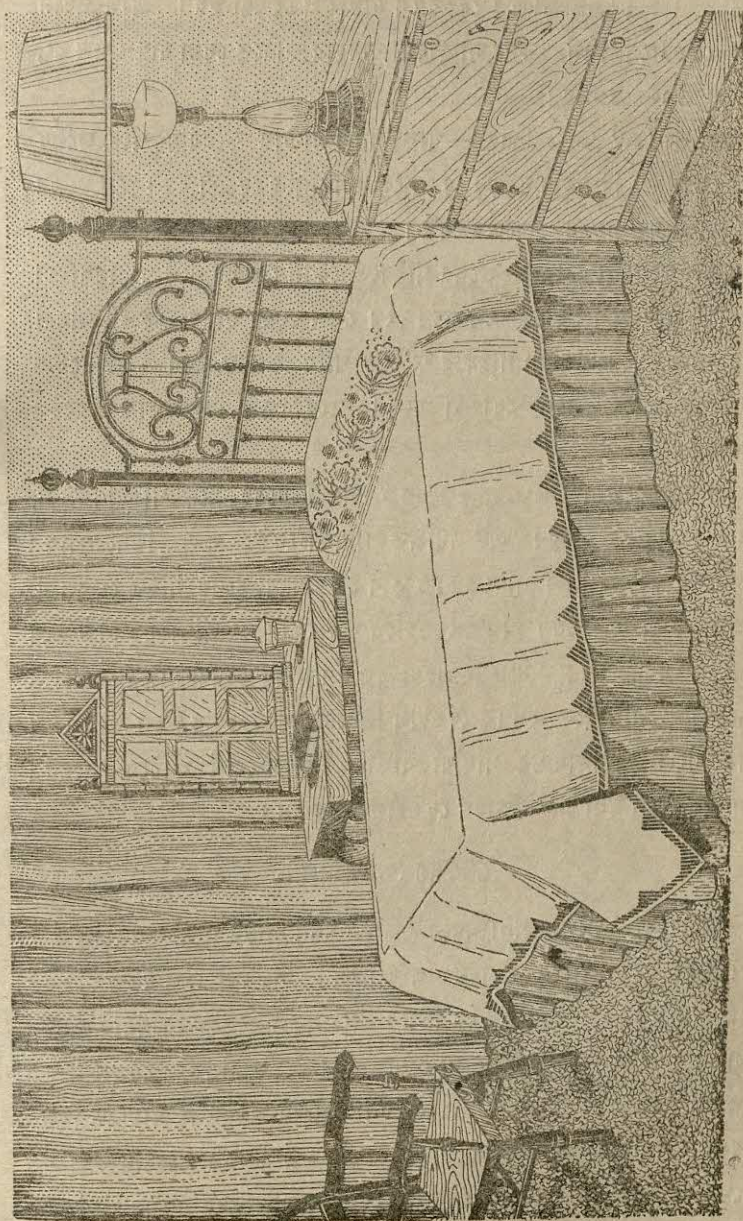
শয়নঘরের আসবাব বিন্যাস

(embroidered tapestries) দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে দেওয়ালে তিন রকম আচ্ছাদন ব্যবহার করিতে দেখা যায়—জল রং, তেল রং ও ডিসটেম্পার।

জল রং (Water colour)—পাকা বাড়ি প্লাস্টার করিবার পরে জলের সঙ্গে কোন রং মিশাইয়া বাড়ির দেওয়ালে ও সিলিংএ দেওয়া হয়। জল রংএর মধ্যে চুনকামের প্রচলনই সবচেয়ে বেশী।

তেল রং (Oil paint)—জলের পরিবর্তে কোন তেলের সঙ্গে রং মিশাইয়া দেওয়ালে লাগাইলে উহাকে বলে তেল রং। তেল রংএর সুবিধা এই যে আমরা যেমন প্রত্যহ মেঝে ধুইয়া পরিষ্কার করিতে পারি তেল রং করা দেওয়ালকেও ঠিক সেই ভাবে প্রত্যহ ধোওয়া চলে। তবে তেল রং অত্যন্ত ব্যয়বহুল আচ্ছাদন।

ডিসটেম্পার (Distemper)—চক অথবা চুনের সঙ্গে পরিমাণমত গ্লু (glue) মিশ্রিত কর। এই মিশ্রিত পদার্থটিকেই বলে ডিসটেম্পার। দেওয়ালের রং যদি সাদা রাখিতে চাও তবে চক্ অথবা চুনের সহিত কেবল গ্লু মিশ্রিত করিলেই চলে। কিন্তু দেওয়ালে যদি কোন রং লাগাইতে চাও তবে আপনার রুচিমত রং গ্লুর সঙ্গে মিশাইয়া লও। প্লাস্টার করিবার পরে দেওয়ালে ডিসটেম্পার লাগাইতে হয়। দেওয়াল ডিসটেম্পার করা খুব সহজ কাজ। যে কোন গৃহিণীই রাজমিস্ত্রির সাহায্য ব্যতীত ইহা প্রয়োগ করিতে পারেন। আমাদের দেশে ইহা একটি আদর্শ দেওয়াল আচ্ছাদন।

মেঝের আচ্ছাদন

আলপনা—বাংলার পল্লীজীবনে একদিন যখন প্রাচুর্য ছিল, তখন ব্রত এবং পূজাঅর্চনা লইয়া মেয়েদের দিনগুলি কাটিত। আলপনা ছিল মূলত ব্রতেরই একটি অঙ্গ-স্বরূপ। উহা মেয়েদের শিল্প। প্রায় সকল ব্রতেই আলপনার প্রচলন দেখা যায়, যেমন—লক্ষ্মীব্রত, মাঘমণ্ডলের ব্রত, তারাব্রত, সেঁজুতি-ব্রত। আলপনা এতকাল পর্যন্ত ব্রত এবং মেয়েলী আচার-অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসুর প্রচেষ্টায় উহা এক নবগৌরব লাভ করিয়াছে। এখন নগরের অভিজাতদের উৎসব অনুষ্ঠানেও আলপনা দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত হইবার ফলে আলপনা ক্রমশ গৃহসজ্জারও অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ধনীরা অনেকেই

এইরূপ সুদৃশ্য নকশাকরা কাপড় দিয়া দেওয়াল ঢাকিয়া দিলে ভাঙাচোরা
দেওয়াল সুন্দর দেখায়।

আজকাল পাশ্চাত্য-প্রথামত গৃহের মেঝে কার্পেট ও গালিচা দ্বারা আবৃত না করিয়া নগ্ন রাখা প্রশস্ত মনে করিতেছেন এবং ঐ স্থানে আলপনা দিয়া সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা রাখিতেছেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্যের কারণে গৃহের মেঝে নগ্ন রাখাই সমীচীন। সংস্কৃতি অথবা স্বাস্থ্য যে কারণেই হউক আলপনার মত একটি উঁচুদরের স্বদেশী শিল্প যে সকলের নিকট সমাদৃত হইতেছে উহা আশার কথা সন্দেহ নাই।

আলপনা কাহাকে বলে?—সংস্কৃত 'আলিম্পন্' শব্দ হইতে আলপনা কথাটির উৎপত্তি। মূল ধাতু 'লিপ' কথার অর্থ 'চিত্রণ' (to paint) নয়, উহার অর্থ 'লেপন' (to plaster)। ভিজা আতপ চাল বাটিয়া উহাতে একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ডুবাইয়া প্রথম চারিটি আঙ্গুলের সাহায্যে মাটিতে কিংবা দেওয়ালে যে নানাপ্রকার চিত্রাঙ্কন করা হয় তাহারই নাম আলপনা।

আলপনার উপাদান—চালই হইল আলপনার প্রধান উপাদান। তবে চালের পরিবর্তে চকের গুড়াতে গঁদ মিলাইয়া লইয়াও চমৎকার আলপনা দেওয়া যায়। আলপনায় অনেকে আবার রং ব্যবহার করে। কালো রং-এর জন্য কাঠকয়লার গুঁড়া, লাল রং-এর জন্য লাল আবির, সবুজ রং-এর জন্য পাতার (সাধারণত সিম) রস এবং বাদামী রং-এর জন্য ইটের গুঁড়া ব্যবহার করা চলিতে পারে।

আলপনা

বিভিন্ন প্রকারের আলপনা—আলপনা কেবল বাংলা তথা উত্তর ভারতের একচেটিয়া শিল্প নয়। দক্ষিণী মেয়েরাও সুন্দর আলপনা দিয়া থাকে। বোম্বাই অঞ্চলে অতিথির সম্মানার্থে ভোজনের স্থানে আলপনা দেওয়া হয়। সেখানে ইহাকে বলে রঙ্গোলি। তবে দক্ষিণ ভারতে পিটুলি ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলি শুকনো উপাদান, যেমন—চাউল, ডাল, বিভিন্ন মশলা ও শস্য আলপনায় ব্যবহার করা হয়। প্রথমে লোহার পাত কিংবা কার্ডবোর্ডে ডাইস (dice)
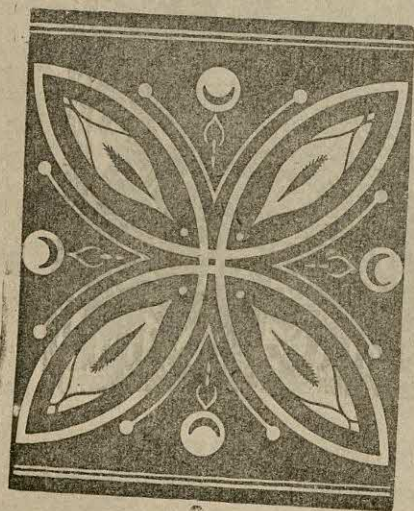
কাটিয়া বিভিন্ন নকশা তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয়। আলপনার স্থানে ঐ ডাইস বসাইয়া রং মিলাইয়া বিভিন্ন শস্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তারপর ঐ ডাইসটি তুলিয়া নিলেই সুন্দর আলপনা অঙ্কিত হয়। দক্ষিণ-ভারতে আলপনা দৈনন্দিন গৃহসজ্জার একটি প্রধান উপাদান। সেখানে দরিদ্রের পর্ণকুটিরের প্রাঙ্গণটিও আলপনায় শোভিত দেখা যায়। প্রতিদিন প্রভাতে গোবরমাটি দিয়া আঙিনা নিকাইয়া পিটুলি-গোলা জল দিয়া দক্ষিণী মেয়েরা আলপনা আঁকিয়া রাখে। আলপনা আঁকা তাহাদের নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

আলপনার শ্রেণীবিভাগ—মানচিত্র ও মণ্ডনশিল্প—আলপনা প্রধানত এই দুই শ্রেণীর। মানুষের মন যাহা চায় তাহাই আলপনায় রূপলাভ করে
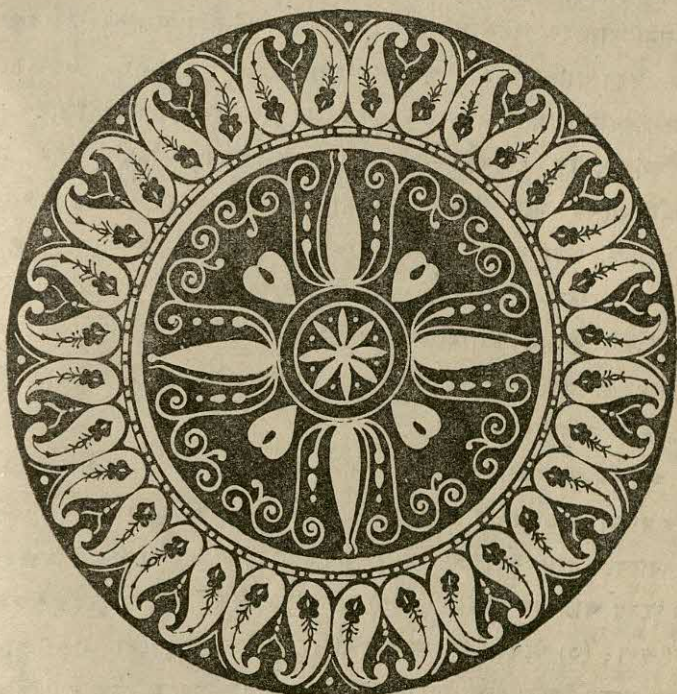
আলপনা

বলিয়া এক রকমের আলপনাকে বলা হয় মানচিত্র। যেমন, মাঘমণ্ডলের আলপনায় ঘরবাড়ি, ঝাঁপি, বিভিন্ন অলংকার, সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় ঘরবাড়ি, সুপুরিগাছ, রান্নাঘর ইত্যাদি দেখা যায়। এইগুলি শুধুমাত্র মানচিত্র, উহাদের

শিল্পকার্য বলিয়া ধরা যায় না। কিন্তু শুধুমাত্র কামনার প্রকাশই আলপনার শেষ কথা নয়। উহাতে কামনার অতিরিক্ত আরও কিছু লেখা থাকে, যেমন অন্নপ্রাশনের আলপনায় পদ্ম, শঙ্খ, লতা কিংবা তারাব্রতের চন্দ্র, সূর্য এগুলি মানচিত্র নয়, কামনার প্রতিচ্ছবি দেওয়ার চাইতে শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসই এখানে প্রবল। আলপনার কলা-লতা, খুন্তি-লতা, শঙ্খ-লতা ইত্যাদি মণ্ডনশিল্পের অন্তর্ভুক্ত—উহারা মানচিত্র নয়। গৃহ প্রসাধনের জন্য যে আলপনার ব্যবহার তাহাও এই মণ্ডনশিল্প বা কারুশিল্প রচনার প্রয়াস হইতেই জাত। আলপনাকে মোট আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম পদ্ম, দ্বিতীয় নানা লতামণ্ডন বা পাড়, তৃতীয় গাছ, ফুলপাতা প্রভৃতি, চতুর্থ নদনদী ও পল্লীজীবনের দৃশ্যাবলী, পঞ্চম পশুপক্ষী, মাছ ও নানা জীবজন্তু, ষষ্ঠ চন্দ্রসূর্য ও গ্রহনক্ষত্র, সপ্তম অলঙ্কার ও নানা আসবাব, অষ্টম পিঁড়িচিত্র। ঘরের মেঝেই হইল আলপনা দিবার প্রশস্ত স্থান। তবে আঙিনায়, জানালায় কিংবা দেওয়ালের গায়ও আলপনা দেওয়া চলে। অবশ্য যেখানেই আলপনা দাও না কেন উহা গৃহের সৌন্দর্য বাড়াইতে সক্ষম।

আলপনার বৈশিষ্ট্য—আলপনা কিন্তু কখনও নিখুঁত হয় না। অবনীন্দ্রনাথের মতে ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন মায়ের মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, উহা কখনও ব্যাকরণ কিংবা ছন্দশাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলে না, আলপনাও তেমনি মেয়েদের কাঁচা হাতের আঁকা বাঁকা রেখার একটি চিত্র-মাত্র, উহা কখনও জ্যামিতিক নকশার মত নির্ভুল নয়। তবে এই অপটু শিল্পীদের হাতের আঁকা বাঁকা আলপনায় যে স্বাভাবিক শ্রী ও সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে তাহা সত্যই অতুলনীয়।

পর্দা—গৃহ সজ্জায় পর্দা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পর্দা হইল দরজা ও জানালার আচ্ছাদন। দেওয়ালের রং, মেঝে এবং অন্যান্য আসবাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া পর্দা টাঙ্গাইতে হয়। পর্দার উদ্দেশ্য হইল (১) গৃহের আব্রু রক্ষা করা; (২) সূর্যের অত্যুজ্জ্বল ছটা হইতে গৃহের শীতলতা রক্ষা করা; (৩) শীতের সময় আবার বাহিরের শীতল বায়ু এবং ঠাণ্ডা হাওয়া হইতে গৃহের উষ্ণতা রক্ষা করা; (৪) ময়লা ও দূষিত বায়ুকে ঠেকাইয়া রাখা; (৫) পুরাতন কিংবা শ্রীহীন জিনিসপত্র লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা; (৬) গৃহ পরিবেশ সুন্দর ও মনোরম করিয়া তোলা।

পর্দার উপাদান—দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য মজবুত ও পাকা রংয়ের সূতির পর্দাই সবচেয়ে উপযোগী। সিল্ক, সাটিন, ভেলভেট, শিফন কিংবা

নাইলন ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্রেরও পর্দা প্রস্তুত হইতে পারে। এইসব কাপড় ধুইয়া পরিষ্কার করাও খুব কঠিন নয়। কিন্তু উহারা একদিকে যেমন ব্যয়বহুল অন্য দিকে তেমনি খুব দ্রুত ময়লা হয়। এইসব কারণে সুতির পর্দাই বেশী সুবিধাজনক। উহাদের অল্পায়াসে বাড়িতে পরিষ্কার করা যায় এবং একবার ইস্ত্রি করিলে সহজে ভাজ নষ্ট হয় না।

পর্দার কাপড় নির্বাচনের সময় আবার গৃহের অবস্থান এবং স্থানীয় আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। গ্রীষ্মকালে মিহি কাপড়ের পর্দা উৎকৃষ্ট কারণ উহাতে বায়ু চলাচল ব্যাহত হয় না। তবে যে কক্ষে প্রখর সূর্যালোক প্রবেশ করে সেই কক্ষের জন্য হাল্কা রং এবং ভারী বস্ত্রের পর্দা নির্বাচন করিতে হয়। শীতকালের পর্দার উপাদান আবার মোটা এবং পর্দার রং হওয়া উচিত গাঢ়।

নানা রকমের পর্দার প্রচলন দেখা যায়—সোজা, বাঁকানো কিংবা আধাআধি দুইটি স্বতন্ত্র কাপড় কাটিয়া একটি সম্পূর্ণ পর্দা। সর্বদা ব্যবহারের জন্য একটি সোজা লম্বা পর্দাই ভাল। গৃহের কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাঁকানো এবং উপরে ঢেউ খেলানো পর্দা ব্যবহার করা যায়।

গৃহ প্রসাধনের অন্যান্য সামগ্রী

চিত্র সন্নিবেশ—গৃহের অভ্যন্তরকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিবার সামগ্রীগুলির মধ্যে প্রথমেই চিত্রের কথা মনে হয়। প্রত্যেক বাড়িতেই বসিবার ঘর, শয়ন ঘর ও পড়ার ঘরে কিছু না কিছু চিত্র সন্নিবেশ করিতে দেখা যায়। চিত্র সন্নিবেশে রুচির প্রয়োজন। প্রথমেই দেওয়ালের আয়তন ও গড়ন অনুসারে চিত্র নির্বাচন করা উচিত। ক্ষুদ্র, অল্প পরিসর কক্ষে বহু চিত্র কিংবা অনেক ক্যালেণ্ডার টাঙ্গাইয়া উহা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে না, কারণ চিত্রের বাহুল্য কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেয়ে উহার সৌন্দর্যহানি ঘটাইয়া থাকে। চিত্র নির্বাচনের সময় উহার বিষয়বস্তুর দিকেও নজর দিতে হয়। প্রত্যেক কর্মের উপযোগিতার সঙ্গে চিত্রের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য থাকা চাই। বসার ঘরে সর্বদা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তি কিংবা নেতার ছবি রাখাই সঙ্গত। শয়ন কক্ষে দুই চারিটি পারিবারিক চিত্র রাখা মন্দ নয়। ছেলেদের পড়ার ঘরে বিখ্যাত কবি, লেখক, দার্শনিক প্রভৃতি ব্যক্তির ছবি রাখা ভাল। ইহাতে শিশুদের মনে ঐ সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ প্রবল হয়,
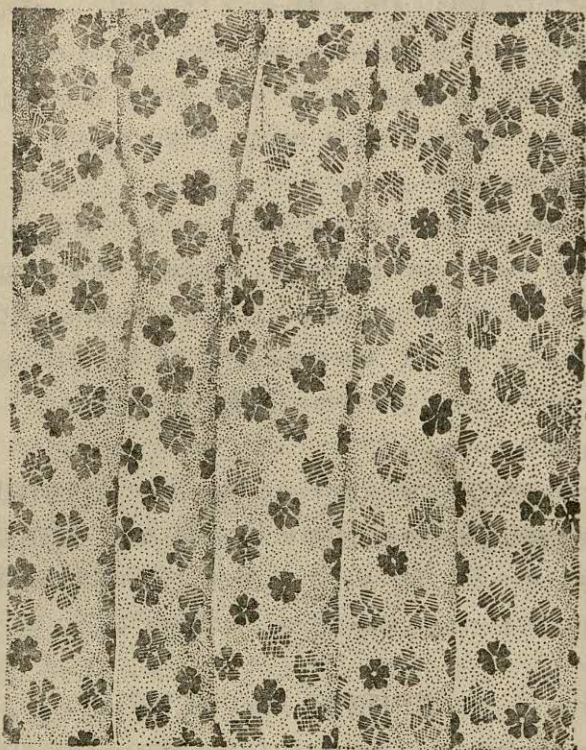
ওয়াল পেপার

এইরূপ ছোট ছোট ওয়াল ম্যাট্স ও ওয়াল প্লেটসগুলি কক্ষের সৌন্দর্য বাড়াইতে সহায়তা করে।

তাহাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ে। পরন্তু ঠাকুর ঘরে কিংবা বৃদ্ধদের শয়নকক্ষে কোন প্রিয় দেবতার ছবি রাখাই যুক্তিযুক্ত।

পুষ্পবিন্যাস—ফুল মানুষের অতি প্রিয় এবং আদরের সামগ্রী। সঙ্গীত এবং ফুল এই দুইটি জিনিস ভালবাসে না পৃথিবীতে এইরূপ একটি লোকেরও সাক্ষাৎ মেলে কিনা সন্দেহ। গন্ধ এবং রূপ—ফুলের এই দুইটি প্রধান আকর্ষণ। আমাদের দেশের লোকেরা বিভিন্ন বর্ণের গন্ধহীন বাহারী ফুলের চেয়ে সুগন্ধযুক্ত ফুলই বেশী পছন্দ করে। বসিবার ঘরে কিংবা শয়ন কক্ষে দুই চারিটি রজনীগন্ধার গুচ্ছ সমস্ত কক্ষের শোভা বহুগুণে বাড়াইয়া তোলে। যাহাদের সঙ্গতি আছে তাহারা খাবার টেবিলেও নানা রংএর ফুল সাজাইয়া রাখেন। গ্রামাঞ্চলের বাড়ির চেয়ে শহরের বাড়িতে ফুলের অভাব বেশী অনুভূত হয়। প্রতি কক্ষে দুই চারিটি ফুল রাখিলে মানুষ দিনান্তে একবার প্রকৃতির সস্নেহ স্পর্শ অনুভব করিতে পারে। বাহিরের বাধাবন্ধনহীন বিরাট প্রকৃতি এবং গৃহের কোণে আবদ্ধ ক্ষুদ্র মানুষ—এই দুই বিপরীত সৃষ্টির মধ্যে মিলনের একটি ছোট সেতু রচনা করিয়া দেয় ফুল।

পুষ্পসজ্জায় ফুলদানির ব্যবহার—ঘরে ফুল রাখিবার আধার হইল ফুলদানি। যদিও ফুল সাজাইয়া রাখিবার জন্যই ফুলদানির ব্যবহার তথাপি একটি সুন্দর ফুলদানি ফুলের শোভা আরও মেলিয়া ধরিতে সাহায্য করে। ফুলহীন সুদৃশ্য ফুলদানিও ঘরের শোভাবর্ধন করে। এইরূপ একটি ফুলদানিতে কখনও কখনও কাগজের ফুল রাখিয়া ফুলের অভাব মিটাইবার চেষ্টা করা হয়। ফুলদানিতে মানিপ্ল্যাণ্ট জাতীয় সবুজ লতা কিংবা পর্টুলেকা প্রভৃতি ফুল গাছ বহুদিন পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা চলে। সাধারণ মাটি, পোড়া মাটি, চীনা মাটি বা পোরসিলিন
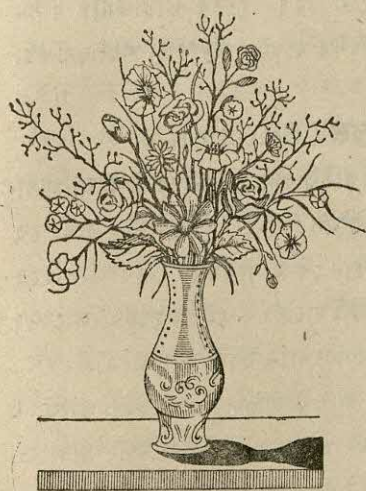
গৃহসজ্জায় ফুল অপরিহার্য

ইত্যাদি নানা উপাদানের সাহায্যে ফুলদানি নির্মিত হয়। টেবিল

ব্যতীত আজকাল দেওয়ালের গায়েও নানারূপ কারুকার্যখচিত দেওয়াল ফুলদানির ব্যবহার দেখা যায়।

ওয়াল ম্যাট্স্ (Wall mats)—আধুনিক গৃহ প্রসাধনে আজকাল নানারূপ ওয়াল ম্যাট্স্ ও ওয়াল প্লেটসের ব্যবহার দেখা যায়। মাদুরের উপর হাতে বোনা নকশা করা কাজ, লক্ষীর সরা, পটশিল্প, লোকশিল্প প্রভৃতি বস্তু দেওয়ালের গায় টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। এই জিনিসগুলি ছোট হইলেও অবহেলার নয়, কারণ. ঘরের সৌন্দর্য বাড়াইয়া তুলিতে ইহারা যথেষ্ট সহায়তা করে। বিশেষত যাহাদের দামি জিনিস কিংবা দুর্লভ শিল্পবস্তু (curios) কিনিবার সঙ্গতি নাই তাহারা সহজেই এই সকল ছোটখাট জিনিসের সহায়তায় ঘর সাজাইতে পারেন। মোটের উপর গৃহসজ্জা একটি উঁচুদরের শিল্প। ছোট বড়, সস্তা দামি সব রকম সুন্দর জিনিস দিয়াই নিপুণ শিল্পী তাহার পরিবেশকে সুন্দর করিয়া তুলিতে সমর্থ হন।

গৃহের আবশ্যক দ্রব্যাদি নির্বাচন ও উহাদের যত্ন

একটি গৃহ পরিচালনা করিতে হইলে নানা রকমের জিনিসপত্র আবশ্যক। গৃহিণীকে পরিবারের লোকেদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। তাই হাতা, খুন্তি হইতে শুরু করিয়া হাতুড়ি, বাটালি ইত্যাদি সব রকম জিনিসই গৃহে কিছু না কিছু মজুত রাখিতে হয়। গৃহের প্রয়োজনীয় বাসন পত্রাদি নির্বাচন ও সংরক্ষণ করিতে গৃহিণীর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

গৃহের দ্রব্যাদি নির্বাচন (Selection)

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময় গৃহিণী প্রথমেই উহার **উপযোগিতা ও স্থায়িত্ব** যাচাই করিয়া লইবেন। যে জিনিস কিনিলে সত্য সত্যই ব্যবহারে লাগিবে শুধু তাহাই কেনা উচিত। কোন কোন পরিবারে দেখিতে পাইবে প্রচুর অনাবশ্যক জিনিসে ঘর ভর্তি হইয়া রহিয়াছে। এইসব গৃহের লোকেরা জিনিস কিনিবার সময় উহার উপযোগিতা কতখানি তাহা ভাবেন নাই।

উপযোগিতা ব্যতীত বস্তু নির্বাচনের আর একটি মাপকাঠি হইল স্থায়িত্ব। মজবুত ও স্থায়ী জিনিস একটু বেশী মূল্য দিয়াও কেনা ভাল, কারণ, তাহাতে গৃহকর্তার লাভই হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সচরাচর পূজার জন্য পিতল ও তামার, দৈনন্দিন ব্যবহারের থালা বাসন কাঁসার, চায়ের বাসনগুলি পোরসিলিন ও কাচের, ডেকচি, খুন্তি ইত্যাদি অ্যালুমিনিয়াম বা পিতলের, কড়াই

বঁটি ইত্যাদি লোহার এবং জল রাখিবার পাত্রগুলি মাটির কেনা হইয়া থাকে। সাধারণত বস্তুর মূল্য, স্থায়িত্ব এবং পরিবারের লোকেদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখিয়া উপরোক্ত নিয়মে বস্তু নির্বাচন করার রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

দ্রব্য নির্বাচনের সময় গৃহিণী বিভিন্ন বস্তুর আপেক্ষিক মূল্য অবশ্যই যাচাই করিয়া লইবেন। সাধারণ গৃহকর্মের জন্য আমরা সর্বদা সুন্দর জিনিসের চেয়ে অল্প মূল্যের স্থায়ী জিনিস পছন্দ করি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় স্টেনলেস স্টীল এবং কাঁসার বাসন উভয়েই আমাদের কাজ চলিয়া যায়। স্টেনলেস স্টীল দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হইলেও কাঁসার বাসনের তুলনায় অনেক বেশী দামি। সাধারণ পরিবারের পক্ষে তাই স্টেনলেস স্টীলের চেয়ে কাঁসার বাসন ক্রয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বাসন নির্বাচনের সময় প্রত্যেক গৃহিণী অবশ্যই নজর রাখিবেন অল্পায়াসে এবং অল্পব্যয়ে কোন্ জিনিসটি পরিষ্কার করা যায়। যে সকল বস্তু সহজে নাড়াচাড়া করা যায় না কিংবা পরিষ্কার রাখাও অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল সেই সকল বস্তু না কেনাই সঙ্গত।

এতদ্ব্যতীত দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময় গৃহিণী উহার সংরক্ষণের দিকটিও চিন্তা করিয়া দেখিবেন। যে বস্তু সংরক্ষণ করা কঠিন তাহা না কেনাই উচিত। লক্ষ্য করিয়া দেখিও প্রত্যেক গৃহেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বাসনকোসন থাকে কারণ হঠাৎ কোন অতিথি অভ্যাগত আসিয়া পড়িলে কিংবা বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইলে ঐ সব অতিরিক্ত বাসন দরকার হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা বিবাহাদি বড় বড় অনুষ্ঠানের জন্যও বাসনপত্র কিনিয়া রাখিতেন। এই সকল প্রয়োজনাতিরিক্ত বাসন সর্বদা কাজে লাগে না। উহাদের যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে ঐ সকল বস্তু না কিনিয়া প্রয়োজনের সময় ভাড়া করিয়া আনিয়া কাজ চালানই ভাল।

সর্বশেষে সঙ্গতি থাকিলে সর্বদা ব্যবহারের জন্য এবং ঘরে মজুত রাখিবার জন্য একেবারে পৃথক্ দুই সেট বাসন থাকা বাঞ্ছনীয়। বহুমূল্যের সেটটি তুলিয়া রাখিয়া অল্পমূল্যের দ্রব্যগুলি সর্বদা ব্যবহার করিবে। মূল্যবান বাসন কেবল যে চোরদেরই প্রলুব্ধ করে তাহা নয়, উহা দাসদাসীদেরও আকৃষ্ট করিতে পারে।

সংরক্ষণ (Storage)—গৃহস্থালীর আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিতে অবশ্যই বিবেচনার প্রয়োজন কিন্তু কিনিবার পরে উহাদের সংরক্ষণ করা আরও অনেক কঠিন কাজ। সংরক্ষণের উপরে গৃহের সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে। কোন

বাড়িতে গেলে দেখিবে থালাবাসনগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, চমৎকার কাপ ডিস বাহির করিয়া অতিথিদের চা জলখাবার দেওয়া হইতেছে, নতুন শিশি বোতলে জ্যাম, জেলী, আচার ও মসলা রাখা হইয়াছে, আসবাবপত্রগুলিও যেন একেবারে নতুন অথচ জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত জানিতে পারিবে, যে-কাপে তোমাকে চা দেওয়া হইয়াছে সেগুলি গৃহিণী তাহার বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে পাইয়াছিলেন। আবার অন্য একটি বাড়িতে গিয়া দেখ সকলে মিলিয়া ভাঙ্গা কাপে চা খাইতেছে, অতিথিকে জল দিবার মত একটি সুন্দর কাচের গ্লাসও নাই, গৃহিণী কৈফিয়তের স্বরে বলিবেন, মাত্র সেদিন জিনিসগুলি কেনা হইয়াছে, ইহারই মধ্যে সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। গৃহিণী আসলে মোটেই সংরক্ষণপটু নহেন। যে গৃহের গৃহিণী সংরক্ষণ করিতে জানেন না স্বভাবতই তাহার জিনিসপত্র অনেকবার কিনিতে হয়। এই কারণেই বলিয়াছি সংরক্ষণের উপর সংসারের সঞ্চয় অনেকখানি নির্ভর করে। কোন্ বস্তু কিভাবে সংরক্ষণ করিতে হয় তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

ধাতবপাত্রাদি সংরক্ষণ—ধাতবপাত্রাদি সংরক্ষণ গৃহিণীর অন্যতম কাজ। ধাতব পাত্রগুলি রন্ধনের কাজে ব্যবহার করিলে তেল কালি লাগিয়া যায়। সর্বদা ঐ তেল কালি তুলিয়া ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া মাজিয়া শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া বাসন মুছিয়া রাখিতে হয়। নিত্যব্যবহার্য বস্তুগুলি নিয়মিত পরিষ্কার রাখিলে এবং মাজিবার পরে মুছিয়া ফেলিলে বাসনগুলি খুব ঝকঝকে থাকে এবং উহাদের আয়ুও বাড়িয়া যায়। বাড়তি বাসনগুলি পরিষ্কার করিয়া মাজিয়া কোন সিন্দুক কিংবা কাঠের বাক্সে পুরিয়া রাখিতে পার। তবে বহুদিনের অব্যবহারের ফলে এনামেল, অ্যালুমিনিয়াম ও স্টেনলেস স্টীল ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধাতব-পাত্রে দাগ পড়িয়া যায়। এই সকল ধাতবপাত্রগুলি মাঝে মাঝে মাজিয়া রাখিবে এবং দোকান হইতে পালিশ করাইয়া আনিবে। অব্যবহৃত লৌহপাত্রে আবার মরিচা পড়ে। এইজন্য ছুরি, কাঁচি, বঁটি, সূচ ইত্যাদি লৌহ কিংবা লৌহমিশ্রিত পাত্রে ভেসিলিন অথবা অলিভ অয়েল মাখাইয়া রাখিবে।

কাচ ও পোরসিলিনের পাত্রগুলি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। এইগুলি খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করিতে হয়। সর্বদা ব্যবহারের কাপগুলি রান্নাঘরে কিংবা খাবার ঘরে একটি ব্র্যাকেট তৈয়ারী করিয়া তাহাতে ঝুলাইয়া রাখিতে পার। একটি তাকের উপর ডিশগুলি উপর্যুপরি সাজাইয়া রাখা চলে। অতিরিক্ত জিনিসগুলি এমনভাবে রাখিবে যাহাতে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি না লাগে।

কাপ, ডিশ, কাচের গ্লাস ইত্যাদি রাখিবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একপ্রকার কাঠের গোল আলমারি পাওয়া যায়। গ্লাস বসাইবার জন্য আলমারির চারিপাশ ঘুরাইয়া গর্ত করা থাকে এবং কাপ রাখিবার জন্য উহার গায়ে ব্র্যাকেটের আংটা লাগান থাকে। কাপের হাতলগুলি আংটার সঙ্গে অনায়াসে ঝুলাইয়া রাখা যায়। আলমারির ভিতরে ডিশ, থালা ইত্যাদি রাখিবার স্বতন্ত্র জায়গা থাকে। সেখানে থালাগুলি উপর্যুপরি সাজাইয়া রাখিতে পার। এইরূপ একটি আলমারি দেখিতেও অতি সুন্দর, এতদ্ব্যতীত পোরসিলিনের পাত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করার পক্ষেও চমৎকার। যাহাদের ঐরূপ আলমারি নাই তাহারা সাধারণ আলমারিতে কাচের পাত্র সাজাইয়া রাখিতে পারেন নতুবা খড় দিয়া পোরসিলিন ও কাচের বস্তু প্যাক করিয়া কাঠের বাক্সে রাখিতে পারেন। ইহাতেও জিনিসপত্র ভাঙ্গিবার আশঙ্কা থাকে না।

ভারতীয় গৃহের পক্ষে উপযোগী বিভিন্ন ধাতব পাত্রাদি এবং উহাদের যত্ন

পিতল পাত্র (Brass)—দুই ভাগ তামার সঙ্গে এক ভাগ দস্তা মিশাইয়া পিতল প্রস্তুত হয়। কোন অম্লরসাত্মক খাদ্যবস্তু পিতলপাত্রে রাখা যায় না। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও পিতলপাত্রে অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখিয়া দিলে পিতল হইতে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ উঠিয়া খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত করিয়া তোলে। কাঁসা কিংবা স্টেনলেস স্টীল হইতে দামে সস্তা এবং অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রের চেয়ে টেকসই বলিয়া অনেক গৃহে পিতলনির্মিত হাঁড়ি, কড়াই, কলসী, হাতা, খুন্তি ইত্যাদি বাসন ব্যবহার করা হয়। রন্ধনের কাজে এই সকল বাসন ব্যবহার করিলেও খাদ্যবস্তু রন্ধনের অব্যবহিত পরেই পাত্র হইতে নামাইয়া রাখা উচিত।

পিতলপাত্র পরিষ্কার রাখা খুব সহজ। কেবল একটু তেঁতুল কিংবা লেবু এবং লবণ মাখিয়া পাত্রটিকে কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও। গরম জলে ধুইয়া মুছিয়া ফেল। এইবার পাত্রে সামান্য একটু ব্রাসো মাখাইয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া পরে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া ফেলিলেই উহা ঝকঝকে দেখাইবে।

কাচের পাত্র (Glass)—আমরা সাধারণত কাচের জগ, জার, শিশি, বোতল, গ্লাস, ডিশ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি। উত্তাপ লাগিলে ফাটিয়া যায় বলিয়া কাচের বাসন রন্ধনের অনুপযুক্ত। তবে অধুনা রন্ধনের উপযোগী

কাচও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে ইহাতে সাধারণত জল, শরবত ইত্যাদি ঠাণ্ডা জিনিসই রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত ঘি, মাখন, মধু, মসলাপাতি, আচার, জ্যাম, জেলী ইত্যাদি বস্তুও কাচের বোতলে কিংবা জারে রাখা যায়। ঠাণ্ডা যে কোন দ্রব্য কাচের পাত্রে ভাল থাকে। কাচ স্বচ্ছ বলিয়া ঔষধপত্র কাচের পাত্রেই রাখিবার নিয়ম। কাচের মধ্য দিয়া ঔষধের রং এবং পরিমাণ সহজেই দেখা যায়।

কাচের পাত্র পরিষ্কার রাখা সহজ। তবে সহজেই ভাঙিয়া যায় বলিয়া কাচের পাত্র সংরক্ষণে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। বাড়িতে দাসদাসী না থাকিলে কাচের পাত্রে খাওয়া সুবিধাজনক, কারণ ইহা পরিষ্কার রাখিতে কোন হাঙ্গামা নাই। ময়লা কিংবা তেলতেলে হইলে ঈষদুষ্ণ গরম জলে সাবান গুলিয়া লইয়া কাচের পাত্রগুলি ডুবাইয়া রাখ। এইবার একটি পরিষ্কার নরম বস্ত্রখণ্ড দিয়া কিংবা কাগজ দিয়া (খবরের কাগজও ব্যবহার করিতে পার) পাত্রগুলি ভাল করিয়া ঘষিয়া ফেল। তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া নাও। জল শুকাইয়া গেলে পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া পাত্রগুলি মুছিয়া ফেল।

পরিষ্কার করিবার জন্য অন্য কোন বস্তু না পাইলে শুধু লবণ ঘষিয়া কাচের পাত্র পরিষ্কার করা যায়।

পোরসিলিনের পাত্র (Porcelain)—চীনামাটি ও পোরসিলিনের পাত্র একই উপাদানে প্রস্তুত। পোরসিলিনের পাত্র রন্ধনের অনুপযুক্ত। এই পাত্রগুলি কাঁসা ও পিতলপাত্রের চেয়ে দামে সস্তা কিন্তু সহজেই ভাঙিয়া যায় বলিয়া খুব সন্তর্পণে ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণত আমরা পোরসিলিন ও চীনামাটির পাত্রে চা খাইয়া থাকি। উত্তাপ লাগিলেই ফাটিয়া যায় না বলিয়া পোরসিলিনের পাত্র চা খাইবার পক্ষে উপযোগী। রন্ধনের কাজে পোরসিলিন ব্যবহার করা হয় না, তবে উহাতে প্রস্তুত খাদ্য ঢালিয়া রাখা যায়।

পোরসিলিনের পাত্র পরিষ্কার রাখা খুব সহজ। কাচের পাত্রের মতই গরম জল ও সাবান দিয়া উহা পরিষ্কার করা চলে। তারপর ঠাণ্ডা জলে বাসনগুলি ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়।

অ্যালুমিনিয়াম পাত্র (Aluminium)—অ্যালুমিনিয়ামের বাসন খুব হাল্কা, দীর্ঘস্থায়ী এবং কাঁসা ও পিতলের চেয়ে দামেও অনেক সস্তা বলিয়া আমাদের দেশে অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের বহুল প্রচলন দেখা যায়। পাতলা বলিয়া

অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র সহজেই উত্তপ্ত হইয়া ওঠে এবং ইহার তাপ সংরক্ষণের ক্ষমতাও মন্দ নয়। অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র পরিষ্কার রাখাও বেশ সহজ। শাক-সবজি, তরিতরকারি, দুধ, অম্লরসাত্মক যে কোন খাদ্যদ্রব্য অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রাখা চলে। এই কারণে কাঁসা ও পিতল পাত্রের চেয়ে অ্যালুমিনিয়াম পাত্র ব্যবহার করা ঢের বেশী সুবিধাজনক। কেট্‌লী ও কড়াই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র পরিষ্কার করিতে হইলে ছাই কিংবা হোয়াইটিং (whiting) দিয়া মাজিয়া গরম জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। পাত্রে কোন দাগ পড়িলে ষ্টীল-উল দিয়া ঘষিয়া দাগ তুলিয়া ফেলিবে। স্মরণ রাখিও অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে সোডা অথবা অপর কোন ক্ষারদ্রব্য ব্যবহার করিতে নাই। ক্ষার দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিলে উহার রং কালো হইয়া যায়।

এনামেল পাত্র (Enamel)—রন্ধনের পক্ষে এনামেল-পাত্র উপযোগী নয়। তবে খাদ্যদ্রব্য ঠাণ্ডা এবং গরম উভয় অবস্থায়ই ইহাতে ঢালিয়া রাখা চলে। আমাদের দেশে প্রতি গৃহে এনামেল নির্মিত থালা, বাটি, গ্লাস ও গামলার বহুল প্রচলন দেখা যায়। ইহার কারণ এনামেলের বাসন দামেও অপেক্ষাকৃত সস্তা এবং মজবুত। অধিকন্তু এনামেল পাত্রে কোন খাদ্যদ্রব্য ঢালিয়া রাখিলে উহার স্বাদ, গন্ধ কিংবা বর্ণ বিকৃত হয় না। এনামেল পাত্রের লেপ উঠিয়া গেলে তাহা কোনমতেই ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমত কোন প্রকারে এনামেলের টুকরাগুলি পেটে চলিয়া গেলে নানারকমের পীড়া দেখা দিতে পারে এবং ঐ ময়লা খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। লেপ অটুট থাকিলে অবশ্য এনামেল পাত্র নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

গরম জলে সাবান কিংবা সোডা দিয়া এনামেল পাত্র ভিজাইয়া রাখিলে উহার তেল কালি সব উঠিয়া যায়। তারপর ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেই চলে। ডিমের খোলা চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া ধীরে ধীরে মাজিয়া ফেলিলেও এনামেল পাত্র বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়।

কাঁসার পাত্র (Bell metal)—তামা, টিন ও দস্তা মিশ্রিত করিয়া কাঁসা প্রস্তুত হয়। পিতল ও তাম্রপাত্র অপেক্ষা কাঁসার পাত্র অধিক উজ্জ্বল। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে কাঁসার পাত্রের সর্বাধিক প্রচলন দেখা যায় এবং তামা ও পিতলের চেয়ে ইহার আদর অনেক বেশী। কাঁসা খুব মজবুত

ধাতু। তবে দাম বেশী বলিয়া আজকাল অ্যালুমিনিয়াম, এনামেল, কাঁচ ইত্যাদি ধীরে ধীরে কাঁসার স্থান দখল করিয়া লইতেছে। তবে অধিকাংশ গৃহে নিত্যব্যবহার্য থালা, বাটি ও গ্লাস ইত্যাদি এখনও কাঁসার। কাঁসার পাত্রের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে ইহাতে পিতলপাত্রের মতই অম্লদ্রব্য রাখা চলে না। অধিক উত্তাপ দিলে কিংবা কোন কঠিন বস্তুর উপর পড়িলে কাঁসা ফাটিয়া যাইতে পারে।

কাঁসার পাত্র পরিষ্কার করা খুব কঠিন নয়। তেঁতুল অথবা লেবু মাখিয়া পাতলা সাদা ছাই দিয়া মাজিলেই কাঁসার পাত্র পরিষ্কার হইয়া যায়। তবে অত্যন্ত ময়লা হইলে পাত্রগুলি প্রথমে সোডার জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিবে। তারপর লেবু, তেঁতুল অথবা ভিনিগার ও ছাই দিয়া মাজিয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলেই চলে। সর্বশেষে একটি পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া পাত্রগুলি মুছিয়া ফেল যাহাতে জল না লাগিয়া থাকে।

তাম্র পাত্র (Copper)—তাম্র পাত্র পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমে খুব গরম জলে ডুবাইয়া রাখ। তারপর একটি পাত্রে জলের সঙ্গে খানিকটা হোয়াইটিং গুলিয়া লও। তাম্রপাত্রগুলি গরম জল হইতে তুলিয়া লইয়া একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া লইতে হইবে। এইবার পাত্রগুলিতে হোয়াইটিং মিশ্রিত জল মাখাইয়া লইয়া গরম জলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল।

তাম্রপাত্রে তেল কালি লাগিলে লেবু, তেঁতুল অথবা ভিনিগার ও লবণ দিয়া পাত্রগুলি পরিষ্কার করিতে হয়।

লৌহ পাত্র (Iron)—লোহা আমাদের জীবনে অপরিহার্য ধাতু। গৃহস্থালীর কাজে আমরা লোহার কড়াই, খুন্তি, চাটু, বঁটি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি। সাধারণত তিন রকম উপায়ে লোহাকে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলা হয়।

(১) **ছাঁচে ঢালা লোহা** (Cast iron)—লোহাকে ছাঁচে ঢালিয়া কড়াই, সসপেন ইত্যাদি পাত্রের রূপ দেওয়া হয়। গরম জলে সোডা মিশ্রিত করিয়া এই সকল ছাঁচে ঢালা লৌহপাত্র ডুবাইয়া রাখিতে হয়। সোডা পাত্রের তেল, কালি ও যাবতীয় ময়লা অপসারিত করে। তারপর পাতলা সাদা ছাই দিয়া মাজিয়া পাত্রগুলি আবার গরম জলে ধুইয়া ফেলিবে। লৌহপাত্রে মরিচা ধরিলে ঝামা দিয়া ঘষিয়া ফেলিবে, নতুবা এমারিচূর্ণ (emery powder) দিয়া মাজিয়া পরে একটু তেল কিংবা ভেসিলিন মাখাইয়া রাখিবে।

(২) **পিটানো লোহা** (Wrought iron)—হাতুড়ি দিয়া লোহা পিটাইয়া বঁটি, দা, কুড়াল ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য কতকগুলি বস্তু প্রস্তুত করা হয়। উত্তাপ পাইলে কঠিন লোহাও নমনীয় হইয়া পড়ে। তখন হাতুড়ি পিটাইয়া ইচ্ছামত উহার আকৃতি তৈয়ারী করা সম্ভব হয়। এইরূপ পিটানো লোহার বস্তু যত্নে রাখিতে হইলে একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া বস্তুটি মুছিয়া লইয়া একটু তেল কিংবা ভেসিলিন মাখাইয়া রাখিবে।

(৩) **গ্যালভেনাইজড লোহা** (Galvanized iron)—ছাঁচে ঢালা লৌহ বস্তুর মত একই ভাবে গ্যালভেনাইজড লোহা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। গ্যালভেনাইজড লোহার লেপ উঠিয়া গেলে সেই স্থানটিতে একটু তেল মাখাইয়া রাখিবে। নতুবা উহাতে মরিচা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

সব রকমের লোহাই পরিষ্কার করিবার পরে খুব ভাল করিয়া মুছিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়। ভিজা লোহা অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিলেই মরিচা ধরিয়া যাইবে।

মাটির পাত্র (Earthenware vessels)—খাদ্যদ্রব্য রাখার পক্ষে মৃৎপাত্রই সর্বাপেক্ষা নির্দোষ। ইহাতে অম্ল, তিক্ত, কটু এবং কষায় সব রকমের পদার্থ ঢালিয়া রাখা যায়। ইহার ভিতর দিয়া সহজেই তাপ চলাচল করে বলিয়া মাটির পাত্র রন্ধনেরও বিশেষ উপযোগী। আমাদের দেশে এতকাল গৃহিণীরা মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না করিয়া আসিয়াছেন। মৃৎপাত্র অন্যান্য সমস্ত ধাতব পাত্রের চেয়ে দামেও সস্তা। তবে সহজেই ভাঙিয়া যায় বলিয়া মাটির হাঁড়ির আজকাল সমাদর অনেক কমিয়া গিয়াছে।

মাটির হাঁড়িতে জল ঢালিয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া উহার ভিতর ও বাহির প্রত্যহ উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে। মাঝে মাঝে পটাশ পারমাঙ্গানেট দিয়া হাঁড়ির ভিতরটি ধুইয়া ফেলিলে উহা বেশ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী থাকে।

রৌপ্য পাত্র (Silver)—রৌপ্য দামি ধাতু বলিয়া সাধারণ গৃহকর্মে ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। অবশ্য ধনীগৃহে রৌপ্য নির্মিত বাসন যে একেবারে ব্যবহার করা হয় না, তাহা নয়, তবে অন্যান্য ধাতব পাত্রের তুলনায় ইহার প্রচলন খুবই কম। রূপা অত্যন্ত নরম ধাতু। তাই রৌপ্য পাত্র পরিষ্কার করিবার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। রৌপ্যপাত্রগুলি প্রথমে গরম সাবানজলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। তারপর তুলিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া শুকাইয়া লইবে।

রূপার বাসনগুলি কারুকার্যখচিত হইলে উহাতে সহজেই ময়লা জমিয়া যায়। এইরূপ কারুকার্যখচিত পাত্র পরিষ্কার করিতে হইলে ফ্রেঞ্চ চক অথবা হোয়াইটিংয়ের সঙ্গে মেথিলেটেড স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া লও। তারপর একটি মসৃণ বস্ত্রখণ্ড দিয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থটি পাত্রগুলির গায় ধীরে ধীরে মাখাইয়া দাও। সমস্ত পাত্রগুলি এইভাবে মাখান হইলে গরম জলে সাবান গুলিয়া লইয়া দুই এক ফোঁটা অ্যামোনিয়া ঢালিয়া দিয়া রৌপ্য-পাত্রগুলি ধুইয়া ফেল। তারপর দ্রুত শুকাইয়া লও। বেশীক্ষণ ভিজা অবস্থায় থাকিলে উহাদের গায় দাগ পড়িতে পারে। সিলভো দিয়া ঘষিয়া লইলেও রৌপ্যপাত্র বেশ ঝকঝকে থাকে।

রৌপ্যপাত্রে কোন প্রকার অ্যাসিড প্রয়োগ করিতে নাই। সালফারের সংস্পর্শে আসিলে উহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হইয়া যায়।

জার্মান সিলভারের বাসনগুলি প্রথমে সাবান-জলে ধুইয়া লইতে হয়। তারপর অ্যালকোহল, অ্যামোনিয়া অথবা খড়ি চূর্ণ করিয়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পাত্রগুলির গায় পালিশ লাগাইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। রৌপ্য পাত্রের মত ইহাতেও কোন লেবু, তেঁতুল ইত্যাদি কোন অ্যাসিড ব্যবহার করিতে নাই। আমাদের দেশে জার্মান সিলভারের পাত্রের বহুল প্রচলন দেখা যায়। ইহা দামেও সস্তা।

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে আর দুইটি জিনিসের ব্যবহার দেখা যায়—একটি পাথর অপরটি স্টেনলেস স্টীল নির্মিত পাত্রাদি। মৃৎপাত্রের মতই পাথরের বাসনেও সব রকম খাদ্য নির্ভয়ে রাখা চলে। তবে পাথরের মধ্য দিয়া তাপ চলাচল করিতে পারে না বলিয়া উহা রন্ধনের কাজে ব্যবহার করা যায় না। বাংলা দেশের হিন্দু বিধবা মহিলারা সর্বদা পাথরের বাসনে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখেন। আহারের জন্যও তাঁহারা পাথরের থালা ব্যবহার করেন।

স্টেনলেস স্টীল দেখিতে প্রায় রূপার মত ঝকঝকে। ইহাতেও সর্বপ্রকার ক্ষার ও অম্লাত্মক খাদ্য নির্বিচারে রাখা চলে। তবে কাঁসা, পিতল ও তামার তুলনায় স্টেনলেস স্টীলের দাম অনেক বেশী। দক্ষিণ ভারতে ইহার বহুল প্রচলন দেখা যায়।

গরম সাবান জল দিয়া ধুইলে স্টীলের বাসন পরিষ্কার হইয়া যায়। অনেকে ভীম (Vim) দিয়া স্টেনলেস স্টীল পরিষ্কার করেন।

গৃহের পরিচ্ছন্নতা

সুষ্ঠুভাবে গৃহপরিচালনাতে গৃহিণীর গর্ব এবং আনন্দ। গৃহের পরিচ্ছন্নতা গৃহপরিচালনার একটি প্রধান অঙ্গ। খালি হাতে কখনও গৃহ পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। ইহার জন্য সর্বদাই কতকগুলি সামগ্রীর প্রয়োজন।

গৃহ পরিষ্কার করিবার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম—গৃহ পরিষ্কারের জন্য ফুল-ঝাড়ু, শক্ত ঝাঁটা, ঝাড়ন, ব্রাশ, মপ (mop) অথবা ন্যাতা, লম্বা হাতলওয়ালা ব্রাশ, কার্পেট ঝাড়িবার ঝাড়ন, ভ্যাকুয়াম ক্লীনার ইত্যাদি সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। বাড়ির মেঝে, বারান্দা ইত্যাদির ধুলাবালি ঝাঁট দিয়া ফেলিবার পক্ষে ফুলঝাড়ুই প্রশস্ত। ইহার অগ্রভাগ নরম ও মসৃণ থাকে বলিয়া সহজেই ধুলা ঝাঁটাইয়া ফেলা যায়। কলতলা, স্নানাগার ইত্যাদি পিচ্ছিল স্থানগুলি ঘষিয়া পরিষ্কার করিবার পক্ষে ব্রাশ অথবা শক্ত ঝাঁটাই প্রশস্ত। নারিকেল, খেজুর অথবা তাল গাছের পাতা চাঁছিয়া ফেলিয়া উহার ভিতরকার সরু কঠিন শির দিয়া ঝাঁটা প্রস্তুত হয়। ঘর ঝাঁটাইবার পরে আমরা সচরাচর ন্যাতা জলে ডুবাইয়া ঘর মুছিয়া ফেলি। ন্যাতা দিয়া ঘর মুছিবার একটি প্রধান অসুবিধা এই যে ইহাতে অনবরত মাটিতে নুইয়া কাজ করিতে হয়। ফলে অধিকক্ষণ ধরিয়া মোছার কাজ করিলে মেরুদণ্ড টনটন করিতে থাকে। ন্যাতার পরিবর্তে বাজারে প্রস্তুত মপ (লাঠির ডগায় পাট কিংবা অন্য কোন মসৃণ আঁশ লাগান ব্রাশ) দিয়া গৃহ পরিষ্কার করিলে অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়। চারি দেওয়াল ও সিলিং পরিষ্কার করিবার জন্য খুব লম্বা হাতলওয়ালা ব্রাশ (Turk's head broom) ব্যবহার করাই সমীচীন। এতদ্ব্যতীত কার্পেট পরিষ্কার করিবার জন্য কার্পেট ঝাড়ন (Carpet beater) ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গৃহ পরিষ্কার করিবার অন্যতম সামগ্রী হইল ভ্যাকুয়াম ক্লীনার। শীত-প্রধান দেশের বাড়িগুলির মেঝেতে কার্পেট পাতা থাকে বলিয়া ঐ সকল দেশে গৃহ পরিষ্কারের জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লীনারই আদর্শ যন্ত্র। তবে আমাদের দেশে ফুলঝাড়ুতেই কাজ চলিয়া যায়, তাই ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের বহুল প্রচলন দেখা যায় না।

এতদ্ব্যতীত গৃহ পরিষ্কার করিবার জন্য বালতি, মগ ইত্যাদি বিভিন্ন পাত্রের প্রয়োজন। শয়ন ঘর বিশেষত রান্নাঘর আমরা প্রত্যহই জল ঢালিয়া

ধুইয়া ফেলি। এই নিত্য-নৈমিত্তিক ধোয়ামোছার জন্য একটি বালতি ও মগ একেবারে অপরিহার্য। ঘর মোছা, বাসনপত্রাদি ধুইবার পরে পাত্রাদির গাত্রস্থিত জল শুকাইয়া লওয়া কিংবা ধাতবপাত্রাদি পালিশ করা ইত্যাদি কাজের জন্য পুরাতন বস্ত্রখণ্ডেরও প্রয়োজন হয়।

গৃহ পরিষ্কারের পরিকল্পনা—প্রত্যেক গৃহিণীই কিছুটা প্রাত্যহিক ধোয়া-মোছার কাজ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে গৃহের সমস্ত ময়লা অপসারিত হয় না এবং গৃহের প্রত্যেকটি কোণ, বাড়তি জামাকাপড়, বাসনকোসন ইত্যাদি পরিষ্কৃত হয় না। গৃহের সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতার জন্য তাহাকে দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং বাৎসরিক পরিকল্পনা করিয়া লইতে হয়।

দৈনিক পরিচ্ছন্নতা—শয়নকক্ষ: প্রাত্যহিক ধোয়ামোছা বলিতে শুধু-মাত্র কক্ষগুলির উপরিভাগের পরিচ্ছন্নতাই বোঝায়। প্রতিদিন গৃহে যে ধুলাবালি সঞ্চিত হয় উহা অপসারণ করাই দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য। প্রথমেই ঘরের দরজা জানালাগুলিকে খুলিয়া দাও। পাটি, মাদুর, সতরঞ্চি প্রভৃতি ঘরের বাহিরে নিয়া ঝাড়িয়া ফেল। বিছানা গুটাইয়া রাখিয়া সমস্ত কক্ষের ধুলা ঝাঁটাইয়া ফেল এবং একটা ঝাড়ন দিয়া সমস্ত আসবাব ও বইগুলি ঝাড়িয়া লও। এইবার ভজা ন্যাতা দিয়া সমস্ত কক্ষ মুছিয়া ফেলিয়া বিছানা পাতিয়া রাখ।

বৈঠকখানা: দরজা জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া ঘর ঝাড়িয়া ফেল। শয়ন কক্ষের মতই বসিবার ঘরও প্রত্যহ ধোয়ামোছা করা উচিত। বাহির হইতে বহু লোক জুতার সঙ্গে ধুলাবালি ও রোগজীবাণু নিয়া আসে। প্রতি-দিন বৈঠকখানা না ধুইলে ঐ ধুলা কক্ষে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং গৃহের লোকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। বৈঠকখানা ঘর মুছিবার পূর্বে সমস্ত আসবাব ঝাড়ন দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে। ফুলদানির জল ও বাসি ফুল বদলাইয়া নতুন ফুল সাজাইয়া রাখিবে।

রান্নাঘর: গৃহের সমস্ত কক্ষের চেয়ে রান্নাঘর ও খাবার ঘরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। রান্নাঘরের সমস্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত বাসনকোসন প্রতিদিন মাজিয়া ফেলিবে। রান্না ঘরের মেঝেতে প্রত্যহ যে সকল তেল কালি পড়ে তাহাও ভাল করিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবে এবং খাবার টেবিল প্রত্যহ দুই বেলা পরিষ্কার করিয়া রাখিবে।

পায়খানা ও স্নানাগার : পায়খানা ও স্নানাগার পরিষ্কার করাও প্রাত্যাহিক পরিচ্ছন্নতার অন্তর্গত। মেথর আসিলে জল ঢালিয়া দিয়া প্রত্যহ পায়খানা পরিষ্কার করাইবে। শহরে জলবাহিত প্রণালীর ব্যবস্থা থাকিলে পায়খানা ও প্রস্রাবাগারে জলের সঙ্গে নির্বীজক ঔষধ ঢালিয়া দিবে। তবে মলশোধনী পায়খানা হইলে এইরূপ নির্বীজক ঔষধ ঢালিতে নাই। স্নানাগারে অনবরত জল পড়িতে পড়িতে স্নানাগার পিচ্ছিল হইয়া পড়ে। তাই প্রতিদিন স্নানাগার ধৌত করিয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, শিশুদের জামা-কাপড় এবং অন্তর্বাস প্রতিদিন স্নানের সময় কাচিয়া ফেলিবে। ইহাও প্রাত্যহিক পরিচ্ছন্নতার অন্তর্গত।

সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা—দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতার চেয়ে সাপ্তাহিক ধোয়া-মোছার কাজে আরও বেশী মনোযোগ দিতে হয়, ইহা আরও বেশী খুটিয়া করিতে হয়। যেমন ধর প্রাত্যহিক ধোয়ামোছার কাজ করিবার সময় আমরা সাধারণত চারি দেওয়ালের ঝুল, মাকড়সার জাল ইত্যাদি ঝাড়িয়া ফেলি না। তাই সপ্তাহে অন্তত একবার করিয়া এই সকল ঝুল ঝাড়া উচিত। বিছানাপত্র সপ্তাহে একদিন রৌদ্রে দিয়া গরম করিয়া লইবে। এইরূপ রৌদ্রদগ্ধ শয্যায় ছারপোকার উৎপাত থাকে না। এতদ্ব্যতীত বাড়ির সমস্ত আবর্জনা স্তূপাকার করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। সপ্তাহে অন্তত একবার নির্বীজক ঔষধ দিয়া ঘরের মেঝে ধুইয়া ফেলিবে। দরজা জানালার পর্দা, বিছানা ইত্যাদি সপ্তাহে একবার করিয়া কাচিবে এবং সমস্ত জামাকাপড় ইস্ত্রি করিবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট রাখিবে।

বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতা—প্রতিদিন এবং সপ্তাহে একবার করিয়া বাড়িঘর পরিষ্কার করিলেও সমস্ত বাড়ি জঞ্জালমুক্ত হয় না, কারণ আলমারির কোণে, দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবির গায় এত ধুলাবালি জমিয়া থাকে, পুরাতন বাসনকোসন ও আসবাবের এমনভাবে পালিশ নষ্ট হইয়া যায় ও রং চটিয়া যায় যে বৎসরে অন্তত একবার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি বাছিয়া ফেলিয়া বাড়িঘর জঞ্জালমুক্ত করিতে হয় এবং আসবাবপত্র মেরামত ও পালিশ করিতে হয়। সাধারণত বাড়ি চুনকাম করাইবার সময় ঘরের জিনিসপত্র বাহির করিতে হয় বলিয়া বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতার কাজটাও অনেকে একই সঙ্গে চুকাইয়া ফেলেন। শীতের প্রয়োজনীয় পোশাক ও শয্যাদ্রব্য প্রস্তুত করা এবং বাড়ির যাবতীয় রেশমী পশমী বস্ত্রাদি একবার রৌদ্রে দেওয়া অথবা কাচাইয়া লওয়া উভয়ই

বাৎসরিক কাজের অন্তর্গত। বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতার কাজকে দুই পর্যায়ে ভাগ করিতে পারি—(১) ধুলাবালির অপসারণ ও জঞ্জালমুক্তি করা, (২) গৃহের মেঝে, দেওয়াল, বস্ত্রাদি, বাসনকোসন ও আসবাবের পরিচ্ছন্নতা ও ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করা।

ধুলাবালি অপসারণ—ধূলি সাধারণত দুই প্রকার—জৈব ধূলি ও অজৈব ধূলি। ছেঁড়া চুল, হাতের নখ, নিষ্ঠীবন ও মলমূত্রাদি অর্থাৎ মানুষ কিংবা অপর প্রাণীর দেহ হইতে নির্গত হইয়া যে সকল পদার্থ ধূলিতে পরিণত হইয়াছে তাহা সমস্তই জৈব ধূলির অন্তর্গত। মাটি, বালুকণা অথবা অপর কোন ধাতব পদার্থ চূর্ণকে অজৈব ধূলি বলে।

ধূলির মত ক্ষতিকর বস্তু কমই আছে। ধূলিকণার সঙ্গে রোগের জীবাণু মিশ্রিত থাকে। মলমূত্র, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির সঙ্গে যে সকল রোগজীবাণু নির্গত হয় উহারা ধূলির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আমাদের খাদ্য ও পানীয় দূষিত করে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। অদৃশ্যভাবে ধূলিকণা সর্বদা আমাদের ঘরের আনাচে কানাচে সঞ্চিত হইয়া থাকে। কোন স্যাঁতালো জায়গায় কিংবা তেলের উপরে ধূলি পড়িয়া কালো চটচটে হইয়া যায়। এই কারণে বাড়ির অন্যান্য কক্ষের মধ্যে রান্নাঘরটি সবচেয়ে বেশী ময়লা হয়। আবার মসৃণ স্থানের চেয়ে খসখসে দেওয়ালে সহজেই ময়লা আটকাইয়া যায়। প্রতিদিন অন্তত একবার করিয়া বাড়ি পরিষ্কার না করিলে উহা শীঘ্রই বাসের অনুপযুক্ত হইয়া ওঠে। তবে আমরা প্রত্যহ যেভাবে গৃহ পরিষ্কার করি তাহাতে গৃহের উপরিভাগের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হইলেও বইপত্র, আলমারি, ঘরের কোণ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। তাই বৎসরে অন্তত একবার বাড়িঘর চুনকাম করাইবে, দরজা জানালা রং করাইবে এবং সমস্ত গৃহের জঞ্জাল দূর করিবে।

বাড়ির মেঝে, আসবাবপত্র ও বাসনকোসনের পরিচ্ছন্নতা—ধূলিকণা ও জঞ্জাল অপসারণ করা ব্যতীত বাড়ির আসবাব পালিশ করাইবার প্রয়োজন আছে। গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি পালিশ করাইবার উদ্দেশ্য একাধারে উহাদের পরিষ্কার করা এবং বস্তুগুলির ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখা। ধাতবপাত্রাদি, কাচের বাসন, বেত ও কাঠের আসবাব, চামড়ার জিনিস ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার উপাদান ও পদ্ধতি এক নয়। কোন্ বস্তু কি উপায়ে রাখিতে হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

বিভিন্ন ধাতু, কাচ, বেত, কাঠ ও চর্মনির্মিত বস্তু পরিষ্কার রাখিবার উপায়

ধাতু (Metals)

ধাতু আমাদের একটি নিত্য ব্যবহার্য বস্তু। ইহার অভাবে মানবসভ্যতার অগ্রগতি কোনমতেই সম্ভব হইত না। দৈনন্দিন কাজগুলিও ধাতু না হইলে অচল হইয়া থাকিত। ধাতুর ব্যবহার ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানিয়া রাখা উচিত।

লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি যে সকল ধাতু আমরা সচরাচর ব্যবহার করি উহাদের কোনটিই ধাতু হিসাবে খনিতে পাওয়া যায় না। তবে ভূপৃষ্ঠে অথবা মাটির অনেক নীচে ভূগর্ভে ঐ সকল ধাতুর খনিজ (mineral) পাওয়া যায়। ঐ খনিজে উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু থাকিলে কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহা নিষ্কাশন করা হয়। যে খনিজ কোন বিশেষ ধাতু নিষ্কাশনের পক্ষে উপযোগী সেই খনিজকে সেই বিশেষ ধাতুর আকরিক বলে।

কোন কোন ধাতু এত নরম থাকে যে, মৌলিক অর্থাৎ বিশুদ্ধ অবস্থায় উহাদের ব্যবহার করা চলে না। ঐ সকল বিশুদ্ধ ধাতুর সঙ্গে অল্লাধিক পরিমাণে অপর একটি বা একাধিক ধাতু মিশ্রিত করিয়া নিলে তাহা খুব মজবুত হইয়া উঠে। এইরূপ মিশ্রিত ধাতুকে বলে সংকর ধাতু (alloy)। দৈনন্দিন কাজে বিশুদ্ধ ধাতু অপেক্ষা সংকর ধাতুরই ব্যবহার বেশী। খাঁটি সোনা এত নরম যে সামান্য চাপ পড়িলে উহা বাঁকিয়া যায়। এজন্য অলংকার প্রস্তুতের সময় সোনার সঙ্গে অল্প পরিমাণ তামা, রূপা ইত্যাদি মিশাইয়া লওয়া হয়। সোনার পরেই লোহার নাম উল্লেখযোগ্য। তোমরা জান মানবসভ্যতায় লোহার দান অপরিমেয়। এই লোহাও বিশুদ্ধ আকারে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বিশুদ্ধ লোহা এত দুর্বল যে উহা সামান্য চাপে বাঁকিয়া যায়। বিশুদ্ধ লোহাকে তাই কাঁচা লোহা (Soft iron) বলে। কাঁচা লোহার সহিত অল্প পরিমাণে কার্বন ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ইস্পাতে পরিণত করা হয়। ইস্পাত অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত ধাতু। বস্তুত ইস্পাত লোহার একটি সংকর ধাতু মাত্র।

উপযোগিতার দিক হইতে বিচার করিলে ধাতুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:—

(ক) আলঙ্কারিক ধাতু (Ornamental metals)—সোনা, রূপা, তামা, ব্রঞ্জ, ইত্যাদি।

(খ) উপযোগী ধাতু (Useful metals)—লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, টিন, গ্যালভেনাইজড লোহা ইত্যাদি। রান্নাঘরের কাজে এই ধাতুগুলিরই ব্যবহার বেশী।

রং-এর দিক হইতেও ধাতু দুই রকমের—

(ক) সাদা ধাতু (White metals)—রূপা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলির বর্ণ সাদা।

(খ) রঙিন ধাতু (Coloured metals)—সোনা, তামা, কাঁসা ও পিতলই প্রধান।

(ক) সাদা ধাতু (White metals)—

১। **লৌহ** (Iron)—লোহার আকরিক হইল হিমাটাইট (hematite)। ব্লাস্ট ফারনেস নামক একপ্রকার চুল্লীর সাহায্যে হিমাটাইট হইতে লোহা নিষ্কাশন করা হয়। ব্লাস্ট ফারনেস হইতে যে লোহা পাওয়া যায় তাহাকে বলে ঢালাই লোহা বা কাস্ট আয়রণ (Cast iron)।

লোহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইলে তাহাকে পেটা লোহা বা রট আয়রণ (Wrought iron) বলে। এই লোহা পিটাইয়া বঁটি, দা, খন্তা, পেরেক, তার প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ঢালাই লোহার সহিত অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া যে সংকর ধাতু উৎপন্ন হয় তাহার নাম ইস্পাত (steel)। রেল লাইন, কড়ি বরগা, পুলের বীম প্রভৃতি সকলই ইস্পাত-নির্মিত। ইস্পাত নানা রকমের। ঘড়ির স্প্রীংয়ের ইস্পাত, ছুরি-কাঁচির ইস্পাত, মরিচাহীন ইস্পাত (Stainless steel), মোটা প্লেট তৈয়ারী করিবার ইস্পাত ইত্যাদি বহু রকমের ইস্পাত আছে। মরিচাহীন ইস্পাতে শতকরা ১৫ কি ১৬ ভাগ ক্রোমিয়াম মিশ্রিত থাকে। পেটা লোহা ও ইস্পাতের মাঝামাঝি লোহাকে নরম ইস্পাত (mild steel) বলে। উহা দ্বারা লোহার প্লেট, শীট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বালতি, টিনের ঘরে ব্যবহৃত ঢেউ খেলানো টিন প্রভৃতি এই নরম ইস্পাত-নির্মিত। লোহার পাতলা পাত প্রস্তুত

করিয়া উহার উপর দস্তার লেপ দিলে তাহাকে বলে গ্যালভেনাইজড লোহা। বালতি প্রভৃতি জিনিস এই গ্যালভেনাইজড লোহার দ্বারা প্রস্তুত হয়। লেপ না উঠিলে এই লোহায় সহজে মরিচা পড়ে না।

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)—একটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। বর্তমানকালের জীবনযাত্রায় লোহার পরেই অ্যালুমিনিয়ামের স্থান। এই ধাতুটি যেমন সুন্দর তেমনি হাল্কা। সব রকমের খাদ্য ইহাতে অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায় বলিয়া এবং জলে বাতাসে স্থায়ী বলিয়া ইহার ব্যবহারের অন্ত নাই।

ধাতু হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত নরম। পেষণ যন্ত্রে চাপ দিয়া উহাকে পাতলা পাতে পরিণত করা যায়। তারপর ঐ পাত হইতে হাঁড়ি, কড়াই, গ্লাস, বাটি প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। হাল্কা, টেকসই এবং তাপ-পরিবাহী (good conductor of heat) বলিয়া রান্নার কাজে ইহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

অ্যালুমিনিয়াম পরিষ্কার রাখিবার উপায় পূর্বেই (১০৭পৃঃ) বর্ণিত হইয়াছে।

দস্তা (Zinc)—রূপার মত সাদা উজ্জ্বল এই ধাতুটি আমাদের অতি পরিচিত। নতুন বালতি অথবা ঢেউখেলানো টিনে আমরা যে সাদা রংটি দেখিতে পাই উহাই দস্তা। লোহার পাতের উপর দস্তার লেপ দিয়া সেই পাত দিয়া এই সকল বালতি ও টিন প্রস্তুত হয়। লোহার পাতে দস্তার লেপের উপযোগিতা এই যে ঐরূপ লোহায় মরিচা ধরিতে পারে না। দস্তা বায়ুতে পোড়াইলে এক প্রকার সাদা রংয়ের বস্তু পাওয়া যায়। উহার রাসায়নিক নাম জিঙ্ক অক্সাইড। বাজারে রং হিসাবে জিঙ্ক অক্সাইড বিক্রি হয়।

গরম সাবান জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে দস্তার জিনিস পরিষ্কার হইয়া যায়। তবে তৈলাক্ত হইলে ধুইবার সময় সোডা ব্যবহার করিবে। পাত্রে যদি কোনরূপ দাগ থাকে তবে বাথ ব্রিক অথবা বালু দিয়া ঘষিয়া প্রথমে দাগ তুলিয়া ফেলিবে। তারপর পরিষ্কার বস্তুটি জলে ধুইয়া শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া রাখিবে।

দস্তা পরিষ্কার করিবার আরও একটি উপায় আছে। সংবাদপত্রে কিছুটা প্যারাফিন মাখাইয়া দস্তার বস্তুটি মার্জনা কর। তারপর উহা গরম জলে ধুইয়া ফেলিয়া শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া লও।

রূপা (Silver)—রূপা সত্যই রূপবান ধাতু। সীসা, দস্তা ও তামা যে সকল খনিজ হইতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে সর্বদাই অল্পবিস্তর রূপা থাকে। জলে বাতাসে মলিন হয় না বলিয়া সকল দেশেই রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন রহিয়াছে। এখনকার টাকায় অবশ্য রূপার পরিবর্তে নিকেল ব্যবহৃত হইতেছে। অলঙ্কার হিসাবেও রূপার আদর আছে। তবে রূপা কেবল আলঙ্কারিক ধাতু নয়, ইহার ব্যবহারিক মূল্যও নগণ্য নয়। দৈনিক ব্যবহার্য তৈজসপত্রাদিতে, মেডেল, কাপ ইত্যাদি বস্তুতে রূপা এবং রূপার বিভিন্ন সংকর ধাতুর ব্যবহার হয়। সিলভার ব্রোমাইড নামক একটি বস্তুর সাহায্যে ফটো তোলা সম্ভব হইতেছে। রূপার আর একটি ব্যবহার দেখা যায় আয়না তৈয়ারীতে। আয়না প্রকৃতপক্ষে রূপার অতি উৎকৃষ্ট প্রতিফলক মাত্র।

রৌপ্য দ্রব্য পরিষ্কার রাখার উপায় পূর্বেই (১১০ পৃঃ) বর্ণিত হইয়াছে।

সীসা (Lead)—সীসাও একটি প্রয়োজনীয় ধাতু। ছাপাখানার হরফে, জলের পাইপে, বন্দুকের গুলীতে, বৈদ্যুতিক তারের খাপে সীসা ব্যবহৃত হয়। সীসা পুড়িয়া নানা রকমের রং তৈয়ারী হয়। উহাদের মধ্যে হলুদ রংয়ের লিথার্জ, লাল রংয়ের রেড লেড এবং সাদা রংয়ের হোয়াইট লেড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জল ও সাবান দিয়া মাজিলেই সীসা পরিষ্কার হইয়া যায়। অতিরিক্ত ময়লা হইলে ঠাণ্ডা জলের পরিবর্তে গরম জল ব্যবহার করিবে।

টিন (Tin)—আধুনিক জীবনযাত্রায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাতুগুলির মধ্যে টিন অন্যতম। বস্তুত টিনের অভাব ঘটিলে সভ্যতার এক দারুণ সঙ্কট দেখা দিবে। টিন আছে বলিয়াই বহু খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হইতেছে। জ্যাম, জেলী, মাখন, দুধ, ওভালটিন প্রভৃতি নানারূপ চূর্ণ পানীয় টিনের কৌটাতে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যে সকল কৌটায় এই সকল খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষিত হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে লোহার পাতে প্রস্তুত এবং ঐ লোহার উপর টিনের অত্যন্ত পাতলা প্রলেপ দেওয়া থাকে। এই প্রলেপের কাজে খুব সামান্য টিনই ব্যবহৃত হয় অথচ ঐটুকু টিনের অভাবে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। টিনের সংস্পর্শে খাদ্যদ্রব্য অবিকৃত অবস্থায় থাকে। সাবান এবং জল দিয়া টিন পরিষ্কার করা যায়। পাত্রটি খুব ময়লা হইলে উষ্ণ জলে সাবান গুলিয়া কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখ এবং তারপর মাজিয়া ফেল। তৈলাক্ত পাত্রে কোন দাগ পড়িলে স্টীল-উল অথবা বালু দিয়া পাত্রটি মাজিয়া ফেলিলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

সাদা ধাতু

ধাতুর নাম	পরিষ্কার রাখিবার সরঞ্জাম	দাগ তুলিবার সরঞ্জাম	পরিষ্কার করিবার প্রণালী	বিশেষ নির্দেশ
লৌহ	গরম জল, সোডা, ছাই	ঝামা অথবা এমারিচূর্ণ দিয়া মরিচা তুলিবে	গরম জলে সোডা মিশ্রিত করিয়া পাত্রগুলি ডুবাইয়া রাখ। তারপর সাদা ছাই দিয়া মাজিয়া, পুনর্বার গরম জলে ধুইয়া ফেলিবে।	ধুইবার পরে লৌহ পাত্র সর্বদা শুকাইয়া রাখিবে। সংরক্ষণ করিতে হইলে তেল অথবা ভেসিলিন মাখাইয়া রাখিবে।
অ্যালুমিনিয়াম	গরম জল, ছাই অথবা হোয়াইটিং	স্টীল-উল	ছাই অথবা হোয়াইটিং দিয়া মাজিয়া গরম জলে ধুইয়া শুকাইয়া লও। দাগ থাকিলে স্টীল-উল দিয়া ঘষিয়া দাগ তুলিয়া ফেল।	কখনও সোডা ব্যবহার করিবে না।
দস্তা	গরম সাবান জল, সোডা, প্যারাফিন, সংবাদপত্র ও বস্ত্রখণ্ড	বাথ ব্রিক, বালু	(১) সাবান জলে ধোও এবং তৈলাক্ত হইলে সোডা ব্যবহার কর। (২) অথবা সংবাদপত্রে প্যারাফিন লাগাইয়া ঘষিয়া দাও। তারপর গরম জলে ধুইয়া ফেল, বাথ ব্রিক বা বালুর সাহায্যে দাগ তোল।	

সাদা ধাতু				
ধাতুর নাম	পরিষ্কার রাখিবার সরঞ্জাম	দাগ তুলিবার সরঞ্জাম	পরিষ্কার করিবার প্রণালী	বিশেষ নির্দেশ
রূপা	উষ্ণ সাবান জল ও বস্ত্রখণ্ড		সাবান জলে ভিজাইয়া বস্ত্রখণ্ড দিয়া ধীরে ধীরে ঘষিয়া লও। কারুকার্যখচিত বাসনের ক্ষেত্রে হোয়াইটিং ব্যবহার করিবে।	অ্যাসিড লাগাইবে না।
সীসা	উষ্ণ সাবান জল ও বস্ত্রখণ্ড		উষ্ণ সাবান জলে ধুইয়া লও।	
টিন	উষ্ণ সাবান জল, সোডা ও বস্ত্রখণ্ড	(১) স্টীল-উল (২) বালু	ময়লা হইলে উষ্ণ সাবান জলে ডুবাও তৈলাক্ত হইলে সোডা ব্যবহার করিবে। স্টীল-উল অথবা বালু দিয়া দাগ তুলিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া পাত্রটি মুছিয়া লও।	

রঙিন ধাতু

ধাতুর নাম	পরিষ্কার রাখিবার সরঞ্জাম	দাগ তুলিবার সরঞ্জাম	পরিষ্কার করিবার প্রণালী	বিশেষ নির্দেশ
সোনা	উষ্ণ সাবান জল ও একটি ব্রাশ		উষ্ণ সাবান জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া ব্রাশ দিয়া ধীরে ধীরে ঘষিয়া ফেল।	
পিতল	লেবু কিংবা তেঁতুল, লবণ, ছাই ও জল, ব্রাসো (Brasso)	(১) লেবু (২) তেঁতুল	লেবু অথবা তেঁতুল ও লবণ মাখাইয়া রাখিয়া ছাই দিয়া মাজিয়া ফেল। তারপর জলে ধুইয়া সামান্য ব্রাসো মাখাও।	তেঁতুল বা লেবু মাখাইয়া পাত্রটি বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিও না।
কাঁসা	লেবু কিংবা তেঁতুল, ছাই, জল ও বস্ত্রখণ্ড	(১) লেবু (২) তেঁতুল	তেঁতুল অথবা লেবু মাখাইয়া ছাই দিয়া ঘষিয়া ফেল। তারপর ঠাণ্ডা জলে ধোও।	ঐ
তাম্র	উষ্ণ জল, হোয়াইটিং ও বস্ত্রখণ্ড	(১) লেবু (২) তেঁতুল (৩) ভিনিগার ও লবণ	প্রথমে উষ্ণ জলে ডুবাইয়া রাখ। তারপর জলে হোয়াইটিং গুলিয়া লইয়া পাত্রগুলি মাজিয়া লও। দাগ থাকিলে লেবু, তেঁতুল অথবা ভিনিগারের সাহায্যে দাগ তুলিয়া ফেল।	ঐ

(খ) রঙিন ধাতু (Coloured metals)—কাঁসা, পিতল, তামা ও সোনা এই চারিটি ধাতুই প্রধানত রঙিন ধাতু বলিয়া গণ্য। প্রথম তিনটি সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। এখানে শুধুমাত্র সোনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

সোনা—সোনা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সুন্দর ধাতু। কেবলমাত্র সৌন্দর্যের জন্যই সোনা আদৃত নয়। উহা অত্যন্ত স্থায়ী ধাতু এবং দীর্ঘকাল জলে বাতাসে ফেলিয়া রাখিলেও উহার ক্ষতি হয় না। পৃথিবীর সকল দেশেই সোনার মূল্য সুনির্দিষ্ট এবং আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার কাজ সোনার মাধ্যমে হইয়া আসিতেছে। সোনা কাহারও সহিত মিলিতে চায় না। ইংরাজীতে তাই ইহাকে অভিজাত (noble) ধাতু বলা হয়। অত্যন্ত দামি ধাতু বলিয়া সাধারণ গৃহে সোনা দ্বারা শুধু অলঙ্কারই নির্মিত হইয়া থাকে। গৃহিণীদের কাছে সোনার অলঙ্কার অত্যন্ত প্রিয়।

সোনার অলঙ্কার পরিষ্কার রাখা খুব সহজ। গরম সাবান জলে অলঙ্কারটি কিছুক্ষণ ধরিয়া ভিজাইয়া রাখ। জলের সংস্পর্শে আসিলেই উহার ময়লা গলিয়া যাইবে। তারপর একটি ব্রাশ দিয়া ধীরে ধীরে ঘষিয়া ফেলিলে সোনা একেবারে ঝকঝকে হইয়া উঠিবে।

কাচ

মানুষ কবে যে কাচ তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে কাচ আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নানা কাজে আমরা এখন কাচ ব্যবহার করিয়া থাকি। কাচের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর কাচ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাচের ব্যবহার নিম্নরূপ :—

(১) কাচের বাসনপত্র—বাসনপত্রের মধ্যে কাচের গ্লাসের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশী। তবে কাচের কাপ, ডিশ, থালা, জগ ইত্যাদির ব্যবহারও কম নয়। আজকাল রান্না করিবার উপযুক্ত কাচও প্রস্তুত হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে রন্ধনের কাজে কাচের ব্যবহার দেখা যায়।

(২) শৌখিন দ্রব্য—কাচের নানারূপ শৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেকে কাচের ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়া রাখেন।

(৩) জানালায় কাচ লাগান হয়।

(৪) কাচের আর একটি ব্যবহার হইল আয়না। আয়না ব্যতীত প্রসাধন অসম্ভব। প্রত্যেক ঘরে ঘরেই আজকাল আয়নার প্রচলন।

(৫) স্নানের ঘরে কাচের তাকে স্নানের সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখা হয়।

(৬) এতদ্ব্যতীত কাচ আমাদের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সাহায্য করে। প্রখর সূর্যকিরণ হইতে চোখকে রক্ষা করে কাচের কালো চশমা। মোটর গাড়িতে যে কাচ লাগান থাকে তাহারও উদ্দেশ্য চালক ও আরোহীদের নিরাপত্তা রক্ষা করা।

কাচের বাসন—কাচের বাসনগুলি প্রথমে একটি ট্রেতে করিয়া সাজাইয়া লও। গ্লাস কিংবা বাটিতে যদি দুধ, চা, কিংবা অপর কোন পানীয় দ্রব্য পড়িয়া থাকে তবে প্রথমে উহা ফেলিয়া দিয়া ঠাণ্ডা জলে পাত্রগুলি ধুইয়া লইবে। তারপর একটি বড় গামলার মধ্যে বাসনগুলি একটি একটি করিয়া সাজাইয়া লইয়া উহাতে সাধারণ উষ্ণ জল ঢালিয়া দিবে। জল অতিরিক্ত উষ্ণ হইলে বাসনগুলি ফাটিয়া যাইতে পারে। এইবার পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড লইয়া শুধুমাত্র আঙ্গুলের সাহায্যে এক একটি পাত্র ধীরে ধীরে মাজিয়া ফেল। একবারে একটির বেশী পাত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিবে না। বাসনগুলি মাজা হইয়া গেলে পুনরায় উষ্ণ জলে ধুইয়া ফেলিয়া উবুড় করিয়া রাখিয়া পাত্রের জল ঝরাইতে দাও। তারপর একটি শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া এক একটি পাত্র মুছিয়া লইয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখ। দুই চারিদিন অন্তর বাসনগুলি সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলিবে। কাচের পাত্রে কোন তৈলাক্ত দ্রব্য লাগিয়া থাকিলে অবশ্য সর্বদাই গরম জল ও সাবান দিয়া এবং প্রয়োজন হইলে সোডা দিয়া মাজিয়া ফেলিবে।

(২) **ফুলদানি প্রভৃতি শৌখীন দ্রব্য**—বাসনপত্রের মত ফুলদানি প্রভৃতি শৌখিন দ্রব্যও মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিতে হয়। ঠাণ্ডা জলে ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া ধুইয়া ফেলিয়া একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া মার্জনা করিলে কাচের ফুলদানি সুন্দর ঝকঝকে হইয়া ওঠে। তবে কাচে কোনরূপ দাগ পড়িলে নিম্নলিখিত যে কোন একটি উপায়ে দাগ তুলিতে পার :—

(ক) দশ আউন্স ভিনিগারের সঙ্গে বড় দুই চামচ লবণ মিশাইয়া পাত্রটিতে কিছুক্ষণ ঢালিয়া রাখ। তারপর বস্ত্রখণ্ড দিয়া মার্জনা করিয়া ফেলিলে কাচের দাগ উঠিয়া যাইবে।

(খ) পাত্রটিতে ঠাণ্ডা জল ও চা পাতা ঢালিয়া রাখ। তারপর ভাল করিয়া মাজিয়া ফেল।

(গ) খবরের কাগজ অথবা ব্লটিং পেপার দিয়া ঘষিয়া ফেল। এই প্রক্রিয়াতেও কাচের দাগ তোলা যায়।

(ঘ) বালু এবং জল দিয়া অথবা

(ঙ) বালু এবং ভিনিগার দিয়া পাত্রটি মাজিয়া ফেল। উপরোক্ত যে কোন একটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে দাগ তুলিয়া লইয়া পাত্রটি গরম জল ও সাবান দিয়া পুনর্বার ধুইয়া ফেলিবে। গরম জলে কয়েক ফোঁটা ভিনিগার ফেলিয়া দিলে পাত্রের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। ধোওয়া হইয়া গেলে শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া পাত্রের সমস্ত জল মুছিয়া লইবে।

(৩) **দরজা জানালার কাচ**—দৈনন্দিন ব্যবহারের বাসনপত্র যে কাচ দিয়া নির্মিত হয় সেই কাচ দরজা জানালায় ব্যবহৃত হয় না। উহার জন্য সর্বদা স্বতন্ত্র কাচ ব্যবহার করা হয়। কাচের দরজা জানালা পরিষ্কার রাখিতে হইলে প্রত্যহ টিস্যু পেপার কিংবা খবরের কাগজ দিয়া দরজা জানালা আস্তে আস্তে ঝাড়িয়া ফেলিবে। তবে অতিরিক্ত ময়লা হইয়া গেলে কাচ ধুইয়া ফেলা উচিত। ঠাণ্ডা কিংবা ঈষদুষ্ণ জলে খবরের কাগজ ডুবাইয়া লইয়া ঘষিয়া ফেলিলে কাচ বেশ পরিষ্কার দেখায়। রান্নাঘরের কাচে অনেক সময় তেল কালি লাগিয়া থাকে। ঐরূপ কাচ পরিষ্কার করিতে হইলে জলে কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া ফেলিয়া দিবে। দরজা জানালার কাচে কোনরূপ দাগ থাকিলে মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া ঘষিলে দাগ উঠিয়া যাইবে। এইভাবে দাগ তুলিয়া লইবার পরে খবরের কাগজ দিয়া পাত্রটি ধীরে ধীরে মুছিয়া লইবে।

(৪) **আয়নার কাচ**—মেথিলেটেড স্পিরিট মিশ্রিত জল অথবা শুধুমাত্র মেথিলেটেড স্পিরিটে একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া লইয়া আয়নার কাচ ঘষিয়া ফেলিবে। এইভাবে আয়না পরিষ্কার করিবার সময় লক্ষ্য রাখিও জল যেন আয়নার ফ্রেমের ভিতর ঢুকিয়া না যায়। আয়না ধোওয়া হইয়া গেলে শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া আয়নাটি পুনর্বার মুছিয়া লইবে।

(৫) **স্নানের ঘরের কাচ**—স্নানের ঘরের কাচের তাক নিয়মিত পরিষ্কার রাখা উচিত, কারণ, উহাতে সাবান, তেল ইত্যাদি পড়িয়া সহজেই কাচটি ময়লা চটচটে হইয়া ওঠে। গরম জলে সাবান গুলিয়া লইয়া ধুইয়া ফেলিলে এইরূপ কাচ বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। তবে কাচ পরিষ্কার করিবার সময় সপ্তাহে অন্তত একবার জলে কয়েক ফোঁটা মেথিলেটেড স্পিরিট

ঢালিয়া দিয়া কাচ ধুইবে। তাহাতে স্নানের ঘরের কাচ খুব ঝকঝকে থাকে।

চশমা কিংবা মোটর গাড়ির কাচ সাধারণ কাচের নিয়মে পরিষ্কার করিবে।

বেত

কাঠের মতই গৃহস্থালীর নানা কাজে বেতেরও প্রয়োজন হয়। বেতের ঝুড়ি, আসবাব, হাতব্যাগ ইত্যাদি নানা বস্তুতে আমরা বেত ব্যবহার করিয়া থাকি। হাল্কা বলিয়া বেতের আসবাব সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়। বাড়িতে এক প্রস্থ বেতের আসবাব থাকিলে ইচ্ছামত উহা লনে কিংবা গৃহের সংলগ্ন বারান্দায় টানিয়া নিয়া বসা যায়। সকল গৃহিণীরই বেতের আসবাব পরিষ্কার রাখার প্রণালী জানিয়া রাখা ভাল। ঝাড়ন কিংবা লম্বা দাঁতওয়ালা ব্রাশ দিয়া প্রত্যহ বেতের আসবাব ঝাড়িয়া ফেলিবে। ময়লা হইলে সাবান গুলিয়া লইয়া বেতের সামগ্রী ধুইয়া ফেলিলেই উহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। বেতের পালিশ উঠিয়া গেলে তেলের দুই প্রস্থ পাতলা পেইন্ট লাগাইয়া দিলে উহার ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

কাঠ

গৃহস্থালীর সঙ্গে কাঠের এক নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। আমাদের গৃহ নির্মাণের একটি প্রধান উপাদান হইল কাঠ। কাঠ দিয়া সমস্ত বাড়ি প্রস্তুত করা যায়, পাকা বাড়িরও দরজা জানালাগুলি থাকে কাঠের। আমাদের আসবাবপত্রও প্রধানত কাঠের তৈয়ারী। এতদ্ব্যতীত আমরা কিছু কিছু কাঠের বাসনও ব্যবহার করি। জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য এই কাঠের উপর সাধারণ যত্ন নিলেই উহা মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

গাছ হইতে কাঠ কাটিয়া লইয়া প্রয়োজনীয় বস্তু ও আসবাবের আকৃতি দিয়া আমরা সাধারণভাবে কাঠ ব্যবহার করিতে পারি। আবার উহাকে পালিশ করিয়া, বার্ণিশ করিয়া, তেল মাখাইয়া, পেণ্ট করিয়া, কিংবা কৃত্রিম উপায়ে উহার গায় দাগ ফেলিয়া (Stained wood) সুন্দর করিয়া লওয়া যায়। কোন্ কাঠ কি উপায়ে পরিষ্কার করিতে হয় নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।

সাধারণ কাঠ (Plain wood)—ছুতার কাঠের উপর তাহার হাতুড়ি, বাটালি চালাইয়া বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি দেয় এবং উহাকে মানুষের ব্যবহারের

উপযোগী করিয়া তোলে। এইরূপ কাঠকে বলে সাধারণ কাঠ। পরিষ্কার বালু এবং জল দিয়া ঘষিলেই সাধারণ কাঠের জিনিস পরিষ্কার হইয়া যায়। রান্নাঘরের তাক, কাঠের গামলা ইত্যাদি এইরূপ সাধারণ কাঠ দিয়া প্রস্তুত হয়। কাঠের সামগ্রী ধুইবার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া লইবে। ভিজা কাঠ জল টানিয়া লয় এবং বহুদিন ভিজা থাকিতে থাকিতে ফুলিয়া ওঠে। অবশেষে উহা ফাটিতে শুরু করে। কাঠের রং কালো হইয়া গেলে কিংবা উহাতে কোনরূপ দাগ পড়িলে ঠাণ্ডা জল, সোডা অথবা পটাশ সলিউশান দিয়া ঘষিলে আগেকার স্বাভাবিক রং ফিরিয়া আসে। কাঠে কালির দাগ পড়িলে অল্প পরিমাণ অক্‌জালিক অ্যাসিড মাখিয়া ব্রাশ দিয়া ঘষিয়া সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে দাগ উঠিয়া যায়।

পেইন্ট করা কাঠ (Painted Wood)—কাঠের স্বাভাবিক রং যদি সুন্দর হয় তবে উহা পেইন্ট করিবার প্রয়োজন হয় না। কাঠ তেল-রং করিতে হইলে বাজার হইতে তেল-রং কিনিয়া আনিয়া কাঠের গায় লাগাইয়া দিতে পার। রং খুব পুরু হইলে উহাতে তার্পিণ তেল মিশাইয়া লইবে। উপর হইতে নীচের দিকে একভাবে ব্রাশ টানিয়া পেইন্ট করিতে হয়। পেইন্ট করা কাঠ ময়লা হইয়া গেলে উহা সাবান জল দিয়া ধুইয়া ফেলা যায়। তবে পেইন্ট করা কাঠে কখনও সোডা ব্যবহার করিতে নাই। অতিরিক্ত ময়লা হইলে সাবান জল দিয়া কাঠ ধুইয়া ফেলিয়া মসিনা বীজের তেল ও পেট্রোল মিশ্রিত করিয়া একটু পালিশ করিয়া দিবে।

স্টেইনড উড (Stained Wood)—কোন কোন বড় গাছের ভিতরে একপ্রকার চমৎকার দাগ থাকে। এইরূপ দাগওয়ালা কাঠকেই বলে স্টেইনড উড। কাঠের গায় স্বাভাবিক স্টেইন বা দাগ না থাকিলে কৃত্রিম উপায়ে স্বল্প ব্যয়ে উহার দাগ সৃষ্টি করা যায়। এক আউন্স পটাশ পারমাঙ্গানেটের গুঁড়া তিন পোয়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া কাঠে একই গতিতে লাগাইতে থাক এবং ঐভাবে কাঠ শুকাইতে দাও। অতঃপর কাঠের গায় বার্ণিশ, তেল অথবা মোম যাহা খুশি প্রয়োগ করিতে পার। বাজারে বার্ণিশমিশ্রিত বিভিন্ন রকমের রং কিনিতে পাওয়া যায়। ঐ রং কিনিয়া আনিয়া কাঠে স্টেইন ফেলা যায়।

বার্ণিশ করা কাঠ (Varnished Wood)—গ্লু, নানাপ্রকার গদ কিংবা রজন (Resin) হইতে বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। পাতলা করিয়া বার্ণিশ প্রস্তুত

করিয়া লইয়া পরিষ্কার ব্রাশ দিয়া লম্বা লম্বা সোজা টান দিয়া বার্ণিশ লাগাইতে হয়। যতক্ষণ ধরিয়া বার্ণিশ করিবে ততক্ষণ ব্রাশটি কাঠের গা হইতে আলগা করিও না।

তেল লাগানো কাঠ (Oiled Wood)—লেবুর তেল, কেরোসিন তেল, মসিনা বীজের তেল, নারিকেল অথবা যে কোন তেলই কাঠে প্রয়োগ করা চলে। পুরু বস্ত্রখণ্ড অথবা ফ্লানেলে তেল মাখাইয়া কাঠের উপর বৃত্তাকারে ঘুরাইতে থাক। একবারে খুব অল্প পরিমাণ তেল লইয়া কাঠের সঙ্গে মিশাইয়া দিবে।

মোম লাগানো কাঠ (Waxed Wood)—½ পাউণ্ড মৌমাছির মোম গরম জলের উপরে রাখিয়া গলাইয়া নাও। গলানো মোমের সঙ্গে তার্পিণ তেল মিশ্রিত করিয়া খুব ভাল করিয়া নাড়িতে থাক। যখন সমস্ত জিনিসটি পাতলা ক্রীমের মত দেখাইবে তখন উহা কাঠের গায় ঘষিয়া দাও।

পালিশ করা কাঠ (Polished Wood)—তার্পিণ তেল ও মসিনা বীজের তেল সম পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইয়া খুব ভাল করিয়া ঘষিয়া দাও। ঘষার উপরেই পালিশ করা কাঠের ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে। পালিশ করা কাঠ দেখিতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর, মসৃণ ও উজ্জ্বল।

বার্ণিশ করা ও তেল মাখানো কাঠ পরিষ্কার করিতে হইলে মসিনার তেল ও পেট্রোল মিশ্রিত করিয়া একটি মসৃণ বস্ত্রখণ্ড দিয়া কাঠের গায় ঘষিয়া দাও। তেল দিয়া কাঠ পরিষ্কার করিতে হইলে একসঙ্গে খুব অল্প তেল প্রয়োগ করিতে হয়। মোম লাগানো এবং পালিশ করা কাঠ পরিষ্কার করিবার একমাত্র উপায় নতুন করিয়া মোম লাগানো এবং নতুন করিয়া কাঠ পালিশ করিয়া লওয়া।

কাঠের আসবাব পরিষ্কার রাখিতে হইলে প্রত্যহ সমস্ত আসবাবের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিবে এবং মাঝে মাঝে উহার গায় নিম্নলিখিত যে কোন সলিউশান মাখাইয়া দিবে।

(ক) ১। ১ পাউণ্ড মৌমাছির মোম

২। ১ পাইন্ট তার্পিণ তেল

৩। ½ পাইন্ট অ্যালকোহল

অথবা

(খ) তার্পিণ তেল ১ : ভিনিগার ১ : মসিনা বীজের তেল ১।

কাঠের গায় দাগ পড়িলে কিংবা কোন স্থান ছিদ্র হইয়া গেলে (ক) সলিউশানটি কাঠের গায় লাগাইবে। রং নষ্ট হইলে খুব মসৃণ ব্রাশ বা তুলি দিয়া পারমাঙ্গানেট সলিউশান লাগাইয়া দিবে। কাঠের গায় কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলে মসিনার তেল ১ : তাপিণ তেল ১½ : হোয়াইটিং অথবা কর্ণফ্লাওয়ার ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ছিদ্রটি বুজাইয়া দিবে এবং তারপর কাঠ পালিশ করিয়া ফেলিবে। কাঠের উপর জলের দাগ পড়িলে মেথিলেটেড স্পিরিট কিংবা অ্যামোনিয়া সলিউশান ঘষিয়া দাগ তুলিয়া ফেল।

চামড়া

বিভিন্ন ধাতব পদার্থ, কাঠ, বেত প্রভৃতির মতই চামড়াও একটি নিত্য-ব্যবহার্য অতি আবশ্যক সামগ্রী। দৈনন্দিন নানা কাজে আমরা চামড়া ব্যবহার করি। শূকর, গরু, হরিণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীর দেহচর্ম দ্বারা চামড়ার যাবতীয় জিনিস প্রস্তুত হয়। কাঁচা চামড়া পচিয়া যায় বলিয়া ব্যবহার করা সম্ভব নয়। মৃত পশুর দেহ হইতে চামড়া খুলিয়া নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ চামড়াকে মসৃণ, নমনীয় ও টেকসই করিয়া আমাদের ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তোলা হয়। চামড়ার বস্তু দামি হইলেও দীর্ঘস্থায়ী ও সুন্দর বলিয়া লোকে অধিক দাম দিয়া চামড়ার সামগ্রী কেনা পছন্দ করে।

চামড়ার ব্যবহার নিম্নরূপ :—

(১) চামড়ার জুতা।

(২) মালপত্র রাখিবার জন্য স্যুটকেশ।

(৩) আসবাব—ইজিচেয়ার, চেয়ারের আসন ইত্যাদি চামড়া দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৪) নানারূপ শৌখিন দ্রব্য, যথা—ব্যাগ, ফটো ফ্রেম, চশমার খাপ ইত্যাদি।

(৫) চামড়ার পোশাক।

(১) **চামড়ার জুতা**—চামড়ার সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহার দেখা যায় জুতা নির্মাণে। আধুনিক সভ্য মানুষের পোশাক এক জোড়া জুতা ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। জুতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে উহার যত্নের উপর। নিয়মিত জুতা পরিষ্কার রাখিলে এক জোড়া জুতা বহুদিন টিকিতে পারে।

জুতা পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমেই দেখিয়া লইবে জুতা জোড়া বেশ শুকনো কিনা। ভিজা জুতায় কালি মাখাইলেও উহার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে না। প্রথমে একটি ব্রাশ দিয়া জুতার ময়লা ঝাড়িয়া লইবে। তারপর একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে জুতার রংয়ের কালি মাখাইয়া লইয়া জুতায় লাগাও তারপর একটি ব্রাশ দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে জুতাটি পালিশ করিয়া লও। তরল (liquid) অথবা কঠিন (paste) যে কোন রকম কালি মাখাইলেই চলে।

(২) **চামড়ার স্যুটকেশ**—প্রথমে খুব ভাল করিয়া স্যুটকেশের ভিতর ও বাহিরের ধুলা ঝাড়িয়া ফেল। স্যুটকেশের ভিতরে কোন পকেট থাকিলে বস্ত্রাদি ঝাড়িবার ব্রাশ দিয়া ঐ পকেটের ধূলা ঝাড়িয়া লও। তারপর গরম সাবান জলে একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ডুবাইয়া স্যুটকেশের উপরিভাগ ধীরে ধীরে মুছিয়া লইতে থাক। এইভাবে ধুইবার সময় লক্ষ্য রাখিও চামড়া যেন বেশী ভিজিয়া না যায় কিংবা স্যুটকেশের ভিতর জল ঢুকিয়া না পড়ে। তারপর একটি শুষ্ক বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে জল মুছিয়া ফেলিবে। চামড়া সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে নিম্নলিখিত যে কোন একটি পালিশ লাগাইয়া ব্রাশ করিয়া দিবে—

(ক) চামড়া পালিশের ক্রীম।
(খ) মৌমাছির মোম ও তার্পিণ তেল মিশ্রিত লোশন।
(গ) চামড়ার রংয়ের অনুরূপ জুতার কালি।

(৩) **চামড়ার আসবাব**—প্রত্যহ ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিবে। ময়লা হইলে গরম জলে সাবান গুলিয়া লইয়া উহাতে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া আসবাব মুছিয়া ফেলিবে। অতিরিক্ত ময়লা হইয়া গেলে মসিনা বীজের তেলে (linseed oil) ভিনিগার (২ তেল : ১ ভিনিগার) মিশ্রিত করিয়া চামড়ার গায় খুব ভাল করিয়া ঘষিয়া ময়লা তুলিয়া ফেলিবে। তারপর নিম্নলিখিত যে কোন একটি পালিশ লাগাইবে—

(ক) চামড়া পালিশের ক্রীম।
(খ) জুতার কালি।
(গ) মৌমাছির মোম ও তার্পিণ তেল মিশ্রিত লোশন।
(ঘ) ভেসিলিন।

৪। **শৌখিন দ্রব্য**—চামড়া পরিষ্কার রাখার সাধারণ নিয়মাবলী প্রযোজ্য।

(৫) **চামড়ার পোশাক**—শীতপ্রধান দেশে চামড়ার পোশাক ব্যবহারের রীতি রহিয়াছে। সাধারণত অত্যন্ত মসৃণ চামড়া কিংবা সোয়েড (suede) দ্বারা এই পোশাক প্রস্তুত হয়। জুতার নিয়মেই পরিষ্কার করিতে হয়। সোয়েড চামড়া পরিষ্কার করিবার স্বতন্ত্র তরল রং পাওয়া যায়। সর্বপ্রকার সোয়েড চামড়ায় ঐ বিশেষ রং ব্যবহার করিতে হয়।

গৃহপরিচালিকার কর্তব্য ও গুণ

গৃহ বলিতে কেবল আহার ও বাসের একটু ঠাঁই বুঝায় না। শুধুমাত্র আহার ও বাসস্থানের জন্য মানুষ সংসারের গুরু দায়িত্ব কাঁধে লইত না। বরং অর্থ থাকিলে বাড়ির চেয়ে হোটেলে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য মিলিবার সম্ভাবনা, নতুবা শুধু দাসদাসী রাখিয়াও যাবতীয় কাজ চালানো যাইতে পারে। সমস্ত ঝঞ্ঝাট ও ঝুঁকি কাঁধে লইয়া তবু মানুষ পরিবার গঠন করে, কারণ গৃহ হইল আসলে স্নেহ-মমতার নীড়। এখানে মানুষ শৈশবে পায় জননীর স্নেহস্পর্শ, পিতার শাসন ও শিক্ষা, যৌবনে পত্নীর সাহচর্য এবং বার্ধক্যে ও রোগশয্যায় সন্তানদের সেবা। পাশ্চাত্যদেশগুলিতে পূর্বে বিত্তবান্ লোকেরা গৃহপরিচালনার জন্য সর্বদা মাহিনা করা পরিচালিকা নিযুক্ত করিতেন কিন্তু আমাদের দেশে চিরকালই গৃহকর্ত্রী গৃহের ভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। এই দেশে গৃহিণী এবং গৃহের পরিচালিকা সমার্থক শব্দ। 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' অর্থাৎ গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। শিশু, বৃদ্ধ হইতে শুরু করিয়া অতিথি অভ্যাগত, এমনকি দাসদাসী পর্যন্ত সকলের সুখসুবিধা দেখাই গৃহিণীর প্রধান কাজ। গৃহের প্রতিটি লোকের সেবাই ভারতে নারীধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। তবে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের কাঠামো এবং মেয়েদের ভূমিকা বদলাইতেছে। তাহারা এখন আর গৃহের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতেছে না। গৃহের বাহিরেও তাহাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। তথাপি গৃহপরিচালনার ভার আজও গৃহিণীদের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে।

প্রাচীন যুগের গৃহিণীদের দায়িত্ব—প্রাচীন কালে সমাজব্যবস্থা যখন খুব সহজ ও সরল ছিল, এখনকার মত শ্রমবিভাগ যতদিন চালু হয় নাই, আজিকার তুলনায় তখন গৃহপরিচালনায় নারীর দায়িত্ব ছিল অনেক বেশী। সন্তানধারণ ও সন্তানপালন ব্যতীত জীবনের সর্ববিধ প্রয়োজনীয় কাজ

গৃহেই সমাধা হইত। প্রথমত রোজগারের পথ ছিল চাষবাস। এই চাষের কাজে গৃহিণীকে সর্বদাই সাহায্য করিতে হইত। তাছাড়া জনসাধারণ ছিল ধর্মভীরু। পূজাপার্বণ ও ব্রতাদি গৃহে লাগিয়াই থাকিত। ধর্মাচরণে নারীর এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। গৃহের তৃতীয় কাজ ছিল শিক্ষা। এখনকার মত সেই যুগে নার্সারী, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়াছড়ি ছিল না। সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব ছিল গৃহিণীদের উপর। গৃহের অন্যতম কাজ ছিল রোগীর পরিচর্যা। হাসপাতালের তখনও এমন বহুল প্রচলন হয় নাই। আমোদ-প্রমোদও ছিল গৃহের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ সংস্থা পরিবারের অনেকগুলি কাজের দায়িত্ব লইয়াছে। শিক্ষার ভার লইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, শিশুশিক্ষার জন্য নার্সারীর প্রবর্তন হইয়াছে। রোগীর চিকিৎসার জন্য আছে হাসপাতাল ও নার্সিং হোম। সিনেমা, থিয়েটার, পেশাদার ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড়রা জনসাধারণের আনন্দ বর্ধন করিতেছে। আমোদপ্রমোদ আর গৃহের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। অবসর বিনোদনের জন্য মানুষ ছোটে বাড়ির বাহিরে। গৃহে পূজাপার্বণ ইত্যাদি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজনও ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। ছোটদের মন পড়িয়া থাকে বারোয়ারী পূজাপ্রাঙ্গণে। বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে জীবনধারা অনেকটা যান্ত্রিক হইয়া আসিতেছে এবং গৃহিণীর দায়িত্বও আগেকার তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে।

আধুনিক গৃহপরিচালিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য—আধুনিক গৃহিণীর কাজকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়—(১) খাদ্য, (২) বাসস্থান, (৩) বস্ত্র, (৪) শিশুপালন ও (৫) পরিজনদের স্বাস্থ্যের তদারক করা।

(১) **খাদ্য**—গৃহপরিচালিকার প্রধান কর্তব্য হইল পরিবারের লোকদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা। খাদ্যের ব্যবস্থা বলিতে শুধু রন্ধনক্রিয়া এবং রন্ধনান্তে পরিবেশন বুঝায় না। গৃহিণী খাদ্য পরিকল্পনার সময় প্রথমেই লক্ষ্য রাখিবেন প্রত্যেকে সুষম খাদ্য (balanced diet) পাইতেছে কিনা। দ্বিতীয়ত, রন্ধনের সময় যতখানি সম্ভব খাদ্যবস্তুর ভাইটামিন রাখিয়া রান্না করিবেন। গৃহিণীর তৃতীয় কাজ খাদ্য সংরক্ষণ। প্রথমেই তিনি তাহার সুবিধা অনুসারে বৎসরের কিংবা মাসের অথবা সপ্তাহের চাল, ডাল ইত্যাদি জিনিসগুলি কিনিয়া ভাঁড়ারে রাখিবেন। এতদ্ব্যতীত কোন্ কোন্ খাদ্যবস্তু অসময়ের জন্য কিভাবে সংরক্ষণ করিবেন সেই চিন্তাও গৃহিণীর কাজ। সস্তার সময় তিনি বিভিন্ন ঋতুর

ফল কিনিয়া জ্যাম, জেলী, আচার ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া বোতলে পূরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিবেন। গ্রীষ্মের সময় বড়ি, পাঁপর, আমসত্ব, আমচুর, শীতকালে আলু, বাঁধাকপি ইত্যাদি তরকারি কাটিয়া শুকাইয়া রাখিতে পারেন। অনেক গৃহে সস্তার সময় আলু, পাকা কুমড়া, কচু, নারিকেল ইত্যাদি কিনিয়া রাখিতে দেখা যায়। বর্ষার সময় সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের যখন দুর্মূল্য ঘটে তখন ঐ সকল সঞ্চিত বস্তু দিয়া অনায়াসে কাজ চালানো যাইতে পারে। খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা হইল উহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। যে পাত্রে খাদ্য প্রস্তুত হইবে উহা সর্বদা পরিষ্কার ঝকঝকে থাকা চাই। বিশুদ্ধ জলে আহার্য বস্তু ও বাসনকোসনগুলি ধোয়া হইতেছে কিনা তাহাও গৃহিণীই লক্ষ্য রাখিবেন। খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা রক্ষাই বোধহয় গৃহিণীর সর্বপ্রধান কর্তব্য, কারণ খাদ্যবস্তুর সঙ্গে বহু রোগের জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

(২) **বাসগৃহের তত্ত্বাবধান**—খাদ্যের পরেই বাসগৃহের তত্ত্বাবধান গৃহিণীর অন্যতম কর্তব্য। বাসগৃহ ধোয়া, মোছা গৃহিণীর প্রাত্যহিক কার্যতালিকার অন্তর্গত। এই প্রাত্যহিক কাজের উপরেও তাহাকে মাঝে মাঝে আসবাবপত্র, বইএর আলমারি, তাক ইত্যাদি ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। মশা, মাছি, আরশুলা, ছারপোকা ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির বাহকদের উৎপাত এড়াইবার জন্য গৃহিণী প্রতি সপ্তাহ কিংবা প্রতি পক্ষকাল অন্তর একবার করিয়া বাড়িতে ডি.ডি.টি. গ্যামাক্সিন কিংবা কেরোসিন তেলের ইমালশন স্প্রে করিবেন। এতদ্ব্যতীত কোন আসবাব ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা সময়মত মেরামত করান, বাড়িতে গরু, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত জীব থাকিলে তাহাদের তত্ত্বাবধান করা, অথবা বাড়িতে এক ফালি জমি থাকিলে সেখানে একটু ফুলের বাগান কিংবা সবজির ক্ষেত করাও এই গৃহরক্ষার অন্তর্গত।

(৩) **বস্ত্রাদি নির্বাচন**—শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। শীত এবং গ্রীষ্মের জন্য উপযুক্ত পোশাক নির্বাচন, বস্ত্রাদি তৈয়ারী করা, ধোলাই করিবার সময় ছিঁড়িয়া গেলে সময়মত রিফু করার ভার গৃহিণীর উপরেই ন্যস্ত থাকে। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পোশাক-পরিচ্ছদ সহজেই নোংরা হয়। উহাদের সময়মত ধোলাই করা, ইস্ত্রি করা কিংবা এখানে ওখানে একটু ছিঁড়িয়া কাটিয়া গেলে অবসর সময়ে রিফু করিয়া রাখাও গৃহিণীর কর্তব্য।

(৪) **শিশুপালন**—সন্তান ধারণ ও সন্তান পালনই প্রকৃতপক্ষে সকল দেশের

সকল গৃহিণীর সর্বপ্রধান কাজ। গৃহিণী অন্যান্য যাবতীয় কর্ম হইতে রেহাই পাইলেও যতদিন পরিবার টিকিয়া থাকিবে গৃহিণী ততদিন এই শিশুপালনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবেন না। শিশুপালন কাজটি সর্বাপেক্ষা কঠিনও বটে। একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, যে-হাত শিশুর দোলনা দোলায় সেই হাতই রাজ্য শাসন করে অর্থাৎ আজিকার শিশুই ভবিষ্যতের দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক। জননীকে এই নাগরিক তৈয়ারীর দায়িত্ব নিজহাতে গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেকটি জ্ঞানী, গুণী, রাজনীতিজ্ঞের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় মায়ের হাতে। শুধুমাত্র স্নানাহার করাইয়া সন্তানের প্রতি জননীর কর্তব্য শেষ হয় না। তাহার প্রাথমিক শিক্ষার ভার পড়ে মায়ের উপর। আজকাল সমস্ত সভ্য দেশগুলিতে নার্সারী ও কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলের প্রচলন হইলেও লাজুক, রাগী, জেদী ও অনগ্রসর শিশুদের জননীই হইলেন সবচেয়ে বড় শিক্ষয়িত্রী।

(৫) **স্বাস্থ্য-রক্ষা**—গৃহপরিচালিকার অপর কর্তব্য হইল গৃহের প্রত্যেকটি লোকের স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। ছেলেমেয়েদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দাঁতের গঠন যাহাতে ভাল হয় গৃহিণী তাহার চেষ্টা করিবেন। শিশু বয়স হইতেই তিনি গৃহের সন্তানদের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় কতকগুলি অভ্যাস করাইবেন, যেমন প্রত্যুষে ঘুম হইতে ওঠা, দাঁত মাজিবার সময়ে দাঁতের মাড়ি রগড়ান, চোখে যাহাতে পিচুটি না লাগিয়া থাকে সেইজন্য প্রচুর জল দিয়া চোখ ধোওয়া, আহারের পর মুখ কুলকুচা করিয়া ফেলা, নখ কাটা, মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া বসা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত রোগীর শুশ্রূষাও গৃহিণীর অন্যতম কাজ। সর্দিকাসি, জ্বর, আমাশয় ইত্যাদি সাধারণ পীড়ায় রোগীকে হাসপাতালে পাঠান সম্ভব নয়। এই সকল রোগের পরিচর্যা গৃহিণী বাড়িতেই করিবেন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গৃহিণী গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানেরও কিছু ব্যবস্থা রাখিবেন। কাহারও হঠাৎ নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে, কাহারও বা আঙ্গুল পুড়িয়া গিয়াছে, এই সমস্ত ছোটখাট ব্যাপারে গৃহিণী সর্বদা ডাক্তার না ডাকিয়া নিজেই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ এড়াইবার জন্য প্রতি বৎসর বাড়ির লোকদের টিকা লওয়াইবার ব্যবস্থা করাও গৃহিণীর কাজ।

এতদ্ব্যতীত বাজেট তৈয়ারী করা, ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা গৃহিণীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুগৃহিণী যদি তাহার কর্তব্যগুলি যথাযথ পালন করিতে চান, তবে তাহাকে আয়ের মধ্যে সমস্ত ব্যয়

সীমাবদ্ধ রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয়েরও ব্যবস্থা করিতে হয়। এইজন্য তিনি মাসের প্রথমেই একটি বাজেট করিয়া লইবেন। ইহাতে বাড়িভাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পোশাক ও আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ ধরা থাকিবে। গৃহপরিচালিকা এমনভাবে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে গৃহের প্রত্যেকটি লোক এই আমোদে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। বাড়িতে একটি রেডিও সেট্ অথবা পূজা অবকাশে কোথাও কয়েকদিন বিশ্রাম ভোগ এইরূপ আমোদের সুযোগ দেয়।

যে গৃহের গৃহিণী উপরোক্ত কর্তব্যগুলি যথাযথভাবে পালন করিয়া আসিতেছেন সে গৃহে সর্বদা শান্তি, আনন্দ ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং সেরূপ গৃহকেই আমরা সুপরিচালিত গৃহ বলি।

গৃহপরিচালিকার গুণ

(১) **কর্মের ইচ্ছা ও দক্ষতা**—প্রত্যেক গৃহিণীর সর্বপ্রধান গুণ হইল কাজ করিবার ইচ্ছা। অলস ও কর্মভীরু মহিলারা কখনই সার্থক গৃহিণী হইয়া উঠিতে পারেন না। কাজের ইচ্ছার সঙ্গে দক্ষতাও থাকা চাই। গৃহিণী নিজ হস্তে সংসার পরিচালনা করুন কিংবা অপর কাহাকেও দিয়া কাজগুলি করাইয়া লউন, নিজে পারদর্শী না হইলে তাহার পক্ষে এতদুভয়ের কোনটিই সম্ভব নয়।

(২) **মিতব্যয়িতা**—মিতব্যয়িতা হইল গৃহিণীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। গৃহপরিচালিকা শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না ও অন্যান্য যাবতীয় গুণের অধিকারিণী হইতে পারেন কিন্তু মিতব্যয়ী না হইলে তাহার সংসারের অনটন ঘুচিবে না। ফলে আর্থিক সঙ্কটে পড়িয়া সমস্ত পরিবারকে দারুণ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

(৩) **ধৈর্যশীলতা ও সেবাপরায়ণতা**—গৃহিণী অবশ্যই ধৈর্যশীল ও সেবাপরায়ণা হইবেন। শিশুদের সহস্র রকমের উপদ্রব, রোগী ও বৃদ্ধদের সকল আবদার গৃহিণীকেই হাসিমুখে সহিতে হয়। গৃহিণী ধৈর্যশীল ও সেবাপরায়ণা না হইলে গৃহের সঙ্গে পান্থশালার কোনরূপ পার্থক্য থাকে না।

(৪) **শিক্ষা ও সুরুচি**—প্রত্যেক গৃহপরিচালিকারই সাধারণ শিক্ষা থাকা দরকার। শিশুদের বর্ণপরিচয় করান, সম্ভব হইলে উচ্চশিক্ষায় সাহায্য করা, সংসারের যাবতীয় হিসাব রাখা, বাজেট তৈয়ারী করা, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম

চালানো ইত্যাদি কাজ চালাইবার মত গৃহিণীর বিদ্যা থাকা দরকার। 'সুরুচি' কথাটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। সুরুচিসম্পন্না বলিতে একদিকে নৃত্যগীতপটিয়সী, সেক্সপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনা করিতে সক্ষম, অতিশয় কেতাদুরস্ত মহিলাকে বুঝাইতে পারি, আবার অন্য-দিকে ব্যবহারে অতিশয় ভদ্র, কোমলস্বভাবা মেয়েদেরও বুঝিয়া থাকি। এখানে আমরা এই শেষের অর্থটিই গ্রহণ করিতেছি।

সমদর্শিতা—গৃহপরিচালিকার অন্যতম গুণ হইল সমদর্শিতা। আপনার সন্তান হইতে শুরু করিয়া আশ্রিত পরিজন ও দাসদাসীদের তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিবেন। বহু বৃহৎ পরিবারে দেখা যায় গৃহিণী আপন সন্তানকে বেশী পরিমাণে উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু দিয়া আশ্রিতদের জন্য সর্বদাই নিকৃষ্ট জিনিসটি রাখিয়া দিতেছেন। ইহাতে কেবল যে আশ্রিতরাই বেদনা বোধ করে তাহা নয়, তাঁহার নিজের সন্তানদের মধ্যেও বৈষম্যবোধ প্রবল হয়। ভবিষ্যতে ঐ গৃহিণীই হয়ত সাশ্রুনয়নে লক্ষ্য করিবেন তাঁহারই একান্নবর্তী সংসারে উপার্জনক্ষম পুত্রের সন্তানরা ভাল ভাল খাদ্য খাইতেছে, চমৎকার পোশাক পরিধান করিতেছে আর অক্ষম পুত্রের ছেলেমেয়েরা তাহাই লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছে! গৃহিণী হইবেন সমদর্শী। তাঁহার নিকটে আপন পুত্রকন্যা ও আশ্রিতদের মধ্যে ভেদ প্রকাশ পাইবে না। দাসদাসীদেরও তিনি যথোচিত আহার ও বিশ্রামলাভের সুযোগ দিবেন।

প্রফুল্লতা—গৃহিণীর আর একটি গুণ হইল মনের প্রফুল্লতা। সারাদিন মুখ হাড়ি করিয়া পরিশ্রম করিলেও কেহই সেই গৃহিণীর নিকট হইতে কোন সেবাযত্ন পাইয়া খুশি হয় না। গৃহিণীর প্রফুল্লতা সংসারের অনেক অভাব অনটন, অনেক গ্লানি ঢাকিয়া রাখিতে সমর্থ হয়।

গৃহে কন্যার দায়িত্ব ও কর্তব্য

পারিবারিক সম্পর্ক ও উহার দায়িত্ব—পারিবারিক বন্ধনের উপর পরিবার গঠিত। বন্ধন শুধু গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর উপরেই নির্ভর করে না। গৃহের প্রত্যেকটি লোকের এই বন্ধনরক্ষার দায়িত্ব আছে। পিতামাতা অবশ্য সন্তানদের স্নেহ করেন। তবে সন্তানরাও যদি তাহাদের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করে তবেই সেই স্নেহবন্ধন দৃঢ় হয়। যৌথপরিবারগুলি শুধু পিতামাতা ও

সন্তানদের লইয়া গঠিত নয়, সেখানে আত্মীয়স্বজন, দুই-চারিজন আশ্রিত, অতিথি অভ্যাগত এবং দাসদাসীদেরও ভীড় থাকে।

পরিবারের নিকট সকলেরই কিছু কিছু আশা থাকে। সুতরাং সকলেরই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেনের উপরেই যদি প্রত্যেকটি লোকের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সমস্ত সম্পর্কটাই একেবারে যান্ত্রিক হইয়া দাঁড়ায়। পারিবারিক বন্ধনকে মধুর ও সুদৃঢ় রাখিতে হইলে হৃদয়ের সম্পর্ক প্রাথমিক স্থান লাভ করিবে, আর্থিক কিংবা অন্যান্য সম্পর্কগুলির স্থান হইবে গৌণ। একদিকে পরিবারের কোন ব্যক্তি কত রোজগার করিতেছে, কাহার পিছনে কত টাকা ব্যয় হইতেছে, এই হিসাব রাখা যেমন অবাঞ্ছিত সেইরূপ দাসদাসীদেরও শুধুমাত্র বেতনভোগী অনাত্মীয়ের মত ব্যবহার না করিয়া বাড়ির লোকের মত ব্যবহার করিলে সে স্বভাবতই সন্তুষ্ট মনে ঘরের কাজকর্ম করিবে। গৃহের প্রত্যেকটি লোক এইভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে পরিবার সুখের হয়।

গৃহে কন্যার দায়িত্ব—প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সমাজেই মেয়েদের তিনটি করিয়া ভূমিকা থাকে—কন্যা, ভার্যা ও জননী। জীবননাট্যের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ভূমিকা বদলায় কিন্তু কর্তব্যগুলি প্রায় একই রকম থাকিয়া যায়। যেমন, শ্বশুরগৃহে পিতামাতার স্থান গ্রহণ করেন শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা, পিতৃগৃহের ছোট ভাই-বোনদের ভূমিকা নেয় প্রথমে দেওর, ননদ এবং পরে আপন সন্তানরা, স্বামী সখী ও সচিবের স্থান দখল করেন। পিতার গৃহে অবস্থান কালেই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাহার প্রস্তুতি শুরু হইয়া যায়। বালিকাকে প্রতি পদে স্মরণ রাখিতে হয় যে সে ভবিষ্যৎ নাগরিক ও গৃহিণী। নাগরিক জীবন গঠনের শিক্ষা শুরু হয় স্কুল, কলেজ ও বিদ্যালয়ে এবং সমাজ ও গৃহিণীর জীবন গঠনের শিক্ষা হয় পরিবারে। বালিকা ভবিষ্যতে একটি সুন্দর পরিবারের কর্ণধার হইবে ইহা মনে রাখিয়া তাহাকে পরিবারবর্গের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

পিতার প্রতি কর্তব্য—শিশু কন্যা পাঁচ সাত বৎসর বয়স হইতেই পিতার ছোটখাট কাজগুলি করিয়া দিতে পারে, যেমন তাঁহার অফিসে যাইবার সময় জুতা ও জামা আগাইয়া দেওয়া, আবার তিনি বাড়ি ফিরিয়া আসিলে সেগুলি যথাস্থানে গুছাইরা রাখা ইত্যাদি কাজগুলি পালনের ভার কন্যার উপরেই

দেওয়া যাইতে পারে। আর একটু বড় হইলে পিতাকে চা, জলখাবার আনিয়া দেওয়া, তাঁহার শয্যা রচনা করা, জুতা পালিশ করা, জামাকাপড় যথাস্থানে গুছাইয়া রাখা, স্নানের সময় তেলের বাটি হাতের কাছে আগাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কাজ সে অনায়াসে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে করিতে পারে।

মাতার প্রতি কর্তব্য—আমাদের দেশের জননী ও গৃহিণীদের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে রান্নাঘরে। একেইত আমাদের রন্ধন প্রণালী সময়সাপেক্ষ। মসলা পিষিয়া, তরকারি কাটিয়া, শাক, ভাজাভুজি, চচ্চড়ি, ডালনা, টক ইত্যাদি নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেই তাঁহাদের প্রায় সমস্ত সময় ব্যয় হইয়া যায়, উপরন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের অবসর বিনোদনের উপযুক্ত ব্যবস্থাও নাই। মেয়েদের কর্তব্য জননীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে একটু বিশ্রামলাভের সুযোগ দেওয়া, সকালবেলার চা ও জলখাবার প্রস্তুত করা এবং বিকালে জামা-কাপড় গোছানো, সন্ধ্যাদীপ জ্বালা, দাসদাসী না থাকিলে বাড়িঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি কিছু কিছু হাল্কা কাজের ভার মেয়েরা অনায়াসে লইতে পারে। ইহাতে পড়াশুনার খুব ব্যাঘাত ঘটে না। বরং একটু কায়িক পরিশ্রমে তাহাদের শরীর সুগঠিত হয় এবং মন প্রফুল্ল থাকে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতাভগ্নী ও অন্যান্যদের প্রতি কর্তব্য—বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতাভগ্নীদের ফুটফরমাইস খাটাও মেয়ের অন্যতম কর্তব্য। ঠাকুরমা, দিদিমা কিংবা বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের ছোটখাট কাজ করিয়া দেওয়া কিংবা সাধারণ পরিচর্যা করা, যেমন স্নানের জন্য গরম জল আনিয়া দেওয়া, শয্যা রচনা করা, অবসর সময়ে গল্পের বই কিংবা ধর্মপুস্তক পড়িয়া শুনাইবার ভার মেয়েরাই লইতে পারে।

কনিষ্ঠদের প্রতি কর্তব্য—ভগ্নীদের কনিষ্ঠদের প্রতি কর্তব্যও কম নয়। তাহাদের স্নান করান, পোশাক পরান, বেড়াইতে নিয়া যাওয়া এবং লেখাপড়ায় সাধ্যমত সাহায্য করা মেয়েদের কাজের অন্তর্গত। শিশুরা সাধারণত মায়ের পরে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদের উপর নির্ভর করে বেশী। ছোট ছোট ভাইবোনদের যত্ন করিয়া পরোক্ষে জননীকে সাহায্য করা হয়।

দাসদাসীদের প্রতি কর্তব্য—দাসদাসীদের প্রতি কখনই বেতনভোগী ভৃত্যের মত ব্যবহার করিতে নাই। অনেক পরিবারে পুরাতন দাসদাসীদের হাতে অনেক শিশুর পরিচর্যার ভার থাকে। বয়সে বড় হইলে তাহাদের প্রতি

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীদের মতই কন্যাদের আচরণ করা উচিত। ভারতীয় পরিবারে পারিবারিক বন্ধন আজও একান্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই বন্ধনকে সুদৃঢ় করার দায়িত্ব প্রধানত কন্যাদের।

বন্ধুত্ব

বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা কি ?

মানুষ সামাজিক জীব। সে কখনও একা একা সময় কাটাইতে পারে না। আপনার সুখদুঃখকে অপরের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইবার স্পৃহা হইতে সে পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। শৈশবে পরিবারই অবশ্য জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পরিচিতের পরিধি আরও বিস্তৃত হইতে থাকে। জীবনের সকল দাবী মিটাইবার ক্ষমতা আর পরিবারের লোকেদের থাকে না। এই সময়ে মানুষ গৃহের বাহিরের বহু লোকের সাহচর্য কামনা করে এবং এইভাবে বন্ধু নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

বন্ধুত্বের লক্ষণ—স্নেহের দ্বারা যিনি বন্ধন করেন তিনিই বন্ধু। এই স্নেহ অর্থাৎ ভালবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আমরা বন্ধুত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি। বন্ধুর পরিচয় দিতে গিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে,
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বন্ধু চিনিবার চারটি উপায় আছে ঃ

(১) প্রথমত উৎসবে ও ব্যসনে যিনি উপস্থিত থাকিবেন তিনিই আমাদের প্রকৃত সুহৃদ্। ইহার অর্থ এক বন্ধু অপর বন্ধুর আনন্দের সময় উপস্থিত থাকিবে, বন্ধুর আনন্দ বিলাসের অংশীদার হইবে এবং তাহার প্রাচুর্যে ও ধনলাভে দুঃখিত হইবে না।

(২) দ্বিতীয়ত দেশে কোন দুর্ভিক্ষ কিংবা রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দিলে বন্ধু বন্ধুর পার্শ্ব ত্যাগ করিবে না। সোজা কথায়, যে কেবল সুখের দিনের অংশীদার নয় পরন্তু দুর্দিনেও বন্ধুকে ছাড়িয়া যায় না, সে-ই সত্যকার বন্ধু। সুখের সময় বন্ধু পাওয়া কঠিন নয়। বন্ধুত্বের আসল পরীক্ষা দুঃসময়েই হইয়া থাকে। বন্ধু নির্বাচনের সময় এই মাপকাঠি দিয়া যাচাই করিয়া লইবে বন্ধু কপট না খাঁটি। তোমার বিপদে সে কি আগাইয়া আসিতে কুণ্ঠিত হয় ?

(৩) তৃতীয়ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে প্রকৃত বন্ধু সর্বদা সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়া আসে। মানুষ চুরি, ডাকাতি, খুন কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহ ইত্যাদি নানা কারণে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে পারে। বন্ধুকে সাহায্য করিলে পাছে নির্যাতন সহিতে হইবে এই ভয়ে যাহারা পিছাইয়া যায় তাহারা প্রকৃত বন্ধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

(৪) চতুর্থত প্রকৃত বন্ধু শ্মশানেও বন্ধুর অনুগমন করিবে অর্থাৎ সত্যকার বন্ধুত্ব মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

শাস্ত্রকারদের লক্ষণগুলি মিলাইয়া বন্ধুদের আমরা দুই পর্যায়ে ভাগ করিতে পারি—সুখের বন্ধু এবং দুঃখের বন্ধু। যে ব্যক্তি সমস্ত দুঃখ বেদনার অংশীদার সে-ই প্রকৃত বন্ধু এবং যাহাদের কেবল সুখের দিনেই হাজির হইতে দেখা যায়, তাহারা বসন্তের কোকিল অর্থাৎ কপট বন্ধু। কপট বন্ধুদের ব্যঙ্গ করিয়া কবি বলিয়াছেন,

সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

কি ভাবে বন্ধু নির্বাচন করিতে হয়—বন্ধু নির্বাচনের প্রধান মাপকাঠি হইল উভয়ের প্রতি উভয়ের আন্তরিকতা ও ভালবাসা। অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ভালবাসা ভিন্ন অপর কোন প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য ভালবাসা ব্যতীত ব্যক্তির চরিত্রের কতকগুলি গুণ বিচার করিয়া বন্ধু নির্বাচন করিবে। চরিত্রের গুণ সর্বদা যাচাই করিয়া লওয়া উচিত কারণ যে ব্যক্তির সাহচর্যে আসিতেছ, তাহার দোষগুণগুলি অল্পবিস্তর তোমাকেও প্রভাবিত করিবে। এই কারণে গুণী মেয়ের সাহচর্য আকাঙ্ক্ষা করা উচিত।

সর্বদা মিশুকে ও সৎস্বভাবা মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত। যেসব মেয়েদের সঙ্গে সর্বদা অপরের ঝগড়াঝাটি লাগিয়া থাকে তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিও না, কারণ ছোটখাটো ব্যাপার নিয়া তোমার সঙ্গেই ঝগড়াঝাটি লাগিয়া যাইবে। আবার বন্ধুর ঐ ঝগড়াটে স্বভাব তোমার মধ্যেও সংক্রামিত হইতেপারে।

এতদ্ব্যতীত মেধাবী ও পরিশ্রমী মেয়ে দেখিয়া বন্ধু নির্বাচন করা উচিত। মেধাবী মেয়েদের সংস্পর্শে আসিলে তোমার নিজের মেধাও বাড়িবে এবং পরিশ্রমী হইবার ইচ্ছা জাগিবে।

সমবয়সীদের মধ্যেই বন্ধুত্ব হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের মনের বিকাশ একরূপ নয়। তোমার চেয়ে ছোট বয়সের মেয়েরা তোমার চেয়ে

অপরিণত থাকিবে। আবার বয়োজ্যেষ্ঠাদের সঙ্গে মিশিলে অকালপক্ক হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সর্বদা পাল্টি ঘর দেখিয়া বন্ধু নির্বাচন করা উচিত। দুই বন্ধুর আর্থিক ও সামাজিক পদমর্যাদার মধ্যে যদি আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকে তবে দুই জনের মনের সঙ্কোচ দূর হইতে চাহে না। বন্ধুদের মধ্যে মাঝে মাঝে ছোটখাট উপহারের আদানপ্রদান হইয়া থাকে। ধনীর ঘরের দুলালী তাহার বন্ধুকে যেরূপ দামী উপহার দিতে পারে, তাহার দরিদ্র বন্ধুটি সেইরূপ মূল্যবান উপহার দিতে না পারিলে স্বভাবতই সে কুণ্ঠা বোধ করিবে। এইজন্য সমান অবস্থার লোকেদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বন্ধু নির্বাচনের সময় আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিয়া দেখিবে যে যাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে যাইতেছ, সে সুস্থ এবং নীরোগ কিনা কিংবা তাহার কোনরূপ বদ অভ্যাস আছে কিনা। অনেক সংক্রামক ব্যাধি আছে যাহা কেবল রোগীর সান্নিধ্যে আসিলেই সুস্থ দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। অবশ্য সুস্থ দেহ দেখিয়া বন্ধু নির্বাচনের অর্থ এই নয় যে রোগ হইলে বন্ধুকে ফেলিয়া পালাইবে। কেবল কপট বন্ধুরাই অসুস্থ বন্ধুকে ফেলিয়া পালাইতে পারে।

বন্ধুত্ব রক্ষা করার উপায়—বন্ধু নির্বাচন যেমন কঠিন কাজ, বন্ধুত্ব রক্ষাও তেমনি সহজ নহে। পূর্বেই বলিয়াছি বন্ধুত্বের মাপকাঠি হইল আন্তরিকতা এবং শুধুমাত্র বিপদের সময়ই সত্যকার আন্তরিকতার পরিচয় মিলে। কথা-মালার ভল্লুক ও দুই বন্ধুর গল্পটি কপট বন্ধুত্বের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। গল্পটি এইরূপ—দুই বন্ধু একবার একটি গভীর বনের ভিতর দিয়া যাইতেছিল। প্রথম ব্যক্তি তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিল, ভাই, যদি হঠাৎ আমাদের কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে আমরা কেহ কাহাকেও ফেলিয়া পালাইব না। দ্বিতীয় ব্যক্তিও তাহার উত্তরে প্রথম ব্যক্তির মতই অঙ্গীকার করিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে এক ভল্লুক আসিয়া উপস্থিত হইল। ভল্লুক গাছে চড়িতে জানে না বুঝিয়া প্রথম ব্যক্তি আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গাছে চড়িয়া বসিল। বন্ধুর যে কি দশা হইল তাহা আর তাহার চাহিয়া দেখিবার অবসর হইল না। এদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গাছে চড়িতে জানিত না। আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া সে মাটিতে মৃতের মত পড়িয়া রহিল। সে লোকের মুখে শুনিয়াছিল ভল্লুক নাকি মৃতদেহ স্পর্শ করে না। বাস্তবিকই ভল্লুক আসিয়া তাহার নাক মুখ শুকিয়া চলিয়া গেল। বিপদ কাটিয়া গেলে প্রথম ব্যক্তি

গাছ হইতে নামিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিল, ভাই, ভল্লুক তোমার কানে কানে কি বলিয়া গেল? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল—বলিয়া গেল, যে-ব্যক্তি বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলিয়া পালায় তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না।

কথামালার এই গল্পটি মনে রাখিয়া চলিও। কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতি পাইয়া বন্ধুকে বিশ্বাস করিতে নাই। বাস্তবিকই সে তোমার সুখ দুঃখের অংশীদার কিনা তাহা যাচাই করিয়া লইবে এবং নিজেও বন্ধুর প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

দ্বিতীয়ত বন্ধুকে সর্বদা বিশ্বাস করিবে এবং মনে মনে কখনও তাহার অমঙ্গল কামনা করিবে না। সামান্যতম অবিশ্বাসও অকপট বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরাইয়া দিতে পারে। এতদ্ব্যতীত বন্ধুর অসাক্ষাতে কখনও তাহার বিরুদ্ধে কিছু আলোচনা করিও না। বন্ধুর দোষত্রুটি দেখিলে সোজাসুজি উহা সংশোধন করিয়া দেওয়াই ভাল। আড়ালে নিন্দা করিবার মত অপরাধ আর নাই। কোন রকমে এই নিন্দা তাহার কানে প্রবেশ করিলে সে আর তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। বিশ্বাসই হইল বন্ধুত্বের প্রথম সোপান।

বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে গেলে বন্ধুকে সাধ্যমত মাঝে মাঝে উপহার দিবে। তবে উহা যেন কখনই ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া না যায় এবং সে যদি তোমার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট উপহার দেয় কিংবা একেবারেই কিছু না দিতে পারে তবে মনে কোন সংকোচ, দ্বিধা অথবা গ্লানি পোষণ করিও না। দেওয়া নেওয়ার মধ্য দিয়াই পরস্পরের সম্প্রীতি গড়িয়া ওঠে সন্দেহ নাই, তবে আন্তরিকতার চেয়ে পার্থিব বস্তু যেন কখনই বড় হইয়া না দাঁড়ায়।

সর্বশেষে, বন্ধুর হিতসাধনই বন্ধুর একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। তাহার বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। এখানে একটি নীতি স্মরণ রাখিয়া চলিও যে, বন্ধুকে কখনও ধার হিসাবে টাকা দিও না। সাহায্য করিবার প্রয়োজন হইলে উহা একেবারে দান করিয়া দিলে এই মনোভাব লইয়া অর্থ দিবে। তারপর সে যদি সেই অর্থ ফিরাইয়া দেওয়া উচিত মনে করে এবং ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হয় তবে গ্রহণ করিতে বাধা নাই। দেখা গিয়াছে অর্থ ধার দিবার ফলে অনেক পুরাতন বন্ধুত্বও শেষ পর্যন্ত আর অটুট থাকে নাই।

———
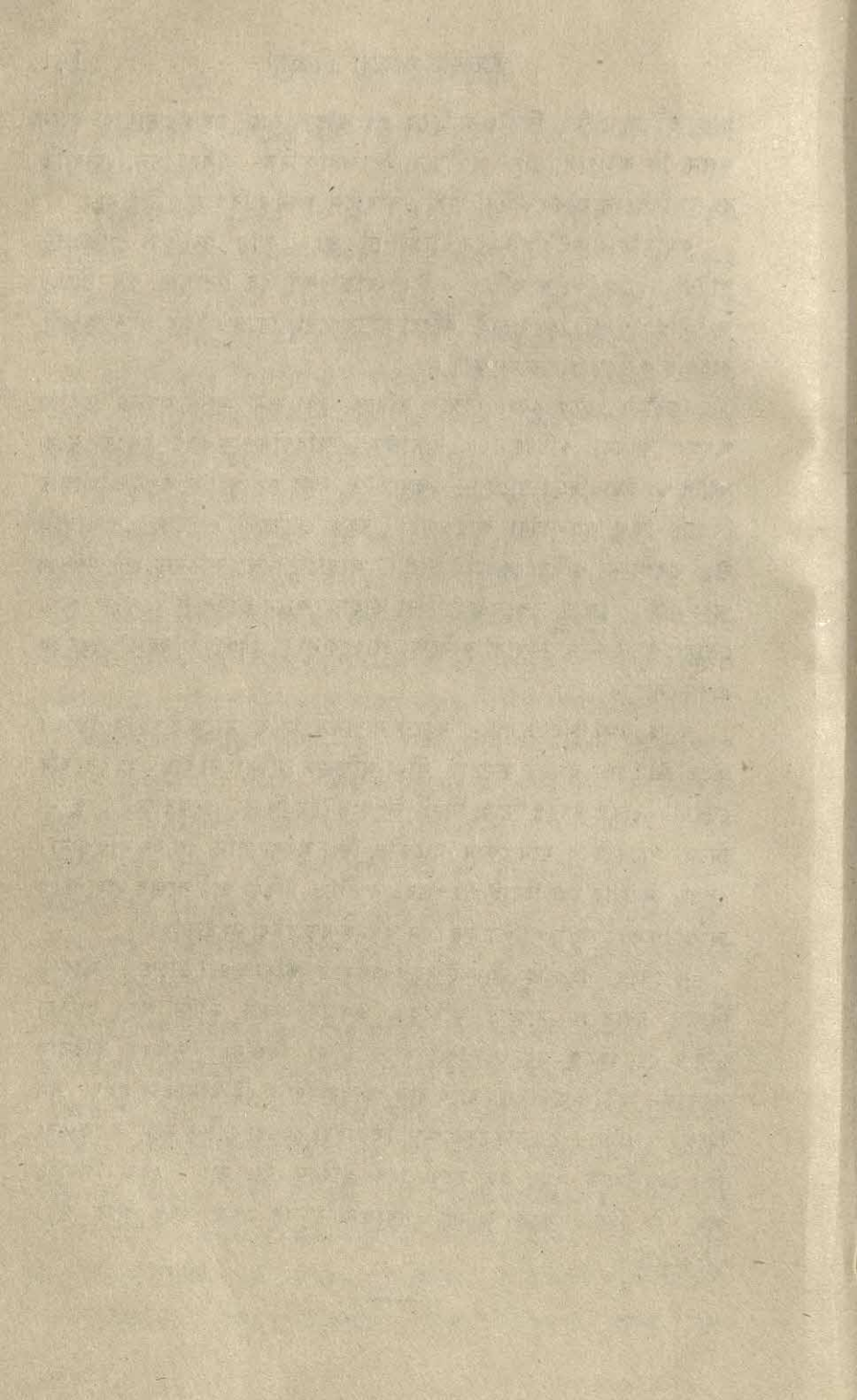
দ্বিতীয় পত্র

প্রথম ভাগ—খাদ্য

দ্বিতীয় ভাগ—বস্ত্রশিল্প

প্রথম অধ্যায়

খাদ্য

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা—একটি জীবকোষ (cell) হিসাবে জীবের প্রথম সৃষ্টি হয় মাতৃগর্ভে। এই সময় হইতেই একের পর এক কোষের সৃষ্টি দ্বারা জীবের বৃদ্ধি চলিতে থাকে। প্রায় ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে এই বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। দেহের এই বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। আবার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানবদেহ ভিতরে এবং বাহিরে অনবরত কাজ করিতে থাকে। দেহের অভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস্, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক ইত্যাদি সর্বদাই কাজ করে। এতদ্ব্যতীত আমাদের দৈনন্দিন কার্যে আমরা দেহের মাংসপেশী সঞ্চালন করিয়া থাকি। এইরূপ অনবরত কাজ করিবার ফলে দেহের কোষগুলি তথা দেহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দেহের এই ক্ষয়পূরণের জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং **খাদ্যের প্রথম কাজ দেহের ক্ষয়পূরণ)ও বৃদ্ধিসাধন করা**।

কোন কাজ করিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন হয়। রেলগাড়ী চালাইতে যে-শক্তির প্রয়োজন তাহা প্রথমে কয়লা পোড়াইয়া তাপ আকারে পাওয়া যায়। এই তাপ পরে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। আমাদের দেহের ভিতরের এবং বাহিরের বিভিন্ন কাজের জন্যও শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি আমরা খাদ্যদ্রব্য হইতেই তাপ-আকারে পাইয়া থাকি। খাদ্য গ্রহণ না করিলে আমাদের কাজ করিবার উৎসাহ এবং শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং **খাদ্যের দ্বিতীয় কাজ দেহে তাপ ও শক্তি সৃষ্টি করা**।

আবার কখনও কখনও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে দেহের আভ্যন্তরীণ কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না, আমরা অসুস্থ হইয়া পড়ি। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য শরীরে দহনক্রিয়ার সাহায্যে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু এই দহন ক্রিয়ার জন্য ভাইটামিন 'বি১' এবং 'বি২' (Vitamin B_1 or Thiamine and Vitamin B_2 or Riboflavine) একান্ত প্রয়োজন। এই ভাইটামিনের অভাবে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের স্বাভাবিক দহনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সুতরাং **খাদ্যের তৃতীয় উদ্দেশ্য শরীরের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিয়া শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা**।

খাদ্যের সংজ্ঞা—খাদ্যের যথাযথ সংজ্ঞা নির্দেশ করা কষ্টসাধ্য। তবে যে-তরল বা কঠিন দ্রব্য আহার করিলে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহাকে খাদ্য বলা যাইতে পারে :

(১) শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন ;

(২) শরীরের তাপ ও শক্তি উৎপাদন ;

(৩) শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন এবং তাপ ও শক্তি উৎপাদন ক্রিয়া সঠিক নিয়ন্ত্রিত করিয়া শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা।

দুগ্ধ খাদ্যের আদর্শ উদাহরণ। ইহার সাহায্যে উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। আবার পাতি লেবুকেও খাদ্য হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কারণ ইহার ভাইটামিন 'সি' উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যের তিন নম্বর উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে। চা এবং কফি এই দুইটি পানীয় খাদ্যবস্তুর অন্তর্গত নহে। কারণ উহাদের দ্বারা উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যের একটিও সাধিত হয় না। অবশ্য চা এবং কফির সহিত দুধ ও চিনি মিশ্রিত করিলে উহা খাদ্যদ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে।

খাদ্যের উপাদান (Nutrients of Foods)—ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। ইহা প্রধানত শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই শ্বেতসার শরীরের মধ্যে দহনের সাহায্যে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া ভাতকে আমরা খাদ্য হিসাবে গণ্য করিয়া থাকি। খাদ্যের যে বস্তুর জন্য উহাকে খাদ্য বলা হয়, সেই বস্তুকে উহার উপাদান (Nutrient) বলে। শ্বেতসার ভাতের প্রধান উপাদান। কোন দ্রব্যের খাদ্য-মূল্য (Food value) উহার উপাদানের প্রকার এবং প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে প্রধানত নিম্নলিখিত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :

(১) প্রোটিন (Proteins) ;

(২) কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates) ;

(৩) স্নেহ পদার্থ (Fat) ;

(৪) বিভিন্ন ধাতব লবণ (Mineral substances) ;

(৫) ভাইটামিন (Vitamins) ।

এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ জাতীয় উপাদান আমাদের খাদ্যের প্রধান অংশ বলিয়া উহাদের Proximate Principle বা

প্রধান উপাদান বলে। শেষোক্ত উপাদান দুইটি অর্থাৎ লবণ ও ভাইটামিন পরিমাণে অল্প থাকে বলিয়া উহাদের Accessory Food Factors বা আনুষঙ্গিক উপাদান বলে।

জল এবং বাতাসের অক্সিজেন যদিও জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এবং উহাদের খাদ্যের উপাদান হিসাবে গণ্য করা উচিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে উহাদের খাদ্যের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কোন একটি খাদ্যে এক বা একাধিক উপাদান বর্তমান থাকিতে পারে।

খাদ্যের উপাদানগুলির কার্যকারিতা—খাদ্যের উপাদানগুলির মধ্যে **প্রোটিনকে** (১) **দেহসংগঠক** এবং (২) **দেহ সংরক্ষক** খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। আমাদের দেহ প্রধানত অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন প্রোটিনই আবার এই সকল জীবকোষের প্রধান উপাদান। গৃহনির্মাণে যেমন ইটই প্রধান উপকরণ, তেমনি দেহ নির্মাণে বিভিন্ন প্রোটিনগুলিই প্রধান উপাদান। এইজন্যই প্রোটিনকে দেহনির্মাণের ইট (body building bricks) স্বরূপ বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য শরীরের কোষগুলি ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে প্রোটিন এই ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে। পঁচিশ বৎসরের পরে সাধারণত জীবদেহের কোন বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু তাহার পরও মৃত্যু পর্যন্ত জীবকোষগুলির ক্ষয়ক্রিয়া চলিতে থাকে। প্রোটিনই এই ক্ষয় পূরণ করিয়া মানুষকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। উপযুক্ত প্রোটিনের অভাব হইলে ক্রমান্বয়ে এই ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। (৩) কখনও কখনও **প্রোটিন শরীরে তাপশক্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে।**

লবণও (Mineral substances) **প্রোটিনের ন্যায় শরীর গঠনে** সহায়তা করে। **ক্যালসিয়াম** (Calcium) এবং **ফস্‌ফরাস্** (Phosphorus) দেহের **অস্থি গঠনে** অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত **শরীর সংরক্ষণেও** ইহাদের দান কম নহে। শরীরে রক্তাল্পতা (anaemia) ঘটিলে লৌহ জাতীয় লবণ তাহা দূর করিয়া শরীরকে রক্ষা করে। শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করাও ইহাদের একটি বিশেষ কাজ। **আয়োডিনের** (Iodine) পরিমাণ খাদ্যে কম হইলে **'গলগণ্ড'** রোগ হয়। কারণ, এই লবণের অভাবে থাইরক্সিন (Thyroxine) নামক হরমণের (Hormone) স্বাভাবিক ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। খাদ্যে সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম আয়োডাইড (Sodium Iodide) মিশাইয়া দিলে 'গলগণ্ড' দূর হইয়া যায়।

খাদ্যের অন্য দুইটি উপাদান **কার্বোহাইড্রেট** এবং **স্নেহ পদার্থ** প্রধানত **তাপ ও শক্তি** উৎপাদন করিয়া শরীরকে কর্মক্ষম রাখে। উহারা শরীরে জ্বালানি কাঠের ন্যায় কাজ করে বলিয়া উহাদের Fuel Foods বা '**জ্বালানি খাদ্য**' বলা হয়। ভাইটামিনসমূহ (Vitamins) শরীর গঠন বা তাপ ও শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে না। উহারা অন্যান্য উপাদানগুলির অর্থাৎ প্রোটিন, শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় পদার্থের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে।

সুতরাং কার্যকারিতা অনুযায়ী খাদ্যসমূহ আমরা প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি ঃ

(১) **শরীরের ক্ষয়পূরক ও বৃদ্ধি সহায়ক খাদ্য ঃ** যথা—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ইত্যাদি। এইগুলি প্রধানত প্রোটিনবহুল খাদ্য। এই সকল খাদ্য প্রধানত প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। তবে অন্যান্য উপাদানও এই সকল খাদ্যে পাওয়া যায়।

(২) **শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্নকারী খাদ্য ঃ** যথা—ভাত, রুটি, ময়দা, আটা, চিড়া, মুড়ি, আলু, গুড়, চিনি, ঘি, মাখন, তেল, ইত্যাদি। কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এইসকল খাদ্য বায়ুর অক্সিজেনের সহিত পুড়িয়া দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে। ইহাদের ক্যালোরী-প্রধান খাদ্যও বলা চলে। খাদ্যের ক্যালোরী বৃদ্ধি করাই ইহাদের মুল উদ্দেশ্য। অবশ্য প্রোটিনজাতীয় খাদ্যও দেহে ক্যালোরী যোগাইয়া থাকে।

(৩) **শরীর সুস্থকারী ও রোগ প্রতিরোধক খাদ্য ঃ** যথা—বিভিন্ন প্রকারের শাক-সব্জি, তরি-তরকারি, ফল-মূল, ইত্যাদি। এই সকল খাদ্যে প্রধানত বিভিন্ন ধাতব লবণ ও ভাইটামিন থাকে। ধাতব লবণ প্রধানত দেহের ক্ষারীয়ভাব (alkalinity) বজায় রাখিয়া রক্ত তথা দেহকে সুস্থ রাখে। অবশ্য কোন কোন ধাতব লবণ দেহ গঠনেও সহায়তা করে। যেমন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অস্থি গঠনে সহায়তা করে। ভাইটামিনসমূহ বেরীবেরী, স্কার্ভি, রিকেট, ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের হাত হইতে দেহকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই জাতীয় খাদ্যের ক্যালোরী-মূল্য অতি সামান্য।

খাদ্যে উপাদানসমূহের কম বা বেশী হইবার ফল—শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে খাদ্যে উপরোক্ত পাঁচটি উপাদানই বয়স ও শারীরিক পরিশ্রম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। যদি খাদ্যে উপাদান-

গুলির মোট পরিমাণ (total quantity) এই নির্দিষ্ট পরিমাণের তুলনায় কম হয়, তবে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং কর্মক্ষমতা কমিয়া যাইবে। এই অবস্থাকে পুষ্টির অভাব বা subnutrition বলা হয়।

খাদ্যে বিভিন্ন উপাদানগুলির মোট পরিমাণ ঠিক রাখিলেই চলিবে না। এই উপাদানগুলিকে আবার নিজেদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। যদি খাদ্যে কোন এক বা একাধিক উপাদানের অভাব বা হ্রাস ঘটে তাহা হইলেও শরীর অসুস্থ হইবে। এই অবস্থাকে অসমখাদ্যজনিত পুষ্টির অভাব বা malnutrition বলে।

আবার শরীরের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে যদি উপাদানগুলি খাদ্যের সহিত গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত উপাদানগুলি শরীরের মধ্যে জমা হইতে থাকিবে। শ্বেতসার এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ এইভাবে জমিতে থাকিলে শরীর অত্যধিক মোটা হইবে এবং দেহের ওজন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থাকে obesity বলে।

রান্নাঘর

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে বাসগৃহের সমস্যা এক উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় এবং জনসাধারণের উদ্যমে অবশ্য ইতোমধ্যে গৃহসঙ্কট নিবারণের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় রান্নাঘরটি আমাদের দেশে আজও সম্পূর্ণ অবহেলিত থাকিয়া যাইতেছে। সাধারণের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখি অনেক সঙ্গতিপন্ন পরিবারেও রান্নাঘর নির্মাণের সময় যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না। এই সকল গৃহের শয়নকক্ষ ও অন্যান্য কক্ষগুলি হয়ত খুব স্বাস্থ্যকর এবং রুচি অনুযায়ী সজ্জিত কিন্তু রান্নাঘরটি আলোবাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে নির্মিত। বস্তুত ইহার চেয়ে অব্যবস্থা আর কল্পনা করা যায় না। দুইটি কারণে রান্নাঘরের সংস্কার সাধন হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রথমত মেয়েদের স্বাস্থ্যের কারণে। আমাদের দেশের মেয়েরা দিনের অধিকাংশ সময় রান্নাঘরেই অতিবাহিত করে। সেখানে বসিয়া তাহারা বাটনা বাটে, তরকারি কোটে এবং খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে। স্বভাবতই মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে রান্নাঘরের পরিবেশটি সুস্থ এবং সুন্দর হওয়া চাই। দ্বিতীয় কারণটি হইল খাদ্যবস্তুর পরিচ্ছন্নতা ও উৎকর্ষ

বজায় রাখা। খাদ্যদ্রব্য স্বাস্থ্যতত্ত্বে যে কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ। রন্ধনের স্থানটি পরিচ্ছন্ন না হইলে খাদ্য-বস্তুসমূহ সহজে রোগের জীবাণু দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। স্বল্পালোকযুক্ত স্থানে পোকামাকড় বা নোংরা চুল ইত্যাদি পড়িয়া খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত রান্নাঘরটি মনোরম ও আলোবাতাসযুক্ত না হইলে রন্ধনকারীরও কাজে স্ফূর্তি ও ইচ্ছা দেখা দিবে না। স্বভাবতই সে স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া কোন রকমে সেই স্থান হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিবে।

রান্নাঘরের বিভিন্ন পরিকল্পনা

১। সিঙ্ক, ২, ৩। আলমারি, ৪। রেফ্রিজারেটার, ৫। উনুন।
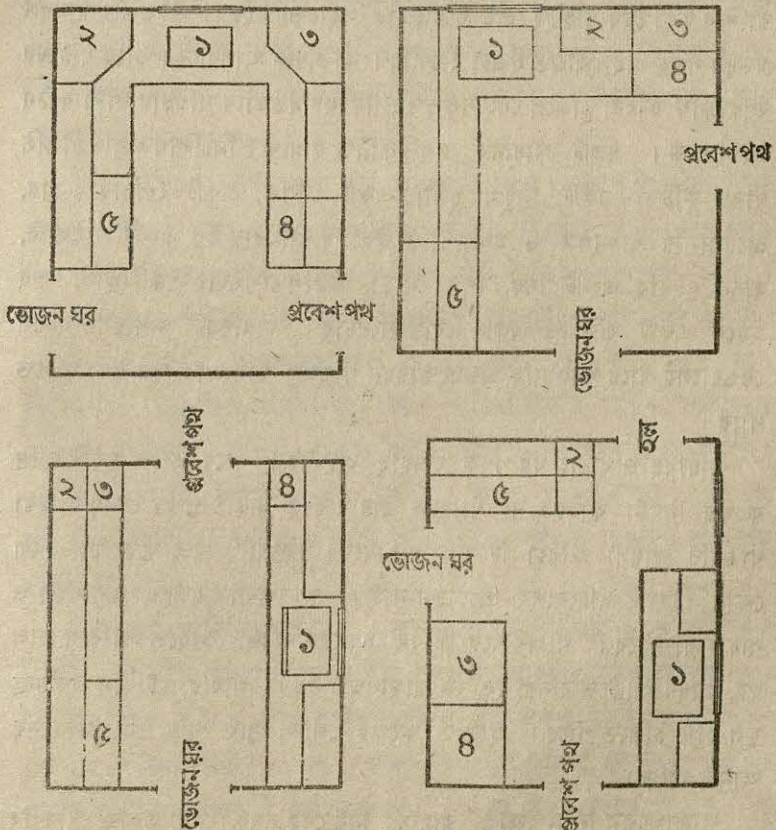
রান্নাঘরের আকৃতি ঃ একটি সুপরিকল্পিত রন্ধনগৃহের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা যতখানি প্রয়োজনীয় উহার অবস্থিতি, নকশা ও গঠন তাহার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গৃহ নির্মাণের সময় রান্নাঘরে যাহাতে যথেষ্ট বায়ু সঞ্চালন ও সূর্যালোক প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে সেদিকে নজর রাখিবে। কক্ষের আকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে কোন নিয়ম অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। রান্নাঘরটি নানা আকারের হইতে পারে—চতুষ্কোণ, U আকৃতি অথবা L আকৃতি। সব রকম আকারের রান্নাঘরই গৃহিণীর নিপুণতার গুণে সুন্দর হইয়া উঠে। মোটের উপর রান্নাঘরটি প্রথমেই স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই, তারপর গৃহকর্তার অর্থানুকূল্য অনুসারে উহার গঠন ও সাজসজ্জার ব্যবস্থা করিবে।

সাজসরঞ্জাম ঃ রান্নাঘরের তৈজসপত্র নির্বাচনের সময় সর্বপ্রথমেই লক্ষ্য রাখিবে উহা যেন গৃহিণীর শ্রম বাঁচাইবার সহায়তা করে। এইজন্য রান্নাঘরটি যতদূর সম্ভব বাহুল্যবর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতিরিক্ত আসবাবের ভারে রান্নাঘর ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলে সেই সকল দ্রব্যাদি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। একটি আধুনিক সুপরিকল্পিত রান্নাঘরে নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলি থাকা উচিত—একটি নির্ধূম চুল্লী, একটি স্টোভ, একটি প্রেসার কুকার, প্রয়োজনীয় বাসনপত্র ও মসলাপাতি ইত্যাদি রাখিবার জন্য একটি আলমারি, বাসন ধুইবার একটি সিঙ্ক, শিল নোড়া, জঞ্জাল ফেলিবার একটি ঝুড়ি, সম্ভব হইলে একটি ঘড়ি ও একটি রেফ্রিজারেটার। রান্নাঘরটি অপরিসর হইলে দেওয়ালের গায়ে আলমারি প্রস্তুত করিয়া সহজেই স্থানাভাব দূর করা যাইতে পারে।

রান্নাঘর ও খাবার ঘর পৃথক্ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে এরূপ দুইটি স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে রান্নাঘরেরই একটি প্রশস্ত কোণ বাছিয়া খাওয়ার জায়গা করিয়া দিবে। রান্নাঘরের কিংবা খাবার ঘরের দেওয়ালে কোন চিত্রাদি সন্নিবেশের প্রয়োজন নাই। আসবাবপত্র যতদূর সম্ভব সরল ও সাদাসিধা হইবে। খাবার ঘরে টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ, মাটিতে বসিয়া ভোজন স্বাস্থ্যসম্মত নয়। খাবার টেবিলে একগুচ্ছ ফুল রাখা চলিতে পারে। ইহাতে কক্ষের শোভা বৃদ্ধি পায় এবং ভোজনের আনন্দ বাড়ে।

রান্নাঘরের নিরাপত্তা ঃ রান্নাঘর নির্মাণের সময় কিংবা উহার আসবাব নির্বাচনের সময় সর্বদাই বাড়ির লোকদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া লইতে

হয়, কারণ, গৃহের অধিকাংশ দুর্ঘটনাই ঘটে রান্নাঘরে। সাধারণত আগুন লাগিয়া, উত্তপ্ত তরল পদার্থ, যথা—দুধ, ডাল, চা, ভাতের মাড় ইত্যাদিতে পুড়িয়া গিয়া, কোন ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া গিয়া, কিংবা ঘরের মেঝেতে পিছলাইয়া গিয়া দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। দুর্ঘটনার কারণগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল :

(১) **অগ্নিকাণ্ড :** রান্নাঘরে দুর্ঘটনার প্রধান কারণই হইল অগ্নিকাণ্ড। পল্লীগ্রামের কাঁচা খড়ের রান্নাঘরগুলিতে সর্বাধিক অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে দেখা যায়। পল্লীগ্রামের রান্নাঘরগুলি সাধারণত খুব নীচু থাকে এবং কাঠের আগুনে রান্না করা হয়। গৃহের সহজদাহ্য খড়নির্মিত চালাগুলিতে সহজেই কাঠের আগুন লাগিয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রান্নাঘরে সচরাচর লম্ফ ব্যবহার করা হয়। সামান্য অসাবধানতাতে ঐ লম্ফের শিখা হইতে ঘরে আগুন লাগিয়া যাইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে রান্নাঘরটি একটু উঁচু করিয়া নির্মাণ করা এবং সতর্কতার সঙ্গে আগুনের ব্যবহার করা ব্যতীত আর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নয়।

পাকা বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ভয় অপেক্ষাকৃত কম। তবে গৃহে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা থাকিলে উহা ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিশেষত বাড়িতে হিটার ব্যবহার করিলে সর্বদাই সুইচের ব্যবস্থা করিবে। প্লাগের সাহায্যে হিটার জ্বালাইতে গিয়া অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়।

কখনও কখনও অসাবধানতাবশত ভাতের মাড়, গরম জল, ফুটন্ত ডাল কিংবা দুধ পড়িয়া গিয়া দেহের কোন অংশ পুড়িয়া যাইতে পারে। এইক্ষেত্রে গরম বস্তু নাড়াচাড়া করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। শুধু গৃহিণীরাই নহে, শিশুরাও এইরূপ দুর্ঘটনার কবলে পড়িয়া থাকে। সুতরাং গরম বস্তু মাটিতে যেখানে সেখানে না রাখিয়া সর্বদাই শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখিবে।

(২) **কর্তনজনিত দুর্ঘটনা :** রান্নাঘরে দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হইল কাটা। দা, বঁটি ইত্যাদি ধারাল অস্ত্র সর্বদাই রান্নাঘরের কাজে ব্যবহৃত হয়। দুর্ঘটনার কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই সকল জিনিসগুলি যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিবে না এবং শিশুদের নাগালের বাহিরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবে। ধারাল বস্তু ব্যতীত অনেক সময় ভাঙ্গা তৈজসপত্র দ্বারাও দেহের কোন অংশ কাটিয়া বা ছড়িয়া যাইতে পারে।

ভাঙ্গা বাসনকোসন বা ধারাল টিন, কৌটা, শিশি, বোতল ইত্যাদি রান্নাঘরের কাজে ব্যবহার করিবে না।

(৩) **পতনজনিত দুর্ঘটনা :** রান্নাঘরে অনেক সময় পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, ভাতের মাড় ইত্যাদি মেঝেতে পড়িয়া থাকিলেই সাধারণত এই পতনজনিত দুর্ঘটনা ঘটে। এই সকল ক্ষেত্রে গৃহিণী সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করিলেই দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে পারেন।

রান্নাঘরের মেঝে অতিরিক্ত পিচ্ছিল হইলেও দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। এইজন্য রান্নাঘর নির্মাণের সময় মেঝে যাহাতে অত্যন্ত পিচ্ছিল উপাদানে নির্মিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে।

রান্নাঘরের বাসনপত্র : রান্নাঘরের কাজে আমরা নানারূপ ধাতব পদার্থ —কাচ, মাটি ও পাথরের বাসন ব্যবহার করিয়া থাকি। এই সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (পৃঃ 105)।

বিভিন্ন প্রকার চুল্লী ও জ্বালানি

আমরা যে সকল পদার্থ জ্বালাইয়া তাপশক্তি সংগ্রহ করি তাহাকে বলে জ্বালানি (fuels)। জ্বালানিমাত্রই কার্বন ঘটিত এবং বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া জ্বলিয়া তাপ উৎপাদন করে। গন্ধক ও ম্যাগনেসিয়ামও জ্বলে কিন্তু উহারা জ্বালানি নয়। জ্বালানি সুলভ এবং সহজদাহ্য হওয়া চাই। জ্বালানি মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়।

কঠিন জ্বালানি : কাঠ এবং কয়লাই প্রধানত কঠিন জ্বালানির অন্তর্গত। তবে আমাদের দেশে ঘুঁটে, গুল, শুকনো পাতা প্রভৃতিও জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বালানি হিসাবে কাঠ সর্বাপেক্ষা সুলভ জ্বালানি। কাঠের আর একটি সুবিধা এই যে ইহার আগুন ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ভাজাভুজি করিবার প্রয়োজন হইলে কাঠের আগুন কমাইয়া লইলেই চলে। ফলে কাঠের আগুনে জ্বালানি এবং তেল উভয়ের খরচ বাঁচিয়া যায়, রান্নার স্বাদও উৎকৃষ্ট হয়। কাঠের আগুনের প্রধান অসুবিধা এই যে কাঠের কালিতে সমস্ত রান্নাঘরটি সহজেই নোংরা হইয়া যায়। কাঠের আগুনের ধোঁয়া চোখের পক্ষেও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। উপরন্তু ভিজা কাঠ দিয়া রান্না করা

একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে। গ্রীষ্মের সময় যথেষ্ট পরিমাণ কাঠ মজুত না রাখিলে বর্ষায় ভিজা কাঠ দিয়া রান্না করা সম্ভব নয়। যাহাদের কাঠ সংরক্ষণের মত উপযুক্ত স্থান নাই তাহাদের পক্ষে কাঠ দিয়া রান্না করা সম্ভব নয়। কাঠ পোড়াইলে যে কয়লা হয় তাহাও একপ্রকার উত্তম জ্বালানি।

কাঠের পরেই কয়লার প্রচলন দেখা যায়। আমাদের দেশে শহরাঞ্চলে, কোথাও কোথাও গ্রামেও কয়লা আসিয়া কাঠের স্থান অধিকার করিয়াছে। কাঠের মত কয়লা মজুত রাখিবার প্রয়োজন নাই; ইহা দামেও সস্তা। তবে কয়লা জ্বালাইবার আনুষঙ্গিক খরচ রহিয়াছে। কয়লা ধরাইতে কাঠ কিংবা ঘুঁটে, কেরোসিন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কাঠের মত কয়লার আগুন ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। একবার কয়লা ধরিয়া গেলে রান্নার সমস্ত কাজ দ্রুত সমাধা করিতে হয়। কয়লার ধোঁয়াতে বাড়ি ঘর নোংরা হয়। আজকাল বিদ্যুৎও একটি প্রধান জ্বালানি। সাধারণত কয়লা পোড়াইয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

তরল জ্বালানি: পেট্রোল, কেরোসিন, স্পিরিট ও অন্যান্য জ্বালানি তেল তরল জ্বালানির অন্তর্গত। স্টোভে যে রন্ধন কার্য চলে তাহাতে আমরা সচরাচর কেরোসিন তেল জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। কেরোসিন জ্বালানি হিসাবে অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল। তবে ক্ষুদ্র পরিবারের পক্ষে স্টোভে রান্নার কাজ চলে।

গ্যাসীয় জ্বালানি: বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস সুলভ হইয়াছে এবং উন্নত দেশগুলিতে আজকাল ঘরোয়া কাজেও গ্যাস ব্যবহার করা হইতেছে। বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের সুবিধাগুলি একরূপ। উভয় প্রকার উনুনই রান্নাঘরটি পরিষ্কার রাখে এবং রন্ধনকারীর শ্রম লাঘবে সাহায্য করে। গ্যাসের উনুনের আর একটি প্রধান সুবিধা এই যে ইহার আগুন ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফলে উত্তাপের অনর্থক অপচয় ঘটে না। গ্যাসের উনুন জ্বালাইতেও কোন হাঙ্গামা নাই। বিদ্যুৎ গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় একটু ব্যয়বহুল বটে কিন্তু সামান্য সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিলে সহজেই উহাদের অপচয় নিবারণ করা যায়।

জ্বালানির মত চুল্লীও নানা প্রকারের, যথা—কাঠের চুল্লী, কয়লার চুল্লী, স্টোভ, গ্যাস এবং বৈদ্যুতিক চুল্লী।

কাঠ এবং কয়লার চুল্লী : কাঠ এবং কয়লার চুল্লীর তিনটি অংশ আছে—

(১) **চুল্লীমুখ**—চুল্লীমুখের উপর রন্ধন পাত্রটি বসান হয়।

(২) **চুল্লীগর্ভ**—এইখানে জ্বালানি দগ্ধ হয়।

(৩) **তলদেশ বা পার্শ্বদেশ**—কাঠের চুল্লীর পার্শ্বদেশ দিয়া জ্বালানি দেওয়া হইয়া থাকে এবং ছাই চুল্লীগর্ভে জমা হয়। কয়লার চুল্লীর নির্মাণ
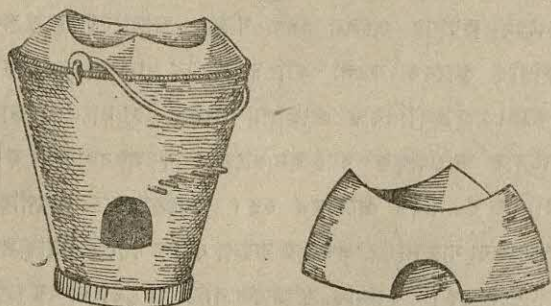
কয়লা ও কাঠের চুল্লী

পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র ধরনের। সাধারণত মাটিতে গর্ত করিয়া কিংবা বালতি কাটিয়া এই চুল্লী প্রস্তুত হয়। কয়লার চুল্লীর চারিপাশ ঢাকা থাকে এবং চুল্লীগর্ভে কয়েকটি লোহার শলাকা সাজাইয়া দেওয়া হয়। ঐ লৌহশলাকার উপর জ্বালানিগুলি থাকে। বায়ুপ্রবেশের জন্য এবং উনুনের ছাই জমা হইবার জন্য লৌহশলাকার অব্যবহিত নীচে যে স্থানটি থাকে উহাই চুল্লীর তলদেশ।

স্টোভ : স্টোভের জ্বালানি হইল কেরোসিন তেল। স্টোভ দুই প্রকারের—প্রেসার স্টোভ (Pressure stove) এবং ব্লু ফ্লেম স্টোভ (Blue flame stove)। প্রেসার স্টোভের তলদেশে জ্বালানি রাখিবার আধার থাকে। ঐ আধারের সংলগ্ন হাতলের সাহায্যে স্টোভটি পাম্প করিয়া দিলে কেরোসিন হইতে যে-গ্যাস সৃষ্টি হয়, তাহারই ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। প্রেসার স্টোভের মধ্যে প্রাইমাস (Primus) স্টোভই উল্লেখযোগ্য। এই স্টোভ ব্যবহার করা খুব নিরাপদ নয়, কারণ ইহা অনেক সময় ফাটিয়া গিয়া দুর্ঘটনা ঘটাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই স্টোভ জ্বালাইতে কেরোসিন ব্যতীত স্পিরিটের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ব্লু ফ্লেম স্টোভ আবার দুই শ্রেণীর—সলিতাবিশিষ্ট (with a wick) এবং সলিতাহীন (wickless)। প্রথমটিতে প্রেসার স্টোভের মতই স্টোভের তলদেশে জ্বালানি রাখিবার আধার থাকে এবং কেরোসিনে ভিজানো ফিতা

প্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্টি করে। স্টোভের গায়ে যে চাবি লাগানো থাকে উহার সাহায্যে ইচ্ছামত তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বস্তুত একটি সলিতাবিশিষ্ট স্টোভের কলকব্জা একটি হ্যারিকেনের অনুরূপ। সলিতাহীন স্টোভের ক্ষেত্রে
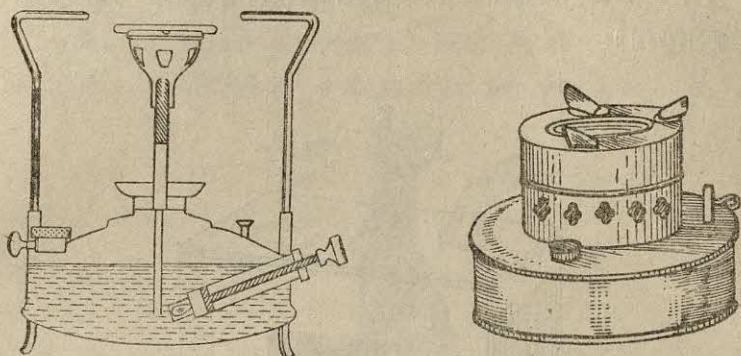
প্রাইমাস ও জনতা স্টোভ

স্টোভের তলদেশে জ্বালানি না রাখিয়া পার্শ্বেই একটি আধারে জ্বালানি রাখা হয়। তারপর ঐ আধার হইতে একটি নলের সাহায্যে স্টোভে জ্বালানি সরবরাহ করা হয়। চাবির সাহায্যে স্টোভে জ্বালানির সরবরাহ বাড়াইয়া কিংবা কমাইয়া দিয়া তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্টোভের মুখে একটি এ্যাসবেস্টাসের রিং থাকে। স্টোভ জ্বালাইলে ঐ রিংটি জ্বলিয়া উঠে।

প্রেসার স্টোভের চেয়ে ব্লু ফ্লেম স্টোভ ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিরাপদ। এই স্টোভ পাম্প করিতে হয় না। ইহা ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই এবং জ্বালাইবার জন্য স্পিরিটের প্রয়োজন হয় না।

গ্যাস ও বৈদ্যুতিক চুল্লী—গ্যাস এবং বৈদ্যুতিক চুল্লীর সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :—

(১) ইহাদের একটিতেও স্বতন্ত্র জ্বালানির প্রয়োজন হয় না। চুলী ব্যবহারে জ্বালানি সংক্রান্ত কোনরূপ হাঙ্গামা নাই বলিয়া ইহারা গৃহিণীর শ্রম লাঘবে খুব সহায়তা করে।

(২) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক হইতেও একটি গ্যাস আভেন (Gas oven) কিংবা একটি ইলেকট্রিক আভেন (electric oven) কাঠ এবং কয়লার উনুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

(৩) উনুন ধরানও খুব সহজ।

(৪) গ্যাস কিংবা বৈদ্যুতিক চুল্লী রান্নাঘর উত্তপ্ত করিয়া তোলে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কাঠ কিংবা কয়লার আগুনে রান্না করা যে কি কঠিন কাজ তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

(৫) সামান্য সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিলে এই প্রকার চুল্লীর খরচও বেশী পড়ে না।
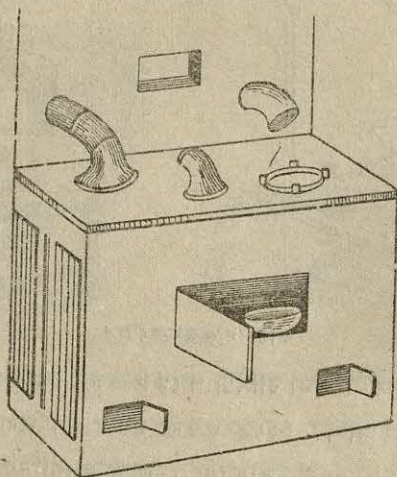
গ্যাসের উনুন

অসুবিধা—(১) যেখানে বিদ্যুৎ কিংবা গ্যাসের সরবরাহ নাই সেখানে এই প্রকার চুল্লী ব্যবহার করা যায় না।

(২) গ্যাস বা বিদ্যুৎ সুলভে না পাওয়া গেলে খরচ অত্যন্ত বেশী পড়িয়া যায়।

আমাদের দেশে অবশ্য গ্যাস কিংবা বৈদ্যুতিক চুল্লীর ব্যবহার দেখা যায় না। তবে অনেক বাড়িতেই গ্যাস রিং (Gas ring) এবং ইলেকট্রিক হিটারের ব্যবস্থা আছে। গ্যাসের উনুন বা গ্যাস রিং ব্যবহারের পর গ্যাসের চাবি খুব ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিবে এবং রান্নাঘরের দরজা জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিবে। কারণ বদ্ধস্থানে অতিরিক্ত গ্যাস জমিয়া গেলে মানুষের প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটিতে পারে।
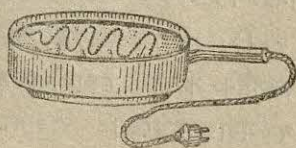
হিটার

নির্ধূম চুল্লী (Smokeless Chula)—আমাদের দেশে কাঠ এবং কয়লাই প্রধান জ্বালানি। এই দুইটি জ্বালানিরই প্রধান অসুবিধা এই যে

ইহাদের ধোঁয়ায় বাড়িঘর নোংরা হয়। এইরূপ ধোঁয়া স্বাস্থ্যের পক্ষেও খুব ক্ষতিকর। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখিবার জন্য এবং গৃহের পরিজনদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখিয়া অধুনা নির্ধূম চুল্লীর আবিষ্কার হইয়াছে। ধূম ও কালি নিয়ন্ত্রণ করাই এই চুল্লীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

চুল্লীর গঠন—এইরূপ চুল্লীতে সাধারণত তিনটি গর্ত থাকে এবং ঘর হইতে ধুম নিষ্ক্রমণের জন্য চুল্লীর উপরে প্রত্যেক গর্তের জন্য স্বতন্ত্র ঢাকনির ব্যবস্থা
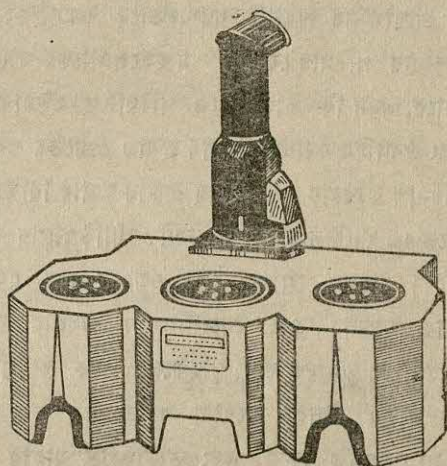
সরকার চুলা

থাকে। চুল্লীর সংলগ্ন দেওয়ালে ধূম নির্গমনের নল থাকে। চুল্লী ধরাইবার সময় ঢাকনিগুলি চুল্লীমুখে বসাইয়া দেওয়া হয়। ফলে উনুনের ধোঁয়া সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া না পড়িয়া ধুম নিষ্ক্রমণের নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। এইরূপ ধূমহীন চুল্লী **'সরকার চুলা'** নামে পরিচিত।

কয়লার মতই কাঠেরও নির্ধূম চুল্লী প্রস্তুত করা যায়। ইহাতে পাশাপাশি দুইটি বা তিনটি গর্ত থাকে। চুল্লীমুখ এরূপভাবে প্রস্তুত করা হয় যাহাতে উহার উপর হাঁড়ি কিংবা কড়াই বসাইলে পাত্রটি চুল্লীমুখের ঠিক খাপে খাপে বসিয়া যায়। ফলে উত্তাপ চুল্লীমুখ দিয়া বাহিরে যাইতে পারে না। চুল্লীপার্শ্ব অর্থাৎ জ্বালানি প্রবেশের পথটিও খুব ছোট করিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং জ্বালানি প্রবেশের মতই আরও একটি ছোট দ্বার রাখা হয়। ঐ দ্বারে একটি বৃহৎ চিমনি লাগাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে ধোঁয়া ঐ দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।

নির্ধূম উনুনে তিনটি গর্ত থাকিলে প্রথম ও তৃতীয়টিতে আগুন জ্বালাইয়া রান্না করা যায় এবং মাঝখানেরটিতে কোন আগুন না দিয়া এক হাঁড়ি জল চাপাইয়া রাখিলে প্রথম দুইটির উত্তাপে উহা গরম হইয়া যায়। ধূম নিয়ন্ত্রণ করা ব্যতীত নির্ধূম-চুল্লীর আর একটি বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে জ্বালানির অপচয় হয় না।

খাদ্য-দ্রব্য পরিমাণ বা ওজন করিয়া লইবার পদ্ধতি—সুখাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথাযথভাবে ওজন করিয়া লইতে হয়। কোন একটি দ্রব্যের পরিমাণ বেশী বা কম হইলে খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি খাদ্য-মূল্যও পরিবর্তিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং দ্রব্যাদির যথাযথ পরিমাণ সুখাদ্য প্রস্তুতের একটি অঙ্গবিশেষ।

দ্রব্যাদি পরিমাপ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। হাটে-বাজারে সাধারণত দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে দ্রব্যাদি ওজন করা হইয়া থাকে। আরও সূক্ষ্ম ওজনের জন্য এক বিশেষ ধরনের তুলাদণ্ড স্বর্ণকার, ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল দাঁড়িপাল্লা বা তুলাদণ্ড দ্বারা গৃহিণীদের পক্ষে দ্রব্যাদি ওজন করিয়া লওয়া সম্ভবপর নহে। উপরন্তু ঘরোয়া কাজে এত সূক্ষ্ম পরিমাপের কোন প্রয়োজনও হয় না। অতি সহজেই এবং তাড়াতাড়ি যাহার সাহায্যে দ্রব্যাদি ওজন করা যাইতে পারে, ঘরের কাজের পক্ষে তাহাই ওজনের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। এইজন্য সাধারণত একটি ৮ আউন্স পরিমাণের কাপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কাপটি আবার $\frac{1}{4}$ অংশ, $\frac{1}{3}$ অংশ এবং $\frac{1}{2}$ অংশ, এইভাবে দাগ কাটা থাকে। ফলে ঐ কাপের সাহায্যে ৮ আউন্স অপেক্ষা কম ওজনের দ্রব্যাদিও পরিমাপ করা যাইতে পারে। সাধারণ কঠিনাকৃতির খাদ্যদ্রব্যাদি, যথা—চাউল, গম, আটা, ময়দা, চিনি, ডাল, ইত্যাদি এই কাপের সাহায্যে পরিমাপ করা হইয়া থাকে। একটি চামচের সাহায্যে ধীরে ধীরে কাপটির নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত দ্রব্যাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে হয়; কখনও হাত দিয়া ঠাসিয়া পূর্ণ করিতে হয় না। আটা, ময়দা ইত্যাদি ওজন করিবার সময় কাপটি পূর্ণ হইলে একটি ছুরির ফলা দ্বারা কাপটির দাগের সহিত সমতল করিয়া দিতে হয়। ইহাতে ওজন বেশী বা কম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কখনও কাপটিকে ময়দা বা আটার মধ্যে ডুবাইয়া কাপ ভর্তি করিতে হয় না। ইহাতে যথাযথ ওজনের ব্যতিক্রম ঘটে।

মাখন, ডালডা ইত্যাদি কঠিন স্নেহ পদার্থ একটু ভিন্নভাবে পরিমাপ করা হয়। কাপটি ইহাদের সাহায্যে বেশ ঠাসিয়া নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত পূর্ণ করা হয় এবং পরিশেষে একটি ছুরির ফলার সাহায্যে দাগের সহিত সমতল করিয়া দিতে হয়।

তরল পদার্থ পরিমাপের জন্য সাধারণত একটি কাচের কাপ বা গ্লাস ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাতেও ওজন পরিমাপক কয়েকটি দাগ কাটা থাকে। দাগের উর্ধ্বেও একটু বাড়তি অংশ থাকে যাহাতে তরল পদার্থ পরিমাপের সময় উপচাইয়া পড়িতে না পারে।

অনেক সময় চামচও দ্রব্যাদি পরিমাপ করিতে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। চামচের সাহায্যে খাদ্যবস্তু ওজন করিতে হইলে ওজনের নিম্নরূপ মাপ অনুসরণ করিবে।

ময়দা ও চিনি জাতীয় শুষ্ক বস্তু ওজন

কানায় কানায় ভরতি করিয়া মাপা বড় চামচের (Table spoon) এক চামচ
=১ আউন্স

" " " " " মাঝারি " (Desert spoon) এক চামচ
=½ আউন্স

" " " " " ছোট " (Tea spoou) এক চামচ
=¼ আউন্স

ঘি মাখন জাতীয় বস্তুর ওজন

কানায় কানায় ভরতি করিয়া মাপা বড় চামচের (Table spoon) এক চামচ
=১ আউন্স

" " " " " মাঝারি " (Desert spoon) এক চামচ
=½ আউন্স

এতদ্ব্যতীত বাজারে খাদ্যদ্রব্য মাপিবার যন্ত্রও কিনিতে পাওয়া যায়। সঙ্গতি থাকিলে গৃহে ঐরূপ একটি যন্ত্র কিনিয়া রাখা মন্দ নয়।

রন্ধনের প্রয়োজনীয়তা—(১) অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন আগুনের ব্যবহার জানিত না, তখন খাদ্যদ্রব্য কাঁচা অবস্থায়ই খাইতে হইত। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আগুন জ্বালাইতে শিখিল। ইহার পর একদিন অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করিল যে রান্না করিয়া খাদ্যদ্রব্যকে

অধিকতর সুস্বাদু করা যায়। তখনকার দিনে রান্না বলিতে শুধু সেঁকাই (Baking) বুঝাইত। একটি উত্তপ্ত পাথরের উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া তাহা নরম করিয়া লওয়াই ছিল তখনকার দিনের রান্নার পদ্ধতি। তখন বাসন-কোসনের প্রচলন হয় নাই। সুতরাং আধুনিক যুগের বিভিন্ন ধরনের রান্না তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ যে কারণে রান্নার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল আজও অনেক খাদ্যদ্রব্য ঠিক সেই কারণেই অর্থাৎ অধিকতর সুস্বাদু বা রুচিকর করিবার জন্যই রান্না করা হইয়া থাকে।

(২) এমন অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে যাহা কাঁচা অবস্থায় আমাদের খাইবার বাসনা হয় না। রান্না করিবার পর ঐ খাদ্যই আবার উহার বর্ণ ও গন্ধের দ্বারা আমাদের আকৃষ্ট করে। কাঁচা মাছ, মাংস ইত্যাদি খাইবার কথা আমরা চিন্তাও করি না। কিন্তু ঐ মাছ, মাংস যখন বিভিন্ন মশলা দ্বারা রান্না করিয়া পরিবেশন করা হয়, তখন আমাদের খাইবার তীব্র বাসনা জাগে। রান্না করা খাদ্যের গন্ধে বা উহা দর্শন মাত্রই আমাদের মুখে এবং পাকস্থলীতে জারকরসের ক্ষরণ হইতে থাকে। সুতরাং রান্না করা খাদ্যের গন্ধ ও বর্ণ পরোক্ষভাবে আমাদের পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

(৩) এতদ্ব্যতীত এমন বহু খাদ্য আছে যাহা রান্না না করিলে আমাদের পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। শস্যকণা বা আলুর শ্বেতসার সাধারণত একটি কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে। কাঁচা অবস্থায় আমাদের লালার মধ্যস্থিত টায়ালিন ঐ শ্বেতসারের উপর কোন ক্রিয়া করে না। রান্না করিলে শস্যকণা বা আলুর শক্ত বহিরাবরণটি ফাটিয়া যায় এবং শ্বেতসার বাহির হইয়া আসে। এই অবস্থায় টায়ালিন ঐ শ্বেতসার ভাঙ্গিয়া গ্লুকোজ উৎপন্ন করিতে পারে। সুতরাং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যদ্রব্য কাঁচা অপেক্ষা রান্না করিয়া খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবার অনেক প্রোটিন জাতীয় খাদ্যদ্রব্য রান্না করিলে তাহাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কাঁচা ডাল (pulses) অপেক্ষা সুসিদ্ধ ডাল হইতে আমাদের দেহ অধিকতর প্রোটিন গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য ডাল অতি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া খাওয়া উচিত। মাংস এবং অনেক তরি-তরকারির তন্তুসমূহ (Fibre) অতিশয় শক্ত থাকে। কাঁচা অবস্থায় পাকস্থলী ঐ সকল তন্তু পরিপাক করিতে পারে না। রান্নার ফলে ঐ সকল তন্তু নরম হয় এবং খাদ্য পরিপাকে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। সুতরাং রান্না প্রত্যক্ষভাবেও আমাদের পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করিয়া থাকে।

(৪) রান্নার অপর উদ্দেশ্য খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত করিয়া শরীরকে সুস্থ রাখা। অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় অসংখ্য জীবাণু থাকে। এই সকল জীবাণুর মধ্যে এমন জীবাণুও থাকিতে পারে যাহা দ্বারা আমাদের দেহ সহজেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। দুধ আমাদের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় খাদ্য। এই দুধ অনেক সময় যক্ষ্মা, টাইফয়েড ইত্যাদি বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। সুতরাং কাঁচা দুধ পান করিলে আমাদের ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। কাঁচা মাংসের মধ্যেও অনেক সময় কঠিন রোগের জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উত্তাপের সাহায্যে ঐ সকল রোগজীবাণু ধ্বংস করিয়া তবেই ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। রান্নার দ্বারা রোগজীবাণু ধ্বংস করিয়া খাদ্যদ্রব্য নির্দোষ করা যাইতে পারে।

রন্ধন প্রক্রিয়া—রান্না করিবার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) ফুটাইয়া সিদ্ধ করা (Boiling)

(২) মৃদু তাপে সিদ্ধ করা (Stewing)

(৩) ভাপে সিদ্ধ করা (Steaming)

(৪) ঝলসানো বা সেঁকা (Roasting or Baking)

(৫) ভাজা (Frying)

ফুটাইয়া সিদ্ধ করা (Boiling)—এই প্রক্রিয়ায় জলের সহিত খাদ্যবস্তু সাধারণত ১০০° সেঃ বা ২১২° ফাঃ উত্তাপে ফুটাইয়া সিদ্ধ করা হয়। ভাত, মাছ, ডাল ইত্যাদি এই পদ্ধতিতেই রান্না করা হইয়া থাকে। ইহার সুবিধা এই যে ফুটন্ত জলের উত্তাপ খাদ্যবস্তুর সর্বত্র সহজেই পৌছিতে পারে এবং এই উত্তাপ সর্বত্রই প্রায় সমানভাবে পরিচালিত হয়। জলের মাধ্যমে উত্তাপ প্রয়োগ করিবার জন্য খাদ্যবস্তু পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে এই পদ্ধতিতে রান্না করিলে খাদ্যমূল্য হ্রাস পাইবার আশঙ্কা থাকে। কারণ, ফুটাইবার সময় জলের মধ্যে অনেক খাদ্যোপাদান দ্রবীভূত হয়। ধাতব লবণ ভাইটামিন 'বি' ও 'সি' এবং কার্বোহাইড্রেট প্রচুর পরিমাণে জলের মধ্যে গুলিয়া যায়। সুতরাং রান্নার পরে ঐ জল ফেলিয়া দিলে খাদ্যবস্তুর খাদ্যমূল্য কমিয়া যায়। এই জন্যই ভাতের মাড় ফেলিয়া দিলে উহার সহিত প্রচুর শ্বেতসার, ধাতব লবণ ও ভাইটামিনের অপচয় ঘটে।

মৃদু তাপে সিদ্ধ করা (Stewing)—এই পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু জলের সহিত ধীরে ধীরে মৃদু তাপে উত্তপ্ত করিয়া সিদ্ধ করা হয়। জল কখনও ফুটাইতে হয় না এবং জলের উষ্ণতা কখনও ৮২° সেঃ বা ১০০° ফাঃ-এর উপর বৃদ্ধি করা হয় না। জলের মাধ্যমে উত্তাপ প্রয়োগ করায় খাদ্যবস্তু পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা এই যে খাদ্যবস্তুর প্রোটিন কখনও অত্যধিক কঠিন ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে না। সুতরাং উক্ত প্রোটিন পরিপাক ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

জলের সহিত উত্তপ্ত করা হয় বলিয়া খাদ্যবস্তুর কার্বোহাইড্রেট, ধাতব লবণ এবং কোন কোন ভাইটামিন ইহাতে দ্রবীভূত হয়। সুতরাং জল ফেলিয়া দিলে খাদ্যমূল্য হ্রাস পাইবে। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিনজাত খাদ্যদ্রব্য এই প্রক্রিয়ায় রান্না করা কর্তব্য।

ভাপে সিদ্ধ করা (Steaming)—এই প্রক্রিয়ায় জল ফুটাইয়া বাষ্প উৎপন্ন করা হয় এবং সেই বাষ্পের উত্তাপে খাদ্যবস্তু সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়।
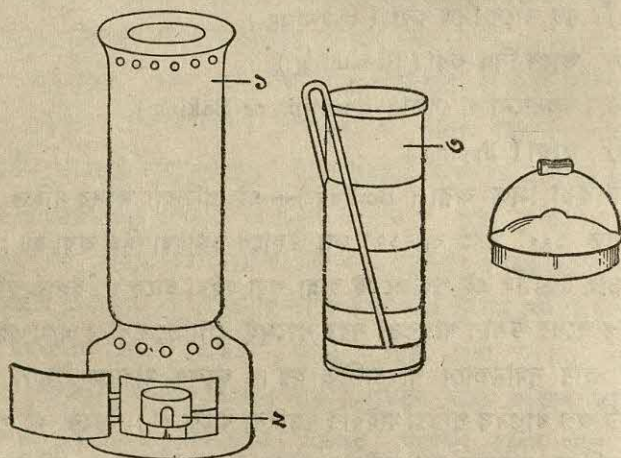
ইকমিক কুকার

১। সিলিণ্ডার ২। উনুন ৩। কুকারের বাটি

বাষ্পের উত্তাপ সাধারণত ১০০° সেঃ বা ২১২° ফাঃ হইয়া থাকে। প্রয়োজনমত এই উত্তাপ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, ইহাতে খাদ্যের ভাইটামিনসমূহ এবং ধাতব লবণের কোন অপচয় হইবার আশঙ্কা থাকে না। বায়ুর অক্সিজেন

ভাইটামিনের একটি প্রধান শত্রু। খাদ্যবস্তু সর্বদা বাষ্প দ্বারা পরিবৃত থাকায় ভাইটামিনসমূহ অক্সিজেন দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না। এই পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তুর 'এক্সট্রাকটিভ' সমূহ পুরাপুরি বজায় থাকে। সুতরাং খাদ্যের স্বাদ এবং গন্ধ নষ্ট হইতে পারে না। ইহাতে খাদ্যবস্তু পুড়িয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। অনেক সময় মাছ ভাপে সিদ্ধ করিয়া রান্না করা হয়। ভাপে রাঁধিবার জন্য 'ইকমিক কুকার' ও 'প্রেসার কুকার' ব্যবহার করা হয়।
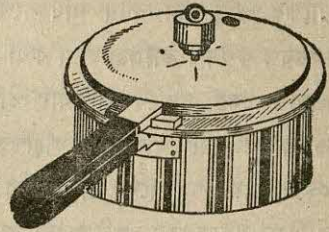
প্রেসার কুকার

ঝলসানো বা সেঁকা (Roasting or Baking)—এই পদ্ধতিতে আগুন হইতে তাপ সরাসরি খাদ্য-বস্তুতে লাগানো হয়। ঝলসানো প্রক্রিয়ায় একদিক হইতে খাদ্যবস্তুতে তাপ প্রয়োগ করা হয়। সেঁকা পদ্ধতিতে একই সময়ে সর্বদিক হইতে তাপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। উভয় পদ্ধতিতেই উত্তাপের পরিমাণ ইচ্ছামত কম বেশী করা যায়। ঝলসাইবার বা সেঁকিবার সময় খাদ্যবস্তু হইতে জলীয় বাষ্প ধীরে ধীরে বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায় এবং শক্ত তন্তুসমূহ নরম ও আল্‌গা হইয়া আসে, শ্বেতসার কণিকার শক্ত বহিরাবরণটি ফাটিয়া যায় এবং অভ্যন্তরস্থ শ্বেতসার বাহির হইয়া আসে, খাদ্যবস্তুর ধাতব লবণের কোন অপচয় হয় না। কিন্তু ভাইটামিনসমূহ বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা উচ্চতাপে ধীরে ধীরে নষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং ভাইটামিনবহুল খাদ্যদ্রব্য এই প্রক্রিয়ায় রান্না করা উচিত নয়। প্রোটিন এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যথা,—মাংস, রুটি, ইত্যাদি এই প্রক্রিয়ায় রান্না করা হইয়া থাকে।

ভাজা (Frying)—খাদ্য-দ্রব্য হঠাৎ অত্যধিক উত্তাপের সংস্পর্শে আনিয়া উহা হইতে জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে উড়াইয়া দেওয়াই এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য। খাদ্যদ্রব্যের অন্যান্য উপাদানসমূহ যাহাতে যথাসম্ভব বজায় থাকে সেইজন্য ভাজা কাজটি কোন একটি স্নেহ পদার্থ, যথা—তেল, ঘি, বনস্পতি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। স্নেহ পদার্থটি প্রথমে একটি পাত্রে ভালভাবে উত্তপ্ত করিয়া (১৮০° সেঃ—২০০° সেঃ বা ৩৫৬° ফাঃ—৩৯২° ফাঃ) ভাজিবার বস্তুটি উহাতে ছাড়িয়া দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্‌বুদ আকারে জলীয় বাষ্প বাহির হইতে থাকে। প্রায় ২-৩ মিনিট পর যখন এই বুদ্‌বুদ ওঠা বন্ধ

হইয়া যায়, তখন বস্তুটি স্নেহ পদার্থ হইতে উঠাইয়া লইতে হয়। স্নেহ পদার্থ ভালভাবে উত্তপ্ত না হইলে বস্তুটি উহাতে ছাড়িয়া দিলে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ পদার্থ ঐ বস্তুতে প্রবেশ করিয়া উহাকে দুষ্পাচ্য করিয়া তুলিবে। এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যের ভাইটামিন প্রায় অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ভাইটামিনযুক্ত খাদ্যবস্তু কখনও ভাজিয়া রান্না করা উচিত নয়। আমরা অনেক সময়ই অতি সামান্য স্নেহ পদার্থে ভাজিবার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করিয়া থাকি। এইরূপ ভাবে ভাজিবার সময় খাদ্যবস্তুটি বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া অক্সিডাইজড হইয়া যায়। ইহাতে খাদ্যমূল্যের প্রচুর হ্রাস হয়। ভাজিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বস্তুটি সর্বদা স্নেহ পদার্থের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। মাছ, বেগুন ইত্যাদি অনেক সময় ভাজিয়া রান্না করা হইয়া থাকে।

শাকসব্‌জি, মাছ, মাংস, ডিম ও শস্যকণা রাঁধিবার বিভিন্ন উপায়

তোমরা রন্ধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি পড়িলে। রন্ধনের এই সকল প্রক্রিয়া-গুলি জানা-ই কিন্তু যথেষ্ট নয়, কারণ খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করিয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক রন্ধনকারীর সম্মুখে থাকে আর একটি সমস্যা—রন্ধনের সময় প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর যথাসম্ভব খাদ্যমূল্য বজায় রাখা। রন্ধনের ফলে খাদ্যদ্রব্য-সমূহের খাদ্যমূল্যের কিছু না কিছু অপচয় ঘটিয়া থাকে। তবে কোন্ খাদ্য উপাদান কি কারণে নষ্ট হয়, সেই সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে খাদ্যবস্তুতে উহাদের বজায় রাখিয়া রান্না করা কিছু কঠিন কাজ নয়। এখন দেখা যাউক বিবিধ শ্রেণীর খাদ্যবস্তুগুলি কি উপায়ে রন্ধন করিলে উহাদের খাদ্যমূল্য বজায় রাখা সম্ভব।

শাকসবজি (Vegetables)—শাকসবজিগুলি প্রধানত নানাবিধ ভাইটামিন ও ধাতব লবণে পূর্ণ থাকে। এই জন্যই শাকসবজিকে আমাদের খাদ্যতালিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়। শাকসবজি আবার তিন শ্রেণীর—শাকপাতা (leafy vegetables), আনাজ বা তরকারি (vegetables) এবং কন্দ জাতীয় সবজি (root vegetables)। এই তিন শ্রেণীর শাকসবজিরই প্রধান শত্রু হইল ৪টি—(১) বায়ুস্থিত অক্সিজেন গ্যাস (oxygen), (২) আলো (light), (৩) উত্তাপ (heat) ও (৪) সোডা (soda)।

(১) **অক্সিজেন** (Oxygen)—ভাইটামিন 'এ' এবং ভাইটামিন 'সি' এই দুইটি ভাইটামিনের প্রধান শত্রু হইল বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস। এই দুইটি

ভাইটামিন-প্রধান শাকসবজিকে অধিকক্ষণ উন্মুক্তস্থানে ফেলিয়া রাখিলে উহাদের খাদ্যমূল্য অনেকখানি কমিয়া যায়। বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া রান্না হইবার সময়ের মধ্যেই শাকসবজির ভাইটামিনের অনেকখানি অপচয় ঘটে। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের ক্রিয়া দ্রুততর হয়। এইজন্যই রান্না করিবার সময় ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া থাকে।

(২) **আলো** (Light)—ভাইটামিন 'বি$_২$' অক্সিজেন দ্বারা নষ্ট হয় না। ইহার প্রধান শত্রু আবার আলো। তাই শাকসবজি অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দিলে উহাদের ভাইটামিন 'বি$_২$' অংশ বজায় থাকে। অক্সিজেন এবং আলো এই দুইটি আবার শীতল স্থান অপেক্ষা উষ্ণ স্থানে অধিক ক্রিয়াশীল। এইজন্য শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে শাকসবজির ভাইটামিন দ্রুত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার উন্মুক্ত স্থানের চেয়ে শাকসবজি সংরক্ষণের পক্ষে রেফ্রিজারেটার অধিক উপযুক্ত। তবে কোন কোন শ্রেণীর ভাইটামিন আবার রেফ্রিজারেটারেও নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই শাকসবজি বিশেষত শাকপাতা, (leafy vegetables) টাটকা কিনিয়া খাওয়া উচিত। কন্দজাতীয় সবজি অবশ্য কয়েক দিন ঘরে ফেলিয়া রাখা চলে।

অক্সিজেন এবং আলোর সংস্রব হইতে খাদ্যবস্তুকে দূরে রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করিবে—(১) বাজার হইতে শাকসবজি কিনিয়া আনিয়া অধিকক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না। (২) রন্ধনের অব্যবহিত পূর্বে তরকারি কাটিয়া লইবে এবং তরকারি কাটিয়া ফেলিয়া রাখিবে না। গোটা-তরকারির চেয়ে কোটা-তরকারির ভাইটামিন আরও দ্রুত নষ্ট হয়। (৩) যতদূর সম্ভব খোসা রাখিয়া তরকারি কাটিবে। খোসার আবরণে অভ্যন্তরস্থ ভাইটামিন অক্সিজেন ও আলোর হাত হইতে রক্ষা পায়। তরকারি বড় করিয়া কাটিলেও এই উদ্দেশ্য কিছু পরিমাণে সফল হয়। (৪) শাকসবজি সর্বদা ঢাকিয়া রান্না করিবে। (৫) রন্ধনের সময় অনাবশ্যক তরকারি নাড়াচাড়া করিবে না। এইরূপ নাড়াচাড়ায় খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে অক্সিজেন এবং আলোর সংস্পর্শে আসে।

(৩) **উত্তাপ** (Heat)—উত্তাপই ভাইটামিন সমূহের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। ভাইটামিন 'সি'র প্রধান শত্রু হইল উত্তাপ। রন্ধনের ফলে খাদ্যবস্তুর ভাইটামিন 'সি' নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য টমেটো, গাজর ইত্যাদি ভাইটামিন 'সি'-প্রধান খাদ্যগুলি কাঁচা খাইতে পারিলেই ভাল হয়।

কতক্ষণ সময় এবং কতটা উত্তাপে খাদ্যবস্তু রান্না হইতেছে তাহার উপর খাদ্যের ভাইটামিন সংরক্ষণ নির্ভর করে। অবশ্য রন্ধনের সময় এবং তাপমাত্রা খাদ্যবস্তুর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে একই সবজিকে বেশী উত্তাপের সাহায্যে কম সময়ের মধ্যে রান্না করিলে কিংবা কম তাপে বেশী সময় ধরিয়া রান্না করিলে উভয়ের খাদ্যমূল্যের কোন তারতম্য হয় না। মোটের উপর শাকসবজি রান্নার ক্ষেত্রে যে কোন প্রক্রিয়াই অবলম্বন কর না কেন, তরকারি সুসিদ্ধ হইয়া গেলেই নামাইয়া ফেলিবে এবং গরম গরম পরিবেশনের চেষ্টা করিবে। বার বার গরম করিলেও সবজির খাদ্যমূল্য কমিয়া যায়।

(৪) **ক্ষারদ্রব্য**—ক্ষারদ্রব্যের সংস্পর্শে আসিলে ভাইটামিন 'বি$_1$' সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। ডাল সিদ্ধ না হইলে অনেকে ডালে একটু সোডা দিয়া থাকেন। ইহাতে ডাল সুসিদ্ধ হয় বটে কিন্তু খাদ্যের ভাইটামিনের অংশ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

বিভিন্ন ভাইটামিনসমূহের মধ্যে ভাইটামিন 'এ' 'ডি' 'ই' এবং 'কে' ব্যতীত অবশিষ্ট সকল ভাইটামিনই এবং ধাতব লবণ সমূহ জলে দ্রবণীয়। সুতরাং তরিতরকারি কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলে ঐ সকল ভাইটামিন ও ধাতব লবণ জলে দ্রবীভূত হয়। উহাদের অপচয় নিবারণ করিতে হইলে তরকারি কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে নাই।

রান্না করিবার সময় ভাইটামিন সমূহের অপচয় কিছুটা হইবেই, তবে অপচয়ের কারণ জানা থাকিলে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া এই অপচয়ের পরিমাণ কমানো যাইতে পারে। উপরোক্ত কারণসমূহ ছাড়াও খাদ্যের এনজাইমের (Enzyme) সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যের ভাইটামিনসমূহ নষ্ট হইতে পারে। সুতরাং রান্না করিবার সময় প্রথমেই এই এনজাইমসমূহ নষ্ট করিয়া দিলে অপচয় কম হইবে। উচ্চতাপে এনজাইমসমূহ দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। নিম্ন তাপে ইহা সহজে নষ্ট হয় না, বরং অনেক সময় ইহাদের কাজ দ্রুততর হয়। এইজন্যই তরি-তরকারি ঠাণ্ডা জলে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত না করিয়া প্রথম হইতেই ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিতে হয়। এই কাজটি আরও ভালভাবে সম্পন্ন হয় যদি তরি-তরকারিগুলি উত্তপ্ত তেলে তাড়াতাড়ি ভাজিয়া লওয়া লয়। ফুটন্ত তেলের উচ্চতাপে এনজাইমসমূহ দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। **এইজন্যই রান্না করিবার পূর্বে তরি-তরকারিসমূহ ভাজিয়া লইবার রীতি প্রচলিত আছে।**

শাকসবজি রন্ধনের মূলনীতিগুলি সংক্ষেপে এই :—

(১) সমস্ত রকম শাকসবজি প্রথমেই জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। কাটিবার পর আর ধুইবে না।

(২) রন্ধনের অব্যবহিত পূর্বে তরকারি কাটিয়া লইবে এবং যতদূর সম্ভব খোসা রাখিয়া কাটিবে।

(৩) সবজিগুলি যথাসম্ভব বড় করিয়া কাটিবে।

(৪) কাটিবার পরে জলে ভিজাইলে ঐ জল ফেলিবে না।

(৫) খুব কম জল দিয়া রান্না করিবে।

(৬) জল ফুটিয়া উঠিলে সবজিগুলি জলে ছাড়িবে। ইহাতে সবজির জারকদ্রব্যসমূহ (Enzymes) তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং ভাইটামিনের অপচয় কম হইবে।

(৭) পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাঁধিবে।

(৮) বেশীক্ষণ ধরিয়া সবজি সিদ্ধ করিবে না কিংবা রন্ধনের সময় বার বার হাতা দিয়া নাড়াচড়া করিবে না।

(৯) রন্ধনে সোডা ব্যবহার করিবে না।

(১০) গরম থাকিতে বায়ুতে মুক্ত অবস্থায় রাখিবে না।

মাংস—মাংসের প্রধান উপাদান প্রোটিন। এই প্রোটিন এবং অন্যান্য উপাদান সমূহের অপচয় না করিয়া ইহাকে সহজপাচ্য এবং সুস্বাদু করিয়া তোলাই মাংস রান্নার প্রধান উদ্দেশ্য। মাংস রান্না করিবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে :—

(১) প্রোটিন যেন উত্তাপের ফলে অত্যধিক কঠিন হইয়া হজম ক্রিয়ায় ব্যাঘাত না ঘটায়।

(২) প্রোটিন, ভাইটামিন এবং ধাতব লবণ সমূহের যেন অযথা অপচয় না হয়।

(৩) মাংসের রক্তে লাল অংশটি অর্থাৎ রক্তকণিকা (Hæmoglobin) যেন সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

(৪) মাংসের স্বাভাবিক সুন্দর গন্ধ ও স্বাদটি যেন বজায় থাকে।

অত্যধিক উত্তাপে মাংসের প্রোটিন অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই কঠিন মাংস অতিশয় দুষ্পাচ্য। সুতরাং যথাসম্ভব অল্প তাপে মাংস রান্না করাই উৎকৃষ্ট পন্থা। সাধারণত ৮০° সেঃ বা ১৭৬° ফাঃ উত্তাপে ধীরে ধীরে

মাংস সিদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে মাংসের শক্ত তন্তসমূহ নরম হইয়া আসিবে এবং প্রোটিন অত্যধিক কঠিন এবং সঙ্কুচিত হইবে না। রক্তকণিকাও এই তাপেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। মাংসে অত্যধিক জল ব্যবহার করা উচিত নয়। মাংসের সুন্দর স্বাভাবিক গন্ধটি আসে উহার 'এক্সট্রাক্‌টিভ্' (extractives) এবং ধাতব লবণের জন্য। এই সকল 'এক্সট্রাক্‌টিভ্' এবং ধাতব লবণসমূহ জলে গুলিয়া যায়। ফলে মাংসের জল ফেলিয়া দিলে ঐ সকল উপাদানসমূহও নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং পরিমাণমত জল ব্যবহার করিয়া মাংস সিদ্ধ করিতে হয়। মাংসে যে সকল ভাইটামিন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ভাইটামিন 'বি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এই ভাইটামিনও নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। 'এক্সট্রাক্‌টিভ্' এবং ভাইটামিন সমূহ রক্ষা করিবার জন্য রান্না করিবার সময় মাংস ঢাকিয়া দিতে হয়। মাংসের টুকরাগুলি বড় বড় হইলে অপচয়ও কম হয়। কখনও কখনও মাংস ঝলসাইয়া বা সেঁকিয়া রান্না করা হয়। তবে মৃদু তাপে সিদ্ধ করাই মাংস রান্নার আদর্শ পদ্ধতি। মাংস রান্নার মূল কথাগুলি হইতেছে :—

(১) দোকান হইতে আনিয়া বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না। ইহাতে নানাপ্রকার রোগজীবাণুর সৃষ্টি হইতে পারে।

(২) মাংসের টুকরাগুলি যথাসম্ভব বড় বড় করিয়া কাটিবে।

(৩) মাংসে পরিমাণ মত জল ব্যবহার করিবে এবং কখনও মাংসের জল ফেলিয়া দিবে না।

(৪) অল্প তাপে মাংস সিদ্ধ করিবে।

(৫) রান্না করিবার সময় পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে।

মাছ—মাছ রান্নার প্রণালী মাংস রান্নার অনুরূপ। মাছের তন্তসমূহ অধিকতর নরম বলিয়া মাংস অপেক্ষা কম তাপে এবং অল্প সময়েই মাছ রান্না হইয়া যায়। মাছের 'এক্সট্রাক্‌টিভ্'-সমূহ মাংস অপেক্ষা অতি সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়। সুতরাং অত্যধিক উত্তাপে মাছ রান্না করা উচিত নয়।

আমরা অনেক সময়ই মাছ ভাজিয়া রান্না করি। ভাজিয়া রান্না করিবার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে হঠাৎ অত্যধিক তাপে ভাজিবার বস্তুর বহিরাবরণ হইতে জল বাষ্পীভূত করিয়া দেওয়া। সুতরাং মাছ ভাজিবার সময় উহা যেন স্নেহ পদার্থে ডুবিয়া থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যথায় মাছের অন্যান্য উপাদান সমূহেরও যথেষ্ট অপচয় ঘটিবে। ভাজিবার মূল উদ্দেশ্যটি

জানা না থাকায় আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাজিবার বস্তুটির খাদ্যমূল্য নষ্ট করিয়া ফেলে।

ডিম—ডিম বিভিন্ন প্রকারে রান্না করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মৃদু তাপে সিদ্ধ করিয়া রান্না করাই উৎকৃষ্ট প্রণালী। ডিমের মধ্যে যে সাদা অংশটি দেখা যায় ইহা এক প্রকারের প্রোটিন। এই প্রোটিন অত্যধিক উত্তাপে কঠিন আকার ধারণ করে এবং পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই সাদা অংশটি যখন জেলীর ন্যায় থকথকে হয়, তখনই ইহা শরীরের বেশী উপকারে আসে। সাধারণত ৮০° সেঃ (১৭৬° ফাঃ) উষ্ণ জলে ১০-১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিলেই ডিমের সাদা অংশটি জেলীর ন্যায় হইয়া পড়ে। ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিলে ইহা দুষ্পাচ্য হইবে।

অনেক সময় ডিম ফেটাইয়া ডিমের 'ওম্‌লেট্' ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। এই সময় ইহা উত্তমরূপে ঢাকিয়া দেওয়া উচিত যেন আলোর সংস্পর্শে আসিতে না পারে। আলোর প্রভাবে ডিমের ভাইটামিন 'বি' নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য—আমরা চাল, ডাল, গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য প্রত্যহ প্রধান আহার্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে ডাল ব্যতীত অবশিষ্ট অধিকাংশই শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য। এই সকল শ্বেতসার কণিকার বহিরাবরণ একটি সেল্যুলোসের কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে, আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ জারকরস (Enzyme) সেল্যুলোসের এই কঠিন আবরণটি ভেদ করিতে পারে না। এই জন্যই এই সকল খাদ্যদ্রব্য রান্না করা প্রয়োজন। রান্নার উত্তাপে বহিরাবরণটি ফাটিয়া যায় এবং শ্বেতসার কণিকা বাহির হইয়া জলের সহিত জেলীর ন্যায় মণ্ড প্রস্তুত করে। পাকস্থলী এই জেলী সহজেই পরিপাক করিতে পারে। শ্বেতসার ছাড়াও এই সকল খাদ্যশস্যে কিছু কিছু ভাইটামিন এবং ধাতব লবণ পাওয়া যায় এবং ইহারা অতি সহজেই জলে গুলিয়া যায়। সুতরাং খাদ্যশস্য যে-জলে রান্না করা হয় সেই জল ফেলিয়া দিলে প্রচুর ভাইটামিন, ধাতব লবণ এবং শ্বেতসারও ঐ সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। **এই জন্যই রান্না করিবার সময় ভাতের মাড় ফেলিতে নাই**। জলে সিদ্ধ করা ছাড়াও এই সকল খাদ্যশস্য অনেক সময় ঝলসাইয়া বা সেঁকিয়া সিদ্ধ করা হয়। ইহাতে খাদ্যমূল্যের অপচয় কম হয়।

ডাল অতি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তবেই খাওয়া উচিত। জলের সহিত ফুটাইলে ডালের খাদ্যমূল্যের বিশেষ কিছু অপচয় হয় না, বরং প্রোটিনসমূহ উত্তাপের ফলে সহজপাচ্য হয়। দেখা গিয়াছে যে অল্পসিদ্ধ ডাল অপেক্ষা সুসিদ্ধ ডালের প্রোটিন দেহ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে। অল্প ব্যয়ে ডাল প্রোটিনের এক উৎকৃষ্ট উৎস। প্রোটিন ছাড়াও ডালে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন 'বি' পাওয়া যায়। এই ভাইটামিন রান্নার প্রভাবে যেন নষ্ট হইয়া না যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ডাল সুসিদ্ধ করিবার জন্য অনেকে ডালে একটু সোডা ফেলিয়া দেন, ইহাতে ডালের ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ডালে কখনও সোডা ব্যবহার করা উচিত নয়।

খাদ্যদ্রব্য পরিষ্কার রাখিবার প্রয়োজনীয়তা—মানবদেহে ব্যাধি প্রবেশের পথ প্রধানত তিনটি—চর্মপথ, নাসাপথ এবং মুখবিবর। খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে রোগজীবাণু থাকিলে মুখবিবরের মধ্য দিয়া ঐ রোগজীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া নানারূপ ব্যাধির সঞ্চার করে। দেহ নীরোগ ও সুস্থ রাখিতে হইলে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা প্রয়োজন এবং খাদ্যদ্রব্য নাড়াচাড়ায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। খাদ্য পরিষ্কার রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিয়া চলিবে :—

(১) **বাসনপত্রের পরিচ্ছন্নতা**—যে পাত্রে খাদ্যদ্রব্য রান্না হয়, ঢালা হয় কিংবা পরিবেশন করা হয়, সেগুলি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং বিশুদ্ধ জলে ধৌত করিয়া লইবে। রোগজীবাণুপূর্ণ ময়লা জল দিয়া বাসন ধুইলে ঐ বাসনেও সকলের অলক্ষ্যে রোগজীবাণু লাগিয়া থাকে।

(২) **রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা**—রান্নাঘরটিও পরিষ্কার ঝকঝকে থাকা চাই। রান্নাঘরের ভিতরে বসিয়া মাছ কোটার কাজ পরিহার করিয়া চলাই উচিত। ভাতের মাড়, তরকারির খোসা, উনুনের ছাই ইত্যাদিও রান্নাঘরে জমাইয়া রাখিবে না, কারণ এরূপ আবর্জনা আরশুলা, মাছি ইত্যাদি রোগের জীবাণুবাহক কীটপতঙ্গদের আকৃষ্ট করে।

(৩) **দাসদাসী ও রন্ধনকারীর পরিচ্ছন্নতা**—শুধু যে কীটপতঙ্গরাই জীবাণু বহন করে তাহা নয়, মানুষও রোগের বাহক (carrier)। রোগের বাহকরা সকলের অলক্ষ্যে রোগজীবাণু ছড়াইতে থাকে। দাসদাসী নির্বাচনের সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা তাহাদের মলমূত্র পরীক্ষা করাইয়া লইতে পারিলে সবচেয়ে ভাল হয়। তবে একান্তই তাহা সম্ভব না হইলে

পরিচিত নীরোগ ব্যক্তি দেখিয়া কর্মে নিযুক্ত করা উচিত। এতদ্ব্যতীত যাহারা রন্ধন ও পরিবেশন করিবে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি ও দেহ পরিষ্কার থাকা উচিত। হাত ও পায়ের নখ বড় রাখা, হাত দিয়া ভোজ্যবস্তু স্পর্শ করা, গামছা কিংবা কাপড় দিয়া থালা মোছা প্রভৃতি কতকগুলি বদ অভ্যাস তাহাদের অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৪) সর্বপ্রকার কাঁচা খাদ্য অর্থাৎ ফলমূল ইত্যাদি বিশুদ্ধ জলে ভাল করিয়া ধুইয়া খাইতে দিবে। খাদ্যবস্তু কখনও অনাবৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিবে না।

খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে উপরিউক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

কয়েকটি প্রাত্যহিক ঘরোয়া রান্না

ভাত—বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত। সর্ববিধ ব্যঞ্জন তাহারা ভাতের সঙ্গে খাইয়া থাকে। ভাত ঠিকভাবে রান্না না হইলে কোন তরকারির স্বাদই অনুভূত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে ভাত রান্না খুব সহজ বলিয়া বোধ হইলেও অনভিজ্ঞ গৃহিণীর হাতে ভাত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম নয়।

যে পরিমাণ চাল রান্না করিতে হইবে প্রথমেই উহার ধান ও কাঁকর বাছিয়া লইয়া জল দিয়া ভালভাবে ধুইয়া ফেল। তারপর হাঁড়িতে পরিমাণমত জল চাপাইয়া আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দাও এবং হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া দাও। ভাত যখন টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে তখন ঢাকনা খুলিয়া ফেলিয়া হাতা দিয়া অর্ধসিদ্ধ ভাতগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দাও। এইভাবে নাড়িয়া না দিলে হাঁড়ির সব জায়গায় ভাত সমান সিদ্ধ হয় না। তারপর চাল সুসিদ্ধ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখ। কয়েকটি ভাত লইয়া টিপিলে যদি ভিতরে খুব ছোট একটি শক্ত দানা অনুভব কর তবে বুঝিবে ভাত নামাইবার উপযুক্ত হয় নাই। এই দানাটি যখন সম্পূর্ণ নরম হইয়া যাইবে তখন ভাত নামাইয়া মাড় সরাইয়া ফেলিবে। আতপ চালের ভাত রান্না করিতে হইলে জল ও চাল একসঙ্গে না চাপাইয়া দিয়া প্রথমে জলটা ফুটাইয়া লইবে। তারপর ধীরে ধীরে চালগুলি ছাড়িবে।

ভাতের মাড় না সরাইয়াও ভাত রান্না করা যায়। তোমরা জান মাড়শুদ্ধ-ভাতে অধিক ভাইটামিন থাকে। ভাতে মাড় রাখিতে হইলে এমনভাবে মাপিয়া জল দিবে যাহাতে চাল বেশ সুসিদ্ধ হয় অথচ সবটুকু জল মরিয়া যায়।

ডাল—ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে ডাল একটি নিত্যব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য। রুটি এবং ভাত উভয়বিধ খাদ্যের সঙ্গেই ডাল ব্যবহার করা চলে। বাংলাদেশে প্রধানত মুগ, মসুর, ছোলা, মটর ও মাষকলাইয়ের ডালের প্রচলন দেখা যায়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা অড়হড় ও খেসারী পছন্দ করে।

সব রকমের ডালই প্রথমে জলে ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া তেলের উপর পাঁচফোড়ন ও মসলা সহযোগে সম্বরা দিবার নিয়ম। তবে প্রত্যেক রকম ডাল রাঁধিবারও নিজ নিজ পদ্ধতি রহিয়াছে। সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

মসুর ডাল—মসুর ডালে যথেষ্ট প্রোটিন বর্তমান। নিত্য-ব্যবহারের পক্ষে মসুর ডাল উৎকৃষ্ট। ইহা রন্ধনও অপেক্ষাকৃত সহজ। ডালগুলি ধুইয়া লইয়া জল সামান্য গরম হইয়া উঠিলে ডাল ছাড়িয়া দিতে হয়। তারপর ফুটিয়া আসিলে নুন ও হলুদ দিয়া দিবে। একেবারে সুসিদ্ধ হইয়া গেলে কাঁটা দিয়া ডাল এমনভাবে ঘুঁটিয়া দিবে যেন ডাল জলের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। এখন কড়াইতে তেল চাপাইয়া তেল উত্তপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তেলের ফেনা মরিয়া গেলেই বুঝিবে তেল গরম হইয়াছে। তারপর গরম তেলের উপর পাঁচফোড়ন, শুকনা লঙ্কা ও তেজপাতা, পাঁচফোড়ন পছন্দ না করিলে শুধু কালজিরা সাঁতলাইয়া লইয়া ডাল কড়াইয়ে ঢালিয়া দাও। ফুটিয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। রুচি অনুসারে মসুর ডালে পেঁয়াজ দেওয়া চলে। সম্বরার সময় পেঁয়াজের কুচিগুলি বাদামী রং করিয়া তেলের উপর ভাজিয়া ডাল ঢালিয়া দিতে হয়। কেহ কেহ মসুর ডালে আম কিংবা টমেটো দিয়া টক ডাল প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

মুগ ও ছোলার ডাল—মুগ ডাল কাঁচা ও ভাজা দুই ভাবেই রান্না করা যায়। অনেকে কাঁচা মুগ ডালে উচ্ছে, কচি লাউ ও ঝিঙ্গে দিয়া তিতা ডাল রান্না করিয়া থাকেন। তিতা ডালে শুধুমাত্র সরিষা, ঘি ও আদাবাটা সম্বরা দিতে হয়, অন্য কোন ফোড়নের প্রয়োজন নাই। ভাজা মুগ ডালে উচ্ছে দেওয়া হয় না, তবে নানাপ্রকার সবজি, যথা—আলু, পটল, কুমড়া, ঝিঙ্গে, বাঁধাকপি, মূলা, নারিকেল কুচি ভাজা ইত্যাদি সহযোগে রান্না করা হইয়া থাকে। ছোলার ডালে কুমড়া, বাঁধাকপি ও এঁচড় এই সবজিগুলি চলে। মাছের কাঁটা ও মুড়া দিয়া ডাল রান্নার পক্ষেও মুগ ও ছোলার ডালই প্রশস্ত। ভাজা মুগ ও ছোলার ডালে ঘি, গরম মশলা, নারিকেল, জিরা ও তেজপাতা সম্বরা দেওয়া হয়।

ছোলার ডাল কঠিন বলিয়া সহজে সিদ্ধ হইতে চায় না। তাই রান্না করিবার পূর্বে অন্ততঃ একঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

মটর ডাল—মটর ডালও বাঙালীর অন্যতম প্রিয় ডাল। কচি লাউ অথবা কচি ছাঁচি কুমড়া ও সামান্য ঘি ও আদাবাটা দিয়া উৎকৃষ্ট মটর ডাল রান্না করা যায়। কেহ কেহ মটর ডালে মূলা দিয়া থাকেন। মটর ডাল, টক ডাল হিসাবেও চমৎকার। সাধারণত আম, আমড়া, চালতা, করমচা, টমেটো ও তেঁতুলই টক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। টক ডালে শুকনো লঙ্কা ও সরিষাই উৎকৃষ্ট ফোড়ন। টক ডালে অনেকেই মিষ্টি দেওয়া পছন্দ করেন।

মাষকলাই—ইহার অপর নাম বিউলি। মাষকলাইয়ের ডালে মৌরী ও আদাবাটা ফোড়ন দিতে হয়। অনেকে চিংড়িমাছ দিয়াও মাষকলাইয়ের ডাল রান্না করিয়া থাকেন। এই ডাল অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং পিত্তনাশে সহায়তা করে।

এতদ্ব্যতীত দুই তিন রকমের ডাল মিশাইয়া এক সঙ্গে পাঁচ মিশালী ডাল রান্না করা যায়। রুটির ডাল সাধারণত ঘন হইয়া থাকে। তবে ডাল পাতলা হইবে কি পুরু হইবে তাহা ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করে। ভাজা মুগ ও ছোলার ডাল পুরু এবং মসুর ডাল সচরাচর পাতলা হইয়া থাকে।

লুচি—যে কয়খানি লুচি করিতে হইবে তত মুষ্টি ময়দা লইয়া ঘি-এর ময়ান* দিবে এবং জল দিয়া খুব ভাল করিয়া ঠাসিবে। ঠাসা হইলে লেচি করিয়া ছোট ছোট লুচির আকারে বেলিয়া নাও। এইবার উনুনে কড়াই চাপাইয়া ঘি দাও। ঘি তাতিয়া উঠিলে ভাসা ঘিয়ে ভাজিয়া লইবে। লুচি বেলা এবং ভাজার কাজ একসঙ্গে চলাই প্রশস্ত, কারণ বেশিক্ষণ বেলিয়া ফেলিয়া রাখিলে লুচি ফুলিতে চায় না।

পুরি—লুচি এবং পুরি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি একই। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে লুচির উপকরণ হইল ময়দা এবং পুরিতে ময়দার পরিবর্তে আটা ব্যবহার করা হয়।

চাপাটি—যে কয়খানি চাপাটি করিতে হইবে তত মুষ্টি লইয়া ঘি-এর ময়ান দিবে এবং জল দিয়া খুব ভাল করিয়া ঠাসিবে। চাপাটিতে সামান্য নুন

*রুচি অনুযায়ী লুচিতে সামান্য চিনি ও নুন দেওয়া চলে। ময়ান দিবার সময়ই চিনি ও নুন মাখিয়া লইতে হয়।

দিতে হয়। ঠাসা হইলে লেচি করিয়া দুই হাতেই থাবড়াইয়া রুটির আকৃতি করিয়া লইবে। রুটির চেয়ে চাপাটি একটু বেশি পুরু হয়। পরে উনুনে চাটু চড়াইয়া অল্প ঘি দিবে এবং ঘি তাতিয়া উঠিলে চাপাটি চাটুতে দিয়া দুই পিঠ বাদামী রং করিয়া ভাজিয়া লইবে। চাপাটি অল্প ঘি দিয়াই ভাজিতে হয়।

চাপাটি ভারতের সর্বজন পরিচিত খাদ্য হইলেও এই বিরাট দেশের সর্বত্র এক পদ্ধতিতে চাপাটি প্রস্তুত হয় না। অনেক স্থানে চাপাটিতে ঘি-এর ময়ান দিয়া রুচি মত বিনা ঘিতে চাটুর উপর ভাজা হয় এবং শেষে চাটু সরাইয়া নিয়া উনুনের কয়লার উপর সেঁকা হয়।

খিচুড়ি—খিচুড়ির প্রধান উপকরণ হইল চাল, ডাল এবং সামান্য ঘি। তবে খিচুড়িতে মূলা অথবা টমেটো, ফুলকপি, আলু ও মটরশুঁটি দিলে ইহা অতিশয় উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হয়। ডালের মধ্যে আবার মুগ ও মসুর ডালই খিচুড়ির পক্ষে উপযুক্ত। ছোলা, মটর ইত্যাদি ডালগুলি সিদ্ধ হইতে অনেক বেশী সময় লাগে বলিয়া উহাদের ব্যবহার না করাই সঙ্গত। চাল এবং ডালের পরিমাণ সর্বদা সমান রাখিবে। তবে খিচুড়িতে সবজি ব্যবহার করিলে ডাল কম দিলেও ক্ষতি নাই। সিদ্ধ চাল অপেক্ষা আতপ চাল খিচুড়ির পক্ষে অধিক উপযুক্ত।

প্রথমেই চাল ও ডালগুলিকে ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর চাল, ডাল এবং সবজি দিতে হইলে সবজিগুলি পৃথক্ পৃথক্ ঘিতে সাঁতলাইয়া উঠাইয়া রাখিবে। মূলা হইলে সাঁতলাইবার প্রয়োজন নাই। এখন যে পাত্রে খিচুড়ি রাঁধিবে তাহাতে কিছু ঘি ও তেল অথবা শুধু ঘি দিয়া তেজপাতা, আস্ত গরম মসলা, জিরা ও আদাবাটা দিয়া জল দিবে। জল ফুটিয়া উঠিলে ভাজা চাল ও ডালগুলি দিবে। সবজিগুলি একটু পরে দিবে এবং সবগুলি সিদ্ধ হইলে নুন এবং মিষ্টি দিবে। ঘন হইয়া আসিলে ঘি ও গরম মসলা বাটা দিয়া নামাইবে। খিচুড়ি গরম গরম খাইতেই ভাল লাগে। খিচুড়িতে পেঁয়াজ দেওয়া রুচির উপর নির্ভর করে। যাহারা পেঁয়াজ পছন্দ করেন তাহারা সবজি দিবার সময় আস্ত পেঁয়াজ দিয়া দিবেন। কোনরূপ সবজি দেওয়া না হইলে খিচুড়িতে নারিকেল কুচি বাদামী করিয়া ভাজিয়া দিলে ভাল হয়। নারিকেল কম থাকিলে অল্প পরিমাণ নারিকেল কুরাইয়া দেওয়া চলিতে পারে।

ভাজা—আমাদের দেশে ভাজাভুজি খাইবার বহুল প্রচলন দেখা যায়। অনেকের ত' ডালের সঙ্গে ভাজা না হইলেই চলে না। সাধারণত আলু, বেগুন,

কুমড়া, ফুলকপি, কচু, পটল, ঢেঁড়স প্রভৃতি তরকারি ভাজার পক্ষে প্রশস্ত। এতদ্ব্যতীত নানারকমের শাক ভাজা এবং ঝিঙ্গে, কাঁকরোল, পটল প্রভৃতি পুর ভরিয়া ভাজারও ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা দেশে ডিম, নারিকেল, কচু ও ডালের বড়া অতি উপাদেয় ভাজা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আমরা সাধারণত দুই ভাবে ভাজা করিয়া থাকি—বেসন দিয়া ভাজা এবং বেসন ব্যতীত ভাজা।

বেসন দিয়া ভাজা—বেগুন, আলু, পটল, কুমড়া ও ফুলকপি বেসন দিয়া ভাজার পক্ষে প্রশস্ত। বাঁধাকপি খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া বেসন মাখিয়া বড়ার মত করিয়া ভাজা যায়। প্রথমে আলু, বেগুন ইত্যাদি যে সবজিগুলি ভাজা করা হইবে তাহা পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া লও এবং উহাতে লবণ মাখাইয়া রাখ। তারপর জলে পুরু করিয়া বেসন গুলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ফেটাইয়া লও এবং সামান্য নুন ও মিষ্টি দাও। এইবার কোটা তরকারি-গুলি বেসনে ডুবাইয়া উত্তপ্ত তেলে বাদামী রং করিয়া ভাজিয়া লও। ফুলকপি বেসনে ভাজিবার পূর্বে সামান্য ভাপ দিয়া লইবে। বেসনে ভাজা বস্তু সর্বদা গরম খাইতে হয়।

বেসন ব্যতীত সবজি ভাজিতে হইলে সবজিগুলি কাটিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া লবণ ও হলুদ মাখিয়া লও। বেগুন ভাজায় রুচিমত মিষ্টি দেওয়া চলে। তারপর কড়াইতে তেল চাপাইয়া উত্তপ্ত তেলে তরকারিগুলি বাদামী রং করিয়া ভাজিয়া তুলিয়া রাখ।

নিরামিষ তরকারি

আমাদের দেশে যে কত বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন উপাদানে নিরামিষ তরকারি রান্না করা যায় তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। চচ্চড়ি, ডালনা, দম, ঘণ্ট, পাঁচমিশালী তরকারি বা ঘ্যাট, ছেঁচকি, ছ্যাচড়া ইত্যাদি নানা রকমের নিরামিষ তরকারির সঙ্গে আমরা পরিচিত। শুধু এক পটল দিয়াই পটল ভাজা, পটলের ডালনা, পটলের দম, দই পটল, পটল পোস্ত ইত্যাদি কত রকম রান্না করা যায়। অনুরূপভাবে প্রায় সকল প্রকার তরকারি দিয়াই দুই তিন রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা সম্ভব।

পটলের ডালনা—প্রথমে পটল এবং কয়েকটি আলু লইয়া খোসা ছাড়াইয়া অথবা খোসাসমেত ডুমা ডুমা করিয়া কাটিয়া ধুইয়া লও। এইবার

কড়াইতে তেল চাপাইয়া তেল উত্তপ্ত হইলে আলু ও পটলগুলি ভাজিতে থাক। ভাজিবার সময়ই নুন, হলুদ, ধনিয়া, জিরা ও লঙ্কাবাটা দিয়া তরকারি ও মসলাগুলি কষিয়া লও। তারপর ঐ কষা তরকারিগুলিই কড়াই হইতে নামাইয়া রাখিয়া কড়াইতে সামান্য ঘি দাও। ঘি উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে তেজপাতা ও কয়েকটি পাঁচফোড়ন দিয়া তরকারিগুলি দাও এবং একটু নাড়িয়া চাড়িয়া পরিমাণমত জল ঢালিয়া দাও। একটি থালা দিয়া তরকারি ঢাকিয়া দাও। আলু ও পটল সিদ্ধ হইয়া আসিলে সামান্য মিষ্টি দিয়া নামাইয়া ফেলিবে।

পরিবেশনের নিয়ম—

ভোজনের তৃপ্তি যে কেবল খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতির উপরেই নির্ভর করে তাহা নয়, পরিবেশনের কাজটিও রন্ধনের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দর ভাবে পরিবেশিত খাদ্য আহারে কিরূপ তৃপ্তি উৎপাদন করে তাহা যে-কোন উচ্চ-শ্রেণীর হোটেল কিংবা ভোজে গেলেই উপলব্ধি করা যায়। বাড়িতেও লক্ষ্য করিও পরিবেশনের গুণে একই খাদ্যের আকর্ষণের কতখানি তারতম্য ঘটে। রান্নাঘরে সঞ্চিত তরকারির খোসা, মাছের আঁশ ইত্যাদির মাঝখানে একটি থালায় করিয়া সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন স্তূপাকৃতি করিয়া দিলে স্বভাবতই আহারের আর স্পৃহা থাকে না। আবার ঐ খাদ্যই যদি বিভিন্ন বাটিতে ঢালিয়া একটি টেবিলের উপরে সাজাইয়া দাও, একটি পরিষ্কার ঝকঝকে গ্লাসে জল দাও এবং টেবিলের উপরে একটি সুদৃশ্য ফুলদানিতে একগুচ্ছ ফুল তুলিয়া রাখ তবে আহারের রুচি অনেকখানি বাড়িয়া যাইবে। বস্তুত খাদ্য পরিবেশন একটি উঁচুদরের শিল্প। খাদ্যবস্তু যত সাধারণই হউক পরিবেশনকারী কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলিলে আহার্যবস্তুকে অনেকখানি চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে পারে। পরিবেশনের নিয়মগুলি মোটামুটি এই :

(১) খাইবার স্থান নির্বাচন—মধ্যবিত্ত পরিবারে সাধারণত বাড়ির সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘরটিতে রান্নার ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ স্থানেই আহারের কাজটিও সমাধা হইয়া থাকে। আলোবাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে ঘরে সাধারণত আহারের আনন্দ কমিয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে আহারের জন্য বাড়ির একটি সুন্দর আলোবাতাসপূর্ণ স্থান বাছিয়া লওয়া উচিত। রান্নাঘর হইতে আহার্য দ্রব্য সেই স্থানে টানিয়া আনিবার সামান্য কষ্টটুকু স্বীকার করিয়া লইলে ভোজনের আনন্দ বাড়িবে।

(২) আহারের স্থান নির্বাচনের পর ঐ জায়গাটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া এরূপ চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবে যাহাতে আপনা হইতেই আহারের রুচি আসে। মাটিতে বসিয়া আহারের ব্যবস্থা করিলে প্রথমে স্থানটির ধূলা ঝাড়িয়া জল দিয়া মেঝে মুছিয়া লইবে। তারপর আসন পাতিয়া প্রত্যেকটি আসনের সম্মুখে জলের গ্লাস থালা দিয়া ঢাকিয়া দিবে। সম্ভব হইলে মেঝেতে একটি আলপনা আঁকিয়া দিবে। টেবিলে ভোজনের ব্যবস্থা থাকিলে টেবিলটি ঝাড়িয়া উহার উপরে একটি সুদৃশ্য টেবিলক্লথ পাতিয়া দিবে। তারপর প্রত্যেকের থালা ও গ্লাস ধুইয়া জলভর্তি গ্লাসগুলি ঢাকিয়া রাখিবে। টেবিলের মাঝখানে লঙ্কা, লেবু ও নুনের পাত্রগুলি সাজাইয়া রাখিবে। আহারের স্থানে একটি কাচের জগ কিংবা ঘটিতে বাড়তি পানীয় জল রাখিয়া দিবে। টেবিলের উপরে একগুচ্ছ ফুল সাজাইয়া রাখিলে স্থানটি আরও মনোরম হইয়া উঠে।

(৩) উপযুক্ত বাসনপত্র নির্বাচন ও উহাদের পরিচ্ছন্নতার উপরেও আহারের তৃপ্তি নির্ভর করে। অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ও নোংরা, ভাঙ্গা, দাগওয়ালা কিংবা কলাই ওঠা বাসনে খাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। দামি কিংবা সুদৃশ্য বাসনে প্রত্যহ ভোজন করা সম্ভব না হইলেও অন্তত পরিষ্কার বাসনে ভোজন করা কিছু কঠিন নয়। কাঁসা, পিতল প্রভৃতির বাসনে কোন দাগ পড়িয়া গেলে মাঝে মাঝে উহা দোকান হইতে পালিশ করাইয়া আনিবে।

(৪) পরিবেশনকারীর দৈহিক পরিচ্ছন্নতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশনকারী যদি খুব নোংরা হয়, তাহার হাতের নখে ময়লা লাগিয়া থাকে কিংবা পোশাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত ময়লা থাকে তবে স্বভাবতই তাহার হাতে খাইতে ভোজনকারীর রুচি হয় না। পরিবেশনকারীকে তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে।

(৫) পরিবেশনকারীর অভ্যাসগুলিও যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। অনেক পরিবেশনকারীকে হাত দিয়া খাদ্যদ্রব্য ঘাঁটাঘাঁটি করিতে দেখা যায়। খাদ্যদ্রব্য এইরূপ ঘাঁটাঘাঁটি করিলে খাইবার রুচি থাকে না। খাদ্যবস্তু যতদূর সম্ভব হাত দিয়া স্পর্শ করিবে না কিংবা আহার্যপূর্ণ বাটি নখ ডুবাইয়া ধরিবে না।

(৬) পরিবেশনকারীর পরিবেশনের কৌশলটিও জানা থাকা চাই। কোন্ বস্তুর পরে কোন্ বস্তু পরিবেশন করিতে হইবে, যিনি খাইতেছেন তাহার

কোন্ ব্যঞ্জনটি ভাল লাগিয়াছে বুঝিয়া লইয়া সেইমত পরিবেশন করার দক্ষতাই হইল পরিবেশনের কৌশল। এতদ্ব্যতীত পরিবেশনকারী একদিকে খাদ্যবস্তুর পরিমাণ ও অন্যদিকে ভোজনকারীর সংখ্যা এতদুভয়ের মধ্যে সর্বদা সঙ্গতি রাখিয়া পরিবেশন করিবে। এইরূপ সঙ্গতি রাখিয়া পরিবেশন করিতে পারিলে জিনিসের অপচয় ঘটে না, আবার সকলেই সমানভাবে ভাল মন্দ সব জিনিসের ভাগ পাইতে পারে।

সবজি বাগান

সবজি বাগানের উপযোগিতা—গৃহসংলগ্ন একফালি সবজি বাগানের উপযোগিতার কথা কাহারও অবিদিত নাই। এই দুর্মূল্যের বাজারে বাড়িতেই যদি লাউ, লেবু, লঙ্কা, মূলা, ঝিঙ্গে, ঢেঁড়স, কুমড়া, উচ্ছে, শশা, কলা, নটে শাক ইত্যাদি বিভিন্ন তরকারি উৎপন্ন হয় তবে গৃহস্থের দৈনন্দিন বাজারের অনেকখানি খরচ বাঁচিয়া যায়। ঘরের টাটকা তরিতরকারি বাজারের শুকনো চালানী তরকারির চেয়ে সুস্বাদু এবং অধিক উপকারীও বটে। উপযোগিতা ব্যতীত সবজি বাগানের সৌন্দর্যের দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। একটি ক্ষুদ্র সবজি বাগান গৃহের সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিতে সাহায্য করে। ক্ষেত্রকার বাগানের ভিতর দিয়া একটি অনুপম সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করেন। বস্তুত উপযোগিতা এবং সৌন্দর্যের এরূপ অপূর্ব সমন্বয় অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়।

নীতির দিক হইতেও সবজির ক্ষেতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। প্রকৃতির নিকট হইতে মানুষ শ্রম করিয়া খাদ্য আহরণ করে। বাইবেলে এইরূপ শ্রমকে বলা হইয়াছে 'রুটির জন্য শ্রম' (Bread labour)। যে ব্যক্তি রুটির জন্য শ্রম না করিয়া প্রত্যহ দুই বেলা অন্ন ধ্বংস করিতেছে সে তো অপরের শ্রমফলে ভাগ বসাইতেছে। সমাজের যাহাতে পরগাছা হইয়া না থাকিতে হয়, সেইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সামান্য হইলেও কিছু কিছু কায়িক শ্রম করা দরকার। এইরূপ শ্রমের ভিতর দিয়া উচ্চ-নীচের ভেদরেখা তিরোহিত হয়, শ্রমের মর্যাদা বাড়ে। নীতির দিকটা ছাড়িয়া দিলেও শুধুমাত্র দেহকে সুগঠিত করিবার জন্যই প্রত্যেক মানুষের প্রত্যহ কিছু না কিছু কায়িক পরিশ্রম করা উচিত। বিশেষত যাহারা কেবল মাথার কাজ করেন তাহাদের পক্ষে বাগান করা একটি চিত্তাকর্ষক ব্যায়াম। ঘরে বসিয়া ডাম্বেল, মুগুর ভাজিয়া কিংবা রাস্তায় ও মাঠে দ্রুত হাঁটিয়াও ব্যায়াম করা চলে বটে কিন্তু তাহাতে দেহচর্চা ব্যতীত

অপর কোনরূপ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। উপরন্তু এইরূপ ব্যায়াম একঘেয়েও বটে। অথচ বাগানের কাজে কত বৈচিত্র্য। প্রত্যেক ঋতুতে প্রকৃতি আমাদের নতুন নতুন ফল ও সবজি উপহার দেয়। বাড়ির প্রতিটি লোক আপন আপন সাধ্যমত এই কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া ফসল ফলাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। শিশুরাও প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের একটা সুযোগ পায়। বছরের কোন্ ঋতুতে কোন্ সবজি হয়, বীজ হইতে কেমন ভাবে অঙ্কুরোদ্গম হয়, ফুল কিরূপে ফলে রূপান্তরিত হয়, কোন্ ফল হইতে কতদিন সময় লাগে, কোন্ গাছে কি সার দেওয়া প্রয়োজন শিশুরা এ সকলই প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারে। বস্তুত ভারত কৃষিপ্রধান দেশ ; খাদ্যসমস্যাও আমাদের প্রচুর। যাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে চায়, তাহাদের যদি শৈশবেই বাড়িতে বাগান সম্বন্ধে হাতেখড়ি হয় তবে পরবর্তী জীবনে তাহারা সহজেই সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। কেন না পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে হাতে কলমে শিক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী।

সবজি ক্ষেতে আবহাওয়া ও মৃত্তিকার গুরুত্ব—সবজি ক্ষেতে আবহাওয়া ও মৃত্তিকা এই দুইটি বস্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে।

আবহাওয়া—সবজির বাগান করিবার সময় সর্বদাই স্থানীয় আবহাওয়ার কথা স্মরণ করিয়া বীজ পুঁতিবে। তোমরা জান আমরা সকল ঋতুতে এক-প্রকার সবজি খাই না। শীতের সময় বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, বীট, গাজর, মটরশুঁটি, বেগুন, ওলকপি ইত্যাদি যে সকল চমৎকার সুস্বাদু সবজিগুলি অপূর্ব রূপ লইয়া বাজার আলো করিয়া থাকে, গ্রীষ্মের আবির্ভাবে তাহারা যেন কোন যাদুমন্ত্রে অন্তর্ধান করে। আবার গ্রীষ্মের আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল, পেপে, পটল, উচ্ছে, প্রভৃতি ফল ও সবজিগুলি বর্ষা কিংবা শীতের সময় পাওয়া যায় না। ঋতুভেদে ফসলের এই প্রভেদের মূলে রহিয়াছে আবহাওয়ার তারতম্য। শাক সবজির জন্য চাই বায়ু, উত্তাপ ও আর্দ্রতা। ঋতুভেদে আবহাওয়ায় এই উপাদানগুলির পরিমাণের তারতম্য ঘটে এবং এই তারতম্য অনুযায়ী আমরা বাংলাদেশের আবহাওয়াকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগে করিতে পারি—(১) গ্রীষ্মের উষ্ণ, আর্দ্র আবহাওয়া (২) বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আর্দ্র আবহাওয়া এবং (৩) শীতের উষ্ণ, শুষ্ক আবহাওয়া।

মৃত্তিকা—শুধুমাত্র আবহাওয়া অনুযায়ী বীজ বপন করিলে উৎকৃষ্ট সবজি উৎপন্ন হয় না। উন্নত ধরনের সবজির জন্য চাই উৎকৃষ্ট মাটি। মৃত্তিকার

গুণাগুণের উপরেই চাষের ফলাফল নির্ভর করে। মাটির মধ্যে সাধারণত চারিটি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়—(১) বালুকা (sand), (২) কর্দম (clay), (৩) চুন (lime) ও (৪) দাহ্য পদার্থ (humus)।

চাষের পক্ষে বেলে মাটি, কর্দমাক্ত মাটি কিংবা অতিরিক্ত চুনবিশিষ্ট মাটির একটিও উপযুক্ত নয়। যে মাটিতে বালুকার পরিমাণ বেশী তাহাকেই বলে বেলে মাটি। বেলে মাটি জল শোষণ করিয়া লইতে পারে বটে কিন্তু ইহার মোটেই জল ধরিবার ক্ষমতা নাই। অথচ জলই প্রধানত গাছের খাদ্য জোগায়। তোমরা জান যাহাদের দাঁত নাই তাহারা কঠিন বস্তু চিবাইয়া খাইতে পারে না। শিশুদের দাঁত নাই বলিয়া উহারা কেবল দুধ বা কোন তরল পদার্থ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। গাছেরাও তেমনি জলীয় দ্রব্য অথবা বাতাস হইতে কোন আহার্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায় দেখিয়াছ। মাটির ভিতরে যে সকল পদার্থ সঞ্চিত আছে উহাতে জল ঢালিলে মাটির পদার্থ সকল দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং গাছ মূলদ্বারা ঐ সকল খাদ্য সংগ্রহ করে। এই জন্যই বলিয়াছি গাছের খাদ্য জোগায় জল।

কর্দমাক্ত মাটির প্রকৃতি বেলে মাটির ঠিক বিপরীত। যে মাটিতে কাদার ভাগ বেশী থাকে, তাহাকে আবার বলে এঁটেল মাটি। এঁটেল মাটির জলধারণের ক্ষমতা বেশী কিন্তু শোষণের শক্তি খুব কম। ইহাও চাষের অনুপযুক্ত।

মাটির তৃতীয় উপাদান হইল চুন। মাটিতে চুনের পরিমাণ বেশী হইলে গাছ-পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। তবে যে-মাটিতে চুনের অভাব আছে তাহাতে চুন দিয়া সহজেই জমির উর্বরতা বাড়ান যাইতে পারে। অধিকন্তু চুন আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস প্রভৃতি ফলের স্বাদ মিষ্টি করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। এই তিনটি পদার্থ ব্যতীত মাটিতে কিছু উদ্ভিজ্জ বা জৈব পদার্থও থাকা চাই। যাবতীয় জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাটির সহিত মিশ্রিত হয়। ইহারই নাম দাহ্য পদার্থ। মাটিতে এই দাহ্য পদার্থ না থাকিলে কোন গাছই ফলিবে না।

উদ্যানের কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইল দো-আঁশ মাটি। ইহাতে প্রায় ৪০ হইতে ৫০ ভাগ বালু, ৩০ হইতে ৫০ ভাগ কর্দম, ৫ ভাগ চুন ও ৫ ভাগ দাহ্য পদার্থ থাকে। সব রকমের ফলমূল, শাকসবজি এই মাটিতেই উত্তম জন্মায়।

জমি প্রস্তুত করিবার উপায়

জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে হইলে কিংবা উহা বজায় রাখিতে হইলে জমি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। জমি কর্ষণই হইল জমি প্রস্তুতির প্রথম স্তর। সুকর্ষিত জমির মৌলিক উপাদানগুলি সূর্যকিরণে নষ্ট হইতে পারে না এবং জমিতে কোন আগাছা থাকিলে কর্ষণের ফলে সেগুলির গোড়া আলগা হইয়া যায় এবং জমি বাছিয়া ফেলা সম্ভব হয়। সাধারণ শাকসবজি চাষের জন্য মাটি দুই হাত গভীর করিয়া খনন করিলেই চলে। সবজির গাছগুলি সাধারণত ছোট থাকে, উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড়গুলি শক্ত মাটি ভেদ করিয়া রস গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া মাটি আলগা ও ঝুরা করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, যাহাতে শিকড় সহজেই মাটির রস গ্রহণ করিতে সমর্থন হয়।

জমি প্রস্তুত করিবার সময়ই জমিতে সার দিতে হয় এবং জলসেচের সুবন্দোবস্তের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সবজির ক্ষেত্রটি বৃহৎ হইলে একটি হোস পাইপের (hose pipe) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে জলসিঞ্চনের কষ্ট লাঘব হয়। বর্ষায় বাগানে জল দাঁড়াইবার সম্ভাবনা থাকিলে জলনিঃসরণের জন্য নর্দমার ব্যবস্থা রাখিবে।

জমির সার (Manure)—মাটির ভিতর যে সকল রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত আছে উহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া গাছপালা বাঁচিয়া থাকে। উদ্ভিদের এই খাদ্যের নাম সার। গাছপালা ক্রমাগত মাটি হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে বলিয়া জমিতে উহাদের উপযোগী খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। খাদ্যাংশ কমিয়া গেলে তখন কৃত্রিম উপায়ে সারের অভাব পূরণ করিতে হয়।

গাছপালার খাদ্য প্রধানত তিনটি—(১) নাইট্রোজেন গাছের শরীর গঠন করে। (২) ফসফরাস গাছে ফুল ও ফল ধরাইবার সহায়তা করে। (৩) পটাশ গাছের খাদ্যাংশ গাছের দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি গৌণ কিন্তু আবশ্যক খাদ্য গাছপালা মাটি ও বায়ু হইতে গ্রহণ করে। এই গৌণ খাদ্যের মধ্যে চৌদ্দটি অন্যতম—(১) ক্যালসিয়াম, (২) ম্যাগনেসিয়াম, (৩) গন্ধক, (৪) ম্যাঙ্গানীজ, (৫) দস্তা, (৬) বোরণ, (৭) তাম্র, (৮) লৌহ, (৯) কার্বন, (১০) ক্লোরিন, (১১) অক্সিজেন, (১২) হাইড্রোজেন, (১৩) অ্যালুমিনিয়াম ও (১৪) সোডিয়াম। গৌণ খাদ্যগুলি গাছের জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বটে তবে মাটি কিংবা বায়ুতে ইহাদের কখনও অভাব হইতে

দেখা যায় না। গাছের দেহে প্রধানত নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সরবরাহের জন্য সারের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন বস্তু হইতে আমরা সার পাইয়া থাকি। উহাদের মোটামুটি ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) উদ্ভিজ্জ সার, (২) প্রাণিজ সার, (৩) খনিজ সার, (৪) মৃত্তিকা সার, (৫) মিশ্রিত সার ও (৬) রাসায়নিক সার।

(১) **উদ্ভিজ্জ সার**—বিভিন্ন গাছের ডাল, পাতা, তরকারির খোসা, চা পাতা ইত্যাদি গর্তে রাখিয়া অল্প জল ও চুন ছড়াইয়া মাটি চাপা দিয়া পচাইলে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। শণ, ধঞ্চে ইত্যাদির বীজও বর্ষার সময় মাটিতে ফেলিয়া রাখিলে চারা গজাইয়া ওঠে। তারপর ফল ধরিবার পূর্বে গাছগুলি মাটিতে মিশাইয়া দিলে উহা পচিয়া জমির সারে পরিণত হয়। উদ্ভিজ্জ সারের মধ্যে খইল অন্যতম। সরিষা, রেড়ি, তিল, তুলা. মহুয়া ইত্যাদি তৈলবীজ হইতে খইল পাওয়া যায়। খইলের সঙ্গে সমপরিমাণে গোবর মিশ্রিত করিয়া গাছের গায় তরল সার দিলে গাছ সহজেই বাড়িয়া ওঠে। এইরূপ সারে নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফরাস বিদ্যমান থাকে। সারের ছাইও উৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ সার।

(২) **প্রাণিজ সার**—প্রাণীর দেহ হইতে প্রাপ্ত সব রকমের সারই প্রাণিজ সারের অন্তর্গত। অস্থিচূর্ণ (bone dust), অস্থিখণ্ড (bone meal) এবং গোময় অতি উৎকৃষ্ট প্রাণিজ সার। অজ্ঞতাবশত আমাদের দেশের লোকেরা গোময়ের মত একটি সস্তা অথচ ফলপ্রসূ সার প্রতি বৎসর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিতেছে।

(৩) **খনিজ সার**—খনিজ সারের মধ্যে সোরা, লবণ ও চুন প্রধান। বীট, পালং, লেবু ও নারিকেল গাছের পক্ষে লবণ অতিশয় উপকারী। চুন ফলের মিষ্টত্ব বাড়ায়। তবে কোন গাছেই বেশী পরিমাণ চুন কিংবা লবণ প্রয়োগ করিতে নাই।

(৪) **মৃত্তিকা সার**—বিভিন্ন প্রকারের মাটি, যথা—পলিমাটি, পোড়ামাটি সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। সদ্য পাঁক জমিতে না দিয়া উহাতে অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া পরিবর্তিত অবস্থায় দেওয়াই সঙ্গত।

(৫) **মিশ্রিত সার**—সবজির ক্ষেতের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার এই মিশ্র সার। ঘরঝাঁটান ধূলা, রান্নাঘরের তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, উনুনের ছাই, ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য, গোশালার আবর্জনা, পশুপাখীর মৃতদেহ সব কিছুর সংমিশ্রণে

এই মিশ্র সার উৎপন্ন হয়। কলিকাতার ডাস্টবিনে প্রত্যহ যে সকল আবর্জনা জমা হইতেছে উহাতে মিশ্রিত সারের সকল উপাদানই পাওয়া যায়। ধাপার মাঠে নিয়া ঐগুলি পচাইয়া মিশ্র সারে পরিণত করা হয়। পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা বাড়িতেই একটি বড় গর্ত খুঁড়িয়া গৃহের যাবতীয় ময়লা উহাতে পচাইতে পারেন।

(৬) **রাসায়নিক সার**—উপরি-উক্ত সার ব্যতীত বাজারে নানারকমের রাসায়নিক সার কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সালফেট অব অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট অব সোডা, নাইট্রেট অব পটাশ, বক ফস্ফেট, সুপার ফস্ফেট উল্লেখযোগ্য। এই সকল রাসায়নিক সারের মধ্যে কোনটিতে নাইট্রেট, কোনটিতে পটাশ এবং কোনটিতে ফসফরাসের প্রাধান্য থাকে। গাছের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতে হয়।

বীজ নির্বাচন—বীজ নির্বাচন ও সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বীজের কাজ হইল বংশধারা বজায় রাখা। উৎকৃষ্ট জাতের গাছের সর্বাপেক্ষা ভাল ও নীরোগ বীজ হইতে গাছ জন্মাইতে পারিলে উহাতে যে শাকসবজি ও ফল পাওয়া যায় তাহা পূর্বপুরুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্বপ্রকার ফল, ফুল ও শাকসবজির বীজ সুপরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করা কর্তব্য। অপরিপক্ক ও অপুষ্ট বীজ হইতে কখনও সবল চারা উৎপন্ন হয় না। শাকসবজির বীজ পরিপক্ক অবস্থায় যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ঘুঁটের ছাইয়ের সহিত কাচের ছিপিআঁটা বোতলে সংরক্ষণ করিতে হয়। বীজের বোতলগুলি কাচের আলমারিতে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ। তারপর মাঝে মাঝে বোতলগুলি মাটিতে না লাগাইয়া রৌদ্রে দিতে হয়।

সবজির কীট—এই জগতে সকলেরই শত্রু মিত্র আছে। সবজিরও শত্রু আছে। কীটই হইল সবজির সর্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু। এতদ্ব্যতীত শাকসবজির দেহে নানারকম রোগাক্রমণ ঘটে। সবরকম ফসলই দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়—(১) প্রথমত **রোগের দ্বারা**। গাছের রুগ্ন শাখায় অনেক সময় রোগজীবাণু দেখা যায়। কখনও বা বায়ুতাড়িত হইয়া রোগের জীবাণু ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহাকে বলে ছাতাধরা। ছাতাধরা রোগটি ফসলের সমূহ ক্ষতি করে।

(২) দ্বিতীয়ত **কীটের দ্বারা**। কীট ফসলের অন্যতম প্রধান শত্রু। কীটপতঙ্গের উপদ্রব অনেক ক্ষেত্রে জলবায়ু এমন কি ভালমন্দ চাষের উপরও

নির্ভর করে। জমি স্যাঁতসেঁতে হইলে কিংবা জমিতে বহুদিন ধরিয়া জল দাঁড়াইলে কীট জন্মিতে পারে। কীটপতঙ্গের আক্রমণ হইতে সর্বদাই সচেতন থাকা আবশ্যক। গাছের শুষ্ক ও রুগ্ন শাখা দেখিলে সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটিয়া ফেলিবে। কীট জন্মাইবার পর কীট হনন করা অপেক্ষা কীট প্রতিরোধ করা অনেক সহজ কাজ। গাছপালা যাহাতে রোগগ্রস্ত বা কীটাক্রান্ত না হইতে পারে ইহার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। সর্বপ্রথম জমির চারিদিক ভাল করিয়া পরিষ্কার রাখিবে। জমিতে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস ও সূর্যালোক খেলিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। রোগাক্রান্ত গাছের বীজ পুঁতিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ রুগ্ন হয়। বীজ পুঁতিবার পূর্বে উহাদের তুঁতের জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া ছাইয়ের গুঁড়া মাখাইয়া শুকাইয়া জমিতে পুঁতিলে গাছ রোগা হইবার সম্ভাবনা বহুলাংশে তিরোহিত হয়। সব রকম আঁইশ ও ছাতাধরা রোগে বোর্দো মিশ্চার (Brodeoux mixture) বা তুঁতের আরক ফলপ্রদ। উইচিংড়ি, মাঠফড়িং, সাদা প্রজাপতি ও সব রকমের পত্রভক্ষক কীট ধ্বংস করিবার একটি কার্যকরী ঔষধ হইল লেড আর্সিনিয়াট (Lead Arseneate)। এতদ্ব্যতীত কেরোসিন জল, তামাকের জল, ফিনাইল কিংবা ক্রুড অয়েল ইমালশান (Crude Oil Emulsion) পিচকারি অথবা ঝারির সাহায্যে গাছে ছিটাইয়া দিলেও ঐ সব কীট ধ্বংস হয়। অনেক সময় হলুদ ও নীল রংয়ের ছোট ছোট পোকা ঝিঙ্গে, শশা, লাউ, কুমড়া, বেগুন , ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি গাছ নষ্ট করে। কেরোসিন জল, ছাইয়ের গুড়া অথবা তুঁতের জল প্রয়োগে ইহারা নষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল কীট গাছের রস শোষণ করিয়া গাছ মারিয়া ফেলে উহাদিগকে লেড ক্রোমেট (Lead Chromate) দ্বারা ধ্বংস করা যায়। পিঁপড়া অনেক সময় গাছের ভিতরকার শাঁস খাইয়া ফেলিয়া গাছ মারিয়া ফেলে। ইহাদিগকে নষ্ট করিতে হইলে হলুদের গুঁড়া ছড়াইয়া রাখা দরকার। বাগানে উই পোকার গর্ত দেখিলে গর্তে গন্ধক কিংবা আর্সেনিক পোড়াইবে।

বৃক্ষরোপণ প্রণালী—বাগানে দুই রকম ভাবে গাছ লাগান যাইতে পারে—প্রথমত বীজ দ্বারা, দ্বিতীয়ত কলম করিয়া। শাকসবজির গাছ শুধু মাত্র বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়। ফুল ও ফলের গাছগুলি বীজ ও কলম দুই উপায়েই প্রস্তুত করা যায়। কলমের গাছের সুবিধা এই যে ইহাতে জায়গা

কম লাগে এবং শীঘ্র ফল ধরে। সবজির ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হইলে দুই চারিটি কলমের ফলের গাছও সেখানে অনায়াসে লাগান চলে।

বীজ নির্বাচন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি। এইবার কি ভাবে এবং কোন্ ঋতুতে কোন্ বীজ লাগাইতে হয় জানিয়া রাখ। মাটি প্রস্তুত হইবার পরে ঋতু অনুযায়ী বীজ লাগাইতে হয়। সব বীজ পুঁতিবার একরকম পদ্ধতি নয়। নটে, ডাঁটা, শুঁটি জাতীয় শাকের বীজ একসঙ্গে ছড়াইয়া দিতে হয়। আবার লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, শশা, সীম, মূলা, পেঁয়াজ, আলু ইত্যাদি নিয়মিত ফাঁক রাখিয়া সারিবদ্ধভাবে জমিতে লাগাইবে। বেগুন, টমেটো, শালগম, বীট, গাজর ইত্যাদি শীতের ফসলগুলি প্রথমে সিড-বেডে (seed-bed) চারা প্রস্তুত করিয়া লইয়া জমিতে নতুন করিয়া পুঁতিয়া দিবে। বাড়িতে প্রচুর জায়গা থাকিলে ভূমিতেই সিড-বেড তৈয়ারী করা যায়। নতুবা বড় বড় কাঠের বাক্স কিংবা মাটির গামলা ও টবে চারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। টবে চারা প্রস্তুত করিবার প্রধান সুবিধা এই যে, ইচ্ছামত রৌদ্র ও বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উপরন্তু পোকামাকড়ের হাত হইতেও কচি চারাগুলি সহজেই রক্ষা করা চলে। চারাগুলি স্থানান্তরের সময় উপস্থিত হইলে একটি একটি করিয়া প্রণালীবদ্ধ ভাবে লাগাইয়া যাইবে। বিকালবেলা বৃক্ষরোপণের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময়। গাছ লাগাইবার সময় সর্বদা নির্দিষ্ট ব্যবধান রাখিয়া লইতে হয়। খুব কাছাকাছি লাগাইলে কোন গাছই যথেষ্ট খাদ্য পায় না এবং ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না।

শাক সবজির গাছ বেশীদিন বাঁচে না। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঋতু উপযোগী নতুন নতুন ফসল লাগাইতে হয়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, সীম, লেট্যুস, পালং, বীট, গাজর ইত্যাদি শীতের ফসল। কোন্ ফসল কখন আবাদ করিতে হয় যে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে যে শীতের ফসল উঠিতে শুরু করে তাহা মার্চ পর্যন্ত কিছু কিছু খাওয়া চলিতে থাকে। মার্চ এপ্রিলে গ্রীষ্ম আসিয়া পড়ে। এই সময় শুধুমাত্র তরমুজ, পটল, ওল, চিচিঙ্গা ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি সবজি লাগান চলে। মে মাসে শশা, ঝিঙ্গে, ক্ষীরাই, জুন জুলাই মাসে কুমড়া, বেগুন, ঢেঁড়স, ডাঁটা ইত্যাদির বীজ লাগাইতে হয়। জুলাই, অগাস্ট মাসে বর্ষার সমস্ত তরকারি উঠিতে থাকে। তারপর অগাস্ট মাস হইতে শীতের তরকারি লাগাইবার প্রস্তুতি শুরু হয়। অগাস্ট মাসে সীম, বেগুন, শীতের লাউ ইত্যাদি বুনিবার প্রকৃষ্ট সময়। সেপ্টেম্বরে

ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম ; অক্টোবরে পালং, লেট্যুস, বীট, গাজর ও মটর শুঁটি বুনিবার সময়। অবশ্য বৃষ্টি চলিতে থাকিলে শীতের সব তরকারি বুনিবার সময়ই একটু পিছাইয়া দিতে হয়। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে কোন বীজ বুনিবার প্রয়োজন নাই। এই সময় শুধু গাছের পরিচর্যা করা, উহাদের জল দেওয়া, সার দেওয়া, বাগানের আগাছা তুলিয়া ফেলার কাজ চলিতে থাকে। মার্চের শেষে আবার শীতের লাগান তরকারির বীজ সংগ্রহ করিবার সময়। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর চক্রাকারে ঋতু পরিবর্তন ও বিভিন্ন গাছ লাগাইবার কাজ চলিতে থাকে।

সবজি ক্ষেতের জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি

সবজি ক্ষেত করিতে হইলে সবজি ক্ষেতের উপযুক্ত কতকগুলি যন্ত্রপাতি রাখা একান্ত প্রয়োজন। মাটি কোপাইতে, গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি আলগা করিয়া দিতে, ডালপালা ও শিকড় ছাঁটিতে, গাছে জল সেচন করিতে নানাবিধ যন্ত্রপাতি আবশ্যক। এইগুলির অভাবে ক্ষেত্রকারকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়।

লাঙ্গল—ক্ষেতখানি প্রশস্ত হইলে জমিতে লাঙ্গল দেওয়াই বিধেয়। সবজি ক্ষেতের জন্য হাল্কা লাঙ্গল হইলেই চলে।

কোদাল—লাঙ্গলের পরেই কোদালের আবশ্যক। সাধারণত লাঙ্গল দ্বারা ছোট বাগান চষা যায় না। অল্প জমিতে লাঙ্গলের চেয়ে কোদালে কম খরচ পড়ে। দুই তিন প্রকারের কোদাল আছে, যথা—হেলা কোদাল, দাঁড়া কোদাল ও দাঁড়বিশিষ্ট গজালের মত কোদাল। ছোট সবজি বাগানের জন্য একটি হেলা কোদাল হইলেই চলে।
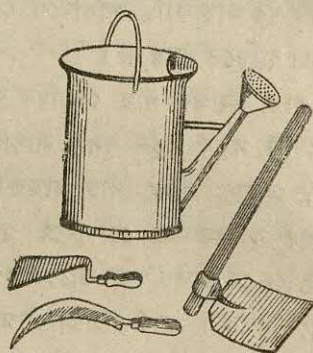
সবজি বাগানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

মই—জমি সমতল করিতে ও ডেলা ভাঙ্গিতে মই প্রয়োজন হয়।

খুরপী ও নিড়েন—ছোট ছোট গাছের গোড়া খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিতে এবং ঘাস বাছিতে ইহাদের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

কাস্তে বা দা—ঘাস কাটিতে কাস্তে এবং গাছের ডাল কাটিবার জন্য দা প্রয়োজন।

ঝারি—সকল গাছের গোড়ায় জল দিলেই চলে না, কোন কোন গাছ আবার উত্তমরূপে স্নান না করিলে ফল দেয় না। এইরূপ গাছের জন্য ঝারি অপরিহার্য।

পিচকারী—গাছের পাতা ধুইতে পিচকারীর প্রয়োজন হয়। পিচকারীর সাহায্যে গাছে কীট নাশক ঔষধও প্রয়োগ করা চলে।

আচড়া—জমির মাটি আলগা করিয়া দিতে ও মাটির আগাছা বাছিয়া ফেলিতে আচড়া খুব কার্যকরী।

গাছ ছাঁটিবার ছুরি ও কাঁচি (Prunning knife and prunning scissors)—গাছ ছাঁটিবার জন্য বিশেষত গোলাপ প্রভৃতি ফুল ও ফলের গাছ ছাঁটিবার জন্য এইরূপ ছুরি ও কাঁচি রাখা প্রয়োজন।

কাঁচি (Garden Shears)—খুব মোটা ও চওড়া কাঁচি। বাগানের বেড়া ছাঁটিবার পক্ষে অপরিহার্য।

এতদ্ব্যতীত গ্রাফটিং নাইফ, বাডিং নাইফ, ফিতা, ঝুড়ি, বালতি, বাঁশ, শাবল ও কাটারি গৃহে মজুত রাখিতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বস্ত্রশিল্প

সৃষ্টির আদিতে অসভ্য বর্বর মানুষের লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত পোশাক-পরিচ্ছদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত রুচির পরিবর্তন হওয়ায় পোশাক-পরিচ্ছদেও নানা বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। প্রথমে এই পোশাকের উপকরণ ছিল প্রকৃতিজাত সূতি, লিনেন, রেশম ও পশম। আজকাল মানুষ তাহার প্রয়োজন মত আরও অনেক রকমের তন্তুর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের আবিষ্কৃত এই সকল তন্তুর ভিতর **রেয়ন, নাইলন, ভিনিয়ন, সরণ** ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

কিরূপ তন্তু দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব ?

বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, যেমন কাপড় জামা ইত্যাদি সূতা হইতেই বোনা হইয়া থাকে। এই সূতা আবার কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ বা তন্তুর সাহায্যে প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন বস্তুর আঁশের গুণাগুণের ভিতর অনেক পার্থক্য আছে। এইজন্য সকল বস্তুর আঁশ বা তন্তু হইতেই আমাদের কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায় না। যেমন, তুলা ও পাটের আঁশের মধ্যে প্রথমটি অনেক সরু, মসৃণ, নরম ও নমনীয় বলিয়া তুলা হইতেই কাপড় প্রস্তুত হয়। পাটের আঁশ অনেক মোটা, খসখসে বলিয়া ঐ আঁশ হইতে সাধারণত কাপড় প্রস্তুত হয় না। সাধারণত যে সকল গুণ থাকিলে আঁশ বা তন্তুকে কাপড় বুনিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করা হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) সূতা যত শক্ত হইবে কাপড়ও তত টেকসই হইবে। আঁশগুলিকে লম্বালম্বি জোড়া দিয়াই সূতা প্রস্তুত করা হয়। আঁশ লম্বা হইলে এই জোড়াও শক্ত হয়। সুতরাং লম্বা আঁশ বা তন্তু কাপড় বুনিবার পক্ষে উপযুক্ত। আঁশগুলি ছোট হইলেও যদি ঐ আঁশের মধ্যে ভাঁজ থাকে তবে উহা দ্বারা শক্ত সূতা প্রস্তুত করা যায়। যেমন, তুলার আঁশগুলি লম্বায় ছোট হইলেও ইহাদের মধ্যে ভাঁজ থাকায় তুলা হইতে টেকসই কাপড় প্রস্তুত হয়।

(২) আঁশগুলি শুধু শক্ত হইলেই চলিবে না। স্থিতিস্থাপকতা এবং নমনীয়তাও উৎকৃষ্ট আঁশের বিশেষ গুণ। আঁশকে দুমড়াইলে বা মোচড়াইলে যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে তাহা দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে না।

(৩) কাপড়কে যাহাতে বিভিন্ন রঙে রঙিন করা যায় সেইজন্য বিভিন্ন রঙ ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকা আঁশ বা তন্তুর একটি প্রয়োজনীয় গুণ। আঁশে ট্যানিন নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকিলে বা মোম জাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ থাকিলে রং তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই কারণেই একপ্রকার প্রকৃতিজাত রেশম তন্তু (wild silk) এবং অ্যাসিটেট রেয়ন দ্বারা রঙিন বস্ত্র প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য।

(৪) আঁশের চাকচিক্য বা ঔজ্জ্বল্য একটি আবশ্যক গুণ। রেশম তন্তুর স্বাভাবিক চাকচিক্যের জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহা সূতির বস্ত্র অপেক্ষা অধিক আদৃত হইয়া আসিতেছে। সূতির বস্ত্রেও আজকাল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চাকচিক্য সৃষ্টি করা হয়। ইহাকেই 'মারসেরাইজড্ কাপড়' (mercerized cloth) বলে।

(৫) প্রত্যেক আঁশই প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ময়লা, গাম, পেকটিন ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত থাকে। আঁশ হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার সময় এই সকল ময়লা দূর করিয়া লওয়া হয়। যে আঁশ হইতে যত সহজে এই ময়লা দূর করা যায়, তাহা বস্ত্র তৈয়ারী করিতে তত বেশী উপযোগী। পাট, রেশম ইত্যাদি তন্তুর অন্যান্য গুণ থাকিলেও ইহাদের ময়লা বিশেষত আঁশের উপরের শক্ত গাম সহজে দূর করা যায় না বলিয়া ইহারা তুলা বা লিনেন আঁশের তুলনায় নিকৃষ্ট।

(৬) বিভিন্ন আঁশের ক্ষয় প্রতিরোধ করিবার শক্তি বিভিন্ন। পশমের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এইজন্য উহা পোকায় সহজেই কাটিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। পশমের ন্যায় লিনেন এবং প্রকৃতিজাত রেশমকে অত সহজেই পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিতে পারে না। অতএব লিনেন এবং প্রকৃতিজাত রেশম এক্ষেত্রে পশম হইতে শ্রেষ্ঠ।

(৭) এতদ্ব্যতীত যে সকল আঁশ স্বাভাবিক তাপে, মৃদু ক্ষার বা অ্যাসিডে নষ্ট হইয়া যায় না তাহাই বস্ত্র শিল্পে বিশেষ উপযোগী।

তন্তুর শ্রেণীবিভাগ—প্রাচীনকালে বস্ত্র শিল্পে, সাধারণত রেশম, পশম, সূতি ও লিনেন এই চারি প্রকারের তন্তুই ব্যবহার করা হইত। আধুনিক

যুগে বিভিন্ন প্রকারের রেয়ন, নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি মনুষ্যসৃষ্ট তন্তুও বস্ত্র-শিল্পে প্রচুর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন তন্তুগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তন্তু।

(২) কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট তন্তু।

অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তন্তুগুলিকে আবার তাহাদের উৎপত্তি অনুসারে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করা যায়। যেমন,

(ক) উদ্ভিজ্জ তন্তু—উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জ তন্তু বলে। সুতি, লিনেন, র‍্যামী, ক্যাপক, পাট, নারিকেল ছোবড়া ইত্যাদি তন্তুগুলি উদ্ভিজ্জ তন্তু।

(খ) প্রাণিজ তন্তু—যে সকল তন্তু প্রাণিজগৎ হইতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে প্রাণিজ তন্তু বলে। এই জাতীয় তন্তুর মধ্যে রেশম ও পশমের নাম উল্লেখযোগ্য।

(গ) খনিজ তন্তু—এই জাতীয় তন্তু বিভিন্ন আকরিক হইতে পাওয়া যায়। এস্‌বেস্‌টস (Asbestos), গ্লাস ও ধাতব তন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট তন্তুগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) রেয়ন তন্তু

(খ) ক্যাসিন

(গ) সিনথেটিক (synthetic) বা সাংশ্লেষিক তন্তু।

রেয়ন তন্তুকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় ; যেমন—ভিস্‌কস্ রেয়ন, কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন, অ্যাসিটেট রেয়ন। এই সকল রেয়ন উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিজগৎ হইতেই উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহারা সাংশ্লেষিক তন্তুর অন্তর্গত নহে।

সিন্‌থেটিক বা সাংশ্লেষিক তন্তুগুলি উদ্ভিদ্ বা প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন নহে। ইহারা জল, বায়ু এবং কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়। এইজন্য ইহারা সাংশ্লেষিক তন্তু। নাইলন, ভিনিয়ন, সরণ এবং টেরিলিন এই জাতীয় তন্তু।

নিম্নের চার্টখানিতে তন্তুগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখান হইল
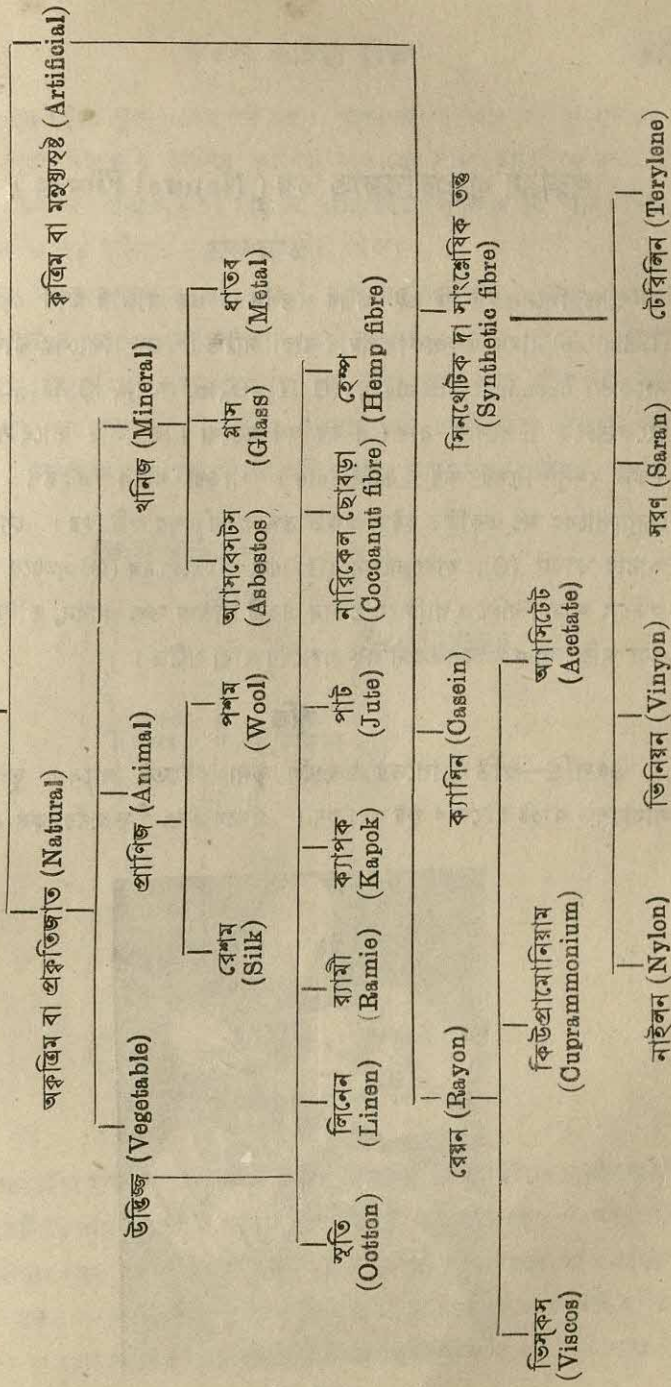
অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তন্তু (Natural Fibres)

(ক) উদ্ভিজ্জ তন্তু

সূতি, লিনেন ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই জাতীয় আঁশ সেল্যুলোস (Cellulose) নামক একপ্রকার পদার্থ দ্বারা গঠিত। সেল্যুলোসের রাসায়নিক সংকেত (chemical formula), $(C_6H_{10}O_5)n$, অর্থাৎ $C_6H_{10}O_5$, এই সংকেতটিকে n-সংখ্যক বার (n-এর অর্থ অসংখ্য) লম্বালম্বি ভাবে সাজাইয়া একটি সেল্যুলোসের অণু (Molecule) পাওয়া যায়। এইরূপ অসংখ্য সেল্যুলোসের অণু একত্রিত হইয়া একটি তন্তু বা আঁশের সৃষ্টি হয়। সেল্যুলোস আবার কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেনের (O) সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে কোন একটি উদ্ভিজ্জ তন্তু কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থের দ্বারা গঠিত।

সূতি

উৎপত্তি—সূতি কাপড়ের তন্তুগুলি তুলা হইতেই আসে। তুলা গাছ সাধারণত ৩ ফুট হইতে ৫ ফুট লম্বা হয়। প্রথমে ঈষৎ পীতবর্ণের ফুল ফোটে।
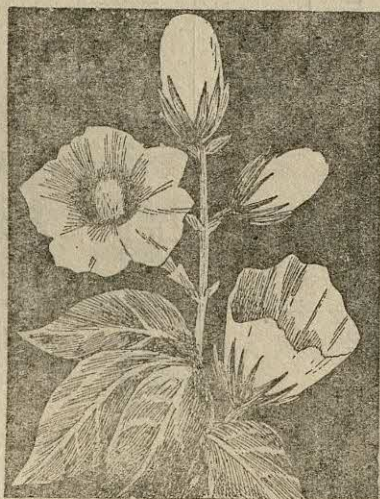
তুলা গাছ

পরে ঐ ফুল হইতে তুলা ফলের সৃষ্টি হয়। তুলা ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং তুলার সাদা আঁশগুলি বাহিরে আসিয়া বাতাসের সহিত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই আঁশগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে বীচি হইতে পৃথক্ করিয়া গাঁট বাঁধিয়া সূতা এবং কাপড় বুনিবার জন্য চালান করা হয়।

প্রথম অবস্থায় তুলার এক একটি আঁশকে অণুবীক্ষণ (Microscope) যন্ত্রের তলায় দেখিলে বেলনাকার এক একটি নলের ন্যায় দেখা যাইবে। ইহার আগা এবং গোড়া প্রায় সমান মোটা। এই বেলনাকার নলের ঠিক মধ্য দিয়া একটি সরু পথ আছে। প্রাথমিক অবস্থায় এই পথটি তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। আঁশগুলি যখন ফল হইতে বাহির হইয়া আসে তখন রৌদ্রের প্রভাবে

আড়াআড়িভাবে কর্তিত অংশের চিহ্ন
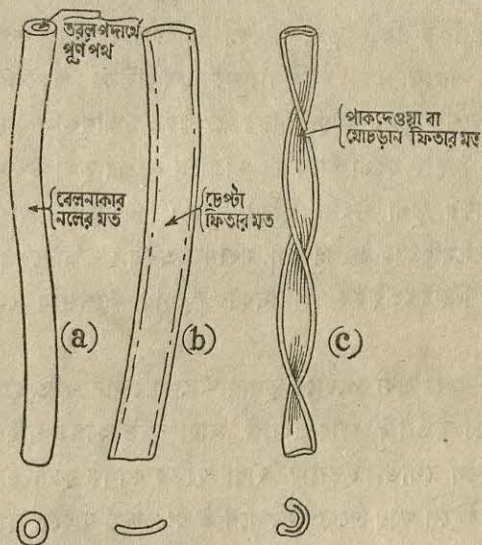
ঐ রস শুকাইয়া যায় এবং আঁশটিও ধীরে ধীরে বেলনাকার হইতে চ্যাপ্টা হইয়া ক্রমে একটি ফিতার মত হইয়া পড়ে। দেখিতে ফিতার মত হইলেও আঁশগুলি ঠিক ফিতার মত সোজা নহে; উহারা অনেকটা পাক দেওয়া বা মোচড়ান ফিতার মত। সাধারণত তুলার আঁশে প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ১৫০টি করিয়া এই পাক বা মোচড় থাকে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অঁাশে প্রতি ইঞ্চিতে ২৫০টি পাক ও দেখা যায়।

তুলার আঁশগুলি সাধারণত আধ ইঞ্চি হইতে আড়াই ইঞ্চি লম্বা হয়। আঁশগুলি যত লম্বা ও সরু হয় কাপড়ও তত সূক্ষ্ম ও মিহি হয়। মোটা ও ছোট আঁশ হইতে সাধারণত মোটা ও নিকৃষ্ট জাতীয় কাপড় তৈয়ারী হয়। অত্যধিক ছোট আঁশ কাপড় বুনিবার অনুপযুক্ত। ইহা রেয়ন নামক কৃত্রিম তন্তু তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ আঁশের ব্যাস প্রায় $\frac{১}{২৫০০}$ ইঞ্চি. খুব সরু এবং উৎকৃষ্ট আঁশের ব্যাস $\frac{১}{৫০০০}$ ইঞ্চি পর্যন্ত হইতে পারে। এক পাউণ্ড তুলা হইতে প্রায় ১৬০,০০০,০০০টি তুলার আঁশ পাওয়া যায়।

সরবরাহ—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তুলা কম বেশী জন্মিয়া থাকে। সমগ্র উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আমেরিকা হইতেই আসে। তুলা উৎপাদনে আমেরিকার পরই ভারতবর্ষের নাম করা যাইতে পারে। আফ্রিকা, রাশিয়া ইত্যাদি দেশও কিছু কিছু তুলা উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশ, মাদ্রাজ এবং দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলেই প্রধানত তুলা জন্মে। বঙ্গদেশের তুলা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। আঁশগুলি দৈর্ঘ্যে সাধারণত $\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চি হইতে $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি হইয়া থাকে। মাদ্রাজে উৎপন্ন তুলা উৎকৃষ্টতর। মিশরে অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তুলার আঁশগুলি সরু এবং লম্বা হয়। আমেরিকায় উৎপন্ন তুলা মধ্যম শ্রেণীর। ভারতের ন্যায় রাশিয়ার উৎপন্ন তুলাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এখানকার তুলার আঁশগুলি মোটা ও ছোট হইয়া থাকে।

প্রকৃতি—ক্ষার দ্রব্য প্রয়োগে তুলার আঁশের কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্যই সাবান, সোডা ইত্যাদি ক্ষার-দ্রব্যাদি দ্বারা সূতি কাপড় পরিষ্কার করা যায়। প্রয়োজন হইলে সোডা ইত্যাদি দ্বারা সূতির কাপড় ফুটানও চলিতে পারে। রঙিন কাপড় হইলে ক্ষার-দ্রব্যের সংস্পর্শে ঐ রং চটিয়া যাইতে পারে।

তুলার আঁশ অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। কখনও কখনও সূতির কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা অক্‌জালিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় কাপড়খানি তৎক্ষণাৎ প্রচুর পরিমাণ জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। যদি সামান্য অ্যাসিডও কাপড়ে লাগিয়া থাকে তবে শুকাইবার পর কাপড়ের ঐ স্থান ফাসিয়া যাইবে। সূতির কাপড় কোন অবস্থাতেই গাঢ় অ্যাসিডের সংস্পর্শে আনিতে নাই।

ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড এই দুইটি রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা তুলার আঁশ নষ্ট হয় না। রঙিন কাপড়-চোপড় সাদা করিতে হইলে ক্লোরিন,

ব্লিচিং পাউডার বা হাইড্রোজেন পারক্সাইডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাধারণ উত্তাপে সূতির কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্য সূতির কাপড় রৌদ্রে শুকাইতে পারা যায় এবং গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যায়। তবে খুব বেশী গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে সূতি পুড়িয়া লালচে দাগ পড়িবে। তুলার আঁশ উত্তাপ-সুসঞ্চালক। কাচিবার সময় রগড়াইলে সূতির কাপড়ের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। সূতির কাপড়ে রং ধরান পশমের মত সহজ না হইলেও খুব কঠিন কাজ নহে।

লিনেন (Linen)

উৎপত্তি—তিসি বা মসিনা গাছ (Flax) হইতেই এই তন্তুটির উৎপত্তি। ইহা একটি ঋজু এবং সরু গাছ—প্রায় ৩৬ ইঞ্চি হইতে ৪০ ইঞ্চি লম্বা হয়। লিনেন তন্তুটি মসিনা গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। মসিনা গাছের উপরের ছালটি সরাইয়া লইলে এই তন্তুটি গাছের মাথা হইতে শিকড় পর্যন্ত ছড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রথমে মসিনা গাছটি কাটিয়া উহার বীচিগুলি বাহির করিয়া লওয়া হয়। পরে গাছটিকে জলে ভিজাইয়া রাখা হয়; কিছুদিন পরে তন্তুগুলি নরম হইলে কাণ্ড হইতে উহা পৃথক্ করা হয়।

সরবরাহ—রাশিয়ায় প্রচুর পরিমাণে মসিনা গাছের চাষ করা হয়। ইহা ছাড়া বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানী ও আমেরিকাতেও মসিনার চাষ করা হয়। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট লিনেন তন্তু বেলজিয়ামেই উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতি—লিনেন তন্তুগুলি তুলার তন্তুর ন্যায় সেল্যুলোস নামক একই উপাদানে গঠিত। দৈর্ঘ্যে এই সকল তন্তু প্রায় এক ইঞ্চি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুগুলি লম্বালম্বি জোড়া লাগিয়া সাধারণত নয়-দশ ইঞ্চি হইতে কয়েক ফুট লম্বা আঁশের সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র তন্তু কতগুলি অণুকোষের (Cell) সমষ্টিমাত্র।

মসিনা গাছ

তন্তুগুলি সোজা এবং সরল হইলেও নলের মত বেলনাকৃতি নহে। একটি

ক্ষুদ্র তন্তুকে আড়াআড়িভাবে কাটিলে (Cross section) উহা দেখিতে একটি বহুভুজের মত হইবে। প্রত্যেকটি তন্তুর গায়ে মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত
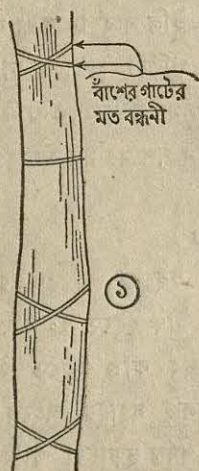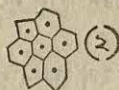
বন্ধনী দেখা যায়। আঁশগুলির বহির্ভাগ খুব মসৃণ। এইজন্য লিনেন বস্ত্রের এত চাকচিক্য।

লিনেন তন্তুর গুণাগুণ অনেকটা সুতির গুণাগুণের অনুরূপ। সুতির মত লিনেন বস্ত্রও সাবান, সোডা ইত্যাদি ক্ষার-দ্রব্যে পরিষ্কার করা যায়। ক্ষার দ্রব্যে ফুটাইলে বা আছড়াইয়া কাচিলে এই তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না। সুতির মত লিনেনও অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। ক্লোরিন, হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইত্যাদি দ্বারা লিনেন বস্ত্রের রং দূর করা যায়। সুতির মত এই তন্তুও সাধারণ তাপে নষ্ট হয় না।

সুতি হইতে লিনেনের আঁশগুলি অধিকতর শক্ত। এইজন্য সুতির বস্ত্র অপেক্ষা লিনেনের বস্ত্র বেশী দিন স্থায়ী হয়। সুতির বস্ত্রে সাধারণত কোন ঔজ্জ্বল্য থাকে না। কিন্তু লিনেনের বস্ত্র খুব চকচকে এবং জমকালো হয়। এই বস্ত্র সুতির বস্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া লইতে পারে। উত্তাপ সঞ্চালন করিবার ক্ষমতাও ইহার সুতি অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার রং ধারণ করিবার ক্ষমতা সাধারণ সুতি অপেক্ষা অনেক কম।

র‍্যামি (Ramie)

লিনেনের ন্যায় র‍্যামিও একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। এশিয়া ও আমেরিকায় সাধারণত এই গাছের চাষ করা হয়। র‍্যামির আঁশগুলি সাধারণত ৬ ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চি লম্বা হয়। কখনও কখনও ইহাদের ২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। এই তন্তুর মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধনী দেখা যায়। তন্তুগুলি দেখিতে অনেকটা চুলের মত এবং মাঝখানটা ফাঁপা। তুলা এবং লিনেনের মত ইহাও সেল্যুলোস হইতে উৎপন্ন। লিনেনের মত র‍্যামির আঁশগুলিও চকচকে।

পাট (Jute)

ভারতবর্ষই পাটের প্রধান উৎপত্তি স্থল। লিনেন এবং র‍্যামির মত পাটের আঁশ বা তন্তুও পাট গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। পাট গাছ সাধারণত ১০-১২ ফুট লম্বা হয়। পাতাগুলি পৃথক্ করিয়া পাটগাছ কিছুদিন মাঠের মধ্যে ফেলিয়া রাখা হয়। পরে গাছগুলি জলের মধ্যে কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিলে আঁশগুলি নরম ও আলগা হইয়া যায়। এইবার আঁশগুলি কাণ্ড হইতে সহজেই পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়।

পাটের আঁশ সাধারণত ৪ ফুট হইতে ৮ ফুট লম্বা হইতে পারে। সেল্যুলোস হইতেই পাটের উৎপত্তি। তুলা, লিনেন এবং র‍্যামি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে পাটের উপাদানে লিগ্নো সেল্যুলোস (Ligno Cellulose) নামে সেল্যুলোসের এক প্রকারে যৌগ (Compound) দেখা যায়। ইহার সাহায্যেই পাট প্রথম তিন শ্রেণীর আঁশ হইতে চিনিয়া বাহির করা যায়।

পাট দিয়া সাধারণত থলে প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট হইতে কার্পেট ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হেম্প (Hemp)

এই তন্তুও র‍্যামির মত একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতেই উৎপন্ন হয়। রাশিয়া, চীন, জাপান, ইটালী, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এই তন্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। আঁশগুলি সাধারণত ৩ ফুট হইতে ৮ ফুট লম্বা হয়। ইহা দেখিতে অনেকটা লিনেনের আঁশের মতই। কিন্তু লিনেনের আঁশ হইতে এই আঁশ অনেক বেশী মোটা। আঁশগুলির প্রান্ত ভাগ সরু এবং দ্বিধাবিভক্ত। লিনেন

তন্তুর প্রান্তভাগ কখনও দ্বিধাবিভক্ত হয় না। সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে লিনেন তন্তু ও হেম্প তন্তুর এই পার্থক্য সহজেই ধরা পড়িবে। এই তন্তু জলে বা বৃষ্টিতে সহজে নষ্ট হয় না। সেইজন্য ইহা দ্বারা দড়ি এবং নৌকা ও জাহাজের পালের কাপড় প্রস্তুত করা হয়। এই আঁশগুলিরও মূল উপাদান সেল্যুলোস।

ক্যাপক (Kapok)

এই তন্তু অনেকটা তুলার তন্তুর ন্যায়। বেলনাকৃতির এই আঁশগুলির একপ্রান্ত স্ফীত, দেখিতে অনেকটা বাল্‌বের মত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই আকৃতি দেখিয়া ইহা অন্যান্য তন্তু হইতে চিনিয়া বাহির করা যায়। ইহা নরম এবং দেখিতে চকচকে। ক্যাপক আঁশের মধ্যে অসংখ্য বায়ুপূর্ণ গর্ত থাকে এবং ইহার মধ্যে সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না। সেল্যুলোসই এই তন্তুর মূল উপাদান।

এই সকল বিভিন্ন তন্তুর মধ্যে সুতি এবং লিনেনই সাধারণত কাপড়, জামা ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। র‍্যামি, পাট, ক্যাপক ইত্যাদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর তন্তু। এইগুলি সাধারণত থলে, কার্পেট, দড়ি, ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

(খ) প্রাণিজ তন্তু

রেশম (Silk)

সরবরাহ—রেশম জগদ্বাসীর নিকট প্রাচীনকাল হইতেই পরিচিত। বাহারে সাজসজ্জায় রেশম অপরিহার্য। তাই নারীজাতির পোশাকের ক্ষেত্রে রেশমের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে চীন দেশে যে রেশমের ব্যবহার ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈনিক রাজরাজড়ার পোশাক রেশম দ্বারা নির্মিত হইত। চৈনিকগণ এই রেশমবিদ্যা বা সেরি কালচারকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত তাহাদের নিজেদের দেশেই গোপন রাখে। সেই সময়ে কোন প্রকারে গুটি পোকার ডিম জাপানে অপহরণ করিয়া আনা হয় এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ভারতে তাম্রলিপ্ত, বারানসী প্রভৃতি স্থানে রেশম চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপে নতুন করিয়া রেশম চর্চার উদ্ভব ঘটে। সমগ্র পূর্ব ইউরোপে এই অভাবনীয় আবিষ্কারের ঢেউ

আসিয়া লাগে। বর্তমানে জাপান পৃথিবীর সর্বাধিক রেশম উৎপন্ন করে। ইহার পরিমাণ বৎসরে প্রায় সাড়ে সাত কোটি পাউণ্ড। চীনে বৎসরে দুই কোটি পাউণ্ড এবং ইটালীতে ১ কোটি পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রাকৃতিক রেশম (wild silk) উৎপন্ন হয়।

উৎপত্তি—রেশম প্রধানত দুই প্রকারের—প্রাকৃতিক ও কৃষিজ (wild and cultivated silk)। ক্ষেত্রে গুটিপোকার চাষ করা হইলে যে রেশম পাওয়া যায় তাহাকে কৃষিজ রেশম (cultivated silk) বলে।

গুটিপোকা

এই রেশমের ধর্ম অনেকাংশে প্রাকৃতিক রেশম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ক্ষেত্রে গুটিপোকার চাষ করা হয় তাহাকে 'ফাইলেচার' (Filatures) বলে। প্রাকৃতিক রেশম বনে-বাদাড়ে গাছের ডালে বাসকারী গুটিপোকার রস হইতে সংগ্রহ করা হয়। তবে এই পদ্ধতিতে রেশম প্রস্তুতির সময় যথেষ্ট যত্ন লওয়া কর্তব্য।

পৃথিবীর প্রায় চারিশত হইতে পাঁচশত বিভিন্ন প্রকারের গুটি পোকা আছে, তবে উহাদের অধিকাংশই নিকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম উৎপন্ন করে। প্রধানত যে সমস্ত গুটিপোকা হইতে রেশম সংগ্রহ করা হইয়া থাকে তাহারা হইল, বমবাইক্স্ মোরি (Bombyx Mori), ইয়ামা-মে (yama-mai), অ্যাটাকাস অ্যাটলাস্ (Attacus Attlas), তসর (Tusser) ইত্যাদি। এই সমস্ত গুটিপোকা চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

গুটিপোকার জীবন—প্রধানত গ্রীষ্মকালেই গুটিপোকা ডিম পাড়ে। ডিমগুলি প্রথমাবস্থায় গোলাপী বর্ণের থাকে এবং ক্রমশই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বসন্ত সমাগমে ঐ ডিমগুলি ফাটিয়া যায় এবং গুটিপোকা নির্গত হয়। প্রথমে গুটি-পোকাগুলি শুধু প্রচুর পরিমাণে খাইতে থাকে। ইহাদের খাদ্য বেরীজাতীয় গাছের পাতা। কিছুদিন গেলে উহাদের খাওয়া বন্ধ হয় এবং উহারা দ্রুত-গতিতে শরীরের আয়তন বাড়াইতে থাকে। প্রথমে ইহারা মাত্র এক-চতুর্থাংশ ইঞ্চি লম্বা থাকে। পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যে বাড়িয়া প্রায় তিন ইঞ্চি হয়। সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত হইলে উহারা ছটফট করিতে থাকে এবং ঐ সময়েই উহাদের মুখ দিয়া রেশম সূতা (Silk thread) বাহির হইতে শুরু করে। গুটিপোকার ঘুরিবার ফলে উহাদের চারিদিকে ঐ রেশম সূতা জড়াইয়া যায় এবং ফলে শেষ অবস্থায় উহা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এক আবরণের (Cocoon) অন্তরালে ঢাকিয়া রাখে। এইভাবে দুই-তিন সপ্তাহ গেলে ক্রমশ আবরণটি শক্ত হইয়া যায় এবং উহার অন্তরালে গুটিপোকা পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয়। তখন ইহার ডানা গজায় এবং শরীরটা ছোট হইয়া আসে। অতঃপর একসময়ে ঐ আবরণ ফাটিয়া গুটিপোকা বাহির হইয়া আসে। সেই কারণে গুটিপোকার মুখ হইতে লালা নির্গমন সমাপ্ত হইলে, সঙ্গে সঙ্গেই গুটিপোকা-গুলিকে জলে সিদ্ধ করা হয়, ফলে পোকা মরিয়া যায় এবং রেশমও অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়।

প্রকৃতি—গুটিপোকার মুখ হইতে যে লালা নিঃসৃত হয় তাহা এক শ্রেণীর প্রোটিন। ইহার মধ্যে ফাইব্রয়েন ও সেরিসিন ৩ : ১ অনুপাতে থাকে। ফাইব্রয়েনের উপর সেরিসিনের একটি আবরণ পড়ে। ফাইব্রয়েনের মৌল (ingredients) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। পশমের ন্যায় ইহাতে কোন সালফার থাকে না। ইহার ফরমূলা নিম্নরূপ :—

$$(C_{24}\ H_{38}\ O_{8}\ N_{8})_{n}$$
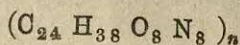
ফাইব্রয়েন রসের ঘনত্ব ১'২৫ হইতে ১'৩ পর্যন্ত হয়। এখানে ফাইব্রয়েন ও সেরিসিনের আকার দেখান হইল। রেশমী তন্তুগুলি খুব সরু হয় বলিয়া সাধারণত ছয় হইতে আটটি তন্তু লইয়া এক একটি সূতা প্রস্তুত করা হয়। পশমের তন্তুগুলির ন্যায় রেশম তন্তুগুলির ব্যাস সর্বত্র সমান নহে। প্রায়শই দেখা যায় যে একটি রেশম তন্তুর একপ্রান্ত যতখানি মোটা অপর প্রান্ত ততটা মোটা নয়। সাধারণত উহা অন্তিম প্রান্তে সরু হইয়া যায়। এইজন্য রেশম বস্ত্রে বুনন (spinning) সর্বত্র সমান (uniform) হয় না। রং করার পর উহা ধরা পড়ে।

রেশম কমনীয় এবং খুবই দৃঢ়। ইহার তন্তু পশম তন্তু অপেক্ষা দৃঢ়তর কিন্তু সূতি হইতে কম দৃঢ়। ইহা দেখিতে অত্যন্ত চকচকে (Lustrous) এবং তাপ সংরক্ষক বলিয়া শীতকালেও রেশমী পোশাক পরিধানযোগ্য। ইহার নমনীয়তা অসাধারণ।
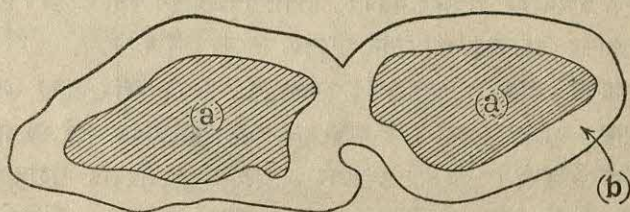
(a) ফাইব্রয়েন (b) সেরিসিন

অধিকাংশ রেশমের বর্ণই প্রথমাবস্থায় সামান্য হলুদ থাকে কিন্তু পরে নানা প্রকারে ইচ্ছামত রং করা হয়। চৈনিক রেশম প্রায়ই সাদা হয়। রেশমের ১১% জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা আছে। ঠাণ্ডা জলে রেশম ম্যাটম্যাটে হইয়া যায় এবং গরম জলে ইহা চকচক করিতে থাকে। রেশমের বুনন খুব পাতলা বলিয়া ইহাকে সর্বদা সতর্কভাবে ব্যবহার করিতে হয়।

লঘু কষ্টিক সোডার দ্রবণে রেশম দ্রবীভূত হইয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় তসরের এই দিক হইতে সর্বাধিক সুবিধা আছে। ক্ষার ইহার উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। রেশমের অ্যাসিড প্রতিরোধের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে।

রেশম চিনিবার উপায় (Identification of Silk)—রেশম চিনিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথমত সালফিউরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ রেশমকে

খয়েরী রঙের থকথকে পদার্থে রূপান্তরিত করে। তারপর ইহাতে অল্প ট্যানিক অ্যাসিড ঢালিলে উহা কঠিন আকারে পৃথকীকৃত হয় (precipitates out)।

দ্বিতীয়ত কিউপ্রো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে বলা হয় স্থইটজার দ্রবণ (schweitzer's solution); ইহা কপার হাইড্রেটকে অ্যামোনিয়ায় দ্রবীভূত করিয়া পাওয়া যায়। এই দ্রবণ সকল রেশমকেই দ্রবীভূত করে। রেশম চিনিবার পক্ষে এই দ্বিতীয় উপায়টিই শ্রেষ্ঠ।

পশম (Wool)

মানুষের ব্যবহার্য আধুনিক শীতবস্ত্রাদির তালিকায় পশম অপরিহার্য। মানুষের আচ্ছাদন সমস্যা সমাধানে প্রকৃতির অবদান যতখানি প্রাণিজগতের অবদান যে তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে, পশমই তাহার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ। প্রাণিজ তন্তু হইতেই পশমের উদ্ভব। ইহাই পশমের মূল কথা। দেশ বিদেশে বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবরণ তথা লোম হইতেই পশমের সৃষ্টি হয়।

পশমের প্রকৃতি ও স্বরূপ: মানুষের কেশের ন্যায় পশুর লোমও ক্রমবর্ধমান। কাজেই লোম যতই কাটা হয় ততই উহা আবার সৃষ্টি হয় সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মেই। ভেড়ার লোমের অগ্রভাগ প্রথমাবস্থায় সূচাল থাকে, কিন্তু কয়েকবার কাটার পর উহার সূচালভাব আর থাকে না। বিভিন্ন জন্তুর লোমের গঠন বিভিন্ন। স্কটল্যাণ্ডের ব্ল্যাকফেস (Blackface-scotch) ভেড়ার লোম খুব দৃঢ় ও শক্ত, ইহার ব্যাস প্রায় $\frac{১}{১০০}$ ইঞ্চি। সাধারণ যে সমস্ত সূক্ষ্ম পশম পাওয়া যায় তাহাদের ব্যাস $\frac{১}{১০০}$ হইতে $\frac{১}{১০০০}$ পর্যন্ত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার মেরিনো (Merino) মেষের লোম সর্বাধিক সূক্ষ্ম, ব্যাস প্রায় $\frac{১}{৩৫০০}$ ইঞ্চি।

পশমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার নমনীয়তা। সাধারণ গুটানো অবস্থায় উহাকে টানিলে পশম লম্বা হয় আবার ছাড়িয়া দিলে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। তবে এই নমনীয়তার পরিমাণ নির্ভর করে পশম কতখানি নরম (soft) তাহার উপর। পশমকে উত্তমরূপে ধূলি ময়লা তৈলাদি হইতে বাষ্প-ধৌতি (steam-wash) পদ্ধতিতে মুক্ত করা হইলে উহার নমনীয়তা ও কমনীয়তা বাড়ে। পশমের এক একটি তন্তু বা Fibreএর দৈর্ঘ্য সাধারণত তিন ইঞ্চি হইতে এক ফুট পর্যন্ত হয়। পশমের প্রাকৃতিক বর্ণ সাদা, ক্রীম, ঈষৎ হলুদ, লালচে, বাদামী প্রভৃতি নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। তবে যত সাদা হয় ততই উহার প্রকৃতি (quality) ভাল হয়। অধুনা কলে ইচ্ছামত পশম রং করা হয়।

পশম তন্তু তাপ ও জলীয় বাষ্প দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং ফলে উহাকে দুমড়াইয়া বা মোচড়াইয়া দিলে, তাপের প্রভাবে পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই পশমের বস্ত্রাদি ধুইবার ক্ষেত্রে শীতল জল অপেক্ষা সামান্য উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে উহার ময়লা কাটিয়া যায় এবং উহার আকৃতি নষ্ট হইবার কিছুমাত্র ভয় থাকে না।

পশম তন্তুর ঘাত সহিবার ক্ষমতা অল্প। তাই পশমের পোশাকাদি যত্ন করিয়া রাখা বিধেয়। অত্যধিক চাপে, ড্যাম্প লাগিলে পশমের তন্তুগুলি উহাদের স্বাভাবিক গুণ হারাইয়া ফেলে। ফলে বস্ত্র নষ্ট হইয়া যায়। অত্যধিক চাপে কোন কোন পশম জমাট বাঁধিয়া যায় এবং উহার নমনীয়তা (Elasticity) হারাইয়া ফেলে। ভিজা অবস্থায় রাখিলে ছাতা (Fungus) পড়িয়া যায়, কড়া রৌদ্রে রঙ জ্বলিয়া যায় এবং উপযুক্তরূপে রক্ষণের অভাবে পোকায় কাটিয়া ফেলে। পশম আগুনে পুড়িয়া যায়। পশম-পোড়া গন্ধ অনেকটা শিং বা পালক পোড়া গন্ধের মত।

কষ্টিক সোডার মৃদু দ্রবণেই পশম সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়া যায়। কাজেই কষ্টিক সোডা বা পটাশ লইয়া কাজ করিতে গেলে পশমের জামা ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পশমকে শুধু বিকৃত করিয়া দেয় (swells up), দ্রবীভূত করে না। সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডে শুধু পশমের রং চটিয়া যায় এবং একটি হলুদ রঙের আবরণ পড়ে।

পশম তন্তুর গঠন (Fibre structure)—পশম তন্তুতে 'কেরাটিন' (Keratin) নামক একপ্রকার প্রোটিন থাকে। অন্যান্য জৈব পদার্থের ন্যায় ইহারও অনেকগুলি অণু একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ আকারে থাকে। এই অবস্থায় 'কেরাটিন' অণুর নাম "মিসেলে" (Micellae)। কেরাটিনে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার বিদ্যমান। এইগুলি কতকগুলি কাঠির গুচ্ছের আকারে (Bundles of sticks) থাকে। কেরাটিনের ফরমুলা ও গঠন নিম্নরূপ :—

$$(C_{42}\, H_{157}\, O_{15}\, N_5\, S)_n$$
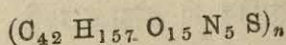
তোমরা সকলে ভুট্টা দেখিয়াছ। ভুট্টার গায়ে একপ্রকার আঁশের মত আবরণ থাকে। পশম তন্তুতেও ঠিক সেইরূপ সরু সরু আঁশের ঢাকা থাকে। আবার কোন কোন তন্তুর মাছের আঁশের মত সুবিন্যস্ত খোলস থাকে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় কাচের স্লাইডে পশম তন্তু টান করিয়া ধরিলে উহার গঠন দেখা যায়। এখানে একটি চিত্র দেওয়া হইল।

পশম চিনিবার উপায় (Identification of Wool)—কোন বস্ত্র পশমের কিনা জানিতে হইলে উহার তন্তুকে পটাশিয়াম প্লামবেটের (K_2PbO_2)
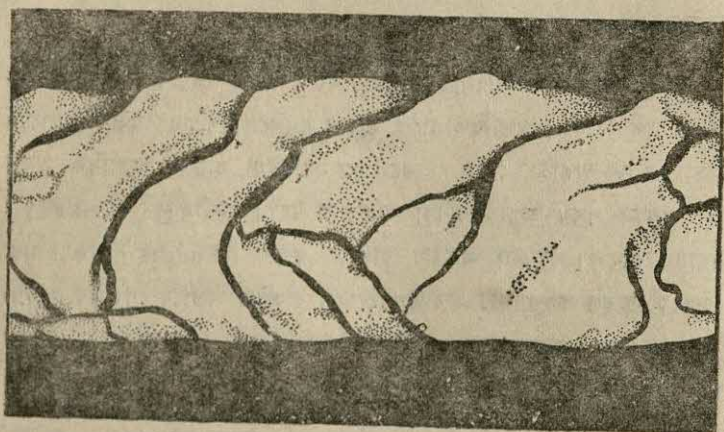
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় একটি পশম তন্তুর আকৃতি

লঘু দ্রবণে এক মিনিট ধরিয়া ফুটাইতে হয়। পশম থাকিলে উহার বর্ণ গাঢ় খয়েরী হইয়া যায়।

পশমের সরবরাহ—সমগ্র বিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বৎসরে পশমের যে যোগান দেখা যায় তাহাতে পশম উৎপাদক দেশগুলি কেহ কাহারও অপেক্ষা কম যায় না। ইংল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সব কয়টি দেশই প্রায় সমভাবে পশমের চাহিদা মিটাইতে সাহায্য করিতেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় মেষ পালিত হয় বলিয়া উৎপন্ন পশমের প্রকৃতিও বিভিন্ন। প্রত্যেক দেশের পশমের এই স্বকীয়তার জন্যই উহারা পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার সহিত তাল রাখিয়া নিজের নিজের চাহিদাকে সমানভাবে বাড়াইতে সমর্থ হইতেছে, ফলে কোন একটি দেশে পশমের বাজার স্থাপিত না হইয়া কয়েকটি দেশে উহা ছড়াইয়া আছে।

অষ্ট্রেলিয়ার 'রিভেরিনা' (Riverina) এবং 'ডারলিং ডাউনস্' (Darling Downs) প্রদেশ হইতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পশম পাওয়া যায়। তথাপি সমগ্র

অষ্ট্রেলিয়াতেই মেষপালনের মাধ্যমে পশম প্রস্তুত হয়। মধ্য আমেরিকার সুবিস্তীর্ণ "প্রেয়ারী" অঞ্চলে (Praire) অসংখ্য মেষ পালিত হয়। ইহা ব্যতীত গ্রেট বৃটেন, নিউজিল্যাণ্ডও পৃথিবীর অন্যতম পশম উৎপাদক দেশ। মরুভূমির দেশে, আরব, মিশর প্রভৃতি স্থানে যেখানে মেষ পালন সহজসাধ্য নহে, সেই সকল স্থানে উটের লোম হইতেও পশম পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় আলপাকা, লামা প্রভৃতি মেষ জাতীয় প্রাণীর দেহ হইতে লোম ছাড়াইয়া পশম সংগ্রহ করা হয়। ইহা ব্যতীত পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে খরগোশ, অশ্ব, ভিক্যুনা (Vienna), গুয়ানাকো (Guanaco) প্রভৃতি প্রাণী হইতেও পশম সংগ্রহ করা হয়।

(১) ইংল্যাণ্ডের পশম—ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন শ্রেণীর মেষ প্রতিপালিত হয়। যেমন—লিঙ্কন, লিসেস্টার, ডেভন, রোমনি, মারষ, সাসেক্স, সাউথ ডাউন, স্রপশায়ার, সিভিয়ট, ব্ল্যাক ফেস, হার্ডউইক প্রভৃতি।

লিঙ্কন ও লিসেস্টার পশম খুব লম্বা কিন্তু মোটা (coarse)। ডেভন ও রোমনি পশম অপেক্ষাকৃত লম্বায় খাপি। সাসেক্স ও সাউথ ডাউন পশম ক্ষুদ্রতম (৩ ইঞ্চি) কিন্তু হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতির পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। সিভিয়ট ও হার্ডউইক পশম খুব ঘন ও নরম।

(২) অষ্ট্রেলিয়ার পশম (Australian Wool)—অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পশম মেরিনোর উৎপাদক। পূর্বেই বলিয়াছি প্রধানত রিভেরিনা ও ডারলিং ডাউন্‌স্ প্রদেশে মেরিনো মেষ পালিত হয়। মেরিনো হইতে প্রাপ্ত পশম তিন শ্রেণীর—মোলায়েম (fine), মাঝারি (medium) ও খসখসে (strong) ; প্রথম শ্রেণীর পশম দুগ্ধধবল, চমৎকার নরম। প্রতি ইঞ্চিতে ইহার ২৪টি ভাজ পড়ে, ফলে টানিলে প্রচুর লম্বা হয়। ইহা উৎকৃষ্ট তাপ-সংরক্ষক। মাঝারি ও খসখসে জাতের মেরিনো পশম লম্বায় ছোট (৩″—৪″) এবং অপেক্ষাকৃত মোটা। অষ্ট্রেলিয়া বৎসরে ১১০ কোটি পাউণ্ড পশম উৎপন্ন করে, তাহার মধ্যে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই মেরিনো।

ইহা ব্যতীত নিউজিল্যাণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও বেশ কিছু পরিমাণ উৎকৃষ্ট পশম উৎপন্ন হয়। অপরাপর দেশের পশম অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতীয়।

ধৌতাগার ও উহার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

অধিকাংশ ঘরের গৃহিণীরা আজকাল ঘরেই কাপড় কাচিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। বাড়িতে কাপড় কাচিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র ধৌতাগারের ব্যবস্থা করিলে সবচেয়ে ভাল হয়। ধৌতাগারটি রান্নাঘরের পাশে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে গৃহিণীরা কাপড় কাচার কাজটি সম্পন্ন করিতে পারেন এবং ইহার ফলে তাহাদের শ্রমলাঘবে সহায়তা ঘটে। যাহাদের বস্ত্রধৌতির জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ রাখিবার সুবিধা বা সামর্থ্য নাই, তাহারা স্নানাগার কিংবা বাড়ীর একটি পছন্দসই কোণ দেখিয়া কাপড় কাচার আবশ্যক তৈজসাদি গুছাইয়া রাখিবেন। যেখানেই কাপড় কাচার ব্যবস্থা করা হউক না কেন, কাপড় কাচার স্থানটিতে যেন যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা থাকে। বস্ত্রাদির রং এবং দাগ দেখিবার জন্য পর্যাপ্ত আলোকের প্রয়োজন। কাপড় কাচাকে আমরা মোটামুটি চারিটি পর্যায়ে ভাগ করিতে পারি—(ক) বস্ত্রধৌতি, (খ) শুকান, (গ) ইস্ত্রি করা এবং (ঘ) বস্ত্রাদি সংরক্ষণ।

(ক) **বস্ত্রধৌতি** (Washing)—ইহার জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত জিনিসগুলির প্রয়োজন অনুভূত হয়ঃ

(১) **উনুন**—ময়লা সাদা জামাকাপড় আমরা সচরাচর গরম জলে ডুবাইয়া থাকি। অতিরিক্ত ময়লা কাপড়-চোপড় অনেকে আবার সাবান জলে ফুটাইয়া কাচিয়া থাকেন। জল গরমের জন্য এবং লোহার পাতের ইস্ত্রি থাকিলে উহা গরম করিবার জন্য একটি উনুন থাকা দরকার। অবশ্য কাপড় কাচার জন্য সকল বাড়িতে স্বতন্ত্র উনুনের ব্যবস্থা থাকে না। নৈশ আহার প্রস্তুতির পালা শেষ করিয়া অনেকেই গরম জলে কাপড় ডুবান এবং ইস্ত্রি করার কাজ করেন। ইহা মন্দ ব্যবস্থা নয়।

(২) **ডেকচি বা হাঁড়ি**—বস্ত্রাদি জলে ফুটাইবার জন্য এবং জল গরমের জন্য একটি মাটির অথবা ধাতুনির্মিত হাঁড়ি প্রয়োজন।

(৩) **টব বা গামলা**—কাপড় ভিজাইবার জন্য অন্তত একটি এবং সম্ভব হইলে দুইটি টব বা গামলা রাখা প্রয়োজন। স্বল্প কাপড় হইলে জল ফুটাইবার হাঁড়িটিতে কাজ চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক সঙ্গে অনেক কাপড় কাচিতে
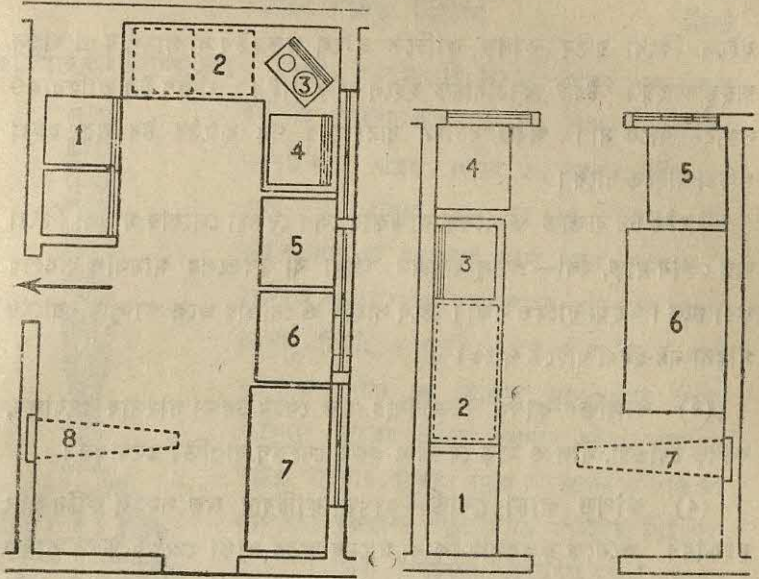
ধৌতাগারের পরিকল্পনা

1. কাপড় কাচার জিনিসপত্র, 2. কাপড় বাছিবার টেবিল, 3. গামলা টব ইত্যাদি, 4. কাপড় কাচা মেসিন, 5. রিংগার, 6. কাপড় শুকাইবার আলমারি, 7. ইস্ত্রিবোর্ড, 8. ম্যাঙ্গল।

সংযুক্ত রান্নাগার ও ধৌতাগার

1. কাপড় কাচার জিনিসপত্র, 2. গামলা, টব ইত্যাদি, 3. কাপড় কাচা মেসিন, 4. রিংগার, 5. কাপড় শুকাইবার আলমারি, 6. ইস্ত্রিবোর্ড, 7. সিঙ্ক
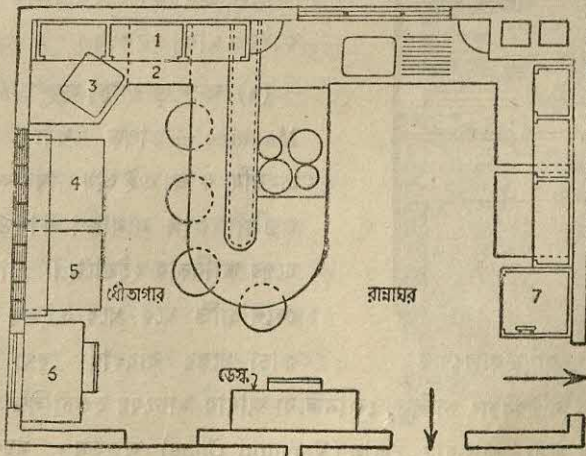
হইলে কিংবা রঙিন কাপড় কাচিতে হইলে স্বতন্ত্র টব বা গামলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। টবটি কাঠনির্মিত হইলে ক্ষতি নাই। এইরূপ টব ভাঙ্গিবারও সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য বহুদিন ব্যবহারের পর কাঠের টব নরম হইয়া পচিয়া যাইতে পারে।

কাঠের টব ব্যতীত এনামেল বা দস্তার লেপ দেওয়া লোহার গামলা কিংবা অন্য কোন ধাতু, যথা—অ্যালুমিনিয়াম, তামা বা পিতলের গামলাও ব্যবহার করা চলে। ইহা দামেও সস্তা। তবে সাবান ও সোডার জলে অ্যালুমিনিয়ামের গামলা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

(৪) **বালতি**--কাপড় ভিজাইবার জন্য যেমন টব বা গামলার প্রয়োজন, কাপড় ধোওয়া, নীল ও মাড় দেওয়ার জন্যও সেইরূপ বালতির প্রয়োজন।

(৫) **কাপড় কাচা বোর্ড**—কাপড় কাচিবার জন্য সমতল কঠিন স্থান দরকার। অনেকে কলতলায় কিংবা স্নানের ঘরের পাকা মেঝের উপর কাপড় কাচিয়া থাকেন। তবে কাপড় কাচার জন্য একটি কাঠের ঢেউ খেলানো বোর্ড রাখিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হয়।
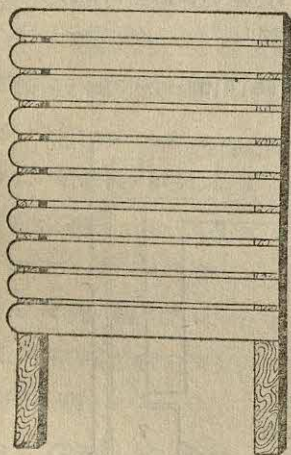
কাপড় কাচা বোর্ড

(৬) **কাষ্ঠদণ্ড**—গরম সাবান জলে বস্ত্রাদি ডুবাইবার জন্য এবং জল হইতে ভিজানো বস্ত্রাদি উঠাইবার জন্য একটি কাষ্ঠদণ্ড থাকা দরকার।

(৭) **কাপড় কাচা যন্ত্র**(Washing Machine)—কাপড় কাচা একটি শ্রমসাধ্য কাজ। এই শ্রম লাঘব করিবার জন্য আজকাল নানারূপ কাপড় কাচা যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। পাশ্চাত্য-দেশে প্রতি ঘরে ঘরে এইরূপ কাপড় কাচা যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। ইহাদের কোনটি বিদ্যুৎ-চালিত, কোনটি বা আবার মানুষের হস্তচালিত। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে ভ্যাকুয়াম কোন (Vacuum Cone) অন্যতম। ময়লা বস্ত্রে সাবান জল প্রবেশ করাইয়া ময়লা টানিয়া বাহির করিয়া আনা এই যন্ত্রগুলির কাজ। গৃহে এইরূপ একটি যন্ত্র থাকিলে, সাবান মাখিবার এবং কাপড় থুপিয়া

কাচিবার শ্রম বাঁচিয়া যায়। তোমরা জান মশারি, বিছানার চাদর, বেডকভার ইত্যাদি শয্যাদ্রব্যগুলি কাচা কি শ্রমসাধ্য ব্যাপার। কাপড় কাচা যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল বস্ত্রাদি কাচা আর কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মত দরিদ্র দেশে এই যন্ত্র রাখা সম্ভব নয়। তবে একটি কাষ্ঠদণ্ড বা তাম্রদণ্ড দ্বারা আমরা এই যন্ত্রের অভাব কিছুটা মিটাইতে পারি। কাপড় কাচিবার সময় অনবরত সাবান ও সোডার জলে হাত ভিজা থাকিলে হাতের চামড়া খসখসে হইয়া অবশেষে উঠিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। বস্ত্রাদিতে হাত না লাগাইয়া দণ্ডদ্বারা ধীরে ধীরে পিটাইয়া পিটাইয়া কাপড় কাচিলে ঐ আশঙ্কা তিরোহিত হয়।
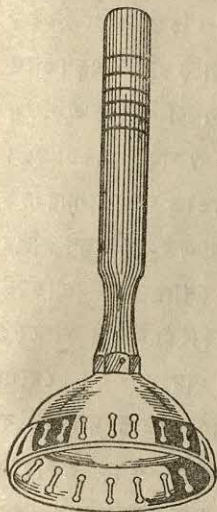
ভ্যাকুয়াম কোন

(৮) **রিংগার** (Wringer)—ভারী কাপড়গুলি কাচা যেমন কঠিন, কাচিবার পর উহাদের নিংড়াইয়া জল বাহির করাও তেমনি কষ্টসাধ্য। তাছাড়া কতকগুলি বস্ত্র অধিক নিংড়াইলে ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে তাই আজকাল জল নিংড়াইবার যন্ত্র বা রিংগার ব্যবহার করা হইতেছে। আমাদের দেশে অবশ্য এখনও এইরূপ যন্ত্রের প্রচলন হয় নাই।

(৯) **ব্রাশ**—বস্ত্রাদির দাগ তুলিবার জন্য ধৌতাগারে কয়েকটি ব্রাশ রাখা সমীচীন।

(১০) **সস্‌পেন ও হাতা**—কাপড় ধুইবার পরেই মাড় দিবার প্রশ্ন দেখা দেয়। মাড় প্রস্তুত করিবার জন্য সর্বদা একটি সস্‌পেন ও হাতা কিংবা একটি বড় চামচ রাখিবে।

রিংগার

এতদ্ব্যতীত কাপড় ধুইবার জন্য ঘরে সাবান, সোডা, রিঠা, নীল, টিনোপল, মাড় দিবার জন্য ময়দা অথবা এরারুট ও গঁদ এবং দাগ তুলিবার জন্য বিবিধ সরঞ্জাম সর্বদা মজুত রাখিবে।

(খ) **শুকান** (Drying)—

কাপড় কাচার সঙ্গে সঙ্গে কাপড় শুকাইবার কথাও চিন্তা করিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে রৌদ্রের একান্ত অভাব, উপরন্তু বাড়িগুলিও এরূপভাবে নির্মিত যে সেখানে ঘরেই কাপড় শুকাইতে হয়। এই সকল কারণে ঐ সকল দেশে গ্যাস কিংবা বিদ্যুৎচালিত আলমারিতে কাপড় শুকাইয়া লওয়া হয়। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে একমাত্র বর্ষাকাল ব্যতীত অন্যান্য সময় এত প্রচুর সূর্যালোক পাওয়া যায় যে, বস্ত্রাদি শুকাইবার জন্য কোনরূপ কৃত্রিম ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। কাপড় শুকাইবার পক্ষে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। উন্মুক্ত প্রান্তরে কাপড় শুকাইয়া লইলে কাপড়ের কোথাও ভাঁজ পড়ে না। এরূপ বস্ত্র ইস্ত্রি করিবার হাঙ্গামা কম। খোলা মাঠে কাপড় শুকাইবার সুবিধা না থাকিলে ঘরের বাহিরে তার, দড়ি কিংবা বাঁশ টাঙ্গাইয়া বস্ত্রাদি শুকাইয়া লইতে হয়। এইভাবে কাপড় শুকাইতে হইলে কিছু 'ক্লিপ' রাখিবে। ক্লিপ দিয়া জামাকাপড় আটকাইয়া দিবে নতুবা উহা হাওয়ায় উড়িয়া যাইতে পারে।

(গ) **ইস্ত্রি করা** (Ironing)—

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সুরুচির প্রশ্নটিও স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। তাই শুধুমাত্র পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়াই আমাদের তৃপ্তি হয় না, পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চাই বস্ত্রের পারিপাট্য। তাই যাহারাই গৃহে কাপড় কাচার ব্যবস্থা করেন তাহাদেরই ইস্ত্রির ব্যবস্থাও রাখিতে হয়।

(১) ইস্ত্রি তিন প্রকার—

(অ) চ্যাপ্টা, মোটা লোহার পাতের মত ইস্ত্রি। এইরূপ ইস্ত্রি উনুনের উপর বসাইয়া গরম করিয়া লইয়া কাপড়ের উপর চালান হয়।

(আ) কয়লার ইস্ত্রিও পাওয়া যায়। এই প্রকার ইস্ত্রি অনেকটা ছোট বাক্সের মত। ইস্ত্রির উপরকার ঢাকনিটি খুলিয়া ভিতরে জলন্ত কয়লা পুরিয়া দেওয়া হয়। ঐ জলন্ত কয়লার উত্তাপে ইস্ত্রি উত্তপ্ত হইয়া ওঠে।

(ই) এতদ্ব্যতীত বিদ্যুৎচালিত ইস্ত্রির ব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি রাখার অনেক সুবিধা। প্রথমত লোহার ইস্ত্রির মত এইরূপ ইস্ত্রি উনুনের উপর রাখিয়া বারবার গরম করিতে হয় না। অধিকন্তু এইরূপ

ইস্ত্রিতে অনেক সময় তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। ফলে রেশমী ও পশমী বস্ত্রগুলি ইস্ত্রি করা খুব সহজ হয়।
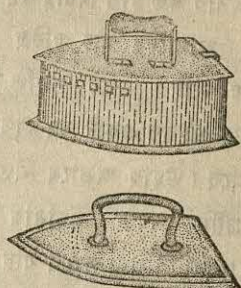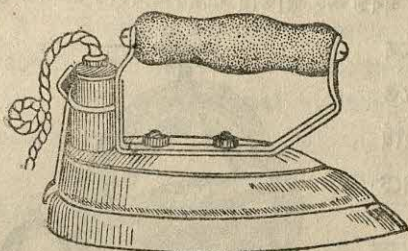
বিভিন্ন রকমের ইস্ত্রি

(২) **ইস্ত্রি বোর্ড** (Ironing board)—ইস্ত্রি করার জন্য একটি ইস্ত্রি বোর্ড কিংবা একটি স্বতন্ত্র টেবিল রাখা দরকার। টেবিলটি প্রয়োজনমত উচু হওয়া আবশ্যক কারণ নুইয়া ইস্ত্রি করিতে হইলে শিড়দাঁড়া ব্যথা হইয়া যাইতে চায়। টেবিলের উপর পুরু কম্বল ও চাদর প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। লোহার ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে ইস্ত্রি ধরিবার জন্য পুরু বস্ত্রখণ্ড রাখিবে। ইস্ত্রির টেবিলের সঙ্গে অপর একটি টেবিল রাখিলে উহাতে সমস্ত কাপড়-চোপড় পূর্বাহ্নে গুছাইয়া পাট করিয়া রাখা যায়।
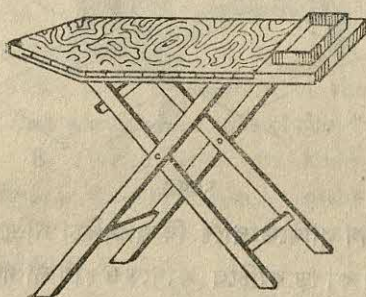
ইস্ত্রি বোর্ড

(৩) **স্লিভ বোর্ড** (Sleeve board)—লম্বা হাতা ইস্ত্রি করিবার জন্য স্লিভ-বোর্ড থাকিলে সার্ট ইত্যাদি ইস্ত্রি করিতে সুবিধা হয়।

স্লিভ বোর্ড

(৪) **ম্যাঙ্গল** (Mangles)—বিছানার চাদর, বেড কভার, টেবিল-ক্লথ ইত্যাদি কতকগুলি নিত্যব্যবহার্য জিনিস ইস্ত্রি করিবার তেমন প্রয়োজন নাই। পরিপাটিরূপে ভাঁজ করিয়া
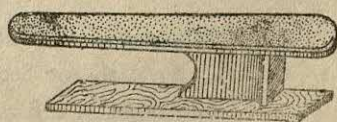
এগুলি একটু চাপিয়া দিলেই হয়। পাশ্চাত্য দেশে বস্ত্রাদি এইভাবে চাপিয়া লইবার জন্য চাপ দিবার যন্ত্র (Mangle) ব্যবহার করা হয়।

আমাদের মত দরিদ্র দেশে অবশ্য এই জাতীয় যন্ত্রের ব্যবহার এখনও শুরু হয় নাই। তবে সঙ্গতি থাকিলে গৃহে এইরূপ একটি যন্ত্র রাখা যাইতে পারে। উহার অভাবে নিত্যব্যবহার্য বস্ত্রাদি অবশ্য বিছানার নীচে রাখিয়া চাপিয়া লওয়া যায়।

ম্যাঙ্গল

ধোতাগারের সরঞ্জাম সংরক্ষণ (Storage of Laundry equipments)—

ধোতাগারে প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যবহারের পর যত্ন করিয়া রাখিতে হয়। টব, গামলা ও বালতিগুলি কাপড় ধোওয়ার পরে জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া উবুড় করিয়া রাখিবে, যাহাতে সব জল ঝরিয়া যায়। শুষ্ক অবস্থায় না রাখিলে ঐ সব পাত্রে জলের দাগ লাগিতে পারে কিংবা মরিচা পড়িতে পারে। ঐরূপ দাগ ধরা পাত্রে পুনরায় কাপড় কাচিলে কাপড়েও দাগ লাগিয়া যাইবে। কাপড় শুকাইবার তার ও ক্লিপও ব্যবহারের পূর্বে মুছিয়া লইবে। ইস্ত্রি ব্যবহারের পরে মুছিয়া শুষ্ক স্থানে রাখিবে। লোহার ইস্ত্রি ব্যবহারের পূর্বে মুছিয়া লইবে এবং ব্যবহারের পর একটু তেল অথবা ভেসিলিন মাখাইয়া রাখিবে নতুবা উহাদের গায় মরিচা ধরিবে।
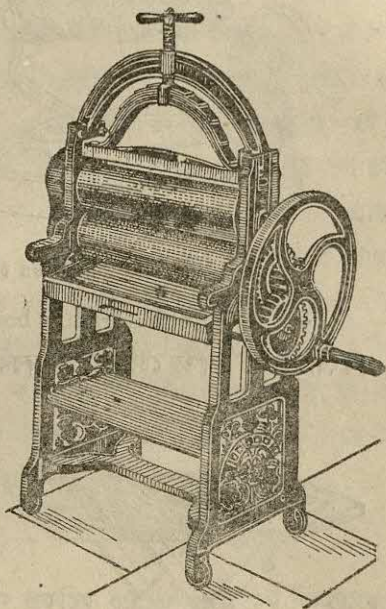
অনুশীলনী

প্রথম পত্র—প্রথম অধ্যায়—স্বাস্থ্য

1. 'Health is not merely absence of disease.'—Explain. State briefly the factors t hat contribute to good physical health.

2. What is personal hygiene ? Explain why fresh air and sunshine are so important for health.

3. State the steps you would take in order to prevent diseases of the hair.

4. Write briefly what you know about the structure of an eye. State the steps you would follow in order to preserve good eye-sight. (S. F. 1952 and 1957)

5. Describe with a diagram the structure of a tooth. State the steps you should take in protecting teeth from early decay. (M. 1949)

6. State briefly the steps you would take in order to prevent the early decay of your teeth. What is 'caries' and how is it caused ? (S. F. 1952)

7. Give a diagram of the elementary structure of the skin. What are the functions of skin ? (M. 1950)

8. Write what you know about the structure of the skin. State how to maintain a healthy skin. (S. F. 1954)

9. What is the importance of deveploping good habits with regard to bath ?

10. Discuss the relation between clothing and health. How does clothing help in regulating body temperature ?

11. What is sunlight ? Discuss its health values. What are the harmful effects of excessive sunlight ?

12. What is air ? Describe briefly the composition of air. How is air polluted inside the room ?

13. Write what you know about the composition of air. What are the principles underlying good ventilation ? (M. '49)

14. Describe the changes in the air due to respiration. (M. 1945)

15. Discuss the importance of breathing in fresh air. How may fresh air be circulated in a bedroom ?

16. What are the effects of breathing confined air ? What arrangements could be made for properly ventilating a room ?

17. What are the bad effects of overcrowding ? State what changes occur in air by overcrowding in closed space.

18. How does exercise help to promote our general health ? State the rules for taking exercise. (S. F. 1954)

19. Mention briefly the general rules of exercise. What are the evil effects of over-exercise ?

20. State the points you would specially consider while planning exercise for a girl of 16. What are the values of organized games and exercise ?

21. What is the importance of rest in human life ? Which is the best form of rest ? Is recreation a rest ? (S. F. 1953)

22. What are the steps you should take in order to promote good sleep and why ? (M. 1949)

23. "The mind, like the body, works better the more regularly it is exercised, but like the body it needs consideration as to rhythms of work and rest." Discuss and state the values of rest to mind and body. (M. 1949)

24. Write what you know about healthy eating habits.

25. At what age do boys and girls increase in weight most rapidly ? How much should you gain in weight for the next twelve months if you are of average weight ?

প্রথম পত্র—দ্বিতীয় অধ্যায়—গৃহ পরিচালনা

1. What are the points you should consider before selecting a dwelling house ? Why is planning essential while constructing a house ?

2. In planning a new house should you give special thought to the following—(a) Structure, (b) Ventilation, (c) Drainage arrangement ? Give reasons for your answer.

3. What are the points you should consider while selecting a house to live in, in a town ? (M. 1951 ; G. U. 1948)

4. What are the factors you should consider in choosing a site for a house in a village ? Draw up a plan for an ideal house in a village.

5. What are the basic principles of decorating a room. Make a list of articles that you should keep in your drawing room. What part does curtain play in interior decoration ?

6. Discuss fully why the two principles of balance and harmony are so important in the interior decoration of a house.

7. House decoration is a work of art, in which the principles of balance, rhythm and harmony be equally exemplified—Discuss.

8. Colour is now playing an ever-increasingly important part in the planning of interior decoration.—Justify the statement. (S. F. 1953)

9. "House furnishing and decoration go hand in hand."—Do you agree ? Give reasons for your answer. State the factors you should consider while buying furniture for your home.

10. State the principles that should guide you in furnishing a drawing-room.

11. State the factors you should consider while buying furniture for your home.

12. What points would you look for when selecting your utensils ? What factors would influence your choice ?

13. How will you clean and polish the following : (a) an old cane chair, (b) stained aluminium, iron or brass cooking utensils, (c) wooden furniture, (d) a steel knife, (e) an ornamental piece of copper.

14. What are the duties of a home-maker ? When could you say a house is efficiently managed ? (S. F. 1953)

15. What are your duties in your family towards your parents and domestic helpers ?

16. Describe the duties a housewife has to perform from morning till night in the average middle class family.

17. What in your opinion are the essential qualities of a friend ? Have you got those qualities in you ?

18. What suggestions would you give to a girl of your own age in choosing her friend and maintaining the friendship ?

দ্বিতীয় পত্র—প্রথম অধ্যায়—খাদ্য

1. How may foods be classified ? State what foods are used for repair and growth of body tissue. (M. 1947)

2. Name the different constituents of food and describe their functions. (S. F. 1952 and 1955)

3. What is food ? Why do men need more food than women ? Is tea with milk a food ? (S. F. 1953)

4. What are the characteristics of each group of foodstuffs from which we select our diet ?

5. What kinds of kitchen equipment and cooking utensils would you select for your kitchen ? Give reasons for your choice.

6. Describe with sketches, where necessary, the arrangement you should like to have in your kitchen with a view to saving your time and labour. Prepare a list of kitchen equipments such as are usually required by people of moderate means. (G. U. 1949)

7. Describe the common types of accidents that take place in the kitchen. Give a list of fatal or non-fatal accidents that have occurred in your family kitchen. What caused the accident and how could it have been prevented ?

8. Name the common fuels that are used in our country and describe their relative advantages and disadvantages.

9. Write what you know about the different types of ovens. Discuss the advantages of a smokeless chula.

10. Why do you use measures and weights for cooking food ?

11. Describe the different methods of cooking.

12. State the advantages of stewing as a method of cooking. What foods may be cooked by this method ?

13. State how would you proceed to cook vegetables preserving almost all its nutrients.

14. What vitamins are readily lost during cooking ? What other nutrients may be affected by faulty cooking process ? Suggest some measures by which such losses may be reduced.

15. State the effect of dry and moist heat on rice, meat and leafy vegetables. Which method of cooking do you think would be best for preserving their food values ?

16. Give reasons for the following :—

(a) Tomatoes should be taken fresh and raw.

(b) Cereals should be taken only when cooked.

17. How can rice be cooked to prevent the loss of Vitamin B ?

18. Write an essay on kitchen garden.

দ্বিতীয় পত্র—দ্বিতীয় অধ্যায়—বস্ত্রশিল্প

1. How may fibres be classified ? Give two examples from each group.

2. Name the natural fibres used in the textile industry and indicate their sources. How would you distinguish these fibres ?

3. Make a comparative study of the merits and demerits of various types of textile fibres.

4. How will you classify fibres ? Discuss the manufacture of silk fibre.

5. State what you know about woollen fibre. How does it differ from silk ?

6. Write short notes on : (a) Fibroin, (b) Sericin.

7. Describe with sketches, where necessary, the arrangement you should like to have in your laundry room at home. Prepare a list of laundry equipments you think a housewife should keep at home. (M. 1949)

8. Make a list of equipments that is necessary for laundry work. How would you take care of the equipments ?

দশম শ্রেণী

প্রথম পত্র

প্রথম ভাগ—**স্বাস্থ্য**

দ্বিতীয় ভাগ—গৃহ-পরিচালনা

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য

আমরা ইতোপূর্বে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উপর গণস্বাস্থ্য নির্ভর করে, কারণ গণস্বাস্থ্য আসলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যেরই সমষ্টিমাত্র। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সমাজকে নীরোগ ও সুস্থ রাখার প্রচেষ্টাকে আমরা গণস্বাস্থ্যের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকি।

গণস্বাস্থ্যে অনাময় ব্যবস্থার গুরুত্ব—গণস্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে অনাময় ব্যবস্থার উপর, কারণ, কতকগুলি রোগের জীবাণু আছে যেগুলি এক ব্যক্তির দেহ হইতে অপর ব্যক্তির দেহে মল, মূত্র, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির সাহায্যে ছড়াইতে থাকে। এই সকল ব্যাধিগুলিকে বলে সংক্রামক ব্যাধি। সংক্রামক ব্যাধিগুলি অবশ্য নিবার্য ব্যাধি কারণ, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সতর্কতা অবলম্বনের দ্বারা এইসব রোগ নিবারণ করা যায়। সমাজকে সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে গণস্বাস্থ্যের উন্নতি করা সম্ভব নয়। অনাময় ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। গণস্বাস্থ্য এবং অনাময় ব্যবস্থা তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অনাময় ব্যবস্থা (Sanitation)—অনাময় ব্যবস্থা বলিতে আমরা বুঝি পরিবেশকে এমন নিরাপদ ও নির্দোষ করিয়া তুলিতে হইবে যে রোগের জীবাণু যেন ছড়াইবার সুযোগ না পায়। সর্বদা রোগজীবাণুর দ্বারা সংক্রামক রোগ ছড়ায়। সংক্রামক রোগীর দেহ হইতে ঐ সকল রোগের জীবাণু তাহাদের মল, মূত্র ও নিষ্ঠীবন ইত্যাদির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাহির হইয়া আসিতেছে। শুধু রোগীই নহে, রোগের বাহকদেরও মলমূত্র গণস্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঐগুলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়িলে কিংবা আবর্জনা প্রভৃতির মধ্যে কোন রকমে মিশিয়া থাকিলে সহজেই রোগের জীবাণু সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিয়া ব্যাধির সৃষ্টি করে। রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই অনাময় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক উপায়ে অর্থাৎ সূর্যকিরণের সাহায্যে আমাদের পরিবেশ অনেকখানি জীবাণুমুক্ত হইয়া থাকে। তবে এই প্রাকৃতিক উপায়ের অসুবিধা এই যে আমাদের পরিবেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে সূর্যালোক পড়ে না। উপরন্ত গৃহে এত বেশী আবর্জনা জমে যে সেগুলি জীবাণুমুক্ত করিবার জন্য কেবলমাত্র সূর্যালোকের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আমাদের চলে না। তাই আবর্জনা ও মলমূত্রাদি নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা করা দরকার। দ্বিতীয়ত গণস্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে চাহিলে খাদ্য, পানীয় ও ভূমিকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে। তৃতীয়ত রোগীর মলমূত্র, নিষ্ঠীবন, ব্যবহৃত বস্ত্র ও আসবাবপত্রাদি যথাযথ নির্বীজিত করিয়া ফেলা উচিত। নতুবা ঐ সমস্ত বস্তু রোগের জীবাণু বহন করিয়া রোগ সংক্রামিত করিবে। অনাময় ব্যবস্থাকে আমরা তিনটি স্তরে ভাগ করিতে পারি—

১। আবর্জনা নিষ্কাশন, ২। ভূমি, খাদ্য ও পানীয় বিশুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন, ৩। নির্বীজন।

(১) আবর্জনা নিষ্কাশন

চারি প্রকারের আবর্জনা আছে, যেমন—(ক) বাড়ির শুষ্ক আবর্জনা—ছেঁড়া কাগজ, ন্যাকড়া, কাচ ভাঙ্গা, উনুনের ছাই, লোহা ভাঙ্গা ইত্যাদি শুষ্ক আবর্জনার অন্তর্গত। (খ) জঞ্জাল (Garbage)—মাছের আঁশ, তরকারির খোসা ইত্যাদি রান্নাঘরের আবর্জনা, হাড়, নাড়িভুঁড়ি। (গ) রাস্তা ঝাঁটান ময়লা—ধুলা, গোবর, পশুপাখীর শব ইত্যাদি। (ঘ) মানুষের বিষ্ঠা ও মূত্র, কলকারখানার আবর্জনা।

এই চারি প্রকার আবর্জনাকে সোজাসুজি আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি—(অ) শুষ্ক আবর্জনা ও (আ) তরল আবর্জনা।

যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলিবার বিপদ—

(ক) আবর্জনা বাড়িতে কিংবা রাস্তায় স্তূপাকার হইয়া থাকিলে উহাতে ক্রমশ দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ঐ গ্যাস আবার বায়ুকেও দূষিত করিতে থাকে।

(খ) পচা আবর্জনা নানারূপ জীবাণুরও আশ্রয়স্থল। ভূমির উপর সঞ্চিত ময়লা জলের সাহায্যে তরলীকৃত হইয়া ধীরে ধীরে চুয়াইয়া ভূমির অভ্যন্তরে

প্রবেশ করে। ময়লা সাধারণত জীবাণুদুষ্ট থাকে বলিয়া ময়লার সঙ্গে জীবাণুও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া ভূগর্ভস্থ জলকে কলুষিত করে। কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশয় ইত্যাদি রোগের জীবাণু এইভাবে ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে নীত হয়।

(গ) বাড়ির আশেপাশে জঞ্জাল জমিয়া থাকিলে পোকামাকড় ও মশা মাছির উৎপাত বাড়ে। এইভাবে মশামাছির সাহায্যে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ ছড়ায়।

(ঘ) ভূমির উপরে যে কঠিন ময়লা পড়িয়া থাকে বা যে তরল ময়লা শুকাইয়া যায়, তাহা পরে উড়িয়া আসিয়া আমাদের খাদ্য ও পানীয়ে পড়ে এবং এইভাবে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ও কৃমিরোগের বিস্তার ঘটায়।

(ঙ) আমাদের দেশে রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে দেখিবে গোময় বা অশ্ববিষ্ঠা পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত বিষ্ঠা ও মলমূত্র স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। কারণ, গোময় ও অশ্ববিষ্ঠার মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার, গ্যাস ও গ্যাংগ্রিণ ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধির জীবাণু থাকিতে পারে। শরীরে কোন ক্ষতস্থান থাকিলে কিংবা দেহের কোন অংশ কাটিয়া গেলে ঐ সমস্ত জীবাণুদুষ্ট বিষ্ঠা যদি সেই ক্ষতস্থানে লাগে তবে উল্লিখিত ব্যাধির আক্রমণ হইতে পারে।

(চ) যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা যেমন বিপজ্জনক, সেইরূপ যেখানে সেখানে থুথু, কাশি, গয়ার ইত্যাদিও ফেলিতে নাই। সমস্ত বায়ু-বাহিত ব্যাধি থুথুর সাহায্যে ছড়ায়।

(অ) শুষ্ক আবর্জনা অপসারণের বিভিন্ন ব্যবস্থা

ডাস্টবিন—শহরাঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই আবর্জনা অপসারণের জন্য ডাস্টবিন ব্যবহার করিতে দেখা যায়। করোগেটেড লোহার দ্বারা তৈয়ারী এইসব ডাস্টবিন বাড়ির অদূরে বসানো থাকে। গৃহস্থরা বাড়ির সমস্ত জঞ্জাল ঐ ডাস্টবিনে ফেলে। তারপর ধাঙড় আসিয়া ঠেলাগাড়িতে করিয়া উহা লইয়া যায়। এই ব্যবস্থাকে বলে 'Scavenging'। পৌরসভার কর্তৃপক্ষ এই ডাস্টবিন বসাইবার এবং উহার ময়লা অপসারণের দায়িত্ব লইয়া থাকে। আবর্জনা অপসারণের পরে উহা অপসারণের চারি প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে, যথা—(১) মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা (dumping and

filling), (২) কমপোস্ট (Compost) অর্থাৎ তরলসাররূপে গলাইয়া ফেলা, (৩) নিকটে সমুদ্র থাকিলে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া এবং (৪) পোড়াইয়া ফেলা (incineration)।

(১) **মাটিতে পুতিয়া ফেলা** (dumping and filling)—আমাদের দেশে খানা, ডোবা, এঁদো পুকুর প্রভৃতি স্থান ভরাট করিবার জন্য সমস্ত জঞ্জাল নিয়া ঐ স্থানে ফেলা হয়। জঞ্জাল দিয়া এই ভরাট করিবার ব্যবস্থাকে বলে dumping ; এই ব্যবস্থা কিন্তু বড়ই অস্বাস্থ্যকর কারণ ইহাতে মশা, মাছি, পোকামাকড়ের উৎপাত বাড়িয়া যায়। স্থতরাং জঞ্জাল দিয়া জমি ভরাট করিতে হইলে সেই জমি বাসভূমি হইতে যত দূরে হয় ততই ভাল। তাছাড়া লক্ষ্য রাখিবে ভরাট করা জমিতে বৃষ্টি বা বন্যার জল পড়িয়া সেই জল আবার যেন পানীয় জলের পুষ্করিণীতে আসিয়া না পড়ে। কোন ঢাকা জায়গায় আবর্জনাদি স্তূপাকার করিয়া মাটিচাপা দিয়া রাখিয়া দিলে কিছুদিন পরে উহা সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আজকাল জঞ্জালকে সার হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে।

(২) **তরলীকরণ** (Compost)—কোন আবর্জনাই ফেলিবার জিনিস নয়। রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে আবর্জনা গলাইয়া সার হিসাবে চাষের কাজে লাগান যাইতে পারে। গোময় ও গোমূত্রমিশ্রিত নাইট্রোজেনযুক্ত একপ্রকার তরল রাসায়নিক দ্রব্য আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ঢালিয়া দিলে কিছুদিন পরে ঐ আবর্জনাও একরূপ তরল পদার্থে পরিণত হয়। আবর্জনাকে এইরূপভাবে তরল করিবার নামই কমপোস্ট। কমপোস্ট সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৩) **আবর্জনা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া চলে।**

(৪) **দাহন** (incineration)—জঞ্জাল নিষ্কাশনের অন্যতম পন্থা হইল দাহন। পল্লীঅঞ্চলে এক জায়গায় জড় করিয়া জঞ্জাল পুড়াইবার ব্যবস্থা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আজকাল আবর্জনা পুড়াইবার এক ধরনের নতুন বৈজ্ঞানিক চিমনিযুক্ত চুল্লী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চুল্লীতে সমস্ত আবর্জনা নিক্ষেপ করিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। সমস্ত জঞ্জাল পুড়িয়া গিয়া কতকগুলি ঝামার মত পড়িয়া থাকে। এই ঝামার পরিমাণ আসল জঞ্জালের এক-চতুর্থাংশ। রাস্তাঘাট মেরামতের কাজে ঝামাগুলি ব্যবহার করা যায়।

আমাদের দেশে এখনও পল্লীগ্রামে আবর্জনা অপসারণের কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। তাই গ্রামাঞ্চলে গর্ত করিয়া আবর্জনা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলাই ভাল। কিছুদিন পরে এই সমস্ত আবর্জনা সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেসকল আবর্জনা পোড়ান যায় তাহা পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

(আ) মলমূত্রাদি ও অন্যান্য তরল ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা

কলিকাতা ও লণ্ডনের মত বড় বড় শহরের প্রত্যেক বাড়ির মলমূত্রাদি, নর্দমার নোংরা জল, আস্তাবল ও কলকারখানার জল, রাস্তার জল সমস্তই মাটির নীচে মোটা নলের মধ্য দিয়া একত্রে নিকাশ করিবার ব্যবস্থা আছে। যাবতীয় তরল ময়লা নিকাশের ঐ ব্যবস্থাকেই জলবাহিত প্রণালী (water carriage system) বলে। এই নোংরা জলকে বলা হয় 'স্যুয়েজ' (sewage) এবং যে বৃহৎ পাইপের সাহায্যে ঐ অর্ধ তরল পদার্থ প্রবাহিত হয় উহাকে বলে 'স্যুয়ার' (sewer)।

স্যুয়েজের নিকাশ—বড় বড় শহরে প্রত্যেক বাড়িতেই ড্রেন পায়খানা (water closet) আছে। এইরূপ পায়খানার ভিতরে একটি করিয়া জলের ট্যাঙ্ক (cistern) আছে এবং উহাতে একটি শিকল লাগান থাকে। শিকল ধরিয়া টানিলেই জল আসিয়া সবেগে পায়খানার মল ধোয়াইয়া নিয়া নীচেকার ময়লা অপসারণের পাইপ (soil pipe) দিয়া নীচে চলিয়া যায়। পায়খানার অভ্যন্তরে বক্রনল বা syphon-এর বন্দোবস্ত থাকার ফলে ঐ জল ঠেলিয়া স্যুয়েজের দুর্গন্ধ উপরে উঠিয়া আসিতে পারে না। তদুপরি সাইফনের ঠিক উপরে একটি দুর্গন্ধনিঃসারক নল লাগান থাকে এবং গৃহের ছাত অতিক্রম করিয়া ঐ নল আরও উপরে উঠিয়া যায়।

জলবাহিত প্রণালীতে মল নিঃসরণের পাইপের মতই ময়লা জল নিঃসরণেরও স্বতন্ত্র পাইপের বন্দোবস্ত থাকে। সকল পাইপগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং বাড়ির সমস্ত ময়লা জল গিয়া রাস্তার বৃহত্তর পাইপের সঙ্গে মিলিত হয়। সেই পাইপগুলি আবার রাস্তার ময়লা অপসারণের বৃহত্তম পাইপের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই পাইপগুলি কংক্রিটের নির্মিত। ইহাদিগকেই বলে স্যুয়ার (sewer)। পাইপগুলি যাহাতে ভরাট হইয়া না যায় এইজন্য রাস্তার মাঝে মাঝে এক একটি বড় গর্ত থাকে। এই গর্তগুলিকে বলে manhole pit—উহাদের মুখ লোহার
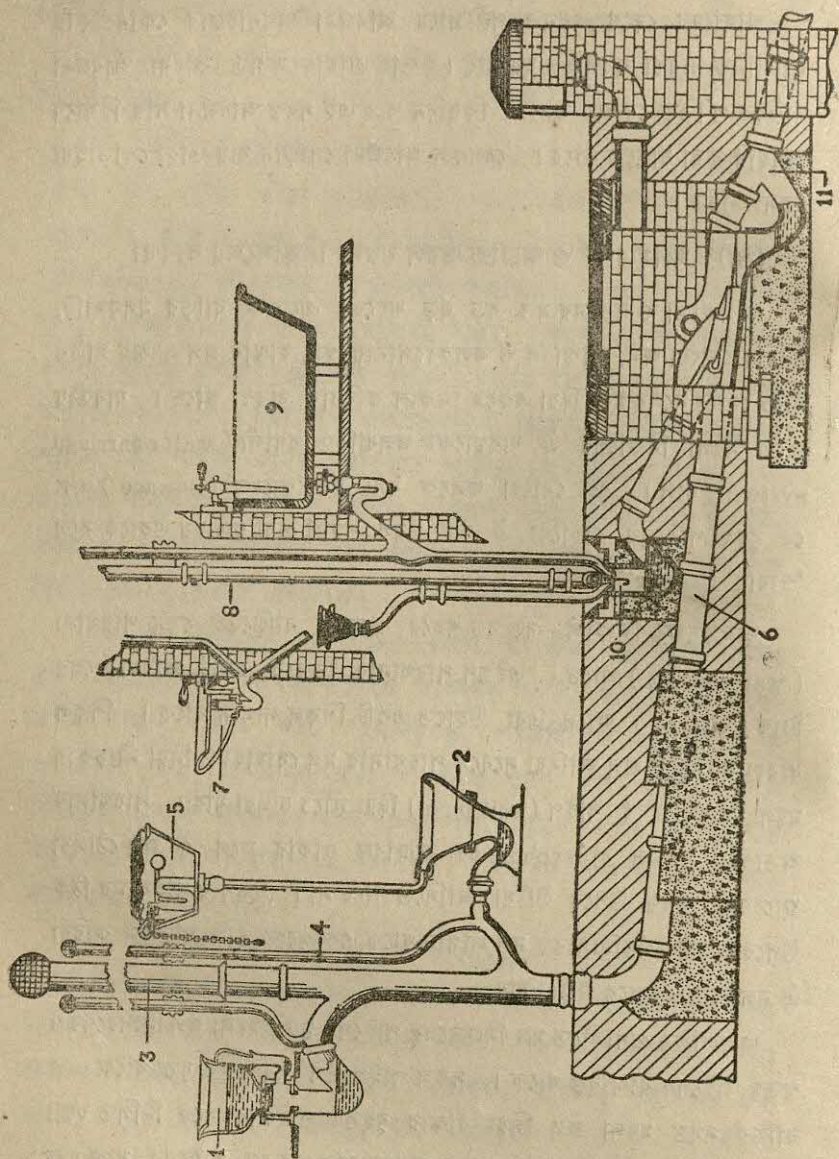
1. জলের চৌবাচ্চা, 2. পায়খানা, 3. মল অপসারণের মোটা নল, 4. দুর্গন্ধ-নিঃসারক নল, 5. সিসটার্ণ, 6. মল অপসারণের নল, 7. মুখ ধুইবার বেসিন, 8. বৃষ্টির জল সরিবার নল, 9. বাথ-টাব, 10. গ্যালি-ট্র্যাপ, 11, মাটির নীচের পাইপ।

ঢাকনি দিয়া সর্বদা বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে ঐ গর্তে নামিয়া ধাঙ্গড়রা ময়লা তুলিয়া ফেলে। পাইপগুলি ক্রমশ ঢালু হইয়া শেষে কোন নদী, সমুদ্র কিংবা পতিত জমিতে গিয়া পড়ে। জলবাহিত প্রণালীর কার্যকারিতা নির্ভর করে দুইটি অবস্থার উপর—(১) ময়লার সঙ্গে প্রথমত যথেষ্ট পরিমাণে জল নিঃসৃত হওয়া চাই। (২) দ্বিতীয়ত নর্দমাগুলিতে আলো প্রবেশের (ventilation) ব্যবস্থা থাকা দরকার।

মলশোধনী পায়খানা (Septic tank)—যেখানে স্যুয়েজ নিকাশের উপরোক্ত ব্যবস্থা নাই সেখানে পায়খানার নীচে মলশোধনী পায়খানা বা সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করিয়া মলনিকাশের ব্যবস্থা করা হয়। মেথর
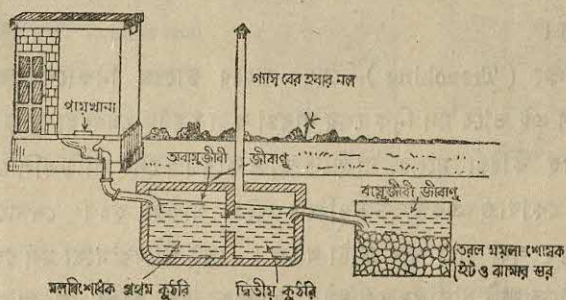
সেপটিক ট্যাঙ্ক

দিয়া এই মল অপসারণের দরকার হয় না, কারণ, মাটির নীচে প্রোথিত চৌবাচ্চার মধ্যে থাকিয়া মল আপনিই আসিয়া নির্দোষ হয়। এইরূপ ট্যাঙ্কের তিনটি অংশ—

(ক) বদ্ধ চৌবাচ্চা (Anaerobic tank)—পায়খানার তলায় মাটির নীচে গভীর গর্ত খুঁড়িয়া পাশাপাশি দুইটি সিমেণ্ট বাঁধানো চৌবাচ্চা তৈয়ারী করা হয়। প্রথম চৌবাচ্চাটি দ্বিতীয়টির চেয়ে আয়তনে ছোট এবং সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ—উহাতে কখনও আলো বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। চৌবাচ্চাটির অর্ধেক প্রায় জলে ভরতি থাকে। উপরের পায়খানার মলগুলি জল ঢালিয়া ধুইয়া দেওয়াতে উহা চীনামাটির নল বাহিয়া প্রথম চৌবাচ্চায় গিয়া পড়ে। এই ট্যাঙ্কে অবায়বীয় জীবাণু কর্তৃক মল কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত হয়।

(খ) বায়ুপূর্ণ চৌবাচ্চা (Aerobic tank)—দুই চৌবাচ্চার মধ্যবর্তী দেওয়ালে ফোকর কাটা থাকে। তরল মল প্রথম চৌবাচ্চা হইতে মাঝের দেওয়ালের ফোকর দিয়া দ্বিতীয় চৌবাচ্চায় পড়ে। এই দ্বিতীয় চৌবাচ্চায় বাহির হইতে বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা আছে। বায়বীয় জীবাণুগণের ক্রিয়াতে ঐ তরল মল আরও বিশোধিত হইয়া পড়ে।

(গ) দ্বিতীয় চৌবাচ্চা হইতে মল বাহির হইয়া তৃতীয় স্তর বা ঝামার স্তরে গিয়া শোধিত হয়। এই জল শুষিয়া না ফেলিয়া ব্লীচিং পাউডার ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া পাইপের সাহায্যে মাঠে লইয়া গিয়া সাররূপে ব্যবহার করা চলে। যেসব অঞ্চলে জলবাহিত প্রণালীর (water carriage system) সুবিধা নাই সেইসব স্থানে সেপটিক ট্যাঙ্কের সাহায্যে মল নিকাশের ব্যবস্থা করা যায়।

ট্রেঞ্চিং (Trenching)—যেসব শহরে স্যুয়েজ নিকাশের ব্যবস্থা নাই সেইখানে এই ভাবে মল নিকাশের ব্যবস্থা করা হয়। মেথররা বাড়ি বাড়ি গিয়া মল-সংগ্রহ করিয়া মলের গাড়িতে ভর্তি করে। সেই গাড়িগুলি লোকালয়ের বাহিরে কোথাও একটি উচ্চভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ছয় ফুট অন্তর খুব লম্বা লম্বা খাদ কাটা থাকে। সেই খাদের মধ্যে মল ফেলিয়া দিয়া উপর হইতে মাটি চাপা দেওয়া হয়। যেখানে মল চাপা দেওয়া হয় তাহাকে বলে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড। ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড সাধারণত তিনটি খাদে বিভক্ত থাকে। এক একটি খাদ এক বৎসর ধরিয়া ব্যবহার করা হয়। তারপর দুই বৎসর উহাকে বিরাম দেওয়া হয়। দুই বৎসর পর্যন্ত মল মাটির নীচে থাকিয়া জমির উৎকৃষ্ট সারে রূপান্তরিত হয়।

কুয়া পায়খানা (Pit latrine)—গ্রামাঞ্চলে কুয়া পায়খানার প্রচলন দেখা যায়। পায়খানার নীচে একটি কুয়ার মত গর্ত কাটান হয়। বৃষ্টির জল আটকাইবার জন্য পায়খানার উপরে সাধারণত চালা থাকে। এইরূপ কুয়া পায়খানা বড়ই দুর্গন্ধযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর। মল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নাই বলিয়া পায়খানার ভিতরেই মল পচিতে থাকে। মাঝে মাঝে চুন দিয়া কূপটি জীবাণু-বর্জিত করিয়া লওয়া উচিত।

গর্ত পায়খানা (Bored hole latrine)—বসতবাটি ও পুষ্করিণী হইতে দূরে একটি উচ্চভূমি এইরূপ পায়খানার জন্য নির্বাচন করা উচিত। প্রায় দেড় ফুট ব্যাসের ১০ হইতে ২০ ফুট গভীর গর্ত কাটিতে হয়। সেই গর্তের

উপর ফোকরযুক্ত গাঁথনি করিয়া বসিবার স্থান করা হয়। বৃষ্টির জল যাহাতে গর্তে পড়িয়া জমিতে না পারে সেজন্য একটি চালা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কীট পতঙ্গাদির উৎপাত ও দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য পায়খানার ভিতরে মাঝে মাঝে চুন বা কেরোসিন তেল ঢালিয়া দেওয়া উচিত। তারপর গর্ত মলে ভরাট হইয়া আসিবার উপক্রম হইলে উহাতে মাটি চাপা দিয়া বুজাইয়া ফেলিয়া নতুন গর্ত করিবে।
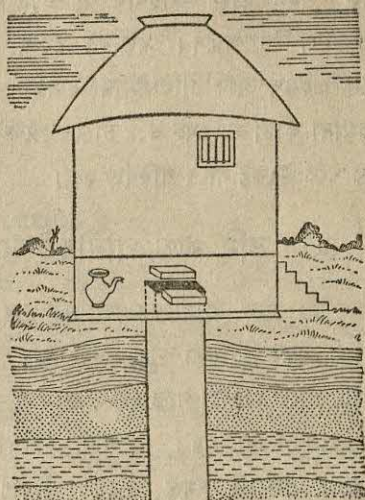
গর্ত পায়খানা

খাটা পায়খানা (Service privy)—বসতবাটির এক প্রান্তে কুয়া বা পুষ্করিণী হইতে দূরে একটি পাকা পায়খানা তৈয়ার করা হয়। উহার চাতালের প্রায় ছয় ফুট নীচে মল ধরিবার জন্য আলকাতরা মাখানো বালতি বা মাটির গামলা থাকে এবং মেথরের প্রবেশের জন্য একটি স্বতন্ত্র দরজা থাকে। দরজাটি সর্বদাই বন্ধ থাকিবে। শৌচাদি কার্যের জন্য পায়খানার পার্শ্বে একটি সরু নালা থাকে। ঐ নালা দিয়া জল গড়াইয়া বাহিরে চলিয়া যায়, বালতি কিংবা গামলায় পড়ে না। প্রত্যহ মেথর আসিয়া খাটা পায়খানার মল লইয়া যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারিলে এরূপ খাটা পায়খানা খুব অস্বাস্থ্যকর নয়।
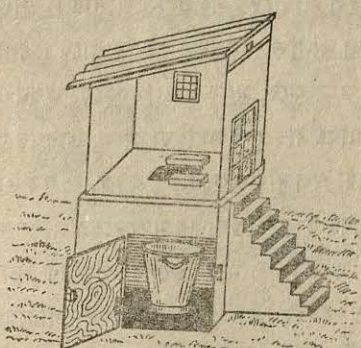
খাটা পায়খানা

খাদ পায়খানা (Trench latrine)—যেখানে কোন স্থায়ী পায়খানা নাই সেইসব স্থানে অস্থায়ীভাবে খাদ পায়খানার ব্যবস্থা করা যায়। দুই ফুট চওড়া

লম্বা লম্বা খাদ কাটিয়া দুই পাশে মাটি স্তূপাকার করিয়া রাখা হয়। তারপর দরমার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া একসঙ্গে বহুজনের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। মল ত্যাগ করিবার পর প্রত্যেক ব্যক্তি দুই পাশ হইতে উহার উপর মাটি চাপা দিয়া আসে। বড় বড় মেলা; অস্থায়ী সৈন্যাবাস, ক্যাম্প প্রভৃতি স্থানে এইরূপ খাদ পায়খানার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। যে জমিতে খাদ পায়খানা কাটা হয় সেই জমি চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, কেননা মল কয়েক বছর পরে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়।

(২) ভূমি, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি দূষিত না করা

ভূমির সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের খুব নিকট সম্বন্ধ। যে ভূমির উপর দিয়া আমরা নিত্য হাঁটাচলা করি, উহা যদি জীবাণুসঙ্কুল হয়, তবে সহজেই সেই জীবাণু খাদ্যে মিশিয়া খাদ্য দূষিত করে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্য দিয়া শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া যায়। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, উদরাময়, ক্ষয়কাশ, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি সমস্ত রোগের জীবাণু এই ভাবে দূষিত ভূমির সাহায্যে ছড়াইতে পারে। ভূমি জীবাণুমুক্ত রাখিতে চাহিলে যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না, রাস্তার উপরে থুথু ফেলিবে না বা অন্য কোনরকম আবর্জনা জমিতে দিবে না।

সমাজকে ব্যাধিমুক্ত রাখিতে হইলে শুধু ভূমি নয়, আমাদের খাদ্য ও পানীয়ও নির্মল রাখা চাই। জলই হইল আমাদের সর্বপ্রধান পানীয়। পানীয় জল সর্বদাই বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। জল নানাভাবে দূষিত হইতে পারে। লোকে জলের ধারে বসিয়া কাপড় কাচে, স্নান করে, মলমূত্র ত্যাগ করে, কখনও বা পশু স্নান করায়, জলাশয়ের সন্নিকটে আবর্জনার স্তূপ জমাইয়া রাখে, তারপর বৃষ্টি-ধৌত হইয়া ঐসব আবর্জনা জলে মিশিয়া জল দূষিত করে। কাক, চিল ইত্যাদি প্রাণীও কখন কখন মাছের কাঁটা, মাংসের হাড়, পশুপাখীর মৃতদেহের নানা অংশ আনিয়া জলে ফেলিয়া জল দূষিত করে। পানীয় জলের পুষ্করিণী কিংবা কূপ যাহাতে উপরোক্ত কারণে দূষিত হইতে না পারে, সেজন্য জনসাধারণের সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। পানীয় জলের জন্য রিজার্ভ পুষ্করিণী ও কূপের ব্যবস্থা করিবে এবং জল সর্বদাই ফুটাইয়া পান করিবে। ফুটানো জল সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং এই জল পান করিলে টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ও কৃমিরোগ ইত্যাদি জলবাহিত ব্যাধিগুলি আক্রমণ করিতে পারে না। দূষিত পানীয়ের

মত দূষিত খাদ্যগ্রহণেও নানা রকম রোগ হইতে পারে। বাসী ও পচা মাছ, মাংস, ডিম কিংবা ফল খাইলে, রুগ্ন পশুপাখীর মাংস, রুগ্ন গরুর দুধ পান করিলে, মাছি ও কীটপতঙ্গের দ্বারা দূষিত আহার্য গ্রহণ করিলে, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বা জীবাণুবাহকদের স্পৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করিলে এবং নোংরা জলে ধৌত পাত্রে বা রোগীর ব্যবহৃত পাত্রে খাইলে নানাপ্রকার ব্যাধি হয়। এই সকল সর্বদা বর্জন করিয়া চলিবে।

(৩) নির্বীজন (Disinfection)—

(১) **সদ্য সদ্য নির্বীজন** (Concurrent disinfection)—কোন ব্যক্তি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে পরে তাহার মলমূত্র, থুথু ও বাসন পত্রাদি নির্বীজিত করার নামই সদ্য নির্বীজন। সংক্রামক রোগীর মলমূত্র, থুথু এবং ব্যবহৃত বস্ত্র ও বাসনের মধ্যে রোগের জীবাণু অদৃশ্যভাবে লাগিয়া থাকে। সুতরাং এই সমস্ত দ্রব্যাদি নিয়মিতভাবে নির্বীজিত না করিলে উহা সহজেই নিকটবর্তী লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সদ্য নির্বীজন তাই একান্ত প্রয়োজন।

(২) **পরিশেষ নির্বীজন** (Terminal disinfection)—রোগী আরোগ্য হইবার পরে কিংবা রোগীর মৃত্যু হইলে তাহার ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্যাদি নির্বীজন করা দরকার হইয়া পড়ে। রোগীর শয্যা, বস্ত্র, পুস্তকাদি নির্বীজিত করার চেয়ে একেবারে পোড়াইয়া ফেলা ভাল। রোগি-কক্ষ চুনকাম করিয়া ফেলিবে। তবে বসন্ত, যক্ষ্মা রোগে শুধুমাত্র চুনকাম করিলেই চলে না। এইসব ক্ষেত্রে ঘরের দেওয়াল ও মেঝে সম্পূর্ণ খুড়িয়া ফেলিয়া নতুন করিয়া প্লাস্টার করা উচিত।

(৩) এই সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি।

সংক্রামক ব্যাধি, তাহার বিস্তার ও প্রতিরোধ

সংক্রামক ব্যাধিবীজ (Communicable or Infectious disease)—যে সকল জীবাণুজনিত ব্যাধি এক ব্যক্তির দেহ হইতে আরেক ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে বলে সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধিগুলির মধ্যে কতকগুলি ব্যাধি ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে বিস্তার লাভ করে। উহাদিগকে বলে স্পর্শজ ব্যাধি (Contagious disease)।

কোন সংক্রামক ব্যাধি যদি একই কালে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ক্ষেত্র জুড়িয়া বহু ব্যক্তিকে আক্রমণ করে তবে তাহাকে **মারী** (Epidemic) বলে। মারী যদি বিশালক্ষেত্রে ভীষণ আকারে দেখা দেয় তবে তাহাকে **মহামারী** (Pandemic) বলে। 1957 সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভারত এবং জাপানে মারীরূপে দেখা দিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই রোগ মহামারীর করালরূপ ধরিয়া সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ব্যাধিবীজ—সকল প্রকার ব্যাধি সংক্রমণের মূলে রহিয়াছে অতি ক্ষুদ্র অণুতুল্য এক প্রকার প্রাণী। সাদা চোখে ইহাদের দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা কেবল ইহারা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের সংক্রমণহেতু শরীরের বিশেষ স্থানে কিংবা সমস্ত শরীর ব্যাপী রক্তে যে বিষক্রিয়া হয় তাহারই ফলে সুস্থ শরীরের অবস্থান্তর ঘটে এবং দেহে ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগুলিকে ব্যাধিবীজ (germs) বলে। এই ব্যাধিবীজগুলি ভূপৃষ্ঠে ও নিম্নস্তরের বায়ুমণ্ডলে বিরাজমান। জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে সর্বত্র ইহাদের অনায়াস গতি। তবে অতিরিক্ত উত্তাপ কিংবা অত্যধিক শীতলতা ইহারা সহ্য করিতে পারে না। ১০-১৫ মিনিট ফুটন্ত জলে থাকিলে ইহাদের অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অন্ধকার এবং স্যাঁতসেঁতে স্থান পাইলে কিংবা প্রতিরোধ-শক্তিহীন দেহে আশ্রয় পাইলে খুব দ্রুতগতিতে ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়।

মানবদেহে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণুদের প্রবেশপথ (Channel of Infection) তিনটি—

(১) মুখ, (২) শ্বাসপথ ও (৩) ত্বক্।

মুখ—কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি সকল জলবাহিত ব্যাধিসমূহ দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে আমাদের দেহে প্রবেশ করে।

শ্বাসপথ—রোগী কিংবা রোগবাহীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলে কিংবা তাহাদের হাঁচি, কাশি, শ্লেষ্মা ও জীবাণুদুষ্ট বায়ু ও ধুলিকণা শ্বাসপথে প্রবেশ করিলে রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করে। সর্দি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা, বসন্ত প্রভৃতির রোগজীবাণু এইভাবে দেহে প্রবেশের সুযোগ পায়।

ত্বক্—অ্যানথ্র্যাক্স, ধনুষ্টঙ্কার, গ্যাস-গ্যাংগ্রিন, জলাতঙ্কের ভাইরাস প্রভৃতি বিভিন্ন জীবাণু ত্বকের ভিতর দিয়া দেহে প্রবেশ করে। উহাদের উৎপাদিত বিষের প্রতিক্রিয়া প্রায়ই মারাত্মক হয়। এতদ্ব্যতীত ত্বকের উপর মশা, উপমক্ষিকা কিংবা অন্যান্য কীটের দংশনের ফলে জীবাণু রক্তে প্রবেশ করে।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গুজ্বর ইত্যাদি রোগের জীবাণু এইভাবে দেহে প্রবেশ করে।

রোগসংক্রমণ রীতি (Mode of Infection) মূলত চারিটি—

(১) প্রত্যক্ষভাবে—রোগী কিংবা রোগবাহীর সংস্পর্শ দ্বারা।

(২) পরোক্ষভাবে—খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে।

(৩) রোগজীবাণুবাহী পতঙ্গ—মশা, মাছি, উপমক্ষিকা প্রভৃতির দ্বারা।

(৪) জীবজন্তু—কুকুর, শূকর ইত্যাদির দ্বারা।

(১) **প্রত্যক্ষভাবে**—(ক) রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ দ্বারা সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। শয়ন, ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারে রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলে রোগজীবাণু সুস্থ ব্যক্তির দেহে বিভিন্ন পথে প্রবেশ করিয়া রোগ জন্মায়।

(খ) রোগবাহী দ্বারা—যাহারা রোগের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া দেহে রোগজীবাণু বহন করে তাহাদের রোগবাহী (carrier) বলে। রোগবাহী দুই প্রকারের—(১) সদ্য রোগমুক্ত, (২) রোগের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না অথচ রোগজীবাণু বহন করিতেছে। ডিপথিরিয়া, নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস, টাইফয়েড, কলেরা, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, বক্রকৃমি প্রভৃতি রোগ এইভাবে বাহকদের সাহায্যে ছড়ায়।

(গ) ত্বকের সংক্রামক ব্যাধি হইল খোসপাঁচড়া। খোসপাঁচড়ার জীবাণু রোগীর ত্বকে বাস করে এবং রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলে উহারা সুস্থ দেহে প্রবেশ করে।

(ঘ) রোগীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, হাঁচিকাশি, নিষ্ঠীবন প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুতে অসংখ্য রোগজীবাণু থাকে। রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিলে ঐ সকল জীবাণু শ্বাসপথে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। এইরূপ রোগকে শ্লেষ্মাবাহিত রোগ (Droplet infection) বলা হয়। সর্দি, হাম, বসন্ত, হুপিংকফ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া, মেনিঞ্জাইটিস, যক্ষ্মা প্রভৃতি শ্লেষ্মাবাহিত ব্যাধি নামে পরিচিত।

(২) **পরোক্ষভাবে** দূষিত খাদ্য ও পানীয় দ্বারা রোগবিস্তার হইতে পারে। মানুষের মলমূত্র ভূমিতে পড়িয়া ভূমি দূষিত করে। এইরূপ ভূমির উপর

হাঁটিলে বক্রকৃমি হইবার সম্ভাবনা থাকে। ভূমিবিধৌত জল আবার জলাশয়ে পড়িলে সেই জল দূষিত হয় এবং উহা পান করিয়া টাইফয়েড, কলেরা বা আমাশয় হইতে পারে।

বস্ত্রাদি, বাসনকোসন, রুমাল ইত্যাদির মধ্যে রোগজীবাণু কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং উহাদের দ্বারা রোগবিস্তার সম্ভব। কোন সুস্থ শিশু যদি ডিপথিরিয়া রোগীর কিংবা রোগবাহীর খেলনা, পেন্সিল ইত্যাদি ব্যবহার করে তবে তাহারও ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ধূলিকণার সঙ্গে আবার হাম, বসন্ত, সর্দি প্রভৃতির রোগজীবাণু মিশ্রিত থাকে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঐ ধূলিকণা সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিয়া ঐসব রোগ ছড়ায়।

(৩) **রোগজীবাণুবাহী পতঙ্গ,** যেমন—মশা, মাছি, উপমক্ষিকা, বালুমক্ষিকা, উকুন ইত্যাদির দ্বারা বিবিধ রোগের বিস্তার হয়। কোন্ কীট-পতঙ্গ কি কি রোগ ছড়ায় নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

মশা—ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, পীতজ্বর ও ডেঙ্গু।

উপমক্ষিকা—বিউবোনিক প্লেগ, টাইফাস ও কালাজ্বর।

উকুন—টাইফাস জ্বর ও ট্রেঞ্চ জ্বর।

গৃহমক্ষিকা—টাইফয়েড, কলেরা ও আমাশয়।

বালুমক্ষিকা—বালুমক্ষিকা জ্বর ও কালাজ্বর।

ইঁদুর—দংশনের ফলে ইঁদুরজাত পৌনঃপৌনিক জ্বর এবং মলমূত্রদ্বারা দূষিত খাদ্যে ফিতা কৃমি ও পাণ্ডুজ্বর।

(৪) **পশুদ্বারা রোগের বিস্তার—**

(১) গরু—গরুর দুধ হইতে গোজনিত যক্ষ্মারোগ সৃষ্টি হয়। অধিকপক্ক কিংবা অপক্ক গোমাংস আহারে ফিতা কৃমি এবং গরুর সংস্পর্শে অ্যানথ্রাক্স রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

(২) ঘোড়া—গরু ও ঘোড়ার অন্ত্রে টিটেনাস ব্যাসিলাস থাকে। ইহাদের মলদ্বারা দূষিত ধূলাবালি ক্ষতে সংক্রামিত হইলে টিটেনাস রোগ হয়।

(৩) শূকর—মাংস ভক্ষণে ফিতা কৃমি এবং মল হইতে গোল কৃমি হয়।

(৪) কুকুর—ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে জলাতঙ্ক (Hydrophobia), মল হইতে হাইডেটিড্ রোগ এবং দেহ হইতে দাদের সৃষ্টি হয়।

সংক্রামক ব্যাধি প্ররিরোধের উপায়

(Prevention of Communicable diseases)

সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ করিতে হইলে রোগবিস্তৃতির কারণগুলি জানিয়া লইয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে ঃ—

(১) প্রজ্ঞাপন (Notification);
(২) স্বতন্ত্রীকরণ ও নিরোধন (Isolation or Segregation);
(৩) অনাক্রম্যতা (Immunisation);
(৪) নির্বীজন (Disinfection);
(৫) জনশিক্ষার প্রসার (Health Education)।

(১) **প্রজ্ঞাপন** (Notification)—সংক্রামক ব্যাধির প্রসার বন্ধ করিতে হইলে প্রথমেই কর্তব্য হইল স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা হেলথ অফিসারকে সংবাদ দেওয়া ; ইহাকেই বলে প্রজ্ঞাপন (Notification)। পৌরসভার পরিচালক ও স্থানীয় চিকিৎসকদেরই এই সংবাদ দিবার দায়িত্ব লওয়া উচিত। এই সংবাদদানের উদ্দেশ্য ব্যাধির বিস্তার নিবারণ। রোগ হওয়ামাত্র সংবাদ পাইলে কর্তৃপক্ষ আসিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া সমস্ত লোক হইতে পৃথক্ (Isolate) করিয়া রাখিবে। ফলে সংক্রামক রোগের জীবাণু আর সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইবে না।

(২) **স্বতন্ত্রীকরণ** (Segregation or Isolation)—(ক) সংক্রামক ব্যাধি হইয়াছে টের পাইবামাত্র রোগীকে সমস্ত সুস্থ ব্যক্তি হইতে আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। গৃহে স্বতন্ত্র রাখিতে হইলে রোগীকে একটি পৃথক্ প্রকোষ্ঠে রাখিবে।

(খ) যে সমস্ত জিনিস রোগীর ব্যবহারে লাগিবে না তাহা সমস্তই পূর্বাহ্নে সরাইয়া ফেলিবে।

(গ) সর্বদা রোগীর ঘরের দরজা বন্ধ রাখিবে। নতুবা কার্বলিক অ্যাসিডের লোশন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নির্বীজিত করিয়া ঘরে পর্দা টাঙ্গাইবে।

(ঘ) বায়ু খেলিবার জন্য জানালা খোলা রাখিবে।

(ঙ) শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত অপর কেহ রোগীর ঘরে প্রবেশ করিবে না। নির্বীজক লোশন দিয়া হাত পা ধুইবে, আপন আপন বস্ত্রাদিও নির্বীজিত করিয়া লইবে। এমন সব বস্ত্র পরিধান করিবে যাহা সহজেই ফুটাইয়া লওয়া যায়।

(চ) নির্বীজক লোশন দিয়া বাসনপত্র না ধুইয়া কখনই রোগীর ঘরের বাহিরে আনিবে না।

(ছ) ভুক্তাবশিষ্ট ও মলমূত্রাদি ঘরে ঢাকিয়া রাখিবে এবং নির্বীজক লোশন ঢালিয়া দিবে। অবশেষে ঘরের বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

(জ) রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলে অর্থাৎ রোগ সংক্রামিত হইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে রোগীকে সাবান দিয়া ভাল করিয়া স্নান করাইবে এবং তাহার ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্য ভাল করিয়া নির্বীজিত করিয়া তবে তাহাকে অন্যের সঙ্গে মিশিতে দিবে।

(ঝ) ঘরে মশা, মাছি, আরশুলা ইত্যাদি ঢুকিতে দিবে না। যেগুলি ঢুকিয়া পড়িয়াছে সেগুলিকে মারিয়া ফেলিবে।

হাসপাতালে স্বতন্ত্রীকরণ—গৃহে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিলেও পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হয় না। বিশেষ করিয়া যাহারা বস্তী অঞ্চলে বাস করে তাহাদের ত কথাই নাই। সংক্রামক ব্যাধি হইলে তাই হাসপাতালে পাঠানই ভাল। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কলেরা, প্লেগ, বসন্ত ও মেনিঞ্জাইটিস রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য হাসপাতালে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

নিরোধন (Quarantine)—বিদেশ হইতে যাহাতে কোনরকমে সংক্রামক রোগের জীবাণু আসিয়া অপর একটি দেশে ছড়াইতে না পারে এইজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বা রোগের বাহক হইতে পারে এরূপ সন্দেহজনক ব্যক্তিদের আটক করিয়া রাখার নামই নিরোধন। নিরোধনও একরূপ স্বতন্ত্রীকরণ। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশের বড় বড় বন্দরগুলিতেই নিরোধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। অর্থাৎ বন্দরে আগত জাহাজগুলির লোকেদের ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া ঐ বন্দরে অবতরণ করিতে দেওয়া হইত না। এইরূপ ব্যাপক নিরোধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে যাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। আজকাল তাই নিজ নিজ দেশ ছাড়িবার পূর্বে ভ্রমণকারীরা কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি নানাবিধ সংক্রামক রোগ-নিবারক ইনজেকশান লইয়াছে কিনা এইটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়।

নিরোধন দুই প্রকারের—(১) **আভ্যন্তরীণ নিরোধন** (inward quarantine) এবং **বহির্মুখী নিরোধন** (outward quarantine)। (১) আভ্যন্তরীণ নিরোধন—সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যখন বহিরাগতদের

একটি দেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না তখন তাহাক বলে আভ্যন্তরীণ নিরোধন। (২) বহির্মুখী নিরোধন—পার্শ্ববর্তী দেশের লোকদের নিরাপত্তার জন্য যখন কোন একটি রোগগ্রস্ত দেশের লোকদের সেই দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে দেওয়া হয় না তখন তাহাকে বলে বহির্মুখী নিরোধন। উল্লিখিত দুই প্রকার নিরোধন ব্যতীত আরও একপ্রকার নিরোধন আছে। তাহাকে বলে স্থানীয় নিরোধন (domestic quarantine)।

স্থানীয় নিরোধন—একটি গৃহে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে যদি সেই বাড়ির লোকদের বাড়ির ভিতরে সংরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তবে তাহাকে স্থানীয় নিরোধন বলে।

চিকিৎসকরা আজকাল নানা কারণে নিরোধনকে রোগ সংক্রমণ বন্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন না। প্রথমত রোগীর যতদিন রোগসংক্রমণের ক্ষমতা আছে বলিয়া ধরা হয়, অনেক ক্ষেত্রে সেই সময় অতিক্রান্ত হইবার বহু পরেও সে রোগ সংক্রামিত করিতে পারে। তাই রোগীকে কিছুদিন আটক করিয়া সর্বত্র সমান ফল লাভ হয় না। দ্বিতীয়ত বেশী কড়াকড়ি করিতে গেলে উল্টা ফল হইবার সম্ভাবনা। অধিকাংশ লোকই রোগ লুকাইবার চেষ্টা করে।

(৩) **অনাক্রম্যতা** (Immunity)—আমাদের দেহের শোণিতে ব্যাধি-প্রতিরোধের এক সহজাত ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা না থাকিলে মানুষ নানাপ্রকার রোগের কবলে পড়িয়া অচিরে প্রাণ হারাইত। কৃত্রিম উপায়ে এই প্রতিরোধশক্তিকে আরও বাড়াইয়া তোলা যায়। আবার স্বাভাবিক নিয়মেও দেহে কোন ব্যাধি সংক্রামিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রোগের উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিরোধশক্তি জন্মায়। প্রতিরোধশক্তির চেয়ে কোন রোগজীবাণুর শক্তি বেশী হইলে তবেই আমরা সেই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হই। **দেহের এই রোগজীবাণু ধ্বংসকারী ক্ষমতার নাম অনাক্রম্যতা**। অনাক্রম্যতা দুই প্রকারের—সহজাত (natural) ও সংপ্রাপ্ত (acquired)।

সহজাত অনাক্রম্যতা (Natural immunity)—সহজাত বা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অনাক্রম্যতার তারতম্য অনুসারে দেহের রোগপ্রবণতা নির্ভর করে। এই শক্তির তারতম্য জন্মগত, জাতিগত অথবা ভৌগোলিক কারণেও ঘটিতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মুর্গীর কখনও ধনুষ্টঙ্কার হয় না। নিগ্রোদের কখনও পীতজ্বরে ভুগিতে দেখা যায় না।

সংপ্রাপ্ত অনাক্রম্যতা (Acquired immunity)—দেহে ব্যাধিবীজ প্রবেশ করিবার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে যখন অনাক্রম্যতার স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রসার ঘটিয়া থাকে তখন তাহাকে সংপ্রাপ্ত অনাক্রম্যতা বলে। ইহা আবার দুই শ্রেণীর—(১) সংপ্রাপ্ত স্বাভাবিক সক্রিয় অনাক্রম্যতা (Natural active acquired immunity)। আপনা হইতে দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়া অনাক্রম্যতা শক্তিকে সক্রিয় করিয়া তোলার নামই হইল সংপ্রাপ্ত স্বাভাবিক সক্রিয় অনাক্রম্যতা। টাইফয়েড, হাম, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগ হইলে দেহে এই উপায়ে অনাক্রম্যতা শক্তি সঞ্চারিত হয়। (২) সংপ্রাপ্ত কৃত্রিম সক্রিয় অনাক্রম্যতা (Artificial active acquired immunity)। শল্য সহকারে ব্যাধিবীজ শরীরে প্রবেশ করাইবার ফলে যে রোগপ্রতিরোধক শক্তি জন্মায় তাহাকে বলে সংপ্রাপ্ত কৃত্রিম সক্রিয় অনাক্রম্যতা। ইহার অপর নাম টিকা লওয়া। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের এইরূপ রোগপ্রতিষেধক টিকা দিয়া কৃত্রিম উপায়ে অনাক্রম্যতা শক্তিকে সতেজ ও সক্রিয় করিয়া তোলা হয়।

টিকা (Vaccination) **ও ইনজেক্‌শান** (Inoculation)—ইংলণ্ডের গ্রাম্য লোকেরা বিশ্বাস করিত যে একবার ইচ্ছা বসন্তের আক্রমণ হইলে পুনর্বার বসন্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই সূত্র ধরিয়া ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক এক বালকের দেহে গো-বসন্তের-বীজ প্রয়োগ করেন। জেনারের আশা ব্যর্থ হইল না। ঐ বীজের প্রভাবে বালকটির শরীরে যে প্রতিক্রিয়া হইল তাহাতে দেখা গেল তাহার দেহে ইচ্ছা বসন্ত প্রতিষেধক অনাক্রম্যতা শক্তি সৃষ্টি হইয়াছে। জেনারের গবেষণার আশ্চর্য ফল ফলিয়াছে! আজকাল ব্যাপকভাবে টিকা দিয়া ইচ্ছা বসন্তের আক্রমণ সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হইতেছে। এমন কি, যাহারা রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিতেছে তাহারাও টিকা দিয়া বসন্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। ল্যাটিন ভাষায় Vacca শব্দটির অর্থ হইতেছে গরু। গোবসন্তের বীজ হইতে টিকা প্রস্তুত হয় বলিয়া বসন্তের টিকার নামকরণ হইয়াছে Vaccination এবং অন্যান্য সকল রোগের টিকাকে inoculation বলা হইয়া থাকে।

সিরাম ইনজেক্‌শান—আরেক প্রকারের অনাক্রম্যতা রহিয়াছে। উহার নাম নিষ্ক্রিয় সংপ্রাপ্ত অনাক্রম্যতা (Passive acquired immunity)। কৃত্রিম উপায়ে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় বিশেষ বিশেষ ব্যাধিবীজ প্রাণিদেহে প্রবেশ করাইলে

তাহার রক্তমস্তুতে (serum) বিশেষ বিশেষ রোগের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি আবির্ভূত হয়। এই শক্তিসম্পন্ন রক্তমস্তু মানুষের দেহে ইনজেক্‌শান করিয়া প্রবেশ করাইলে সেই রোগ-নিবারক বা নিয়ন্ত্রক অনাক্রম্যতার সৃষ্টি হয়। ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথিরিয়া, মেনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ও চিকিৎসা চলে এইভাবে।

রাসায়নিক ও জীবজ প্রতিষেধক—উপরোক্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দেহের অনাক্রম্যতা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই দেহকে রোগবীজের হাত হইতে রক্ষা করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। দেহপ্রবিষ্ট রোগবীজকে নিষ্ক্রিয়, নিয়ন্ত্রিত কিংবা ধ্বংস করিবার অন্যান্য উপায়ের মধ্যে অধুনা আবিষ্কৃত **রাসায়নিক ও জীবজ ঔষধগুলি** সর্বাপেক্ষা কার্যকর। রাসায়নিক ঔষধগুলির মধ্যে সালফার (Sulphonamide বা Sulpha) প্রবর্তন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সালফা অতি শক্তিশালী ঔষধ। ইহা দেহস্থিত রোগবীজকে নাশ করিতে পারে না বটে কিন্তু ইহার প্রভাবে দেহের মধ্যে বীজগুলির বংশবৃদ্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়া রোগের বিস্তার সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যে দেহের অনাক্রম্যতা শক্তি আসিয়া বীজের ধ্বংসসাধন করে ও দেহ রোগমুক্ত হয়। নিউমোনিয়া, মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ড অধিকারী জ্বর (cerebro spinal fever), বিষাক্ত ব্রণ ও ক্ষত, কর্ণের অভ্যন্তর-প্রদাহ, রক্ত আমাশয়, মূত্রযন্ত্রের সংক্রমণ, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে সালফা অতিশয় কার্যকরী।

জীবজ ঔষধের (antibiotics) আবিষ্কার এক স্মরণীয় ঘটনা। 1928 সালে প্রফেসার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কর্তৃক আবিষ্কৃত পেনিসিলিনই সর্বপ্রথম জীবজ ঔষধ। লণ্ডনের এক হাসপাতালে স্ট্যাফাইলোক্‌কাস্ রোগবীজ লইয়া গবেষণাকালে ফ্লেমিং একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন যে একজাতীয় ছাতা (Penicillium notatum) পড়ার ফলে পরীক্ষাপাত্রস্থিত বীজাণু উপনিবেশগুলি স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। তিনি এই ছাতাকেই বীজাণু ধ্বংসের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। Penicillium notatum হইতে উদ্ভূত বলিয়া ফ্লেমিং ইহার নামকরণ করেন পেনিসিলিন। পেনিসিলিনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ক্রমে অরিয়োমাইসিন (Aureomycin), স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycine), ক্লোরোমাইসিটিন (Chloromycetin) প্রভৃতি অন্যান্য জীবজ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও অবশ্য ক্লোরোমাইসিটিন প্রস্তুত হইতেছে। পূর্বে যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি

দুরারোগ্য ব্যাধিগুলি চিকিৎসার কোন উপায় ছিল না। এখন সে সমস্যা নাই। সালফা দ্বারা যে সব রোগ আরোগ্য হয় antibiotic দ্বারাও সেই সব রোগ আরোগ্য হয়। উপরন্তু সালফা যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে সেইক্ষেত্রে antibiotic কার্যকর হইতেছে।

জীবজ ঔষধ প্রয়োগে সাবধানতা—জীবজ ঔষধগুলি প্রয়োগ করিলে প্রতিরোধশক্তিসম্পন্ন নতুন শ্রেণীর রোগবীজাণু দেহ আশ্রয় করে। সেইজন্য বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত ক্ষেত্রে যেখানে রোগবীজাণুর কোন তীব্র আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় থাকে না কেবলমাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই ইহাদের প্রয়োগ করা উচিত। নতুবা প্রতিরোধশক্তি বিশিষ্ট নতুন নতুন ব্যাধিবীজ সৃষ্টির সহায়তা করিয়া চিকিৎসকগণ এই অমূল্য ঔষধগুলির কার্যকারিতা হরণ করিবেন এবং ফলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হইবে।

(৩) **নির্বীজন** (Disinfection)—রোগবীজের ধ্বংসসাধনকে **নির্বীজন** বলা হয়। নির্বীজন প্রক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য হইল বীজগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা অথচ মানবদেহকে নির্বীজনের উপাদানের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা। দেহের বাহিরেই সাধারণত ব্যাধিবীজের ধ্বংসাধন করিতে হয়। সম্পূর্ণ ধ্বংস যেখানে সম্ভব হয় না সেখানে বীজের বংশবৃদ্ধি, বিস্তার ও বিষক্রিয়াকে নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। দেহাভ্যন্তরে এই ধ্বংসাধন, প্রশমন বা নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ঔষধ সাহায্যে হইয়া থাকে। পেনিসিলিন ইত্যাদি জীবজ ও **নির্বিষক** (anti-toxin) এই ঔষধগুলির মধ্যে প্রধান। দেহের ক্ষতস্থানকে নির্বীজন করিবার জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করা হয় তাহাকে **ক্ষত সংক্রমণ নিরোধক** (antiseptic) বলা হয়। লর্ড লিস্টার নামে একজন ইংরেজ অস্ত্র চিকিৎসক এই শেষোক্ত পদ্ধতির উদ্ভাবক। লুই পাস্তুর কক-এর জীবাণু-তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসেন যে রোগবীজ সংক্রমণের ফলেই অস্ত্রোপচারের ক্ষত শীঘ্র সারিয়া ওঠে না। এই সিদ্ধান্তের বশে তিনি অস্ত্রোপচার কক্ষ, অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত যাবতীয় বস্তু, রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্র এবং অস্ত্রোপচারকারীর হাত জীবাণু নিরোধক প্রক্রিয়ায় জীবাণু সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উপদেশ দেন। তাঁহার উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে কার্বলিক অ্যাসিডই জীবাণুনাশক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। পরে এই পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়। বর্তমানে হাসপাতালগুলিতে অস্ত্রোপচারকে সম্পূর্ণরূপে সংক্রমণশূন্য করিবার বহু বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত

হইতেছে। অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত পদার্থগুলিকে নির্বীজ করিবার জন্য অধিকতর বায়ুচাপবিশিষ্ট বাষ্পযন্ত্রের (sterilizer) মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়।

রোগ-বীজধ্বংসী নির্বীজন : রোগবীজ-ধ্বংসী নির্বীজন (Disinfection) প্রণালীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) **প্রাকৃতিক উপাদান** সাহায্যে নির্বীজন (Disinfection by natural agents)—মুক্ত বায়ু ও সূর্যরশ্মি বীজাণুনাশক। রৌদ্র ও আলোবাতাসহীন বাসগৃহই ব্যাধিবীজের রাজধানী।

(২) **ভৌতিক উপাদান** সাহায্যে নির্বীজন (Disinfection by physical agents)—ফুটন্ত জলে বা ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত জলে ১৫-২০ মিনিট থাকিলে প্রায় সকল ব্যাধিবীজই বিনষ্ট হয়। ফুটন্ত জলে রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র শোধিত করিয়া লওয়া সর্বাপেক্ষা সুলভ নির্বীজন পদ্ধতি। উষ্ণ বাষ্পও বীজাণুনাশক। ইহাও অপেক্ষাকৃত সুলভ পদ্ধতি।

(৩) **রাসায়নিক উপাদান** সাহায্যে নির্বীজন (Disinfection by chemical agents)—এই উপাদানগুলি কঠিন তরল বা গ্যাসজাতীয় হইতে পারে। কঠিন উপাদানের মধ্যে সাধারণ চুন বেশ সুলভ। দেওয়ালে মাঝে মাঝে চুনকাম করা গৃহের ব্যাধিবীজ নিবারণ প্রণালীর অন্যতম। আলকাতরাজাত রাসায়নিক বীজনাশক উপাদানের মধ্যে লাইজল (Lysol), ফিনল (Phenol) ও ক্রিজল (Cresol) প্রধান। জলের সহিত বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ইহাদের দ্রবের (Solution) মধ্যে সংক্রামিত বস্ত্র ডুবাইয়া রাখিয়া নির্বীজিত করা হয়। ফরম্যালডিহাইড (formaldehyde) গ্যাস প্রয়োগে সংক্রমিত কক্ষ ও আবদ্ধ স্থানকে বিশুদ্ধ করা হয়। কোথাও কোথাও গন্ধক পোড়াইয়াও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। গ্যাস প্রয়োগে আবদ্ধ স্থানকে নির্বীজিত করার নাম ফিউমিগেশান (fumigation)। ১০% ফরমালিন (formalin) দ্রবে ডুবাইয়া রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য বা মলমূত্র, থুথু ইত্যাদি নির্বীজ করিতে পারা যায়।

নির্বীজন দুই প্রকারের—(১) সঙ্গ সঙ্গ নির্বীজন এবং (২) পরিশেষ নির্বীজন। (231 পৃষ্ঠা দেখ।)

(৫) **জনশিক্ষার প্রসার**—সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা সকলেরই জানা উচিত। প্রথমত সমস্ত সংক্রামক ব্যাধি কিন্তু ঠিক একভাবে ছড়ায় না। ম্যালেরিয়া এবং কলেরা উভয়ই সংক্রামক ব্যাধি কিন্তু একটির বাহক মশা এবং অপরটির বাহক মূলত মাছি। মাছি এবং মশার অভ্যাস আবার সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের উপায় যে কলেরা প্রতিরোধের উপায় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবে একথা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয়ত যে কোন একটি সংক্রামক ব্যাধিও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ছড়াইতে পারে। যেমন, ডিপথিরিয়া রোগটি আক্রান্ত ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসিবার ফলে ছড়াইতে পারে, আবার গরম দুধও ডিপ-থিরিয়ার বাহন হইতে পারে। মোটকথা কিসের মাধ্যমে রোগ সংক্রামিত হইতেছে সেই সম্বন্ধে পূর্ব ধারণা না থাকিলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায় না।

সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিবে জীবাণুবাহক কীটপতঙ্গ নিকটে উপস্থিত হইয়াছে কিনা। উহাদের কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। রোগীর খাদ্য, মলমূত্রাদি সম্বন্ধে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করিবে। বস্তিগুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন থাকিবে। বস্তিতে একবার সংক্রামক ব্যাধি হইলে আর নিস্তার নাই। অতি অল্প সময়েই উহা সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গেও জীবাণু নির্গত হয়। একের রোগ যাহাতে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে তাই এক রোগী হইতে অপর রোগীকে যথাসম্ভব দূরে রাখিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে Cerebro-spinal জ্বরে রোগীদের তিন ফুট অন্তর রাখিলেই চলে, ডিপথিরিয়া রোগীদের নয় ফুট এবং হাম রোগীদের ১২ ফুট দূরে রাখিতে হয়। বাড়িতে কাহারও সংক্রামক ব্যাধি হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র রাখিবে। মলমূত্র, কফ, থুথু ইত্যাদি জীবাণুযুক্ত বলিয়া গণ্য করিবে এবং যথাযথ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিবে। সম্ভব হইলে রোগীর ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্য পোড়াইয়া ফেলিবে। জলসরবরাহের স্থানের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। পানীয় জল সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা অবশ্যই ফুটাইয়া পান করিবে। দুগ্ধকেন্দ্রগুলি হইতে রোগ সংক্রামিত হইতেছে বলিয়া সন্দেহ হইলে দুগ্ধপাত্র খুব পরিষ্কার রাখিবে এবং জাল দিবার পূর্বে পাত্রটি সর্বদা বিশুদ্ধ জল দিয়া ধুইয়া লইবে। সরবরাহ কেন্দ্রে কিভাবে দুধ রাখা হইতেছে এবং সেখানকার

লোকেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়ম কতখানি মানিয়া চলিতেছে সেই সম্বন্ধে খোঁজ লইবে।

তবে কেবলমাত্র **ব্যক্তিগত শিক্ষায়** সংক্রামক রোগের প্রসার বন্ধ হয় না। তার সঙ্গে চাই সমাজগত ও জাতিগত শিক্ষা।

সমাজগত শিক্ষা—মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যদি শুধু স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলে, তবে সেই ক্ষেত্রে অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা সংক্রামক ব্যাধি একেবারে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িবে। ধর, গ্রামে একটি রিজার্ভ পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীর জল কেবলমাত্র পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা হইবে এবং স্নান করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদি সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। দেখিবে অজ্ঞ লোকেরা লোকচক্ষুর অগোচরে সমস্ত নিষিদ্ধ কাজগুলি করিয়া যাইতেছে। পল্লীঅঞ্চলে এই ভাবেই কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ ছড়ায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার বহুল প্রচার করিয়া জনগণের অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। অবশ্য সরকারী প্রচেষ্টা ভিন্ন মুষ্টিমেয় উদ্যোগী লোক এই কাজ করিয়া উঠিতে পারিবে না। গ্রামে গ্রামে গিয়া সিনেমা দেখাইয়া, বক্তৃতা করিয়া সংক্রামক ব্যাধির গুরুত্ব জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যাধির মরসুমের পূর্বে প্রবলভাবে প্রচার কার্য চালাইয়া যাইতে হইবে এবং কোন গ্রামে পানীয় জলের জন্য নির্দিষ্ট জলাশয় ও কূপে সতর্ক পাহারা রাখিয়া লোককে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে যে পানীয় জল, খাদ্য ইত্যাদি দূষিত না হইলে রোগজীবাণু প্রসারলাভ করিতে সুবিধা পায় না।

জাতিগত শিক্ষা—ব্যক্তি ও সমাজ-চেতনা ভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের জাতিগত চেতনারও দরকার আছে। যাবতীয় ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য জাতিসংঘ এক আন্তর্জাতিক সংস্থাও (WHO) গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেকটি সভ্য জাতিই আজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে। যে জাতি স্বাস্থ্য-বিধি সম্বন্ধে যত সচেতন ও সতর্ক থাকিবে সেই জাতি তত কর্মক্ষম ও সাহসী হইয়া উঠিবে। কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া আজ আমাদের ভারতীয় জাতির সামনে এক উদ্যত খড়্গের মত। জাতীয় চেতনা না জাগাইয়া তুলিতে পারিলে আমাদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ বাড়ানোও কঠিন হইয়া পড়িবে।

কতিপয় সংক্রামক ব্যাধির কারণ ও উহাদের প্রতিকার

সংক্রামক ব্যাধিগুলি মোটামুটি চার শ্রেণীর—

(১) জলবাহিত,

(২) বায়ুবাহিত,

(৩) কীটপতঙ্গবাহিত এবং

(৪) চর্মরোগ।

(১) **জলবাহিত ব্যাধি** (Water-borne diseases)—জলবাহিত ব্যাধিগুলির মধ্যে আমাশয়, কলেরা এবং টাইফয়েডই প্রধান।

আমাশয় (Dysentery)—আমাশয় একটি পানীয়বাহিত পেটের পীড়া-বিশেষ। ইহা কতকগুলি উপসর্গ লইয়া আসে। মলের সঙ্গে মিউকাস ও রক্ত পড়া, দৌর্বল্য, পেট কামড়ানো, ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা ও তৃষ্ণাবোধ আমাশয়ের প্রধান উপসর্গ। আমাশয় দুই প্রকারের—ব্যাসিলারি (Bacillary) ও এমিবাজনিত আমাশয় (Amaebic)।

ব্যাসিলারি আমাশয়ঃ রোগের কারণ—Bacillus Dysenteriae নামক ব্যাধিবীজ সংক্রমণের ফলে এই রোগ জন্মায়। প্রকার ভেদে ব্যাসিলারি আমাশয় দুই প্রকার—শিগা ও ফ্লেক্সনার।

রোগের লক্ষণ—ঘন ঘন মলত্যাগ, মলের সঙ্গে খুব তাজা টকটকে রক্ত ও মিউকাস এই রোগের লক্ষণ সূচনা করে। জর, দৌর্বল্য ইত্যাদি উপসর্গও থাকে। সাধারণত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আমাশয় রোগটি দ্রুত সংক্রামিত হইয়া থাকে।

রোগ সংক্রমণ—(১) রোগীর মলের মধ্যে ব্যাসিলারি আমাশয়ের জীবাণু থাকে। এই জীবাণু খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে আমাদের পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। দূষিত জলই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাশয় সংক্রমণে সহায়তা করে।

(২) আমাশয় রোগ বিস্তারে মাছি একটি প্রধান বাহক। রোগীর মলমূত্রে বসিয়া মাছি রোগের জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাদ্যের উপর বসে। ঐ খাদ্য খাইয়া আমরা আমাশয় রোগে আক্রান্ত হই।

(৩) ধুলাবালির মধ্যেও অনেক সময় আমাশয়ের জীবাণু থাকে। ঐ ধুলা খাদ্যে উড়িয়া আসিয়া খাদ্য জীবাণুদুষ্ট করে।

(৪) হাসপাতালের চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীদের অসাবধানতায়ও আমাশয় রোগ ছড়াইয়া থাকে। আমাশয় রোগীর ব্যবহৃত এনিমা সিরিঞ্জ

ভালভাবে নির্বীজিত না করিয়া অপর রোগীকে ব্যবহার করিতে দিলে শেষোক্ত ব্যক্তির আমাশয় হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৫) আমাশয় রোগ বাহকের (carrier) মারফৎও সংক্রামিত হইয়া থাকে। আমাশয় বিস্তৃতির যতগুলি কারণ আছে উহাদের মধ্যে বাহকই হইল সবচেয়ে মারাত্মক। ইহারা স্কুল, কলেজ, জেলখানা ইত্যাদি স্থানে থাকিয়া কখনও বা বাড়ির ভৃত্য, পাচক হিসাবে নিযুক্ত হইয়া সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা ও পানভোজন করে। ঐ বাহকদের মলে, হাতে এবং হাতের নখে অদৃশ্যভাবে রোগজীবাণু লাগিয়া থাকে এবং খাদ্য ও পানীয়ের মধ্য দিয়া রোগ বিস্তার করে।

চিকিৎসা—অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ইহাও এখন সাল্‌ফা ও এন্টিবায়োটিক ঔষধের আয়ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে। সাল্‌ফাগুয়ানিডিন ট্যাবলেট. সাল্‌ফাসাকসিডিন,সাল্‌ফাডায়োজিন, সাল্‌ফামেজাথিন,স্ট্রেপটোমাইসিন ট্যাবলেট, সেরাম ইন্‌জেকশান প্রভৃতি ঔষধ এই রোগের মহৌষধ। শিগা এবং ফ্লেক্সনার জীবাণুঘটিত আমাশয়ের পথ্য আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিগা ব্যাসিলারিতে কেবল কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য, যেমন—এরারুট, বার্লি বা গ্লুকোজের জল দিতে হয় এবং সব রকম প্রোটিন বন্ধ করিয়া দিতে হয়। পরন্তু ফ্লেক্সনার জাতীয় ব্যাসিলারির পথ্য ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রোটিন-প্রধান এবং কার্বোহাইড্রেটবর্জিত।

প্রতিরোধের উপায়—এই রোগ পানীয়বাহিত ব্যাধি। সুতরাং পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রোগ প্রতিরোধের পক্ষে অপরিহার্য। মাছি এবং ধুলাবালির মধ্য দিয়াও রোগ ছড়ায়। এইজন্য খাদ্য ও পানীয়কে উহাদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। গৃহে আমাশয় রোগী থাকিলে তাহাকে স্বতন্ত্র রাখিবে, রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও মলমূত্র নির্বীজিত করিয়া অপসারণের ব্যবস্থা করিবে। কাহারও কোষ্ঠকাঠিন্যের ধাত থাকিলে মাঝে মাঝে বেলের সরবত বা লিকুইড প্যারাফিন কিংবা অন্য কোন রেচক ঔষধ দিবে। নতুবা ঐ ব্যাধির পরিণামে আমাশয় দেখা দিতে পারে।

এমিবাজনিত আমাশয় (Amaebic Dysentery)—এন্ট-এমিবা হিস্টোলিটিকা শরীরের মধ্যে প্রধানত কোন খাদ্যসামগ্রী বা পানীয়ের সঙ্গে প্রবেশ করিয়া বৃহৎ অন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া এমিবা আমাশয় ঘটায়। গ্রীষ্মপ্রধান

দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই রোগের আবির্ভাব হইলে প্রথমে তরল মল কয়েকবার নির্গত হইয়া পরে স্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিলেও উহার সহিত বাদামী বা লালচে রংয়ের মিউকাস বাহির হয়। এমিবা আমাশয়ের আর একটি কাজ হইল অন্ত্রনালীতে ক্ষত সৃষ্টি করা। এই ক্ষত বিস্তৃত হইয়া মাংসপেশীসমূহ পচাইতে শুরু করে।

রোগ-লক্ষণ—প্রথমে প্রত্যহ ৪।৫ বার তরল দাস্ত হয়, পরে দুর্গন্ধযুক্ত মিউকাস ও উহার সঙ্গে সামান্য রক্তের ছিটা দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও এই রোগে ব্যাসিলারি আমাশয়ের মত জ্বর, পেটে বেদনা ও মলের সহিত অল্প মিউকাস ও রক্ত মিশ্রিত তরল দাস্ত হইতে দেখা যায়। সন্দেহ হইবামাত্র মল পরীক্ষা করাইয়া চিকিৎসা করান উচিত। নতুবা এই আমাশয় গুরুতর আকার ধারণ করিলে ইহা হইতে এপেণ্ডিসাইটিস, কলিসিষ্টাইটিস কিংবা পেরিটোনাইটিস রোগ সৃষ্টি হইতে পারে।

রোগ-সংক্রমণ—(১) ব্যাসিলারি আমাশয়ের মতই এই রোগ প্রধানত খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে আমাদের দেহে প্রবেশ করে।

(২) মাছিই হইল রোগবিস্তৃতির প্রধান সহায়ক।

(৩) ধূলাবালির মধ্যে রোগের জীবাণু থাকে।

(৪) হাসপাতালের অসতর্ক শুশ্রূষাকারিণীরাও রোগ ছড়াইয়া থাকে।

(৫) ব্যাসিলারি আমাশয়ের মত এমিবিক আমাশয়েরও বাহক (carrier) থাকে। তবে এই বাহকরা ব্যাসিলারি আমাশয়ের বাহকদ্বয়ের চেয়েও মারাত্মক। জীবনে অন্তত একবার আক্রান্ত না হইলে কোন ব্যক্তি ব্যাসিলারির বাহক হইতে পারে না, কিন্তু একবারও আক্রান্ত না হইয়া এমিবার বাহক হইতে পারা যায়। ব্যাসিলারির বাহক খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নয়, কিন্তু এমিবার বাহক বাহির করা কঠিন।

প্রতিরোধের উপায়—(১) পরিচ্ছন্নতাই হইল রোগ নিবারণের একমাত্র উপায়। রান্নাঘর ও পায়খানা সর্বদা ঝকঝকে পরিষ্কার রাখিবে।

(২) জল সর্বদা ফুটাইয়া পান করিবে। খাদ্যদ্রব্যে মাছি বসিতে কিংবা ধুলা জমিতে দিবে না।

(৩) ভৃত্য ও পাচকদের মল মাঝে মাঝে পরীক্ষা করাইয়া লইবে, কারণ তাহারা রোগের বাহক হইতে পারে।

ব্যাসিলারি ও এমিবিক আমাশয়ের প্রভেদ

ব্যাসিলারি	এমিবিক
(১) মহামারীরূপে (epidemic) দেখা দেয়।	(১) সর্বব্যাপী এবং সর্বকালীন। তবে বর্ষায়ই রোগের আধিক্য ঘটে।
(২) পায়খানার বেগ প্রবল। দিনে ৪০-৫০ বার পর্যন্ত হইতে পারে।	(২) পায়খানার বেগ তেমন প্রবল নয়। দিনে ১৬ বারের বেশী নয়।
(৩) মলে দুর্গন্ধ নাই।	(৩) মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।
(৪) তাজা লাল টকটকে রক্ত। মলের পরিমাণ খুব কম।	(৪) মলে রক্তের ছিট পাওয়া যায়। মলের পরিমাণ খুব বেশী।
(৫) সুচিকিৎসায় আরোগ্যলাভ সম্ভব।	(৫) দুরারোগ্য।

কলেরা (Cholera)—কলেরা এক জাতীয় মারাত্মক ও সংক্রামক উদরাময়।

রোগ-লক্ষণ—ভেদবমি, হাত পায়ের খিঁচুনি, প্রস্রাব বন্ধ ও গভীর শারীরিক অবসাদ কলেরার প্রধান উপসর্গ। ঘন ঘন মলত্যাগ ও বমির জন্য রোগীর পিপাসা মিটিতে চায় না। রোগী ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়ে, ত্বক্ বিবর্ণ হইয়া যায়, মুখ চুপসাইয়া যায়, আঙুলের চর্ম কুঞ্চিত হয় এবং দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিকরূপে নামিয়া যায়। ঠিক সময় চিকিৎসা শুরু না হইলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

রোগের কারণ—Vibrio Cholerae নামক একপ্রকার জীবাণুর সংক্রমণের ফলে কলেরার সৃষ্টি হয়। এই জীবাণু দেখিতে অনেকটা ইংরাজী কমা চিহ্নের মত, তাই ইহাকে কমা ব্যাসিলি (comma bacilli) বলে। ইহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষণজীবী। সূর্যালোক ইহারা সহ্য করিতে পারে না। ফুটন্ত জল বা নির্বীজক রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে ইহারা সহজেই বিনষ্ট হয়। তবে অক্সিজেনের অভাবেও ইহারা বাঁচিতে পারে। ঠাণ্ডায় ইহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। এমন কি বরফের মধ্যেও কলেরা জীবাণু বাঁচিতে দেখা যায়। দেহে কলেরার জীবাণু প্রবেশের পথ (channel of infection) হইল মুখ। খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে বিশেষ করিয়া জলের সঙ্গে কলেরার জীবাণু মুখের ভিতর দিয়া শরীরে প্রবেশ করে। **উপ্তাবস্থা**—১-৫ দিন।

রোগ-সংক্রমণ (mode of infection)—(ক) মানুষের মেলামেশা—মানুষই কলেরার জীবাণু সংক্রামিত করে। সাধারণত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা

নদীপথ ও রেলপথে রোগজীবাণু এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া যায়। মানুষ যদিও কলেরা ছড়ায় তথাপি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাইলে উহা দ্রুত প্রসারলাভ করিবার সুযোগ পায়। এইজন্য সাধারণত রথে ও মেলায় কলেরা রোগটি দ্রুত সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহার দ্রুত বিস্তৃতি পরিবেশের উপরই নির্ভর করে।

(খ) বাহক (carriers)—কখনও কলেরা হয় নাই এরূপ ব্যক্তিরা কলেরা ছড়াইতে পারে কিনা তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কোন কোন চিকিৎসক বিশ্বাস করেন যাহারা নিজেরা কলেরায় ভোগে নাই তাহাদের মলদ্বারাও পুষ্করিণীর জল দূষিত হইতে পারে। আবার কাহারও মতে শুধুমাত্র রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরাই (sufferers) রোগ ছড়াইতে পারে, তথাকথিত বাহকদের (carriers) এই ক্ষমতা নাই।

(গ) পানীয় জল—পানীয় জলের সাহায্যে রোগজীবাণু ছড়ায় সবচেয়ে বেশী। আমাদের দেশে পুষ্করিণী, দীঘি ও কূপের নিকটে বসিয়া ময়লা কাপড় কাচার প্রচলন আছে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বস্ত্রাদি পুষ্করিণী কিংবা কূপের জলে ধুইলে রোগের জীবাণু গিয়া জলে মিশ্রিত হয় এবং পরে ঐ দূষিত জল ভাল করিয়া নির্বীজিত না করিয়া পান করিলে কলেরা হইবেই।

(ঘ) দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্য—দুধ কেবল কলেরার জীবাণু বহন করে না, দুধের মধ্যে কলেরার জীবাণু বাড়িবার সুযোগ পায়। সাধারণ পুষ্করিণী বা ডোবার দূষিত জল মিশাইবার ফলে দুধের মধ্যে রোগজীবাণু প্রবেশের সুযোগ পায় এবং ঐ দুধ পান করিলে কলেরা হয়। আবার দূষিত জল দিয়া দুগ্ধপাত্র ধুইলেও দুধে জীবাণু আসিতে পারে।

(চ) কীটপতঙ্গ—রোগ সংক্রামিত হইবার প্রধান বাহক হইল মাছি। মাছি কলেরা রোগীর ভেদবমিতে বসিয়া জীবাণু সংগ্রহ করে এবং সেই জীবাণু লইয়া আমাদের অনাবৃত খাদ্যে বসে। এই কারণে মেলা ও বাজারের উন্মুক্ত খাবার খাইয়া লোকের কলেরা হয়।

চিকিৎসা—অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় এই ক্ষেত্রে সালফা-প্রমুখ রাসায়নিক ঔষধ ও ক্লোরোমাইসিটিন, স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি জীবজ ঔষধ যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। ভেদবমির সহিত দেহের জল ও লবণজাতীয় পদার্থ প্রভূত পরিমাণে বাহির হইয়া যায় বলিয়া দেহের ঐ ক্ষয় নিবারণের জন্য ক্ষার ও লবণ সংমিশ্রিত দ্রবণ (Alkaline Saline Solution) রোগীর শিরায় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়।

প্রতিরোধের উপায়—কলেরা রোগ হইতে রক্ষা পাইবার সর্বপ্রধান উপায় হইল টিকা লওয়া। এই টিকার অনাক্রম্যতা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। এইজন্ম বারবার এই টিকা লওয়া উচিত। তবে এই রোগটি প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তির এবং সমষ্টির সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।

ব্যক্তিগত সাবধানতা—(১) পেটে কোনরূপ গোলমাল বা বদহজমের সূত্রপাত হইলে তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে, কারণ তীব্র উদরাময় কিংবা হজমের গোলমালই শেষে কলেরায় পর্যবসিত হইতে পারে।

(২) যে ধরনের খাদ্য হজমের গোলমাল ঘটাইতে পারে তাহা সর্বদা বর্জন করিয়া চলিবে। কাঁচা বা বেশী পাকা ফল, পচা, বাসি ও উন্মুক্ত খাবার এবং খোলাযুক্ত মাছ (fish with scale) খাইবে না।

(৩) পেট কখনো খালি রাখিবে না।

(৪) রেলগাড়িতে ভ্রমণের সময় রাস্তার খাদ্য ও পানীয় বর্জন করিয়া চলিবে। ঠাণ্ডা পুডিং, আইসক্রীম, সদ্য তৈয়ারী সোডাওয়াটার পরিহার করিবে। তবে প্রয়োজনবোধে রাস্তায় ঘাটে হাল্কা চা (light tea), লেবুর রস, দই ও ডাবের জল নির্ভয়ে খাওয়া যাইতে পারে।

(৫) পানীয় জল সর্বদা নির্বীজিত করিয়া লইবে, দুধ ফুটাইয়া পান করিবে এবং বাসনপত্রের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিবে।

(৬) গৃহে মলমূত্র নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে, কারণ মলের মধ্য দিয়া রোগজীবাণু নির্গত হয়।

সাধারণের কর্তব্য—কোথাও কলেরা হইয়াছে সংবাদ পাইবামাত্র নিকটবর্তী স্বাস্থ্যবিভাগীয় অধিকর্তাকে খবর দিবে এবং রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবে। পানীয় জলের কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি যাহাতে কেহ জীবাণুদুষ্ট করিতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। রথ এবং মেলায় যাহাতে কোনরূপ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হইতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং রথ ও মেলার অন্তত প্রায় সাতদিন পূর্বে জনসাধারণের মধ্যে টিকা দিবার ব্যবস্থা করিবে। এতদ্ব্যতীত মেলার লোকদের জন্ম উপযুক্ত স্নানাগার ও পায়খানার ব্যবস্থা করিবে।

টাইফয়েড (Typhoid)—কলেরার মতই টাইফয়েড বা আন্ত্রিক জ্বর একটি পানীয়বাহিত সংক্রামক ব্যাধি। তবে ইহার সংক্রমণ অপেক্ষাকৃত মন্থর। পৃথিবীর সর্বত্রই এই রোগের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। ব্যাসিলাস টাইফোজাস (Bacillus

Typhosus) নামক একপ্রকার জীবাণু ক্ষুদ্র অন্ত্রের শেষভাগে প্রদাহ উৎপাদন করিয়া যে জ্বর সৃষ্টি করে তাহা সাধারণত তিন চারি সপ্তাহ কাল স্থায়ী হয়। সচরাচর অল্পবয়স্ক লোকেরাই ইহার কবলে পড়ে। উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা না হইলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

রোগ-লক্ষণ—জ্বরের প্রথম অবস্থা হইতে মাথা ধরা, অবসাদ এবং নাড়ির মৃদুগতি লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে সকল লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। জ্বর প্রত্যহ ক্রমবর্ধমান হইয়া প্রথম সপ্তাহের শেষভাগে ১০৩° বা ১০৪" ডিগ্রীতে ওঠে এবং একইভাবে চলিতে থাকে। প্রাতে জ্বর প্রায় ২° ডিগ্রী নামিয়া যায়। তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে জ্বর প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া কমিয়া সাধারণ অবস্থায় আসে। জ্বর অপেক্ষা এই রোগের উপসর্গগুলি বেশী মারাত্মক।

চিকিৎসা—টাইফয়েড মারাত্মক হইলেও আজকাল আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। যথা সময়ে চিকিৎসা শুরু হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। অবশ্য সুচিকিৎসার সঙ্গে উপযুক্ত শুশ্রূষাও চাই। ক্লোরোমাইসিটিন এই রোগের প্রধান ঔষধ। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্লোরোমাইসিটিনের সঙ্গে অথবা স্বতন্ত্রভাবে টেরামাইসিন, ক্যাক্রোমাইসিন, আইলোটাইসিন ইত্যাদি জীবজ ঔষধ ব্যবহার করিয়া টাইফয়েড রোগ সহজেই আয়ত্তে আনা সম্ভব হইতেছে। তবে আরোগ্য লাভের পরও রোগীকে কিছুদিন পর্যবেক্ষণাধীন রাখা উচিত, কারণ অনেক সময় রোগীকে পুনরাক্রান্ত (relapse case) হইতে দেখা গিয়াছে।

প্রতিরোধের উপায়—টাইফয়েড রোগটি সর্বদা পানীয়ের সাহায্যেই ছড়ায়। তাই ইহা প্রতিরোধ করিতে হইলে পানীয় সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। পানীয়বাহিত সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া টাইফয়েড রোগবিস্তার নিরোধ করিতে হইলে কলেরা রোগের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও মাছি নিয়ন্ত্রণ, রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ ও তাহার যাবতীয় ব্যবহৃত দ্রব্য উত্তমরূপে নির্বীজন করা প্রয়োজন। মলমূত্রাদিও নির্বীজিত করিয়া লইয়া নিক্ষেপ করিবে অথবা সম্ভব হইলে পোড়াইয়া ফেলিবে। সংক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য রোগীর শুশ্রূষাকারীরা ব্যক্তিগত দৈহিক পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবে। টাইফয়েড রোগের সংক্রমণ কলেরা অপেক্ষা মন্থর কিন্তু প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে দ্রুত রোগ ছড়াইতে পারে। এই রোগটি আর একটি কারণে ভয়াবহ। ব্যাসিলারি আমাশয়ের

মত ইহারও বাহক আছে অর্থাৎ আরোগ্যলাভের পরেও কোন কোন ব্যক্তি সকলের অলক্ষ্যে রোগ ছড়াইতে থাকে।

কলেরার ন্যায় টাইফয়েডেরও প্রতিষেধক টিকা আছে। সম্মিলিত টি. এ. বি. সি, (Typhoid, Paratyphoid A and B, Cholera) টিকা লইলে টাইফয়েড. প্যারাটাইফয়েড (অপেক্ষাকৃত মৃদুজাতের টাইফয়েড) ও কলেরার আক্রমণ হইতে সাময়িকভাবে রক্ষা পাওয়া যায়।

উদরাময় (Diarrhoea)—উদ্‌রাময়ও প্রধানত পানীয়বাহিত ব্যাধি। উদরাময় অবস্থায় মল তরল ও সংখ্যায় অধিকতর হয়।

রোগ-লক্ষণ—নানা কারণে উদরাময়ের সৃষ্টি হইতে পারে। দূষিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের ফলেই সচরাচর উদরাময় দেখা দেয়। এতদ্ব্যতীত কোন ঔষধ কর্তৃক অন্ত্রের উত্তেজনা, ঠাণ্ডা লাগা, বহুবিধ অন্যান্য ব্যাধি, কোষ্ঠকাঠিন্য, গুরুপাক কিংবা প্রদাহকারী খাদ্যদ্রব্য ভোজনও উদরাময়ের অন্যতম কারণ। বমি, পেটের যন্ত্রণা এবং ঘন ঘন তরল মল নির্গত হওয়াই উদরাময়ের প্রধান উপসর্গ।

চিকিৎসা—সামান্য পরিমাণ চকের গুঁড়া কিংবা আফিম দিয়া উদরাময় বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। তবে উদরাময় হইলে দেহের যাবতীয় দূষিত পদার্থ মলের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায় বলিয়া প্রথম অবস্থায় কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া উহা চলিতে দেওয়াই বিধেয়। অজীর্ণ দ্রব্যঘটিত উদরাময় হইলে একমাত্র ক্যাস্টর অয়েল দিয়া পরে দুধ পথ্যের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। ক্যাস্টর অয়েল রেচকের কাজ করে। ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইলে রোগীকে শয্যায় শায়িত রাখিয়া হাত, পা এবং পেটে উত্তাপ প্রয়োগ করিবে এবং ফুটন্ত দুধ নিয়মিত পান করিতে দিবে। সাধারণ উদরাময়ে উপরোক্ত চিকিৎসা চলে। তবে অসুখ গুরুতর আকার ধারণ করিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। নতুবা উহা আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা অথবা কোলাইটিসে পর্যবসিত হইতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়—খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবে। দুধ ফুটাইয়া পান করিবে এবং খাদ্যদ্রব্য সর্বদা মাছি হইতে দূরে রাখিবে, কারণ মাছির সাহায্যে এই রোগটি ছড়াইয়া থাকে।

(২) **বায়ুবাহিত ব্যাধি** (Air-borne diseases)—বায়ুবাহিত ব্যাধিগুলির মধ্যে সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ও ডিপথিরিয়াই প্রধান।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)—ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি বায়ুবাহিত মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। রোগ মারাত্মক হইলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। ব্যাসিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা (Bacillus Influenza) নামক জীবাণুই এই রোগের মূল কারণ। কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা ব্যাপকভাবে এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশে প্রকাশ পাইয়াছিল।

রোগ লক্ষণ—জ্বর, সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনাবোধ, হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা ও মানসিক অবসাদই হইল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রধান উপসর্গ। এই রোগের জন্য অনেক সময় শ্বাসনালীর প্রদাহ সৃষ্টি হইয়া থাকে। রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলে প্রত্যক্ষভাবে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত রোগীর থুথু এবং হাঁচি কাশির মধ্যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু থাকে। হাঁচি এবং কাশির সঙ্গে ঐ জীবাণু বাহির হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যায় এবং সুস্থ ব্যক্তির প্রশ্বাসবায়ুর সঙ্গে তাহার দেহে আশ্রয় নেয়।

চিকিৎসা—সাধারণত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেটই এই রোগের ঔষধ। এতদ্ব্যতীত স্যালিসিলেট, সাল্‌ফা, পেনিসিলিন প্রভৃতি ঔষধ এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। রোগের সময় এবং আরোগ্যলাভের পরেও রোগীর কিছুদিন বিশ্রাম লওয়া উচিত। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগটি রোগীর দেহে কোনরূপ অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে না।

প্রতিরোধের উপায়—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে টের পাইবামাত্র রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া দিবে এবং দেহ গরম রাখিবে। রোগীকে হাসপাতালে পাঠানই সবচেয়ে নিরাপদ। তবে তাহা সম্ভব না হইলে বাড়িতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবে এবং রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ও রুমাল সর্বদা নির্বীজিত করিয়া লইবে। বায়ুর মধ্য দিয়া রোগীর হাঁচি কাশির সঙ্গে রোগের জীবাণু ছড়ায়। এইজন্য রোগীকে কখনও উন্মুক্তভাবে হাঁচিতে, কাশিতে কিংবা যেখানে সেখানে থুথু ফেলিতে দিবে না। হাঁচিবার সময় সর্বদা রুমাল ব্যবহার করিতে বলিবে।

রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলে সুস্থ ব্যক্তির সহজেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়। এইজন্য কখনও রোগীর সংস্রবে আসিবে না এবং যতদূর সম্ভব সংক্রমণ এড়াইয়া চলিবে। সর্বদা সংক্রমণ এড়ান অবশ্য সম্ভব নয়। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করিলে সহজেই সংক্রমণ এড়ান যায়, যেমন—আলো-বাতাসপূর্ণ কক্ষে শুইবে ; ভিড় এড়াইয়া চলিবে, যথোপযুক্ত শীতবস্ত্র পরিধান করিবে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগিতে পারে। স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি যতদূর সম্ভব

মানিয়া চলিবে। ব্যায়াম, বিশ্রাম ও পানাহার যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয়। অতিরিক্ত ক্লান্ত এবং পানাসক্ত ব্যক্তিরা সহজে এই রোগের কবলে পড়ে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা কোথাও মহামারী আকার ধারণ করিলে শিশুদের বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া ভাল এবং রেলগাড়ী ও ট্রামবাসের ভিড়ও এড়াইয়া চলা উচিত।

(৩) **কীটপতঙ্গ বাহিত ব্যাধি: ম্যালেরিয়া** (Malaria)—ম্যালেরিয়া একপ্রকার সকম্প, সবিরাম রক্তক্ষয়ী প্লীহাবর্ধক জ্বর বিশেষ। ম্যালেরিয়া শব্দটি ইতালীয়। ইহার অর্থ বিষাক্ত বায়ু (Mal = bad, aer = air)। জলাভূমির বিষাক্ত বায়ু হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ঘটে, এই বিশ্বাস হইতেই উক্ত রোগের নামকরণ হইয়াছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে এখন অবশ্য আমরা রোগের প্রকৃত কারণ অবগত হইয়াছি। গ্রীষ্মমণ্ডলের সর্বত্র এই রোগটি বিস্তৃত এবং ভারতের জনগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ও সবচেয়ে অনিষ্টকারী ব্যাধি এই ম্যালেরিয়া। তবে যথাবিধি চিকিৎসা করিলে এই রোগটি সারান যায় এবং উপযুক্ত প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা সম্ভব।

রোগ লক্ষণ—সাধারণত শীত ও কম্প দিয়া জ্বর আসে এবং ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনর্বার জ্বর দেখা দেয়। মাথাধরা ও যকৃতের প্রসার রোগের অন্যতম প্রধান উপসর্গ। কখনও রোগীর বমি হইতে পারে। রোগের তিনটি স্তর আছে—(ক) শীতাবস্থা (Cold stage)—এই স্তরে রোগীর কম্প এবং মাথাধরা আরম্ভ হয়। নাড়ির গতি দ্রুত এবং উত্তাপ অতি দ্রুত বাড়িতে থাকে। (খ) উত্তাপাবস্থা (Hot stage)—এই অবস্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া ওঠে, দেহ লালবর্ণ ধারণ করে এবং মাথার যন্ত্রণা প্রবল হইতে পারে। (গ) ঘর্মাবস্থা (Sweating stage)—এই স্তরে রোগীর অত্যন্ত ঘাম হয়, দেহের উত্তাপ হ্রাস পায়, রোগী আরাম অনুভব করে এবং অনেক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

প্রোটোজোয়া (Protozoa) জাতীয় সর্বনিম্নস্তরের এককোষী অতি ক্ষুদ্র পরজীবীই (Parasite) ম্যালেরিয়া রোগের মূল কারণ। 1880 খ্রীষ্টাব্দে লাভেরাঁ নামক এক ফরাসী চিকিৎসক এই পরজীবী আবিষ্কার করেন। তারপর বহু পরীক্ষার পর ম্যানসন ও রোনাল্ড রস নামক দুই বিজ্ঞানী প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে এই পরজীবীদের জীবনধারণের জন্য মানুষ ও মশা উভয় প্রাণীর দেহকেই সাময়িকভাবে আশ্রয় করিতে হয়। মশা যখন মনুষ্যদেহে দংশন করে তখন এই পরজীবীরা দেহ পরিবর্তনের কাজটুকু সারিয়া লয়। প্রকৃতপক্ষে রস-ই

প্রথম প্রমাণ করেন যে মানুষের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায় মশা। পরবর্তী গবেষকরা আবার প্রমাণ করেন যে শুধুমাত্র এনোফিলিস জাতীয় মশার দ্বারাই এই কাজ সাধিত হয়।

রোগ-সংক্রমণের কারণ—(১) যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়াছে সেখানে পূর্ব হইতেই ম্যালেরিয়া রোগী থাকা চাই। যেখানে কাহারও দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু নাই সেখানে ম্যালেরিয়া সৃষ্টি হইতে পারে না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে-সকল লোক বহুদিন ধরিয়া অল্প মশার কামড় খাইতে অভ্যস্ত তাহার ধীরে ধীরে ম্যালেরিয়ার অনাক্রম্যতা অর্জন করে। তবে এই অর্জিত ক্ষমতা রোগ নিবারণের পক্ষে সর্বদা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ নাই।

(২) এনোফিলিস জাতীয় মশাই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। অন্য মশার এই জীবাণু বহন করিবার ক্ষমতা নাই।

(৩) আবহাওয়ার অবস্থার উপরও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নির্ভর করে। জমিতে আর্দ্রতা বেশী থাকিলে মশার দংশনের মাত্রা বাড়িয়া যায়। আর্দ্রতা মশার জীবনও দীর্ঘ করিয়া তোলে। বর্ষাকালে যে মশার উপদ্রব বাড়ে তাহার একটি কারণ, এই সময় মশা ডিম পাড়িবার উপযোগী স্থান খুঁজিয়া পায় কিন্তু তাহার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল আবহাওয়ার আর্দ্রতা এই সময় বাড়িয়া যায়।

(৪) জলসেচের ব্যবস্থার উপরেও ম্যালেরিয়ার প্রসার অনেকখানি নির্ভর করে। বন্যার জল ধানের জমিতে না দাঁড়াইলে বেশী মশা জন্মায় না কিন্তু দেখা গিয়াছে খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করিলে মশার প্রকোপ বাড়িয়া যায়।

চিকিৎসা—ম্যালেরিয়ার ঔষধ হিসাবে কুইনাইন, মেপাক্রিণ, গামাকুইন, ক্লোরাকুইন ও প্রোগুয়ানিল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। প্রত্যহ ০·১ গ্রাম মেপাক্রিণ সেবনে ম্যালেরিয়া হইতে পারে না। অতিরিক্ত সেবনে চামড়ার রং হলুদবর্ণ ধারণ করিতে পারে। প্রোগুয়ানিল এই রোগের অত্যন্ত কার্যকরী ঔষধ।

প্রতিরোধের উপায়—(১) মশার দংশন নিবারণ করিয়া, (২) এনোফিলিস মশা ধ্বংস করিয়া, (৩) ম্যালেরিয়া রোগীদের সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া (৪) জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যায়।

(১) **কিভাবে মশার দংশন নিবারণ করা যায়**—(ক) যেখানেই মশার উৎপাত শুরু হইবে সেখানেই প্রত্যহ মশারি খাটাইয়া শুইবে। মশারির

চারিধার তোশকের তলায় ভালভাবে গুজিয়া দিবে যাহাতে কোনরকমে মশা ঢুকিতে না পারে। রাত্রে যদি একান্তই মশারি ব্যতীত শুইতে হয় তবে দেহের খোলা জায়গায় এবং বিছানায় তার্পিণ তেল ও ইউক্যালিপটাস কয়েক ফোঁটা ঢালিয়া দিবে।

(খ) মশা বেশী কামড়াইলে বুট পরা চলিতে পারে। ক্যানভাস অথবা নরম চামড়া দিয়া এই বুট তৈয়ারী হওয়া চাই। রাত্রিবেলা হাতে গ্লাভস্ পরাও মন্দ নয়।

(গ) মশা প্রবেশ করিতে না পারে এইরূপ সূক্ষ্ম জাল দিয়া বাড়ির সমস্ত দরজা জানালা ঢাকিয়া দেওয়া (Screening of building) সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা।

(২) **মশার উচ্ছেদসাধন**—দুই স্তরে মশার উচ্ছেদ সাধন করা যায়। প্রথমত পরিণত উড়ন্ত অবস্থায় এবং দ্বিতীয়ত ডিম ও শূককীট অবস্থায়।

উড়ন্ত অবস্থায় মশাদের মারিবার জন্য বাড়িতে ডি. ডি. টি., গ্যামাক্সিন্ অথবা পাইরেথ্রাম (pyrethrum) বা অন্য কোন ইমালসান স্প্রে করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্প্রে করিয়া মশাদের ধ্বংস করা যায় না, কারণ একঝাঁক মশা মরিলেই অপর এক ঝাঁক মশা আসিয়া উহাদের স্থান দখল করিয়া লইবে। আসলে মশা উচ্ছেদ করিবার চেয়ে মশার কামড় এড়ানই হইল স্প্রে করিবার উদ্দেশ্য। ঘরে নিমপাতা কিংবা ধূপ পোড়াইয়াও মশা দূর করা যায়।

উড়ন্ত মশা মারিবার জন্য একপ্রকার কলও ব্যবহার করা যায়। খুব সরু মুখওয়ালা পাত্রে অল্প জল ও বালু রাখিয়া দিয়া পাত্রটি এক কোণে রাখিয়া দিলে প্রচুর মশা ঢুকিয়া যাইবে। তারপর উহার মুখ ঢাকিয়া দিয়া জলটি খুব ভাল করিয়া ঝাঁকিয়া লও। দেখিবে সব মশা মরিয়া গিয়াছে।

এনোফিলিস মশার স্বভাব হইল দিনের বেলা ঝোপে ঝাড়ে লুকাইয়া থাকা। সুতরাং ঐসব ঝোপঝাড় কাটিয়া ফেলা উচিত।

শূককীট অবস্থায় মশার উচ্ছেদ—মশা উচ্ছেদ করিবার প্রশস্ত উপায় হইল শূককীট অবস্থায় উহাদের মারিয়া ফেলা। শূককীটগুলি বায়ু ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। সুতরাং যে জলে মশা ডিম পড়িয়াছে ঐ জলে যদি কিছু কেরোসিন ঢালিয়া দেওয়া যায় তবে দেখিবে জলের উপর একটি পাতলা স্তর সৃষ্টি হইয়াছে। শূককীটগুলি ঐ স্তর ভেদ করিয়া বায়ু গ্রহণ করিতে পারিবে না। সুতরাং শীঘ্রই বায়ুর অভাবে মরিয়া যাইবে।

পান-বসন্ত (Chicken Pox)—পান-বসন্ত অত্যন্ত ছোঁয়াচে বটে কিন্তু ইহা কখনও তীব্র আকার ধারণ করে না এবং তেমন মারাত্মক ব্যাধিও নয়। তবে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগ হইতে পারে।

রোগ-লক্ষণ—সামান্য জ্বর, অস্থির ভাব এবং পিঠে ও পায় বেদনা দেখা দেয়। প্রথম কিংবা দ্বিতীয় দিবসে সর্বাঙ্গে ছোট ছোট লাল দাগ দেখা দেয় এবং ঐগুলি অতি দ্রুত ফোস্কায় পরিণত হয়। ফোস্কাগুলি শুকাইয়া যায় এবং মামড়ি পড়ে। মামড়িগুলি শুকাইয়া গেলে আর কোন চিহ্ন থাকে না।

রোগ-সংক্রমণ—(১) রোগের মামড়ি বাতাসে মিশিয়া বায়ুবাহিত ব্যাধির মত সংক্রামিত হয়। রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলে রোগ হইতে পারে। (২) রোগীর শ্লেষ্মা ইত্যাদিও সংক্রামক। (৩) রোগীর ক্ষতে বসিয়া মাছি রোগের জীবাণু বহন করিয়া লইয়া যায়, তারপর সাধারণের মধ্যে ছড়ায়।

চিকিৎসা—এই রোগের জন্য বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। রোগীকে সর্বদা লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হয় এবং প্রচুর দুধ পান করিতে দিতে হয়। মামড়িগুলি চুলকাইতে দিবে না। প্রদাহ ও চুলকানি নিবারণের জন্য গায়ে বোরিক অয়েন্টমেন্টের প্রলেপ দেওয়া চলিতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়—কিভাবে পান-বসন্ত ছড়ায় তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া রোগীকে সর্বদা স্বতন্ত্র কক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে মশারির ভিতরে রাখিবে এবং শুশ্রূষাকারী ব্যতীত অপর কাহাকেও রোগি-কক্ষে প্রবেশ করিতে দিবে না। রোগীর ব্যবহৃত প্রত্যেকটি দ্রব্য ও মলমূত্রাদি নির্বীজিত করিয়া লইয়া রোগি-কক্ষের বাহিরে আনিবে। রোগীর গৃহের লোকদের সংরুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। টিকা লইলে পান-বসন্ত প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায় না। তবে আরোগ্যলাভ করিতেছে এরূপ ব্যক্তির সেরাম (Serum) সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে পান-বসন্ত প্রতিরোধের শক্তি জন্মায়। একবার পান-বসন্ত জন্মাইলে দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা কম।

ইচ্ছা-বসন্ত (Small Pox)—ইচ্ছা-বসন্ত ও পান-বসন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রোগ। একটি জন্মাইলে অপরটি প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায় না। তবে পান-বসন্তের মতই ইচ্ছা-বসন্তও একবার জন্মাইলে দ্বিতীয়বার জন্মাইবার সম্ভাবনা কম। অণুবীক্ষণাতীত এক প্রকার জীবাণু (virus) এই রোগের কারণ। **উপ্তাবস্থা** ৮-১৬ দিন।

রোগ-লক্ষণ—প্রথম অবস্থায় বমি, মাথায় যন্ত্রণা, পিঠে বেদনা এবং অত্যধিক জ্বর হয়। সাধারণত তৃতীয় দিবসে দেহচর্মের উপর হাত বুলাইলে বন্দুকের ছিটার মত অনুভূত হয়। ক্ষুদ্র গুটিকাগুলি প্রথমে লাল ব্রণের মত দেখায় এবং কয়েক দিন পরে ব্রণের মধ্যে সিরাম জন্মায়। পরে উহারা ছোট ছোট ফোস্কার আকার ধারণ করে। অষ্টম দিবসে ফোস্কাগুলির মধ্যে পুঁজ জমে এবং উহারা গুটিকায় পরিণত হয়। এই সময় আবার জ্বর দেখা দেয়। তারপর গুটিকাগুলি ফাটিয়া গিয়া মামড়ি পড়ে। গুটি অবস্থায় চর্ম স্ফীত হয় এবং লাল বর্ণ ধারণ করে।

রোগ-সংক্রমণ—(১) রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলে কিংবা রোগীর বাসনপত্র ব্যবহারের দ্বারা রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়। মৃতদেহ সৎকারকালেও রোগের সংক্রমণ সম্ভব। (২) রোগীর শ্লেষ্মা কিংবা মামড়ি ধূলিকণার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া প্রায় এক মাইল পর্যন্ত ছড়াইতে পারে। (৩) রোগীর ক্ষতে বসিয়া মাছি রোগজীবাণু বহন করিয়া লইতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়—(১) কৃত্রিম উপায়ে টিকা লইয়া ইচ্ছা-বসন্ত প্রতিরোধ করা যায়। টিকা লওয়া থাকিলে বসন্ত হইলেও উহা তেমন মারাত্মক আকার ধারণ করে না। সাধারণত দুই তিন বৎসর পর্যন্ত টিকার প্রতিষেধক ক্ষমতা থাকে। তথাপি প্রতি বৎসর টিকা লওয়া উচিত। টিকা ব্যতীত বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে গরম জলে নির্বীজক ঔষধ দিয়া গার্গেল করা ভাল, কারণ, নাক ও মুখ দিয়াই বসন্তের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে।

(২) বসন্ত হইয়াছে সন্দেহ হওয়ামাত্র রোগীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে আলো বাতাসযুক্ত স্বতন্ত্র কক্ষে মশারির মধ্যে রাখিবে। একমাত্র শুশ্রূষাকারী ব্যতীত অপর কাহাকেও রোগি-কক্ষে প্রবেশ করিতে দিবে না এবং রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র নির্বীজিত না করিয়া ঘরের বাহিরে আনিবে না।

(৩) রোগীর ঘরের অনাবশ্যক সমস্ত বস্ত্র ও আসবাবপত্র বাহিরে লইয়া আসিবে। যে সব দ্রব্য জীবাণু-সংক্রামিত হইয়াছে সেগুলি পোড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই ভাল হয়। নতুবা ঐগুলি সম্পূর্ণ নির্বীজিত করিয়া লইবে। মলমূত্র ও বস্ত্রাদি নির্বীজনের উদ্দেশ্যে রোগি-কক্ষের ভিতরে সর্বদা একটি পাত্রে জলে দশ ভাগ ফর্মালিন সলিউশান মিশাইয়া রাখিবে।

(৪) মশা, মাছি প্রভৃতি জীবাণুবাহী পতঙ্গরা যাহাতে রোগীর দেহে কিংবা মলমূত্রে বসিতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে।

(৫) শুশ্রূষাকারীমাত্রই টিকা লইবে এবং রোগীর শুশ্রূষার পর প্রত্যেক বার গরম জল ও সাবান দিয়া হাত ধুইবে। রোগীর নিকট যে সকল বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইবে উহা সর্বদা বদলাইয়া ফেলিবে।

(৬) আরোগ্যলাভের সময়ও রোগ সংক্রামিত হয়। তাই গুটিকার শেষ দাগটি না মিলানো পর্যন্ত কাহাকেও রোগীর সঙ্গে মিশিতে দিবে না। মাথার চুল ভালভাবে আঁচড়াইয়া গুটিকার খোলস তুলিয়া ফেলিবে। বস্ত্রাদি ভালভাবে নির্বীজিত করিবে এবং নির্বীজক (antiseptic) লোশন দিয়া রোগীকে স্নান করাইয়া লইবে।

(৭) **মৃতদেহের ব্যবস্থা**—বসন্ত রোগীর মৃতদেহ যথাসম্ভব সত্বর অপসারিত করিবে। প্রথমে জলের সঙ্গে শতকরা ৪০ ভাগ ফর্মালিন সলিউশান মিশাইয়া উহাতে একটি চাদর কিংবা বস্ত্রখণ্ড ডুবাইয়া মৃতদেহ ভাল করিয়া জড়াইবে। তারপর মৃতদেহ দ্রুত অপসারিত করিবে। কফিনে চাপা দিলে দেখিবে উহা যেন বায়ু নিরোধক (air-tight) হয়।

রোগী সুস্থ হইয়া উঠিলে কিংবা রোগীর মৃত্যু হইলে ফর্মালিন, ফর্মালডিহাইড অথবা সাল্‌ফার গ্যাসদ্বারা সমস্ত গৃহ এবং আসবাবপত্র নির্বীজিত করিবে। তারপর বাড়ির সমস্ত বস্ত্রাদি প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত করিবে। সূর্যালোক নির্বীজনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলে ইচ্ছা-বসন্ত প্রতিরোধ করা অনেক সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

পান-বসন্ত ও ইচ্ছা-বসন্তের প্রভেদ

পান-বসন্ত	ইচ্ছা-বসন্ত
(১) অল্প জ্বর, মাথা ধরা, পিঠে বেদনা ও কম্পন।	(১) তীব্র জ্বর, পিঠে তীব্র যন্ত্রণা ও বমির উদ্বেগ।
(২) প্রথম দিনেই গুটিকা বাহির হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে গুটিকা বাহির হইতে থাকে। সাধারণত পেট হইতে শুরু করিয়া দেহের অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে ছড়াইতে থাকে।	(২) তৃতীয় দিবসে গুটিকা বাহির হয়। দেহের উপরিভাগ অর্থাৎ মুখ হইতে শুরু করিয়া হাতে পায় ছড়াইতে থাকে।
(৩) গুটিকার কেন্দ্রাপসারী গতি।	(৩) গুটিকার কেন্দ্রাভিমুখী গতি।
(৪) গুটিকা উপরে ভাসা ভাসা থাকে।	(৪) গুটিকা চর্মের ভিতর হইতে বাহির হয়।

পান-বসন্ত	ইচ্ছা-বসন্ত
(৫) গুটিকার চারিপাশ ফোলা থাকে এবং কেন্দ্রস্থল স্ফীত হইয়া ওঠে।	(৫) গুটিকার চারিপাশ জলে ফোলা এবং কেন্দ্রস্থল চাপা থাকে।
(৬) কোন দাগ থাকে না।	(৬) দাগ হয়।

যক্ষা রোগ (Tuberculosis)—যে কয়েকটি মারাত্মক ব্যাধি আমাদের দেশে স্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছে যক্ষা তাহাদের অন্যতম।

রোগের কারণ—জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক ১৮৮২ সালের ২০শে এপ্রিল সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যক্ষারোগের নিজস্ব জীবাণু আছে। চিকিৎসকদের মতে জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া সাধারণত ফুসফুসকে আক্রমণ করে এবং উহার ফলে শরীর ক্ষয় হইতে হইতে রোগীর জীবন-দীপ নিভিয়া যায়। জীবাণুগুলি এক দেহ হইতে অন্য দেহে আশ্রয় করে বলিয়া যক্ষা একটি সংক্রামী-ব্যাধি।

যক্ষার জীবাণু প্রধানত চার শ্রেণীর—(১) মনুষ্য-সংশ্লিষ্ট (human), (২) গবাদি-সংশ্লিষ্ট (bovine), (৩) পক্ষী-সংশ্লিষ্ট (avian) ও (৪) সরীসৃপ-সংশ্লিষ্ট (reptilian)।

দেহে প্রবেশপথ—তিনটি রাস্তা দিয়া যক্ষা-জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। যথা—(১) শ্বাসপথ, (২) মুখ ও (৩) ত্বক্।

শ্বাসপথ—আমাদের দেশে সচরাচর যে যক্ষারোগ দেখা যায় তাহা মানব-জনিত জীবাণুজাত। এই জীবাণুগুলি শ্লেষ্মাবাহিত। রোগীর হাঁচি কাশি, গয়ের ইত্যাদির সঙ্গে অসংখ্য যক্ষাজীবাণু নির্গত হয় এবং রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলে সুস্থব্যক্তির দেহ আক্রান্ত হয়। এই সকল জীবাণু আবার সূর্যালোক-বর্জিত স্থানে বহুদিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। থুথু, গয়ের প্রভৃতি শুকাইয়া ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যায়। এইরূপ দূষিত ধুলাবালি সুস্থব্যক্তির ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া রোগ জন্মায়।

মুখ—ক্ষয়রোগগ্রস্ত গাভীর দুধ পান করিলেও যক্ষা হয়।

ত্বক্—যক্ষারোগীর গয়ের কিংবা গয়ের দ্বারা দূষিত ধূলি ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে ত্বকে যক্ষার সৃষ্টি করে।

রোগের লক্ষণ—যক্ষা-রোগের প্রধান লক্ষণ এই যে ইহাতে ঘুষঘুষে জ্বর, খুসখুসে অল্প কাশি, রাত্রে ঘাম হয় এবং দেহের ওজন দ্রুত কমিয়া যাইতে থাকে। এক্স-রে লইলে এবং রোগীর শ্লেষ্মা পরীক্ষা করিলে রোগ ধরা পড়ে।

রোগ-সংক্রমণ—শিশু, যুবক ও শীর্ণকায় দুর্বল ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগ দ্রুত বিস্তারলাভ করে। শহর, বাণিজ্য ও শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতে সর্বত্র যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আছে। তবে সকলেই এই রোগের কবলে পড়ে না। কোন কারণে দেহে রোগ-প্রতিরোধক শক্তি কমিয়া গেলে তবেই মানুষ যক্ষ্মারোগ দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়। দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, আলোবাতাসহীন ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে বাস, কলকারখানার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদি নানা কারণে যক্ষ্মারোগ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

রোগ প্রতিরোধ—প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক রহিয়াছে; যেমন—(১) রোগজীবাণুর বিস্তার নিবারণ; (২) অনাক্রান্তদিগকে রক্ষা করা; (৩) ব্যক্তিগত সাবধানতা; (৪) রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(১) **রোগজীবাণুর বিস্তার নিবারণ**—রোগীর থুথু, গয়ের ইত্যাদির সঙ্গে রোগজীবাণু নির্গত হয়। সুস্থ ব্যক্তিরা যাহাতে ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদ্বারা বিপন্ন না হয় সেইজন্য রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা এই রোগ নিবারণের প্রধান অঙ্গ। অত্যন্ত রুগ্ন ব্যক্তিদের ক্ষয়নিবাসে রাখাই বাঞ্ছনীয় যাহাতে তাহারা সর্বদা চিকিৎসাধীন থাকিতে পারে।

(২) **অনাক্রান্তদিগকে রক্ষা**—সুস্থ ব্যক্তির দেহেও যক্ষ্মা রোগের জীবাণু থাকিতে পারে। যক্ষ্মাজীবাণু হইতে প্রস্তুত টিউবারকিউলিন ত্বকের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া ম্যান্টু টেস্টের (Mantoux test) সাহায্যে কাহার শরীরে যক্ষ্মাজীবাণু আছে তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। যাহাদের দেহে এই জীবাণু আছে তাহাদের খাদ্য এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া কর্তব্য। দেহে অল্পমাত্রায় যক্ষ্মাজীবাণু বর্তমান থাকিলে উহা যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধক শক্তি সঞ্চার করে। তবে অধিক মাত্রার যক্ষ্মাজীবাণু থাকা সর্বদাই বিপজ্জনক কারণ তাহাতে যে কোন সময়ে রোগাক্রমণের ভয় থাকে।

যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা হইল বি. সি. জি. (Bacillus Calmette Guerin) অর্থাৎ কালমেত গেঁরো আবিষ্কৃত ব্যাধিবীজ। এই টিকা লইলে প্রায় পাঁচ ছয় বৎসরের জন্য যক্ষ্মারোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। বড় বড় শহরে ও শিল্পকেন্দ্রগুলিতে যেখানে অনবরত কলকারখানার ধূম নির্গত হয়, সেখানে সকলের এই টিকা লওয়া উচিত।

(৩) **ব্যক্তিগত সাবধানতা**—রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ যথাসম্ভব পরিত্যাজ্য। দুধ অন্তত ১০।১৫ মিনিট ফুটাইয়া পান করা উচিত। বদ্ধ আলোবাতাসহীন

কক্ষে ঘুমাইবে না এবং যতদূর সম্ভব মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিবে। যক্ষ্মা হইতে নিষ্কৃতি লাভের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও কার্যকরী পন্থা হইল আপন আপন স্বাস্থ্য অটুট রাখা। এইজন্য নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিবে এবং স্বাস্থ্যের যাবতীয় বিধি পালন করিয়া চলিবে।

(৪) **রাষ্ট্রের কর্তব্য**—জনবহুল শহরগুলিতে আলোবাতাসযুক্ত স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্মাণের বন্দোবস্ত করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। কলকারখানার গ্যাস ও ধূম যাহাতে স্থানীয় আবহাওয়া দূষিত করিতে না পারে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত স্কুল, কলেজ, কারখানা এবং অন্যান্য জনবহুল প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এবং সন্দেহজনক ব্যক্তিদের এক্স-রে লইয়া যথার্থ রোগী আবিষ্কার করা উচিত। যক্ষ্মা-রোগীদের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় এবং যক্ষ্মানিবাস নির্মাণ করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। জনসাধারণ যাহাতে ভেজালশূন্য খাদ্য সুলভে পায় সেদিকে রাষ্ট্র এবং পৌরসভাসমূহ অবশ্যই দৃষ্টি রাখিবেন। এতদ্ব্যতীত ক্ষয়রোগ নিবারণ ও বিস্তার ব্যাপারে জনশিক্ষার বন্দোবস্ত করা চাই। মানুষের অজ্ঞতাই এই রোগ ছড়াইতে সাহায্য করে সবচেয়ে বেশী।

(৪) **চর্মরোগ : খোসপাঁচড়া** (Scabies)—সচরাচর যে সকল চর্মরোগ দেখা যায় তাহাদের মধ্যে খোসপাঁচড়া (Scabies) ও দাদই (Ringworm) প্রধান।

রোগ-লক্ষণ—খোসপাঁচড়া একপ্রকার চর্মের ক্ষত। অতি ক্ষুদ্র মাকড়সার মত একজাতীয় কীটাণু হইতে পাঁচড়া জন্মায়। এই কীটাণুদের গায়ের রং সাদা এবং সর্বসমেত আটটি পা আছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত খালি চোখেও ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীকীটগুলি ডিম পাড়িবার উদ্দেশ্যে চর্মের অব্যবহিত নীচে অতি ক্ষুদ্র গর্ত সৃষ্টি করিতে থাকে। প্রায় দুই তিন সপ্তাহ ইহারা বাঁচিয়া থাকে এবং দেহচর্মের অভ্যন্তরে অন্যূন ৩০টি ডিম পাড়ে। তিন চারি দিন পরে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয় এবং আরও এক সপ্তাহের মধ্যে উহারা পূর্ণাঙ্গ কীটে পরিণত হয়। কীটগুলি দেহচর্ম ফুঁড়িয়া যখন বাসা করে তখন চর্মে দারুণ চুলকানির সৃষ্টি হয়। অনবরত চুলকাইতে চুলকাইতে স্থানটিতে প্রথমে ঘা দেখা দেয়, তারপর ঐ ঘা হইতে রক্ত এবং পুঁজ পড়িতে থাকে। সাধারণত কনুই, কুঁচকি, কব্জি এবং আঙ্গুলের ফাঁকেই চুলকানি দেখা দেয়।

চিকিৎসা—পূর্বে পাঁচড়ার জন্য সাধারণত সালফার মলম (Sulphur ointment) ব্যবহার করা হইত। আজকাল বেনজিল বেনজোয়েট (Benzyl

Benzoate) আসিয়া উহার স্থান দখল করিয়াছে। পাঁচড়ার ক্ষতগুলি গরম জল ও নির্বীজক সাবান দিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া বেনজিল বেনজোয়েট প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া যাইতেছে।

প্রতিরোধের উপায়—খোসপাঁচড়া অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। যাহাদের পাঁচড়া আছে তাহাদের সংস্পর্শে আসিলেই পাঁচড়া হয়। পাঁচড়ার রোগীদের দেহ হইতে পুঁজ রক্ত নির্গত হয় বলিয়া সকলেই পাঁচড়ার রোগীকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। তবে এই রোগ প্রতিরোধ করা কঠিন নয়। নোংরা লোকেরই পাঁচড়া হয়। এইজন্য খোসপাঁচড়ার হাত হইতে নিস্তার পাইতে চাহিলে দেহের সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিয়া চলিবে এবং সর্বদা খোসরোগীদের সংস্রব পরিহার করিয়া চলিবে।

দাদ (Ringworm)—পাঁচড়ার মতই দাদও একটি ছোঁয়াচে রোগ। ছাতা জাতীয় একপ্রকার নিম্নস্তরের উদ্ভিদ্ বা ফাঙ্গাস (fungus) চর্ম, চুল ও নখ প্রভৃতি স্থানে আক্রমণ করিবার ফলে দাদ রোগের সৃষ্টি হয়। ফাঙ্গাসের শ্রেণীভেদ অনুসারে দাদও বিভিন্ন রকমের, যেমন—কুঁচকির দাদ, দেহের দাদ ও মাথার দাদ। ইহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র প্রকার ফাঙ্গাস দ্বারা সৃষ্ট। একজাতীয় ফাঙ্গাস অপর জাতের দাদ সৃষ্টি করিতে পারে না।

রোগ-লক্ষণ—মাথায় দাদ হইলে মাথা খুশকিতে ভরিয়া যায়, চুল ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া ঝরিয়া পড়িতে থাকে। নখে দাদ হইলে নখের স্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ হয়। কখনও কখনও নখে ক্ষত দেখা দেয়। নখ ব্যতীত হাত পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকের মাঝখানে ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে দাদ হইতে পারে। দেহ সর্বদা ভিজা থাকিলে কিংবা অপরিচ্ছন্ন থাকিবার ফলেই দাদ জন্মাইয়া থাকে। দাদ-জনিত ক্ষতের বর্ণ ঈষৎ লালাভ হয় এবং ক্ষতস্থান চর্মের চেয়ে সামান্য উঁচু হইয়া থাকে। দাদের চুলকানি অত্যন্ত তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক। চুলকাইবার পর দাদের স্থান হইতে আঠা আঠা রস গড়াইতে পারে।

চিকিৎসা—সাধারণত স্যালিসিলিক অ্যাসিড (Salicylic acid), বেনজোয়িক অ্যাসিড (Benzoic acid), জেনশ্যান ভায়লেট (Gentian violet), ভায়োফরম (Vioform) প্রভৃতি ঔষধমিশ্রিত মলম দাদের চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়। দাদের চিকিৎসার জন্য রঞ্জনরশ্মিরও (X-ray) সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। তবে মলমের ব্যবহার করিয়া সুফল না পাইলে

তবেই এই রশ্মি ব্যবহার করা উচিত। মাথার দাদ হইলে সর্বদা মাথার চুল কামাইয়া ফেলিবে।

প্রতিরোধের উপায়—রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদির সংস্পর্শে আসিলে দাদ হইবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং দাদ-রোগীর সংস্রব এড়াইয়া চলাই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। বাড়িতে কাহারও দাদ থাকিলে তাহার চিরুনি ও তোয়ালে অপর কেহ ব্যবহার করিবে না এবং আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিবে।

গৃহ শুশ্রূষা

শুশ্রূষাকারীর কাজ

একজন সুস্থ ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি, যেমন—স্নান, আহার ইত্যাদি নিজেই মিটাইতে পারে, কিন্তু একজন অসুস্থ ব্যক্তি অপরের সাহায্য ব্যতীত এই কাজগুলি সমাধা করিতে পারে না। তাই তাহার শুশ্রূষার প্রয়োজন। রোগীর প্রয়োজনকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—

(১) দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন,—স্নান, আহার, দেহের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি দৈহিক প্রয়োজন এবং স্নেহ, প্রীতিলাভ মানসিক প্রয়োজনের অন্তর্গত।

(২) পারিপার্শ্বিকস্থিত প্রয়োজন—বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা, রোগি-কক্ষে আলোহাওয়ার সুযোগ লাভ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিকস্থিত প্রয়োজনের অন্তর্গত।

(৩) চিকিৎসাগত ও শুশ্রূষাগত প্রয়োজন—

(ক) উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক রোগনির্ণয়,

(খ) নির্ভুল চিকিৎসা ও উপযুক্ত ঔষধপথ্য লাভ,

(গ) চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী কোন বুদ্ধিমান ও বিবেচক ব্যক্তি কর্তৃক রোগীর শুশ্রূষালাভ চিকিৎসা ও শুশ্রূষাগত প্রয়োজনের অন্তর্গত।

রোগীর প্রয়োজনগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একজন শুশ্রূষাকারীর কর্তব্যগুলি প্রধানত তিন শ্রেণীর :—

(১) রোগীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি,

(২) রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি,

(৩) চিকিৎসকের প্রতি।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শুশ্রূষাকারীরই আরও একটি কর্তব্য থাকে। সেই কর্তব্যটি প্রধানত :—

(৪) রোগীর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি ও জনসাধারণের প্রতি।

(১) রোগীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি শুশ্রূষাকারীর কর্তব্য—

রোগি-কক্ষ নির্বাচন—উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রোগী যাহাতে অবস্থান করিতে পারে তাহা দেখাই শুশ্রূষাকারীর প্রধান কাজ। একটি প্রশস্ত, প্রচুর আলোহাওয়াযুক্ত, ধূলিধূমবর্জিত কক্ষই রোগীর উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় সাহায্য করিতে পারে। হাসপাতালের কক্ষগুলি সাধারণত রোগীর স্বাস্থ্যের উপযোগী করিয়াই তৈয়ারী হয়, কিন্তু গৃহে রোগি-কক্ষ নির্বাচনের সুযোগ সীমিত থাকে। বাড়ির মধ্যে অন্তত সবচেয়ে আলোবাতাসযুক্ত ও নির্জন ঘরখানিই রোগীর জন্য বাছিয়া লওয়া উচিত। রোগীর পক্ষে ঔষধ, পথ্য এবং শুশ্রূষা যতখানি প্রয়োজনীয়, সূর্যালোকও ঠিক ততখানি প্রয়োজনীয়। শ্রীমতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বলিয়াছেন, 'আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি প্রত্যেকটি রোগী চায় আলো। গাছের গতি যেমন আলোর দিকে, প্রত্যেকটি রোগী তেমনি সূর্যালোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, উপযুক্ত আলোক এবং হাওয়া পাইলে রোগী সহজেই সারিয়া ওঠে।' রোগীর আপনার ঘরখানি যদি রোগি-কক্ষ নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত হয়, তবে রোগীকে সেই ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। রোগি-কক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থাকিলে উহা আদর্শ রোগি-কক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার সুবিধা এই যে রোগীর রাতের পথ্য, ফল, দুধ, মিষ্টি কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি ঐ কক্ষে একটি টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া যায় অথচ ঐগুলি কাহারো নজরে আসে না।

আসবাব-পত্রের সংস্থান—অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব রোগি-কক্ষ হইতে অপসারিত করিবে। দরজা জানালাগুলি হইবে বেশ বড় বড় এবং আড়ম্বরশূন্য, জানালায় কোন নক্সা কিংবা জাফ্রি কাটা থাকিবে না, কারণ তাহাতে ধুলাবালি ও মাকড়সার জাল জমিয়া ঘর নোংরা হয়। একটি খাট, দুইটি টেবিল, দুইখানি সাধারণ চেয়ার ও একটি ইজি চেয়ারই রোগি-কক্ষের পক্ষে যথেষ্ট। জামা-কাপড় ইত্যাদি রাখিবার জন্য একটি আলমারিও রাখা চলে। খাটখানি এমনভাবে রাখিবে যাহাতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া রোগী নীল আকাশ দেখিতে পায় অথচ ঝড়-ঝাপ্টা বা দমকা হাওয়া আসিয়া রোগীর

গায় না লাগিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রোগীর জানালায় পর্দা লাগানো যাইতে পারে। কক্ষের সমস্ত আসবাব যথাসাধ্য সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করিবে। যে টেবিলে ধুইবার সরঞ্জাম থাকে, উহা ম্যাকিনটোশ দিয়া মুড়িয়া দিবে। কম্বল নষ্ট হইবার ভয় থাকিলে পুরু ব্রাউন পেপার দিয়া কম্বল ঢাকিয়া দিবে। রোগি-কক্ষের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মধ্যে রহিয়াছে—

রোগি-কক্ষ—1. জানালা, 2. খাট, 3. টেবিল, 4. আগন্তুকদের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার, 5. শুশ্রূষাকারীর জন্য নির্দিষ্ট আসন, 6. আলমারি।

(১) একটি ক্লিনিকাল থার্মোমিটার,

(২) ঔষধ মাপিবার ও খাওয়াইবার গ্লাশ,

(৩) ফিডিং কাপ,

(৪) কাপ, ডিশ, পীরিচ ও চামচ,

(৫) মুখ ধোওয়াইবার গামলা,

(৬) চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীর হাত মুছিবার জন্য দুইখানি স্বতন্ত্র তোয়ালে,
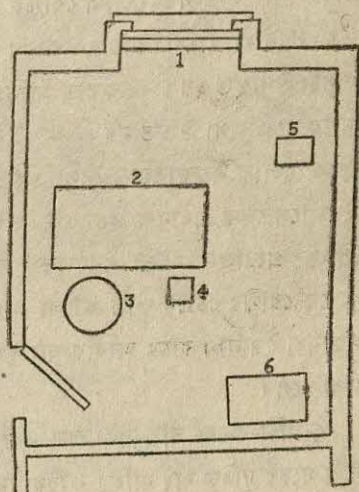
(৭) একটি কমোড এবং একটি বেড-প্যান,

(৮) একটি গরম (hot water bag) ও একটি ঠাণ্ডা জলের ব্যাগ (Ice bag),

(৯) এক বালতি জল,

(১০) একটি মগ,

(১১) সাবান,

(১২) এক কুজা পানীয় জল,

(১৩) একটি নোটবুক ও পেন্সিল,

(১৪) একটি ডুশ,

(১৫) একটি সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ি।

রোগীর ব্যবহারের চিরুনি, টয়লেটের সামান্য জিনিসপত্র, বাসনকোসন রোগি-কক্ষের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে রাখা যায়। আসবাবের বাহুল্য যেমন রোগীর স্বাস্থ্যের প্রতিকূল একেবারে সজ্জাবিহীন শূন্য কক্ষও রোগীর মনকে নিস্তেজ ও

পীড়িত করিয়া তোলে। এইজন্য রোগি-কক্ষে সামান্য পুষ্পবিন্যাস দরকার। তবে ফুলের রং, বর্ণ, গন্ধ ও পরিমাণ নিরূপণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তীব্র গন্ধযুক্ত ফুল রোগীর পক্ষে উপযুক্ত নয়। এতদ্ব্যতীত ফুলগুলি রাত্রে সরাইয়া ফেলা উচিত, কারণ ফুলের আকর্ষণে নানারকম কীট-পতঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। একমাত্র মানিপ্ল্যাণ্ট ব্যতীত অন্য কোনরূপ গাছপালাও রোগীর ঘরে রাখা উচিত নয়।

আলোর বন্দোবস্ত—বৈদ্যুতিক আলোই রোগি-কক্ষের পক্ষে উপযোগী। এই আলোকের প্রধান সুবিধা এই যে ইহা বায়ুস্থিত অক্সিজেন টানিয়া লয় না। উপরন্তু প্রয়োজন হইলে বৈদ্যুতিক আলো কাগজ দিয়া মুড়িয়া রাখা চলে। ইহাতে রোগীর চোখে তীব্র আলো লাগে না অথচ শুশ্রূষাকারীরও কাজের অসুবিধা হয় না। রাত্রে আবার স্বল্প পাওয়ারের নীল বা সবুজ আলো জ্বালাইয়া রাখা চলে।

রোগি-কক্ষে বায়ু-সঞ্চালন—রোগি-কক্ষে বায়ু-সঞ্চালনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ঘরের দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু ভিতরে টানিয়া আনা। উত্তাপ পরিমাপের জন্য কক্ষে একটি থার্মোমিটার রাখা চলে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র দিয়া অনায়াসে কক্ষের উত্তাপ ঠিক রাখা যায়। কিন্তু সে সুবিধা না থাকিলে সবচেয়ে প্রশস্ত কক্ষটি রোগীর জন্য নির্বাচন করাই শ্রেষ্ঠ। রোগীর পক্ষে দক্ষিণ, পূর্ব অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী ঘরই প্রশস্ত। এইরূপ ঘরে উন্মুক্ত হাওয়া ও পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ মেলে। উত্তরমুখী ঘর রোগীর একেবারে অনুপযুক্ত কারণ, শীতকালে উত্তুরে হাওয়া যেমন সুখপ্রদ নয়, তেমনি উত্তরের ঘরে সূর্যালোক প্রবেশেরও সম্ভাবনা নাই। রোগি-কক্ষে বায়ু চলাচলের সুবিধার জন্য রুজু রুজু জানালা থাকা উচিত এবং জানাগুলি সর্বদাই খুলিয়া রাখিবে। রাতের হাওয়া রোগীর পক্ষে খারাপ এ খুবই ভুল ধারণা। শীতকালে সমস্ত জানালা খুলিয়া রাখা সম্ভব নয়। বায়ু-সঞ্চালনের জন্য ঘরে তাই ঘুলঘুলি অথবা স্কাইলাইট থাকা উচিত। একটি লোকের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট বায়ু প্রয়োজন। কমপক্ষে ১০০০ ঘনফুট বায়ু না হইলে রোগীর চলে না। তাই রোগি-কক্ষটি হওয়া উচিত ১০ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চ।

রোগীর শয্যা—শয্যা রচনার লক্ষ্য হইল রোগীকে যথাসাধ্য আরাম দেওয়া। শয্যার পারিপাট্য দরকার সন্দেহ নাই কিন্তু বিছানা বেশী পরিপাটি করিতে গিয়া যেন রোগীকে বিরক্ত করা না হয়। রোগীর শয্যা রচনার সাধারণ

নিয়ম হইল রোগীর দেহের নীচেকার চাদর যেন বেশ মসৃণ ও আঁটসাট হয়, কিন্তু দেহের উপরকার আচ্ছাদন হইবে হাল্কা ও ঢিলেঢালা। শয্যা রচনায় শুশ্রূষাকারীকে যদি অপর কোন ব্যক্তি সাহায্য করে তবে খুব অল্পায়াসে চমৎকার শয্যা রচনা করা যায়। অতিশয় পীড়িত ব্যক্তির শয্যা রচনার জন্য সর্বদাই দুই জন লোক চাই।

রোগীর শয্যার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

(১) ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া একটি লোহার খাট। রোগীর পক্ষে চাকা লাগান খাটই সবচেয়ে প্রশস্ত, কারণ, রোগীর বিন্দুমাত্র অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়া এইরূপ খাট সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়।

(২) একটি শতরঞ্জি ;

(৩) ২½ ইঞ্চি বা ৩ ইঞ্চি পুরু একটি ওয়াড়যুক্ত তোশক ;

(৪) ১ গজ বা ২ গজ একটি ম্যাকিনটোশ (Mackintosh) ;

(৫) দুইখানি চাদর—একখানি ম্যাকিনটোশের তলায় পাতিবার জন্য (undersheet) এবং অপরখানি ম্যাকিনটোশের উপরে পাতিবার জন্য (drawsheet) ;

(৬) পরিষ্কার ওয়াড়যুক্ত দুইটি বালিশ ;

(৭) গায়ে দিবার জন্য একটি সাদা চাদর (Top sheet) ;

(৮) শীতকাল হইলে লেপ অথবা দুইটি হাল্কা কিন্তু গরম কম্বল।

শয্যা রচনার নিয়ম—খাটের উপরে শতরঞ্জি বিছাইয়া দাও। তোশকটিতে যেন ওয়াড় লাগানো থাকে। এইবার একটি চাদর তোশকের উপর পাতিয়া দাও। চাদরের কেন্দ্রস্থল যেন তোশকের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়। ইংরাজীতে এই চাদরটিকে বলে আণ্ডারশীট। চাদরটি চারপাশে বেশ শক্ত করিয়া গুঁজিয়া দিতে হয় যাহাতে বিছানায় কোনরকম ভাঁজ না পড়ে। চাদরের কোণগুলি ঠিক এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া লইবে। এইরূপ কোণ করিলে চাদর বেশ আঁটসাট থাকে।

এইবার বিছানার উপরে ম্যাকিনটোশ বিছাইয়া দিবে। শিশু, বৃদ্ধ, অচৈতন্য কিংবা মলমূত্রের বেগধারণে অক্ষম (incontinent) রোগীদের বিছানায় ম্যাকিনটোশ অপরিহার্য। এইবার সাদা একখানি চাদর দিয়া ম্যাকিনটোশ ঢাকিয়া দাও। ম্যাকিনটোশের ঠাণ্ডা ভাব সাধারণত রোগীর ভাল লাগে না।

তাই উহার উপরে একখানি চাদর পাতিয়া দুই পাশে ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিবে। এই চাদরখানির ইংরাজী নাম ড্র-শীট (Draw-sheet); বালিশ দুইটি যথাস্থানে রাখিয়া দিবে।

তৃতীয় চাদরখানি বা টপ-শীট দিয়া রোগীর দেহ ঢাকিয়া দিবে। রোগীর পায়ের দিকে তোশকের নীচে উহা আলতোভাবে গুঁজিয়া দিবে। কোণগুলি এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া দিবে, তবে রোগী নড়াচড়া করিলেও গা হইতে চাদর খুলিয়া পড়িবে না। শীতকাল হইলে পাতলা আচ্ছাদনের উপর একখানি, প্রয়োজনবোধে দুইখানি হাল্কা অথচ বেশ গরম কম্বল চাপাইয়া দিবে। মাথার দিকে টপ-শীটখানির প্রায় ছয় ইঞ্চি নীচে কম্বল রাখিবে। টপ-শীট নীচে থাকাতে কম্বল নষ্ট হইতে পারে না। আবার কম্বল ও দেহের মাঝখানে চাদর থাকাতে কম্বল রোগীর গায় লাগিয়া খসখস করে না বলিয়া রোগী বেশ আরাম বোধ করে।

রোগীকে বিছানায় শায়িত রাখিয়া শয্যা রচনা—শায়িত অবস্থায় রোগীর বিছানা পরিবর্তন করিতে হইলে দুইজন লোক দরকার। খাটের দুই দিকে দুই ব্যক্তি দাঁড়াইবে। চাদরের এনভেলাপের মত কোণগুলি প্রথমে আলগা করিয়া লইবে। তারপর রোগীর গায়ের উপকার সমস্ত আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিবে। এইবার প্রথম ব্যক্তি পরিষ্কার ড্র-শীট, ম্যাকিনটোশ এবং প্রয়োজন হইলে আণ্ডার-শীট লম্বালম্বিভাবে গোল করিয়া গুটাইয়া লইয়া বিছানা বদলের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে এবং রোগীর মাথার বালিশ সরাইয়া লইবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি রোগীকে একপাশে কাত করিয়া ধরিয়া রাখিবে। এদিকে প্রথম ব্যক্তি বিছানায় পাতা ম্যাকিনটোশ ও চাদর একসঙ্গে গোল করিয়া গুটাইয়া অপসারিত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ পাতিতে থাকিবে। বিছানার মাঝামাঝি পর্যন্ত চাদর পাতা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি রোগীর কাঁধ ও নিতম্বের নীচে হাত রাখিয়া রোগীকে তুলিয়া ধরিবে এবং প্রথম ব্যক্তি চাদর ও ম্যাকিনটোশ সম্পূর্ণ তুলিয়া ফেলিয়া পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ দ্রুত টানিয়া পাতিয়া দিবে। সর্বশেষে চাদরের কোণগুলি এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া দিবে। বালিশ যথাস্থানে রাখিবে এবং রোগীর গায়ের উপর টপ-শীট টানিয়া দিবে।

রোগি-কক্ষের পরিচ্ছন্নত—রোগীর চারিপাশে একটি সুন্দর ও সুচারু পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইলে শুশ্রূষাকারীর রোগি-কক্ষের পরিচ্ছন্নতা ও

সৌন্দর্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। বস্তুত শুশ্রূষার অন্যতম মূলনীতি হইল রোগি-কক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা। ঝাঁটা দিয়া ঘর ঝাটাইলে ঘরের সর্বত্র ধূলা ছড়াইয়া পড়ে। ভ্যাকুয়াম ক্লীনার দিয়া ঘর পরিষ্কার করা তাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা। তবে রোগী অত্যন্ত পীড়িত থাকিলে ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের শব্দে তাহার বিরক্তি বোধ হইতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে কোন জীবাণুনাশক দ্রবণ জলে মিশাইয়া লইবে। তারপর একটি বস্ত্রখণ্ড ঐ জলে ডুবাইয়া লইয়া কক্ষ মুছিয়া লইবে। চায়ের ভিজা পাতা কিংবা করাতের গুঁড়া (saw dust) ছড়াইয়া রোগি-কক্ষ পরিষ্কার করা যায়। করাতের গুঁড়ার সঙ্গে সমস্ত ধুলাবালি লাগিয়া যায় বলিয়া চারিদিকে ধুলা উড়িতে পারে না। ঘরের চারি দেওয়াল, দরজা জানালার খাচগুলি লম্বা ঝাঁটার ডগায় ভিজা ন্যাকড়া জড়াইয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে। দৈনন্দিন ধোয়া মোছার কাজ শেষ হইয়া গেলে সমস্ত আসবাবপত্র যথাস্থানে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিবে। মাঝে মাঝে ঘরের পর্দাগুলি কাচিয়া দিবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেমন রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য, কক্ষের সৌন্দর্য রক্ষাও তেমনি একান্ত প্রয়োজনীয়। সুন্দর সুচারু কক্ষ রোগীর মানসিক অবস্থাকে উন্নত ও প্রফুল্ল করে।

(২) রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি শুশ্রূষাকারীর কর্তব্য—

শুধু পারিপার্শ্বিক নয়, রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতিও শুশ্রূষাকারীর কতকগুলি কর্তব্য রহিয়াছে। প্রধানত রোগীর দৈহিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, রোগীকে খাওয়ানো, মলমূত্র ত্যাগ করানো প্রভৃতি দৈনন্দিন কাজগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। এগুলির যথাযথ পালনের উপর রোগীর রোগমুক্তি বহুলাংশে নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীর গায় হাত বুলানো, বৈদ্যুতিক পাখা অসহ্য বোধ হইলে হাতপাখা চালানো, রোগীকে মালিশ করিয়া দেওয়া বা গা হাত টিপিয়া দেওয়া, সেঁক দেওয়া ইত্যাদি শুশ্রূষাকারীর অন্যতম কর্তব্য।

মুখ ও দাঁত—রোগীর দৈহিক পরিচ্ছন্নতার মধ্যে প্রথমেই পড়ে মুখ ও দাঁতের পরিচ্ছন্নতা। পীড়িত অবস্থায় দাঁত ও মুখবিবর পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, অপরিষ্কার দাঁত অনেক সময়ই পেটের পীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। পরিষ্কার রাখিবার আর একটি সুফল এই যে ইহাতে রোগীর ক্ষুধা এবং আহারে তৃপ্তি জন্মে।

নিতান্ত দুর্বল কিংবা অক্ষম না হইলে অপরের সাহায্য ব্যতীত রোগী বিছানায় বসিয়া নিজেই মুখ ধুইতে পারে। এইরূপ রোগীর মুখ ধোওয়াইবার

জন্য একটি টুথ ব্রাশ, রোগীর পছন্দমাফিক মাজন (paste), ছোট ও বড় দুইখানি তোয়ালে, বড় এক জগ জল, একটি মগ, মুখ ধুইবার একটি গামলা প্রয়োজন। জামা কাপড় যাহাতে না ভিজিয়া যায় এইজন্য প্রথমেই বড় তোয়ালেখানি দিয়া রোগীর গা ঢাকিয়া দিবে। শীতকাল হইলে গরম জল নতুবা ঠাণ্ডা জলে কোন জীবাণুনাশক দ্রবণ মিশাইয়া লইবে এবং মুখের জল ফেলিবার জন্য খাটের পাশে একটি গামলা রাখিবে। রোগীর হাতে টুথ ব্রাশ ও মাজন তুলিয়া দিয়া যতক্ষণ না মুখ ধোওয়া শেষ হয় অপেক্ষা করিবে। তারপর রোগীর প্রয়োজনমত তাহাকে তোয়ালেটি আগাইয়া দিবে।

রোগী নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে মুখ ধোওয়াইবার কাজটি শুশ্রূষাকারীকেই করিতে হয়। শয্যাশায়ী রোগীদের টুথ ব্রাশ দিয়া মুখ ধোওয়ানো সম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারী একটি ট্রেতে করিয়া রোগীর মুখ ধুইবার নিম্নলিখিত সরঞ্জাম গুছাইয়া লইবে—

(১) দুইখানি তোয়ালে,

(২) একটি কাচের পাত্রে বাইকারবোনেট অব সলিউশান,

(৩) একটি ছোট পাত্রে গ্লিসারিণ ও বোরাক্সমিশ্রিত সলিউশান, সংক্ষেপে বোরো-গ্লিসারিণ,

(৪) লিকুইড প্যারাফিন,

(৫) পরিষ্কার কয়েকখণ্ড কাপড় বা গজ এবং তুলি বানাইবার জন্য কয়েকটি কাঠি,

(৬) একটি বালতিতে পর্যাপ্ত জল ও একটি মগ,

(৭) একটি কিডনি ডিশ।

মুখ ধোওয়াইবার নিয়ম—প্রথমে রোগীকে একপাশে কাত করিয়া লও এবং বড় তোয়ালেখানা রোগীর বুকের উপর যথাযথভাবে বিন্যস্ত কর, যাহাতে জল লাগিয়া রোগীর জামাকাপড় ভিজিয়া না যাইতে পারে। এইবার রোগীর মুখে যদি বাঁধানো দাঁত থাকে তবে তাহা খুলিয়া লইয়া বাইকারবোনেট অব সোডা সলিউশানের পাত্রে ভিজাইয়া রাখ। কাঠিগুলির প্রান্তভাগে কাপড় বা গজ জড়াইয়া কয়েকটি তুলি প্রস্তুত করিয়া লও। একটি তুলি লইয়া কাচের দ্বিতীয় পাত্রটির বোরো-গ্লিসারিণে ডুবাইয়া রোগীর মুখের মধ্যে তুলিটি ধীরে ধীরে বুলাইয়া আনিবে। এইভাবে পরপর চার পাঁচটি তুলি দিয়া রোগীর দাঁত মাজিয়া ফেলিতে হয়। রোগীর মুখে তুলি বুলাইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে—

(ক) দাঁত দিয়া কোন রকমে যেন রক্ত বাহির না হয়,

(খ) দাঁত, মাড়ি ও জিহ্বা পরিষ্কার হওয়া চাই,

(গ) জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে যেন তুলি না লাগিয়া যায়, কারণ, উহাতে রোগীর বমির উদ্বেগ দেখা দিতে পারে।

সমস্ত রোগীই দাঁত মাজিবার পর মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে চায়। মুখ ধুইবার সুবিধার জন্য রোগীকে পাশ ফিরাইয়া লইবে এবং মুখের কাছে কিডনি ডিশ ধরিবে। অনেক রোগীর মুখ ও গলা শুকাইয়া আসিতে চায়। মুখের ভিজা ভাব বজায় রাখিবার জন্য দাঁত মাজাইবার পরে রোগীর মুখে, দাঁতে ও ঠোঁটে একটু বোরো-গ্লিসারিণ মাখাইয়া দিবে। যে সকল রোগীদের মুখ আপনিই ভিজা থাকে তাহাদের মুখে বোরো-গ্লিসারিণ লাগাইবার প্রয়োজন নাই। তবে একটু পাতিলেবু কিংবা কমলালেবুর রস জলে মিশ্রিত করিয়া মুখ ধোওয়াইয়া দিলে মুখটি বেশ পরিষ্কার লাগে এবং রোগীর মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসে। সকালবেলা এবং রাত্রিবেলা নিদ্রার পূর্বে দিনে মোট দুইবার রোগীর মুখ ধোওয়ানো উচিত। অতিশয় পীড়িত ব্যক্তিদের দিনে চার বার মুখ ধোওয়াইবে এবং ধোওয়াইবার পরে রোগীর চোখে একটু লিকুইড প্যারাফিন মাখাইয়া দিলে চোখে পিচুটি পড়িবে না।

রোগীর স্নান—সুস্থ ব্যক্তির ত্বক্ পরিষ্কার রাখা যেমন উচিত, অসুস্থ ব্যক্তির ত্বক্ পরিষ্কার রাখাও তেমনি একান্ত প্রয়োজন। সুস্থ এবং অসুস্থ উভয়েরই পক্ষে স্নান তাই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিছানায় শোয়াইয়া গরম জল দিয়া রোগীর গা মোছাইয়া দেওয়াই হইল রোগীর স্নান। এইরূপ স্নানকে Blanket bath বা Sponge bath বলা হয়।

স্পঞ্জ বাথ (Sponge bath)—রোগীর স্নানের উদ্দেশ্য ত্বক্ পরিষ্কার রাখা এবং রোগীকে একটুখানি আরাম দেওয়া। রোগীর স্নানের জন্য প্রয়োজন একটি বালতি, জলের গামলা, একটি ছোট এবং একটি বড় ম্যাকিনটোশ, এক জগ গরম জল, সাবান, একখানি তোয়ালে, স্নানের জন্য একটি স্পঞ্জ ক্লথ, নখ কাটার কাঁচি, মেথিলেটেড স্পিরিট, অ-ডি-কোলোন (Eau-de-Cologne), পাউডার, দুইখানি কম্বল (গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কম্বলের পরিবর্তে দুইখানি বড় বাথ টাওয়াল)।

স্নানের প্রক্রিয়া—স্নানের পূর্বে রোগীর মাথা ধোওয়াইবার কাজটি সমাধা করা উচিত। প্রথমে রোগীর খাটের নিকটে একটি বালতিতে পরিষ্কার

জল ধরিয়া রাখিবে। তারপর অপর একটি বালতি কিংবা গামলা রোগীর মাথার নীচে স্থাপন করিবে। এইবার ছোট ম্যাকিনটোশটি লইয়া রোগীর বালিশের উপর এরূপভাবে পাতিয়া দিবে যাহাতে ম্যাকিনটোশের একপ্রান্ত রোগীর পিঠ পর্যন্ত আসে এবং অপরপ্রান্ত খাট বাহিয়া মাথার নীচে রক্ষিত বালতির উপরে আসিয়া পড়ে। এইবার বালতি হইতে জল লইয়া ধীরে ধীরে রোগীর মাথা ধোওয়াইয়া দিবে।

মাথা ধোওয়ানো শেষ হইলে শুষ্ক তোয়ালে দিয়া রোগীর মাথা মোছাইয়া রোগীর স্নান শুরু করিবে। পূর্বেই হাতের কাছে স্নানের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখিবে। তারপর রোগি-কক্ষের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া লইয়া রোগীর দেহের সমস্ত আচ্ছাদন অপসারিত করিবে। প্রথমে ম্যাকিনটোশটি পাতিয়া দিবে এবং উহার উপরে একখানি বড় বাথ-টাওয়াল বিছাইয়া লইবে। তারপর দ্বিতীয় বাথ-টাওয়ালখানি দিয়া রোগীর দেহ উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিবে। স্নানের প্রাথমিক প্রস্তুতির পরে রোগীর জামাকাপড়ের বোতাম ও বাঁধনগুলি খুলিয়া বস্ত্রাদি একে একে খুলিয়া ফেলিবে। এইবার স্নানের কাজটি দ্রুত সমাধা করিতে হইবে কারণ বহুক্ষণ ধরিয়া স্নান করাইলে রোগীর গায় ঠাণ্ডা
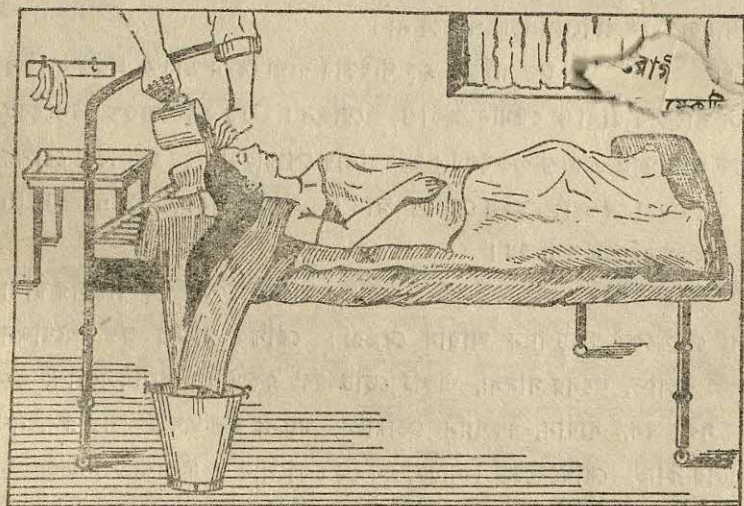
এইভাবে রোগীর মাথা ধোওয়াইবে

লাগিয়া যাইবার ভয় থাকে। গরম জল ও সাবান দিয়া যথাক্রমে রোগীর মুখ, হাত, বুক, পেট, পা ও পিঠ বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে। যে সকল

রোগী হাত এবং পা জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে চায় তাহাদের হাত ও পা জলে ডুবাইতে দিবে। প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোছাইবার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো তোয়ালে দিয়া গা মুছিয়া ফেলিবে এবং ঢাকিয়া দিবে। দরকার মত স্নানের জল বদলাইয়া ফেলিয়া নতুন জল লইবে। এক ব্যক্তি যদি রোগীকে স্নান করায় এবং অপর একজন রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মোছাইতে থাকে তবে স্নান খুব দ্রুত এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

স্নানের সময় বিশেষ করিয়া নজর রাখিবে দেহের প্রতিটি ভাঁজ, যেমন বগল, হাঁটু প্রভৃতি যেন পরিষ্কার করা হয়। রোগী নিতান্ত দুর্বল হইয়া না পড়িলে নিজেই দেহের ঢাকা স্থানগুলি পরিষ্কার করা পছন্দ করে। শুশ্রূষাকারী কেবল তাহার হাতে স্পঞ্জ ক্লথ তুলিয়া দিবে এবং প্রত্যেকটি অংশ পরিষ্কৃত হইবার পর গামছাখানি জলে নতুন করিয়া ভিজাইয়া দিবে।

রোগীর দেহে যে সমস্ত স্থানের হাড় বেশ উঁচু হইয়া থাকে সেই সমস্ত স্থানগুলি সাবান মাখান হাত দিয়া রগড়াইয়া দিবে। তারপর তোয়ালে দিয়া ভাল করিয়া মোছাইয়া একটু স্পিরিট কিংবা অ-ডি-কোলোন মাখাইয়া রোগীর গায় সামান্য পাউডার ছড়াইয়া দিবে। এইবার রোগীর বিছানা হইতে বাথ-টাওয়াল অপসারিত করিয়া তাহাকে বস্ত্রাদি পরাইয়া দিবে।

রোগীর গায় জ্বর থাকিলে চিকিৎসকরা কখন কখন ঠাণ্ডা জল বা বরফ জল দিয়া রোগীকে স্পঞ্জ দিবার নির্দেশ দেন। এইরূপভাবে গা মোছানোকে cold sponge বলে।

কোল্ড স্পঞ্জ (Cold sponge)—এক গামলা বরফ জল অথবা সামান্য উষ্ণ জল, দুইখানি বাথ-টাওয়াল, ম্যাকিনটোশ, একটি ছোট ও একটি বড় তোয়ালে, অ-ডি-কোলোন, বাথ সল্ট ও ভিনিগার হইল কোল্ড স্পঞ্জের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

রোগীর ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া দাও এবং ঘরে পাখা চালাইও না। রোগীর গায়ের সমস্ত বস্ত্রাদি ও চাদর সরাইয়া ফেল। পিঠের নীচে প্রথমে ম্যাকিনটোশ ও তাহার উপর একখানি বাথ-টাওয়াল পাতিয়া দিয়া অপর বাথ-টাওয়ালখানি দিয়া রোগীর সমস্ত দেহ আবৃত কর। ছোট তোয়ালেটি জলে ভিজাইয়া জল নিংড়াইয়া লইয়া ভিজা তোয়ালেখানি দিয়া প্রথমে রোগীর মুখ মুছিয়া লইবে। তারপর শুকনো তোয়ালে দিয়া মুখ আবার ভাল করিয়া মুছিয়া লইলেই মুখ স্পঞ্জ করা হইল। তারপর এক একটি হাত লইয়া উপর হইতে নীচের দিকে টানিয়া একভাবে স্পঞ্জ করিয়া লইবে। এইভাবে

একে একে পেট, পা ও পিঠের স্পঞ্জিং শেষ করিবে। সর্বদা খুব বেশী জল দিয়া স্পঞ্জ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুকনো তোয়ালে দিয়া গা মুছিয়া ফেলিবে। স্পঞ্জের সময় গা রগড়াইবে না, বা সাবান ব্যবহার করিবে না, কারণ, ঠাণ্ডা স্পঞ্জের উদ্দেশ্য দেহ পরিষ্কার করা নয়, দেহের উত্তাপ কমান। বিশ মিনিট ধরিয়া ঠাণ্ডা স্পঞ্জ করা উচিত। তারপর রোগীকে জামাকাপড় পরাইয়া দিবে। স্পঞ্জ দিবার সময় রোগীর নাড়ির অবস্থা ও গায়ের বর্ণের দিকে বিশেষ নজর রাখিবে। চিকিৎসকের নির্দেশে তাহার সম্মুখে এইরূপ ঠাণ্ডা স্পঞ্জ দেওয়া বিধেয়।

কোল্ড প্যাক (Cold pack)—সুস্থ ব্যক্তির দেহে তাত লাগিলে (Heat stroke) হঠাৎ অত্যন্ত জর উঠিয়া যাইতে পারে। অন্য সব প্রক্রিয়া ব্যর্থ হইলে অনেক সময় কোল্ড প্যাকের সাহায্যে রোগীর জর কমান হইয়া থাকে। কোল্ড প্যাকের সরঞ্জাম ও প্রস্তুতি কোল্ড স্পঞ্জের অনুরূপ। তবে স্পঞ্জের পরিবর্তে এখানে ঠাণ্ডা জলে চাদর ভিজাইয়া ২৫-৩০ মিনিটকাল রোগীর দেহ মুড়িয়া রাখিতে হয়। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর দেহ মুছিয়া ফেলিবে এবং কাঁপুনি উঠিলে কম্বল দিয়া মুড়িয়া তাহাকে কিছু গরম পানীয় দিবে।

কোল্ড কমপ্রেস (Cold compress)—রোগীর দেহের কোন বিশেষ স্থান হইতে যদি রক্তক্ষরণ হইতে থাকে, তবে ঐ রক্তের প্রবাহ বন্ধ করিবার জন্য ঐ বিশেষ স্থানে ঠাণ্ডা সেঁক বা cold compress দেওয়া হয়। একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লও। লক্ষ্য রাখিও বস্ত্রখণ্ডটিতে যেন প্রচুর জল থাকে অথচ ফোঁটা ফোঁটা জল উহা হইতে গড়াইয়া না পড়ে। এইবার ভিজা বস্ত্রখণ্ডটি রক্তক্ষরণের স্থানে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে সেঁক দিতে থাক।

আইস ব্যাগ ব্যবহারের নিয়ম—অত্যধিক জর হইলে রোগীর মাথায় আইস ব্যাগ দিতে হয়। প্রথমে ছোট ছোট করিয়া বরফ ভাঙ্গিয়া ব্যাগে ভরিয়া লইবে এবং বরফ যাহাতে তাড়াতাড়ি গলিয়া না যায় এইজন্য উহাতে এক চামচ নুন কিংবা কিছুটা ভিনিগার মিশ্রিত করিয়া দিবে। ব্যাগের মুখ আঁটিয়া দিবার পূর্বে সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া লইবে এবং বরফ সম্পূর্ণ না গলিতেই ব্যাগে নতুন করিয়া বরফ পূরিয়া দিবে। স্মরণ রাখিও কোন এক জায়গায় বেশীক্ষণ আইস-ব্যাগ রাখিতে
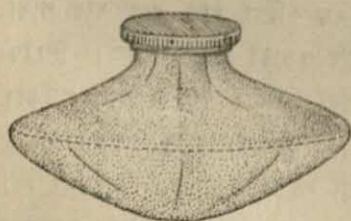
আইসব্যাগ

নাই। মাঝে মাঝে ব্যাগের স্থান পরিবর্তন করিয়া দিতে হয়। ব্যাগ ব্যবহারের পর জল ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া উহার ভিতরে কিছু পাউডার বা ফ্রেঞ্চ চকের গুড়া পুরিয়া রাখিলে ব্যাগ দীর্ঘদিন পর্যন্ত কার্যকরী থাকে।

রোগীকে উত্তপ্ত রাখিবার উপায়

রোগীর দেহ যেমন মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা রাখা প্রয়োজন, সেইরূপ শুশ্রূষাকারীকে দরকার মত তাহার দেহ উত্তপ্তও রাখিতে হয়। স্নায়বিক আঘাতে, নিদ্রাহীনতায় এবং মূত্রাশয়ের কোন কোন পীড়ায় রোগীর দেহ উত্তপ্ত করিয়া তুলিতে হয়। স্নায়বিক আঘাতে দেহের উত্তাপ কমিয়া যায় বলিয়া বাহির হইতে রোগীর দেহে উত্তাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নিদ্রাহীনতার ক্ষেত্রেও রোগীকে উত্তপ্ত রাখা দরকার। সাধারণত মানসিক চাঞ্চল্যের ফলে মাথা গরম হইয়া নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। দেহে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত নামিয়া যায় বলিয়া মাথা হাল্কা হয় এবং উত্তাপ এইভাবে সুনিদ্রার সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। এতদ্ব্যতীত দেহে উত্তাপ প্রয়োগের ফলে ঘাম ঝরে এবং মূত্রাশয়ের জল নিষ্কাশন ক্রিয়া কমিয়া গিয়া মূত্রাশয়কে বিশ্রাম দেয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দেহে উত্তাপ প্রয়োগ করা যায়। নিম্নে উহাদের কয়েকটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

গরম জলের সেঁক (Hot compress)—গা-ব্যথা, কোমর-ব্যথা বা বিশেষ কোন কারণে গরম সেঁক দিতে হইলে আমরা সচরাচর রবারের তৈয়ারী গরম জলের ব্যাগ (Hot water bag) ব্যবহার করিয়া থাকি। অনেক সময় রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিলেও এইরূপ গরম সেঁক দেওয়া হয়। প্রথমে গরম জল ব্যাগে পুরিয়া ব্যাগের মুখটি বেশ ভাল করিয়া আঁটিয়া দিয়া রোগীর দেহে সেঁক দিবে। ব্যাগে ফুটন্ত জল ব্যবহার না করাই সঙ্গত, কারণ উহাতে ব্যাগ নষ্ট হয় এবং রোগীও অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। ব্যাগ ব্যবহারের পর উহার জল নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া ব্যাগের ভিতরে ফ্রেঞ্চ চকের গুড়া অথবা পাউডার পুরিয়া রাখিবে।

হট ওয়াটার ব্যাগ

হট ওয়াটার ব্যাগ ব্যতীত বস্ত্রখণ্ড উষ্ণ জলে ভিজাইয়াও গরম সেঁক দিবার রীতি

আছে। সাধারণত দেহের কোন অংশ ফুলিয়া উঠিলে কিংবা অঙ্গে বেদনা অনুভূত হইলে এইভাবে সেঁক দেওয়া হইয়া থাকে। প্রথমে দুই টুকরা ফ্লানেল অথবা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড নাও। তারপর ফুটন্ত জলের মধ্যে একটি টুকরা ফেলিয়া খুব ভাল করিয়া ভিজাইয়া লও। একটি পরিষ্কার কাঠির সাহায্যে ঐ বস্ত্রখণ্ডটি তুলিয়া লইয়া উহার দুই কিনারা ধরিয়া এমনভাবে জল নিংড়াইয়া লইবে যে উহা হইতে জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া গড়াইয়া পড়িবে না, অথচ বস্ত্রখণ্ডটি যথেষ্ট ভিজা থাকিবে। এইবার একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়া ব্যথা কিংবা ফোলা জায়গায় সেঁক দিতে থাক এবং অপর বস্ত্রখণ্ডটি জলে ভিজিতে দাও। চোখে সেঁক দিতে হইলে কখনও ফুটন্ত জল ব্যবহার করিবে না এবং ফ্লানেল বা বস্ত্রখণ্ডের পরিবর্তে বরিক তুলা ব্যবহার করিবে।

হট ড্রাই প্যাক (Hot dry pack)—স্নায়বিক আঘাত, কাঁপুনি (rigor) ও অত্যধিক অবসাদের রোগীকে হট ড্রাই প্যাক দেওয়া হয়। রোগীর গায় গরম কম্বল চাপা দিয়া তিন চারিটি হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়া সেঁক দেওয়াকেই বলে হট ড্রাই প্যাক। হট ওয়াটার ব্যাগগুলি সর্বদা কম্বলের বাহিরে রাখিবে।

গরম জলে পা ডুবান (Foot-bath)—সর্দি হইবার ফলে যদি অনবরত নাক দিয়া জল ঝরিতে থাকে কিংবা অনিদ্রা হয়, তবে গরম জলে পা ডুবান বা ফুট-বাথ লওয়া বিশেষ উপকারী। রাত্রিবেলা আহারের পর ফুট-বাথ লইবার উৎকৃষ্ট সময়। দরজা জানালা বন্ধ করিয়া সমস্ত দেহ প্রথমে আবৃত করিয়া লইবে। তারপর একটি বালতি কিংবা গামলায় উষ্ণ জল লইয়া ধীরে ধীরে পায়ের পাতা ডুবাইবার চেষ্টা করিবে। এইভাবে আধ ঘণ্টা ধরিয়া ফুট-বাথ লইয়া পা মুছিয়া সরাসরি বিছানায় শুইয়া পড়িবে।

রোগীর চুলের যত্ন—দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে রোগীর চুলের যত্ন নেওয়াও শুশ্রূষাকারীর অবশ্য কর্তব্য। প্রাত্যহিক প্রসাধনের সময় রোগীর চুল আঁচড়াইয়া দিবে। শায়িত অবস্থায় রোগীর চুল আচড়ান অসুবিধাজনক মনে করিয়া শুশ্রূষাকারী যদি রোগীর চুলের যত্ন না নেয়, তবে কিছুদিনের মধ্যে চুলে একেবারে জট পাকাইয়া যাইবে এবং নোংরা চুলে উকুন পড়াও কিছু আশ্চর্যের নয়। লম্বা চুল হইলে প্রত্যহ বিকালে চুল আঁচড়াইয়া দুইটি বিনুনী বাঁধিয়া দিলেই সবচেয়ে ভাল হয়। খোপা কিংবা একটি বিনুনী করিলে রোগীর মাথায় ব্যথা লাগিতে পারে। কেবল চুল আঁচড়ানই নয়, কেহ দীর্ঘদিন

যাবৎ রোগে ভুগিতে থাকিলে মাঝে মাঝে মাথা ঘষিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা চুল আঠা হইয়া জট বাঁধিয়া যাইবে।

শায়িত অবস্থায় রোগীর মাথা ঘষা—প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

(১) একখানি বড় ম্যাকিনটোশ,

(২) ম্যাকিনটোশনির্মিত একটি কেপ (cape) অথবা উহার অভাবে একটি বড় তোয়ালে,

(৩) একখানি বড় তোয়ালে,

(৪) একটি ছোট গামলা বা জগে খানিকটা শ্যাম্পু (Shampoo),

(৫) মাথা ঘষিবার জন্য একটি গামলা ও

(৬) এক জগ গরম জল।

প্রথমেই রোগীর বিছানায় ম্যাকিনটোশখানি পাতিয়া লইবে। মাথার দিকে ম্যাকিনটোশের এক প্রান্ত ঠিক পিঠের নীচে আসিয়া শেষ হইবে এবং অপর প্রান্ত রোগীর ঘাড়ের নীচ দিয়া বালিশ ঢাকিয়া ফেলিয়া মাথার নীচে যেখানে মাথা ঘষিবার গামলাটি রহিয়াছে সেই পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িবে। এইবার চোখে একটি রুমাল বা ছোট তোয়ালে পটির মত করিয়া বাঁধিয়া দিবে। ম্যাকিনটোশ ও কেপ থাকাতে রোগীর জামাকাপড় কিংবা বিছানা জলে ভিজিবে না। এইবার শ্যাম্পু দিয়া যথানিয়মে মাথা ঘষিয়া দিবে। প্রচুর জল ঢালিয়া চুল ধুইয়া ফেলিবে। তারপর তোয়ালে দিয়া ধীরে ধীরে চুল মুছিয়া দিবে। ভিজা থাকিতেই চুল আঁচড়ান উচিত। ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে তাড়াতাড়ি চুল শুকাইবার এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সেসব সুবিধা নাই। তাই নাড়িয়া চাড়িয়া একটু পাখা করিয়া তাড়াতাড়ি চুল শুকাইয়া ফেলিবে।

রোগীর পথ্য—শুধু ঔষধ ও শুশ্রূষাতেই রোগী সুস্থ হইয়া ওঠে না। সঙ্গে উপযুক্ত পথ্যও চাই। পথ্য রোগীর শরীর গঠনে সাহায্য করে। কোন কোন রোগে ঔষধের চেয়ে বেশী প্রয়োজন পথ্যের। সুস্থ ব্যক্তির খাদ্যের মতই রোগীর পথ্যও প্রধানত তিনটি কাজ করে।

(ক) প্রথমত দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে,

(খ) দ্বিতীয়ত পেশীসমূহ গঠনে সাহায্য করে ও দেহে উত্তাপ সঞ্চার করে,

(গ) তৃতীয়ত দেহকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে সাহায্য করে।

উপরোক্ত সব কয়টি কাজ সাধনের জন্য আমাদের খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, কার্বোহাইড্রেট, ধাতব লবণ, ভাইটামিন ও জল থাকা দরকার। প্রোটিন আমাদের দেহ নির্মাণ করে। স্নেহজাতীয় খাদ্যের কাজ হইল দেহে শক্তি ও উত্তাপ সৃষ্টি করা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের খাদ্য সব্জি ও কার্বোহাইড্রেট-প্রধান এবং শীতপ্রধান দেশের খাদ্য প্রোটিন-প্রধান হওয়া উচিত। দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য অনুরূপভাবে ভাইটামিন, ধাতব লবণ ও জলও প্রয়োজন। কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি পীড়া হইলে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা কি সুস্থ কি অসুস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য উল্লিখিত সব কয়টি উপাদানই থাকা প্রয়োজন।

রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিবার সময় কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিবে—

(ক) রোগীর বয়স, পেশা, শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়া অনুযায়ী খাদ্যতালিকা প্রস্তুত হইবে।

(খ) প্রত্যেকবারের খাদ্য রোগীকে তৃপ্তি দিবে, পরিমাণে বেশী হইবে না অথচ পূর্ণ খাদ্যমূল্য থাকিবে।

(গ) খাদ্যমূল্য বিচার করিয়া বাজারের সস্তা জিনিসের মধ্য হইতে খাদ্য তালিকা তৈয়ারী করিবে। শুধু যে দামী বস্তুতেই খাদ্যপ্রাণ থাকে তাহা নহে, অনেক সস্তা জিনিসেরও দামী বস্তুর সমান খাদ্যমূল্য থাকে। সুগৃহিণী রোগীকে সস্তা অথচ পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইতে সক্ষম হন।

(ঘ) যে ঋতুতে যে শাক-সব্জি ও ফল পাওয়া যায়, সেই ঋতুতে সেই সব শাক-সবজি ও ফল খাইতে দিবে। সময়ের জিনিস সুস্বাদু ও সস্তা হয় এবং উহার খাদ্যমূল্যও বেশী থাকে।

(ঙ) চিকিৎসক সম্মতি দিলে রোগীর পছন্দমাফিক বিভিন্ন রকম খাদ্য দেওয়া উচিত।

পথ্য পরিবেশন—চিকিৎসক রোগীর জন্য যে পরিমাণ খাদ্য নির্ধারণ করেন তাহা বিভিন্ন বারের আহারের মধ্যে সমপরিমাণে বণ্টন করিয়া খাওয়ান উচিত। রাত্রিবেলার চেয়ে সাধারণত দিনের বেলায় আহারের মাত্রা বেশী হওয়া উচিত, কারণ, রাত্রে আহারের চেয়ে নিদ্রা ও বিশ্রাম বেশী প্রয়োজনীয়। চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে কখনও রোগীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া খাওয়ানো উচিত নয়। কখন কতটুকু খাদ্য রোগীকে দেওয়া হইয়াছে এই সম্বন্ধে একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখা বরং ভাল। তালিকা দেখিয়া চিকিৎসক আহারের পরিমাণ সম্বন্ধে এক নজরে আন্দাজ করিয়া লইতে পারেন।

রোগীর প্রত্যেক বার আহারের একটি নির্দিষ্ট সময় রাখিবে এবং ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রোগীকে খাইতে দিবে। রোগীর নিকটে খাবার আনিবার পূর্বে রোগীর হাত ও মুখ ভাল করিয়া ধোয়াইয়া লইবে এবং যেভাবে রোগীর বসিতে ভাল লাগে সেইভাবে একটি আরামদায়ক ভঙ্গীতে রোগীকে বসাইবে। সম্ভব হইলে রোগীর বিছানার উপরে একটি বড় জলচৌকি পাতিয়া লইবে এবং উহাতে খাদ্য পরিবেশন করিবে। খাবারের ট্রেখানি যেন খুব সুন্দরভাবে পরিপাটি করিয়া গুছাইয়া লওয়া হয়। পুষ্টিকর সুস্বাদু খাদ্য যেমন রোগীর
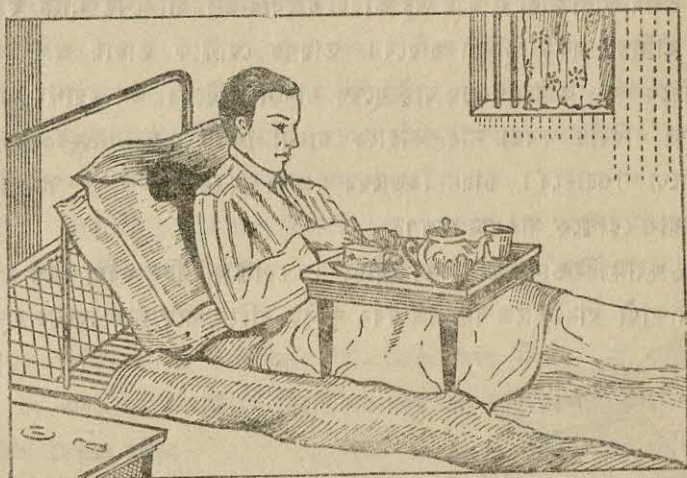
এইরূপ একটি আরামদায়ক ভঙ্গীতে রোগী শয্যায় বসিয়া আহার করিতে পারে

প্রয়োজন, আহারের পরিবেশটি তেমন পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হওয়া চাই। রোগীর দেহের উপরে একটি ন্যাপকিন বিছাইয়া লইবে নতুবা খাবারের টুকরা পড়িয়া শয্যা ও জামাকাপড় নোংরা হইতে পারে। রোগীকে যদি গরম গরম খাদ্য পরিবেশন করা হয়, তবে প্রত্যেকটি ডিশ ও প্লেট ইত্যাদি গরম জলে ধুইয়া লইবে। পরন্তু ঠাণ্ডা খাদ্য ঠাণ্ডা বাসনেই পরিবেশন করা উচিত। পরিণত বয়স্ক রোগীরা নিজ নিজ হাতে খাদ্য গ্রহণ করা পছন্দ করে। শুশ্রূষাকারী শুধু পাশে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিবে রোগী কোন্ জিনিসটি কখন চায়। রোগীর নিকট একবারে একটির বেশী 'পদ' (dish) পরিবেশন করিতে নাই। খাইবার সময় রোগীকে কোন তাড়া দিবে না।

আহারের পর্ব সমাধা হইবার সঙ্গে সঙ্গে এঁটো বাসন তুলিয়া লইবে এবং ভুক্তাবশিষ্ট একটু সময়ের জন্যও রোগীর ঘরে ফেলিয়া রাখিবে না। রোগীর জন্য কোন তরল খাদ্যের পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট করা থাকে, তবে কতটা খাদ্য নির্ধারিত আছে জানিয়া লইয়া যতবার খাওয়াইতে হইবে তত বারের মধ্যে সমপরিমাণে ভাগ করিয়া লইয়া রোগীকে খাওয়াইবে।

শয্যাশায়ী রোগীদের পথ্য—নিতান্ত দুর্বল ও পীড়িত রোগীদের সাধারণত তরল খাদ্যই দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ রোগীকে খাওয়াইবার সময় শুশ্রূষাকারী মাথা ও কাঁধ উঁচু করিয়া ধরিবার জন্য বালিশের নীচে হাত দিয়া বালিশটি একটু তুলিয়া ধরিবে। তারপর রোগীকে তাহার সুবিধামত একদিকে কাত করিয়া পথ্যের বাটি মুখের সামনে ধরিবে। যে রোগীর মাথা তুলিয়া ধরিবার ক্ষমতা নাই তাহাকে চায়না ফিডারের (China feeder) সাহায্যে খাওয়াইবে। চায়না ফিডারের অভাবে খুব ছোট একটি টি-পটে পথ্য ঢালিয়াও রোগীকে খাওয়ান চলে।

শুশ্রূষাকারী ডান হাতে ফিডার ধরিবে। রোগী যদি চিত হইয়া থাকে তবে শুশ্রূষাকারী বাম হাতে বালিশটি ঈষৎ তুলিয়া ধরিবে, সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মুখটি
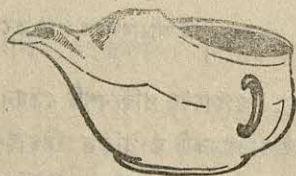
আইডিয়াল ফিডার ও চায়না ফিডার

একটু উঁচু হইয়া উঠিবে এবং তাহার খাদ্যগ্রহণে সুবিধা হইবে। রোগী যদি পাশ ফিরিয়া শুইয়া থাকে রোগীর বালিশের কিনারা উঁচু করিয়া রোগীর মুখটি সামান্য তুলিয়া লইবে। এইবার ফিডারের নলটি রোগীর মুখে লাগাইয়া দিবে এবং সামান্য ধাক্কা দিয়া প্রতিবারে একটুখানি তরল পথ্য ঢালিয়া দিবে। যতটুকু মুখে ঢালা হইয়াছে ততটুকু গিলিয়া না ফেলা পর্যন্ত রোগীর মুখে দ্বিতীয়বার পথ্য ঢালিবে না।

কোন কোন রোগী চায়না ফিডারের চেয়ে আইডিয়াল ফিডারে খাওয়া বেশী পছন্দ করে। ফিডার একেবারে ভর্তি না করিয়া উহার এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখিবে। তারপর একটি টিউব বা ষ্ট্র রোগীর মুখে লাগাইয়া দিলে রোগী নিজেই ফিডার হইতে খাদ্যদ্রব্য মুখ দিয়া টানিয়া লইতে পারিবে। প্রতিবার আহারের পর ষ্ট্র পোড়াইয়া ফেলিবে। গ্লাস-টিউব ব্যবহার করিলে তাহা ফুটাইয়া নির্বীজিত করিয়া লইবে এবং জলে রাখিয়া দিবে।

রোগীর ঔষধ—

রোগীকে ঔষধ দিবার দায়িত্বও শুশ্রূষাকারীর। উপযুক্ত ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষার সাহায্যেই রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলা সম্ভব। দেহে ঔষধ প্রবেশ করাইবার নানারকম পথ আছে ; যথা—(ক) মুখ, (খ) নাক, (গ) ত্বক্ ও (ঘ) মলদ্বার।

(ক) **মুখের মধ্য দিয়া রোগীর দেহে ঔষধ দেওয়া**—রোগীকে ঔষধ খাওয়াইতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবে :—

(১) ঔষধ দিবার পূর্বে সর্বদা ঔষধের লেবেল দেখিয়া নাম পড়িয়া লইবে। শুধুমাত্র গন্ধ শুঁকিয়া বা ঔষধের বর্ণ দেখিয়া কখন কোন্ ঔষধ দিতে হইবে আন্দাজ করিতে যাইবে না।

(২) চিকিৎসক যদি ঔষধ দিবার কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ না করিয়া দেন তবে ঔষধ দিবার মোটামুটি নিম্নলিখিত সময় অনুসরণ করা যাইতে পারে।

ঔষধ দেওয়া হইবে	সময়	রাত্রি	এবং দিন
দুই ঘণ্টা অন্তর	২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২	"	"
তিন ঘণ্টা অন্তর	৩, ৬, ৯, ১২	"	"
দিনে তিন বার	১০, ২, ৬	দিন	
দিনে চার বার	১০, ২, ৬, ১০	দিন	

(৩) আহারের পর ঔষধ দিবার নির্দেশ থাকিলে আহার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ দিবে এবং পূর্বে যদি ঔষধ দিবার নির্দেশ থাকে তবে আহারের অন্তত ২০ মিনিট পূর্বে ঔষধ দিবে।

(৪) চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও কখনও ঘুম ভাঙ্গাইয়া ঔষধ দিবে না।

(৫) ঔষধ দিবার পরে রোগীকে সর্বদা ছোট এক গ্লাস জল পান করিতে দিবে। ঔষধ খাইবার পরে রোগীর মুখ যদি অত্যন্ত বিস্বাদ লাগে তবে এই বিস্বাদ ভাব দূর করিবার জন্য মৌরী বা জোয়ান ইত্যাদি যে কোন মুখরোচক

জিনিস দিবে। রোগীর মুখ যদি শুকনা বোধ হয় তবে ঔষধ দিবার পূর্বে মুখে একটু জল দিয়া লইবে।

(৬) খাইবার ঔষধ ব্যতীত অন্য যে-কোন ঔষধ যদি বিষাক্ত না হয় তথাপি সর্বদা পৃথক্ করিয়া রাখিবে।

(৭) বিষাক্ত ঔষধ ও খাইবার ঔষধের শিশির গড়ন ও বর্ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিষাক্ত ঔষধের জন্য রঙিন শিশি এবং খাইবার ঔষধের জন্য সাদা শিশি ব্যবহার করিবে। বিষাক্ত ঔষধের শিশির গায় "বিষ" শব্দটি বড় করিয়া লিখিয়া দিবে।

(৮) সংক্রামক রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র ও বস্ত্রাদির মতই তাহার ঔষধের গ্লাস, শিশি, মুঁখ ধুইবার গামলা ইত্যাদি পৃথক্ করিয়া রাখিবে।

(৯) ঔষধে লোহা থাকিলে দাঁত কাল হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য লৌহ-মিশ্রিত ঔষধ স্ট্র দিয়া রোগীকে গ্লাস হইতে টানিয়া খাইতে বলিবে।

মুখ দিয়া যেসব ঔষধ খাওয়ানো হয় তাহা সাধারণত ছয় প্রকার—তরল (liquid), বটিকা (pills), চূর্ণ (power), ট্যাবলেট (tablet), ক্যাপসুল (capsuls), তৈলজাতীয় (oil) ঔষধ।

তরল ঔষধ (Liquid)—রোগীর মুখে তরল ঔষধ দিবার পূর্বে উহা ঝাঁকিয়া লইবে। যে সব ঔষধের তলায় থিতানি পড়ে উহা গ্লাসে ঢালিবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া রোগীর মুখে ঢালিয়া দিবে। তরল ঔষধ মেজার গ্লাসে ঢালিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মেজার গ্লাস

ঔষধ ঢালিবার পরে শিশির ছিপি খুব ভাল করিয়া আঁটিয়া দিবে এবং ঔষধ খাওয়ানো হইয়া গেলে গ্লাসটি সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া শুকাইয়া ফেলিবে।

বটিকা (Pills)—সাধারণত একবারে একটি গোটা বটিকা খাইয়া ফেলিবার নিয়ম। অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে যে গলার ভিতরে বটিকা ফেলিয়া দিলে গিলিতে সুবিধা। রোগীর মুখে প্রথমে শুধু একটু জল ঢালিবে। তারপর জিহ্বার অগ্রভাগে বটিকাটি রাখিয়া রোগীকে গিলিতে বলিবে।
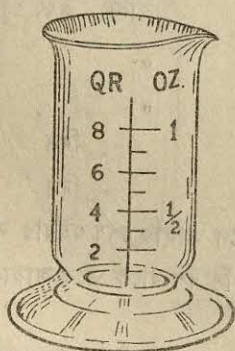
চূর্ণ (Powder)—জলের সঙ্গে ঔষধ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। কখন কখনও চিকিৎসক মধুর সঙ্গে চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইবার নির্দেশ দেন। শুশ্রূষাকারীর কাজ হইল চিকিৎসকের নির্দেশ পালন করা।

ট্যাবলেট (Tablets)—বটিকার মতই ট্যাবলেট একসঙ্গে জল দিয়া গিলিয়া-ফেলা যায় নতুবা চূর্ণ করিয়া জলের সঙ্গেও খাওয়া চলে। গলা অথবা বুকের কষ্টের জন্য যে ট্যাবলেট দেওয়া হয়, রোগীকে তাহা সর্বদা চুষিয়া খাইতে বলিবে।

ক্যাপসুল (Capsuls)—একটি খাপে ভরা ঔষধ। রোগীকে সর্বদা গিলিয়া খাইতে দিবে।

তৈলাক্ত ঔষধ (Oil)—যথা, ক্যাস্টর অয়েল অথবা কড্‌লিভার অয়েল। গ্লাসের ভিতর এবং কিনারায় পাতিলেবু কিংবা কমলালেবুর রস মাখাইয়া লইয়া ঔষধ ঢালিবে। এইবার খানিকটা লেবুর রস প্রথমে গ্লাসে ঢালিয়া দিয়া ঔষধ দিবে। তারপর আবার খানিকটা লেবুর রস ঢালিয়া দিবে। এইবার গ্লাসের সমস্ত পদার্থ টুকু রোগীর মুখে ঢালিবে।

গরম দুধের সঙ্গে ক্যাস্টর অয়েল মিশাইয়াও রোগীকে দেওয়া যায়। একটি কাঁটা (fork) দিয়া বেশ করিয়া ক্যাস্টর অয়েল ও দুধ ফেটাইয়া লইবে। তারপর রোগীকে উহা খাইতে দিবে। তৈলাক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্য সর্বদা একটি পৃথক্ গ্লাস ব্যবহার করিবে। লবণ ও জল দিয়া সহজেই ঐ গ্লাস পরিষ্কার করা চলে।

(খ) **নাক**—ঔষধ দিবার আর একটি পথ হইল নাক। অত্যন্ত পীড়িত রোগীদের নিঃশ্বাসের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য নাসাপথে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে শিক্ষিত (trained) শুশ্রূষাকারী ব্যতীত গৃহে সাধারণ লোকেদের দিয়া এইরূপ অক্সিজেন দিবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

(গ) **ত্বক্**—দেহে ঔষধ প্রবেশের আর একটি পথ হইল ত্বক্। ইনজেকশান ও মালিশ এই দুই ভাবে ত্বকের মধ্য দিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী মালিশ করা কঠিন নয় কিন্তু চিকিৎসক কিংবা শিক্ষিত শুশ্রূষাকারী ব্যতীত অপর কেহ রোগীকে ইনজেকশন দিবার চেষ্টা করিবে না।

(ঘ) **মলদ্বার**—মলদ্বার দিয়া রোগীকে এনিমা (enema) দেওয়া হয়। এনিমা দিবার উদ্দেশ্য প্রধানত তিনটি :—

(১) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা,

(২) গুরুতর উদরাময় নিবারণ করা,

(৩) অচেতন রোগীর দেহে খাদ্য প্রবেশ করানো।

এনিমা দিবার পদ্ধতি—এনিমা দিবার জন্য রবারের নল লাগানো এক প্রকার এনিমা পাত্র (enema can) বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এই নলটির প্রান্তভাগে স্টপককযুক্ত একটি নির্গমনল লাগানো থাকে। এনিমা নিতে হইলে রোগীর বয়স ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া পরিমিত ঈষদুষ্ণ জলে ভাল সাবান গুলিয়া লইয়া পাত্রের ভিতরে রাখিবে। এইবার সাবান-জলপূর্ণ পাত্রটি কোন উঁচু টেবিলে বসাইয়া অথবা দেওয়ালের গায় কোন পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিবে এবং নলের অগ্রভাগে ভেসিলিন মাখাইয়া পিচ্ছিল করিয়া লইয়া উহা রোগীর মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। এখন স্টপককটির নির্গম নল খুলিয়া দিলে এনিমা পাত্র হইতে সাবান-জল মলাধারে ঢুকিতে থাকিবে। সমস্ত সাবানজল রোগীর মলাধারে প্রবেশ করাইবার পর মলদ্বারের মুখে একটি তুলার প্লাগ চাপিয়া ধরিবে। পায়খানার বেগ আসিলে বেডপ্যান দিবে এবং প্লাগ খুলিয়া দিবে। তখন সাবানজলের সহিত রোগীর পেটের সমস্ত মল বাহির হইয়া আসিবে। অতিরিক্ত কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে সাবানজলের এনিমা দিবার পূর্বে বয়স্কদের ক্ষেত্রে ক্যাস্টর অয়েল অথবা অলিভ অয়েল এবং
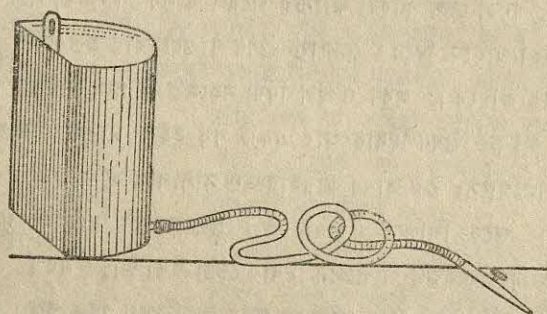
এনিমা পাত্র

শিশুদের ক্ষেত্রে গ্লিসারিণ এনিমা দিবার রীতি আছে। প্রথমে অয়েল বা গ্লিসারিণপূর্ণ পাত্রটি একটি গরম জলের পাত্রের মধ্যে বসাইয়া গরম করিয়া লইতে হয়। তারপর রোগীর মলদ্বারের ভিতর দিয়া ঐ উষ্ণ তেল রোগীর মলাধারে প্রবেশ করাইতে হয়। আধঘণ্টা পরে পুনরায় যথারীতি সাবানজলের এনিমা দিয়া বেডপ্যান দিতে হয়।

অচেতন রোগীদের মুখ দিয়া খাওয়ান সম্ভব হয় না বলিয়া মলদ্বার দিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপভাবে খাওয়ানোকেও এনিমা দেওয়া

বলে। সাধারণ লবণ জলের (normal saline water) সঙ্গে গ্লুকোজ মিশাইয়া মলদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। চিকিৎসকের নিকট হইতে লবণ জল ও গ্লুকোজের পরিমাণ জানিয়া লইবে। রোগীকে এনিমার সাহায্যে খাওয়াইবার পূর্বে পরীক্ষা করিয়া লইবে রোগীর তলপেটে কোন মল জমা হইয়া আছে কিনা। সাধারণত নল দিয়া গরম জল প্রবেশ করাইয়া দিবার পর যদি পরিষ্কার মলহীন জল বাহির হইয়া আসে, তবে বুঝিবে রোগীর তলপেটে মল জমিয়া নাই, সুতরাং নির্ভয়ে খাদ্য দেওয়া চলিতে পারে।

স্নায়বিক আঘাতপ্রাপ্ত কিংবা অবসন্ন রোগীদের কখন কখন চিকিৎসক স্যালাইন এনিমা দিবার নির্দেশ দেন। গরম জলে নুন মিশাইয়া এই এনিমা তৈয়ারী করিতে হয়।

এনিমা দেওয়া অতি সহজ কাজ। যে কোন ব্যক্তিই সামান্য অভ্যাস করিলে অতি সহজে ও সুষ্ঠুভাবে এনিমা দিতে পারে। প্রতি গৃহে একটি এনিমা পাত্র কিনিয়া রাখা উচিত।

বেড-সোর (Bed sore)—বেড-সোর কথাটির অর্থ শয্যাজনিত চর্মের ঘা। দীর্ঘদিন যাবৎ শয্যাশায়ী হইয়া থাকিবার ফলে রোগীর দেহের কোন কোন অংশের রক্ত চলাচল কমিয়া আসে এবং সেই সমস্ত জায়গায় বেড-সোর হইতে চায়। শরীরের যে সমস্ত অংশে চর্মের উপর হাড় বেশ উঁচু হইয়া থাকে, সেই সব স্থানে বেড-সোর দেখা দেয়, যেমন—কাঁধ, কনুই, নিতম্ব, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালি ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত যে সব অংশে অনবরত ঘষা ও চাপ লাগে সেই সকল স্থানেও বেড-সোর হইতে চায়। বেড-সোর নিবারণের জন্য শুশ্রূষাকারীকে সর্বদা সজাগ থাকিতে হয়, কারণ, একবার বেড-সোর দেখা দিলে উহা দ্রুত ছড়াইতে থাকে। এইজন্য বেড-সোরের চিকিৎসার চেয়ে বেড-সোর প্রতিরোধ করা সহজ কাজ।

বেড-সোরের সূচনা ও কারণ—বেড-সোর দেখা দিবার পূর্বে চর্মের সেই স্থানটি লালবর্ণ হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ উহা প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে বেড-সোর এত দ্রুত ছড়াইতে থাকে যে উহার প্রসার বন্ধ করা শুশ্রূষাকারীর পক্ষে এক দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

বেড-সোর হইবার কারণ প্রধানত চারিটি :—

(১) **অসাবধানতাবশত রোগীকে নাড়াচাড়া করা**—শুশ্রূষাকারীর অসাবধানতা বেড-সোরের একটি কারণ। বেড-প্যান কিংবা বেড-রেস্টের ধারাল কিনারায় ঘষা লাগিয়া বেড-সোর হইতে পারে।

(২) **ঘর্ষণ**—চাদর জড় অথবা ভাঁজ হইয়া থাকিবার ফলে কিংবা বিছানায় রুটির গুঁড়া জমা হইয়া থাকিলে ঘর্ষণের সৃষ্টি হইতে পারে। ঘর্ষণের ফলে সচরাচর জানুদ্বয়ের ভিতরের দিকে, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে, গোড়ালির ভিতর দিকে এবং কানে বেড-সোর হইয়া থাকে।

(৩) **চাপ**—বহুদিন ধরিয়া শয্যায় একইভাবে শুইয়া থাকিবার ফলে দেহের কোন কোন অংশে অত্যন্ত চাপ পড়িতে পারে এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া অবশেষে বেড-সোর সৃষ্টি করে।

(৪) **দেহের কোন অংশ অনবরত ভিজা থাকিবার ফলে**—দেহের অংশবিশেষ অনবরত ভিজা থাকিতে থাকিতে সেই স্থানের চামড়া নরম হইয়া আসে এবং সহজেই সেখানে ক্ষত হইতে পারে। নানা কারণে শরীর ভিজা থাকিতে পারে, যেমন—অতিরিক্ত ঘাম হইবার ফলে, মলমূত্রের বেগধারণে অক্ষমতার জন্য, আবার স্নানের পরে রোগীর দেহ ভাল করিয়া না মোছাইয়া দিলেও শরীর ভিজা থাকে।

বেড-সোর প্রতিরোধের উপায়—

(১) বিছানা পাতিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে চাদরে কিংবা ম্যাকিনটোশে কোথাও যেন ভাঁজ না পড়ে, কুচকাইয়া না যায় কিংবা রুটির গুঁড়া না থাকে।

(২) শরীরের যে সকল স্থানে চাপ পড়ে সেই সকল স্থানে দিনে অন্তত দুইবার করিয়া সাবানজল দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া দিবে। শুশ্রূষাকারী হাতে সাবানজল লইয়া নির্দিষ্ট স্থানটিতে বৃত্তাকারে মাখাইবে (massage)। সাবান-জল চর্মে শুষিয়া গেলে অলিভ অয়েল ও স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া সকল স্থানে ঘষিয়া দিবে এবং রোগীর গায় একটু জিঙ্ক (zinc), বোরিক (boric) ও স্টার্চ (starch) পাউডার ছড়াইয়া দিবে।

(৩) রোগি-দেহের কোন অংশে যাহাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে এবং প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অক্ষম রোগীদের পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া দিবে।

(৪) শরীরের কোথাও জল জমিয়া থাকিতে দিবে না।

(৫) চর্মে কোনরূপ রুক্ষতা দেখা দিলে স্পিরিট ও অলিভ অয়েল সম-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ঐ স্থানে মাখাইবে।

বেড-সোরের চিকিৎসা—প্রতিরোধের সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি বেড-সোর দেখা দেয় কিংবা চর্মের কোন অংশ লাল হইয়া ওঠে, তবে

শুশ্রূষাকারীর প্রথম কর্তব্য হইবে পরদিন চিকিৎসক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানটির দিকে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং ইতোমধ্যে—

(১) শুশ্রূষাকারী এয়ার কুশন দিয়া বেড-সোরকে সব রকম চাপ ও ঘর্ষণ হইতে রক্ষা করিবে।

(২) দেহের অন্যত্র যাহাতে বেড-সোর না ছড়াইতে পারে এইজন্য ক্ষত-স্থানটি পরিষ্কার রাখিবে।

(৩) বেড-সোরের আশেপাশে উঁচু হাড়বিশিষ্ট স্থানগুলিতে দিনে অনেকবার অলিভ অয়েল ও স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া মাখাইবে।

বেড-প্যান ব্যবহারের নিয়ম—রোগীকে বেড-প্যান দিবার পূর্বে উহা একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়া ঢাকিয়া লইবে। প্রথমে রোগীর জামাকাপড় আলগা করিয়া দিবে। তারপর বেড-প্যানের ঢাকনা ও কাপড়ের ঢাকনা তুলিয়া দিয়া রোগীর দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইবে। বাম হাতে রোগীর নিতম্ব উঁচু করিয়া ধরিয়া ডান হাতে বেড-প্যানটি বসাইয়া দিবে। কঠিন পীড়া হইলে এবং নড়াচড়া নিষিদ্ধ হইলে অথবা রোগীর দেহ অত্যন্ত ভারি হইলে শুশ্রূষাকারী অপর কোন ব্যক্তির সাহায্যে রোগীকে বেড-প্যান দিবে। বেড-সোর প্রতিরোধের জন্য খুব দুর্বল রোগীর নিতম্ব ও বেড-প্যানের মাঝখানে একটুকরা কাপড় ভাঁজ করিয়া দিবে।
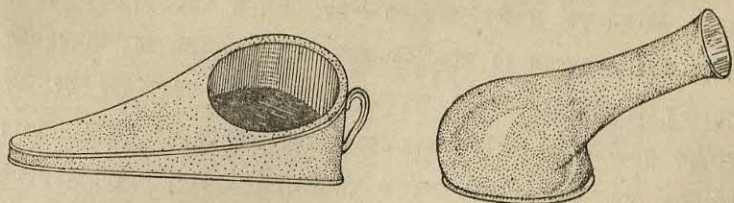
বেড-প্যান ও ইউরিন্যাল

মল নিঃসরণের পর রোগীর শৌচাদি কাজ শেষ করিয়া ফেলিবে। শৌচকর্মের জন্য তুলা, কাগজ অথবা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা জলে ভিজাইয়া ব্যবহার করা উচিত। ব্যবহৃত তুলা বা কাগজের টুকরা বেড-প্যানে না ফেলিয়া অন্য কোন স্বতন্ত্র পাত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং পরে পোড়াইয়া ফেলিবে। ব্যবহারের পরেই বেড-প্যান রোগি-কক্ষের বাহিরে লইয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

মূত্র নিঃসরণের জন্য দুর্বল রোগীদের ইউরিন্যাল ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। প্রতিবার ব্যবহারের পর ইউরিন্যাল ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিবে এবং দিনে অন্তত একবার সোডা ও গরম জল দিয়া ইউরিন্যাল পরিষ্কার করিবে।

(৩) চিকিৎসকের প্রতি কর্তব্য

রোগীর প্রতি যেমন শুশ্রূষাকারীর কতকগুলি কর্তব্য রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে চিকিৎসকের প্রতি। সাধারণত চিকিৎসক সমস্ত দিনে একবার রোগীকে দেখিতে আসেন, অথচ তাহাকে রোগীর সারাদিনের অবস্থা অবগত হইতে হয়। রোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া শুশ্রূষাকারী একটি চার্ট তৈয়ারী করিয়া রাখিবে, যাহাতে ঐ চার্ট দেখিয়া চিকিৎসক রোগীর যথাযথ অবস্থা জানিতে পারেন। চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীর মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা ভিন্ন রোগীর চিকিৎসা সম্ভব হয় না। শুশ্রূষাকারী প্রথমেই দিনে অন্তত দুইবার করিয়া রোগীর দেহের তাপ লইবে।

তাপ লইবার প্রয়োজনীয়তা ও তাপ পরীক্ষার পদ্ধতি—একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহের উত্তাপ সাধারণত ৯৮·৪° ডিগ্রী ফারেনহাইট। তবে বয়স, দিনের সময় এবং আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী আমাদের দৈহিক উত্তাপের সামান্য তারতম্য ঘটে। সাধারণত সকাল বেলাকার চেয়ে সন্ধ্যার সময় দেহের উত্তাপ বাড়ে। একটি শিশুর দেহের তাপ ৯৯° ডিগ্রী ফারেনহাইট হইতে পারে, আবার একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির তাপ ৯৭°—৯৮° ডিগ্রীও হইতে পারে। কোন কারণে কাহারো দেহের এই স্বাভাবিক তাপ যদি বাড়িয়া যায়, তবে আমরা বলি লোকটির জ্বর হইয়াছে এবং জ্বর অসুখের ইঙ্গিত দেয়। জ্বর হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে একটি এনিমা কিংবা কোন রেচক ঔষধ দিয়া রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে। দুধ, বার্লির জল ও ফলের রস ইত্যাদি হাল্কা পথ্য দিয়া রোগীকে বিশ্রামে থাকিতে দিবে।
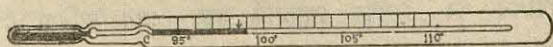
ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার

জ্বর পরীক্ষার সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরশীল যন্ত্র হইল একটি ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার। উহার গায় ৯৫° হইতে ১১০° ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে, কারণ জীবিত ব্যক্তির দেহের তাপমাত্রা ইহার ভিতরেই ওঠানামা

করে। সেইজন্য ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার অন্যান্য থার্মোমিটারের চেয়ে আকৃতিতে অনেক ছোট। থার্মোমিটারের ৯৮'৪° ডিগ্রীতে একটি Y চিহ্ন থাকে। উহা স্বাভাবিক ও সুস্থ দেহের তাপমাত্রা বুঝায়। থার্মোমিটারের বাল্‌বে পারদ পোরা থাকে। দেহের উত্তাপের সংস্পর্শে আসিলে ঐ পারদ আয়তনে বাড়িয়া ক্রমশ উপরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বাল্‌ব হইতে থার্মোমিটারের দেহে পারদ প্রবেশের রাস্তাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বাঁকা। (চিত্রের C অংশ লক্ষ্য কর।) ইহার ফলে পারদ একবার দেহের উত্তাপ অনুযায়ী উপরে উঠিয়া গেলে দেহের বাহিরে আনিলেও উহা আর বাল্‌বে নামিয়া আসিতে পারে না। ইহার জন্য আমাদের তাপমাত্রা দেখিবার সুবিধা হয়। সাধারণ থার্মোমিটারের এই সুবিধা নাই। উত্তাপ দেখা হইয়া গেলে পারদ ঝাঁকাইয়া পুনর্বার ৯৫° ডিগ্রীতে নামাইয়া রাখিতে হয়।

তাপ লইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে—

(১) পারদ ৯৫° ডিগ্রীতে নামিয়া আসিয়াছে কিনা।

(২) কোন খাদ্য কিংবা পানীয় গ্রহণের অন্তত ১৫ মিনিটের মধ্যে তাপ লইবে না। পানীয়ের শীতলতা মুখে শীতলভাব আনিয়া দেয়। ফলে রোগীর দেহের সঠিক তাপ জানা যায় না। একই কারণে মুখ, বগল কিংবা কুঁচকি ধৌত করিবার অব্যবহিত পরে তাপ পরীক্ষা করিতে নাই।

(৩) শুশ্রূষাকারী নিজে রোগীর দেহের তাপ লইবে—রোগীর হাতে কখনও থার্মোমিটার দিবে না।

(৪) তাপ পরীক্ষার পরে থার্মোমিটার দেখিয়া জ্বরের মাত্রা দৈনিক চার্টে লিখিয়া রাখিবে। তারপর যন্ত্রটি ঝাঁকিয়া মার্কারি নামাইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিবে এবং মৃদু জীবাণুনাশক দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিবে।

তাপ লইবার নিয়ম—

উপকরণ—ছোট ট্রের উপরে একটি মৃদু জীবাণুনাশক দ্রবণে থার্মোমিটার ডুবাইয়া রাখিবে এবং অপর একটি পাত্রে ঠাণ্ডা জল ও খানিকটা পরিষ্কার শুকনো কাপড়ের টুকরা লইবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে দেহের বিভিন্ন স্থানের তাপ লইতে হয়:—

মুখে—বস্ত্রখণ্ড দিয়া থার্মোমিটারটি মুছিয়া লইবে, তারপর ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া আবার মুছিয়া লইবে। এইবার থার্মোমিটারের বাল্‌বটি জিহ্বার নীচে

গুজিয়া দিবে। রোগীকে নাক দিয়া প্রশ্বাস লইতে বলিবে এবং লক্ষ্য রাখিও রোগী যেন যন্ত্রটি দাঁত দিয়া কামড়াইয়া না ধরে।

বগলে (Axilla)—বগল শুষ্ক থাকা চাই। থার্মোমিটারটি মুছিয়া লইয়া রোগীর বগলে দাও। হাতখানি রোগীর বুকের উপর চাপিয়া রাখিতে বলিবে।

কুঁচকিতে (Groin)—বগলে এবং কুঁচকিতে একই পদ্ধতিতে থার্মোমিটার দিতে হয়। তবে থার্মোমিটার যাহাতে চর্মের সংস্পর্শে আসিতে পারে এইজন্য হাঁটু চাপিয়া ধরিতে হয়।

মলদ্বার (Rectum)—কেবলমাত্র এক বৎসর বয়স্ক শিশুদেরই মলদ্বারে থার্মোমিটার দেওয়া যায়। তেল অথবা সামান্য ভেসিলিন মাখাইয়া থার্মোমিটারের বাল্‌বটি মলদ্বারে স্থাপন কর। উত্তাপ পরীক্ষা হইয়া গেলে জলে ধুইয়া উহা জীবাণুনাশক দ্রবণে ভিজাইয়া রাখ।

জ্বর লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম—রোগীর দেহের উত্তাপ নির্ণয়ের পরে উহা কাগজে ছক কাটিয়া লিখিয়া রাখা আবশ্যক, কারণ, কতিপয় রোগে জ্বরের গতি
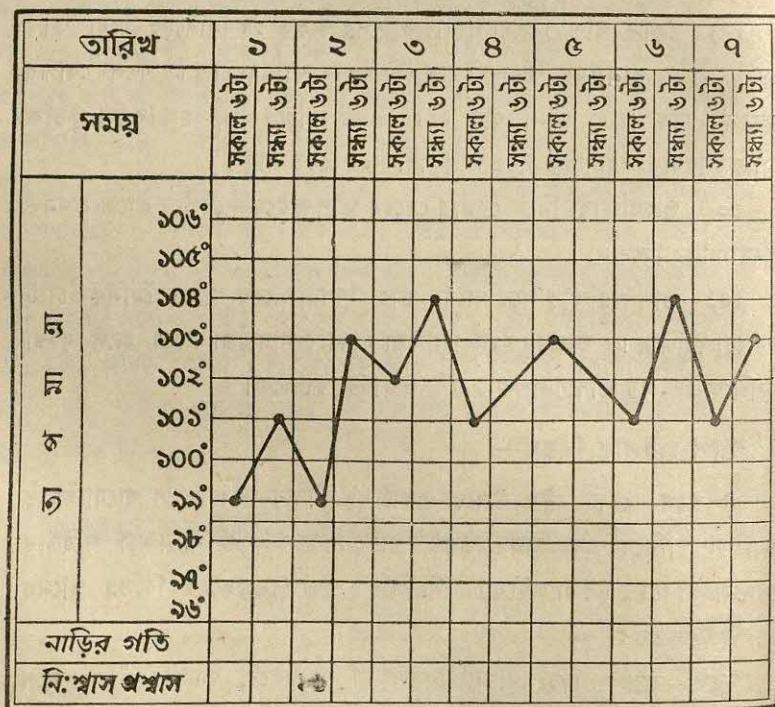
জানা থাকিলে রোগ নির্ণয়ের সুবিধা হয়। তাপমাত্রার ছক লিখিবার একটি বিশেষ নিয়ম রহিয়াছে। প্রথমে গ্রাফ পেপারের অনুকরণে কাগজে ছোট ছোট চৌকা ঘর কাটিয়া লইতে হয়। ছকের উপরিভাগে বাঁ হইতে ডান দিকে তারিখ ও তাপ লইবার সময় দেওয়া থাকিবে এবং দিনে দুইবার জ্বর দেখিলে ছকে প্রতি দিনের জন্য দুইটি করিয়া ঘর নির্দিষ্ট রাখিবে। ছকের বাম দিকে থার্মোমিটারের অনুকরণে ৯৬° হইতে ১০৬° ডিগ্রী পর্যন্ত দাগ কাটিয়া রাখিবে। এইবার জ্বর দেখিয়া ছকের ভিতরকার ঘরগুলিতে জ্বরের অঙ্ক বসাইবে। বিন্দুর সাহায্যে সচরাচর ঐ অঙ্ক নির্ধারিত হয় এবং একটি রেখা টানিয়া দিয়া বিন্দুগুলিকে পরস্পর যুক্ত করিয়া দিলে জ্বরের ওঠানামা খুব সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। সর্বনিম্নে প্রতিদিনকার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ও নাড়ির গতি লিখিবার স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে। (পূর্ব-পৃষ্ঠার ছক দেখ)।

সাধারণ রোগে আমরা দিনে সাধারণত দুইবার জ্বর দেখিয়া থাকি। কিন্তু টাইফয়েড প্রভৃতি পীড়ায় দুইবার জ্বর দেখিলে চলে না। সেইক্ষেত্রে প্রতিদিনের জ্বর দেখিবার জন্য দুইটি ঘর নির্দিষ্ট না রাখিয়া ছয়টি ঘর রাখিবে এবং সময় নির্দেশের স্থানে সকাল, সন্ধ্যা না লিখিয়া ৬, ১০, ২ লিখিয়া রাখিবে। জ্বরের চার্ট দেখিয়া চিকিৎসক বেলা ৬টা, ১০টা ও ২টায় রোগীর কত জ্বর ছিল জানিতে পারিবেন।

নাড়ির (pulse) গতি পরীক্ষা করিবার নিয়ম—চিকিৎসকের সুবিধার জন্য দেহের উত্তাপ জানা যেমন দরকার, তেমনি নাড়ির গতি কিরূপ, দ্রুত কিংবা মন্থর, সবল অথবা ক্ষীণ তাহাও জানা দরকার। আমাদের হৃৎপিণ্ডের (heart) স্পন্দনের তালে তালে ধমনীগুলিও (artery) নিয়মিতভাবে স্ফীত হইয়া ওঠে। ধমনীর এই স্ফীতিকে বলে নাড়ি। দেহের যেখানে ধমনী চলিয়া গিয়াছে, সেখানেই আমরা নাড়ি অনুভব করিতে পারি। তবে হাতের কব্জির নাড়ির স্পন্দনই বেশ স্পষ্ট অনুভূত হয় বলিয়া কব্জির নাড়ি দেখিবার রীতিই চলিয়া আসিতেছে। শুশ্রূষাকারী রোগীর কব্জির সম্মুখের ধমনী তাহার তিনটি অঙ্গুলি দিয়া ঈষৎ চাপিয়া ধরিবে এবং এক মিনিট ধরিয়া রোগীর নাড়ির গতি গণনা করিবে। নাড়ি দেখিবার সময় সর্বদাই একটি সেকেণ্ডের কাঁটাওয়ালা ঘড়ি ব্যবহার করিবে।

নাড়ির স্বাভাবিক স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭২ বার। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের নাড়ির স্পন্দন অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং শিশুদের নাড়ির স্পন্দন আরও বেশী দ্রুত।

রাত দুইটার সময় রোগী সাধারণত ঘুমাইয়া থাকে বলিয়া তখন আর উত্তাপ লওয়া হয় নাই।
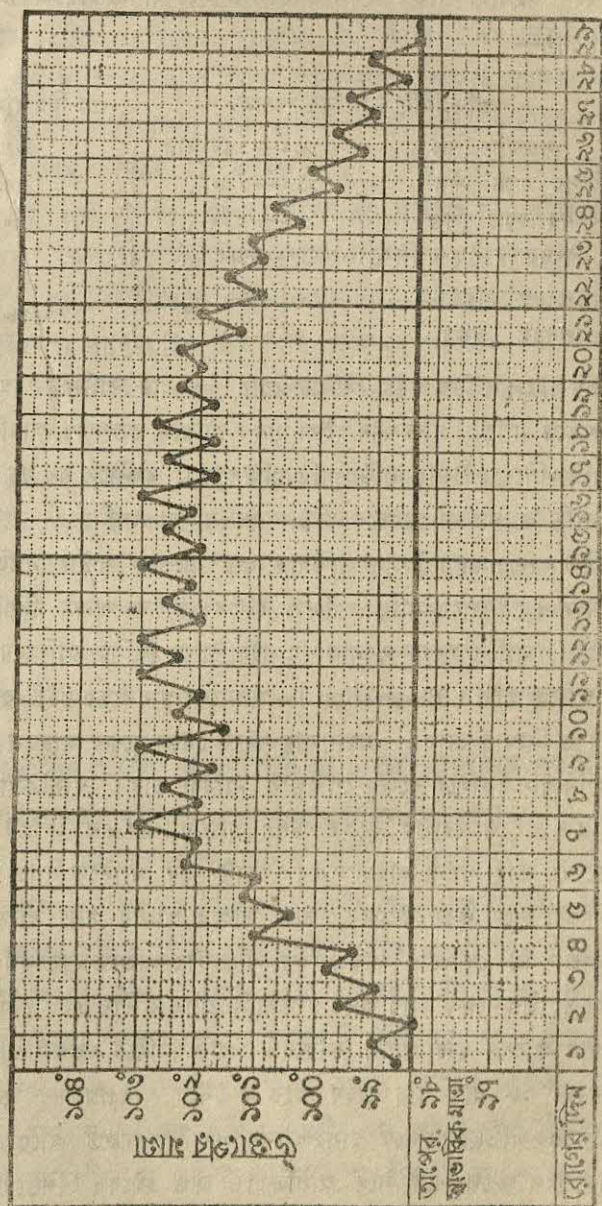
টাইফয়েড রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাপমাত্রা দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ওঠানামা করে তবে জ্বর কখনই একেবারে ছাড়িয়া যায় না। সাধারণত প্রতিদিন প্রত্যুষে পূর্বদিনের তাপমাত্রার চেয়ে জ্বর আধ ডিগ্রী নামিয়া যায় এবং রাত্রিবেলা সর্বোচ্চ তাপমাত্রার চেয়ে আধ ডিগ্রী করিয়া বাড়ে।

নীচে বয়স অনুযায়ী নাড়ির স্পন্দন ও প্রতি মিনিটে শ্বাসক্রিয়ার একটি তালিকা দেওয়া গেল—

প্রতি মিনিটে নাড়ির স্পন্দন		প্রঃ মিঃ শ্বাসক্রিয়া
সদ্যজাত শিশু	১৩০—১৪০ বার	৩৫
এক বৎসর বয়স্ক শিশু	১১০—১২০ ,,	২৫
দুই বৎসর বয়স্ক শিশু	১০০—১১০ ,,	২০
৮-১৪ বৎসর (বালক-বালিকা)	৮০—৯০ ,,	
প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা	৬৫—৮০ ,,	১৮
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	৬০—৭২ ,,	

জ্বর হইলে নাড়ির গতি মিনিটে প্রায় ১০ বার বাড়িয়া যায়। আবার টাইফয়েডে নাড়ির গতি ক্ষীণ হইয়া যায়। ব্যায়াম, রক্তক্ষরণ, স্নায়বিক আঘাত কিংবা হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়। ধমনীতে খুব মৃদু চাপ দিলে যদি নাড়ি অনুভূত না হয় তবে নাড়ি দুর্বল বলিয়া জানিবে। নাড়ির স্পন্দন নিয়মিত (regular) কিনা, বুঝিবার জন্য প্রত্যেক ঘণ্টায় নাড়ি দেখিবে। সারাদিন একই তালে নাড়ি স্পন্দিত হইলে নাড়ির স্পন্দন নিয়মিত বলিয়া বুঝিবে। নাড়ির স্পন্দন গণনার পর সর্বদা গ্রাফে লিখিয়া রাখিবে।

শ্বাসপ্রশ্বাস (Respiration)—আমাদের শ্বাসতন্ত্রের দুইটি কাজ—প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ। প্রশ্বাস বায়ু লইতে গেলে বুকের আয়তন বাড়িয়া যায় এবং নিঃশ্বাস ফেলিলে বুকের পেশীগুলি নামিয়া যায়। শ্বাসক্রিয়ার গতিচ্ছন্দ জানিতে হইলে রোগীর বুকের উপর হাত রাখিয়া এক মিনিটে বুক কতবার উঠিতেছে তাহা গণনা করিয়া লও। রোগী যদি জানিতে পারে যে তাহার শ্বাসক্রিয়া গণনা করা হইতেছে, তবে তাহার শ্বাসের গতি বাড়িয়া যাইবে। এইজন্য নাড়ি দেখিবার পরেও কিছুক্ষণ রোগীর কব্জিতে হাত রাখিয়া আলতো ভাবে রোগীর বক্ষের উপর অপর হাতখানি স্থাপন করিবে এবং রোগীর অজ্ঞাতে তাহার শ্বাসের ছন্দ গণনা করিবে। প্রতি মিনিটে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সচরাচর ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ করে (উপরে শ্বাসপ্রশ্বাসের চার্ট দেখ)। হৃৎপিণ্ডের গতিছন্দের সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসের একটি সামঞ্জস্য আছে। হৃৎপিণ্ডের কাজ দুর্বল হইলে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসক্রিয়াও দ্রুত হইবে। শিশুদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত বলিয়া তাহাদের শ্বাসক্রিয়াও দ্রুত। রোগীর শ্বাসের গতিচ্ছন্দ গ্রাফে লিখিয়া রাখা উচিত।

এতদ্ব্যতীত রোগীর মল, মূত্র ও বমন প্রভৃতির বার ও পরিমাণ শুশ্রূষাকারী একটি খাতায় লিখিয়া রাখিবে। মলমূত্রের বর্ণ কিংবা গন্ধের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম বা অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে চিকিৎসককে জানান দরকার এবং প্রয়োজনবোধে মলমূত্র পরীক্ষার জন্য রাখিয়া দেওয়াও শুশ্রূষাকারীরই কাজ। কোন একটি পরিষ্কার পাত্রে মল রাখিয়া ছিপি আঁটিয়া দিবে। সাধারণত সকালবেলাকার মলই রাখিয়া দেওয়া উচিত এবং অবিলম্বে উহা পরীক্ষাগারে পাঠাইয়া দিবে। শুশ্রূষাকারীকে রোগীর মূত্রের গন্ধ, বর্ণ ও পরিমাণের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইউরিন্যাল কিংবা বেড-প্যান হইতে পরিষ্কার কাচের শিশিতে করিয়া মূত্র রাখিয়া দিবে এবং শিশির মুখে খুব দৃঢ়-ভাবে ছিপি আঁটিয়া দিবে। থুথু পরীক্ষা করিতে হইলে অনুরূপভাবে বোতলে রাখিয়া ছিপি আঁটিয়া দিবে।

মলমূত্র ইত্যাদি পরীক্ষাগারে পাঠাইবার পূর্বে সর্বদা শিশির মুখে লেবেল আঁটিয়া রোগীর নাম, তারিখ ও কি বস্তু পাঠান হইতেছে তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিবে, কেননা পরীক্ষাগারে বহু লোকের মলমূত্র পরীক্ষার জন্য আসে। নাম লেখা না থাকিলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। সামান্য অসাবধানতায় গুরুতর চিকিৎসা সঙ্কট দেখা দেয়। তাই পূর্বাহ্লেই সাবধান হইবে।

(৪) রোগীর পরিজন ও সমাজের প্রতি শুশ্রূষাকারীর কর্তব্য

শুধু রোগীর শুশ্রূষা করিলেই শুশ্রূষাকারীর দায়িত্ব শেষ হইয়া যায় না, গৃহের অন্যান্য পরিজন ও সমাজের সমস্ত ব্যক্তির প্রতিও শুশ্রূষাকারীর এক গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। বিশেষত সংক্রামক রোগীর ক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারীর দায়িত্ব আরও অনেকগুণ বেশী। তখন শুশ্রূষাকারীর প্রথম ও প্রধান কাজ হইবে রোগের প্রসার বন্ধ করা। এইজন্য প্রথম হইতেই রোগীকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ঘরে রাখিবে এবং রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য ও মলমূত্রাদি নির্বীজিত না করিয়া ঘরের বাহিরে আনিবে না। শুশ্রূষাকারী আপন বস্ত্রাদি সম্বন্ধেও অত্যন্ত সাবধান থাকিবে। যে-সমস্ত পরিচ্ছদ পরিয়া রোগীর ঘরে যাইবে তাহা নির্বীজিত না করিয়া ফেলিয়া রাখিবে না এবং হাত, মুখ, পা ইত্যাদি সাবান দিয়া ভাল করিয়া না ধুইয়া অন্য কোন বস্তু স্পর্শ করিবে না। বাড়ির সমস্ত লোককে রোগ প্রতিষেধক টিকা লওয়াইবার ব্যবস্থা করিবে। শুধু রোগীর মারফতই নয়,

শুশ্রূষাকারীর অসাবধানতায়ও অনেক ক্ষেত্রে রোগ ছড়ায়। পল্লী অঞ্চলে দেখা যায় রোগীর পরিচর্যাকারীরা পুষ্করণীতে কাঁথা কাপড় ধুইয়া জল দূষিত করিতেছে। স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মগুলি সম্বন্ধে শুশ্রূষাকারী অবহিত থাকিয়া সমাজ ও জাতির প্রতি তাহার কর্তব্য পালন করিবে।

পরিশেষ নির্বীজন—রোগভোগ কালেই যে শুধু শুশ্রূষাকারীর কর্তব্য থাকে তাহা নয়, রোগের উপশমে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলেও তাহার কতকগুলি দায়িত্ব থাকিয়া যায়। বিশেষ করিয়া সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারীর দায়িত্ব গুরুতর।

ব্যাধির অবসানে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলে রোগি-কক্ষের সমস্ত দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, পুস্তক, বিছানা ও বাসনকোসন নির্বীজিত করিয়া লইতে হয়। নির্বীজনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইল ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বহুক্ষণ ধরিয়া গরম জলে ফুটাইয়া লওয়া। পুস্তক, আসবাব ইত্যাদি যাহা ফুটানো যায় না, তাহা পোড়াইয়া ফেলাই বাঞ্ছনীয়। তবে সাধারণ গৃহস্থদের পক্ষে আসবাবপত্র একবার নষ্ট করিয়া ফেলিলে অনেক সময় দ্বিতীয়বার কেনার সাধ্য থাকে না। এই ক্ষেত্রে ফর্মালডিহাইড অথবা ফর্মালিন স্প্রে করিয়া কিংবা গন্ধক পোড়াইয়া ঐ সব জিনিসপত্র নির্বীজিত করিয়া লওয়া উচিত। আধ সের গন্ধকে মিথিলেটেড স্পিরিট মাখাইয়া ঘরের মধ্যে পোড়াইবে। তারপর ঘরের দরজা জানালা অন্তত ছয় ঘণ্টা বন্ধ করিয়া রাখিবে। গন্ধক অবশ্য গ্যাস—রঙিন বস্ত্র ও ধাতব পদার্থ নষ্ট করে। রোগীর বাসনপত্রাদি কার্বলিক দ্রবণের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে জলে ফুটাইয়া ফেলিলে নির্বীজিত হয়। রোগি-কক্ষ নির্বীজিত করা, রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যের মতই একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন কোন অসুখে রোগি-কক্ষ শুধুমাত্র চুনকাম করিলেই চলে। কিন্তু যক্ষ্মা, বসন্ত ইত্যাদি রোগে ঘর নতুন করিয়া প্লাস্টার করিয়া লইতে হয়।

শুশ্রূষাকারীর অন্যতম কাজ হইল রোগমুক্তির পরে রোগীর দেহ নির্বীজিত করিয়া ফেলা। গরম জলে পটাস সালফিউরাটা (৩০ গ্যালন জলে ৪ আউন্স পটাশ সালফিউরাটা) কিংবা কার্বলিক অ্যাসিড (৫ গ্যালন জলে ৩ আউন্স কার্বলিক অ্যাসিড) মিশাইয়া লও। তারপর বিশোধিত সাবান দিয়া রোগীকে ভাল করিয়া স্নান করিয়া লইতে বল। শুশ্রূষাকারীর নিজেরও এইরূপভাবে স্নান করিয়া ফেলা উচিত।

শুশ্রূষাকারীর গুণ

শুশ্রূষাকারীর কর্তব্যগুলি কি তোমরা জান। এখন দেখা যাউক কি কি গুণ থাকিলে শুশ্রূষাকারী হওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শুশ্রূষাকারীর কাজ নিতান্ত সহজ এবং যে-কেহ শুশ্রূষার কাজ সমাধা করিতে পারে। কিন্তু বস্তুত শুশ্রূষাকারীর কাজ খুব সহজ নহে। শুশ্রূষার জন্য চাই ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সেবার ইচ্ছা। এই গুণগুলি না থাকিলে সার্থক শুশ্রূষাকারী হওয়া যায় না।

ধৈর্যই হইল শুশ্রূষাকারীর প্রথম ও প্রধান গুণ। একেইত একজন অসুস্থ ব্যক্তির সকল প্রয়োজন মিটানো অপরের পক্ষে ক্লান্তিকর মনে হইতে পারে। উপরন্তু অসুস্থ অবস্থায় মানুষের মেজাজ সাধারণত খিটখিটে হইয়া পড়ে, দীর্ঘদিন রোগে ভুগিবার ফলে রোগীর মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হইয়া যায়—কথা-বার্তায় অসংযম ও রুক্ষতা প্রকাশ পায়। এই সমস্ত কারণে রুগ্ন ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ কাজ এবং শুশ্রূষাকারীর কর্তব্যও সুস্থব্যক্তির সেবকদের চেয়ে অনেক বেশী কঠিন।

কষ্টসহিষ্ণুতা ও সেবার ইচ্ছা শুশ্রূষাকারীর অপর একটি প্রধান গুণ। সম্পূর্ণ অক্ষম রোগীদের সমস্ত নোংরা কাজগুলি শুশ্রূষাকারীকে করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজন হইলে রাত জাগিয়া তাহার সেবা করা দরকার হইয়া পড়িতে পারে। শুশ্রূষাকারী যদি এই সকল কাজ করিতে অনিচ্ছুক ও অপারগ হন তবে তাহাকে দিয়া শুশ্রূষা সম্ভব হইবে না।

শুশ্রূষাকারীর মেজাজ হইবে শান্ত অথচ প্রফুল্ল। দীর্ঘদিন রোগভোগের ফলে রোগীর মন সর্বদা বিমর্ষ থাকে। শুশ্রূষাকারী নিজেও যদি বিমর্ষ-প্রকৃতির হন, যেমন তেমনভাবে রোগীর দৈনন্দিন কাজটুকু শেষ করিয়া আপন কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন ভাবেন, তবে তাহার পক্ষে রোগীর সেবা সম্ভব নয়। শুশ্রূষাকারীর অন্যতম কর্তব্য হইবে রোগীর সমস্ত কটু ব্যবহার অবহেলা করিয়া যাওয়া এবং আপনার মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা দিয়া রোগিচিত্ত সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া তোলা। এইজন্য অবসর সময়ে শুশ্রূষাকারী তাহার রোগীর সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া কাটাইবেন, বই পড়িয়া শোনাইবেন এবং আপনার প্রতিটি ক্ষুদ্র আচরণে রোগীর প্রতি মমতা দেখাইবেন। শুশ্রূষাকারীর আচার ব্যবহারে কোথাও যেন কিছুমাত্র বিরক্তির আভাস না দেখা যায়, এই বিষয়ে তাহার লক্ষ্য রাখা উচিত।

এতদ্ব্যতীত শুশ্রূষাকারী হইবেন কর্তব্যপরায়ণ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। চিকিৎসকের সমস্ত নির্দেশ শুশ্রূষাকারীকেই পালন করিয়া চলিতে হয়। সুতরাং

তাহাকে রোগীর ঔষধ, পথ্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ইত্যাদি যে সকল কাজের ভার দেওয়া হয়,তিনি যদি তাহা পালন না করেন তবে রোগীর পীড়ার উপশম ত হয়ই না বরং তাহাতে রোগীর অবস্থার আরও অবনতি ঘটিতে পারে। এই কারণে আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে শুশ্রূষাকারী সর্বদা সচেতন থাকিবেন এবং কোন রকম অবহেলাকে গুরুতর অন্যায় বলিয়া মনে করিবেন।

শুশ্রূষাকারীর অপর গুণ হইল পর্যবেক্ষণ শক্তি। চিকিৎসক ত দিনে মাত্র একবার আসেন। রোগীর অবস্থার কোন পরিবর্তন হইতেছে কিনা, ত্বকের বর্ণ কিরূপ, ঘাম বেশী হইতেছে না কম হইতেছে, মলমূত্রের বর্ণ ও পরিমাণের কোন তারতম্য ঘটিল কিনা এ সমস্ত শুশ্রূষাকারীকে লক্ষ্য করিতে হয় এবং চিকিৎসককে জানাইতে হয়। যে শুশ্রূষাকারীর এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নাই তাহার চোখের সামনে রোগীর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিলেও তিনি টের পাইবেন না। এইজন্যই পর্যবেক্ষণ শক্তি হইল শুশ্রূষাকারীর অন্যতম গুণ।

চিকিৎসকের প্রতি আনুগত্যও শুশ্রূষাকারীর একটি প্রধান গুণ। তিনি তাহার কাজে কিংবা কথায় এমন কোন ভাব দেখাইবেন না যাহাতে চিকিৎসক, বাড়ির অন্যান্য লোক কিংবা রোগী তাহার প্রতি আস্থা হারায়। রোগী যেন সম্পূর্ণভাবে শুশ্রূষাকারীকে বিশ্বাস করিতে পারে।

সর্বোপরি শুশ্রূষাকারী রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলার জন্য তাহার সমস্ত বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহানুভূতি প্রয়োগ করিবেন। অনেক সময় বিছানায় শুইয়া একঘেয়ে ঔষধ ও পথ্য খাইতে খাইতে রোগীর অরুচি আসিয়া যায়, একেই ত রুগ্ন অবস্থায় খাইবার স্পৃহা মোটেই থাকে না, উপরন্তু অনিচ্ছুক রোগীকে ঔষধ পথ্য খাওয়ানো খুব কঠিন কাজ। শুশ্রূষাকারী রোগীর মন বুঝিয়া কৌশলে তাহার উপর চিকিৎসকের নির্দেশগুলি পালন করিবেন।

শুশ্রূষাকারীর প্রতি কয়েকটি ব্যক্তিগত উপদেশ

রোগি-কক্ষে নীরবতা রক্ষা করা শুশ্রূষাকারীর অন্যতম লক্ষ্য হইবে। শুধু যে বাহিরের গোলমালই রোগীকে পীড়িত করে তাহা নয়, শুশ্রূষাকারীর চলাফেরা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়াও তাহার শান্তি নষ্ট হইতে পারে। শুশ্রূষাকারীর জামাকাপড়ের খসখসানি, জুতার মচমচ শব্দ, কাঁটাচামচ ও বাসনপত্রের ঠুং ঠাং আওয়াজ, দরজা জানালা বন্ধ করিবার দুমদাম শব্দ রোগীর কাছে অসহ্য বোধ হয়। তাই চলাফেরায় তিনি অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হইবেন।

রোগী শান্তি চাহিলেও মৃত্যুর নিস্তব্ধতা আবার মনকে পীড়িত করিয়া তোলে। রোগীর ঘরে তাই কখনও পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে কিংবা ফিসফিস করিয়া কথা বলিতে নাই। শুশ্রূষাকারী সর্বদা স্বাভাবিক অনুচ্চস্বরে কথা বলিবেন।

শুশ্রূষাকারী রোগীর আরামের দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন কিন্তু অতিরিক্ত মনোযোগও রোগীর পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। বারংবার রোগীর বিছানা টানিলে কিংবা মাথার বালিশ সোজা করিয়া দিলে, গরম জলের ব্যাগ যথাস্থানে আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে রোগী বিরক্ত বোধ করে।

এতদ্ব্যতীত শুশ্রূষাকারী নিজ স্বাস্থ্য ও সর্বপ্রকার দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও বিশ্রামের দিকে নজর রাখিবেন। তাহার পোশাক পরিচ্ছদ, হাত পা বিশেষ করিয়া নখের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। রোগীর যে কোন কাজ করিবার পূর্বে এবং পরে সাবান দিয়া খুব ভাল করিয়া হাত ধুইয়া ফেলা তাহার অভ্যাস করা উচিত। শুশ্রূষাকারীর বেশভূষা হইবে পরিচ্ছন্ন, হাল্কা, বাহুল্যবর্জিত এবং আঁটসাট।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহ পরিচালনা

পারিবারিক হিসাব ও বাজেট পরিকল্পনা

বাজেট (Budget)—একটি তহবিল হইতে কয়েকজন মিলিয়া যখন সাধারণ উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করে তখন প্রত্যেক ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি পরিকল্পনার (planning) প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা শব্দটির সঙ্গে আজকাল আমরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর পরিচিত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, খাদ্য পরিকল্পনা, পরিবার পরিকল্পনার কথা আমরা শুনিয়া থাকি। **বাজেট হইল অর্থব্যয় পরিকল্পনা।** প্রত্যেকটি পরিবারের অর্থব্যয়ের একটি পূর্বপরিকল্পনা বা পারিবারিক বাজেট থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ এখানে বাবা, মা ও সন্তানদের প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু অর্থ ব্যয় করেন এবং প্রত্যেকটি খরচের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্যক্তিগত সন্তোষবিধান এবং পরিবারের সামগ্রিক প্রয়োজন মিটান। কিন্তু একাধারে এই দুইটি উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা কম দুরূহ নয়। আগে হইতে পরিকল্পনা করিয়া অর্থ ব্যয় করার সুবিধা এই যে ইহাতে আয়ের প্রত্যেকটি পয়সার সদ্ব্যবহার হয় এবং গৃহের প্রত্যেকটি লোকের সন্তোষ ও তৃপ্তি ঘটে।

বাজেট হইতে পারে দুই প্রকারের—**মানসম্মত** (standard) এবং **আদর্শ** (ideal)। কোন দুইটি পরিবারের প্রয়োজন কখনও এক হইতে পারে না। সুতরাং একের বাজেট অন্যের পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। তাই সম আর্থিক-সামাজিক মর্যাদার লোক, যেমন—অধ্যাপনা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য নমুনা বাজেট প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ নমুনা বাজেটকে বলে মানসম্মত বাজেট। মানসম্মত বাজেট দেখিয়া প্রত্যেক পরিবার আপন আপন প্রকৃত বাজেট (actual budget) প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। আদর্শ বাজেটে আবার সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট অর্থ কিভাবে ব্যয় করিলে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে তাহাই দেখান হয়। আদর্শ বাজেট প্রস্তুত করাতে অত্যন্ত দূরদৃষ্টি দরকার।

বাজেটের খাত (budget headings)—প্রকৃত বাজেট প্রস্তুত করার সময় কোন্ কোন্ খাতে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে তাহা প্রথমে স্থির করিয়া লইতে

হয়। ক্রমশ কম গুরুত্ব অনুযায়ী উহাদের পর পর সাজাইয়া লইয়া প্রত্যেকটি খাতের মধ্যে আবার কোন্ কোন্ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে তাহা নিধারণ করিয়া লইবে। আগেই বলিয়াছি প্রত্যেকটি পরিবারের চাহিদা একরূপ নয়। তাই প্রত্যেকের বাজেট হইবে স্বতন্ত্র। তবে এখানে একটি মানসম্মত বাজেটের খাত দেখান হইল। প্রথমেই আমরা খাদ্য, বস্ত্র, পোশাক, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সঞ্চয়, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি প্রধান প্রধান বিভাগগুলি স্থির করিয়া লইলাম। তারপর উহাদের অন্তর্গত উপবিভাগগুলি দেখান হইল :—

১। **খাদ্য**
মুদি
মাছ, মাংস
টাটকা সবজি
ফল
ডিম
দুধ
গৃহের বাহিরে কেনা খাবারে ব্যয়

২। **বস্ত্র**
শাড়ি
ধুতি
জামা ইত্যাদি

অথবা

স্বামী
স্ত্রী
সন্তানদের প্রত্যেকের জন্য ব্যয়

৩। **বাসস্থান**
(ক) ভাড়া বাড়ি
ভাড়া
মেরামত বাবদ ব্যয়
অন্যান্য ব্যয়—যেমন ট্যাক্স

অথবা

(খ) নিজস্ব বাড়ি
ধার শোধ
সুদ
ট্যাক্স
ইনস্যুরেন্স
মেরামত

৪। **বাড়ি পরিচালনার ব্যয়**
জল
বিদ্যুৎ
গ্যাস

৫। **জ্বালানি**
কয়লা
ঘুঁটে
কেরোসিন

৬। **টেলিফোন**
ফোনের ভাড়া
অতিরিক্ত কল
ট্রাঙ্ক কল ও টোল কল

৭। **ধোপা**
সাধারণ কাপড়
গরম বস্ত্র

৮। **যাতায়াত**
গাড়ি
ট্যাক্সি
ট্রাম, বাস
ট্রেনের ভাড়া

৯। **শিক্ষা**
স্কুল-কলেজের বেতন
গৃহশিক্ষক
বই খাতা
যাতায়াতবাবদ ব্যয়
নৃত্যগীতবাবদ ব্যয়
দৈনিক, সাপ্তাহিক ও
মাসিক পত্র পত্রিকা

১০। **স্বাস্থ্য**
চিকিৎসকের ফি
বিশেষজ্ঞের ফি
ওষুধের দাম

১১। **আমোদ-প্রমোদ**
পরিবারের জন্য
অন্যান্য লোকেদের জন্য
শিশুদের খেলনা

১২। **সঞ্চয়**
লাইফ ইন্স্যুরেন্স
অন্যান্য উপায়ে সঞ্চয়

১৩। **অন্যান্য খরচ**
দান
উপহার

বাজেট প্রস্তুত করিবার নিয়ম—বাজেট প্রস্তুত করিবার সময় দুইটি নিয়ম অনুসরণ করা যায়। প্রথমটি হইল **আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার রীতি** (Live within your income method)। এই রীতি অনুসারে বাজেট প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া লইবে :—

(১) সর্বপ্রথমে আগামী বছরের সম্ভাব্য আয়ের একটা হিসাব করিবে।

(২) তারপর ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাতগুলি নির্ধারণ করিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জীবিকার মানই ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধনী পরিবারের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক এবং বাজেটে উল্লেখযোগ্য স্থান পায়, দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তাহাই আবার একান্ত দুর্লভ এবং বাজেটে তাহাদের কোন স্থানই থাকে না।

(৩) প্রধান খাতগুলি নির্ণীত হইবার পরে কোন্ খাতে মোটামুটি কত ব্যয় করিবে তাহা স্থির করিয়া লইবে।

(৪) এইভাবে ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হইবার পরে প্রত্যেকটি খাতের উপবিভাগগুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি উপবিভাগের ব্যয়ও স্থির করিবে। উপবিভাগ করিবার সুবিধা এই যে ইহাতে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের ব্যক্তিগত রুচি ও অভ্যাসের দিকে দৃষ্টি রাখা যায়। যেমন কোন পরিবারের

গৃহকর্তার ধূমপানের অভ্যাস আছে এবং গৃহিণীর আবার পানের সঙ্গে জর্দা প্রয়োজন হয়। উক্ত পরিবারের খাদ্যের খাতে সিগারেট, পান ও জর্দার একটি উপবিভাগ রাখিলে বাস্তবিকই হিসাব করার সুবিধা হয়।

(৫) সমস্ত হিসাবের পরে যদি দেখা যায় কোন একটি বা একাধিক খাতে প্রয়োজনের অনুরূপ অর্থ নাই তখন অন্য খাত হইতে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ খাতের প্রয়োজন মিটান যায় কি না দেখিবে।

উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করিলে আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা সহজ হয়। দরিদ্র কিংবা সদ্য বিবাহিত দম্পতি যাহারা সবেমাত্র নিজেদের সংসার পাতিয়াছেন তাহাদের পক্ষে এই নিয়ম অনুযায়ী বাজেট করা প্রশস্ত।

জীবনকে যেভাবে গড়িতে চাই পদ্ধতি (The "Make-life-what-I-would-like-it" method)—এই পদ্ধতিতে বাজেট করিবারও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে।

(১) প্রথমে কোন্ খাতে কত অর্থ ব্যয় করিবে তাহা স্থির করিবে। তারপর যে জিনিসগুলি কেনা দরকার তাহার একটা ফর্দ করিবে, যেমন পোশাকের ক্ষেত্রে পিতার কয়খানি ধুতি, মায়ের কয়খানি শাড়ি, কটা ব্লাউজ, সন্তান ও অন্যান্য পরিজনদের প্রত্যেকের কাহার কয়টি পোশাক, জুতা, মোজা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ করিবে।

(২) দ্বিতীয়ত বাজেটের প্রত্যেকটি বিভাগের জিনিসগুলি গুরুত্ব অনুসারে সাজাইয়া যাইবে, যেমন খাদ্যের খাতে চাল, ডাল, মাছ, শাকসবজি, দুধ, ফল, মাখন, ডিম এইভাবে ক্রমশ কম গুরুত্ব অনুযায়ী উপবিভাগগুলি নির্দেশ করিবে। জীবিকার মান ও পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী অবশ্য এই উপবিভাগগুলি স্থাপন করিতে হয়।

(৩) খাত বিভাগের কাজ শেষ হইলে প্রত্যেকটি বস্তুর পাশে সম্ভাব্য দাম নির্দেশ করিবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ঝোঁক থাকিলে সম্ভাব্য বাড়তি দামও বাজেটের মধ্যে ধরিতে হয়। কতকগুলি ব্যাপার, যেমন—চিকিৎসার খরচ, কোন আকস্মিক ক্ষয়ক্ষতি, অতিথি অভ্যাগত বাবদ খরচ আগে হইতে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। তবে এইসব বাবদ কিছু অর্থ হিসাবের মধ্যে ধরিতে হয়।

(৪) আয়ের একটা সুষ্ঠু হিসাব থাকা চাই। চাকুরে লোকদের পক্ষে আয়ের হিসাব করা কঠিন নয় কিন্তু যাহাদের আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয় তাহাদের পক্ষে পূর্বাহ্ণে আয়ের হিসাব করা দুরূহ।

(৫) আয়ের পরিমাণ স্থির করিয়া লইয়া আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনিবার চেষ্টা করিবে। নানাভাবে বাজেটের ভারসাম্য বজায় রাখা যায়—প্রথমত আয় বাড়াইয়া। আয় বাড়াইবার সুযোগ যেখানে সীমিত কিংবা একেবারেই নাই সেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প দামের জিনিস কিনিয়া, একটু বেশী দাম দিয়া মজবুত জিনিস কিনিয়া ব্যয়সঙ্কোচ করা যায়। বহু গৃহিণী ঘরের ভিতরেই দৈনন্দিন ব্যবহারের জামাকাপড়গুলি সেলাই করিয়া কিছুটা খরচ বাঁচাইতে পারেন।

(৬) বাজেটের সবশেষের কথাটি হইল স্বচ্ছলতার প্রতি সতর্ক নজর রাখা। যাহার যাহা কিছু প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইয়া দিবার সামর্থ্যকে বলে স্বচ্ছলতা। আর্থিক অভাবই যে সমস্ত পরিবারের অস্বচ্ছলতার প্রধান কারণ তাহা নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই টাকাটা ঠিক প্রয়োজনের সময় মজুত থাকে না বলিয়া অভাব দেখা দেয়। তাই বছরের প্রথম দিকে আয়-ব্যয়ের একটা সুষ্ঠু হিসাব করিয়া লইয়া যদি মাসিক বাজেট তৈয়ারী করা যায় তবে এই অসুবিধা দূর করা যায়। যেসব পরিবারগুলিতে বৎসরের প্রথম মাসগুলিতে আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হয় এবং শেষের মাসগুলিতে কতকগুলি বড় বড় পাওনা, যেমন—লাইফ ইন্স্যুরেন্স, বাড়ির ট্যাক্স প্রভৃতি মিটাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে বৎসরের প্রথম দিকের উদ্বৃত্ত অর্থে শেষের দিকের দেনা মিটান সহজ হয়। কিন্তু যেসব পরিবারে আবার প্রথম দিকেই বেশী ব্যয় হয়, যেমন জানুয়ারীতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবাবদ মোটা খরচ, মার্চ মাসে বাড়ির ট্যাক্স, এপ্রিল মাসে বাহিরে যাইবার পরিকল্পনা থাকে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ হইতে কিছু তুলিয়া লইয়া, কিছু দেনা রাখিয়া কতকগুলি প্রয়োজনীয় কেনাকাটা স্থগিত রাখিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হয়। এইভাবে চলিলে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয় বটে তবে কয়েক বৎসর ধরিয়া একই নিয়মে বাজেট করিয়া চলিলে পরে আর অসুবিধা হয় না।

ধনী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের পক্ষেই উপরোক্ত নিয়মে বাজেট করা চলে। দরিদ্র পরিবারদের আবার আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার রীতিই অনুসরণ করা উচিত।

হিসাব রাখিবার নিয়ম—

বাজেটের প্রত্যেকটি খাতে কত ব্যয় করা হইবে তাহা স্থির করিয়া লইয়া দৈনন্দিন হিসাবের খাতায় প্রতিদিনকার বাজার খরচ লিখিয়া রাখিবে। ঐ খাতার-ই একদিকে সংবাদপত্র ও দুধের হিসাবের জন্য কয়েকটি পৃষ্ঠা রাখিয়া দিবে এবং তাহাতে প্রত্যহের দুধের পরিমাণ লিখিয়া রাখিবে। সংবাদপত্র ও দুধের হিসাব খাতায় না লিখিয়া দেওয়ালে টাঙ্গান ক্যালেণ্ডারের পাতায় লিখিয়া রাখিতে পারা যায়। ধোবার হিসাবের জন্য স্বতন্ত্র খাতা থাকা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে কয়েকটি পরিবারের বাজেট ও তাহাদের প্রাত্যহিক হিসাব রাখার নমুনা দেওয়া গেল।

১। গ্রামাঞ্চলের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেট

মাসিক আয় ২০০'০০ এবং জমির ফসল। পরিবারের লোকসংখ্যা ৮ জন।

রামবাবু তাঁহার পরিবার লইয়া হালিশহরের নিজস্ব বাড়িতে থাকেন। বাড়ীতে তাঁহার মা, বিধবা ভগ্নী, স্ত্রী ও চারিটি ছেলেমেয়ে আছে। আয় বলিতে একটি দোকান এবং কয়েক বিঘা চাষের জমি। দোকানটি একেবারে মন্দ চলে না। মাসে সমস্ত খরচ মিটাইয়া প্রায় ২০০'০০ টাকা নীট আয় হয়। জমিতে যে ফসল ওঠে তাহাতে চাল ডাল কিনিতে হয় না। উপরন্তু বৎসরে প্রায় ৬০০'০০ শত টাকার ধান বিক্রয় করেন। জমি চাষ করাইবার জন্য দুই জন মজুর ও দুই জোড়া বলদ রাখিয়াছেন। তাছাড়া বাড়ীর ভিতরেই যে এক ফালি জমি আছে তাহাতে সামান্য তরি-তরকারি উৎপন্ন হয়। খাঁটি দুধ পাইবার জন্য একটি গরুও রাখিয়াছেন। রামবাবু মাসিক বাজেট তৈয়ারী করিতেছেন, দেখ—

জমা—(Credit)		খরচ—(Debit)	
দোকানের আয়—	২০০·০০	(ক) খাদ্য :—	
জমি হইতে গড়ে আয়—	৫০·০০	(১) মুদি খরচ	৩০·০০
	২৫০·০০	(২) দৈনিক কাঁচা বাজার	৭০·০০
চাল ও ডাল কিনিতে হয় না।		(৩) জ্বালানি	১০·০০
		(৪) গরুর খরচ (দুধ)	১০·০০
		(খ) বস্ত্র :—	
		(১) জামা-কাপড় ক্রয়	১০·০০
		(২) সাবান খরচ	৫·০০
		(গ) বাড়ির খরচ :—	
		(১) বাড়ির খাজনা	৫·০০
		(২) আলো	৩·০০
		(ঘ) অন্যান্য খরচ :—	
		(১) শিক্ষা	২০·০০
		(২) চিকিৎসা	১০·০০
		(৩) আমোদ-প্রমোদ	৫·০০
		(৪) চাষের খরচ	৫০·০০
		(৫) বিবিধ	১২·০০
		(ঙ) সঞ্চয়	
		লাইফ ইনস্যুরেন্স	১০·০০
			২৫০·০০

রামবাবু দৈনিক বাজার খরচ ও মাসিক মুদির খরচের হিসাব তৈয়ারী করিতেছেন।

খাওয়া খরচ

মুদির হিসাব—

১।১।৬২ জমা—৩০'০০

দ্রব্যাদি	দর	খরচ
২½ কিলো সঃ তেল	কিলো ৪'২০	১০'৫০
½ কিলো ঘি	,, ১২	৬'০০
৪ কিলো আটা	,, '৫০	২'০০
২ কি. চিনি	,, ১'৪০	২'৮০
৩ কিলো গুড়	,, ১'০০	৩'০০
মশলা		১'৫০
নুন		'৫০
নারিকেল তেল		২'৫০
বড়ি, পাঁপর ইত্যাদি		১'২৫
		৩০'০৫

দৈনিক বাজার খরচের হিসাব

তারিখ	দ্রব্যাদি	দর	খরচ
১লা জানুয়ারী	২৫০ গ্রাম মাছ	কিলো ৬'০০	১'৫০
	৫০০ গ্রাম আলু	কিলো '৬৪	'৩২
	১টি লাউ		'৩৭
	শাক		'১২
	কাঁচা লঙ্কা		'৩
			২'৩৪

রামবাবু মুদির জন্য মাসে ৩০'০০ বরাদ্দ করিয়াছেন এবং প্রতি মাসে ৭০'০০ করিয়া কাঁচা বাজার করেন। তিনি গড়ে দৈনিক ২'৩৩ পয়সা খরচ করিতে পারেন। উপরের হিসাব দেখিয়া বুঝিতে পারিবে তাঁহার কি ভাবে টাকা খরচ করা উচিত।

২। কলিকাতা শহরের একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেট

রথীন্দ্রনাথের পরিবারের লোকসংখ্যা ৫ জন—স্বামী, স্ত্রী, দুইটি সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা। তাঁহার মাসিক রোজগার ১৭৫'০০ টাকা এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন।

জমা

আয়—১৭৫·০০

খরচ

(ক) খাদ্য :—

(১)	মুদির খরচ	৪৫·০০
(২)	কাঁচা বাজার	৩৫·০০
(৩)	জ্বালানি	৫·০০
(৪)	দুধ	১২·০০

(খ) বস্ত্র :—

(১)	বস্ত্রাদি ক্রয়	১০·০০
(২)	জামাকাপড় কাচানো	৫·০০

(গ) বাসস্থান :—

(১)	বাড়ী ভাড়া	২০·০০
(২)	আলো	৩·০০
(৩)	যাতায়াত	১০·০০

(ঘ) বাড়ির অন্যান্য খরচ :—

(১)	শিক্ষা	১০·০০
	চিকিৎসা	৫·০০
	আমোদ-প্রমোদ	৫·০০
	টয়লেট	৩·০০
	বিবিধ	২·০০

(ঙ) সঞ্চয় :—

	ইনস্যুরেন্স	৫·০০
		১৭৫·০০

রথীনবাবুর বাজেটে মুদির হিসাব :—

জমা—৪৫·৪০

তারিখ	দ্রব্যাদি	দর	খরচ
১লা জানুয়ারী	২০ কিলো চাউল	কিলো ·৮৪	১৬·৮০
	২০ কিলো আটা	কিলো ·৫৮	১১·৬০
	২ কিলো ডাল	কিলো ১·২০	২·৪০
	মশলা		১·০০
	১ কিলো সঃ তেল		৪·২০
	½ কিলো ঘি		৬·০০
	১ কিলো চিনি		১·৪০
	১ কিলো গুড়		১·০০
	চা		১·০০
			৪৫·৪০

৩। কলিকাতা শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেট

রমেশবাবুর পরিবারের লোকসংখ্যা ৪ জন—স্বামী, স্ত্রী এবং দুটি ছোট ছেলেমেয়ে। স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই সরকারী অফিসে চাকরি করেন। উভয়ের যৌথ রোজগার ৪০০'০০ টাকা। কলিকাতায় তাঁহাদের নিজস্ব বাড়ি নাই।

রমেশবাবুর মাসিক বাজেটের নমুনা দেখ—

জমা		খরচ	
রমেশবাবুর মাসিক আয়	২৫০'০০	(ক) **খাদ্য :—**	
রমেশবাবুর স্ত্রীর মাসিক আয়		(১) মুদির খরচ	৬০'৫০
	১৫০'০০	(২) কাঁচা বাজার	৮৫'০০
	৪০০'০০	(৩) জ্বালানি	১০'০০
		(৪) দুধ	২০'০০
		(খ) **বস্ত্র :—**	
		(১) বস্ত্রাদি ক্রয়	২০'০০
		(২) জামা-কাপড় কাচানো	৬'০০
		(গ) **বাসস্থান :—**	
		(১) বাড়ি ভাড়া	৭০'০০
		(২) ইলেকট্রিসিটি	৮'০০
		(৩) ভৃত্য	১৫'০০
		(৪) টিফিন ও যাতায়াত ব্যয়	৩০'০০
		(ঘ) **বাড়ির অন্যান্য খরচ :—**	
		(১) শিক্ষা	১৫'০০
		(২) চিকিৎসা	১০'০০
		(৩) আমোদ-প্রমোদ	১০'০০
		(৪) সংবাদপত্র	৫'০০
		(৫) অতিথি	৫'০০
		(৬) বিবিধ	৫'০০
		(ঙ) **সঞ্চয় :—**	
		(১) লাইফ ইনস্যুরেন্স	১৩'০০
		(২) পোস্ট অফিস	৪'৫০
		(চ) **দান**	২'০০
			৪০০'০০

খাওয়া খরচা

মুদির হিসাব—জমা ৬০·৫০

তারিখ	দ্রব্যাদি	দর	খরচ
১লা জানুয়ারী			
	১৬ কিলো চাল	·৮৪	১৩·৪৪
	১৬ ,, আটা	·৫৮	৯·২৮
	১ কি. মুগ ডাল		১·৩৫
	১ কি. মসুর ডাল	১·২৫	১·২৫
	২ কি. সঃ তেল	৪·২০	৮·৪০
	১ কি. ঘি		১২·০০
	২ কি. চিনি	১·৪০	২·৮০
	৫০০ গ্রাম চা		৫·০০
	২ কি. গুড়	১·০০	২·০০
	১ কি. নারিকেল তেল		৩·৫০
	বড়ি, পাঁপর ইত্যাদি		১·০০
	নুন		·৫০
			৬০·৫২

দৈনিক বাজার খরচের হিসাব—

মাসিক বরাদ্দ—৮৫·০০

তারিখ	দ্রব্যাদি	দর	খরচ
১লা			
	২৫০ গ্রাম মাছ	কি. ৪·০০	১·০০
	৫০০ গ্রাম আলু	কি. ·৬৪	·৩২
	৫০০ গ্রাম বেগুন	কি. ·৮০	·৪০
	শাক		·১২
	দই		·৫০
	মুড়ি		·১৬
			২·৫০
২রা			
	ডিম		·৭৫
	সবজি		১·০০
	ফল		·৭৫
	ইত্যাদি		২·৫০

অন্যান্য হিসাব

দুধের হিসাব

মাস—	জানুয়ারী
১লা	আধ লিটার
২রা	,,
৩রা	,,
৪ঠা	,,
	ইত্যাদি

ধোবার হিসাব

মাস—		জানুয়ারী
১লা		
	শাড়ি	২ খানা
	প্যান্ট	২টি
	বিছানার চাদর	১টি
	সার্ট	২টি
		মোট ৭ খানা

প্রতি মাসের শেষে হিসাব মিলাইয়া দুধওয়ালা ও ধোবার টাকা মিটাইয়া দিও। বাজেটে দুধের জন্য ২৬·০০ ধার্য আছে। প্রয়োজনে কখনও নিয়মিত বরাদ্দের চেয়ে দুধ বেশী লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে কোন খাতেই যেন মাসিক বরাদ্দের অতিরিক্ত খুব বেশী টাকা খরচ না হইয়া যায়। তবে বাজেট ঘাটতি হইতে শুরু করিবে।

৪। **শহরাঞ্চলের একটি ধনী পরিবারের বাজেটের নমুনা :—**

মাসিক আয়—১৫০০'০০

পরিবারের লোকসংখ্যা ৪ জন, স্বামী, স্ত্রী ও দুইটি সন্তান।

জমা	খরচ	
মাসিক আয়—১৫০০'০০	(ক) **খাদ্য :—**	
	(১) মুদির খরচ	১১০'০০
	(১) কাঁচা বাজার	২৫০'০০
	(৩) দুধ	৬০'০০
	(খ) **বস্ত্র :—**	
	(১) বস্ত্রাদি ক্রয়	১০০'০০
	(২) ধোবার খরচ	১৫'০০
	(গ) **বাড়ির খরচ :—**	
	(১) বাড়ির ট্যাক্স	৫০'০০
	(২) গ্যাস ও ইলেকট্রিসিটি	৪০'০০
	(৩) মোটর গাড়ির খরচ	২০০'০০
	(৪) টেলিফোন	২৫'০০
	(৫) ঝি, ভৃত্য ও পাচক	৭৫'০০
	(ঘ) **অন্যান্য খরচ :—**	
	(১) শিক্ষা	১০০'০০
	(২) নাচগান	৪০'০০
	(৩) চিকিৎসা	২৫'০০
	(৪) আমোদ-প্রমোদ	৪০'০০
	(৫) সংবাদপত্র ইত্যাদি	১৫'০০
	(৬) বিদেশ ভ্রমণ	৫০'০০
	(৭) টয়লেট	১০'০০
	(৮) বিবিধ	২০'০০
	(ঙ) **সঞ্চয় :—**	
	(১) লাইফ ইনস্যুরেন্স	১০০'০০
	(২) ব্যাঙ্কে জমা	১০০'০০
১৪৭৫'০০	(চ) **দান**	৫০'০০
২৫'০০		১৪৭৫'০০

সমস্ত খরচ নির্বাহের পরেও উক্ত ব্যক্তির হাতে ২৫'০০ উদ্বৃত্ত থাকে। ইহা তিনি পোস্ট অফিসে আলাদা একটি বই করিয়া জমাইয়া রাখেন। তাঁহার মাসিক মুদির খরচ ও দৈনিক বাজার খরচের তালিকা নিম্নরূপ :—

খাওয়া খরচ

মুদি জমা—১১০'০০ বাজার খরচ মাসিক বরাদ্দ—২৫০'০০

তারিখ	দ্রব্যাদি	দর	খরচ	তারিখ	দ্রব্যাদি	দর	খরচ
১লা জুলাই	২৫ কিলো চাল	৮৪	২১'০০	১লা	৫০০ গ্রাঃ মাছ	৫'০০	২'৫০
	২৫ কিলো আটা	'৫৮	১৪'৫০		২৫০ গ্রাঃ মাংস	৫'০০	১'২৫
	২ কিলো ডাল	১'২৫	২'৫০		সবজি		১'০০
	২ কিলো ঘি	১২'০০	২৪'০০		ফল		১'৫০
	৪ কিলো তেল	৪'২০	১৬'৮০		মাখন ১'২৫ গ্রাম		১'০০
	৫ কিলো চিনি	১'৪০	৭'০০		পাঁউরুটি		'৫০
	১½ কিলো চা	৬'০০	৯'০০				
	কফি		৩'৫০				৭'৭৫
	মশলা		২'৭৫	২রা	৫০০ গ্রাম মাছ		৫'০০
	নুন		'৫০		সবজি		১'০০
	মাথার তেল		৬'০০		দই		'৫০
	বড়ি, পাঁপর ইত্যাদি		৩'০০		মিষ্টি		১'০০
			১১০'৫৫				৭'৫০

ইত্যাদি

ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটের তুলনা—

বাজেট তৈয়ারীর একমাত্র উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে জীবনের সমস্ত চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মিটান। এখন এই চাহিদা কথাটির অর্থ পরিষ্কার করিয়া বোঝান উচিত। সকলের চাহিদা একরূপ নয়—ধনীর চাহিদা দরিদ্রের চাহিদা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই দরিদ্র মনে করে তাহার জীবনের সর্বপ্রধান চাহিদা মিটিল, পরন্তু ধনীর চাহিদা আরও বেশী। জীবনের এই চাহিদাগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি—(২) অতি আবশ্যক দ্রব্যাদি, (১) দক্ষতা বাড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল এবং সর্বশেষে (৩) বিলাস ব্যসনের সামগ্রী।

অতি আবশ্যক বস্তু, যেমন—খাদ্য, লজ্জা নিবারণের মত বস্ত্র ও মাথা গুঁজিবার জন্য একটি বাসস্থান না হইলে জীবনধারণই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার পরের স্তর হইল দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বাড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন পুষ্টিকর খাদ্য (মাখন, দুধ ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত), উপযুক্ত শিক্ষা ও শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষার মত বস্ত্র। এই কয়টির অভাবে মানুষের দেহ সুস্থ ও সুগঠিত হইয়া উঠিতে পারে না এবং জীবনযুদ্ধে লড়িবার মত দক্ষতা অর্জন করিতে সে অসমর্থ হয়। সবচেয়ে শেষে আসে বিলাসের দ্রব্যের জন্য চাহিদা। জীবনধারণের জন্য এইগুলির কোন প্রয়োজন নাই। দক্ষতা বাড়াইবার কাজেও বিলাসের বস্তু কোন সাহায্য করে না, তথাপি মানুষ স্বভাবত শৌখিন ও আরামপ্রিয় জীব। এইজন্যই তাহার বিলাসের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের বাজেটের তুলনা করিলে দেখিতে পাইবে, নিম্ন মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রের বাজেটে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এই তিনটি বস্তুর প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য তাহারা আয়ের প্রায় সমস্ত অংশটুকু খরচ করিয়া ফেলে। মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটে অতি আবশ্যক বস্তুর অভাব মিটাইবার পরেই সন্তানদের শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হয়। ধনী পরিবারের বাজেটের আয়ের একটি মোটা অংশ আমোদ-প্রমোদ ও দেশভ্রমণ ইত্যাদির জন্য ধরা থাকে। সেই তুলনায় খাই খরচা তাহাদের কম। বস্তুত মানুষের আয় যে অনুপাতে বাড়িতে থাকে, সেই অনুপাতে তাহার খাওয়া খরচ বাড়ে না, কিন্তু শিক্ষা, আমোদ-আহ্লাদ ও বস্ত্রাদির খরচ অনেক বেশী বাড়িয়া যায়। যে ব্যক্তির প্রথম জীবনে মাসিক আয় ছিল ৪০০'০০ টাকা সেই ব্যক্তি খাওয়ার জন্য খরচ করিবেন আনুমানিক ১৮৬'০০ টাকা, অর্থাৎ মোট আয়ের প্রায় অর্ধেক। ঐ ব্যক্তিরই আয় বাড়িয়া গিয়া যদি পরবর্তীকালে ১৫০০'০০ টাকায় দাঁড়ায় তবে তাহার খাইখরচা হইবে প্রায় ৩৭৫'০০ টাকা অর্থাৎ আয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ। অথচ আমোদ-প্রমোদ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাড়ি-গাড়ির ব্যয় অনেক বেশী হইবে। ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটের মধ্যে এই গুরুতর পার্থক্যটি সর্বদা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে।

সংসারের সঞ্চয়

ধনীই হউক আর দরিদ্রই হউক প্রত্যেক পরিবারেরই ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করা দরকার। ধনীদের চেয়ে স্বল্পবিত্ত পরিবারের সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা

বেশী। তবে ধনীরাও যদি ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া বেহিসাবীভাবে চলিতে থাকে তবে তাহাদেরও পরিণামে দারিদ্র্য বরণ করা কিছু অস্বাভাবিক নয়। গৃহনির্মাণ, পুত্রকন্যাদের পড়াশুনা, বিবাহ ইত্যাদির জন্য এককালীন বহু অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উপরন্তু হঠাৎ বিপদ-আপদের জন্যও কিছু অর্থ সর্বদাই হাতে মজুত রাখা দরকার। এই সমস্ত কারণে আমাদের প্রতি মাসেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত। নতুবা একদিন যখন বহু অর্থের দরকার হইয়া পড়ে গৃহস্থকে তখন বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সঞ্চয় করিবার জন্য কোন জাতীয় পরিকল্পনা কিংবা ব্যবস্থা ছিল না। মানুষ সোনা রূপা কিনিয়া রাখিত কিংবা মাটির তলায় অর্থ পুঁতিয়া রাখিয়া উদ্বৃত্ত ধন সঞ্চয় করিত। এইভাবে ধন সঞ্চয়ের বিপদও ছিল কম নয়। প্রথমত চোর ডাকাতের ভয়, দ্বিতীয়ত আগুন লাগিলে কাগজের নোট পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হইল এইরূপভাবে অর্থ পুঁজি করিয়া রাখিলে সেই অর্থ জাতীয় উন্নতির কাজে লাগে না, সেই অর্থ ব্যবসায়ে খাটে না বলিয়া উহা পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না। সঞ্চয় করিবার সময় দেখিবে, (১) **ধনের নিরাপত্তা আছে কি না,** (২) **উহা বাড়ানো যায় কি না,** (৩) **এবং প্রয়োজনের সময় পাওয়া যাইবে কিনা।** আজকাল সরকারী প্রচেষ্টায় ও জনসাধারণের উদ্যমে নানাভাবে আমাদের সঞ্চয় করিবার সুবিধা বাড়িয়াছে। প্রথমে আমরা পোস্ট অফিসের সাহায্যে সঞ্চয়ের কথা আলোচনা করিতেছি।

পোস্ট অফিস—

দূরদূরান্তরে আমাদের যে সকল আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিতরা রহিয়াছে তাহাদের খবর আদান প্রদানের কাজ করে পোস্ট অফিস বা ডাকঘর। উহার এই কাজের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। তবে জনসাধারণের টাকা গচ্ছিত রাখিবার জন্যও পোস্ট অফিসের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। একটি ন্যূনতম অঙ্কের অর্থ হইতে শুরু করিয়া আমরা যে কোন পরিমাণ অর্থ পোস্ট অফিসে জমা রাখিতে পারি। পোস্ট অফিস অর্থ গচ্ছিতকারীর একটি সহি (Sepcimen Signature) রাখিয়া দেয়। টাকা উঠাইতে গেলে পোস্ট অফিস ঐ সহি মিলাইয়া গচ্ছিতকারীকে টাকা দেয়। কত টাকা জমা পড়িল, কত টাকা তোলা হইল এই সকল হিসাব রাখিবার জন্য পোস্ট অফিস গচ্ছিতকারীকে বিনামূল্যে একটি জমার বহি (Pass Book) দেয়।

সরকার নিজে এই অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলিয়া পোস্ট অফিসের গচ্ছিত অর্থ অত্যন্ত নিরাপদ। গচ্ছিতকারী আপন প্রয়োজনমত এই অর্থ তুলিয়া লইতে পারেন। Postal withdrawal form-এর নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল। টাকা তুলিবার সময় শূন্যস্থানগুলি পূরণ করিয়া দিতে হয়।

S. B. 1.

APPLICATION FOR WITHDRAWAL

To

The Post office Savings Bank.................................P. O.

Account No.....................

Existing balance. Rupees (in words)....................................

Please pay the sum of Rupees (in words)........................

................................to me/us/messenger named below and debit the amount to my/our S. B. account mentioned above.

PARTICULARS OF MESSENGER

Name of the Messenger..

Signature of the Messenger..

....

Signature of identifier
(if necessary)

....

Signature/Thumb-impression
of depositor (s)

Dated.........................

Dated..............................

N. B.—The attention of the depositor is drawn to the instructions printed on the cover of the Pass Book.

CAUTION

The receipt for payment is to be signed only at the time of actual payment. The Post office will not accept any liability for any loss sustained by the depositor as a result of disregard of this direction.

Date of withdrawal..........................

WARRANT OF PAYAMENT

Account No.....................Ledger folio..........................

passed for payment of Rupees (in words)..............................

.... Rupees in figures ....

Post Office Date-Stamp. *Signature of Postmaster*
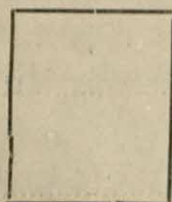
Closed Account Calculations

Balance..................................

Interest from 1st April...........

to......

Total

Receipt for Payment

1. Received payment of Rupees (in words)..........................

..............................only Rupees (in figures)

2. The up-to-date interest on the account has been received and the account is finally closed.

....

Signature of identifier (if necessary)

Signature/Thumb-impression of the depositor(s) or messenger.

Dated........... *Dated*...........

*IMPORTANT.—To be scored through when the account is not finally closed.

AUDITED

Initials / *Signature* *of the Auditor*

ব্যাঙ্কের সাহায্যে অর্থ সঞ্চয়—

ব্যাঙ্কের মারফত আমরা অর্থ সঞ্চয় করিতে পারি। ক্রেডিট বেচা ও ক্রেডিট কেনা এই দুইটি হইল ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। আরও সহজ করিয়া বলা যায়, জনসাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত অর্থাৎ গচ্ছিত রাখে। এই গচ্ছিত অর্থ খাটাইয়া ব্যাঙ্ক উহা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। তারপর অর্থ গচ্ছিতকারীকে কিছু সুদ দেয় এবং সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দেয়। সোজা কথায় 'পরের ধনে পোদ্দারির' মত ব্যাঙ্কার অন্যের টাকায় ব্যাঙ্কিং করে। শুধু টাকাই নয়, ব্যাঙ্কে আমরা বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ও কাগজপত্রও গচ্ছিত রাখিতে পারি। এই সব জিনিসের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে বলিয়া ব্যাঙ্কারকে আমাদের কিছু অর্থ দিতে হয়। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া আমরা কিছু সুদ পাই এবং অলঙ্কারাদি গচ্ছিত রাখিবার জন্য ব্যাঙ্ককে আমাদের কিছু সুদ দিতে হয়।

মক্কেল (Customer)—যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া হিসাব (account) খোলেন তাহাদের বলা হয় ব্যাঙ্কের মক্কেল বা Customer; যে কেউ ব্যাঙ্কে গিয়া সোজাসুজি এই হিসাব খুলিতে পারেন না। প্রথমে ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরিচিত কোন লোক হিসাব খুলিতে ইচ্ছুক এইরূপ ব্যক্তির পরিচয়পত্র দেন। তারপর ব্যাঙ্ক তাহাকে হিসাব খুলিতে অনুমতি দেয়।

হিসাব খুলিবার আবেদন-পত্র (Opening account form)—

পূর্বোক্ত পরিচয়পত্র দিয়া ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার সময় ব্যাঙ্ককর্তৃক আমানত-কারীর নিকট হইতে আবেদন-পত্র লিখাইয়া নেওয়া হয়। এই সময় আমানত-কারীর একটি সহি (Specimen Signature) ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়। এই সহিটি ব্যাঙ্ক এবং আমানতকারী উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইচ্ছা করিলে দুই ব্যক্তি যুক্তভাবে হিসাব খুলিতে পারেন। যুক্ত হিসাবের বেলায় যে কোন মক্কেল টাকা তুলিতে পারেন।

টাকা জমা দিবার খাতা—আবেদনপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পর টাকা জমা দিবার জন্য ব্যাঙ্ক মক্কেলকে একখানি খাতা দেয়। এই খাতাখানিতে ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী একটি ন্যূনতম অঙ্কের অর্থ (এই ন্যূনতম অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন প্রকার) জমা দিলে ব্যাঙ্ক আবেদনকারীকে মক্কেল করিয়া লইবে। জমার বইখানিতে টাকা ও চেক জমা দিবার আলাদা আলাদা ঘর কাটা থাকে

এবং প্রতি পৃষ্ঠায়ই প্রতিপত্র (Counterfoil) থাকে। টাকা জমা দিবার সময় মক্কেলের নাম, ব্যাঙ্কের একাউণ্ট নম্বর, টাকার পরিমাণ ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ জমার খাতায় লিখিয়া দিতে হয়। ব্যাঙ্ক বাম দিকের প্রতিপত্র সই করিয়া রসিদ স্বরূপ মক্কেলকে ফেরত দেয় এবং ডান দিকের প্রতিপত্রখানি হিসাব মিলাইবার জন্য ছিঁড়িয়া রাখে।

এই প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কে জমা দিবার কত রকম পদ্ধতি আছে তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে। তিন রকম ভাবে ব্যাঙ্কে অর্থ জমা রাখা হয়।

(১) **চলতি খাতা** (Current Account)

চলতি খাতা খুলিতে হইলে ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী একটি ন্যূনতম অঙ্কের অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়, উহার কম হইলে টাকা জমা লওয়া হয় না। টাকা জমা দিবার পর সমস্ত টাকা উঠাইতে হইলে সর্বদাই এই ন্যূনতম অঙ্কের অর্থ বাদ দিয়া টাকা তুলিতে হয়। অবশ্য যাহারা হিসাব বন্ধ করিয়া দিতে চান তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা সব টাকাই তুলিয়া লইতে পারেন। চলতি খাতায় টাকা জমা রাখিলে সুদ পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। তবে ইহার একটি প্রধান সুবিধা এই যে সপ্তাহে যতবার খুশি টাকা তোলা যায়। ব্যবসায়ীরা সর্বদা চলতি খাতায় টাকা জমা করেন।

(২) **জমার খাতা** (Savings Account)

চলতি খাতা ব্যতীত জমার খাতা বা সেভিংস হিসাবেও টাকা গচ্ছিত রাখা যায়। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে সেভিংস হিসাবে টাকা জমা রাখাই প্রশস্ত। ইহাতে সুদ পাওয়া যায় এবং চলতি হিসাবের তুলনায় খাতা খুলিবার সর্বনিম্ন হারও অনেক কম, যেমন, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিয়ম অনুযায়ী ৫০০.০০ টাকা দিয়া চলতি খাতা খুলিতে হয় এবং ব্যাঙ্কে সর্বদা অন্যূন ৩০০.০০ টাকা জমা রাখিতে হয়, পরন্তু ৫.০০ টাকা জমা দিলেই এই ব্যাঙ্কে সেভিংস হিসাব খোলা যায়। হিসাব খুলিবার এই সর্বনিম্ন হার, সব ব্যাঙ্কে একরূপ নয়। তবে সর্বত্রই চলতি খাতার চেয়ে সেভিংস হিসাবে হার অনেক কম। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে পূর্বে সেভিংস হিসাবে আবার অন্যূন ১০০.০০ টাকা জমা না রাখিলে চেক ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া যাইত না। এখন আর সে নিয়ম নাই। চেকবই না পাইলে আমানতকারীকে টাকা তুলিবার কাগজে (withdrawal slip) সই করিয়া টাকা তুলিতে হয়।

(৩) দীর্ঘ মেয়াদী বা স্থির আমানত (Fixed deposit)

স্থির আমানত অন্য পর্যায়ের। এইরূপ আমানতে টাকা গচ্ছিত রাখিবার সময়ই গচ্ছিতকারী ব্যাঙ্কের সঙ্গে স্থির করিয়া নেন কবে তাহার ঐ টাকাটা ফেরত চাই। সাধারণত ছয় মাস হইতে এক বৎসরের মেয়াদে স্থির আমানত নেওয়া হয়। অল্প দিনের জন্য আমানত দিলে অল্প স্থদ, বেশী দিনের জন্য আমানতে বেশী স্থদ ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া হয়।

স্থির আমানতের টাকা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোনমতেই তোলা যায় না। তবে প্রয়োজন হইলে টাকা ধার নেওয়া যায়। অবশ্য ধার নিয়া লোকসান বই লাভ নাই। গচ্ছিত রাখিয়া যে স্থদ আসিবে তাহার চেয়ে ধার বাবদ ব্যাঙ্ককে স্থদ দিতে হইবে অনেক বেশী।

পাশ বই (Pass Book)

ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া হইলে ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে একখানা পাশ বই দেয়। কত টাকা জমা পড়িল, কত টাকা তোলা হইল এই সম্বন্ধে ব্যাঙ্কে যে হিসাব রাখা হয় পাশ বইখানি শুধু তাহার নকলমাত্র।

চেক বই (Cheque Book)

ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার পর আমানতকারী তাহার দরকারমত টাকা তুলিতে পারেন। নিজের নামে টাকা তুলিতে হইলে কিংবা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ হইতে আর কোন ব্যক্তিকে টাকা দিতে হইলে আমানতকারী কর্তৃক সর্বদাই ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিতে হয়। এই নির্দেশ না পাইলে ব্যাঙ্ক কাহাকেও অর্থ দিবে না। **কাহাকেও অর্থ দিবার জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাঙ্ককে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেই নির্দেশপত্রকে বলে চেক** (Cheque)। চেকের উপর টাকার অঙ্ক, একাউণ্ট নম্বর, গ্রহীতার নাম, তারিখ ও আমানতকারীর সহি থাকা দরকার। পূর্বেই বলিয়াছি আমানতকারীর স্পেশিমেন সহি ব্যাঙ্কে জমা থাকে। যখনই আমানতকারী চেক কাটিয়া ব্যাঙ্ককে অর্থ দিবার নির্দেশ দিবেন ব্যাঙ্ক তখন ঐ সহি মিলাইয়া দেখিবে চেকের সহি এবং আমানতকারীর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সহি এক কি না। আমানতকারীর সহি জাল করিয়া অপর কেহ যাহাতে তাহার টাকা তুলিয়া লইতে না পারে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। চেক বই, জমার বই ও পাশ বই ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে বিনামূল্যে দিয়া থাকে। তবে পাশ বইটি একবার হারাইয়া ফেলিলে দ্বিতীয়বার পাশ বই

(duplicate pass book) দিবার পূর্বে ব্যাঙ্ক মক্কেলের নিকট হইতে কিছু জরিমানা আদায় করিয়া লয়। চেকের একখানি ছবি দেওয়া হইল দেখ। মক্কেলের চলতি খাতার হিসাবের উপর চেক কাটা হইয়াছে। তাই উহাতে একাউন্ট নম্বর উল্লেখ করা হয় নাই।

চেক তিন প্রকারের—

(১) **বেয়ারার চেক** (Bearer Cheque)

চেকের উপর লেখা থাকে Pay···or bearer; যাহার অনুকূলে চেক কাটিবে 'পে' শব্দটির পরে তাহার নাম লিখিয়া আনুষঙ্গিক তথ্যগুলি (অর্থাৎ টাকার অঙ্ক ইত্যাদি) এবং চেকদাতার নাম সহি করিয়া দিলেই উহা বেয়ারার চেকে পরিণত হইবে। চেকদাতা নিজেই যদি চেকের সাহায্যে টাকা তুলিতে চান তবে 'পে' শব্দটির পরে 'self' লিখিয়া দিবেন। গ্রহীতাকেই যে সর্বদা চেক জমা দিয়া টাকা লইতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যিনি চেকের বেয়ারার অর্থাৎ চেকটি যাহার হাতে পড়িবে তিনিই ঐ চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা লইতে পারেন। চেকের বিপরীত দিকে শুধু তাহার নাম সহি করিয়া দিতে হইবে। বেয়ারার চেকের সুবিধা এই যে ব্যাঙ্কে যাহার কোন হিসাব নাই এরূপ ব্যক্তিও ঐ চেক ভাঙ্গাইতে পারেন। বেয়ারার চেক গ্রহীতার পরিচয় নেয় না। বেয়ারার চেক হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে চেকদাতা ব্যাঙ্ককে চেকটি নাকচ করিয়া দিবার নির্দেশ দিবেন যাহাতে অপর কোন ব্যক্তি চেক ভাঙ্গাইতে না পারে।

(২) **অর্ডার চেক** (Order Cheque)

যাহার অনুকূলে আমানতকারী চেক কাটিতে চান 'Pay' শব্দটির পরে তাহার নাম লিখিয়া 'or bearer' শব্দটি কাটিয়া সেই স্থানে 'or order' শব্দ দুইটি লিখিয়া দিবেন। 'or order' না লিখিলেও ক্ষতি নাই। শুধু 'or bearer' কাটিয়া দিলেও উহা অর্ডার চেক বলিয়া গণ্য হইবে।

অর্ডার চেকটি কাহারো হিসাবে জমা দিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। বেয়ারার চেকের মত উহা সোজাসুজি কাউন্টার হইতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া যায়। তবে চেকের গ্রহীতা যদি ব্যাঙ্কের পরিচিত ব্যক্তি না হন তবে ব্যাঙ্ক তাহাকে টাকা দিবে না—এইখানেই বেয়ারার চেকের সঙ্গে অর্ডার চেকের পার্থক্য। সাধারণত যে সব ব্যক্তি ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখেন তাহারাই

ব্যাঙ্কের সহিত পরিচিত থাকেন। তবে অন্যভাবেও ব্যাঙ্কের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। ধর, তোমার পিতা সর্বদা এত কর্মব্যস্ত থাকেন যে তাঁহার ব্যাঙ্কে যাইবার সময় হয় না। তুমি তোমার পিতার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত কাজ করিয়া দাও। বহুদিন নানা উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্কে যাওয়া আসা করার দরুন ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা তোমার পরিচয় জানে। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে তোমার যদিও কোন হিসাব নাই তথাপি তুমি ব্যাঙ্কের পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাঙ্কের সহিত যাহারা একেবারেই পরিচিত নন প্রয়োজন হইলে তাহারাও যাহাতে চেক ভাঙ্গাইতে পারেন ব্যাঙ্ক সেরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছে। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি।

Endorsement আবার চার প্রকার :—

(১) Blank or General Endorsement ;

(২) Special Endorsement ;

(৩) Restrictive Endorsement ;

(৪) Conditional Endorsement ;

(১) Blank Endorsement—ব্ল্যাঙ্ক এণ্ডোর্সমেণ্টের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি চেকের আসল মালিক তিনি চেকের বিপরীত দিকে শুধু Pay লিখিয়া ছাড়িয়া দিবেন অর্থাৎ endorsee-র নাম উল্লেখ করিবেন না এবং নীচে আপনার নাম সই করিয়া দিবেন। যে কোন ব্যক্তি Pay শব্দটির শেষে আপনার নাম লিখিয়া তাহার ব্যাঙ্কের হিসাবে উহা জমা দিতে পারিবেন। এইরূপ endorse করা চেক বেয়ারার চেকের সমতুল্য। এণ্ডোর্স করিলে চেকটি এইরূপ দাঁড়াইবে,

Pay·········

Ramchandra Ghose.

(২) Special Endorsement—এই ক্ষেত্রে এণ্ডোর্সার Pay শব্দটির শেষে endorsee-র নাম উল্লেখ করিয়া দিবেন। চেকটি এণ্ডোর্স করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে,

Pay Mr. Shyamchandra Ghosh.

Ramchandra Ghosh

(৩) Restrictive Endorsement—এই ক্ষেত্রে endorseeর নামের শেষে 'only' শব্দটি জুড়িয়া দিবেন। এণ্ডোর্স করিলে চেকটি এইরূপ দাঁড়াইবে :—

Pay Mr. Shyamchandra Ghosh only

Ramchandra Ghosh.

(৪) Qualified Endorsement—এই ক্ষেত্রে রামবাবু লিখিবেন,

Pay Mr. Shyamchandra Ghosh without recourse to me.

Ramchandra Ghosh.

কোয়ালিফাইড এণ্ডোর্সমেণ্টের ক্ষেত্রে চেকটি যদি কোন কারণে বাতিল হয় তবে শ্যামচন্দ্র বাবু রামবাবুর নিকট চেকের অর্থ দাবী না করিয়া রামবাবুকে যিনি প্রথমে চেকটি দিয়াছিলেন তাহার নিকট চেকের টাকা দাবী করিবেন। চেক বাতিল হইবার জন্য রামবাবু দায়ী থাকিবেন না।

(৩) **ক্রশড চেক** (Crossed cheque)—

চেকের নিরাপত্তার জন্য চেক ক্রশ করিবার নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণ চেকের বাম দিকে কোণাকুণিভাবে সমান্তরাল দুইটি রেখা টানিয়া দিয়া উহার মধ্যে এণ্ড কো (& Co) অথবা একাউণ্ট পেয়ী (A/C Payee) লিখিয়া দিলেই উহা ক্রশড চেকে পরিণত হয়।

ক্রশড চেক ব্যাঙ্কের হিসাবে অবশ্য জমা দিতে হইবে। গ্রহীতা ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরিচিত হইলেও ব্যাঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা দিবে না। 'এণ্ড কো' লেখা ক্রশড চেক ইচ্ছা করিলে endorse করা যায়। একাউন্ট পেয়ী চেক কখনো endorse করা যায় না। যাহার অনুকূলে চেক কাটা হইয়াছে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির হিসাবের খাতায় ঐ চেক জমা দেওয়া চলিবে। এইরূপ চেক সবচেয়ে নিরাপদ। ইহা হারাইলেও কোন ক্ষতি নাই, কারণ গ্রহীতা ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির নামে ঐ চেক জমা হইবে না।

চেক ভাঙ্গাইবার সময় একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখিবে, চেকদাতা গ্রহীতার নামের যেরূপ বানান লিখিয়াছেন (সেই বানান যদি ভুলও হয়) ঠিক সেইরূপ বানান করিয়া গ্রহীতাকে চেকের বিপরীত দিকে নিজের সহি করিয়া চেক জমা দিতে হইবে। নতুবা চেক বাতিল হইয়া যাইবে।

চেক কাটা—(ক) চেক কাটিবার সময় সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে চেক যেন বাতিল না হয়।

বাতিল চেক (dishonoured cheque)—চেক বাতিল হয় নানা কারণে।

(ক) যে অঙ্কের টাকার চেক কাটা হইয়াছে সেই পরিমাণ টাকা জমা না থাকিলে চেক বাতিল হয়। ধর, ব্যাঙ্কে তোমার ৬০০'০০ টাকা গচ্ছিত আছে এবং তুমি ৭০০'০০ টাকার চেক কাটিয়া দিয়াছ। ব্যাঙ্ক এই ক্ষেত্রে গ্রহীতাকে টাকা দিবে না এবং চেকটি বাতিল করিয়া দিবে।

(খ) সেভিংস একাউন্টের নিয়ম অনুযায়ী কোন ব্যাঙ্কে সপ্তাহে দুইবার কোথাও বা মাসে পাঁচ বার চেক কাটা যায়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তুমি যদি মাসে ছয়বার চেক কাটিয়া বস তবে সর্বশেষ চেকখানি জমা হইবে না, উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; কারণ, তুমি ব্যাঙ্কের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বেশীবার চেক কাটিয়াছ।

(গ) চেকের সহি এবং স্পেশিমেন সহি না মিলিলে কিংবা চেকে কাটাকুটি হইলেও চেক বাতিল হইয়া যায়।

(ঘ) একবার চেক কাটিয়া দিয়া পরে দাতা যদি চেক প্রত্যাহার করিয়া লইল বলিয়া ব্যাঙ্কে চিঠি দেয় তবে চেক বাতিল হইয়া যায়।

একমাত্র শেষোক্ত কারণটি ব্যতীত অন্য যে কোন কারণে চেক বাতিল হওয়া বড়ই লজ্জার ব্যাপার। বিশেষত ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থের চেয়ে বেশী টাকার চেক কাটা হইয়াছে এই কারণে চেক বাতিল হইলে পাওনাদার ভাবিতে

পারে যে শুধু ঠকাইবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে ঐরূপ চেক দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং চেক কাটিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে :—

(অ) গচ্ছিত অর্থের চেয়ে বেশী পরিমাণে টাকার চেক কাটিয়াছ কি না।

(আ) সেভিংস হিসাব হইলে সপ্তাহে কতবার তোমার চেক কাটা হইয়াছে।

(ই) স্পেশিমেন সহি স্মরণ করিয়া চেকে সহি করিবে।

(ঈ) চেকে কোন কাটাকুটি হইলে তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে স্পেশিমেন সহি করিয়া দিবে।

(খ) চেক কাটিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে গ্রহীতাকে উত্তর কালীন চেক দেওয়া হইতেছে কিনা।

উত্তরকালীন চেক—(Post-dated cheque)—যে তারিখে চেক কাটা হইতেছে সেদিনের তারিখ না দিয়া যদি চার পাঁচ দিন পরের তারিখ দেওয়া হয় তবে তাহাকে বলে উত্তরকালীন চেক। সাধারণত এইরূপ চেক দেওয়া হয় দুইটি কারণে :—

(১) প্রথমত যে পরিমাণ অর্থের চেক দেওয়া হইতেছে বর্তমানে দাতার হিসাবে ঐ পরিমাণ অর্থ নাই। তবে চেক ভাঙ্গাইবার পূর্বে দাতা আশা করিতেছেন বাকী টাকাটা তিনি ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিতে পারিবেন।

(২) দ্বিতীয়ত তোমার ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী সেভিংস হিসাবে সপ্তাহে একবারের বেশী চেক কাটা যায় না। কিন্তু অনিবার্য কারণে একই সপ্তাহে তোমাকে দ্বিতীয়বার চেক কাটিতে হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে তুমি একটি উত্তরকালীন চেক দিলে। উত্তরকালীন চেক কি কারণে দেওয়া হইল গ্রহীতাকে সর্বদাই তাহার কারণ উল্লেখ করিয়া দিবে।

চেক গ্রহণ করা—

চেক কাটিতে গেলে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় চেক গ্রহণেও অনুরূপ সতর্কতার প্রয়োজন।

(১) চেক কালি দিয়া লেখা কি না সর্বদা দেখিয়া লইবে। পেন্সিলের লেখা সহজেই মুছিয়া যাইতে পারে। সুতরাং জাল করা কঠিন নয়।

(২) চেকটি যদি উত্তরকালীন চেক হয় তবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উহা জমা দিবে না।

(৩) কাটাকুটি থাকিলে উহার পাশে দাতার সহি আছে কি না পরীক্ষা করিয়া লইবে।

(৪) অন্য কোন কারণে চেকটি বাতিল হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা দাতার নিকট সম্ভব হইলে জানিয়া লইবে। অবশ্য কেহ যদি প্রতারণার উদ্দেশ্যেই ভুয়া চেক দেয়, তবে ব্যাঙ্কে চেক জমা না পড়া পর্যন্ত উহা ভুয়া কিনা জানিবার উপায় নাই। এই কারণে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন লোকের নিকট হইতে চেক গ্রহণ না করাই সমীচীন।

(৫) চেক জমা দিবার সময় দাতা কিরূপে তোমার নামের বানান করিয়াছেন দেখিয়া লইয়া অনুরূপভাবে বানান করিয়া চেকের বিপরীত দিকে তোমার নাম সহি করিবে।

চেক হারাইলে কি করিবে?—

যদি গ্রহীতার নিকট হইতে চেকখানি হারাইয়া যায় তবে তিনি তৎক্ষণাৎ চেকদাতাকে সংবাদ দিবেন। চেকদাতা সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাঙ্কে চেক বাতিল করিবার জন্য প্রত্যাহার পত্র পাঠাইয়া দিবেন।

চেকের সুবিধা—চেকে অর্থ প্রদানের সুবিধা নানাবিধ। প্রথমত পথেঘাটে অর্থ বহনের বিপদ অনেক। টাকা চুরি গেলে আর ফিরিয়া পাওয়া কঠিন। কিন্তু চেক চুরি গেলে চেকদাতা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে জানাইয়া দিলে ব্যাঙ্ক হারানো চেকটি বাতিল করিয়া দিবে। তাই চেক বহনের বিপদ নাই। দ্বিতীয়ত ব্যবসায়ীদের অনেক লোকের সঙ্গে কারবার করিতে হয়। হাজার হাজার টাকা নোটে দিতে হইলে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই অর্থ বহনের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সেই ক্ষেত্রে চেকে অর্থ দেওয়াই সুবিধাজনক।

জীবন বীমা

অর্থ সঞ্চয় করিবার অন্যতম উপায় হইল জীবনবীমা। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার সুবিধা আছে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে অভাব অনটন লাগিয়াই থাকে। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা সঞ্চিত থাকিলে অভাবের সময় ঐ টাকা উঠাইয়া লইবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ব্যাঙ্ক হইতে যখন তখন টাকা উঠাইবার কোন অসুবিধা নাই। এই জন্যই বহু ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া যে সামান্য অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয়, গৃহস্থ তাহা সহজেই খরচ করিয়া ফেলে।

ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া জমান আর হইয়া ওঠে না। ফলে গৃহস্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় বহু পরিবার দারুণ অভাবে পড়িয়া দুঃখদুর্দশা ভোগ করে। জীবনবীমার টাকা মেয়াদ (maturity) ফুরাইবার পূর্বে তোলা যায় না বলিয়া টাকাটা জমানো থাকে। ব্যাঙ্কের চেয়ে জীবন বীমা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ পন্থা। জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে এবং পতনোন্মুখ মধ্যবিত্ত সমাজকে আকস্মিক ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে জীবনবীমার বহুল প্রচলন দরকার।

ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই বীমার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত এক জীবন বীমা কর্পোরেশন (Life Insurance Corporation সংক্ষেপে L. I. C.) বীমা করিতে ইচ্ছুক এইরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। চুক্তিপত্রটিকে বলা হয় পলিসি (Policy) এবং যাহারা বীমা করিয়াছেন তাহাদের বলা হয় বীমাকারী (Policy holder)। এই চুক্তিতে স্থির হয় বীমাকারী কত টাকার বীমা করিবেন এবং কত বৎসরের মধ্যে এই টাকা দিবেন। তারপর মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক বা বাৎসরিক কিস্তিতে নির্ধারিত বৎসরের মধ্যে বীমার টাকা শোধ করা হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে এই অর্থ পরিশোধ করাকে বলে প্রিমিয়াম দেওয়া। একটি উদাহরণের সাহায্যে সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার করা যাউক।

ধর, রামবাবু ত্রিশ বৎসরের মেয়াদে একটি ১০,০০০ টাকার বীমা করিবেন। তিনি বৎসরে একবার করিয়া প্রিমিয়াম দিবেন। ইহার অর্থ এই যে বীমা করার দিন হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাৎসরিক কিস্তিতে রামবাবু বীমা কর্পোরেশনকে ১০,০০০ টাকা দিবেন। তারপর ত্রিশ বৎসর পরে এককালীন ঐ টাকাটা পাইবেন।

বীমা সাধারণত দুই প্রকারের—(১) মেয়াদী বীমা (Endowment Policy) এবং (২) আজীবন বীমা (Whole Life Policy)।

(১) মেয়াদী বীমা—এইরূপ বীমা করিলে বীমাকারী বীমার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ঐ অর্থ নিজেই পাইবেন। অর্থাৎ রামবাবু ত্রিশ বৎসর পরে ১০,০০০ টাকা নিজেই দাবি করিতে পারিবেন (claim by maturity)।

(২) আজীবন বীমা—এইরূপ বীমা করিলে বীমাকারী বীমার নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পরেও টাকাটা পাইবেন না। বীমাকারীর মৃত্যুর পরে

তাহার মনোনীত ব্যক্তি (nominee) ঐ অর্থের মালিক হইবে (claim by death)।

বীমা করিবার সুবিধা—বীমা করিবার অনেকগুলি সুবিধা আছে। এই সুবিধাগুলিই বীমার বৈশিষ্ট্য। বীমার সুবিধা সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা যাক।

(১) বাধ্যতামূলক সঞ্চয়—ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের মত বীমার অর্থ যখন তখন তোলা যায় না। বীমাকারী কর্পোরেশনের নিকট হইতে অবশ্য টাকা ধার পাইতে পারেন। তবে এই ধার সুদসমেত শোধ দিতে হয়। তাই সহজে কেহ বীমার বিনিময়ে ধার নিতে চান না।

(২) ব্যাঙ্কের তুলনায় সুদের হার বেশী—বীমা করিবার আর একটি সুবিধা এই যে এখানে মোটা সুদ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্কগুলিও অবশ্য আজকাল মক্কেলদের মোটা সুদ দিতেছে।

বীমাকারী ইচ্ছা করিলে সুদ ব্যতীত কর্পোরেশনের নিকট হইতে লাভও (Profit) পাইতে পারেন। লাভহীন (without profit) বীমা এবং লাভ-সমেত (with profit) বীমার পার্থক্য এই যে লাভহীন বীমাতে মোট প্রিমিয়ামের অঙ্ক বীমার টাকার চেয়ে কম ; সুতরাং ইহার প্রিমিয়াম রেটও কম। কেহ যদি ১০০০·০০ টাকার বীমা করেন তবে তাহাকে প্রিমিয়াম বাবদ অনুমান ৮৫০·০০ টাকা দিতে হইবে অর্থাৎ যে টাকা পাইবেন তাহার চেয়ে বীমাকারী আরও কম দিবেন। লাভসমেত বীমার প্রিমিয়াম রেট অনেক বেশী। ১০০০·০০ টাকার একটি লাভসমেত বীমাতে প্রিমিয়াম বাবদ প্রায় ১০৫০·০০ টাকা দিতে হয়। তবে বীমাকারী কোম্পানীর নিকট হইতে লাভবাবদ সাধারণত মোটা টাকা পাইয়া থাকেন। লাভসমেত বীমার ঝুঁকি এই যে কোম্পানী টাকা ভালভাবে ব্যবসায়ে খাটাইতে না পারিলে বীমাকারীদেরও লোকসান। জানিয়া রাখ বীমা কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক জনসাধারণের টাকা নিয়া সর্বদা ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে।

(৩) কিস্তিতে টাকা দিবার সুবিধা—যে টাকা সঞ্চয় করিতে চাই উহা এককালীন জমা রাখিতে হয় না। কিস্তিতে বীমার টাকা দিতে হয়। প্রত্যেক কিস্তি দিবার সময় উপস্থিত হইলে বীমা কর্পোরেশন বীমাকারীকে একটি নোটিশ পাঠাইয়া স্মরণ করাইয়া দেয় তাহাকে প্রিমিয়ামের টাকা দিতে হইবে। এই প্রিমিয়াম নোটিশ পাঠান অবশ্য কর্পোরেশনের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। নির্ধারিত

সময়ে প্রিমিয়াম দিতে না পারিলে বীমা বাতিল (lapse) হইয়া যায়। বীমা বাতিল হইবার ভয়ে কেহ সহজে প্রিমিয়াম দিতে বিলম্ব করে না।

(৪) বীমার আর একটি সুবিধা এই যে নির্ধারিত সময় পার হইবার পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে যে পরিমাণ অর্থ বীমা করা হইয়াছে কর্পোরেশন সেই অর্থ বীমাকারীর মনোনীত ব্যক্তিকে ফেরত দেয়। জীবনবীমা করিবার এই বিশেষ সুবিধাটি কম নয়। কোন ব্যক্তি অকালে স্ত্রীপুত্র রাখিয়া মারা গেলে তাহার অভাবে সমস্ত পরিবারকে কষ্ট পাইতে হয় না।

(৫) প্রয়োজন হইলে বীমার পলিসি বন্ধক রাখা যায়। সরকারী বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থার সমবায় সমিতির সদস্যরা এইরূপভাবে বীমা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার পাইবার সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন।

বীমার অসুবিধা—

বীমার সর্বপ্রধান অসুবিধা এই যে একাদিক্রমে প্রিমিয়াম চালাইয়া যাইতে না পারিলে বীমা বাতিল হইয়া যায়। অবশ্য এখানেও কর্পোরেশন বীমাকারী-দের একটি সুবিধা দিতেছে—তিন বৎসর বীমার প্রিমিয়াম চালাইবার পর কেহ যদি উহা চালাইতে অসমর্থ হইয়া পড়েন, তবে তিনি বীমা স্থগিত রাখিতে পারেন। বীমা স্থগিত রাখিলে বীমার নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে গচ্ছিত টাকা পাইবেন না।

প্রিমিয়াম রেট কিভাবে স্থির হয় ?

বীমা করিবার সময় বীমা কর্পোরেশন তাহার নিজস্ব চিকিৎসক দিয়া বীমাকারীর স্বাস্থ্য ভালভাবে পরীক্ষা করাইয়া লয় ; কারণ কর্পোরেশনকে বীমা-কারীর জীবনের ঝুঁকি লইতে হইতেছে। কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মারা গেলে সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম না দেওয়া সত্ত্বেও তাহার উত্তরাধিকারী বীমার সমস্ত টাকা পাইতেছে। কর্পোরেশনের পক্ষে বীমাকারীর মৃত্যু কম ক্ষতিকর নয়। দুর্বল কিংবা রুগ্ন ব্যক্তি—যাহার অকালে জীবননাশের সম্ভাবনা আছে সেরূপ ব্যক্তিকে বীমা করিতে দেওয়া মানেই গুরুতর ঝুঁকি লওয়া। তাই বীমা কোম্পানীর চিকিৎসক বীমা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পেশা, স্বাস্থ্য, দেহের ওজন, তাহার নিজের কিংবা বংশের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার জীবন সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করিয়া লন। পরীক্ষিত ব্যক্তির জীবন যদি নির্দিষ্ট মানসম্মত (standard life) বলিয়া বিবেচিত হয় তবে তাহাকে বীমা করিতে দেওয়া হয়। সাধারণ নিয়মে বয়স্কদের চেয়ে

অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের আয়ু বেশী হইবার সম্ভাবনা। স্বভাবত এই কারণেই অল্পবয়স্ক ব্যক্তির প্রিমিয়ামের হার পূর্ণবয়স্কদের চেয়ে কম। অল্প বয়সেই তাই বীমা করা বাঞ্ছনীয়। যাহাদের কোনরূপ পান দোষ আছে কিংবা যাহারা বিপজ্জনক পেশায় নিযুক্ত, যেমন—রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি বা বিমানপরিচালকদের প্রিমিয়ামের হার অনেক বেশী, কারণ, বীমা কর্পোরেশন এই সকল ব্যক্তির জীবনের বেশী ঝুঁকি লইতেছে। এখানে বলা আবশ্যক বীমাকারী যদি বীমা করিবার তের মাসের মধ্যে আত্মহত্যা করে তবে বীমার টাকা তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে দেওয়া হয় না। আমাদের দেশের বীমা সংস্থা যখন একটি বেসরকারী সংস্থার হাতে ছিল, তখন যুক্ত জীবন-বীমার সুবিধা ছিল। স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্নী, দুই-ভ্রাতা, দুই-ভগ্নী অর্থাৎ যে কোন দুই ব্যক্তি যৌথভাবে বীমা করিতে পারিত। এই বীমা অনুসারে একজন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে অপরজন বীমার টাকা পাইতেন। কোম্পানীকে এখানে দুই জীবনের ঝুঁকি লইতে হইত। বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রীয়করণের পরে এই যুগ্মবীমার সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে একজনকে হত্যা করিয়া অপর অংশীদার বীমার টাকা আদায়ের চেষ্টা করিয়াছেন প্রমাণিত হইবার পরেই বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক যুক্ত-বীমা বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নানা রকমের বীমা করা যায়, যথা,—

(১) **বিবাহ বীমা**—কন্যার বিবাহের জন্য মাতাপিতা অথবা অভিভাবকদের সঞ্চয় করা প্রয়োজন। শিশুকন্যার জন্মের পরেই পিতা কন্যার নামে এমন একটি বীমা করিতে পারেন যাহাতে কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলে বীমাও পরিণত হইয়া উঠিবে। এইরূপ বীমায় কন্যা যদিও বীমার মালিক তথাপি কার্যত পিতার জীবনকেই বীমা করা হইতেছে। কর্পোরেশন পিতার জীবনের উপর বীমা করিবে এবং প্রিমিয়ামের হার নির্ধারিত করিবে, তবে, অর্থের মালিকানা কন্যার। বীমা পরিণত হইবার পূর্বেই যদি পিতার মৃত্যু ঘটে তবে কর্পোরেশন উত্তরাধিকারীকে সম্পূর্ণ অর্থই দিতে বাধ্য। তবে বীমা পরিণত হইবার সময় পর্যন্ত উত্তরাধিকারীকে অপেক্ষা করিতে হয়। সাধারণ বীমার মত বীমাকারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই অর্থ প্রাপ্য হয় না।

মনোনীত ব্যক্তির যদি পূর্বাহ্ণে মৃত্যু ঘটে তবে বীমাকারী অপর কোন সন্তানকে মনোনীত করিতে পারেন অথবা যে অর্থ প্রিমিয়াম বাবদ দিয়াছেন সেই অর্থও ফেরত লইতে পারেন।

(২) **শিক্ষা-বীমা**—বিবাহের উদ্দেশ্যে বীমা করার মত যে কোন অভিভাবক কিংবা পিতা সন্তানদের শিক্ষার খরচ চালাইবার জন্যও বীমা করিতে পারেন। এখানেও নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পরে মনোনীত ব্যক্তি অর্থের মালিকানা পায়। সাধারণত সন্তানের জন্মের পরে ১৫ অথবা ২০ বছরের মেয়াদে বীমা করা হয়। সন্তান ঐ বয়সে পদার্পণ করিবার পরে তাহার শিক্ষার জন্য মোটা অর্থ ব্যয় করিতে হইবে এইরূপ ভাবিয়া শিক্ষা-বীমা করা হইয়া থাকে। বীমা পরিণত হইবার পরে বীমাকারী এককালীন টাকাটা লইতে পারেন কিংবা কয়েকটি কিস্তিতেও টাকা লইতে পারেন। ছয় বৎসর ধরিয়া সন্তানের শিক্ষা চলিবে। সুতরাং ছয় বৎসরে ছয় কিস্তিতে টাকা লওয়াই অধিক সুবিধাজনক মনে হইলে বীমাকারী সেইভাবে টাকা গ্রহণ করিতে পারেন। তবে টাকা পরিণত হইবার পরে বীমা কর্পোরেশনের নিকট এইভাবে টাকাটা গচ্ছিত থাকিলেও, কর্পোরেশন বীমাকারীকে সুদ কিংবা লাভ কোন সুবিধাই দিবে না।

(৩) **বৃত্তিবীমা**—চাকরি হইতে অবসর লাভের পর যাহাদের পেনসন পাইবার আশা নাই তাহাদের পক্ষে এই বীমা খুবই সুবিধাজনক। বীমাকারী এমন একটি বীমা করিবেন যে তাহার চাকরি হইতে অবসর পাইবার সময় বীমাও পরিণত হইয়া আসিবে। তারপর বীমার টাকা একসঙ্গে গ্রহণ না করিয়া প্রতি মাসে বৃত্তির মত পাইতে থাকিবেন। এইরূপ একটি বীমা থাকিলে বৃদ্ধ বয়সে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না।

এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার বীমা আছে। উহার নাম দুর্ঘটনা বীমা ও ক্ষতিপূরক বীমা। দুর্ঘটনা বীমা করিলে বীমাকারী কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বীমার দ্বিগুণ অর্থ পাইবেন। দুর্ঘটনা বীমার প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত বেশী। ক্ষতিপূরক বীমা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। বীমাকারী এখানে আপনার জীবনের উপর বীমা না করিয়া কোন মূল্যবান সম্পত্তি, যথা—গাড়ি, বাড়ি অথবা ব্যবসায়ের উপর বীমা করিয়া থাকেন। এই সকল মূল্যবান সম্পত্তি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে বীমাকারী বীমার অর্থ পাইয়া থাকেন।

ভারত সরকারের জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা—

ভারত সরকার জাতীয় উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা করিয়াছেন। জনসাধারণের নিকট হইতে বিভিন্ন মেয়াদে ঋণস্বরূপ

অর্থ গ্রহণ করিয়া সরকার একদিকে জাতীয় উন্নয়নের কাজে লাগাইতেছেন অপরদিকে জনসাধারণকে মোটা সুদসহ ঐ অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে সহায়তা করিতেছেন। এইভাবে সঞ্চয়ের একটি প্রধান সুবিধা এই যে এগুলি আয়করমুক্ত (free from income tax)। নীচে এইরূপ কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় পরিকল্পনার আলোচনা করিতেছি।

(১) **বার বৎসরের মেয়াদে ন্যাশনাল প্ল্যান সেভিংস্ সার্টিফিকেট**—যে সমস্ত পোস্ট অফিসে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ হয় সেই সমস্ত পোস্ট অফিসে ৫'০০ টাকা হইতে শুরু করিয়া ২৫০০০'০০ টাকা পর্যন্ত এই সার্টিফিকেট বিক্রয় হয়। এক ব্যক্তি ২৫০০০'০০ টাকার বেশী সার্টিফিকেট কিনিতে পারেন না। দুই ব্যক্তি যুক্তভাবে ৫০,০০০'০০ টাকা পর্যন্ত এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতিগুলি এক লক্ষ টাকার সার্টিফিকেট কিনিতে পারে। বছরে শতকরা ৫'৪১% হারে সুদ পাওয়া যায়। এই সার্টিফিকেটের মেয়াদ ১০ বৎসর। তবে এক বৎসর পরেই উহা ভাঙ্গাইয়া ফেলা যায়। সরকার এই সব ক্ষেত্রে এক বৎসরের সুদ দিবেন।

(২) **গিফ্ট কুপন**—যে সকল পোস্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ হয় সেখানে গিফ্ট কুপন কিনিতে পাওয়া যায়। ৫'০০ হইতে শুরু করিয়া ১,০০০ ০০ টাকা পর্যন্ত গিফ্ট কুপন কেনা যায়। বিবাহ, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতিতে উপহার হিসাবে এই কুপন দেওয়া যাইতে পারে। কুপন জমা দিয়া উহার বিনিময়ে ন্যাশনাল প্ল্যান সেভিংস্ সার্টিফিকেটও কিনিয়া লওয়া যায়।

(৩) **দশ বৎসরের মেয়াদে ট্রেজারী সেভিংস্ ডিপোজিট**—৫০'০০ টাকা হইতে শুরু করিয়া ৫০-এর গুণক হিসাবে (অর্থাৎ ১০০'০০, ১৫০'০০, ২০০'০০ ইত্যাদি) ২৫০০'০০ টাকা পর্যন্ত ট্রেজারী সেভিংস্ সার্টিফিকেট কেনা যায়। শতকরা ৪'০০ টাকা হার সুদে দশ বৎসর পরে সমস্ত টাকা এককালীন সুদেমূলে পাওয়া যায়। নতুবা প্রতি বৎসর কেবল সুদও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৪) **১৫ বৎসরের মেয়াদে এন্যুয়িটি সার্টিফিকেট**—১,৩৩০'০০, ৩,৩২৫'০০, ৬,৬৫০'০০, ১৩,৩০০'০০ কিংবা ২৬,৬০০'০০ টাকা দিয়া ১৫ বৎসরের মেয়াদে এন্যুয়িটি সার্টিফিকেট কিনিতে পারা যায়। পনের বছর ধরিয়া ৪'২৫% চক্রবৃদ্ধিহার সুদে সরকার মাসিক কিস্তিতে সমস্ত টাকা পরিশোধ করেন। টাকা জমা দিবার পর ক্যালেণ্ডারের হিসাবে এক মাস অতিক্রান্ত হইলেই টাকা পাওনা হইতে থাকে।

(৫) **কিউমিউলেটিভ টাইম ডিপোজিট**—পাঁচ অথবা দশ বৎসরের মেয়াদে এইভাবে পোস্ট অফিসে টাকা জমা রাখা যায়। জীবনবীমার প্রিমিয়ামের মত মাসিক কিস্তিতে টাকা জমা দিতে হয়। প্রতি মাসে ৫'০০ টাকা হইতে শুরু করিয়া ২০০'০০ টাকা পর্যন্ত জমা রাখা যায়। কেহ যদি মাসে ২০'০০ টাকা হিসাবে জমা দেন তবে পাঁচ বৎসর পরে তাহার ১৩০০'০০ টাকা পাওনা হইবে। আবার দশ বৎসরের মেয়াদে ২০'০০ টাকা করিয়া রাখিলে ২,৯০০'০০ টাকা পাওয়া যাইবে।

(৬) **পে রোল সেভিংস্ স্কীম**—সরকারী কর্মচারীদের আজকাল সঞ্চয়ের একটি নূতন সুবিধা দেওয়া হইতেছে। কর্মীরা ইচ্ছা করিলে তাহাদের বেতন হইতে কিছু সঞ্চয়ের জন্য নিয়োগকর্তার নিকট আবেদন জানাইতে পারেন। প্রতি মাসে কত টাকা সঞ্চয় করা হইবে তাহাও ঐ আবেদন পত্রে উল্লেখ করা থাকিবে। সরকার আবেদন অনুযায়ী টাকাটা বেতন হইতে কাটিয়া রাখিয়া পোস্ট অফিসের সেভিংস্ বুকে রাখিয়া দিতে পারেন নতুবা আবেদনকারীর ইচ্ছা অনুসারে তাহার নামে ন্যাশনাল প্ল্যান সেভিংস্ সার্টিফিকেটও কিনিয়া দিতে পারেন।

(৭) **সেভিংস্ স্ট্যাম্প**—পোস্ট অফিস হইতে বিনামূল্যে সেভিংস্ কার্ড দেওয়া হয়। ২৫ পয়সা অথবা ১'৫০ পয়সার স্ট্যাম্প কিনিয়া ঐ কার্ডে আঁটিয়া রাখিতে হইবে। ৫'০০ টাকার স্ট্যাম্প জমা হইলে তাহার বিনিময়ে ঐ মূল্যের একটি সেভিংস্ সার্টিফিকেট কেনা যায়। শিশু ও বালকদের মধ্যে এইভাবে খেলার ছলে অর্থ জমাইবার স্পৃহা জাগাইয়া তোলা যাইতে পারে।

(৮) **১০ বছরের মেয়াদে প্রতিরক্ষা ডিপোজিট** (Ten-Year Defence Deposits)—স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সকল শাখায় এবং সরকারী ট্রেজারী ও সাব-ট্রেজারীগুলিতে এইভাবে দশ বৎসরের মেয়াদে টাকা জমা রাখা যায়। শতকরা ৪½% হারে সুদ দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি ৩৫,০০০'০০ টাকার বেশী জমা রাখিতে পারেন না। দুই ব্যক্তি যুক্তভাবে ৭০,০০০ ০০ টাকা; যে সকল প্রতিষ্ঠানের দান আয়করমুক্ত উহারা এক লক্ষ টাকা; প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫০,০০০'০০ টাকা এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড যে কোন পরিমাণ অর্থ জমা রাখিতে পারে। ক্যালেণ্ডারের হিসাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলেই সুদ পাওনা হইতে থাকে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে টাকা তুলিলে সুদ পাওয়া যায় না। এক বৎসর পূর্ণ হইবার পরেই টাকা তোলা যায়।

তবে সরকার নিম্নলিখিত হারে টাকা কাটিয়া রাখিয়া মূল অর্থ ফেরত দিবেন।

১ বৎসর পূর্ণ হইবার পরে কিন্তু ২ বৎসর পার হইবার পূর্বে
প্রতি ৫০'০০ টাকায় ২'২৫ কাটা যাইবে

২ বৎসর পূর্ণ হইবার পরে কিন্তু ৩ বৎসর পার হইবার পূর্বে
প্রতি ৫০'০০ টাকায় ২'৫০ " "

৩ বৎসর পূর্ণ হইবার পরে কিন্তু ৪ বৎসর পার হইবার পূর্বে
প্রতি ৫০'০০ টাকায় ৩'২৫ " "

৪ বৎসর পূর্ণ হইবার পরে কিন্তু ৫ বৎসর পার হইবার পূর্বে
প্রতি ৫০'০০ টাকায় ৩'২৫ " "

৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পরে কিন্তু ৬ বৎসর পার হইবার পূর্বে
প্রতি ৫০'০০ টাকায় ২'৭৫ " "

৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পরে কিন্তু ৭ বৎসর পার হইবার পূর্বে
প্রতি ৫০'০০ টাকায় ২'২৫ " "

৭ বৎসর পূর্ণ হইবার পরে কিন্তু ৮ বৎসর পার হইবার পূর্বে
প্রতি ৫০'০০ টাকায় ২'০০ " "

৮ বৎসর পূর্ণ হইবার পরে কিন্তু ৯ বৎসর পার হইবার পূর্বে
প্রতি ৫০'০০ টাকায় ১'৫০ " "

৯ বৎসর পূর্ণ হইবার পরে কিন্তু ১০ বৎসর পার হইবার পূর্বে
প্রতি ৫০'০০ টাকায় ০'৭৫ প. "

১০ বৎসর পূর্ণ হইবার পরে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে।

প্রতিরক্ষা ডিপোজিট আয়করমুক্ত।

(৯) **কোম্পানীর শেয়ার** (Shares in companies)—সাধারণ লোকেরা সঞ্চিত মূলধন ব্যবসায়ে খাটাইয়া বাড়াইবার সুযোগ পায় না, পাইলেও অর্থের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনেক সময় নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। তাই তাহাদের পক্ষে ভাল কোম্পানীর শেয়ার কেনা নিরাপদ। ভাল কোম্পানীর শেয়ার কিনিলে টাকা লোকসান হইবার আশঙ্কাও থাকে না। এখন প্রশ্ন হইল শেয়ার জিনিসটি কি ? এক একটি বড় বড় ব্যবসায় চালাইতে হইলে প্রচুর মূলধনের দরকার। ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্টায় সর্বদা এই বিরাট মূলধন যোগান দেওয়া সম্ভবপর হইয়া ওঠে না। তখন যৌথ উদ্যমে ব্যবসায় চালাইবার প্রয়োজন হয়। কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তি মিলিয়া জনসাধারণের নিকট অর্থ বিনিয়োগের আহ্বান জানান। এই অর্থের বিনিময়ে তাহাদের কোম্পানীর অংশীদার করিয়া লওয়া হয়। অধিকাংশ কোম্পানীর

মূলধনের পরিমাণ স্থির করা থাকে। এই মূলধনকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে (unit) ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। মূলধনের এই এককের নাম শেয়ার। শেয়ার বিক্রির সময় সর্বদা শেয়ারের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ধর, একটি কোম্পানীতে ৫০,০০০'০০ টাকা মূলধন প্রয়োজন। এক একটি শেয়ারের ১০০'০০ টাকা করিয়া দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল। এইবার কোম্পানীর শেয়ারের পরিমাণ দাঁড়াইল ৫০০ খানা। শেয়ার কিনিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রতিটি শেয়ারের জন্য ১০০'০০ টাকা করিয়া দিতে হইবে। মোট পাঁচ শত শেয়ার বিক্রয় হইয়া গেলে কোম্পানীর নিকট নতুন কোন ক্রেতা হাজির হইলে কোম্পানী তাহাদের ফিরাইয়া দিবে।

শেয়ার কিনিতে হইলে কোম্পানীর নিকট প্রথমে উহার নির্ধারিত আবেদন পত্রে আবেদন করিতে হয়। সাধারণত এই আবেদন পত্রের সঙ্গে একটি প্রবেশ-মূল্য দিতে হয়। আবেদন মঞ্জুর হইলে কোম্পানীকে শেয়ারের মূল্য মিটাইয়া দিতে হয় এবং কোম্পানী আবেদনকারীকে ব্যবসায়ের অংশীদার করিয়া লয়। শেয়ারের দর যেমন বাঁধা থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে শেয়ারের পরিমাণও তেমনি বাঁধা থাকে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী কেহ শেয়ার কিনিতে পারিবে না। শেয়ারের টাকা এককালীন দিতে হইবে, না কিস্তিতে দিতে হইবে তাহাও কোম্পানী স্থির করিয়া দেয়। যাহাদের এইরূপ শেয়ার আছে তাহাদের বলে শেয়ারহোল্ডার। শেয়ারহোল্ডাররা নিজ নিজ শেয়ার অনুযায়ী কোম্পানীর লভ্যাংশের ভাগ পাইয়া থাকেন।

পূর্বেই বলিয়াছি ভাল কোম্পানীর শেয়ার কিনিলে লাভ বই লোকসান নাই। শেয়ারহোল্ডার ইচ্ছা করিলে শেয়ার হস্তান্তর করিতে পারেন অথবা বিক্রি করিতে পারেন। যে দামে কেনা হইয়াছে তাহার চেয়ে অধিক দামে বিক্রি করিতে পারিলে শেয়ারহোল্ডার লাভসমেত (at premium) শেয়ার বিক্রয় করিলেন। সাধারণত সমস্ত উঠতি ব্যবসায়গুলির শেয়ার বাজারে চড়া দামে বিক্রি হইয়া থাকে এবং নিত্যই উহার দাম চড়িতে থাকে। স্বভাবতই পড়তি কোম্পানীর শেয়ারে লভ্যাংশ পাইবার সম্ভাবনা কম, সুতরাং শেয়ারের দামও কম। লোকসান দিয়া শেয়ার বিক্রয় অর্থাৎ যে দামে ক্রয় করা হইয়াছে উহার চেয়ে কম দামে বিক্রয় করার নাম এ্যাট ডিস্‌কাউন্ট (at discount)। যে দামে ক্রয় করা হইয়াছে ঠিক সেই দামেই শেয়ার বিক্রয় করাকে বলে এ্যাট পার (at par)।

অবসর সময়ের সদ্‌ব্যবহার

দৈনন্দিন বাঁধাধরা কাজগুলি করার পরে প্রত্যেক লোকেরই কিছু-না-কিছু সময় অবসর মেলে। আমাদের দেশের অধিকাংশ গৃহিণী তাহাদের পর্যাপ্ত অবসর সময়গুলি গল্পগুজবে কাটাইয়া দেন। এইভাবে সময় অতিবাহিত করার ফলে সময়ের অপব্যবহারই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু গৃহিণীরা প্রত্যেকেই যদি সময়ের যথার্থ সদ্‌ব্যবহার করিতে পারেন, তবে তাহাদের অবসর বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে সংসারে কিছু আয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। বস্তুত অধিকাংশ পরিবারেই এইরূপ বাড়তি আয়ের প্রয়োজন। বিশেষত খণ্ডিত বাংলার পরিবারগুলির জীবনযাত্রার উপরে নানা দিক হইতে প্রচণ্ড চাপ আসিয়া পড়িতেছে। মেয়েরা যাহারা অফিসে, স্কুলে, কলেজে চাকরিতে রত আছেন তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে সকল গৃহিণীরা শুধু গৃহকর্ম ব্যতীত অপর কিছু করেন না এবং সম্পূর্ণরূপে স্বামীর মুখাপেক্ষী তাহারা তাহাদের অবসর সময়ে নানারূপ কুটির শিল্প বা হাতের কাজ করিয়া স্বামীর আয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারেন।

নিম্নে মেয়েদের উপযোগী কয়েকটি শিল্পের নাম দেওয়া হইল :—

(১) ছাঁট কাট ও সেলাই—রন্ধন ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক মেয়েরই বোধহয় ছাঁট কাট ও সেলাইয়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরাগ ও দক্ষতা থাকে। অবসর সময়ে মেয়েরা সেলাই করিয়া গৃহের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। যাহাদের অর্থের প্রয়োজন বেশী তাহারা অন্য লোকের ফরমাস খাটিয়াও কিছু উপার্জন করিতে পারে।

(২) সূচিশিল্প—পোশাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী করা ব্যতীত মেয়েরা অবসর সময়ে জামায় ফুল-তোলা, কাশ্মীরি শাল তৈয়ারী ইত্যাদি কাজ করিতে পারে।

(৩) বুনন—নানারকম বুনন যেমন, সোয়েটার, স্কার্ফ, মোজা, পুলওভার, পশমের ব্লাউজ ইত্যাদি কিংবা লেস বোনার কাজ মেয়েরা গল্পগুজবের সঙ্গেই চালাইয়া যাইতে পারে।

(৪) চামড়ার কাজ—চামড়া দিয়া আজকাল মেয়েরা সুন্দর সুন্দর ব্যাগ, পৃষ্ঠার চিহ্ন, রাইটিং প্যাড ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে শিখিতেছে।

(৫) বাটিকের কাজ—এইটিও একটি মেয়েদের শিল্প।

(৬) বেতের কাজ—ব্যাগ, চুপড়ি, ডালা, চাঙ্গাড়ি, হাতপাখা ইত্যাদি তৈয়ারী করা সহজও বটে এবং এইরূপ কাজে সংসারের অনেক প্রয়োজন মেটে।

(৭) শাড়ি রং করা ও ছাপা—এই শিল্পটিও আজকাল বহু মহিলা সঙ্ঘে শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(৮) খেলনা তৈয়ারী—অতি সুন্দর, অথচ সহজ শিল্প। সামান্য দক্ষতাতেই মেয়েরা চমৎকার খেলনা তৈয়ারী করিতে পারে।

(৯) মাটির কাজ—মাটির হাঁড়ি, সরা, ফুলদানি ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া উহাতে রং-এর নক্‌শা করা অন্যতম ঘরোয়া শিল্প। মেয়েরা সহজেই এই শিল্পটির চর্চা করিতে পারে।

(১০) কাগজের ঠোঙ্গা প্রস্তুত করা—বহু দরিদ্র পরিবার আজকাল কাগজের ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া দিনযাপন করিতেছে। মেয়েরা অনায়াসে অবসর সময়ে এই সহজ কাজটি করিতে পারে। ইহাতে কোনরূপ দক্ষতার প্রয়োজন নাই।

(১১) সুতা কাটা ও তাঁত বোনা—বাংলার অতি প্রাচীন ঘরোয়া শিল্প। এই শিল্পটির পুনরুদ্ধার হওয়া প্রয়োজন। আসামের প্রতি ঘরে মেয়েরা তাঁতে কাপড় বুনিয়া পরিধান করে।

এতদ্ব্যতীত মেয়েরা ঘরেই নানা প্রকার জ্যাম, জেলী, চাটনি, আচার, আমসত্ব, স্কোয়াশ, কেক, বড়ি, নানারকমের নোনতা ও মিষ্টি খাবার, যেমন—আলু-চিপস্, চানাচুর, ঘুগ্‌নি, নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, মোয়া ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া স্কুলে কলেজে কিংবা লোকের বাড়িতে যোগান দিতে পারে। বস্তুত অনেক দুঃস্থ পরিবার আজ উপার্জনের এই পথটি বাছিয়া লইয়াছে। বাড়িতে এক ফালি জমি থাকিলে উহাতে ঋতু বিশেষে বিভিন্ন তরিতরকারি, শাকসবজি লাগাইয়াও মেয়েরা আয়ের একটি ব্যবস্থা করিতে পারে। এইরূপ নানাবিধ কুটিরশিল্পের চর্চা করিলে মেয়েরা পরিবারের অনটন ঘুচাইতে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করিতে পারে এবং অসহায় মহিলারাও ক্রমশ আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারে। কায়িক পরিশ্রমে কোন লজ্জা কিংবা সঙ্কোচের কারণ নাই। ইহাতে বরং শ্রমের মর্যাদা বাড়ে, পরিবারের দারিদ্র্য ঘোচে, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং সর্বোপরি মহিলারা আপনার শক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া উন্নত জাতি গঠনে দেশকে সাহায্য করে। যে যন্ত্র-সভ্যতার হাতে পড়িয়া আমাদের গ্রামের কুটিরশিল্পগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে সেগুলিকেও জাগাইয়া তোলা দরকার। ভারতের মেয়েরা যদি এই কাজে অগ্রণী হইয়া আসে, তবে জাতির পক্ষে উহা এক পরম কল্যাণের দিন বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম ভাগ—**খাদ্যতত্ত্ব**

দ্বিতীয় ভাগ—**বস্ত্রশিল্প**

প্রথম অধ্যায়

খাদ্যতত্ত্ব

খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্যসমূহকে দুই ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে— (১) দেহাভ্যন্তরে উহাদের কাজের প্রকার ভেদে এবং (২) উহাদের উপাদান অনুযায়ী।

কাজের প্রকারভেদে খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ—খাদ্যদ্রব্য আমাদের দেহের প্রধানত তিনটি প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে, তাহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। এই প্রয়োজনানুসারে আমরা খাদ্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

(১) ক্ষয়-পূরক এবং পুষ্টি ও বৃদ্ধি-সহায়ক খাদ্য :—

প্রোটিনই দেহের ক্ষয় পূরণ এবং বৃদ্ধি সাধনে প্রধানত সহায়তা করিয়া থাকে। উপযুক্ত প্রোটিনের অভাবে দেহ রুগ্ন ও অপরিপুষ্ট হয়। ইহা ছাড়া ধাতব লবণসমূহও দেহ গঠনে সাহায্য করিয়া থাকে। এইজন্য যে সকল খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিন ও ধাতব লবণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাদের ক্ষয়-পূরক এবং পুষ্টি ও বৃদ্ধি-সহায়ক খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, বাদাম, সয়াবীন ইত্যাদি এই শ্রেণীর খাদ্য।

(২) তাপ ও শক্তি উৎপাদক খাদ্য :—

এক শ্রেণীর খাদ্য আমাদের দেহে প্রধানত তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিয়া উহাকে কর্মক্ষম রাখে। কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যই প্রধানত দেহে তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইজন্য যে সকল খাদ্যে এই উপাদান দুইটি অধিক পরিমাণে থাকে তাহাদের তাপ ও শক্তি উৎপাদক খাদ্য বলে। চিনি, গুড়, ভাত, রুটি, মাখন, জেলী, ঘি, ময়দা, আটা ইত্যাদি এই শ্রেণীর খাদ্য।

(৩) দেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী ও রোগ প্রতিরোধক খাদ্য :—

আবার এমন খাদ্যও আছে যাহা আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি কোন কাজেই আসে না। অথচ উহাদের অভাবে

আমাদের দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইতে পারে না এবং অচিরেই আমরা বেরীবেরী, স্কার্ভি ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। খাদ্যের ভাইটামিনসমূহই প্রধানত দেহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদের এই সকল রোগের হাত হইতে রক্ষা করে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ধাতব লবণ এবং জলও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করে। সুতরাং ভাইটামিন ও ধাতব লবণ যে সকল খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তাহাদের রোগ প্রতিরোধক খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। সবুজ শাকসবজি, টমেটো, কমলালেবু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ফল, ডিম, দুধ ইত্যাদি এই শ্রেণীর খাদ্য।

উপাদান অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ—উপাদান অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করাই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। প্রথমেই মনে রাখা ভাল যে অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যেই একাধিক উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র একটি উপাদানে গঠিত এমন খাদ্যদ্রব্যের সংখ্যা খুবই কম। চিনি, সরিষার তেল ইত্যাদি এই শ্রেণীর খাদ্য। প্রথমটি বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট এবং দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ স্নেহদ্রব্য। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, চাউল, আটা ইত্যাদি মিশ্র খাদ্য, অর্থাৎ একাধিক খাদ্যোপাদান এই সকল খাদ্যে বর্তমান। সুতরাং খাদ্যকে উপাদান অনুযায়ী বিভক্ত করিবার মূল নীতিটি হইতেছে, যে খাদ্যে যে উপাদানটি সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যমান তাহাকে সেই উপাদানের খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রধানত প্রোটিনবহুল এবং প্রোটিনের অভাব পূরণ করিবার জন্যই আমরা এই জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। এইজন্য উহাদের প্রোটিনবহুল খাদ্য বলে। ভাত, আটা, ময়দা, রুটি, আলু ইত্যাদি খাদ্যের প্রধান অংশ কার্বোহাইড্রেট। এইজন্য উহারা কার্বোহাইড্রেটবহুল খাদ্য, এইরূপে উপাদান অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যসমূহ নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) **প্রোটিনবহুল খাদ্য**—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল (Pluses), সয়াবীন, বাদাম ইত্যাদি।

(২) **কার্বোহাইড্রেটবহুল খাদ্য**, যথা—চিনি, গুড়, বাতাসা, মিছরি, সরবত, মুড়ি, চিড়া, ভাত, রুটি, আটা, ময়দা, আলু, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি।

(৩) **স্নেহবহুল খাদ্য**, যথা—তেল, ঘি, ডালডা, মাখন, চর্বি ইত্যাদি।

(৪) **ভাইটামিন ও ধাতব লবণবহুল খাদ্য,** যথা—সবুজ শাকসবজি, বিভিন্ন প্রকারের ফল, তরিতরকারি ইত্যাদি।

কোন কোন খাদ্যে আবার একাধিক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইলিশ মাছ এই শ্রেণীর খাদ্যের উদাহরণ। ইহাতে প্রোটিন ছাড়াও যথেষ্ট স্নেহপদার্থ এবং ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' পাওয়া যায়। দুধ ক্যালসিয়াম ধাতব লবণের অতি উৎকৃষ্ট উৎস। ডিম, মাংস, মাছ প্রভৃতিতে ফসফরাস ধাতব লবণ এবং ডালে ভাইটামিন 'বি' বেশ পাওয়া যায়। সুতরাং এই সকল খাদ্য একাধিক শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

প্রোটিন
(Proteins)

প্রোটিন হইতেই জীবনের স্পন্দন উদ্ভূত হইয়াছে ; তাই প্রোটিন ব্যতীত কোন প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জীব এবং উদ্ভিদ্-জগতে এই প্রোটিন একটি প্রধান অংশ, এইজন্য প্রোটিনকে মুখ্য উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রোটিনের রাসায়নিক সংগঠন—সকল প্রোটিনেই কার্বন (carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen), অক্সিজেন (Oxygen) এবং নাইট্রোজেন (Nitrogen) দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ প্রোটিনেই আবার এই সকল মৌলিক পদার্থের সহিত গন্ধকও (sulphur) থাকে। কখনও কখনও ফসফরাস (Phosphorus), লৌহ (Iron) এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থও প্রোটিনের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রোটিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিলে প্রথমে অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acids) এবং শেষে কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকারের প্রোটিন হইতে মোট প্রায় পঁচিশটি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া গিয়াছে। এই সকল অ্যামিনো আসিডই প্রোটিনের মূল উপাদান বলা যাইতে পারে। A, B, C, D ইত্যাদি ইংরাজী ২৬টি অক্ষরের বিভিন্ন প্রকার মিলনে যেমন অসংখ্য শব্দের সৃষ্টি হয়, তেমনি এই পঁচিশটি অ্যামিনো অ্যাসিড হইতেই সকল প্রোটিনের উৎপত্তি হইয়াছে। দুইটি শব্দের পার্থক্য যেমন উহাদের অক্ষরের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে, তেমনি দুইটি প্রোটিনের পার্থক্যও উহারা যে অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত তাহাদের পার্থক্যের উপরই নির্ভর করে।

প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ—প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ উভয় জগতেই প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। উৎপত্তি হিসাবে প্রোটিন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) **প্রাণিজ প্রোটিন** (Animal Protein)—প্রাণি-জগৎ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাদের প্রাণিজ প্রোটিন বলে, যথা—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনীর ইত্যাদি।

(২) **উদ্ভিজ্জ প্রোটিন** (Vegetable Protein)—এই শ্রেণীর প্রোটিন উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে উৎপন্ন হয়; যথা—ডাল (Pulses), বাদাম (Nuts), সয়াবীন ইত্যাদি।

আমাদের দেহের প্রধান অংশ প্রোটিন এবং এই প্রোটিন কতগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের সাহায্যে দেহের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কতগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড শরীর নিজে প্রস্তুত করিয়া উহাদের অভাব মিটাইতে পারে না, খাদ্যদ্রব্যের সহিত বাহির হইতে সরবরাহ করিতে হয়। এই সকল অ্যামিনো অ্যাসিড **প্রয়োজনীয়** বা **অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড** (Essential amino acid) নামে পরিচিত। নিম্নলিখিত **দশটি** অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড।

(১) আরজিনাইন (Arginine), (২) হিসটিডাইন (Histidine) (৩) আইসোলিউসিন (Isoleucine), (৪) লিউসিন (Leusine) (৫) লাইসিন (Lysine), (৬) মিথায়নাইন (Methionine), (৭) ফিনাইল অ্যালানাইন (Phenyl alanine), (৮) থ্রিওনাইন (Threonine), (৯) ট্রিপ্টোফেন (Tryptophan) (১০) ভ্যালাইন (Valine).

শরীরের প্রোটিন প্রস্তুতিতে এইগুলি ছাড়া আরও অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়। এই সকল অ্যামিনো অ্যাসিড খাদ্যের মধ্যে না থাকিলেও শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ শরীর নিজেই এই সকল অ্যাসিড প্রস্তুত করিয়া উহার অভাব পূরণ করিতে পারে। এইজন্য এই সকল অ্যামিনো অ্যাসিড অপ্রয়োজনীয় (non-essential) অ্যামিনো অ্যাসিড নামে পরিচিত।

মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিনে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নয়, এই সকল অ্যামিনো অ্যাসিড দেহ-প্রোটিন

নির্মাণের উপযোগী অনুপাতেই বর্তমান থাকে। এইজন্যই প্রাণিজ প্রোটিনকে **উপযোগী** (Suitable), **সম্পূর্ণ** (Complete) বা **প্রথম শ্রেণীর** (First class) প্রোটিন বলে। উদ্ভিদ্-জগতের মধ্যে সবুজ শাক-সবজি, সয়াবীন ইত্যাদিতে অল্প পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত খাদ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায় :—

মাছ, মাংস, ডিম, যকৃত (liver), বৃক্ক (Kidney), ছানা, দুধ, দধি, পনীর (Cheese), সবুজ শাক-সবজি (green leafy vegetables), সয়াবীন।

প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন

আবার কোন কোন প্রোটিনে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ দেহ নির্মাণের উপযোগী অনুপাতে থাকে না বলিয়া দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই সকল প্রোটিন **কম উপ-যোগী** (less suitable). **আংশিক পূর্ণ** (partially complete) বা **দ্বিতীয় শ্রেণীর** (Second class) প্রোটিন নামে পরিচিত। সাধারণত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সমূহই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।
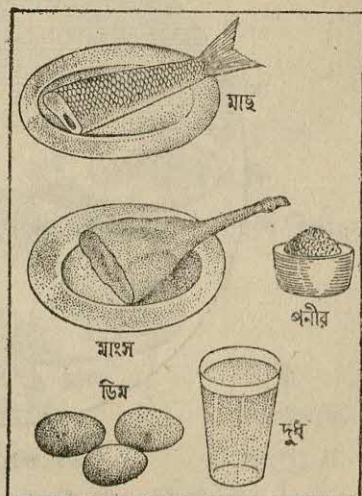
নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে সাধারণত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন দেখা যায় :—চাউল, আটা, যব Barley), রাগী (Ragi), চোলাম (Cholam), বিভিন্ন প্রকারের ডাল (Pulses), বাদাম, আলু, গাজর, বীট, শালগম, বিভিন্ন প্রকারের ফল এবং শাক-সবজি (সবুজ শাক-সবজি বাদে)। ইহাদের মধ্যে ডাল এবং বাদামে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী।

ইহা ছাড়া আরও এক প্রকার প্রোটিন আছে যাহা দ্বারা দেহের বৃদ্ধি বা পুষ্টি কিছুই সাধিত হয় না। কখনও কখনও ইহারা দেহে তাপ উৎপাদন করিয়া জ্বালানি খাদ্যের ন্যায় কাজ করে। এই সকল প্রোটিনে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব লক্ষিত হয়। এইজন্য ইহাদের **অনুপযুক্ত**

(unsuitable), **অসম্পূর্ণ** (incomplete) বা **তৃতীয় শ্রেণীর** (third class) প্রোটিন বলে। জেলাটিন (gelatin), জেন (zein) এই শ্রেণীর প্রোটিনের অন্তর্গত।

প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনকে **উৎকৃষ্ট** এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রোটিনকে **নিকৃষ্ট** শ্রেণীর প্রোটিনও বলে।
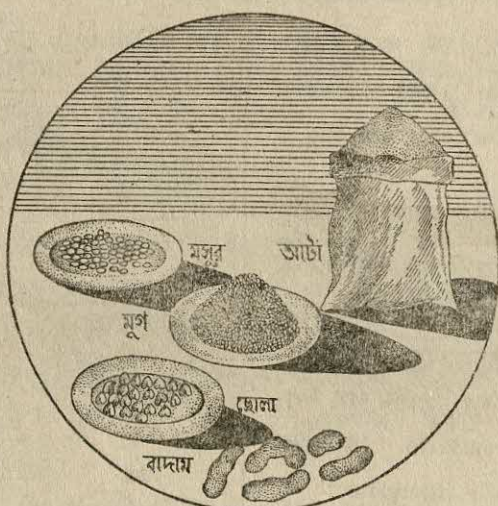
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন

সুতরাং প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগ **দুই প্রকারে** করা যাইতে পারে— (১) উহাদের উৎপত্তি অনুসারে এবং (২) প্রয়োজনীয় (essential) অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ হিসাবে।

আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাইয়া থাকি। ইহাদের অনেকের মধ্যেই কিছু-না-কিছু প্রোটিন থাকে। তবে সকল খাদ্যের প্রোটিনেই প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না এবং থাকিলেও দেহ গঠনের উপযোগী অনুপাতে থাকে না। ডাল একটি প্রোটিনবহুল খাদ্য। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির তুলনায় ডাল অনেক সস্তা। এই কারণে কম খরচে ডালের সাহায্যে আমাদের প্রোটিনের চাহিদা অনেকটা পূরণ হইতে পারে। ডালের ন্যায় বাদামেও যথেষ্ট প্রোটিন পাওয়া যায়। তাছাড়া চাউল, আটা ইত্যাদি আমাদের নিত্যকার খাদ্য। ইহাতেও কিছু কিছু প্রোটিন থাকে। কিন্তু এই সকল খাদ্যের প্রোটিন দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন। শুধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর

প্রোটিনের দ্বারা দেহের ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টি সাধন চলিতে পারে না। তবে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতিতে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনও দেহ কাজে লাগাইতে পারে। **এই কারণেই ভাত, ডাল, রুটি, বাদাম ইত্যাদি খাদ্যের সহিত প্রতিদিনই আমাদের খাদ্যে কিছু কিছু মাছ মাংস, ডিম বা দুধের ব্যবস্থা থাকা উচিত।**

উৎপত্তি অনুসারে প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ
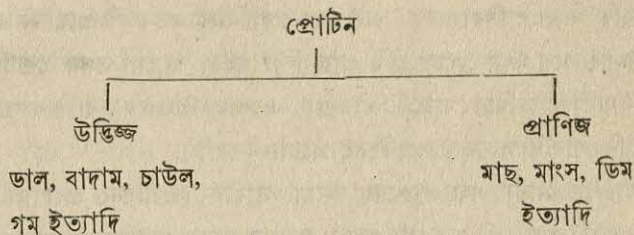
প্রয়োজনীয় (essential) অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ হিসাবে প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ।

প্রোটিন

উপযোগী	কম উপযোগী	অনুপযোগী,
সম্পূর্ণ বা	আংশিক পূর্ণ বা	অসম্পূর্ণ বা
প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন :	দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন :	তৃতীয় শ্রেণীর প্রোটিন :
মাছ, মাংস, ডিম,	ডাল, আটা,	জেলাটিন,
দুধ ইত্যাদি।	বাদাম ইত্যাদি।	জেন ইত্যাদি।
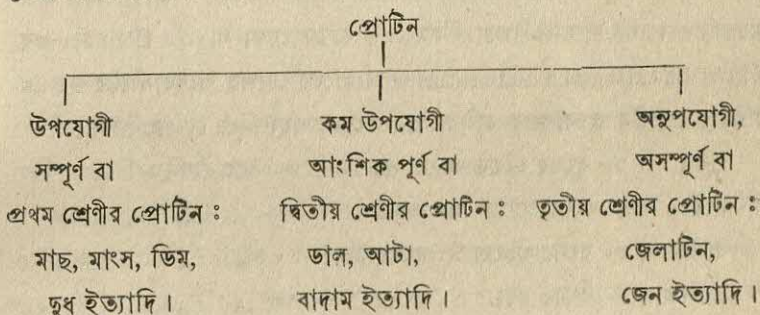
সাধারণত অধিকাংশ খাদ্যেই কিছু-না-কিছু প্রোটিন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এমন কতকগুলি খাদ্য আছে **যাহাদের মধ্যে কোনও প্রোটিন দেখিতে পাওয়া যায় না।** যথা—চিনি, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, বনস্পতি ইত্যাদি।

প্রোটিনের গুণাগুণ—অধিকাংশ প্রোটিনই জলে অদ্রবণীয়। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের প্রোটিন জল এবং লবণের মিশ্রণে দ্রবীভূত হয়। ডিমের সাদা অংশও এক প্রকার প্রোটিন। ইহাকে অ্যালবুমেন (albumen) বলে। এই অ্যালবুমেন জলে দ্রবীভূত হয়। অ্যালবুমেনের এই দ্রবণ উত্তপ্ত করিলে ইহা ঘনীভূত হইয়া নীচে পড়িয়া যায়। এই অবস্থায় প্রোটিনকে **denatured**

প্রোটিন বলে। উত্তাপের সাহায্যে এই প্রকারে ঘনীভূত হওয়া প্রোটিনের একটি স্বাভাবিক গুণ।

প্রোটিনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা—প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বয়স ও নারী-পুরুষ ভেদে বিভিন্ন প্রকার হইতে দেখা যায়। আমাদের দেহের বৃদ্ধি জন্মকাল হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সুতরাং এই সময় প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী। শরীরের দৈনন্দিন ক্ষয় পূরণ ছাড়াও দেহের বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই এই সময় প্রোটিনের এত বেশী প্রয়োজনীয়তা। পঁচিশ বৎসর পরে যখন দেহের বৃদ্ধি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসে তখন প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া যায়। এইজন্যই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় একজন কিশোর বা যুবকের প্রোটিনের প্রয়োজন বেশী।

সাধারণত নারী এবং পুরুষের মধ্যে নারীর প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা পুরুষের তুলনায় কম। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদান কালে) এই প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়। একজন সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দৈনন্দিন প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা প্রায় ৭০ গ্রাম। দেশ এবং অবস্থা ভেদে এই প্রয়োজনীয়তাও কম বেশী হইতে দেখা যায়। Coonoor-এর Nutrition Research Laboratories আমাদের দেশের অধিবাসীদের জন্য যে পরিমাণ প্রোটিন অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

পুরুষ (১৮ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর)......৬৫ গ্রাম দৈনিক
নারী (১৮ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর)......৫০ ,, ,,
বালক (১০ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর)......৮০ ,, ,,
বালিকা (১০ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর)......৭০ ,, ,,
শিশু (৬ বৎসর হইতে ৯ বৎসর)......৬০ ,, ,,
শিশু (২ বৎসর হইতে ৬ বৎসর)......৪০-৫০,, ,,

অন্যান্য দেশের তুলনায় এই পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইলেও আমাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া শরীর রক্ষার জন্য এই পরিমাণ প্রোটিনই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে।

খাদ্য হইতে প্রোটিন গ্রহণের নীতি—আমাদের শরীর গঠনের জন্য প্রথম শ্রেণীর (First class) প্রোটিনের একান্ত প্রয়োজন, কারণ এই সকল প্রোটিনের মধ্যে শরীর গঠনের উপযোগী প্রয়োজনীয় (essential) অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দৈনন্দিন

প্রয়োজনীয় প্রোটিনের সমস্তই প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বিশেষত যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে এই জাতীয় প্রোটিন পাওয়া যায়, যেমন—মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি, সেগুলি অত্যন্ত দুর্মূল্য, সাধারণ লোকের প্রায় আয়ত্তের বাহিরে। সুতরাং দেহের গঠন ও সংরক্ষণের জন্য প্রোটিনের দৈনন্দিন প্রয়োজন প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণীর প্রোটিন হইতেই সংগ্রহ করা কর্তব্য। প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনও দেহ গঠনে সহায়তা করে। সুতরাং মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির সহিত উপযুক্ত পরিমাণে ভাত, ডাল, আটা ইত্যাদি খাইলেই আমাদের দৈনন্দিন প্রোটিনের অভাব পূরণ হইবে। আবার বিভিন্ন প্রকার খাদ্য হইতে প্রোটিন গ্রহণ করিলে এক প্রকার খাদ্যের প্রোটিনের অভাব অন্য প্রকার খাদ্য দ্বারা পূরণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। ডালে প্রচুর প্রোটিন পাওয়া যায়। সুতরাং আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলে কিছু মাছ, মাংস ইত্যাদির সহিত প্রচুর পরিমাণ ডাল খাইয়া প্রোটিনের অভাব পূরণ করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র ডাল, বাদাম, আটা ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন দ্বারা শরীর রক্ষা করা যায় না। উহাদের সহিত কিছু প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষত শিশু, যুবক, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীর খাদ্যে কিছু প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন অপরিহার্য। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অন্ততপক্ষে $\frac{1}{5}$ অংশ প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন হইতে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্যে প্রোটিনের অভাবের (deficiency) ফল—প্রোটিন দেহ গঠন ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপাদান। সুতরাং সকল বয়সের লোকের খাদ্যেই উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন থাকা অত্যাবশ্যক। শিশুর খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হইলে উহার দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ওজন হ্রাস পায় এবং মেজাজ খিটখিটে হয়। প্রোটিনের অভাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধক শক্তি কমিয়া যায় এবং রক্তাল্পতা, পেটের অসুখ প্রভৃতি দেখা দেয়। বয়স্কদের এই সকল রোগ ছাড়াও শোথ রোগ (Oedema) হইবার সম্ভাবনা থাকে।

খাদ্যে প্রোটিনের আধিক্যের ফল—প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করাও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উদ্বৃত্ত প্রোটিন শরীরের কোন উপকারে আসে না। উহা শরীরের মধ্যে দূষিত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া মাথা ধরা, অবসাদ, আবার কখনও কখনও বাত রোগের (Rheumatism) সৃষ্টি করিতে পারে।

প্রোটিনের কাজ (Functions)—(১) দেহের ক্ষয় পূরণ এবং বৃদ্ধি সাধন করাই প্রোটিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ। (২) কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহজাতীয় খাদ্যে দেহের তাপ-শক্তির চাহিদা পূরণ না হইলে প্রোটিন ঐ অভাব পূরণ করিয়া থাকে। (৩) ইহা ছাড়া দেহের অভ্যন্তরস্থ জারকরস সমূহ (Enzymes), যথা—পেপসিন, ট্রিপসিন ইত্যাদি এই প্রোটিন হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। (৪) আমাদের দেহে antibody নামে একপ্রকার প্রোটিন জাতীয় পদার্থ দেখা যায়। ইহা দেহে রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা উৎপন্ন করে। (৫) আমাদের রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।

কার্বোহাইড্রেট
(Carbohydrates)

আমাদের দৈনিক খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে কার্বোহাইড্রোটের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে। ইহা অন্যান্য খাদ্যোপাদানগুলির তুলনায় সস্তা (cheap)। শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য স্নেহ পদার্থের পরেই কার্বোহাইড্রেটের গুরুত্ব। মানব সভ্যতায় এই কার্বোহাইড্রেটের অবদান বহুমুখী। তুলা, পাট ইত্যাদি আমাদের বস্ত্রসমস্যার সমাধান করিয়াছে। কাগজ আমাদের শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে। যে প্লাষ্টিক আজকাল মানব সভ্যতায় বৈচিত্র্য আনিয়াছে, তাহাও আজকাল কার্বোহাইড্রেট হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

কার্বোহাইড্রেটের রাসায়নিক সংগঠন—সমস্ত কার্বোহাইড্রেটই কার্বন (Carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen) এবং অক্সিজেন (Oxygen) এই তিনটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি অর্থাৎ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সাধারণত ২ : ১ অনুপাতে অর্থাৎ উহারা জলে যে অনুপাতে থাকে সেই অনুপাতে থাকে।

এইজন্যই এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য কার্বোহাইড্রেট (hydrate of carbon) নামে পরিচিত। **সুতরাং কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনযুক্ত কোন পদার্থে যদি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ২ : ১ অনুপাতে থাকে তবে ঐ পদার্থকেই সাধারণভাবে কার্বোহাইড্রেট বলা যাইতে পারে।**

উদাহরণস্বরূপ গ্লুকোজের কথাই ধরা যাউক। গ্লুকোজের একটি অণুতে ৬টি কার্বনের পরমাণু, ১২টি হাইড্রোজেনের পরমাণু ও ৬টি অক্সিজেনের পরমাণু আছে। ($C_6 H_{12}O_6$)। অতএব হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের (পরমাণুর) অনুপাত ১২ : ৬ বা ২ : ১। তাছাড়া গ্লুকোজে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি পদার্থই আছে। সুতরাং গ্লুকোজ একটি কার্বোহাইড্রেট। অনুরূপভাবে স্টার্চ [(C_6 . O $_n$]), চিনি ($C_{12} H_{22} O_{11}$) ইত্যাদিও যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য তাহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। তবে অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইহার ব্যতিক্রম। ইহার মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি জিনিসই আছে এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনও ২ : ১ অনুপাতে বর্তমান তবু উহা কার্বোহাইড্রেট নয়, উহা একটি অ্যাসিড মাত্র।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিভাগ—কার্বোহাইড্রেটসমূহকে প্রধানত **তিনটি ভাগে** বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) **শর্করা** (Sugars), যথা—গ্লুকোজ (Glucose), ইক্ষু শর্করা (Cane Sugar), দুগ্ধ শর্করা (Lactose), মধু শর্করা (Fructose) ইত্যাদি।

(২) **শ্বেতসার** (Starch), যথা—চাউল, গম, বার্লি ইত্যাদি।

(৩) **সেল্যুলোজ** (Cellulose), যথা—কাগজ, কাপড়, ঘাস, তুলা, পাট ও শাক সবজির প্রধান অংশ ইত্যাদি।

শর্করা (**Sugars**)—সকল প্রকার শর্করাই জলে দ্রবণীয়, মিষ্টস্বাদযুক্ত একটি স্ফটিকাকার পদার্থ। এই হিসাবে সেল্যুলোজ ও শ্বেতসার হইতে শর্করাসমুদয় সম্পূর্ণ পৃথক্। শর্করাসমুদয়কে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) **মনোস্যাকারাইড** (Mono Saccharide) এবং (২) **ডাই-স্যাকারাইড** (Di-Saccharide)। গ্লুকোজ, গ্যালাক্টোজ, মধু-শর্করা (fructose) ইত্যাদি প্রথম জাতের শর্করা এবং ইক্ষু-শর্করা, দুগ্ধ-শর্করা ও মল্‌টোজ ইত্যাদি দ্বিতীয় জাতের শর্করা। শ্বেতসার ও সেল্যুলোজকে **পলি-স্যাকারাইড** (Poly Saccharide) বলে।

শ্বেতসার (Starch)—আমরা খাদ্যদ্রব্যের সহিত যে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করিয়া থাকি তাহার অধিকাংশই শ্বেতসার হিসাবে গ্রহণ করি। ধান,

গম, যব, আলু ইত্যাদি খাদ্যের অধিকাংশই এই শ্বেতসার। কাঁচা আপেল এবং কলার মধ্যে প্রথমে শ্বেতসার থাকে ; পরে ফল পাকিবার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্বেতসার শর্করাতে পরিণত হয়। এই সকল উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার ব্যতীত প্রাণিদেহের বিশেষ করিয়া যকৃতে (liver) এক প্রকারের শ্বেতসার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে **গ্লাইকোজেন** বা **প্রাণিজ শ্বেতসার** (animal starch)

(১) শর্করা, (২) শ্বেতসার, (৩) সেল্যুলোজ
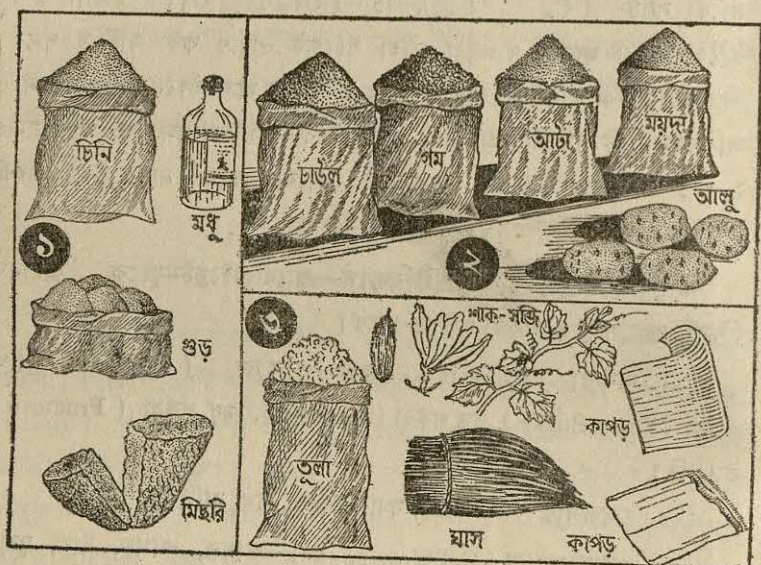
বলে। খাদ্যদ্রব্যের কার্বোহাইড্রেট প্রাণিদেহে এই গ্লাইকোজেন উৎপন্ন করে। অনেকগুলি গ্লুকোজের অণুর সমন্বয়ে একটি শ্বেতসারের অণু গঠিত হয়। দেহের মধ্যে এই শ্বেতসার জারক রসের (Enzymes) সাহায্যে আর্দ্র বিশ্লেষিত (Hydrolysis) হইয়া গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। ধান, গম, যব, আলু ইত্যাদিতে এই শ্বেতসার একটি কঠিন আবরণে আবৃত থাকে। অণুবীক্ষণ (Microscope) যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন খাদ্যের শ্বেতসার কণিকা বিভিন্ন আকৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতসারের উপরের এই কঠিন আবরণটি দুষ্পাচ্য। জলের সাহায্যে উত্তপ্ত করিলে বাহিরের কঠিন আবরণটি ফাটিয়া শ্বেতসার কণিকা বাহির হইয়া আসে। এইজন্যই রন্ধনের সাহায্যে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সহজপাচ্য হয়।

সেল্যুলোজ (Cellulose)—খাদ্যশস্য, যথা—ধান, গম, যব, ইত্যাদি, শাক-সবজি এবং ফল প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশটিকে সেল্যুলোজ বলা হয়। উদ্ভিদের দেহগঠনে ইহাই প্রধানতম উপাদান। সেল্যুলোজের অণু গ্লুকোজের অণুর দ্বারাই গঠিত। তুলা প্রায় বিশুদ্ধ সেল্যুলোজ। কিন্তু দেহের জারকরস (Enzyme) শ্বেতসারের ন্যায় ইহাকে আর্দ্র বিশ্লেষিত করিয়া গ্লুকোজে পরিণত করিতে পারে না বলিয়া খাদ্যহিসাবে ইহার গুরুত্ব অনেক কম।

কার্বোহাইড্রেটের গুণাগুণ—কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে শর্করাসমূদয় জলে দ্রবণীয়, মিষ্টস্বাদযুক্ত এবং দেখিতে স্ফটিকাকার। শ্বেতসার এবং সেল্যুলোজ স্বাদহীন এবং জলে অদ্রবণীয়। দেহের জারকরসের দ্বারা গ্লুকোজ, মধু শর্করা এবং গ্যালাক্টোজ শর্করার কোন পরিবর্তন হয় না। সেল্যুলোজের অতি সামান্যই জারকরসের দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হইয়া গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। ইহার উপরে জারকরসের কোন ক্রিয়া নাই বলিলেই চলে। পরন্তু শ্বেতসার জারকরসের দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হইয়া গ্লুকোজে পরিণত হয়। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যশস্যের অঙ্কুরোদ্গম হইবার সময় কিছু শ্বেতসার মলটোজ (Maltose) শর্করায় পরিণত হয়। রন্ধনের সময় শ্বেতসারের কিছু অংশ অগ্নির উত্তাপে আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া ডেক্সট্রিন (Dextrin) নামক এক পদার্থ উৎপন্ন করে। আয়োডিন দ্রবণের সংস্পর্শে শ্বেতসার নীল বর্ণ ধারণ করে। অন্য কোন কার্বোহাইড্রেট আয়োডিনের সংস্পর্শে নীলবর্ণে পরিণত হয় না। এইজন্য এই পরীক্ষাটির সাহায্যে শ্বেতসার অন্যান্য কার্বোহাইড্রেটের মধ্য হইতে সহজে চিনিতে পারা যায়।

কার্বোহাইড্রেটের উৎস—আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট প্রাণী এবং উদ্ভিদ্-জগৎ হইতেই আসে। প্রাণীর যকৃৎ (liver), বৃক্ক (Kidney), পনীর (Cheese), মাছ ইত্যাদি হইতে যে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ অতি সামান্যই। কার্বোহাইড্রেটের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস উদ্ভিদ্-জগৎ। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেটের অধিকাংশই উদ্ভিদ্-জগৎ হইতে পাইয়া থাকি। তবে সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যেই কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সমান থাকে না।

কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ ক্রমশ কম অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যসমূহ পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

(১) ইক্ষু শর্করা (Sugar), মিছরি (Jaggery), গুড় (goor), মধু (Honey) ;

(২) সাগু (Sago), শিমলা-আলু (tapioca) ;

(৩) চাউল (Rice), রাগী (Ragi), ভুট্টা (Maize), যব (Barley), গম (Wheat), ওট (Oat), জোয়ার (Cholam) বাজরা (Cambu) ;

(৪) বিভিন্ন প্রকারের শুষ্ক ফল যথা,—খেজুর (Dates), কিসমিস (Raisins) ইত্যাদি ;

(৫) বিভিন্ন প্রকারের ডাল, যথা—ছোলা (Bengal gram), মুগ (green gram), মাস কলাই (Black gram), অড়হর (Red gram), মসুর (lentils) ইত্যাদি ;

(৬) সয়াবীন (soya-been), বাদাম (nuts) ইত্যাদি ;

(৭) আলু (Potato), রসুন (garlic), মিঠে আলু বা রাঙ্গা আলু (Yams), পেঁয়াজ (Onions) ইত্যাদি ;

(৮) টাটকা ফল, যথা—আঙ্গুর, কলা, আপেল, আম, আনারস ইত্যাদি।

(৯) সবুজ শাক-সবজি, যথা—লালশাক বা নটে শাক, বাঁধাকপি, কলমী শাক, লেটুস শাক, পালং শাক ইত্যাদি।

কার্বোহাইড্রেটের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা—কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য বিশেষত শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য সামগ্রী—মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া আমাদের দেশের অগণিত দরিদ্র অধিবাসী তাহাদের দেহের প্রয়োজনীয় তাপ-শক্তির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই এই জাতীয় খাদ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। ধনী বা অবস্থাপন্নদের মধ্যে এই জাতীয় খাদ্যের প্রচলন অপেক্ষাকৃত কম। আয় ও অবস্থা ভেদে আমরা সাধারণত দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তির শতকরা ৫০-৮০ ভাগ এই জাতীয় খাদ্য হইতে গ্রহণ করিয়া থাকি। সুষম খাদ্যে (Balanced diet) কার্বোহাইড্রেট মোট তাপ ও শক্তির শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ সরবরাহ করিবে। সুতরাং যে ব্যক্তির দৈনিক ৩০০০ ক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন হয় তাহাকে প্রায় ৪০০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট প্রত্যহ গ্রহণ করিতে হইবে।

খাদ্য হইতে গ্রহণ করিবার নীতি—কোন একটি নির্দিষ্ট খাদ্য হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ না করিয়া ঐ জাতীয় বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য হইতেই উহা গ্রহণ করা উচিত। চিনি (Sugar), মিছরি (Sugar candy) এবং গুড়ের (goor) প্রায় সমস্তটাই কার্বোহাইড্রেট। শুধু এই জাতীয় খাদ্যসামগ্রীর দ্বারা কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ করিলে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া ক্ষুধামান্দ্য ঘটাইতে পারে। আবার অপর দিকে, শাক-সবজি, যথা—পালং শাক, লেট্যুস শাক, কলমী শাক, বাঁধাকপি ইত্যাদির মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অতি সামান্য। সুতরাং প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট শুধু এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য হইতে সংগ্রহ করিতে হইলে উহা প্রচুর পরিমাণে খাইতে হইবে এবং পাকস্থলী উক্ত পরিমাণ শাক-সবজি পরিপাক করিতে পারিবে না। শুধু বিভিন্ন প্রকারের ডাল হইতেও আমরা কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ করিতে পারি না। কারণ, এই সকল ডালে আবার প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনও আছে। কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ করিতে যে পরিমাণ ডাল গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে দেহে প্রোটিনের আধিক্য দেখা দিতে পারে। সুতরাং প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট চিনি, মিছরি, শাক-সবজি, ডাল, ভাত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের মিশ্রণ হইতে গ্রহণ করাই সবচেয়ে ভাল। ইহাতে বিভিন্ন খাদ্যের লবণ এবং ভাইটামিনও আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য পাওয়া যাইবে।

খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের আধিক্যের ফল—খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট অন্ত্রে (Intestine) পড়িয়া থাকে এবং গ্যাস ও অ্যাসিড উৎপন্ন করে। ফলে পেটফাঁপা, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগের সৃষ্টি হয়। খাদ্যে অত্যধিক কার্বোহাইড্রেট থাকিলে খাদ্যের অন্যান্য উপাদানগুলি, যথা—প্রোটিন, ভাইটামিন ও লবণ শরীর প্রয়োজনমত গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে দেহের ওজন হ্রাস পায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং দেহ সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। দাঁতের ক্ষয় রোগও খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের আধিক্যের একটি ফল। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্যে দেহ মেদবহুল হইয়া পড়ে।

খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের অভাবের (deficiency) ফল—খাদ্যের উপাদানগুলির মধ্যে যেহেতু সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিয়া

থাকে। এই তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কার্বোহাইড্রেটের অভাবে স্নেহজাতীয় পদার্থের দহন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ফলে শরীরে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয়, ইহাকে 'কিটোন বডি' (Ketone bodies) বলে। এই কিটোন বডি দেহে কিটোসিস (Ketosis) রোগের সৃষ্টি করে।

কার্বোহাইড্রেটের কাজ (Functions)—(১) দেহে তাপ বা শক্তি সরবরাহ করাই এই জাতীয় খাদ্যের প্রথম এবং প্রধান কাজ, এইজন্যই উহাদের জ্বালানী খাদ্য বলে। (২) স্নেহজাতীয় পদার্থের দহনে সহায়তা করিয়া কার্বোহাইড্রেটসমূহ আমাদের কিটোসিস (Ketosis) নামক রোগ হইতে রক্ষা করে এবং (৩) খাদ্যের প্রোটিন, ভাইটামিন ও ধাতব লবণ গ্রহণে সহায়তা করে। (৪) কার্বোহাইড্রেটের অপর একটি কাজ হইতেছে, অল্প প্রোটিন মূল্যের খাদ্যে (low protein diet) প্রোটিনকে তাপ উৎপাদনের কাজ হইতে অব্যাহতি দেওয়া। প্রোটিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ দেহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করা। ইহা ছাড়া দেহে তাপ উৎপাদনও ইহার অপর একটি কাজ। কিন্তু খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কমাইয়া কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বাড়াইলে সমস্ত প্রোটিনটুকুই দেহের ক্ষয় পূরণে ব্যয় হইয়া যায় এবং ইহা তাপ উৎপাদনের কোন সাহায্য করে না। তখন খাদ্যের বাড়তি কার্বোহাইড্রেটই প্রোটিনের এই তাপ উৎপাদনের কাজটুকু করিয়া দেহের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। এইরূপ কার্বোহাইড্রেট অল্প প্রোটিন মূল্যের খাদ্যে **প্রোটিনকে তাপ উৎপাদনের কাজ হইতে অব্যাহতি দেয় বলিয়া কার্বোহাইড্রেটের এই ক্রিয়াকে Protein sparing action বলে**। (৫) কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতিতে এক প্রকার জীবাণু অন্ত্রে ভাইটামিন 'কে' এবং ভাইটামিন 'বি' উৎপন্ন করিয়া ঐ সকল ভাইটামিনের অভাব কিছুটা পূরণ করিয়া থাকে। (৬) খাদ্যের সেল্যুলোজ নামক কার্বোহাইড্রেট কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

স্নেহ পদার্থ (Fat)

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিতে পারে। প্রকৃতির সর্বত্রই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। তৈল, ঘৃত, মাখন, বনস্পতি প্রভৃতি এই শ্রেণীর খাদ্য।

স্নেহ পদার্থের রাসায়নিক সংগঠন—স্নেহ পদার্থ কার্বন (Carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen) এবং অক্সিজেন (Oxygen) দ্বারা গঠিত। স্নেহ পদার্থে অক্সিজেনের পরিমাণ কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় অনেক কম।

স্নেহ জাতীয় পদার্থ কাপড় কাচা সোডার (washing soda) জলীয় দ্রবণে কিছুক্ষণ ফুটাইলে **গ্লিসারিন** এবং **সাবান** উৎপন্ন হয়। স্নেহ পদার্থ হইতে এই প্রক্রিয়ায় সাবান প্রস্তুত করাকে Saponification বলে। ইহা যে কোন স্নেহ পদার্থ চিনিবার সর্বোৎকৃষ্ট রাসায়নিক পদ্ধতি।

আমরা সাধারণভাবে কেরোসিন তৈল, মেটে তৈল (white oil) ইত্যাদিকেও তৈল বলিয়া থাকি। কিন্তু এই জাতীয় তৈল হইতে Saponification পদ্ধতিতে সাবান ও গ্লিসারিন প্রস্তুত হয় না। এইজন্যই ইহাদের তৈল বা স্নেহ জাতীয় দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা হয় না।

স্নেহ পদার্থের শ্রেণী বিভাগ—স্নেহ জাতীয় খাদ্যদ্রব্যসমূহ সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(১) কঠিন স্নেহ (Fat),

(২) তরল স্নেহ বা তৈল (Oil)।

যে সকল স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক উষ্ণতায় এবং চাপে কঠিন আকৃতির হয় তাহাদিগকে কঠিন স্নেহ বা Fat বলে; যথা—বিভিন্ন জন্তুর চর্বি, মাখন, বনস্পতি ইত্যাদি। স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক উষ্ণতায় এবং চাপে তরল অবস্থায় থাকিলে উহাকে তৈল বা oil বলে। যথা—সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল ইত্যাদি।

প্রকৃত পক্ষে কঠিন এবং তরল স্নেহ পদার্থের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। কারণ, একই স্নেহ পদার্থ ঋতুভেদে কখনও তরল এবং কখনও কঠিন আকার ধারণ করিতে পারে। আমাদের দেশে শীতকালে নারিকেল তৈল জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। সুতরাং ঐ সময় উহাকে কঠিন স্নেহ বা Fat বলা যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে কিন্তু নারিকেল তৈল তরল অবস্থায়ই থাকে। সুতরাং তখন উহাকে তরল স্নেহ বা oil বলা হয়। অনুরূপভাবে ঘৃতকে কঠিন এবং তরল উভয় প্রকার স্নেহদ্রব্যের মধ্যেই গণ্য করা যাইতে পারে।

উৎপত্তি অনুসারেও স্নেহজাতীয় খাদ্যদ্রব্যসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) **উদ্ভিজ্জ স্নেহ** (Vegetable Fat),

(২) **প্রাণিজ স্নেহ** (Animal Fat)।

স্নেহ পদার্থ উদ্ভিদ্-জগৎ হইতে উৎপন্ন হইলে উহাকে উদ্ভিজ্জ স্নেহ বলে, যথা—সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, বনস্পতি ইত্যাদি।
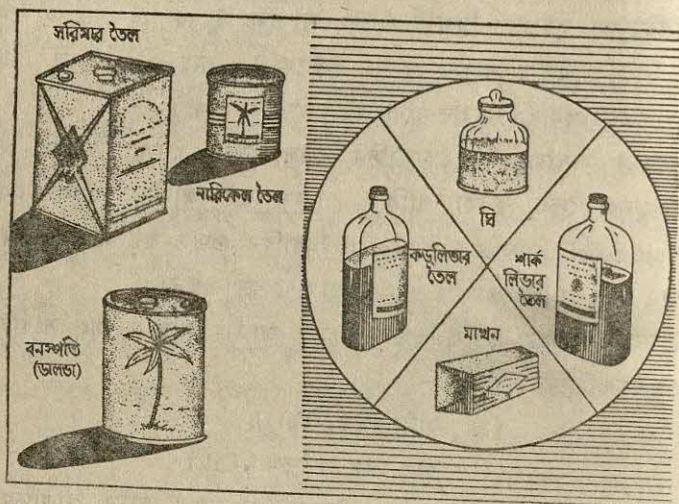
উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ প্রাণিজ স্নেহ পদার্থ

প্রাণি-জগৎ হইতে উৎপন্ন স্নেহ পদার্থকে প্রাণিজ স্নেহ বলা হয়, যথা—ঘি, মাখন, মাছের তৈল (Cod liver oil, etc.), জন্তুর চর্বি ইত্যাদি।

প্রাণিজ স্নেহে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ স্নেহে সাধারণত এই জাতীয় ভাইটামিন দেখা যায় না।

স্নেহ পদার্থের শ্রেণীবিভাগ :
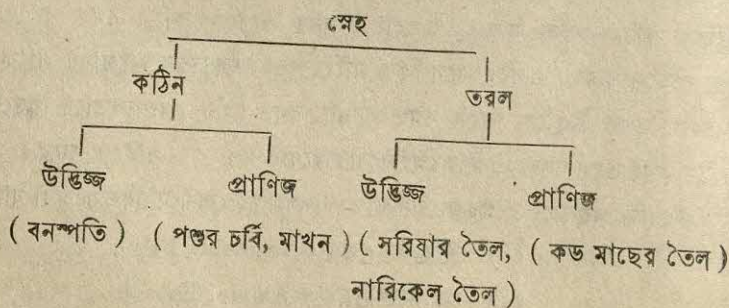
স্নেহ পদার্থের উৎস—স্নেহের পরিমাণ অনুযায়ী স্নেহজাতীয় খাদ্যদ্রব্য মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) প্রথম শ্রেণীর স্নেহজাতীয় খাদ্যে শতকরা প্রায় একশত ভাগই স্নেহ। ইহারা স্নেহপ্রধান খাদ্য এবং স্নেহের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস-কেন্দ্র। ঘৃত (ghee), মাখন (Butter), বিভিন্ন প্রকারের তৈল, যথা—বাদাম তৈল, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, কডমাছের তৈল (Cod liver oil), শার্ক মাছের তৈল (Shark liver oil), বনস্পতি (Margarine or vegetable ghee) ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে মাখন ব্যতীত প্রায় সমস্তই বিশুদ্ধ স্নেহ।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নেহজাতীয় খাদ্যে স্নেহের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৪০ হইতে ৬০ ভাগ। বিভিন্ন প্রকারের বাদাম (Nuts)—চীনা বাদাম (Ground nut); কাজু বাদাম (Cashew nut); পেস্তা বাদাম (Pistachio nut); আখরোট (Walnut); নারিকেল (Cocoanut) ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নেহ পদার্থের অন্তর্গত।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্যে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ খুবই সামান্য। দুধ, ডিম, মাংস, যকৃত, মাছ ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর স্নেহ পদার্থের উদাহরণ।

স্নেহ পদার্থের গুণাগুণ—স্নেহ পদার্থ জলে অদ্রবণীয়। কাপড় কাচা সোডার জলীয় দ্রবণে স্নেহ পদার্থ ফুটাইলে সাবান এবং গ্লিসারিন উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিকে Saponification বলে। কোন কোন স্নেহ আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। মাখন অনেকদিন আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে থাকিলে একটু অম্ল-স্বাদ-যুক্ত হইয়া পড়ে। স্নেহ পদার্থ ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' (Vitamin A and D) দ্রবীভূত করিতে পারে। খাদ্যের উক্ত ভাইটামিন স্নেহপদার্থে দ্রবীভূত হওয়ায় সহজেই শরীর উহা গ্রহণ করিতে পারে।

স্নেহ পদার্থের দৈনন্দিন প্রয়োজন—আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে কিছু কিছু স্নেহ পদার্থ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কতটুকু স্নেহ পদার্থ খাদ্যে থাকা অত্যাবশ্যক তাহা এখনও সঠিকরূপে জানা যায় নাই। তবে আমাদের দৈনিক প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তির শতকরা প্রায় ২০ হইতে ২৫ ভাগ স্নেহ পদার্থ হইতে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এই হিসাবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক কর্মক্ষম লোকের প্রত্যহ ৭০—৮০ গ্রাম স্নেহ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা কর্তব্য।

খাদ্য হইতে স্নেহ পদার্থ গ্রহণের নীতি—আমরা সাধারণত উদ্ভিজ্জ স্নেহ হইতেই আমাদের স্নেহের প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। রন্ধনকালে আমরা যে সরিষার তৈল, বাদাম তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাই প্রধানত আমাদের স্নেহ পদার্থের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। ইহা যেমন প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে, তেমনি উদ্ভিদ্-জাত বলিয়া ভাইটামিন "এ" এবং "ডি" বর্জিত। সুতরাং প্রত্যহ কিছু ঘি, মাখন ইত্যাদি প্রাণিজ স্নেহও ইহার সহিত গ্রহণ করা উচিত। প্রাণিজ স্নেহে ঐ সকল ভাইটামিন পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের অভাব কিয়ৎ পরিমাণ দূর হইবে। সুতরাং প্রয়োজনীয় স্নেহ উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ উভয় প্রকার খাদ্য হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা আজকাল যে বনস্পতি (vegetable ghee) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি তাহা পুষ্টির দিক হইতে ঘি, মাখন ইত্যাদি প্রাণিজ স্নেহের তুলনায় নিকৃষ্ট। উদ্ভিজ্জ তৈলে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করিয়া বনস্পতি প্রস্তুত করা হয়। এই উদ্ভিজ্জ তৈলে ভাইটামিন প্রায় নাই বলিলেই চলে। সামান্য পরিমাণ ভাইটামিন "এ" কোন কোন উদ্ভিজ্জ তৈলে দেখা যায়, তাহাও বনস্পতি প্রস্তুত করিবার সময় নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ছাড়া স্নেহ পদার্থ যে সকল Fatty acid দ্বারা গঠিত তাহাদেরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে কখনও কখনও ভাইটামিন "এ" মিশ্রিত করিয়া বনস্পতির খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধি করা হয়।

ঘি ও বনস্পতির তুলনা

ঘি	বনস্পতি
(১) প্রাণিজ স্নেহ।	(১) উদ্ভিজ্জ স্নেহ।
(২) ইহার মধ্যে ভাইটামিন "এ" এবং "ডি" আছে।	(২) ইহার মধ্যে ভাইটামিন প্রায় কিছুই নাই।
(৩) ঘি দেখিতে একটু হরিদ্রাভ।	(৩) বনস্পতি দেখিতে সাদা।
(৪) ইহার গলনাঙ্ক (Melting Point) অপেক্ষাকৃত কম, অনেক সময় তরল অবস্থায় পাওয়া যায়।	(৪) ইহার গলনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত বেশী, কখনও তরল অবস্থায় পাওয়া যায় না।
(৫) অধিক পুষ্টিকর।	(৫) অপেক্ষাকৃত কম পুষ্টিকর।

কখনও কখনও বনস্পতিতে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' মিশ্রিত করিয়া উহার খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধি করা হয়।

খাদ্যে স্নেহ পদার্থের অভাবের (deficiency) ফল—(১) খাদ্যে অনবরত স্নেহ পদার্থের অভাব হইলে শরীরের ত্বক্ শুষ্ক এবং খস্‌খসে ভাব ধারণ করিতে পারে। (২) ভাইটামিন 'এ', ডি', 'ই' এবং 'কে' স্নেহ পদার্থে দ্রবীভূত হইয়া দেহের মধ্যে প্রেরিত হয়। স্নেহ পদার্থের অভাব হইলে ঐ সকল ভাইটামিনের অভাবও দেহে পরিলক্ষিত হইতে পারে। (৩) আমাদের শরীর সুস্থ রাখিতে কতকগুলি অ্যাসিডের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ধরনের অ্যাসিডের মধ্যে লিনোলেয়িক (linoleic) এবং অ্যারাচিডোনিক (Arachidonic) অ্যাসিডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল অ্যাসিড দেহ নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না, স্নেহজাতীয় খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমেই উহা দেহে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। স্নেহ পদার্থের অভাব হইলে এই সকল অ্যাসিডেরও অভাব হয় এবং দেহে eczema-র ন্যায় চর্মরোগ দেখা দেয়।

খাদ্যে স্নেহপদার্থের আধিক্যের ফল—(১) অত্যধিক স্নেহজাতীয় খাদ্য অজীর্ণ এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগের সৃষ্টি করে। (২) অতিরিক্ত স্নেহ দেহে মেদের সৃষ্টি করিয়া শরীরকে অকর্মণ্য করিয়া তোলে। (৩) অত্যধিক প্রাণিজ স্নেহে হৃদ্-রোগের সৃষ্টি হইতে পারে এবং বহুমূত্র রোগীর মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

স্নেহজাতীয় পদার্থের কাজ (Functions)—(১) স্নেহজাতীয় খাদ্য দেহে তাপ ও শক্তি সৃষ্টি করিয়া দেহকে কর্মক্ষম রাখে। (২) ইহা ভাইটামিন 'এ', 'ডি', 'ই' এবং 'কে' দ্রবীভূত করিয়া দেহের গ্রহণোপযোগী করিয়া তোলে। (৩) স্নেহ পদার্থ প্রয়োজনীয় fatty acid সরবরাহ করিয়া আমাদের চর্মরোগের হাত হইতে রক্ষা করে। (৪) ইহা ছাড়া দেহের মসৃণতা এবং সৌন্দর্য স্নেহ পদার্থের উপর অনেকটা নির্ভর করে। (৫) স্নেহ পদার্থ তাপ কুপরিবাহী (Bad conductor of heat) বলিয়া দেহ হইতে তাপের অপচয় বন্ধ করিয়া শরীর গরম রাখে। শীতপ্রধান দেশে তাই অধিক পরিমাণে স্নেহ পদার্থ খাওয়া উচিত।

ধাতব লবণ (Mineral Salts)

শরীর গঠনে প্রোটিনের পরেই বিভিন্ন ধাতব লবণের স্থান। খাদ্যদ্রব্য পোড়াইলে ছাইয়ের মত অবশিষ্ট যে অংশটুকু পড়িয়া থাকে উহাই উক্ত খাদ্যে লবণের পরিমাণ। আমাদের দেহের প্রায় $\frac{1}{25}$ অংশ এই লবণ দ্বারা গঠিত

বিভিন্ন প্রকারের ধাতব লবণ—লবণসমূহ কতগুলি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের শরীরের বিভিন্ন লবণের মধ্যে প্রায় ২০টি মৌলিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

(১) ক্যালসিয়াম (Calcium), (২) পটাসিয়াম (Potassium), (৩) সোডিয়াম Sodium), (৪) লৌহ (Iron), (৫) ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium), (৬) ম্যাঙ্গানিজ (Manganese), (৭) জিঙ্ক (Zinc), (৮) তাম্র (Copper), (৯) লিথিয়াম (Lithium), (১০) বেরিয়াম (Barium), (১১) ফস্ফরাস (Phosphorus), (১২) গন্ধক (Sulphur), (১৩) ক্লোরিন (Chlorine), (১৪) আয়োডিন (Iodine), (১৫) সিলিকণ (Silicon), (১৬) ফ্লোরিন (Fluorine).

ইহাদের মধ্যে প্রথম দশটি ক্ষার (alkali) জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে দেহের ক্ষারীয় ভাব (alkalinity) বজায় থাকে। শেষোক্ত ছয়টি অম্ল (acid) উৎপাদক ; কারণ, ইহারা শরীরে অম্ল বা অ্যাসিড উৎপন্ন করিয়া থাকে। ক্ষারীয় পদার্থগুলির (alkaline elements) মধ্যে আবার ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ এবং ম্যাগনেসিয়াম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ, দেহে এইগুলির আধিক্য দেখা যায়। অবশিষ্ট পাঁচটি দেহে অল্প পরিমাণে থাকে। অ্যাসিড উৎপাদক পদার্থসমূহের মধ্যে ফস্ফরাস, গন্ধক এবং ক্লোরিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষার এবং অ্যাসিড উৎপন্নকারী পদার্থসমূহ উপযুক্ত অনুপাতে খাদ্যদ্রব্যে থাকিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। ক্ষার জাতীয় দ্রব্যের আধিক্যে শরীরে অত্যধিক ক্ষার এবং অ্যাসিড জাতীয় পদার্থের আধিক্যে শরীরে অত্যধিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। উভয় অবস্থাই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

বিভিন্ন প্রকার লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং লৌহঘটিত লবণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস দাঁত ও হাড়ের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারী এবং শিশুর খাদ্যে এই জাতীয় লবণের অভাব ঘটিলে হাড় অপুষ্ট ও দুর্বল হয়। লৌহঘটিত লবণের অভাবে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। খাদ্যের অন্যান্য উপাদানসমূহ যদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য হইতে উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে এই

জাতীয় লবণের চাহিদা ঐ খাদ্য হইতেই পূরণ হয়, উহার জন্য কোন বিশেষ খাদ্য খাইবার প্রয়োজন হয় না। ধাতব লবণের জন্য মিশ্রখাদ্য গ্রহণ করাই উচিত। কোন একটি খাদ্যে সকল প্রকার ধাতব লবণ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। দুধ আদর্শ খাদ্য হইলেও উহাদ্বারা আমাদের লৌহঘটিত লবণের অভাব পূরণ হয় না। আমাদের শরীর হইতে দৈনিক প্রায় ২০-৩০ গ্রাম লবণ বিভিন্নভাগে বাহির হইয়া যায় সুতরাং প্রতিদিন খাদ্যের সহিত অন্তত ঐ পরিমাণ লবণ গ্রহণ করা কর্তব্য।

খাদ্যে ধাতব লবণের কাজ (Functions)—(১) হাড় এবং দাঁতের পুষ্টিতে সহায়তা করা ক্যালসিয়াম এবং ফস্‌ফরাসঘটিত ধাতব লবণের অন্যতম প্রধান কাজ। ম্যাগনেসিয়ামও এই কাজে সামান্য সাহায্য করিয়া থাকে। (২) লৌহ এবং ফস্‌ফরাসঘটিত খাদ্য দেহের বিভিন্ন কোষ (Cell) নির্মাণে সহায়তা করে। (৩) ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণ রক্ত এবং শরীরের অন্যান্য তরল পদার্থের মধ্যে চাপের সমতা বজায় রাখিয়া আমাদের সুস্থ রাখে। (৪) সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি ক্ষারধর্মী লবণসমূহ দেহ হইতে দূষিত পদার্থ অপসারণে সহায়তা করে। (৫) রক্তের হিমোগ্লোবিন লৌহ এবং তাম্রের সাহায্যেই উৎপন্ন হয়। (৬) ইহা ছাড়া আয়োডিন থায়রক্সিন (Thyroxine) হরমোণ প্রস্তুতিতে, জিঙ্ক জারকরস (Enzymes) সৃষ্টিতে এবং কোবাল্ট ভাইটামিন 'বি$_{১২}$' উৎপাদনে সহায়তা করে।

ক্যালসিয়াম (Calcium)

ক্যালসিয়ামঘটিত খাদ্যের কাজ (Functions)—শরীরের প্রয়োজনীয় লবণসমূহের মধ্যে ক্যালসিয়াম অন্যতম। (১) ইহা দন্ত ও অস্থি-র পুষ্টিতে সহায়তা করে এবং (২) দেহের কোন অঙ্গ কাটিয়া গেলে রক্ত পড়া বন্ধ করিয়া অধিক রক্তক্ষয়ের হাত হইতে দেহকে রক্ষা করে। (৩) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অব্যাহত রাখাও ইহার একটি কাজ। (৪) ক্যালসিয়াম খাদ্যের স্নেহ পদার্থ এবং লৌহঘটিত লবণ শরীরের গ্রহণে সহায়তা করিয়া দেহের পুষ্টি বিধান করিয়া থাকে।

ক্যালসিয়ামঘটিত খাদ্য—নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে **প্রচুর পরিমাণে** ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়।

দুধ, দই, গুঁড়া দুধ (Milk powder), পনীর (Cheese), ডিমের কুসুম, বাদাম (Nuts), বিভিন্ন প্রকারের ডাল (Pulses), বিভিন্ন প্রকারের ফল এবং সবুজ শাক-সবজি।

ইহাদের মধ্যে দুধই ক্যালসিয়ামের শ্রেষ্ঠ উৎস। এক পাইণ্ট (Pint) দুধে একটি শিশুর দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ হয়। নারী এবং শিশুর ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন অন্যান্যদের তুলনায় বেশী। পালং শাকের ক্যালসিয়াম শরীরের গ্রহণের অনুপযোগী। পালং শাকে অক্জালিক অ্যাসিড (oxalic acid) আছে। ঐ অক্জালিক অ্যাসিডের জন্য উহার ক্যালসিয়াম শরীরের কোন কাজে আসে না।

ক্যালসিয়ামঘটিত খাদ্য

নিম্নলিখিত খাদ্যে ক্যালসিয়ামের **পরিমাণ অতি অল্প :—**

চাউল, গম, জোয়ার, বাজরা, রাগী, ভুট্টা, আলু, রাঙ্গা-আলু বা মিষ্টি আলু, মূলা, গাজর, বীট, সাগু, মাংস ইত্যাদি।

খাদ্যে ক্যালসিয়ামের দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ এবং ইহার অভাবের ফল—একজন সুস্থ, স্বাভাবিক কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষের দৈনিক প্রায় ০·৮ গ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়। বাড়ন্ত শিশুদের দৈনিক প্রায় ১ গ্রাম এবং গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী নারীর দৈনিক প্রায় ১·৫-২·০ গ্রাম ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন।

(১) প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থি-র পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং দাঁত ক্ষয় হইয়া পান্‌সে হইয়া যায়। (২) এই ধাতব লবণের অভাব হইলে শরীরের কাটা স্থান হইতে সহজে রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। (৩) শারীরিক দৌর্বল্যও এই প্রকার লবণের অভাব সূচিত করে।

ফস্‌ফরাস (Phosphorus)

ফস্‌ফরাসঘটিত খাদ্যদ্রব্যের কাজ (Functions)—(১) ফস্‌ফরাস অস্থি ও দন্তে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটরূপে বর্তমান। সুতরাং অস্থি ও দন্তের পুষ্টির জন্য ইহার প্রয়োজন ক্যালসিয়ামের ন্যায় অপরিহার্য। (২) কার্বোহাইড্রেট আমাদের শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। এই তাপ সরবরাহে ফস্‌ফরাস পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। (৩) জীবকোষ সৃষ্টি এবং দেহের বৃদ্ধির জন্যও ইহার প্রয়োজন হয়।

ফস্‌ফরাসঘটিত খাদ্যদ্রব্য—নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে ফস্‌ফরাসঘটিত লবণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দুধ, দৈ, ডিম, সয়াবীন, বিভিন্ন প্রকারের ডাল
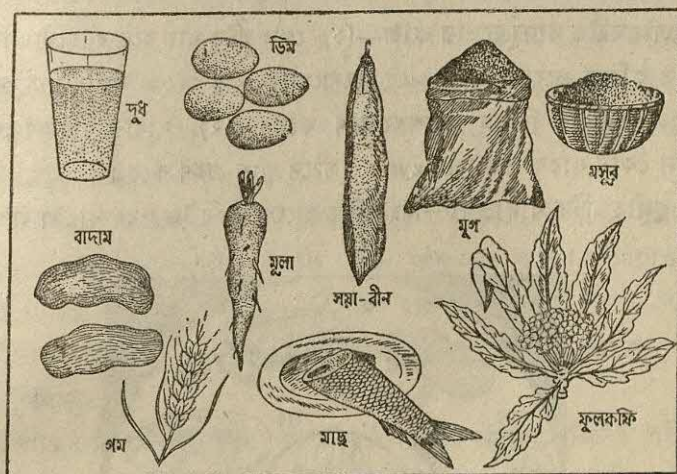
ফস্‌ফরাসঘটিত খাদ্য

(Pulses), বাদাম, (Nuts), গম, জৈ (Oat), যব, বাজরা, রাগী, জোয়ার, পালং শাক, মূলা (Radish), গাজর, ফুলকপি, মাছ, মাংস, শশা (Cucumber) ইত্যাদি।

কলে-ছাঁটা চাউল, ময়দা (White flour), আলু ইত্যাদিতে ফস্‌ফরাসের পরিমাণ খুব অল্প।

খাদ্যে ফস্‌ফরাসের দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ—মোটামুটি হিসাবে ক্যালসিয়ামের সম-পরিমাণ ফস্‌ফরাস দৈনিক গ্রহণ করা উচিত। কাহারও কাহারও মতে খাদ্যে ক্যালসিয়াম এবং ফস্‌ফরাস ১ : ১'৫ বা ১ : ২ অনুপাতে

থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে ফস্‌ফরাসের প্রাচুর্যের জন্য সাধারণত শরীরে ইহার অভাব লক্ষিত হয় না। ফস্‌ফরাস এবং ক্যালসিয়াম ঘটিত খাদ্যদ্রব্য একত্রে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে ফস্‌ফরাস অস্থি ও দন্তের পুষ্টিসাধন করিতে পারে না। দুধ, ডিম ইত্যাদি প্রাণিজ খাদ্যের ফস্‌ফরাস উদ্ভিজ্জ খাদ্যের ফস্‌ফরাস অপেক্ষা শরীরের গ্রহণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। বিভিন্ন বয়সের নারীপুরুষের দৈনিক ফস্‌ফরাসের পরিমাণ 368 পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

লৌহ (Iron)

লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্যের কাজ—(১) লৌহঘটিত খাদ্য রক্তের হিমোগ্লোবিন প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। এই হিমোগ্লোবিন বায়ু হইতে অকসিজেন গ্রহণ করিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে। (২) সামান্য পরিমাণ লৌহ কোন কোন জারক দ্রব্য (Enzyme) গঠনে অংশ গ্রহণ করে।

লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্য—নিম্নলিখিত খাদ্যে লৌহঘটিত লবণ পাওয়া যায় :—
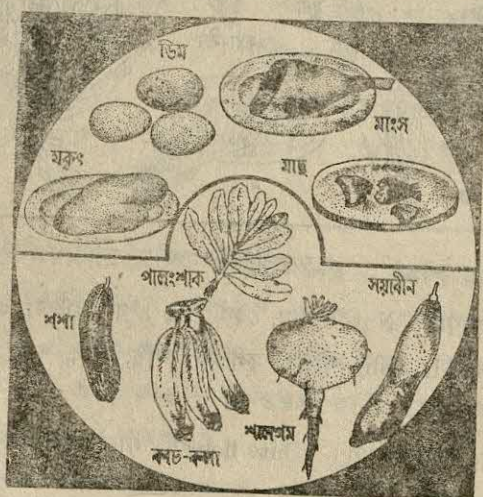
লৌহঘটিত খাদ্য

যকৃত (liver), মাংস, ডিম, মাছ, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, ঢেঁকি-ছাটা চাউল, আটা, বাজরা, জোয়ার, রাগী, পালং শাক (Spinach), লেট্যুস্‌, পেঁয়াজ, মূলা

(Radish), তরমুজ (Water-melon), শশা, শালগম, টমেটো, সয়াবীন, পান, লাল শাক বা নটে শাক (Amarnath tender), তালমিশ্রি (Jaggery), পুদিনা পাতা (Mint), করলা (Bitter gourd) ইত্যাদি। কলে-ছাঁটা চাউল এবং ময়দায় সামান্য পরিমাণ লৌহঘটিত লবণ পাওয়া যায়।

লৌহঘটিত খাদ্যের দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ এবং খাদ্যে ইহার অভাবের ফল—একজন সুস্থ, স্বাভাবিক কর্মক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দৈনিক খাদ্যে লৌহের পরিমাণ প্রায় ১২ মিলিগ্রাম হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত নারী এবং বর্ধিষ্ণু বালকবালিকার দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ পুরুষ অপেক্ষা বেশী। নারীর এই অতিরিক্ত লৌহঘটিত খাদ্যের প্রয়োজন হয় সাধারণত দুইটি কারণে। (১) মাসিক রক্তস্রাবের (Menstruation) ফলে নারীর দেহ হইতে প্রচুর রক্ত বাহির হইয়া যায়। সুতরাং এই রক্ত পূরণ করিতে অতিরিক্ত লৌহঘটিত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। (২) গর্ভবতী নারী তাহার সন্তানকে যে লৌহঘটিত খাদ্য অনবরত সরবরাহ করে, তাহার এই ঘাটতি পূরণ করিতে অতিরিক্ত লৌহঘটিত খাদ্যের দরকার হয়।

একজন স্তন্যদানকারী নারীর দৈনিক প্রায় ১৫ মিলিগ্রাম লৌহের প্রয়োজন হয়। বর্ধিষ্ণু বালক-বালিকার দেহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এই অতিরিক্ত রক্ত প্রস্তুতির জন্য বালক-বালিকার খাদ্যে লৌহের পরিমাণ বেশী হওয়া প্রয়োজন। তাহাদের দৈনিক লৌহের প্রয়োজন প্রায় ১৫ মিলিগ্রাম।

খাদ্যে লৌহঘটিত লবণের অভাব হইলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমিয়া যায়। ফলে বায়ু হইতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌছায় না। ইহাতে শরীর দুর্বল ও শ্রান্ত মনে হয় এবং পরিশেষে রক্তাল্পতা (anemia) দেখা দেয়।

প্রধান প্রধান ধাতব লবণ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

ধাতব লবণ	দেহে ঐ লবণের কাজ	অভাবের ফল	যে সকল খাদ্যে পাওয়া যায়	দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ
ক্যালসিয়াম	১। দেহের অস্থি ও দন্ত পুষ্টির কাজে, ২। রক্ত জমাট বাঁধিতে, ৩। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও মাংস পেশীর কুঞ্চনে, ৪। লৌহ ধাতব লবণ কাজে লাগাইতে, ৫। জীবনীশক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ুর জন্য, ৬। কোন কোন Enzyme-এর সক্রিয়তার জন্য।	১। অস্থি ও দন্তের অপুষ্টি, ২। রিকেট রোগ, ৩। জীবনীশক্তি হ্রাস, ৪। অকাল বার্ধক্য।	দুধ, পনীর, সবুজ শাক-সবজি।	বালক-বালিকা ১-১'৪ গ্রাম প্রাপ্তবয়স্ক ০'৮ ,, গর্ভবতী নারী ১'৫ ,, স্তন্যদানকারী নারী ২'০ ,,
লৌহ	১। হিমোগ্লোবিনের অংশ, সুতরাং পরোক্ষভাবে অক্সিজেন পরিচালনায় সহায়তা করে, ২। অস্থি গঠনে সাহায্য করে।	(১) রক্তাল্পতা রোগ (anemia), (২) জীবনীশক্তি হ্রাস।	যকৃৎ, মাংস, ডিম, সবুজ শাক-সবজি, ফল-মূল, শস্যকণা, ডাল ইত্যাদি।	বালক-বালিকা ৬-১৫ মিঃ গ্রাম প্রাপ্তবয়স্ক ১২ ,, ,, গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী নারী ১৫ ,, ,,
ফস্ফরাস	১। অস্থি ও দন্তের পুষ্টির জন্য, ২। জীবকোষ সৃষ্টিতে, ৩। কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ পদার্থের মেটাবলিজম-এ সহায়তার জন্য।	(১) অস্থি ও দন্তের অপুষ্টি, (২) রিকেট রোগ, (৩) খর্বাকৃতি।	দুধ, পনীর, ডিমের কুসুম, মাংস, ডাল, বাদাম, শস্যকণা, শাক-সবজি ইত্যাদি।	বালক-বালিকা ১'০ গ্রাম প্রাপ্তবয়স্ক ১'২ ,, গর্ভবতী নারী ১'৪ ,,

প্রধান প্রধান ধাতব লবণ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

ধাতব লবণ	দেহে ঐ লবণের কাজ	অভাবের ফল	যে সকল খাদ্যে পাওয়া যায়	দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ
আয়োডিন	থায়রক্সিন (Thyroxine) হরমোণ প্রস্তুতিতে সাহায্য করে।	(১) গলগণ্ড রোগ (goiter), (২) দেহের মেটাবলিজম হ্রাস, (৩) খর্বাকৃতি।	সোডিয়াম আয়োডাইড, সামুদ্রিক খাদ্য।	প্রাপ্তবয়স্ক ০.১৫-০.৩০ মিঃ গ্রাম
তাম্র	হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করিতে লৌহকে সাহায্য করে।	রক্তাল্পতা রোগ (anemia)	যকৃৎ, মাংস, বাদাম, ডাল, শাক-সবজি, ফল, শস্য ইত্যাদি।	বালক-বালিকার প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য ০.০৫ মি.গ্রা.। প্রাপ্তবয়স্ক ১—২ মি. গ্রাম

ভাইটামিন (Vitamin)

উনবিংশ শতাব্দীতেই ভাইটামিনের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়। খাদ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ ও ধাতব লবণের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৮৮১ খ্রীঃ লুনিন যখন খাদ্যে ঐ সকল উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিয়াও একটি ইঁদুরকে বেশীদিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না, সেইদিন হইতে বৈজ্ঞানিকদের ভাবজগতে পরিবর্তন দেখা দিল। এই সময় জাপানী নৌ-সেনাদের মধ্যে বেরিবেরির প্রাদুর্ভাব হয়। বেরিবেরি কথাটির অর্থ হইল 'অতি দুর্বল'। এই রোগে ক্রমশ হাত পা দুর্বল হইয়া অবশেষে নাবিকগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। জাপানী নৌবহরের প্রধান ডাক্তার টাকাকী লক্ষ্য করিলেন যে ইংরেজ এবং আমেরিকান নাবিকেরা এই রোগে আক্রান্ত হয় না এবং তাহাদের খাদ্যতালিকা জাপানী নাবিকদের খাদ্যতালিকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাপানী নাবিকদের খাদ্যের একটি প্রধান অংশ ছিল কলেছাঁটা চাউল এবং ইহাই যে বেরিবেরি রোগের মূল কারণ এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইল। সুতরাং তিনি নাবিকদের খাদ্যে কলেছাঁটা চাউলের পরিমাণ কমাইয়া মাংস, তরিতরকারি ও শাক-সবজির পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। খাদ্যতালিকার এই পরিবর্তনের ফলে নাবিকদের মধ্যে বেরিবেরি রোগ ক্রমশ কমিয়া গেল। টাকাকী এই রোগ দূরীভূত করিতে পারিলেও উহার কারণ কিন্তু তিনি সঠিকরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

এই সময় ১৮৯৭ খৃঃ ওলন্দাজ চিকিৎসক আইখম্যান যবদ্বীপে একটি জেলের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। জেলের কয়েদীদের কলেছাঁটা চাউল খাইতে দেওয়ায় তাহারাও জাপানীদের মত বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যাইত। জেলের মুর্গীগুলিও এই চাউল খাইয়া 'পলিনিউরাইটিস' নামে এক অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

এই রোগের ফলে মুর্গীগুলির ঘাড় বাঁকিয়া যাইত এবং তাহারা খোঁড়াইয়া হাঁটিত ; অবশেষে দুর্বল হইয়া একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইত। অবস্থা দেখিয়া আইখম্যান বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ তিনি একদিন লক্ষ্য করিলেন যে অসুস্থ মুর্গীগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ সোজাভাবে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে কয়েকদিন যাবৎ মুর্গী-গুলিকে কলেছাঁটা চাউলের পরিবর্তে সস্তাদামের ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের ভাত

দেওয়া হইতেছে। তিনি উভয় প্রকার চাউলই খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করিলেন, কলে-ছাঁটা চাউল বেশ সাদা ধবধবে, কিন্তু ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের গায়ে লালচে মত কুঁড়ার একটি পাতলা আবরণ থাকে এবং কলে-ছাঁটা চাউলের মত উহা তত পরিষ্কার নয়। তিনি এই লালচে মত কুঁড়ার পাতলা আবরণটি পৃথক্ করিয়া লইলেন এবং জলে গুলিয়া রোগগ্রস্ত কয়েকটি মুর্গীকে খাওয়াইয়া দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই রোগগ্রস্ত মুর্গীগুলি এই জল খাইয়া সুস্থ হইয়া উঠিল। এদিকে কয়েদীদেরও ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল খাইতে দেওয়ায় তাহারা আরোগ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং আইখম্যান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ঢেঁকিছাঁটা চাউলের মধ্যে একটি অত্যাবশ্যক বস্তু আছে যাহা মানুষের বেরিবেরি এবং পাখীদের 'পলিনিউরাইটিস' রোগ প্রতিরোধ বা উপশম করিতে সহায়তা করে।

এদিকে বিজ্ঞানী হপ্‌কিন্সও ১৯০৬ সালে বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা করিয়া প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে শুধু প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ এবং ধাতব-লবণ-যুক্ত খাদ্যে প্রাণীসকল শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু খাদ্য তালিকায় নিয়মিত একটু দুধের ব্যবস্থা করিলে রোগের উপসর্গ দূরীভূত হয়। সুতরাং দুধের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা এই রোগ প্রতিরোধ করিয়া দেহ সুস্থ রাখিতে সহায়তা করে।

অবশেষে ১৯১২ খৃঃ বিজ্ঞানী ফুঙ্ক ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল হইতে এমন একটি জিনিস পৃথক্ করিতে সমর্থ হইলেন যাহা মানুষের বেরিবেরি এবং পাখীদের 'পলিনিউরাইটিস' রোগের প্রতিষেধক। তিনি এই নূতন পদার্থটির নাম দিলেন **ভাইটামিন (Vitamine)**। ফুঙ্ক মনে করিতেন যে এই নূতন গবেষণালব্ধ পদার্থটি প্রোটিনের অন্তর্গত অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুরূপ। এইজন্য 'ভাইটা' (Vita যাহার অর্থ জীবন) কথাটির শেষে অ্যামিনো অ্যাসিডের 'অ্যামিন' (amine) কথাটি যুক্ত করিয়া ভাইটামিন (Vitamine) শব্দটির সৃষ্টি করেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে সমস্ত ভাইটামিনই অ্যামিন নয়, সুতরাং এখন ইংরেজী Vitamine শব্দটির শেষের e বর্জন করিয়া উহা Vitamin আকারে লেখা হয়।

এই ভাবে বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, খাদ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ এবং লবণসমূহ ব্যতীত আরও এমন একটি সূক্ষ্ম উপাদানের প্রয়োজন যাহার অভাবে শরীর সহজেই বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেটস্, পেলেগ্রা প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হয় অথবা

বিভিন্ন সংক্রামক রোগপ্রবণ হয়। **ভাইটামিন** বা **খাদ্যপ্রাণ** বলিতে আমরা খাদ্যের এই সূক্ষ্ম উপাদানটিকেই বুঝি।

অন্যান্য উপাদানের তুলনায় খাদ্যে ইহার প্রয়োজন অতি সামান্য। ভাইটামিনের সাহায্যেই দেহসংগঠক প্রোটিন এবং বিভিন্ন ধাতব লবণ দেহ গঠন সম্পূর্ণ করিয়া থাকে। ভাইটামিনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেহ গঠনে অংশ গ্রহণ না করিলেও ইহাদের অভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন বা দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সুসম্পন্ন হইতে পারে না। জীবদেহের এই সকল বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপ ইহাদের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া ভাইটামিনসমূহকে **জৈবিক অনুঘটক** (Biological catalyst) বলে। ইট, চুন, বালি ইত্যাদি গৃহ নির্মাণের প্রধান উপাদান হইলেও এই সকল উপাদানসমূহ একত্রিত করিয়া গৃহের আকৃতিদান করিতে রাজমিস্ত্রি এবং সূত্রধরের প্রয়োজন হয়। দেহ নির্মাণে ভাইটামিনসমূহ এই রাজমিস্ত্রি এবং সূত্রধরের কাজ করিয়া থাকে।

গৃহনির্মাণে যেমন কাজের প্রকারভেদে কেহ রাজমিস্ত্রি, কেহ বা সূত্রধর, তেমনি দেহের মধ্যেও ভাইটামিনসমূহের কাজের তারতম্য অনুসারে ইহাদের বিভিন্ন নামকরণ করা হইয়াছে। যে ভাইটামিন প্রধানত চক্ষু, ফুস্‌ফুস, পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহাকে **ভাইটামিন "এ"** (Vitamin A) নামে অভিহিত করা হয়। মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র এবং বিভিন্ন মাংসপেশীর উপর ক্রিয়াশীল ভাইটামিনকে **ভাইটামিন "বি"** (Vitamin B); রক্তের উপর ক্রিয়াশীল ভাইটামিনকে **ভাইটামিন "সি"** (Vitamin C) এবং দাঁত ও হাড়ের উপর ক্রিয়াশীল ভাইটামিনকে **ভাইটামিন "ডি"** (Vitamin D) নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া **ভাইটামিন "ই"** (Vitamin E) এবং **ভাইটামিন "কে"** (Vitamin K)-এর অস্তিত্বও প্রমাণিত হইয়াছে।

এই সকল ভাইটামিনের মধ্যে কতগুলি আবার একাধিক ভাইটামিনের মিশ্রণে সংগঠিত। ইহাদের মধ্যে ভাইটামিন "বি"-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিনের মধ্যে "এ", "ডি" "ই" এবং "কে" স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় এবং জলে অদ্রাব্য; ভাইটামিন "বি" এবং "সি" জলে দ্রবণীয়।

ভাইটামিন "এ" (Vitamin A)

প্রয়োজনীয়তা—ভাইটামিন "এ" (১) ত্বক্ ও শ্লেষ্মাঝিল্লিকে সুস্থ রাখিয়া দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত হইতে রক্ষা করে, (২) খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও ক্ষুধার উদ্রেক করিতে সহায়তা করে এবং (৩) রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিয়া শরীর সুস্থ রাখে। (৪) এতদ্ব্যতীত দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধিতেও ভাইটামিন "এ" সহায়তা করিয়া থাকে। বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের পরিমাণ 346 পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

অভাবজনিত রোগ—(১) খাদ্যে ভাইটামিন "এ"-র অভাব হইলে চক্ষু রোগ দেখা দেয়। এই রোগে চোখের বাহিরের অংশ স্ফীত হইয়া প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং কিছুদিন পর রাত্র্যান্ধতা রোগ দেখা দেয়। (২) ইহার অভাবে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং (৩) সর্দি, কাশি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। (৪) কখনও কখনও ক্ষুধামান্দ্য, পাকস্থলী এবং অন্ত্রের রোগও ভাইটামিন "এ"-র অভাবে হইয়া থাকে।

উৎস—এই জাতীয় ভাইটামিন বিভিন্ন সবুজ শাক-সবজিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী এই ভাইটামিন উদ্ভিদ্-জগৎ হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহারা নিজেরা ইহা প্রস্তুত করিতে পারে না। সবুজ ও টাট্‌কা ঘাস না খাওয়াইলে গরুর দুধে ভাইটামিন "এ"-র অভাব হয়। উদ্ভিদের হলুদ অংশে

(যেমন, গাজর) "ক্যারোটিন" (Carotine) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। ইহা হইতে শরীরে ভাইটামিন "এ" উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকার মাছ, মাছের তৈল, যকৃৎ এবং ডিমের মধ্যেও ইহা পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে এই ভাইটামিন বিভিন্ন পরিমাণে পাওয়া যায়।

যে সকল খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—কড মাছের তৈল (Cod liver oil), শার্ক মাছের তৈল (Shark liver oil), বিভিন্ন প্রকার তৈলজাতীয় মাছ (যথা, ইলিশ মাছ), ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি যকৃৎ, বৃক্ক (Kidney), বিভিন্ন জন্তুর চর্বি, দুধ, বিভিন্ন প্রকারের সবুজ শাক-সবজি, যথা—পালং শাক, লেট্যুস শাক, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

যে সকল খাদ্যদ্রব্যে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে পাওয়া যায়—গাজর, মিষ্টি আলু বা রাঙ্গা আলু, টমেটো, অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদি।

যে সকল খাদ্যে অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়—মাখন তোলা দুধ (Skimmed milk), ডাল (Pulses), গম, জোয়ার, বাজরা, মটর, সয়াবীন, যব, জই, লঙ্কা, তাল-শাঁস, নারিকেল তৈল, কমলালেবুর রস, কলা, পেঁয়াজ, চাউল, আলু, মূলা, বাদাম (Nuts) ইত্যাদি।

যে সকল খাদ্যদ্রব্যে ইহা পাওয়া যায় না—ময়দা, কলে-ছাঁটা চাউল, সিদ্ধ চাউল (Parboiled rice), সরিষার তৈল, ডালডা বা বনস্পতি ইত্যাদি।

ভাইটামিন "বি" (Vitamin B)

ভাইটামিন-"বি" প্রায় ১৫টি বিভিন্ন ভাইটামিনের সমন্বয়ে গঠিত। এইজন্য ইহাকে **ভাইটামিন বি কমপ্লেক্স** (Vitamin-B-Complex) বলা হয়। ইহাদের মধ্যে **থায়ামিন বা ভাইটামিন "বি১"** (Thiamine, Vitamin B_1 or aneurine), **রাইবোফ্লাবিন বা ভাইটামিন "বি২"** (Riboflavin, Vitamin G or Vitamin B_2) এবং নায়াসিন (Niacin) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভাইটামিন "বি"-এর প্রয়োজনীয়তা—খাদ্যে এই শ্রেণীর ভাইটামিন (১) পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, (২) স্নায়ুতন্ত্রকে সবল ও সতেজ রাখে এবং বেরিবেরি নামক কঠিন রোগ নিবারণ করে, (৩) ইহা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক পরিবর্তনে সহায়তা করিয়া শরীর সুস্থ রাখে এব্য (৪) স্তন্যদানকারী নারীর স্তনে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি

করে। বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষের দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ 386 পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

খাদ্যে ভাইটামিন "বি"-এর অভাবের ফল :—(১) খাদ্যে ভাইটামিন "বি"-এর অভাব হইলে 'বেরিবেরি' নামক শোথ রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া ফুলিয়া যায়। (২) ক্ষুধামান্দ্য, অবসাদ এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্যও এই ভাইটামিনের অভাব সূচিত করে। (৩) ইহার অভাবে জিহ্বার প্রদাহ এবং মুখের কোণায় ঘায়ের সৃষ্টি হয় এবং (৪) যকৃৎ, প্লীহা এবং পাকস্থলী আকার ও আয়তনে বৃদ্ধি পায়।

উৎস—নিম্নলিখিত খাদ্যে "বি" ভাইটামিন **প্রচুর পরিমাণে** পাওয়া যায়। ঈষ্ট (yeast), ডিম, যকৃৎ, টমেটো, আখরোট, লেট্যুস, শালগম, মূলা ইত্যাদি।

অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে ইহা আটা, যব, ভুট্টা জোয়ার, রাগী, জই, মটর, সয়াবীন, সিম, ডাল, ছোলা, বিভিন্ন প্রকারের বাদাম, বাঁধাকপি, গাজর, পেঁয়াজ, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, মস্তিষ্ক, দুধ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে **অতি সামান্য** পরিমাণে "বি" ভাইটামিন পাওয়া যায়—

পাঁউরুটি, ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল, সিদ্ধ চাউল, কলা, বীট (beet-root), বেগুন, আলু, মূলা, মিষ্টি আলু বা রাঙা আলু, আঙ্গুর ফল, খেজুর কাগজি-লেবু (lemon), কমলালেবু, পেঁপে, ন্যাসপাতি, মাংস ইত্যাদি।

ময়দা, কলে-ছাঁটা চাউল, মাখন, সকল প্রকার চর্বি এবং তৈল ইত্যাদিতে **"বি" ভাইটামিন পাওয়া যায় না।**

ভাইটামিন 'বি$_১$' বা থায়ামিন

(Vitamin B_1 or Thiamin)

প্রয়োজনীয়তা—ভাইটামিন 'বি$_১$' আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এক প্রকার এন্‌জাইম-এর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে সহায়তা করে। ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে চলাচল করিতে সাহায্য করে।

অভাবের ফল—এই ভাইটামিনের অভাবে দেহ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়। সেইজন্য ইহাকে বেরিবেরি প্রতিরোধক ভাইটামিনও বলে। বেরিবেরি

রোগের লক্ষণগুলি খুব জটিল এবং কোন কোন ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাই এই রোগের উপসর্গ হিসাবে দেখা দেয়। ক্রমশ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। অনেকের আবার পা ফোলাই এই রোগের লক্ষণ হিসাবে দেখা যায়। এই ফোলা পায়ে আঙ্গুলের চাপ দিলে গর্ত হইয়া যায় এবং ইহা সহজে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে না। তবে শুধু ভাইটামিন 'বি$_1$' এর অভাবেই যে এই রোগ হয় তাহা নহে। আরও কয়েকটি ভাইটামিনের মিলিত
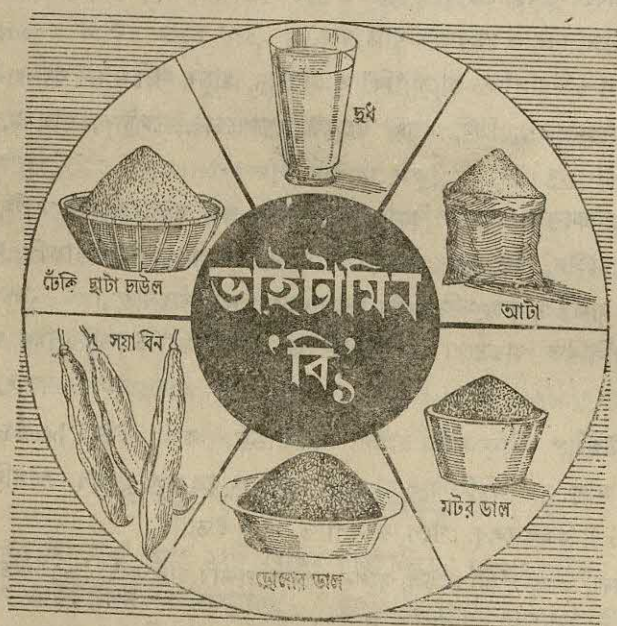
অভাবেই এই রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ভাইটামিনের অভাবে স্নায়ুতন্ত্র পীড়িত হইয়া প্রথমে দেহের পঙ্গুতা এবং অবশেষে মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। এই ভাইটামিনের অভাব প্রাথমিক অবস্থায় আহারে অনিচ্ছা, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ, স্নায়ুতন্ত্রের প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যায়। গর্ভাবস্থায় যাহারা বমনের জন্য কষ্ট পায় তাহারা এই ভাইটামিন ব্যবহারে সুফল পাইতে পারে।

উৎস—দুধ, আটা, ছোলার ডাল, সয়াবীন, মটর ডাল এবং ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলে এই ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কফি, আলু, গাজর, পেঁয়াজ, টমেটো, বাদাম প্রভৃতিতেও ভাইটামিন 'বি$_1$' পাওয়া যায়।

ভাইটামিন 'বি₂' বা রাইবোফ্লাবিন

(Vitamin B_2 or Riboflavin)

প্রয়োজনীয়তা—প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম্-এ যে সকল এন্‌জাইম সহায়তা করে তাহাদের সক্রিয় রাখিয়া রাইবোফ্লাবিন পরোক্ষভাবে প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম্-এ সাহায্য করে। ইহার সাহায্যে যৌবনকাল বহুদিন পর্যন্ত অটুট রাখিয়া দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। ত্বকের সজীবতা, সুষ্ঠু পরিপাক ক্রিয়া এবং স্বভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্যও এইপ্রকার ভাইটামিনের প্রয়োজন হয়।

অভাবের ফল—খাদ্যে ভাইটামিন 'বি₂'-এর অভাব হইলে জিহ্বার স্ফীতি এবং মেজেন্টা রং দেখা দেয়। ঠোঁট লালবর্ণ, মুখের কোনায় ঘা, চামড়া কুচকাইয়া আঁশ আঁশ হইয়া যাওয়া ইত্যাদি এই প্রকার ভাইটামিনের অভাব সূচিত করে। চোখ জ্বালা করা এবং দৃষ্টিশক্তির অস্পষ্টতাও এই প্রকার ভাইটামিনের অভাবে দেখা দেয়। বিভিন্ন বয়সে ইহার প্রয়োজনের পরিমাণ 386 পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

উৎস—দুধ এই প্রকার ভাইটামিনের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস। পনীর, যকৃৎ, বৃক্ক ইত্যাদিতেও প্রচুর পরিমাণে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়। মাংস, ডিম এবং সবুজ শাক-সবজি প্রভৃতিতে ইহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। বিভিন্ন প্রকার ফলে অতি সামান্যই এই ভাইটামিন পাওয়া যায়।

নিকোটিনিক অ্যাসিড
(Nicotinic Acid or Niacin)

১৯৩৭ খৃঃ এলভিজ্যাম (Elvehjem) এবং তাঁহার সহকর্মীরা প্রথম ইহার নামকরণ করেন। ইহা পেলেগ্রা নিবারণ করিতে পারে বলিয়া ইহাকে পেলেগ্রা প্রতিরোধক ভাইটামিনও বলে। প্রত্যেক জীবিত প্রাণীরই এই ভাইটামিনের প্রয়োজন হয়। থায়ামিন ও রাইবোফ্লাবিনের মত ইহাও পরোক্ষভাবে কার্বো-হাইড্রেট মেটাবলিজম-এ সহায়তা করে।
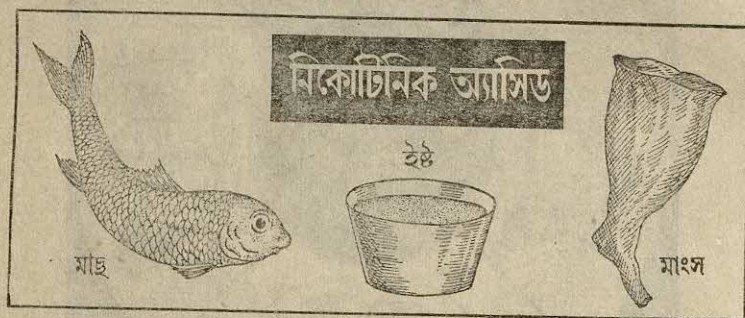
অভাবের ফল - এই ভাইটামিনের অভাবে পেলেগ্রা নামক রোগ দেখা দেয়। পেটের অসুখ, বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ ও চামড়ার কুঞ্চন এই রোগের লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। এই ভাইটামিনের অভাবে কুকুরের জিহ্বা কালো হইতে দেখা যায়। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রতিদিন ১৭-২১ মিঃ গ্রাম নিকোটিনিক অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়। তবে অসুস্থ অবস্থায় বা গর্ভাবস্থায় ইহার পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়াইতে হয়।

উৎস—ঈষ্ট, মাছ, মাংস ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে নিকোটিনিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। আলু, যকৃৎ, আটা, সবুজ শাক-সবজি, ইত্যাদিতেও ইহা দেখা যায়।

ভাইটামিন সি (Vitamin C)

প্রয়োজনীয়তা—(১) খাদ্যের ভাইটামিন 'সি' স্কার্ভি (scarvy) রোগের উপশম করে এবং এইজন্য ইহাকে Anti-scorbutic ভাইটামিনও বলা হয়। (২) দাঁত ও হাড়ের পুষ্টিসাধন এবং (৩) রক্তের বিশুদ্ধতা ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিতেও ইহা সহায়তা করিয়া থাকে। (৪) ইহা পাকস্থলী সুস্থ রাখে এবং (৫) বিভিন্ন রোগজীবাণুর হাত হইতে দেহকে রক্ষা করে। বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষের দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ 387 পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

অভাবের ফল—খাদ্যে ভাইটামিন 'সি'র অভাব হইলে (১) ক্ষুধামান্দ্য, (২) অলসতা, (৩) হাত ও পায়ের গাঁটে ব্যথা হওয়া ও ফুলিয়া যাওয়া
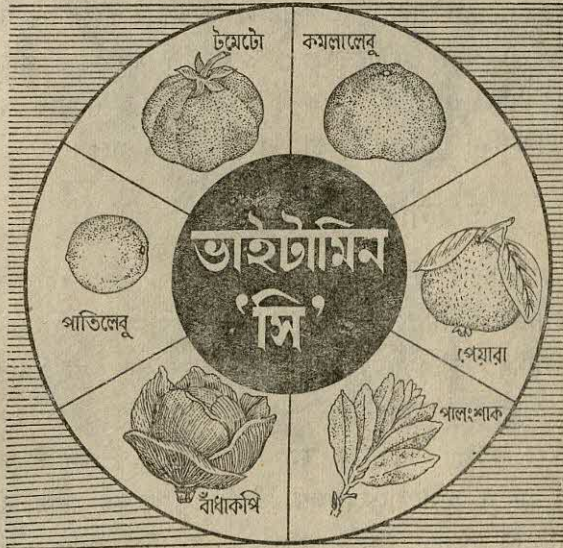
ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া (৪) খিটখিটে মেজাজ, (৫) ওজন হ্রাস এবং (৬) অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়া ইত্যাদিও এই ভাইটামিনের অভাব সূচিত করে। অধিক দিন এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাব হইলে (৭) দাঁতের মাড়ি ফুলিয়া দাঁত দিয়া রক্ত পড়ে। এই অবস্থাকে স্কার্ভি বলে।

উৎস—নিম্নলিখিত খাদ্যে **অধিক পরিমাণে** ভাইটামিন 'সি' পাওয়া যায়ঃ

টাট্কা বাঁধা কপি, পালং শাক, অঙ্কুরিত ছোলা, মটর ইত্যাদি, লেবুর রস, কমলালেবুর রস, টমেটো।

নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে **অপেক্ষাকৃত কম** পরিমাণে এই ভাইটামিন পাওয়া যায় :—

টাট্‌কা গাজর, লেট্যুস শাক, শালগম, আলু, সিম, মিষ্টি আলু, আনারস, ন্যাশপাতি ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে **খুব অল্প পরিমাণ** ভাইটামিন 'সি' আছে :—

দুধ, দই, অঙ্কুরিত যব, জোয়ার, বীট, আলু, রান্না করা বাঁধা কপি, সিদ্ধ ফুল কপি, পেঁয়াজ, আলু সিদ্ধ, তরমুজ, আপেল, কলা ইত্যাদি।

মাংস, ডিম, সয়াবীন, আটা, ময়দা, তৈল, বিভিন্ন প্রকার শুকনো ফল ও তরি-তরকারি ইত্যাদিতে **ভাইটামিন 'সি' থাকে না**। তবে শুষ্ক আমলকি ইহার ব্যতিক্রম। ভাইটামিন সি প্রধান ফলের অভাব ঘটিলে শুষ্ক আমলকির গুঁড়া খাইয়া ঐ অভাব মিটান যায়। একটি আমলকিতে প্রায় দুইটি কমলালেবুর সমান ভাইটামিন থাকে। সুতরাং অল্প পরিমাণ আমলকির গুঁড়াতেই ভাইটামিন সি'র দৈনিক চাহিদা পূরণ হইতে পারে।

ভাইটামিন 'ডি' (Vitamin D)

খাদ্যে ক্যালসিয়াম এবং ফস্‌ফরাস ঘটিত লবণের অভাব হইলে বা উহারা উপযুক্ত অনুপাতে না থাকিলে রিকেট (Ricket) রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু খাদ্যে ভাইটামিন 'ডি'-র অভাব হইলে উপরোক্ত লবণ দুইটি থাকা সত্ত্বেও এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। এই ভাইটামিন ক্যালসিয়াম এবং ফস্‌ফরাসের কাজে সহায়তা করে। আমাদের ত্বকে সূর্যের আলো পড়িলে এই ভাইটামিন সৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত সূর্যালোকের জন্য ভারতবর্ষে রিকেট রোগ প্রায় দেখা যায় না বলিলেই চলে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং ভাইটামিন 'ডি' জাতীয় খাদ্যের অভাবে 'রিকেট' রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেশী।

প্রয়োজনীয়তা—ইহা অন্ত্র (intestine) হইতে ক্যালসিয়াম এবং ফস্‌ফরাস ঘটিত লবণ শোষণে সহায়তা করিয়া দেহের অস্থি গঠনে সহায়তা করে।

বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষের দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ 387 পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

অভাবের ফল—শিশুর খাদ্যে এইপ্রকার ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশু ভীরু ও অস্থিরমতি হয়; তাহাদের মাংসপেশী শিথিল এবং গ্রন্থি

দুর্বল হইয়া পড়ে। হাড়ের যথাযথ পরিপুষ্টি না হওয়ায় উহা দুর্বল ও নরম হয় এবং হাঁটিতে অনেক বিলম্ব করে। ইহাই রিকেট রোগের লক্ষণ। ভাইটামিন ডি-এর অভাবে খাদ্যের ক্যালসিয়াম এবং ফস্‌ফরাস শিশুদের হাড় গঠনে সহায়তা করিতে পারে না বলিয়া এই রোগের সৃষ্টি হয়। রিকেট রোগাক্রান্ত শিশুদের হাত পা অনেকটা ধনুকের মত বাঁকা হইয়া যায়। ক্রমাগত অভাবের ফলে শরীর ফ্যাকাশে হইয়া রক্তাল্পতাও দেখা দিতে পারে এবং অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি, কাশি ইত্যাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহার অভাবে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। খারাপ দাঁত এবং অকালে দাঁতের ক্ষয় রোগও এই প্রকার ভাইটামিনের অভাব সূচিত করে।

রিকেট কেবল শিশুদেরই রোগ নয়। বয়স্কদেরও অনুরূপ রোগ হইতে পারে। তখন ইহাকে 'adult ricket বা **অষ্টিয়োম্যালাসিয়া** (osteomalacia)' বলে। এই রোগে বয়স্কদের হাড় হইতে ক্যালসিয়াম এবং ফস্‌ফরাস ক্ষয় হইয়া ক্রমশ উহা নরম ও দুর্বল হইয়া পড়ে। হাঁটা চলা করিতে খুব কষ্ট বোধ করা এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এই রোগে ক্রমশ পা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং হাতের উপর ভর দিয়া

চলিতে হয়। কখনও কখনও কোমরে এবং পায়ে বাতের ব্যথার মত ব্যথাও হইয়া থাকে। শেষ অবস্থায় পায়ের হাড় এবং মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যাইতে পারে। **গর্ভবতী এবং স্তন্য-দানকারী নারীদের মধ্যে এই রোগ বেশী পরিমাণে দেখা যায়।**

এই রোগ প্রধানত ভাইটামিন 'ডি' এবং ক্যালসিয়ামের অভাবের জন্যই হইয়া থাকে। স্নেহ পদার্থ দেহ গ্রহণ না করিতে পারিলেও এই রোগ হইতে পারে, কারণ, স্নেহ পদার্থে ভাইটামিন 'ডি' দ্রবীভূত থাকে।

কডলিভার অয়েল এই রোগের প্রধান প্রতিষেধক। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের সহিত প্রত্যহ ২।৩ চামচ কডলিভার অয়েল খাইতে দিলে এই রোগ সহজেই আরোগ্য হয়।

উৎস—কড মাছের তৈল, শার্ক মাছের তৈল ভাইটামিন 'ডি'-র প্রধান উৎসস্থল। মাখন, দুধ, ঘি, ডিমের কুসুম এবং বিভিন্ন প্রকার মাছের তৈলে এই জাতীয় ভাইটামিন পাওয়া যায়। সামান্য পরিমাণে ইহা নারিকেল তৈলেও দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈলে এই ভাইটামিন দেখা যায় না। সূর্যের আলো আমাদের ত্বকে পড়িলে দেহে এই ভাইটামিন প্রস্তুত হয়।

ভাইটামিন 'ই' (Vitamin E)

এই ভাইটামিনকে আল্‌ফা-টকোফেরলও বলে। বিজ্ঞানী ইভানস্ (Evans) ১৯২২ সালে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করেন যে খাদ্যে ভাইটামিন 'ই'-র অভাব হইলে স্ত্রী ইঁদুরগুলির প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য বহুদিন পর্যন্ত ইহা অনুর্বরতারোধক ভাইটামিন নামেই পরিচিত ছিল। এই ভাইটামিনের অভাবে স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণের ক্ষমতা চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে সকল স্ত্রীলোকের অসময়ে গর্ভস্রাব হইয়া গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় তাহাদের খাদ্যে ভাইটামিন 'ই'-র পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে এই অকাল গর্ভস্রাব প্রবণতা কমিয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। ইহার ব্যবহারে মৃতবৎসা নারীও সুস্থ, সবল সন্তানের জননী হইতে পারে। পুরুষের খাদ্যে এই ভাইটামিনের অভাব হইলে তাহাদের শুক্রাশয়ের আকারে ক্রমশ ছোট হইতে থাকে। ক্যানাডার ডাঃ মুঠে হৃদ্‌রোগে এই ভাইটামিন ব্যবহার করিয়া প্রভূত ফল পাইয়াছেন। ইহার ব্যবহারে রক্তের

জমাট বাঁধা এবং করোনারী থ্রম্বোসিস নিবারিত হয়। যাহারা চশমা ব্যবহার না করিয়া দূরের বস্তু দেখিতে পায় না, তাহারাও এই ভাইটামিন ব্যবহারে তাহাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে। যে সকল শিশুর দেহ, মন ও বুদ্ধির বিকাশ অসম্পূর্ণ অথবা যাহারা কথা বলিতে গিয়া তোতলায় তাহাদের এই ভাইটামিন নিয়মিত ব্যবহারের ফলে অদ্ভুত উপকার পাইতে দেখা গিয়াছে। যাহারা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত তাহাদের নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে এই ভাইটামিন খাইতে দিলে রক্তে চিনির পরিমাণ ক্রমশ কমিতে থাকে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। অগ্ন্যাশয় এবং যকৃতের প্রদাহ

ঘটিত পীড়ায় এই ভাইটামিনে সুফল পাওয়া যায়। অকাল বার্ধক্যে দেহ ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়িলে এই ভাইটামিন ব্যবহারে যৌবনের আনন্দ ও উৎসাহ ফিরিয়া আসে, এইজন্য এই ভাইটামিনকে '**যৌবন সঞ্জীবনী**' নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে রক্তের চাপ কমাইতে এবং শিথিল ইন্দ্রিয়গুলির কার্যক্ষমতা ফিরাইয়া আনিয়া যৌনশক্তি বৃদ্ধি করিতে এই ভাইটামিন সহায়তা করে।

সয়াবীন, লেট্যুস প্রভৃতি সবুজ শাক-সবজি, যবের খৈ, গম, যকৃৎ, ডিমের কুসুম, গমের অঙ্কুর, বাদাম, পেস্তা, অঙ্কুরিত ছোলা, মটর শুঁটি প্রভৃতিতে ভাইটামিন 'ই' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রতিদিন ৩০ মিলিগ্রামই একজন লোকের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

ভাইটামিন 'কে' (Vitamin K)

১৯৩৫ সালে ডাঃ ড্যাম (Dr. Dam) প্রথম লক্ষ্য করেন যে রক্তের ক্ষরণ বন্ধ করিতে হইলে কেবলমাত্র ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়, একটি বিশিষ্ট ভাইটামিনও এই ক্ষরণ বন্ধ করিতে প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই ভাইটামিনকে তিনি ভাইটামিন 'কে' নামে অভিহিত করিয়াছেন। শরীরে সাধারণত এই ভাইটামিনের অভাব হয় না ; কারণ, অন্ত্রের জীবাণু খাদ্যদ্রব্য হইতে শরীরের মধ্যে এই ভাইটামিন প্রস্তুত করিয়া থাকে। গর্ভবতী নারীকে গর্ভের শেষ মাসে প্রতিদিন ১ মিলিগ্রাম করিয়া ভাইটামিন 'কে' দেওয়া হইলে

অত্যধিক রক্তপাতের ভয় থাকে না। ইহার অভাবে পিত্তের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

সবুজ শাক-সবজি, যথা—পালং শাক, বাঁধা কপি, ফুল কপি ইত্যাদিতে ভাইটামিন 'কে' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চাউল, আটা, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদিতে এবং বিভিন্ন প্রকার ফলে ইহা অল্প পরিমাণে থাকে।

[**ভাইটামিন 'পি'** (Vitamin 'P')—ইহাকে ভাইটামিন 'সি'-এর আনুষঙ্গিক ভাইটামিনও বলা চলে। কারণ আম, জাম, কমলালেবু, টমেটো ইত্যাদি যে সকল খাদ্যে ভাইটামিন 'সি' পাওয়া যায় সেই সকল খাদ্যে এই ভাইটামিনও দেখা যায়।

আমরা অজ্ঞানতাবশত ফল খাইয়া ফলের যে ছিব্ড়া ফেলিয়া দেই, সেই ছিব্ড়ার মধ্যেই থাকে ভাইটামিন 'পি'। সুতরাং ফলের খোসা এবং বিচি বাদে ছিব্ড়াসহ সমস্তটাই খাওয়া উচিত।

আধুনিক যুগে করোনারী থ্রম্বোসিস যে একটি ভয়াবহ রোগ তাহাতে সন্দেহ নাই। করোনারী আর্টারী নামক যে ধমনী হৃৎপিণ্ডের কোষগুলিকে সর্বদা খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে এই রোগে সেই আর্টারীর গায়ে রক্ত জমাট বাঁধিতে থাকে। সম্ভবত রক্তে কোলেস্টেরল নামক একটি অপকারী পদার্থের বৃদ্ধি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে রক্তের এই জমাট বাঁধা কাজটি আরম্ভ হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী খাদ্যের অভাবে ক্রমশ দুর্বল হইয়া একদিন চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়।

অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গিয়াছে যে রুটিন নামক এক প্রকার পদার্থ করোনারী থ্রম্বোসিসের প্রাথমিক লক্ষণ রক্তের এই জমাট বাঁধা দোষটি নিরাময় করিতে পারে। এই রুটিনেরই অপর নাম হইল ভাইটামিন 'পি'। প্রত্যহ ছিবড়াসহ কিছু কিছু ফল খাইলে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়। থ্রম্বোসিসের প্রাথমিক অবস্থায় ভাইটামিন 'পি'এর সঙ্গে ভাইটামিন 'ই' জাতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়।]

পরের দুই পাতায় প্রধান প্রধান ভাইটামিনসমূহ এবং উহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইল।

ভাইটামিন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়

ভাইটামিন 'এ'	প্রধান উৎস	অভাবের ফল	রান্নার প্রভাব	দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ
ভাইটামিন 'এ'	কডলিভার অয়েল, শার্ক-লিভার অয়েল, মাখন, ডিম, চর্বি জাতীয় মাছ, দুধ, সবুজ ও পীত বর্ণের শাক-সবজি।	চক্ষু রোগ, রাতকানা রোগ, দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তির হ্রাস।	নষ্ট হয় না	প্রাপ্ত বয়স্ক— ৫০০০ আই. ইউ. গর্ভবতী নারী— ৬০০০ " " স্তন্যদানকারী নারী—৮০০০ " " বালক-বালিকা—১৫০০-৫০০০ "
ভাইটামিন 'বি১'	ঈষ্ট, যকৃৎ, আটা, বৃক্ক, মাংস, ডিম, ডাল, মটর-শুঁটি, দুধ ইত্যাদি।	বেরিবেরি, ক্ষুধামান্দ্য, সহজেই পরিশ্রান্ত হওয়া, কাজে অনুৎসাহ এবং মনমরা ভাব ইত্যাদি।	তাপে সামান্য নষ্ট হয়। সোডা বা ক্ষার দ্রব্যের সংস্পর্শে অধিক পরিমাণে নষ্ট হয়। খাদ্যের জল ফেলিয়া দিলে জলের সঙ্গে চলিয়া যায়।	বালক-বালিকা—০.৪-১.১ মিঃ গ্রাম (১০ বৎসরের নীচে) বালক-বালিকা—১.২-১.৮ মিঃ গ্রাম (১০ বৎসরের উর্দ্ধে)
ভাইটামিন 'বি '	ঈষ্ট, যকৃৎ, ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, ডাল, মটর-শুঁটি, আটা, সবুজ শাক-সবজি ইত্যাদি।	মুখের কোণায় ঘা, জিহ্বার স্ফীতি, চোখ-জ্বালা করা, অস্পষ্ট দৃষ্টি।	উত্তাপে সামান্য নষ্ট হয়। জল ফেলিয়া দিলে জলের সঙ্গে অনেক অপচয় হইয়া থাকে।	বালক-বালিকা—০.৫-১.৫ মিঃ গ্রাম (১০ বৎসরের নীচে) বালক-বালিকা—১.৯-২.৫ " " (১০ বৎসরের উর্দ্ধে) প্রাপ্ত-বয়স্ক— ১.৫-১.৮ " " গর্ভবতী নারী—২.০ " " স্তন্যদানকারী নারী—২.৫ " "

ভাইটামিন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়

ভাইটামিন	প্রধান উৎস	অভাবের ফল	রান্নার প্রভাব	দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ
নায়াসিন বা নিকোটিনিক অ্যাসিড	ঈষ্ট, মাছ, মাংস, যকৃৎ, বৃক্ক, শস্য-কণা, সবুজ শাক-সবজি ইত্যাদি।	পেলেগ্রা	উত্তাপে নষ্ট হয় না। জলের সঙ্গে অপচয় হইতে পারে।	বালক-বালিকা—৬-১৪ মিঃ গ্রাম (১০ বৎসরের নীচে) বালক-বালিকা—১৬-২৫ " " (১০ বৎসরের উর্ধ্বে) প্রাপ্ত-বয়স্ক—১৭-২১ " "
ভাইটামিন 'সি'	টমেটো, কমলালেবু, পাতি-নেবু, পেয়ারা, জাম (berries), আলু, কফি ইত্যাদি।	স্কার্ভি রোগ, দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তির হ্রাস।	অক্সিজেনের উপস্থিতিতে উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। রান্নার জল ফেলিয়া দিলে অপচয় ঘটে।	বালক-বালিকা—৩০-৬০ মিঃ গ্রাম (১০ বৎসরের নীচে) বালক-বালিকা—৭৫-১০০ " " (১০ বৎসরের উর্ধ্বে) প্রাপ্ত বয়স্ক—৭০-৭৫ " " গর্ভবতী নারী—১০০ " " স্তন্যদানকারী নারী—১৫০ " "
ভাইটামিন 'ডি'	কডলিভার অয়েল, শার্ক-লিভার অয়েল, চর্বি জাতীয় মাছ, ডিম, মাখন, দেহের উপর সূর্যের প্রভাব ইত্যাদি।	রিকেট, অষ্টিয়োম্যালা-সিয়া, দাঁতের ক্ষয়রোগ, খর্বাকৃতি প্রভৃতি।	নষ্ট হয় না।	প্রাপ্ত-বয়স্কদের প্রয়োজনের পরিমাণ খুব সামান্য। বালক-বালিকা, গর্ভবতী ও স্তন্য-দানকারী নারীর খাদ্যে প্রত্যহ ৪০০ আই. ইউ. প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও তাহাদের খাদ্য-মূল্য
(Different foods and their food values)

খাদ্য-শস্য (Cereals)—চাউল, গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, রাগী, ঝৈ (Oat) ইত্যাদি খাদ্য-শস্যের অন্তর্গত। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের বৃহত্তম অংশ আমরা এই শ্রেণীর খাদ্য হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এইরূপ একটি শস্যকণাকে মধ্য দিয়া লম্বালম্বি কাটিলে পার্শ্বস্থিত চিত্রের ন্যায় দেখাইবে।
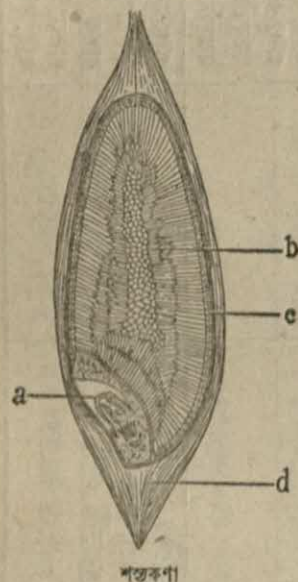
শস্যকণা

শস্যকণাটির ভ্রূণে (চিত্রের 'a' অংশ লক্ষ্য কর) প্রায় সমস্ত প্রোটিন, ভাইটামিন এবং লবণ নিবদ্ধ থাকে। ইহাছাড়া কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ পদার্থও এই অংশে অল্প পরিমাণে দেখা যায়। শস্যকণার প্রায় অধিকাংশই শ্বেতসার (চিত্রের 'b' অংশ লক্ষ্য কর) জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। শ্বেতসার ব্যতীত সামান্য পরিমাণ শর্করা (Sugar) এবং প্রোটিনও এই 'b' চিহ্নিত অংশে পাওয়া যায়। শস্যকণার 'a' এবং 'b' অংশকে ঘিরিয়া একটি পাতলা আবরণ (চিত্রের 'c' অংশ) থাকে, এই অংশটিকে 'ব্র্যান' (Bran) বলে। এই ব্র্যান-চিহ্নিত অংশে শস্যকণার কিছু ভাইটামিন, প্রোটিন এবং লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র শস্যকণাটি ঘিরিয়া একটি পুরু আস্তরণ থাকে। এই আস্তরণটিকে তুষ বা ভূষি (husk) বলে। (চিত্রে 'd' অংশ)।

খাদ্যশস্য বা শস্যকণার সাহায্যে আমরা আমাদের কার্বোহাইড্রেটের অভাবই সাধারণত পূরণ করিয়া থাকি। প্রোটিন, ভাইটামিন, লবণ এবং স্নেহ পদার্থের পরিমাণ ইহাতে অতি সামান্যই থাকে। ইহা ছাড়া এই সকল প্রোটিন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির প্রোটিনের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীরও নয়, অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন। সুতরাং শুধু মাত্র এই জাতীয় খাদ্যের দ্বারা দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতে পারে না। বিভিন্ন ধাতব লবণের মধ্যে লৌহ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু শস্যকণার লৌহ শরীর গ্রহণ করিতে পারে না। ক্যালসিয়ামের

পরিমাণ ইহাতে অনেক কম ; উপরন্তু ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস উপযুক্ত অনুপাতে না থাকায় ইহা দেহের গ্রহণোপযোগী নয়।

সকল খাদ্যশস্যেই ভাইটামিন 'ই'-র প্রাচুর্য দেখা যায় ; ভাইটামিন 'বি'-র পরিমাণও মন্দ নহে। কিন্তু সকল প্রকার খাদ্যশস্যেই ভাইটামিন 'এ', 'সি' এবং 'ডি'-র অভাব লক্ষিত হয়।

প্রায় সকল প্রকার খাদ্যশস্যেই কিছু-না-কিছু স্নেহ পদার্থ দেখা যায়। চাউল এবং গম অপেক্ষা জোয়ার, বাজরা, জৈ-তে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ বেশী।

গম—গম হইতে সাধারণত **আটা** এবং **ময়দা** প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। শস্যকণার শুধুমাত্র বাহিরের অংশ (চিত্রের 'a' অংশ লক্ষ্য কর) আটা প্রস্তুত করিবার সময় বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং গমের প্রায় সমস্ত প্রোটিন, ভাইটামিন, লবণ এবং স্নেহ পদার্থই আটায় বর্তমান থাকে। আটার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কিছু উৎকৃষ্ট প্রোটিন, প্রচুর 'বি' ভাইটামিন এবং ম্যাঙ্গানিজ (Manganese) লবণ পাওয়া যায়। কিন্তু ভাইটামিন 'এ'র অভাব ইহাতে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট প্রোটিন এবং ভাইটামিন 'এ' না থাকায় শুধু আটার সাহায্যে শরীর রক্ষা করা যায় না।

পাঁউরুটি—আটা এবং ময়দা হইতে বিভিন্ন প্রকার রুটি, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি হইয়া থাকে। গমের মধ্যে গ্লায়াডিন (gliadin) এবং গ্লুটেলিন (glutelina) নামক দুইটি প্রোটিন দেখা যায়। জলের সাহায্যে এই প্রোটিন এক প্রকার আঠাল পদার্থে পরিণত হয়। এই জন্যই আটা ময়দা জলে মাখিয়া উহার সাহায্যে সহজেই রুটি, লুচি ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়। চাউল, জই, রাই, যব ইত্যাদির সাহায্যে এই প্রকার রুটি প্রস্তুত করা যায় না। কারণ, ইহাদের মধ্যে ঐ আঠাল প্রোটিন না থাকায় উহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়।

প্রাচীন কালে রুটি প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক প্রণালী হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিল। ময়দা ভাল করিয়া জলে মাখাইয়া প্রথমে একটি তাল (dough) প্রস্তুত করা হইত। পরে এই তাল কিছুক্ষণের জন্য একটি উষ্ণ স্থানে ফেলিয়া রাখা হইত। ইহার ফলে বায়ু (air) হইতে ঈষ্ট (yeast) ঐ তালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা গাঁজাইয়া (fermentation) কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাস উৎপন্ন করিত। এই গ্যাস সৃষ্টির ফলে ঐ তালটি ফুলিয়া ফাঁপিয়া স্পঞ্জের আকৃতি ধারণ করিত। সেঁকিবার সময় (baking) ঐ গ্যাস আয়তনে আরও বৃদ্ধি পাইত, ফলে রুটি নরম ও ফাঁপা হইত। **এই কারণেই এখনও**

গৃহে রুটি বা লুচি প্রস্তুত করিতে হইলে আটা বা ময়দা জলে মাখাইয়া কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখিতে দেখা যায়।

শুধুমাত্র বায়ুর উপর ঈষ্টের জন্য নির্ভর না করিয়া আজকাল পাউরুটি প্রস্তুতিতে ময়দার সহিত ঈষ্ট মেশানো হয়। কখনও কখনও ঈষ্টের পরিবর্তে বেকিং পাউডারও (baking powder) ব্যবহার করা হয়। বেকিং পাউডার সাধারণত টারটারিক অ্যাসিড (Tartaric acid) বা পটাসিয়াম হাইড্রোজেন টারটারেট (Potassium hydrogen tarterate)-এর সহিত সোডি-বাই-কার্ব (Sodium bicarbonate) মিশাইয়া প্রস্তুত করা হয়। কখনও কখনও ফটকিরিও (Alum) উহার সঙ্গে মিশানো হয়। ময়দার সহিত এই বেকিং পাউডার মিশাইয়া জল দিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

পাঁউরুটি প্রস্তুতিতে বেকিং পাউডারের পরিবর্তে ঈষ্ট ব্যবহার করিলে উহার খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ঈষ্ট ভাইটামিন 'বি'-এর উৎকৃষ্ট উৎসস্থল। সুতরাং পাঁউরুটি ময়দা দ্বারা প্রস্তুত হইলেও ইহাতে ভাইটামিন 'বি' পাওয়া যায়। তবে এই ভাইটামিনের পরিমাণ সামান্যই। সমপরিমাণ আটায় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী 'বি' ভাইটামিন থাকে। অপরদিকে বেকিং পাউডার ক্ষার জাতীয়। সুতরাং এই ক্ষারের সংস্পর্শে রুটির 'বি' ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়।
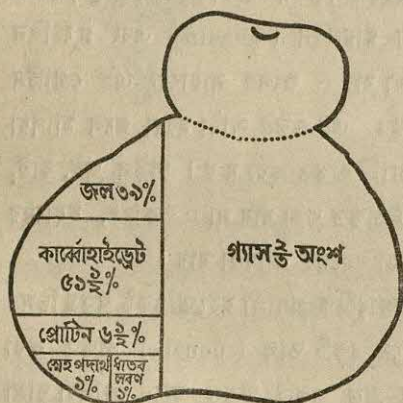
পাঁউরুটির উপাদানসমূহের পরিমাণ

পাঁউরুটির ভিতরটা ফাঁপা এবং ফাঁপা অংশ গ্যাসে পূর্ণ থাকে। ইহা প্রধানত কার্বো-হাইড্রেট জাতীয় খাদ্য, তবে অন্যান্য খাদ্যোপাদানও ইহাতে কিছু কিছু দেখা যায়। একটি পাঁউরুটির বিভিন্ন উপাদানসমূহের মোটামুটি পরিমাণ পার্শ্ববর্তী চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

আটা অধিক দিন রাখিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য আজকাল আটা অপেক্ষা ময়দার প্রচলন বেশী। কিন্তু ময়দা প্রস্তুত করিবার সময় গমের একমাত্র

'b' অংশ ছাড়া অবশিষ্ট 'a', 'c' এবং 'd' অংশসমূহ (শস্যকণার চিত্র দেখ) নষ্ট হইয়া যায়। 'd' অংশের প্রধান উপাদান শ্বেতসার এবং সামান্য পরিমাণ নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন, সুতরাং ময়দায় প্রোটিন, ভাইটামিন, লবণ এবং স্নেহ পদার্থ প্রায় নাই বলিলেই চলে। এইজন্য ইহার খাদ্য-মূল্য আটা, চাউল, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদির তুলনায় অনেক কম।

চাউল—চাউল আমাদের প্রধান খাদ্য। ইহার প্রায় শতকরা ৭৬ ভাগই শ্বেতসার। এই শ্বেতসার অতিশয় সহজপাচ্য। প্রোটিন এবং স্নেহ পদার্থের পরিমাণ ইহাতে অতি সামান্য, এমন কি সকল খাদ্যশস্যের মধ্যে চাউলেই প্রোটিন, স্নেহ এবং লবণের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। এই প্রোটিনসমূহও আবার নিকৃষ্ট শ্রেণীর। অন্যান্য খাদ্যশস্যের তুলনায় 'বি' ভাইটামিনও চাউলে অপেক্ষাকৃত কম। বিশেষতঃ কলে-ছাঁটা চাউলে এই ভাইটামিন প্রায় কিছুই থাকে না। এইজন্য কলে-ছাঁটা চাউল যাহাদের প্রধান খাদ্য তাহাদের মধ্যে বেরিবেরি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলে শস্যের 'a' এবং 'c' অংশ (শস্যকণার চিত্র দেখ) বজায় থাকে। সুতরাং এই প্রকার চাউলে প্রোটিন, 'বি' ভাইটামিন এবং লবণসমূহ বজায় থাকে। আতপ চাউল অপেক্ষা সিদ্ধ চাউলে 'বি' ভাইটামিন বেশী থাকে। ভাতের মাড়ে প্রচুর শ্বেতসার, প্রোটিন, 'বি' ভাইটামিন এবং লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সুতরাং ভাতের মাড় ফেলিয়া দিলে ভাতের খাদ্যমূল্য অনেক কমিয়া যায়।

আমাদের দেশে আতপ এবং সিদ্ধ এই দুই প্রকার চাউল সাধারণত ব্যবহার করা হয়। ঋতুভেদে (১) আমন, (২) আউশ এবং (৩) বোরো এই তিন প্রকারের চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের এবং মৃত্তিকার চাউল আবার বিভিন্ন আকার, স্বাদ এবং গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। আকৃতি, স্বাদ ও গন্ধ অনুসারে চাউলের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়, যথা—রামশাল, সীতাশাল, ছত্রশাল, দুধশাল, চিনিসক্কর, আকাশমণি, দাদখানি, বাসমতি, গোবিন্দভোগ, বাদশাভোগ ইত্যাদি।

ডাল—আমাদের দেশে অড়হর, মসুর, ছোলা, মুগ, মটর, কলাই ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ডাল দেখিতে পাওয়া যায়। ডালের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। গমের দ্বিগুণ এবং কলে-ছাঁটা চাউলের প্রায় চতুর্গুণ প্রোটিন ডালে আছে। যে কোন শস্যকণার (cereals) তুলনায় অনেক বেশী এবং অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন ইহাতে পাওয়া

যায়। শস্যকণার প্রোটিনের অভাব ডালের দ্বারা অনেকটা পূরণ হইতে পারে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রোটিন-প্রধান খাদ্যের তুলনায় ডালে প্রোটিনের পরিমাণ কম নহে। কিন্তু এই প্রোটিন মাছ, মাংস ইত্যাদির প্রোটিনের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়। এক ছটাক যে কোন প্রকার ডালে প্রোটিনের পরিমাণ ১ ছটাক মাংসের প্রোটিনের সমান, ১ ছটাক ডিমের প্রোটিনের দ্বিগুণ এবং ১ ছটাক দুধের প্রোটিনের প্রায় সাত গুণ। সুতরাং আমাদের মত দরিদ্র দেশে অল্প ব্যয়ে ডাল হইতেই অধিকাংশ প্রোটিনের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ডালের প্রোটিন তেমন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়, এইজন্য ইহার সহিত কিছু কিছু মাছ, মাংস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনও গ্রহণ করিতে হয়।

ডাল রান্না করিতে খর জল ব্যবহার করিলে ডাল ভাল সিদ্ধ হয় না এবং ঐ ডাল পরিপাক করিতেও অসুবিধা হয়। এইজন্য মৃদু জলে ডাল রান্না করিতে হয়। একজন সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম ব্যক্তি দৈনিক প্রায় আধ পোয়া ডাল হজম করিতে পারে।

লৌহ এবং ফসফরাস-ঘটিত লবণ ডালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধাতব লবণ ইহাতে সামান্যই আছে। সমস্ত প্রকার ডালেই 'বি' ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ভাইটামিন 'এ' এবং 'সি' ইহাতে নাই বলিলেই চলে। **কিন্তু অঙ্কুরিত ছোলা বা ডালে ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' পাওয়া যায়।** এইজন্যই কেহ কেহ অঙ্কুরিত ছোলা খাইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রকার ডালের মধ্যে অড়হর এবং মুগই শ্রেষ্ঠ। রান্না করিবার সময় ডালের 'বি' ভাইটামিন কিছু নষ্ট হইয়া যায়।

যকৃৎ (Liver)—বিভিন্ন প্রাণীর যকৃৎ একটি উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু। দেহের উদ্বৃত্ত কার্বোহাইড্রেট ভবিষ্যতের খাদ্য হিসাবে এই যকৃতেই জমানো থাকে। বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিনের মধ্যে ভাইটামিন 'এ' ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, ভাইটামিন 'বি', 'সি' এবং 'ডি'ও কিছু কিছু পাওয়া যায়। যকৃতের প্রোটিন অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ধাতব লবণের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ এবং লৌহ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ম্যাঙ্গানিজ দেহের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। স্নেহ জাতীয় পদার্থও যকৃতে কম নহে। সপ্তাহে অন্তত একদিন যকৃৎ খাওয়া উচিত।

ডিম (Egg)—বিভিন্ন প্রকার প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে ডিম একটি শ্রেষ্ঠ খাদ্য। ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন আছে। ডিমের সাদা অংশটি প্রধানত

অ্যালবুমেন (Albumen) নামক এক প্রকার প্রোটিন দ্বারা গঠিত। স্নেহ পদার্থ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং লৌহ-ঘটিত লবণ ডিমের কুসুমে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। একমাত্র ভাইটামিন 'সি' বাদে প্রায় সকল প্রকার ভাইটামিনই ইহাতে আছে। ডিমের মধ্যে কোন কার্বোহাইড্রেট থাকে না। একটি মাঝারি আকৃতির ডিমের কুসুম এবং সাদা অংশের উপাদানসমূহের মোটামুটি পরিমাণ পাশের চিত্রে দেখানো হইল।

একটি ৫০ গ্রাম ওজনের ডিমের উপাদানসমূহের পরিমাণ। বাহিরের প্রায় ৬ গ্রাম ওজনের শক্ত আবরণটি চিত্রে দেখান হয় নাই।

মাংস (Meat)—উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনের জন্য মাংসের প্রয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাংসের প্রোটিনে প্রয়োজনীয় সকল অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহই পাওয়া যায়। প্রত্যহ ভাত, ডাল ইত্যাদির সহিত কিছু কিছু মাংস গ্রহণ করিয়া প্রোটিনের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। মাংসের চর্বি শুধু স্নেহ পদার্থের অভাবই পূরণ করে না, ইহা খাদ্যে ভাইটামিন 'এ'ও সরবরাহ করে। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'বি,' 'সি', 'ডি' এবং 'ই'ও মাংসে অল্প পরিমাণে থাকে। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হইতে এই সকল ভাইটামিনের অভাব পূরণ করিতে হয়। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরাস-ঘটিত লবণ এবং সামান্য ক্যালসিয়াম লবণ পাওয়া যায়।

মাছ—মাছ বাঙালীর একটি প্রধান খাদ্য ; ইহাতে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন থাকে। মাংস অপেক্ষা মাছ অধিকতর সহজপাচ্য। কেবলমাত্র ভাইটামিন 'সি' বাদে অন্যান্য ভাইটামিনসমূহ প্রায় সমস্তই মাছে পাওয়া যায়। তৈল জাতীয় মাছ, যথা—ইলিশ মাছে এবং সমুদ্রের মাছে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' অধিক পরিমাণে থাকে। যে সকল ধাতব লবণ মাছে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে আয়োডিন এবং তাম্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশে আমরা সাধারণত দুই শ্রেণীর মাছ দেখিতে পাই ;—

(১) ছোট মাছ যথা—মৌরালা, বাটা, বাচা, ফ্যাসা, চাঁদা, পুঁটি, পাবদা, ট্যাংড়া, রয়না, খলিসা প্রভৃতি।

(২) বড় মাছ, যথা—বোয়াল, চিতল, আইড়, রুই, কাতলা প্রভৃতি।

ছোট মাছের তন্তুগুলি অপেক্ষাকৃত নরম এবং ইহাতে স্নেহ পদার্থও কম থাকে, এই জন্য ছোট মাছ সহজপাচ্য। ইহা ছাড়া ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং আয়োডিন এই শ্রেণীর মাছে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

অধিক স্নেহ পদার্থ এবং অপেক্ষাকৃত শক্ত তন্তুর জন্য বড় মাছ হজম করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। আজকাল শহরে সাধারণত বড় বড় মাছ বরফচাপা অবস্থায় চালান করা হয়। এই জন্য এই সকল মাছের খাদ্যমূল্যও কমিয়া যায়। কিন্তু ছোট ছোট মাছ সাধারণত স্থানীয় পুকুর ইত্যাদি হইতেই সংগ্রহ করিয়া টাট্‌কা অবস্থায় বিক্রি করা হয়। এই জন্য বড় মাছের তুলনায় ছোট মাছের খাদ্যমূল্য বেশী। ইলিশ, বড়-কৈ, মাগুর, বাইন, পাঙ্গাশ ইত্যাদি চর্বিবহুল মাছ। ইহাদের মধ্যে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' অধিক পরিমাণে থাকে।

দুগ্ধ—বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দুধ অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য। শরীর রক্ষার প্রায় সমস্ত উপাদানসমূহই ইহাতে পাওয়া যায়। যে সকল জন্তুর দুধ আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকি তাহার মধ্যে গরুর দুধই অধিক প্রচলিত। দুধের মধ্যে জলের পরিমাণই সর্বাপেক্ষা অধিক। টাট্‌কা গরুর দুধের বিভিন্ন উপাদানসমূহের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

জল	শতকরা	৮৭ ভাগ
প্রোটিন	"	৩·৫ "
স্নেহ	"	৩·৯ "
কার্বোহাইড্রেট ...	"	৪·৯ "
বিভিন্ন লবণ ...	"	০·৭ "
মোট		১০০ ভাগ

দুধের প্রোটিন অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ; ইহাতে দেহ গঠনের সকল অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহই উপযুক্ত অনুপাতে আছে। ক্যাসিন (Casein) এবং ল্যাক্টো অ্যালবুমেন (Lacto-albumen) এই দুইটিই দুধের প্রধান প্রোটিন। ইহাতে ল্যাক্টোজ (Lactose) নামক কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়। ইহাকে দুগ্ধ শর্করা বলে। আখের চিনি (Sugar) অপেক্ষা ইহার মিষ্টত্ব অনেক কম,

এই ল্যাক্টোজ হইতে অন্ত্রে অ্যাসিড উৎপন্ন হয় ; ফলে বিভিন্ন জীবাণুদ্বারা পেটে গ্যাস সৃষ্টি হইতে পারে না। ইহা ছাড়া খাদ্যের ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস-ঘটিত লবণ দেহের মধ্যে শোষিত হইতে ইহা সাহায্য করিয়া থাকে ; দুধের স্নেহ পদার্থ অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং অতিশয় সহজপাচ্য। ইহাতে অস্থি গঠনকারী ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস লবণ যথেষ্ট পরিমাণে এবং উপযুক্ত অনুপাতেই পাওয়া যায়। এই জন্য শিশুর খাদ্যে দুধের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দুধে ভাইটামিন 'এ' এবং 'বি' পাওয়া যায়। ভাইটামিন 'সি' এবং 'ডি'-এর পরিমাণ ইহাতে সামান্যই।
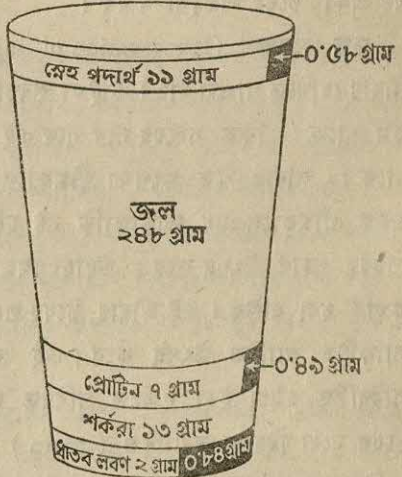
অতএব দেখা যাইতেছে যে শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপাদান খাদ্যে থাকা প্রায়োজন তাহার প্রায় সমস্তই দুধে উপযুক্ত অনুপাতে বিদ্যমান। এইজন্যই দুধ আমাদের **আদর্শ খাদ্য** (Ideal food) বলিয়া বিবেচিত হয়। দুধের বিভিন্ন উপাদানসমূহ প্রায় সমস্তই দেহ গ্রহণ করিয়া নিজের কাজে লাগাইতে পারে, ইহার অতি সামান্য অংশই নষ্ট হয়। এক গ্লাস দুধের বিভিন্ন উপাদানসমূহের পরিমাণ এবং তাহা হইতে দেহের গ্রহণোপযোগী অংশ উপরকার চিত্রে দেখানো হইল।

সাদা অংশের লেখা এক গ্লাস দুধের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে। ঐ সকল উপাদানের শতকরা যে পরিমাণ অংশ দেহ গ্রহণ করিতে পারে না তাহা কালো চিহ্নিত অংশদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। ঐ গ্লাসে দুধের পরিমাণ ২৮১ গ্রাম ধরা হইয়াছে।

বিভিন্ন ধাতব লবণের মধ্যে লৌহঘটিত লবণ অতি সামান্যই দুধে পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন লৌহঘটিত লবণের চাহিদা ইহার সাহায্যে পূরণ হয় না। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'সি'ও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এইজন্যই দুধ আদর্শ খাদ্য হইলেও **সম্পূর্ণ খাদ্য** (Complete food) নহে। গরুর দুধ শিশুর প্রধান খাদ্য হইলে উহার ভাইটামিন 'সি' এবং লৌহঘটিত লবণের অভাব টমেটো, সবুজ শাক-সবজি ইত্যাদি হইতে পূরণ করিতে হয়।

মহিষের দুধে প্রোটিনের পরিমাণ গরুর দুধ অপেক্ষা বেশী এবং স্নেহ পদার্থের পরিমাণ গরুর দুধের প্রায় দ্বিগুণ। এইজন্য মহিষের দুধ হজম করা কষ্টসাধ্য। ছাগল এবং ভেড়ার দুধেও প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের পরিমাণ গরুর দুধের তুলনায় বেশী। ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' ছাগল ও ভেড়ার দুধে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এইজন্যই গরুর দুধ অপেক্ষা এই প্রকার দুধের খাদ্যমূল্য অধিক।

দুগ্ধ সংরক্ষণ (Preservation of milk)—সকল প্রকার দুধেই অসংখ্য জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। টাট্‌কা অবস্থায় এই জীবাণুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জীবাণুর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আবার শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে এই বৃদ্ধি আরও দ্রুততর হয়। এই জন্যই গ্রীষ্মকালে দুধ তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়। জীবাণুসমূহ দুধে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়ার কথাই ধরা যাউক। এই জীবাণু দুধের ল্যাক্টোজ শর্করা (Lactose) হইতে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই অ্যাসিডে দুধের স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া ইহা দধিতে পরিণত হয়। আবার কোন কোন জীবাণু দুধের মধ্যে বিষাক্ত দ্রব্যাদিও (toxin) উৎপন্ন করিয়া থাকে। দুধের বাহিক অবস্থার হয়তো ইহাতে কোন পরিবর্তনই হয় না। কিন্তু এই বিষাক্ত দুধ পান করিলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং (১) দুধে অ্যাসিড উৎপাদন বন্ধ করিয়া উহার স্বাভাবিক অবস্থা অপরিবর্তিত রাখা এবং (২) ইহাতে বিষাক্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন বন্ধ করাই দুগ্ধ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত উপায়ে দুগ্ধ সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

(১) **শীতল কক্ষে রাখিয়া**—দুধের মধ্যস্থিত জীবাণুই যে দুধ নষ্ট হইবার প্রধান কারণ তাহা তোমরা উপরে লক্ষ্য করিয়াছ। আবার এই জীবাণু বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত উষ্ণতার প্রয়োজন। অধিকাংশ জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য ৩০°—৪০° সেঃ উষ্ণতা বিশেষ অনুকূল। ০° সেঃ এবং ইহারও কম উষ্ণতায় ইহাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং অতি মন্থর গতিতে চলিতে থাকে। ফলে ইহাদের কার্যক্ষমতাও কমিয়া যায়। সুতরাং টাট্‌কা দুধ রেফ্রিজারেটার বা ঐ জাতীয় কোন শীতল কক্ষে রাখিয়া অনেক সময় পর্যন্ত ভাল অবস্থায় রাখা যায়।

(২) **ফুটাইয়া**—এই পদ্ধতির মূল কথা হইতেছে দুধের জীবাণুসমূহ তাপের প্রভাবে ধ্বংস করিয়া ফেলা। একটি পরিষ্কার পাত্রে দুধ কিছুক্ষণ ধরিয়া

ভালভাবে ফুটাইতে হয়। ইহাতে অধিকাংশ জীবাণুই ধ্বংস হইয়া যায়। মুখ ভালভাবে বন্ধ করিয়া রাখিলে কিছু সময় পর্যন্ত এই ফুটন্ত দুধ অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে। গৃহে দুধ সংরক্ষণের জন্য সাধারণত এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হইয়া থাকে। তবে উত্তাপের ফলে সকল জীবাণুই ধ্বংস হয় না। যে সকল জীবাণু বাঁচিয়া থাকে তাহারা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টা পরে ইহাদের দ্বারা দুধ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। ফুটন্ত দুধ শীতলকক্ষে রাখিয়া অনেকদিন পর্যন্ত ভাল রাখা যায়।

(৩) **রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে**—দুধের সহিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়াও দুধ সংরক্ষিত করা যায়। যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি এই জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে বোরিক অ্যাসিড, বোরাক্স, ফরমালিন, হাইড্রোজেন পারক্সাইড, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, বেনজয়িক অ্যাসিড ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল দ্রব্যাদি সাধারণত দুইটি নীতিতে কাজ করিয়া থাকে--(ক) কিছু সংখ্যক জীবাণু ধ্বংস করে এবং অবশিষ্ট জীবাণুর বৃদ্ধি ব্যাহত করে ; (খ) জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন অ্যাসিড প্রশমিত করিয়া দুধ, দধি বা ছানায় পরিণত হওয়া বন্ধ করে।

বোরিক অ্যাসিড এবং বোরাক্স-এর মিশ্রণ 'Preservitas', 'glacialine' ইত্যাদি নামে বাজারে পাওয়া যায়। এই সকল মিশ্রণে শতকরা ১০ হইতে ২০ ভাগ বোরাক্স এবং ৭০ হইতে ৮০ ভাগ বোরিক অ্যাসিড থাকে। এক হাজার ভাগ দুধে এক ভাগ এই মিশ্রণ দ্রবীভূত করিলে কয়েকদিন পর্যন্ত দুধ অবিকৃত থাকিবে। ফরম্যালিন দুধ সংরক্ষণে অধিকতর উপযোগী। ৬০ ভাগ জলে ৪০ ভাগ ফরম্যালডিহাইড মিশ্রিত করিলে ফরম্যালিন প্রস্তুত হয়। ইহা বাজারে 'Iceline', 'Freezine', 'Steryl' ইত্যাদি নামে কিনিতে পাওয়া যায়। ফরম্যালিন এবং সোডিয়াম নাইট্রাইটএর মিশ্রণও 'Mystin' নামে এই কাজে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সোডিয়াম নাইট্রাইটের জন্য দুধের সহিত মিশ্রিত ফরম্যালিন রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা যায় না। কুড়ি হাজার ভাগ দুধে এক ভাগ ফরম্যালিন মিশ্রিত করিলে কয়েকদিন পর্যন্ত দুধ ভাল অবস্থায় থাকিবে। এই সামান্য ফরম্যালিন স্বাস্থ্যের পক্ষেও তেমন ক্ষতিকর নয়। সকল রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে হাইড্রোজেন পারক্সাইডই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। দুধের মধ্যে মিশ্রিত হাইড্রোজেন পারক্সাইড ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাঙ্গিয়া জল এবং

অক্‌সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়। সুতরাং ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর নয়।

রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে দুধ সংরক্ষণ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কারণ, মিশ্রিত রাসায়নিক দ্রব্যটি নিজেই বিষাক্ত হইতে পারে (ফরম্যালিন একটি বিষাক্ত দ্রব্য)। তাহা ছাড়া পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এইজন্য আজকাল অনেক দেশেই আইনের সাহায্যে দুধের সহিত এই সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রণ বন্ধ করা হইয়াছে।

(৪) **পাস্তুরাইজেশন**—বিজ্ঞানী পাস্তুরের পদ্ধতিতে দুগ্ধ সংরক্ষণই সর্বাপেক্ষা আধুনিক পদ্ধতি। ইহাকে পাস্তুরাইজেসন বলে। ইহাতে দুধের শতকরা ৯৮ হইতে ৯৯ ভাগ জীবাণুই ধ্বংস হইয়া যায়। ল্যাকটিক অ্যাসিডে জীবাণু বিনাশ হইবার ফলে দুধে অ্যাসিড উৎপন্ন হইতে পারে না এবং অনেক সময় পর্যন্ত দুধ অবিকৃত থাকে। ইহা ছাড়া রোগ জীবাণুসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়ায় এই প্রকার দুধ স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ। [বিশদ বিবরণের জন্য একাদশ শ্রেণীর 'খাদ্য সংরক্ষণ' প্রণালী দেখ।]

মাখন (Butter)—দুধের স্নেহ পদার্থের সাহায্যেই মাখন প্রস্তুত হয়। ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয়। এইজন্য দুধের এই সকল ভাইটামিনসমূহ মাখনে পাওয়া যায়। তথাপি দুধের ন্যায় মাখনেও ভাইটামিন 'ডি'-এর পরিমাণ অল্প। অন্যান্য ভাইটামিনসমূহ ইহাতে দেখা যায় না। মাখনের বিশেষত্ব এই যে, সকল প্রকার স্নেহ পদার্থের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য

ঘি (Ghee)—মাখনের জলীয় অংশ বিতাড়িত করিয়া ঘি প্রস্তুত করা হয়। এইজন্য মাখন অপেক্ষা ঘি অধিক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। খোলা পাত্রে এবং বাতাসের সংস্পর্শে অধিকক্ষণ উত্তপ্ত করিলে মাখনের ভাইটামিন 'এ' অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য ঘি প্রস্তুত করিবার সময় যথাসম্ভব ঢাকিয়া প্রস্তুত করা উচিত।

মাখন বা ননী তুলিয়া লইবার পর যে দুধ পড়িয়া থাকে তাহাকে skimmed milk বলে। এই দুধে প্রোটিন, বিভিন্ন ধাতব লবণ, ভাইটামিন 'বি' এবং সামান্য ভাইটামিন 'এ' পাওয়া যায়। সুতরাং দেহের পুষ্টির জন্য এই দুধের গুরুত্ব যথেষ্ট।

দুধ হইতে **দধি** প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে দুধের সমস্ত প্রোটিনই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং দধিও একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

বিভিন্ন প্রকারের বাদাম (Nuts)—সকল প্রকার বাদামেই প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। এক আউন্স ডিমের তুলনায় এক আউন্স বাদামে অনেক বেশী প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিন খাদ্য-শস্য (Cereals) এবং ডালের (Pulses) প্রোটিন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। স্নেহ পদার্থ এবং ভাইটামিন 'বি' যথেষ্ট পরিমাণে বাদামে পাওয়া যায়। ইহাতে সামান্য ভাইটামিন 'এ' আছে।

শাক-সবজি (Leafy Vegetables)—বিভিন্ন প্রকার তরি-তরকারির মধ্যে বাঁধাকপি, শালং পাক, কলমী শাক, নটে শাক, লাউ শাক, কুমড়া শাক ইত্যাদি শাক-সবজি জাতীয়। এই সকল সবজির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জল। তাহা হইলেও খাদ্য হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব কম নহে। ইহাদের সবুজ অংশে ক্যারটিন (Carotine) নামে এক প্রকার পদার্থ থাকে। এই ক্যারটিন হইতে আমাদের দেহে ভাইটামিন 'এ' উৎপন্ন হয়। এইজন্য এই শ্রেণীর খাদ্য ভাইটামিন 'এ'-র একটি বড় উৎস। ভাইটামিন 'বি' এবং 'সি'ও এই সকল খাদ্যদ্রব্যে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের ধাতব লবণ সবুজ শাক-সবজিতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এই সকল ধাতব লবণ রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিয়া শরীর সুস্থ রাখে। প্রোটিনের পরিমাণ শাক-সবজিতে কম হইলেও এই প্রোটিন শরীরকে খাদ্য-শস্যের নিকৃষ্ট প্রোটিন গ্রহণে সহায়তা করে। সেল্যুলোজ নামক এক প্রকার দুষ্পাচ্য কার্বোহাইড্রেট শাক-সবজির একটি উপাদান। ইহা আমরা জীর্ণ করিতে পারি না। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে এই সেল্যুলোজ আমাদের দেহের কোন উপকারে আসে না। কিন্তু পরোক্ষভাবে ইহা আমাদের অন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেহকে সুস্থ রাখে। খাদ্যে শাক-সবজির এই সেল্যুলোজ কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করে।

কন্দ জাতীয় তরকারি (Tuber and Root Vegetables)—এই জাতীয় তরকারি সাধারণত মাটির নীচে উৎপন্ন হয়। আলু, মূলা, পেঁয়াজ, কচু, ওল, গাজর ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে আলু প্রধানত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। পেঁয়াজ এবং গাজরে সামান্য পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট আছে। এই শ্রেণীর খাদ্যে প্রোটিনও পাওয়া যায়, কিন্তু এই প্রোটিন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়। খাদ্যশস্য (Cereals) হইতে ইহাতে ভাইটামিন 'বি'-এর পরিমাণ কম থাকে।

গাজর এবং রাঙ্গা আলু বাদ দিলে এই শ্রেণীর খাদ্যে ভাইটামিন 'এ'র পরিমাণও সামান্যই। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ ধাতব লবণ এবং সামান্য ভাইটামিন 'সি' পাওয়া যায়।

ফল (Fruits)—কলা, পেঁপে, টমেটো, লাউ, কাঁচকলা, বেগুন, পটল ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ধাতব লবণ পাওয়া যায়। এইজন্য সবুজ শাক-সবজির ন্যায় ইহাও রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখিয়া শরীর সুস্থ রাখিতে সহায়তা করে। এই শ্রেণীর খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। টমেটো ভাইটামিন 'এ', 'বি' এবং 'সি'এর একটি প্রধান উৎস। এইজন্য ইহা বেরিবেরি এবং স্কার্ভি রোগের প্রতিষেধক। রান্না করিবার সময় ভাইটামিন 'সি' অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য টমেটো কাঁচা খাওয়াই ভাল। কলাও একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। ভাইটামিন ছাড়াও ইহাতে শ্বেতসার এবং শর্করা জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে।

চা এবং কফি (Tea and Coffee)—এক কাপ চা বা এক কাপ কফি আমাদের কাজে প্রচুর উৎসাহ দান করে। চা এবং কফির মধ্যে ক্যাফিন (Caffeine) নামে যে পদার্থ আছে তাহাই এই উৎসাহের কারণ। দুধ এবং চিনি বাদ দিলে চা এবং কফির কোন খাদ্যমূল্য নাই। সাধারণত উদ্দীপক হিসাবে ইহা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সামান্য পরিমাণ চা অথবা কফি কাজে উৎসাহ জোগাইবার পক্ষে ভালই, কিন্তু অত্যধিক চা বা কফি শরীরের পক্ষে বিষের তুল্য ; ইহাতে (১) স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) উত্তেজিত হয়, (২) ক্ষুধামান্দ্য ঘটে এবং (৩) রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

কোকো (Cocoa)—চা এবং কফির ন্যায় ইহাও একটি উদ্দীপক পদার্থ। চা এবং কফিতে যেমন ক্যাফিন, এই কোকোতে তেমনি থিয়োব্রোমিন (Theobromine) নামে একটি উদ্দীপক পদার্থ আছে। ইহা ছাড়া কোকোতে অল্প পরিমাণ স্নেহ পদার্থ, প্রোটিন এবং শ্বেতসার পদার্থও থাকে। এইজন্যই কোকো শুধু উদ্দীপকই নয় ইহাকে একটি খাদ্য হিসাবেও গণ্য করা যাইতে পারে।

অ্যাসিড ও ক্ষারধর্মী খাদ্য—তোমরা ধাতব লবণ পড়িবার সময় লক্ষ্য করিয়াছ যে লবণের গন্ধক, ক্লোরিন, ফস্ফরাস ইত্যাদি হইতে আমাদের শরীরে অম্ল বা অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। গন্ধক, ক্লোরিন, ফস্ফরাস ইত্যাদি মাছ,

মাংস, ডিম, ভাত, ডাল, আটা, রুটি ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে থাকে। সুতরাং এই সকল খাদ্য আমাদের শরীরে অ্যাসিড সৃষ্টি করে। এইজন্য এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্যকে **অ্যাসিড উৎপন্নকারী খাদ্য** (Acidic foods) বলা যাইতে পারে। দেহে অ্যাসিড উৎপন্নকারী খাদ্যের আধিক্য ঘটিলে রক্ত দূষিত হয় এবং পরিশেষে **অ্যাসিডোসিস** (Acidosis) নামক রোগের সৃষ্টি হয়।

অপর পক্ষে যে সকল লবণে সোডিয়াম (Sodium), পটাসিয়াম (Potassium), ক্যালসিয়াম (Calcium), ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium), লৌহ (Iron) ইত্যাদি থাকে তাহারা ক্ষারধর্মী (alkaline), অর্থাৎ তাহারা শরীরে ক্ষার (alkali) উৎপন্ন করে। বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, ফলমূল, যথা—পালং শাক, লেটুস শাক, টমেটো, কমলালেবু, কলা, পটল ইত্যাদিতে এই শ্রেণীর ক্ষার উৎপন্নকারী লবণ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় খাদ্যে আমাদের দেহে ক্ষার উৎপন্ন হয়। এইজন্য এই প্রকার খাদ্যকে **ক্ষার উৎপন্নকারী খাদ্য** (alkaline foods) বলে।

মাছ, মাংস ইত্যাদির সহিত প্রচুর পরিমাণে তরি-তরকারি, ফল-মূল, শাক-সবজি ইত্যাদি খাইলে মাছ, মাংস ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন অ্যাসিড ফলমূল, শাক-সবজি ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন ক্ষারধর্মী লবণের দ্বারা সহজেই প্রশমিত হইতে পারে। ফলে দেহে অধিক অ্যাসিড সৃষ্টি হইয়া অ্যাসিডোসিস রোগ হইতে পারে না। **এইজন্যই মাছ, মাংস, ভাত, রুটি ইত্যাদির সহিত শাক-সবজি, ফলমূল খাইবার রীতি প্রচলিত আছে।**

খাদ্য-মূল্য হিসাবে কয়েকটি খাদ্যের তুলনামূলক আলোচনা

	ডিম	শাক-সব্জি	ভাত	দুধ	মাছ
প্রোটিন	প্রোটিনের অংশই প্রধান। প্রথম ও অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন আছে।	সামান্য পরিমাণ প্রোটিন আছে।	সামান্য পরিমাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন আছে।	অতি উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়	অতি উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন আছে।
কার্বোহাইড্রেট	কার্বোহাইড্রেট নাই।	প্রধান কার্বোহাইড্রেট সেলুলোজ। ইহা কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করে।	প্রধানত কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। ইহার কার্বোহাইড্রেট স্টার্চ।	ইহাতে ল্যাক্টোজ কার্বোহাইড্রেট আছে।	কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অতি সামান্য।
স্নেহ পদার্থ	স্নেহ পদার্থের পরিমাণ মন্দ নয়।	স্নেহ পদার্থ নাই।	স্নেহ পদার্থের পরিমাণ অতি সামান্য।	স্নেহ পদার্থের পরিমাণ মন্দ নয়।	কোন কোন মাছে স্নেহের পরিমাণ কম। আবার কোন কোন মাছে (ইলিশ মাছ) যথেষ্ট স্নেহ পদার্থ আছে।
ভাইটামিন	ভাইটামিন 'সি' ব্যতীত অন্যান্য সকল ভাইটামিনই ডিমে পাওয়া যায়। ভাইটামিন 'এ', 'বি' ও 'ডি'এর ইহা একটি উৎকৃষ্ট উৎস।	ভাইটামিন 'এ' ইহাতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। শাক-সব্জির সবুজ অংশের ক্যারটিন হইতেই দেহে এই ভাইটামিন প্রস্তুত হয়। ভাইটামিন 'বি' ও 'সি' থাকে।	ভাইটামিনের পরিমাণ কম। ঢেঁকি ছাটা চাউলে 'বি' ভাইটামিন প্রধানত পাওয়া যায়।	ভাইটামিন 'এ' ও 'বি'এর ভাল উৎস। 'সি' ও 'ডি' অল্প পরিমাণে থাকে।	ভাইটামিন 'সি' বাদে অন্যান্য সকল ভাইটামিনই কিছু কিছু আছে। তৈল-জাতীয় মাছে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' প্রচুর পরিমাণে থাকে।
ধাতব লবণ	ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস ও লৌহ ঘটিত লবণ ডিমে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।	ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফস্ফরাস, তাম্র ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতব লবণ শাক-সব্জিতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।	লৌহ ঘটিত ধাতব লবণই ইহাতে অধিক পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস ইত্যাদির পরিমাণ সামান্য।	ক্যালসিয়াম ও ফস্ফরাস ঘটিত ধাতব লবণ দুধে প্রচুর পরিমাণে এবং অস্থি গঠনের উপযুক্ত অনুপাতেই আছে।	বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণ মাছে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস, আয়োডিন ও তাম্র-ঘটিত লবণই প্রধান।

খাদ্যের তাপমূল্য (Calorie Value of food)

খাদ্যের একটি প্রধান কাজ আমাদের দেহে প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ এবং প্রোটিনই আমাদের শরীরে তাপ ও শক্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে। খাদ্যের তাপ ও শক্তি পরিমাপ করিবার জন্য যে একক ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাকে ক্যালোরী (Calorie) বলে। **এক কিলোগ্রাম** (বা ১০০০ গ্রাম) জলের এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে এক ক্যালোরী বলে। পদার্থবিদ্যায়ও তাপের একক হিসাবে ক্যালোরী ব্যবহার করা হয়। এই ক্যালোরী খাদ্যের পরিমাপে ব্যবহৃত ক্যালোরী হইতে স্বতন্ত্র। **এক গ্রাম** জলের এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের প্রয়োজন হয় তাহাই পদার্থবিদ্যায় এক ক্যালোরী হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং খাদ্যে ব্যবহৃত ক্যালোরী পদার্থবিদ্যার ক্যালোরী হইতে ১০০০ গুণ বড়।

আমাদের দেহে ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হইতে ৪ ক্যালোরী, ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ হইতে ৯ ক্যালোরী এবং ১ গ্রাম প্রোটিন হইতে ৪ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন হয়।

খাদ্যের তাপমূল্য নির্ণয়—খাদ্যের তাপমূল্য নির্ণয় করিতে হইলে খাদ্যের কোন্ কোন্ উপাদানের তাপমূল্য বা ক্যালোরী মূল্য আছে এবং কোন্ কোন্ উপাদানের ক্যালোরী মূল্য নাই তাহা আগে জানা প্রয়োজন। খাদ্যের উপাদানগুলিকে আমরা পূর্বে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি (১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ) এই সকল উপাদানের মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ উপাদানেরই ক্যালোরীমূল্য আছে। অর্থাৎ এই সকল উপাদানই আমাদের দেহে তাপশক্তি বা ক্যালোরী জোগাইতে পারে। খাদ্যের অপর দুইটি উপাদানের অর্থাৎ ভাইটামিন ও ধাতব লবণের কোন ক্যালোরী মূল্য নাই। অতএব ভাইটামিন ও ধাতব লবণ আমাদের দেহে তাপশক্তি বা ক্যালোরী উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং শুধু ভাইটামিন বা ধাতব লবণসম্পন্ন খাদ্যের ক্যালোরী মূল্য কিছুই নাই।

আমরা যে খাদ্যদ্রব্য খাই তাহার অধিকাংশই মিশ্র-জাতীয় অর্থাৎ ঐ সকল খাদ্যে ঐ পাঁচটি উপাদানের একের বেশী উপাদান থাকে। দুধের কথাই ধরা যাউক। দুধে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ, ভাইটামিন, ধাতব লবণ ইত্যাদি

পাঁচটি উপাদানই আছে। কলা একটি ফল। কিন্তু ইহাতেও ঐ পাঁচটি উপাদান পাওয়া যায়। কলা প্রভৃতি ফলে ভাইটামিন ও ধাতব লবণই বেশী থাকে। কিন্তু প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ উপাদানও অনেক ফলেই কম বেশী পাওয়া যায়। ভাইটামিন ও ধাতব লবণের কোন ক্যালোরীমূল্য নাই, সুতরাং কলা বা অন্যান্য ফলের ক্যালোরীমূল্য খুবই সামান্য এবং ঐ সামান্য ক্যালোরী মূল্য উহার প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ উপাদানের জন্যই। এইরূপে রুটি, চা, ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, তরিতরকারি ইত্যাদি সমস্তই মিশ্র জাতীয় খাদ্য। তবে এমন খাদ্যও আছে যাহাতে কেবলমাত্র একটি উপাদানই পাওয়া যায়। এই জাতীয় খাদ্যকে আমরা বিশুদ্ধ খাদ্য বলিতে পারি। চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি বিশুদ্ধ খাদ্য। কারণ ইহাতে কার্বোহাইড্রেট ছাড়া খাদ্যের অন্য কোন উপাদান নাই। তেমনি সর্ষের তেলও একটি বিশুদ্ধ খাদ্য, কারণ উহাতে স্নেহ উপাদান ছাড়া কিছুই থাকে না। কিন্তু কড্‌লিভার অয়েল বা শার্ক লিভার অয়েল ইত্যাদি প্রাণিজ তেলে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকে। সুতরাং এই সকল প্রাণিজ তেল মিশ্র খাদ্যের অন্তর্গত। **সুতরাং উপাদানের সংখ্যা অনুযায়ী আমরা খাদ্যদ্রব্যসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—(১) মিশ্র খাদ্য (২) বিশুদ্ধ খাদ্য।**

তবে একটি কথা মনে রাখিবে যে একেবারে বিশুদ্ধ খাদ্যের সংখ্যা খুবই নগণ্য, অধিকাংশ খাদ্যই মিশ্র খাদ্যের অন্তর্গত।

মনে কর, একটি খাদ্যের তাপমূল্য বা ক্যালোরীমূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। প্রথমেই লক্ষ্য করিবে খাদ্যটি মিশ্র না বিশুদ্ধ জাতীয়। যদি বিশুদ্ধ খাদ্য হয় তবে খাদ্যের কোন্ উপাদানটি উহাতে আছে? ভাইটামিন অথবা ধাতব লবণ থাকিলে ঐ খাদ্যের ক্যালোরীমূল্য শূন্য হইবে, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভাইটামিন ও ধাতব লবণ এই দুইটি উপাদানের কোন ক্যালোরী মূল্য নাই। অপর তিনটি উপাদানের যে কোন একটি থাকিলেই আর ক্যালোরী মূল্য শূন্য হইবে না। তখন ঐ খাদ্যের প্রকৃতি ও ওজন অনুযায়ী উহার ক্যালোরী মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ চিনির কথাই ধরা যাউক। মনে কর, ১০ গ্রাম চিনির ক্যালোরীমূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। চিনি একটি বিশুদ্ধ খাদ্য। উহাতে, কার্বোহাইড্রেট ছাড়া আর কোন উপাদানই নাই। পূর্বেই বলিয়াছি ১ গ্রাম যে কোন কার্বোহাইড্রেটের তাপমূল্য বা ক্যালোরী মূল্য ৪ ক্যালোরী। সুতরাং ১০ গ্রাম চিনির তাপমূল্য বা ক্যালোরীমূল্য ৪ × ১০ ক্যালোরী বা ৪০

ক্যালোরী। অর্থাৎ আমরা যদি ১০ গ্রাম চিনি খাই তবে উহা আমাদের দেহে ৪০ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন করিবে।

আরও একটি উদাহরণ ধরা যাউক। মনে কর, একটি মাছ ১০ গ্রাম সরিষার তেলে ভাজিয়া রান্না করা হইয়াছে। তাহা হইলে ঐ ১০ গ্রাম তেলের তাপমূল্য কত? অর্থাৎ ঐ মাছ ভাজা খাইলে ঐ ১০ গ্রাম তেল হইতে আমাদের দেহে কত ক্যালোরী মূল্যের তাপ উৎপন্ন হইবে? মনে কর, ঐ তেল সমস্তটাই ভাজার কাজে লাগিয়াছে এবং তেলের কোন রকম অপচয় হয় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১ গ্রাম স্নেহ বা তেল জাতীয় খাদ্য হইতে ৯ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ১০ গ্রাম তেল হইতে ১০ × ৯ = ৯০ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন হইবে। অর্থাৎ ঐ মাছ ভাজা খাইলে মাছের মধ্যের ঐ ১০ গ্রাম তেল হইতেই দেহে ৯০ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন হইবে।

কিন্তু অধিকাংশ খাদ্যই মিশ্রজাতীয়। এই সকল খাদ্যের ক্যালোরী মূল্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে উহাতে কি কি উপাদান কতটুকু পরিমাণে আছে তাহা জানা প্রয়োজন। অবশ্য ভাইটামিন ও ধাতব লবণের পরিমাণ জানিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ উহার ক্যালোরী মূল্য শূন্য। কেবলমাত্র প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ এই তিনটি উপাদান আছে কিনা এবং থাকিলে কোন্‌টি কতটুকু পরিমাণে আছে তাহা জানিতে হইবে। এইজন্য খাদ্যের উপাদান মুখস্থ রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। খাদ্যমূল্য-তালিকায় (Food value chart) ঐ সকল মিশ্র খাদ্যের কোন্‌টিতে কি কি উপাদান কতটুকু পরিমাণে আছে তাহা দেওয়া হইয়াছে (বইএর শেষে দেখ)। কোন একটি খাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ জানিতে হইলে ঐ খাদ্যমূল্য-তালিকা দেখিয়াই নির্ণয় করা যায়।

মনে কর, এক আউন্স পাঁউরুটির তাপমূল্য বা ক্যালোরীমূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। প্রথমেই পাঁউরুটিতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ উপাদানের কোন্‌গুলি আছে এবং কি পরিমাণে আছে তাহা ঐ চার্ট বা তালিকা দেখিয়া নির্ণয় কর। ঐ তালিকা হইতে দেখা যায় যে এক আউন্স রুটিতে ১১·২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ০·৬ গ্রাম স্নেহ এবং ৩·১ গ্রাম প্রোটিন আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হইতে ৪ ক্যালোরী তাপ, ১ গ্রাম প্রোটিন হইতে ৪ ক্যালোরী তাপ এবং ১ গ্রাম স্নেহ হইতে ৯ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন হয়। **সুতরাং ১ আউন্স রুটির ক্যালোরী মূল্য—**

১১·২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের জন্য	= ১১·২ × ৪ = ৪৪·৮ ক্যালোরী
০·৬ গ্রাম স্নেহের জন্য—	০·৬ × ৯ = ৫·৪ ক্যালোরী
৩·১ গ্রাম প্রোটিনের জন্য—	৩·১ × ৪ = ১২·৪ ক্যালোরী
মোট ক্যালোরীর পরিমাণ	= ৬২·৬ ক্যালোরী

যদি প্রত্যহ কেহ ১০ আউন্স রুটি খায় তবে ঐ ১০ আউন্স রুটির তাপমূল্য বা ক্যালোরীমূল্য হইবে ৬২·৬ × ১০ = ৬২৬ ক্যালোরী। অর্থাৎ একজন লোক প্রতিদিন ১০ আউন্স রুটি খাইলে ঐ রুটি হইতে তাহার দেহে ৬২৬ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন হইবে। **এইরূপে যে কোনও খাদ্যের ওজন জানা থাকিলে খাদ্য-মূল্য-তালিকার সাহায্যে ঐ ওজনের খাদ্যের ক্যালোরীমূল্য নির্ণয় করা যায়।**

কিন্তু কখনও কখনও নির্দিষ্ট ওজনের খাদ্যের পরিবর্তে একটি গোটা খাদ্যের ক্যালোরী মূল্য নির্ণয় করিতে হয়। যেমন, একটি কলার ক্যালোরী মূল্য, এক কাপ দুধের বা এক কাপ চায়ের ক্যালোরী মূল্য, একটি আপেল ও একটি কমলালেবুর ক্যালোরী মূল্য ইত্যাদি। মনে কর, একটি কলার ক্যালোরী মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। এই ক্যালোরী মূল্যের জন্য ঐ কলার প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহের পরিমাণ জানা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কোন খাদ্যের উপাদানের পরিমাণ জানিতে হইলে খাদ্য-মূল্য-তালিকার সাহায্য লইতে হইবে। **খাদ্য-মূল্য তালিকায় ওজনের ভিত্তিতে সকল খাদ্যের উপাদানের পরিমাণ দেওয়া আছে। কিন্তু গোটা খাদ্যের উপাদান দেওয়া হয় নাই।** অর্থাৎ একটি কলা, এক কাপ চা, একটি আপেল, একটি ডিম ইত্যাদি গোটা খাদ্যের ওজন বা উপাদানের পরিমাণ খাদ্যমূল্য তালিকা হইতে জানা যায় না। অতএব প্রথমে এই সকল গোটা খাদ্যের ওজন জানিয়া পরে ঐ তালিকার সাহায্যে ঐ সকল খাদ্যের উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। এখন এই সকল গোটা খাদ্যের ওজন আবার উহাদের আকৃতি এবং আয়তনের উপর নির্ভর করে। যেমন বড় কলা, আপেল বা ডিমের বেশী ওজন এবং ছোট কলা, আপেল বা ডিমের কম ওজন হইবে। তেমনি এক কাপ দুধ বা চায়ের ওজন ঐ কাপের আয়তনের উপর নির্ভর করে। এইজন্য এই সকল গোটা খাদ্যের একটা গড়-পড়তা ওজন—প্রমাণ ওজন (standard weight) হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়। যেমন একটি কলার (ছোট) প্রমাণ ওজন ১০০ গ্রাম ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং কলা বলিলেই সাধারণত উহার ওজন ১০০ গ্রাম ধরিয়া লইতে হইবে, এখন এই ওজন হইতে অনায়াসেই খাদ্যমূল্য তালিকার সাহায্যে উহার উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। ঐ তালিকা হইতে দেখা যায় যে

১০০ গ্রাম কলায় ১'৩ গ্রাম প্রোটিন, ০'২ গ্রাম স্নেহ পদার্থ এবং ৩৬'৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে। **অতএব ১টি কলার তাপমূল্য :—**

১'৩ গ্রাম প্রোটিনের জন্য— ১'৩ × ৪ = ৫'২ ক্যালোরী
০'২ গ্রাম স্নেহ পদার্থের জন্য—০'২ × ৯ = ১'৮ ক্যালোরী
৩৬'৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের জন্য—৩৬'৪ × ৪ = ১৪৫'৬ ক্যালোরী

মোট তাপমূল্য = ১৫২ ৬ ক্যালোরী

এক কাপ দুধ বা চায়ের প্রমাণ ওজন ২৪০ গ্রাম ধরা হয়। অর্থাৎ এক কাপ দুধ বা চা বলিলেই উহার ওজন এই ২৪০ গ্রাম ধরিতে হইবে। এখন খাদ্য-মূল্য-তালিকা হইতে এই ওজনের দুধ বা চায়ে কি কি উপাদান কতটুকু পরিমাণে আছে তাহা নির্ণয় করা যায়। মনে কর, এক কাপ চায়ের ক্যালোরী মূল্য বাহির করিতে হইবে। খাদ্য-মূল্য-তালিকা হইতে দেখা যায় ২৪০ গ্রাম চায়ের মধ্যে ০'৮ গ্রাম প্রোটিন, ০'৮ গ্রাম স্নেহ পদার্থ এবং ৬'৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে (বইর শেষে Food Value Chart দেখ)।

অতএব ১ কাপ চায়ের তাপমূল্য—

০'৮ গ্রাম প্রোটিনের জন্য— ০'৮ × ৪ = ৩'২ ক্যালোরী
০'৮ গ্রাম স্নেহের জন্য— ০৮ × ৯ = ৭'২ ক্যালোরী
৬'৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের জন্য ৬'৮ × ৪ = ২৭'২ ক্যালোরী

মোট তাপমূল্য = ৩৭'৬ ক্যালোরী

এইরূপে গোটা খাদ্যের প্রমাণ ওজন জানা থাকিলে খাদ্যমূল্য তালিকার সাহায্যে উহার ক্যালোরীর মূল্য নির্ণয় করা যায়। নিম্নে কয়েকটি গোটা খাদ্যের প্রমাণ ওজন দেওয়া হইল।

১ কাপ দুধ—	২৪০ গ্রাম	১ চামচ (চায়ের) মাখন	৫ গ্রাম
১ কাপ চা—	২৪০ "	১ টি আপেল (মাঝারি)	১০০ "
১টি ডিম—	৫০ "	১ টি কলা (ছোট)	১০০ "
১ খণ্ড রুটি —	২৫ "	১ টি কমলালেবু (ছোট)	১০০ "
১ টি আলু (মাঝারী)—	১৫০ "	১ টি টমেটো (ছোট)	১০০ "

উপরোক্ত পদ্ধতিতে আমরা যে-কোন খাদ্যের ক্যালোরী-মূল্য বা তাপ মূল্য নির্ণয় করিতে পারি। মনে রাখিবে কোন খাদ্যের তাপ মূল্য বা ক্যালোরী মূল্য নির্ণয়ের জন্য (১) প্রথমে খাদ্যের ওজন জানা

প্রয়োজন ; (২) ঐ ওজন হইতে খাদ্যমূল্য তালিকার (Food value chart) সাহায্যে উহার প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয় ; (৩) শেষে ঐ প্রোটিনের ওজনকে ৪ দ্বারা, কার্বোহাইড্রেটের ওজনকে ৪ দ্বারা এবং স্নেহের ওজনকে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া সমস্ত গুণফল যোগ করিলেই ঐ খাদ্যের ক্যালোরী-মূল্য বাহির হয়।

খাদ্যের ভাইটামিন ও ধাতব লবণের কোন ক্যালোরী মূল্য নাই।

এখন আমরা অনায়াসেই কোনও ব্যক্তির দুপুরের এবং রাত্রের খাবারের বা সকাল ও বিকালের জলখাবারের তাপমূল্য বা ক্যালোরী মূল্য নির্ণয় করিতে পারি। কোনও এক বেলার খাবারে সাধারণত একাধিক বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য থাকে। এই সকল খাদ্যের ক্যালোরী-মূল্য পূর্বোক্ত প্রণালীতে নির্ণয় করিয়া যোগ করিলেই ঐ বেলার খাবারের মোট ক্যালোরী-মূল্য বাহির হইবে। মনে কর, একটি লোক সকালের জলখাবার ২ খণ্ড পাঁউরুটি, ১টি অর্ধসিদ্ধ মুর্গীর ডিম, ১টি কলা, ও ১ কাপ চা দ্বারা সম্পন্ন করিল। এই জলখাবারের ক্যালোরী-মূল্য নিম্নলিখিত রূপে নির্ণয় করা যায়।

দুইখণ্ড পাঁউরুটির তাপমূল্য নির্ণয় :—

দুইখণ্ড পাঁউরুটির মোট ওজন—২৫×২=৫০ গ্রাম। কারণ একখণ্ড পাঁউরুটির প্রমাণ ওজন ২৫ গ্রাম। খাদ্য-মূল্য-তালিকা হইতে দেখা যায় যে এই ৫০ গ্রাম রুটিতে ৪·০২ গ্রাম প্রোটিন, ০·৩৫ গ্রাম স্নেহ এবং ২৬·২৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে। (Food Value Chart দেখ)। অতএব ২ খণ্ড পাঁউরুটির তাপ মূল্য :—

৪·০২ গ্রাম প্রোটিনের জন্য—	৪·০২×৪= ১৬·০৮ ক্যালোরী
০·৩৫ গ্রাম স্নেহের জন্য—	০·৩৫×৯= ৩·১৫ ক্যালোরী
২৬·২৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের জন্য—	২৬·২৫×৪=১০৫·০০ কালোরী
	মোট তাপমূল্য=১২৪·২৩ ক্যালোরী

একটি মুর্গীর ডিমের তাপমূল্য নির্ণয় :—

একটি মুর্গীর ডিমের প্রমাণ ওজন ৫০ গ্রাম। খাদ্যমূল্য তালিকা হইতে দেখা যায় যে এই ৫০ গ্রাম ডিমে ৬·৬৫ গ্রাম প্রোটিন, ৬·৬৫ গ্রাম স্নেহ পদার্থ

আছে। (ডিমের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট নাই)। **অতএব ১টি ডিমের তাপমূল্য—**

৬'৬৫ গ্রাম প্রোটিনের জন্য—৬'৬৫ × ৪ = ২৬'৬ ক্যালোরী

৬'৬৫ গ্রাম স্নেহের জন্য— ৬'৬৫ × ৯ = ৫৯'৮৫ ক্যালোরী

মোট তাপ-মূল্য = ৮৬'৪৫ ক্যালোরী

একটি কলা ও এক কাপ চায়ের তাপ-মূল্য যথাক্রমে ১৫২'৬ ক্যালোরী ও ৩৭'৬ ক্যালোরী (পূর্বেই নির্ণয় করা হইয়াছে)।

অতএব দুইখণ্ড পাঁউরুটি, ১টি মুর্গীর ডিম, ১টি কলা ও ১ কাপ চায়ের দ্বারা প্রস্তুত জলখাবারে মোট তাপমূল্য :—

দুইখণ্ড পাঁউরুটির জন্য	১২৪'২৩ ক্যালোরী
১টি মুর্গীর ডিমের জন্য	৮৬'৪৫ "
১টি কলার জন্য	১৫২'৬০ "
১ কাপ চায়ের জন্য	৩৭'৬০ "

সর্বমোট তাপমূল্য = ৪০০'৮৮ ক্যালোরী

বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষের দৈনন্দিন খাদ্যের প্রয়োজনীয় তাপমূল্য—

পুরুষের ক্যালোরীর পরিমাণ—কোনও এক ব্যক্তির দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরীর পরিমাণ নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

(১) **দেহের ওজন**—দেহের ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে যাহার ওজন বেশী তাহার অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ক্যালোরীমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন হইবে।

(২) **দেহের ক্ষেত্রফল**—কোনও ব্যক্তির দেহের ক্ষেত্রফল উহার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। দেহের ক্ষেত্রফল বা দৈর্ঘ্য বেশী হইলে ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়, কারণ তখন দেহ হইতে তাপ অপসারণের হারও বাড়িয়া যায়। কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে যাহার দেহের ক্ষেত্রফল বা দৈর্ঘ্য বেশী তাহার অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ক্যালোরী মূল্যের খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

(৩) **শারীরিক পরিশ্রম**—শারীরিক পরিশ্রমের উপর দৈনিক ক্যালোরীর পরিমাণ বিশেষভাবে নির্ভর করে। একজন অত্যধিক পরিশ্রমী কাঠুরিয়ার

দৈনিক ক্যালোরীর পরিমাণ একজন কেরাণী অপেক্ষা অনেক বেশী। শারীরিক পরিশ্রম বৃদ্ধি পাইলে ক্যালোরীর পরিমাণও বাড়াইতে হয়।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ভয়েট (Voit) বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একজন পরিশ্রমী ব্যক্তির প্রত্যহ ৩০০০ ক্যালোরী খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আধুনিক যুগে এই পরিমাণ খাদ্যই একজন সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক পরিশ্রমী ব্যক্তির প্রমাণ (standard) খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল (National Research Council, U. S. A.) ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসাবে অনুমোদন করিয়াছে তাহাতে একজন অল্প পরিশ্রমী এবং একজন কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তির প্রত্যহ যথাক্রমে ২৫০০ ক্যালোরী এবং ৪৫০০ ক্যালোরী খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য।

সর্বদা স্মরণ রাখিও ব্যক্তিবিশেষে এই ক্যালোরীর পরিমাণ বিভিন্ন হইতে পারে। Miss Widdowson গবেষণাকালে লক্ষ্য করিয়াছেন যে একই বয়সের এবং একই পেশার দুই ব্যক্তির একজনের প্রত্যহ ১৭৭২ ক্যালোরী খাদ্যের এবং অপর ব্যক্তির প্রত্যহ ৪৯৫৫ ক্যালোরী খাদ্যের প্রয়োজন হইতে পারে।

নারীর ক্যালোরীর পরিমাণ—পুরুষ অপেক্ষা নারীর দৈনিক ক্যালোরীর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। ইহার কারণ মোটামুটি তিনটি :—(১) নারীর দেহের ওজন পুরুষের তুলনায় কম, (২) পুরুষ অপেক্ষা নারী কম পরিশ্রমী এবং (৩) নারীর দেহের প্রতি একক ক্ষেত্রফল হইতে পুরুষের তুলনায় কম তাপ অপসারিত হয়।

অনেকের মতে একজন পুরুষের শতকরা ৮৩ ভাগ ক্যালোরীই একজন নারীর প্রয়োজনীয় ক্যালোরীর আদর্শ পরিমাণ। প্রফেসর McCance এবং Miss Widdowsonএর মতে একজন নারী তাহার সম অবস্থার একজন পুরুষের শতকরা ৭০ ভাগ ক্যালোরী মূল্যের খাদ্য গ্রহণ করে। তবে গর্ভাবস্থায় এবং শিশুকে স্তন্যদানকালে নারীর অপেক্ষাকৃত অধিক ক্যালোরী মূল্যের খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

বৃদ্ধের ক্যালোরীর পরিমাণ—বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কার্যক্ষমতাও কমিয়া আসে। এইজন্যই বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তাও কমিতে থাকে। ৭০ বৎসরের উর্ধ্বে দেহের পক্ষে দৈনিক ১৮০০ ক্যালোরীই যথেষ্ট।

বালক-বালিকাদের ক্যালোরীর পরিমাণ—একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি পাউণ্ড দেহের ওজনের জন্য যতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন, একজন বালক বা বালিকার প্রতি পাউণ্ড দেহের ওজনের জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক ক্যালোরী মূল্যের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ প্রধানত দুইটি—(১) বয়স্ক লোকের তুলনায় একটি বালক বা বালিকা অনেক বেশী শারীরিক পরিশ্রম করে এবং (২) একজন বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বালক বা বালিকার দেহের প্রতি একক ক্ষেত্রফল হইতে অনেক বেশী তাপ অপসারিত হয়। উহাদের বিভিন্ন বয়সের ক্যালোরীর পরিমাণ ৪১২ পৃষ্ঠার চার্টখানিতে দেওয়া হইল। মনে রাখিবে ইহা একটি গড়পড়তা পরিমাণ, ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে এই পরিমাণের যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়।

বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষদের দৈনিক ক্যালোরী এবং খাদ্যোপাদান সমূহের আদর্শ তালিকা (Food and Nutrition Board, National Research Council, Washington ; Revised 1945)।

পর পৃষ্ঠায় তালিকা দেওয়া হইল :

	ক্যালোরী	প্রোটিন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	ভাইটামিন 'এ' (আই, ইউ)	থায়ামিন (মিলিগ্রাম)	রাইবোফ্ল্যাবিন (মিলিগ্রাম)	নিকোটিনিক অ্যাসিড (মিলিগ্রাম)	ভাইটামিন 'সি' (মিলিগ্রাম)	ভাইটামিন 'ডি'* (আই, ইউ,)
পুরুষ (ওজন—১৫৪ পাঃ) :—										
অল্প পরিশ্রমী	২৫০০	৭০	০'৮	১২	৫০০০	১'২	১'৬	১২	৭৫	×
স্বাভাবিক পরিশ্রমী	৩০০০	৭০	০'৮	১২	৫০০০	১'৫	২'০	১৫	৭৫	×
কঠোর পরিশ্রমী	৪৫০০	৭০	০'৮	১২	৫০০০	২'০	২'৬	২০	৭৫	×
নারী (ওজন—১২৩ পাঃ)										
অল্প পরিশ্রমী	২১০০	৬০	০'৮	১২	৫০০০	১'১	১'৫	১১	৭০	×
স্বাভাবিক পরিশ্রমী	২৫০০	৬০	০'৮	১২	৫০০০	১'২	১'৬	১২	৭০	×
কঠোর পরিশ্রমী	৩০০০	৬০	০'৮	১২	৫০০০	১'৫	২'০	১৫	৭০	×
গর্ভবতী	২৫০০	৮৫	১'৫	১৫	৬০০০	১'৮	২'৫	১৮	১০০	৪০০—৮০০
স্তন্যদানকারী	৩০০০	১০০	২'০	১৫	৮০০০	২'০	৩'০	২০	১৫০	৪০০—৮০০
শিশু :—১-৩ বৎসর (২৯ পাঃ)	১২০০	৪০	১'০	৭	২০০০	০'৬	০'৯	৬	৩৫	৪০০
৪-৬ ,, (৪২ পাঃ)	১৬০০	৫০	১'০	৮	২৫০০	০'৮	১'২	৮	৫০	৪০০
৭-৯ ,, (৫৫ পাঃ)	২০০০	৬০	১'০	১০	৩৫০০	১'০	১'৫	১০	৬০	৪০০
১০-১২ ,, (৭৫ পাঃ)	২৫০০	৭০	১'২	১২	৪৫০০	১'২	১'৮	১২	৭৫	৪০০
বালক :—১৩-১৫ বৎসর (১০৩ পাঃ)	৩২০০	৮৫	১'৪	১৫	৫০০০	১'৫	২'০	১৫	৯০	৪০০
১৬-২০ ,, (১৪১ পাঃ)	৩৮০০	১০০	১'৪	১৫	৬০০০	১'৮	২'৫	১৮	১০০	৪০০
বালিকা :—১৩-১৫ বৎসর (১০৮ পাঃ)	২৬০০	৮০	১'৩	১৫	৫০০০	১'৩	২'০	১৩	৮০	৪০০
১৬-২০ ,, (১১৯ পাঃ)	২৪০০	৭৫	১'০	১৫	৫০০০	১'২	১'৮	১২	৮০	৪০০

* দেহে সূর্যকিরণের প্রভাবে যে ভাইটামিন 'ডি' প্রস্তুত হয় তাহাতেই প্রাপ্তবয়স্কদের এই ভাইটামিনের অভাব পূরণ হইয়া যায়। সূর্য কিরণের অভাব হইলে ভাইটামিন 'ডি' যুক্ত খাদ্য সামান্য গ্রহণ করিলেই হয়।

দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ (Maintenance of body temperature)—একজন সুস্থ লোকের দেহের উষ্ণতা প্রায় ৩৭° সেঃ (৯৮·৬° ফা.)। সুস্থ অবস্থায় এই উষ্ণতার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যদ্রব্য হইতে আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন তাপই দেহের উষ্ণতা রক্ষা করে। তবে এই তাপের পরিমাণ খুব বেশী হইলে দেহের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এই তাপের পরিমাণ যাহাতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হইতে না পারে সেইজন্য শরীর হইতে তাপ অপসারণেরও ব্যবস্থা আছে। আমাদের শরীর হইতে তাপ প্রধানত দুইটি উপায়ে অপসারিত হয়। একটি হইতেছে বিকিরণ (Radiation), অপরটি পরিবহন (Conduction) পদ্ধতি। শীতকালে যখন বায়ুর উষ্ণতা খুব কম থাকে তখন অধিক পরিমাণে তাপ শরীর হইতে বিকিরণ ও পরিবহনের সাহায্যে বায়ুতে চলিয়া যায়। ফলে দেহের নির্দিষ্ট উষ্ণতা (৩৭° সে.) রক্ষা করিবার জন্য কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হইতে অধিক পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করিতে হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বায়ুর উষ্ণতা বেশী থাকে বলিয়া দেহ হইতে অপেক্ষাকৃত কম তাপই পূর্বের বিকিরণ ইত্যাদির সাহায্যে বায়ুতে পরিচালিত হইতে পারে। এই সময়ে দেহের অতিরিক্ত তাপ সাধারণত ঘামের সাহায্যেই বাহির হইয়া যায়। লোমকূপ হইতে যে ঘাম নির্গত হয় সেই ঘাম বাষ্পীভূত হইবার সময় দেহ হইতে প্রচুর তাপ শুষিয়া লয়। ফলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। শরীর হইতে তাপ অপসারিত করিবার ইহাই দ্বিতীয় পদ্ধতি। সুতরাং পারিপার্শ্বিক বায়ুর উষ্ণতা যাহাই হউক না কেন বিকিরণ, পরিবহন ও ঘাম বাষ্পায়নদ্বারা শরীরের উষ্ণতা কমান যাইতে পারে। আবার প্রয়োজন হইলে তাপ উৎপাদক খাদ্যদ্রব্য হইতে তাপ উৎপন্ন করিয়া শরীরের উষ্ণতা বাড়াইতেও পারা যায়। দেহে তাপ উৎপাদন ও দেহ হইতে তাপ অপসারণ এই দুইটি বিপরীত ক্রিয়া যথাযথরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই দেহের নির্দিষ্ট উষ্ণতা (৩৭° সে) রক্ষা করা হয়। তবে এই ক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার স্নায়ুতন্ত্রের উপর। স্নায়ুতন্ত্রই এই নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়া পরিচালিত করিয়া দেহের নির্দিষ্ট উষ্ণতা বজায় রাখে।

দেহে খাদ্যের তাপ ও শক্তির ব্যবহার—খাদ্যের তাপ ও শক্তি দেহের তিনটি বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া থাকে, যথা :—

১। **দেহের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিতে,** যথা—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, রক্ত চলাচল, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, দেহের উষ্ণতা ইত্যাদি।

আমাদের দৈনন্দিন কার্যসমূহ মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) বাহ্যিক এবং (২) আভ্যন্তরীণ। হাঁটা চলা, স্নান করা, খাওয়া, লেখা পড়া ইত্যাদি বাহ্যিক কাজ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্ত চলাচল, ফুসফুসের উঠানামা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ কাজ। এই সকল কাজের জন্য অনবরতই শক্তির (Energy) প্রয়োজন হয়। তোমরা জ্বালানী খাদ্য (Fuel food) কাহাকে বলে পড়িয়াছ এবং কোন্ কোন্ খাদ্য এই জ্বালানী খাদ্যের অন্তর্গত তাহাও জান। এই সকল জ্বালানী খাদ্য হইতেই এই শক্তি বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হইয়া দেহের শক্তির চাহিদা পূরণ করিয়া থাকে। দেহের অভ্যন্তরস্থ শক্তি উৎপাদনকারী এই সকল রাসায়নিক পদ্ধতিকেই Energy Metabolism নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির শক্তির প্রয়োজনীয়তা তাহার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের প্রকার এবং পরিমাণের উপরই প্রধানত নির্ভরশীল। লেখা পড়া অপেক্ষা হাঁটা চলা বা দৌড়াইতে অনেক বেশী শক্তি ব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং কোন ব্যক্তি চলা ফেরা বন্ধ করিয়া শুধু লেখা পড়া করিলে তাহার যতটুকু শক্তির প্রয়োজন হয়, লেখা-পড়া বন্ধ করিয়া ঐ সময় শুধু হাঁটা-চলা করিলে তাহার আরও বেশী শক্তির প্রয়োজন হইবে। দেখা গিয়াছে আভ্যন্তরীণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ প্রত্যেক সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিরই প্রায় নির্দিষ্ট। কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া যদি আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় শান্তভাবে শুইয়া থাকি তাহা হইলেও আমাদের ফুসফুসের ক্রিয়া, রক্ত চলাচল ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ কার্যসমূহ অব্যাহত থাকিবে। খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করায় পাকস্থলীর পরিপাক ক্রিয়া এই সময় বন্ধ থাকিবে। সুতরাং এই অবস্থায় আমরা যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করিয়া থাকি তাহাই আমাদের প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তির পরিমাণ। অন্যান্য অবস্থার কোন পরিবর্তন না করিয়া ঘুমাইবার পরিবর্তে যদি জাগিয়া (awake) থাকা যায় তাহা হইলে পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক শক্তি ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে এই ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইলেও ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ইহা নির্দিষ্টই থাকে, কোন পরিবর্তন হয় না। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তিকেই

Basal Metabolism বা Basal Energy Metabolism বলা হইয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি ১২ ঘণ্টা উপবাস (Fasting) করিবার পর সম্পূর্ণ বিশ্রামরত, শায়িত এবং জাগ্রত অবস্থায় যে-হারে তাপ-শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে তাহা দ্বারাই উহার Basal Energy Metabolism পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির Basal Metabolism বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ ব্যক্তির প্রতি কিলোগ্রাম (২'২ পাউণ্ড) দেহের ওজনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ঐ অবস্থায় ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ সমান এবং ইহা প্রায় ১ ক্যালোরী। সুতরাং একজন পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ ব্যক্তির Basal Metabolic rate (B. M. R.) ১ ক্যালোরী। এই হিসাবে একজন পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ, স্বাভাবিক উচ্চতা ও ওজনের পুরুষ এবং নারীর দৈনিক Basal Metabolism যথাক্রমে ১৭০০ ক্যালোরী এবং ১৪০০ ক্যালোরী প্রায়।

Basal Metabolism নিম্নলিখিত কারণে পরিবর্তিত হইতে পারে।

(১) **দেহের ক্ষেত্রফল**—তোমরা দেখিলে যে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির Basal Metabolism rate একই এবং ইহা প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য ঘণ্টায় প্রায় ১ ক্যালোরী। সুতরাং যে-কোন দুইজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি 'ক' এব 'খ'-এর দেহের ওজন যদি সমান হয় তবে তাহাদের প্রাত্যহিক (২৪ ঘণ্টায়) Basal Metabolism'ও সমান হইবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেহের ওজন সমান হইলেও যদি দেহের ক্ষেত্রফল বিভিন্ন হয় তবে Basal Metabolism'ও বিভিন্ন হইয়া থাকে। সাধারণত মোটা ও বেঁটে লোক অপেক্ষা রোগা এবং লম্বা লোকের দেহের ক্ষেত্রফল বেশী। সুতরাং 'ক' এবং 'খ'-এর মধ্যে যে অধিক লম্বা তাহার Basal Metabolism বেশী হইবে। নিম্নের উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

ব্যক্তি	বয়স	উচ্চতা	ওজন	দেহের ক্ষেত্রফল	২৪ ঘণ্টায় Basal Metabolism		
					মোট	দেহের প্রতি বর্গমিটারে	দেহের প্রতি কিলোগ্রামে
ক	৪১	১৮৩ সে. মি.	৮৩ কি. গ্রা	২'০৬ ব. মিটার	১৮০৯ ক্যালোরী	৮৭৫ ক্যালোরী	২১'৭ ক্যালোরী
খ	৩৬	১৬৯ সে. মি.	”	১'৮৯ ব. মিটার	১৬৫৫ ক্যালোরী	৮৭৬ ক্যালোরী	১৯'৯ ক্যালোরী

উপরের উদাহরণ হইতে দেখিতেছি যে উচ্চতার তারতম্যের জন্য Basal Metabolismএর তারতম্য ঘটে। তাই ব্যক্তির ওজন অর্থাৎ কিলোগ্রামের দ্বারা Basal Metabolism নির্ণয় করা যায়। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের প্রতি বর্গমিটারের ক্ষেত্রফলের Basal Metabolism সমান। সুতরাং Metabolismএর নিখুঁত হিসাব পাইতে হইলে দেহের ওজন অর্থাৎ কিলো-গ্রামের চেয়ে ক্ষেত্রফল অর্থাৎ বর্গমিটারের উপর জোর দেওয়া উচিত।

(২) **বয়স**—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে Basal Metabolic rateও (প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য) হ্রাস পাইতে থাকে। জন্মের পর প্রথম বৎসরে ইহা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম এবং দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যেই ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তৃতীয় বৎসর হইতে ইহা ক্রমশ হ্রাস পাইয়া যৌবনে আবার সামান্য বৃদ্ধি পায়। পঁচিশ বৎসর হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত ইহা আবার ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া থাকে।

(৩) **দেহের গঠন**—দেহের ওজন এবং ক্ষেত্রফল সমান হইলেও দুই ব্যক্তির Basal Metabolic rate উহাদের দেহের গঠনের জন্য বিভিন্ন হইতে পারে। দৃঢ় পেশীবহুল (muscle tissue) দেহের metabolism মেদবহুল (Fatty) দেহ অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। এইজন্যই যাহারা নিয়মিত খেলাধুলা বা শরীর চর্চা করে তাহাদের Metabolism সাধারণ অলস প্রকৃতির লোক অপেক্ষা বেশী। আবার পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের দেহে সাধারণত অধিক মেদ বা চর্বি থাকে। এইজন্য পুরুষদের Metabolism নারীদের তুলনায় শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বেশী।

(৪) **হরমোন**—আমাদের দেহের মধ্যস্থিত কয়েকটি গ্রন্থি হইতে হরমোন নামে কয়েকটি রস সরাসরি রক্তের মধ্যে নিঃসৃত হয়। এই সকল হরমোনের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলেও Basal Metabolic rateএর পরিবর্তন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত থায়রক্সিন নামক হরমোনের ক্রিয়াই সর্বাধিক। অধিক পরিমাণে এই হরমোন নিঃসৃত হইলে Metabolism অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। আবার থায়রক্সিন হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে Metabolismও হ্রাস পাইয়া থাকে।

(৫) **পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব**—পুষ্টিকর খাদ্যের অনবরত অভাবে এবং অনাহারে Basal Metabolism শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পাইতে পারে।

(৬) **গর্ভাবস্থা**—গর্ভের চার মাস পর হইতেই Basal Metabolism ধীরে ধীর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রসবের সময় পর্যন্ত ইহা প্রায় শতকরা ২০-২৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে।

ইহা ছাড়া দেহের উত্তাপ বাড়িলে (জ্বরের সময়) Metabolism'ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতি ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য শতকরা ৭·২ ভাগ Metabolism বৃদ্ধি পায়। মানসিক পরিশ্রম (যথা—চিন্তা করা, ইত্যাদি) এবং স্ত্রী-পুরুষ (Sex) ভেদের জন্য Basal Metabolismএর কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

২। **দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শারীরিক কাজে**—হাঁটা চলা, দাঁড়ান, স্নান করা, খাওয়া, পোশাক বদলান ইত্যাদি।

প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিরই এই সকল কাজ করিতে হয়। এই সকল কাজে যে পরিমাণ তাপ আমরা প্রত্যহ ব্যয় করিয়া থাকি তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিতে···	১৫ ক্যাঃ	প্রতি ঘণ্টায়
দাঁড়াইয়া থাকিতে···	২৫ ,,	,, ,,
পোশাক বদলাইতে······	৩৩ ,,	,, ,,
ধীরে ধীরে চলাফেরা করিতে···	১১৫ ,,	,, ,,
অপেক্ষাকৃত দ্রুত হাঁটিতে···	২৫৫ ,,	,, ,,
সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে নামিতে···	২৯০ ,,	,, ,,
সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে···	১০০০ ,,	,, ,,

যদি এক ব্যক্তির দৈনিক ৮ ঘণ্টা সময় এই সকল বিভিন্ন কর্মে ব্যয়িত হয় তবে এই ৮ ঘণ্টা সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় তাপের গড়-পড়তা পরিমাণ,

৩৬০ ক্যাঃ (পুরুষ)
২১৫ ক্যাঃ (নারী)

৩। **বিশেষ কোন শারীরিক পরিশ্রমের কাজে,** যথা—কাঠ কাটা, কাপড়-কাচা, টাইপ করা ইত্যাদি।

শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখা অথবা দৈনন্দিন হাঁটা চলা ইত্যাদি ছাড়াও আমরা প্রত্যেকেই সাধারণত কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিয়া থাকি। এই সকল কাজেও প্রচুর তাপশক্তির প্রয়োজন হয় এবং কাজের প্রকৃতিভেদে এই শক্তির পরিমাণেরও আবার তারতম্য দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রকার পরিশ্রমের কার্যসমূহ আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি এবং এই প্রত্যেকটি বিভাগের কাজের জন্য যে পরিমাণ তাপ বা শক্তি প্রয়োজন হয় তাহাও দেওয়া হইল।

(ক) **অল্প পরিশ্রমের কাজ** ... ৭৫ ক্যাঃ প্রতি ঘণ্টায়
(Sedentary Occupation)

(খ) **স্বাভাবিক পরিশ্রমের কাজ** ... ৭৫-১৫০ ক্যাঃ ,,
(Moderately active Occupation)

(গ) **পরিশ্রমের কাজ** ... ১৫০-৩০০ ক্যাঃ ,,
(Active Occupation)

(ঘ) **কঠোর পরিশ্রমের কাজ** ... ৩০০ ও তদূর্ধ্ব ক্যাঃ ,,
(Very active Occupation)

যে সকল হাল্কা ধরনের কাজে প্রতি ঘণ্টায় ৭৫ ক্যালোরী পর্যন্ত তাপ শক্তির প্রয়োজন হইতে পারে উহাদেরই অল্প পরিশ্রমের কাজ বলা হয়। এই ধরনের কয়েকটি কাজের তাপের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

লেখা ... ২০ ক্যাঃ প্রতি ঘণ্টায়
টাইপ করা ... ৩০ ক্যাঃ ,, ,,
দর্জির কাজ ... ৪৫ ক্যাঃ ,, ,,

কোন কাজে ব্যয়িত তাপের পরিমাণ যদি প্রতি ঘণ্টায় ৭৫—১৫০ ক্যালোরীর মধ্যে হয় তবে ঐ কাজ স্বাভাবিক পরিশ্রমের কাজ বলিয়া ধরা হয়। কয়েকটি স্বাভাবিক পরিশ্রমের কাজের নাম ও উহাদের মাপের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

জুতা সেলাই ... ৯০ ক্যাঃ প্রতি ঘণ্টায়
ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ ... ১৪০ ক্যাঃ ,, ,,

প্রতি ঘণ্টায় ১৫০ ক্যালোরী হইতে ৩০০ ক্যালোরী পর্যন্ত তাপ যে সমস্ত কাজে ব্যয়িত হয় তাহাদের পরিশ্রমের কাজ বলা হয়। এই ধরনের কয়েকটি কাজের নাম ও তাহাদের তাপের পরিমাণ দেওয়া হইল।

গুরুভার ছুতোর মিস্ত্রির কাজ ... ১৮০ ক্যাঃ প্রতি ঘণ্টায়
কর্মকারের কাজ (লঘু) ... ২৭৫ ক্যাঃ ,, ,,
রাজমিস্ত্রির কাজ ... ৩০০ ক্যাঃ ,, ,,

কঠোর পরিশ্রমের কাজে প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ ক্যালোরী বা তারও বেশী ক্যালোরী তাপ ব্যয় হইয়া থাকে। এই প্রকারের কয়েকটি কাজ ও তাহাদের তাপের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

কয়লা খনির মজুরের কাজ	...	৩২০ ক্যাঃ প্রতি ঘণ্টায়
গুরুভার কর্মকারের কাজ	...	৩৫০ ক্যাঃ " "
কাঠ কাটার কাজ	...	৩৮০ ক্যাঃ " "

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ তাপ বা শক্তির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন পেশাদারী লোকের দৈনিক তাপের পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায়।

একজন ৮ ঘণ্টা কর্মরত **কেরানীর** দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরী নির্ণয় :—

২৪ ঘণ্টা আভ্যন্তরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ...	১৭০০ ক্যাঃ
হাঁটা-চলা, পোশাক বদলান ইত্যাদি বিভিন্ন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ করিতে ...	৩৬০ ক্যাঃ
৮ ঘণ্টা লেখার কাজে ...	...৮×২০=১৬০ ক্যাঃ

দৈনিক মোট তাপ=২২২০ ক্যাঃ

একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমী **ছুতোর মিস্ত্রির** দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরী নির্ণয় :—

২৪ ঘণ্টা আভ্যন্তরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ...	১৭০০ ক্যাঃ
হাঁটা-চলা, পোশাক বদলান ইত্যাদি বিভিন্ন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ করিতে ...	৩৬০ ক্যাঃ
৮ ঘণ্টায় ছুতোরের কাজে	৮×১৪০=১১২০ ক্যাঃ

দৈনিক মোট তাপ=৩১৮০ ক্যাঃ

দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমশীল একজন **কর্মকারের** প্রয়োজনীয় ক্যালোরী নির্ণয় :—

২৪ ঘণ্টা আভ্যন্তরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ...	১৭০০ ক্যাঃ
হাঁটা-চলা, পোশাক বদলান ইত্যাদি বিভিন্ন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ করিতে ...	৩৬০ ক্যাঃ
৮ ঘণ্টা লোহা পেটার কাজে	৮×২৭৫=২২০০ ক্যাঃ

দৈনিক মোট তাপ=৪২৬০ ক্যাঃ

একজন কঠোর পরিশ্রমী কাঠুরিয়ার দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরী নির্ণয় :—

২৪ ঘণ্টা আভ্যন্তরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ... ১৭০০ ক্যাঃ
হাঁটা-চলা, পোশাক বদলান ইত্যাদি বিভিন্ন
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ করিতে ... ৩৬০ ক্যাঃ
৮ ঘণ্টা কাঠ কাটিতে ৮×৩৮৯০=৩০৪০ ক্যাঃ

দৈনিক মোট তাপ=৫১০০ ক্যাঃ

কোনও খাদ্যের তাপমূল্য এবং পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন লোকের প্রয়োজনীয় ক্যালোরী নির্ণয় করিতে তোমরা শিখিলে। কোনও ব্যক্তির খাদ্যের পরিমাণ করিতে হইলে প্রথমে ঐ ব্যক্তির পেশা অনুযায়ী উহার প্রয়োজনীয় ক্যালোরী নির্ণয় করিবে। ইহার পর খাদ্য-মূল্য-তালিকার (Food-Value Chart) সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য হইতে ঐ তাপমূল্যের খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিবে। এইখানে একটি কথা মনে রাখিবে যে, খাদ্যের সমস্ত অংশটুকুই আমরা দেহের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতে পারি না। ইহার কিছু অংশ অন্ত্র হইতে রক্তের মধ্যে শোষিত না হইয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই সকল অপচয়ের জন্য প্রয়োজন অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ বেশী তাপমূল্যের খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। মনে কর, একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক, স্বাভাবিক কর্মক্ষম, সুস্থ ব্যক্তির দৈনিক ৩০০০ ক্যালোরী তাপ বা শক্তির প্রয়োজন। তাহা হইলে এই তাপ বা শক্তির জন্য তাহাকে প্রত্যহ $\frac{১১০\times৩০০০}{১০০}$ ক্যালোরী বা ৩৩০০ ক্যালোরী তাপমূল্যের খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

খাদ্যই আমাদের শক্তির (Energy) উৎস। এই শক্তির প্রকাশ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে দেখিতে পাই। যথা—তাপ শক্তি (Heat energy), আলোক শক্তি (Light energy), যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical energy), রাসায়নিক শক্তি (Chemical energy) ইত্যাদি। শক্তির রূপান্তর যেমন বাহিরের জগতে তেমনি আমাদের দেহের মধ্যেও দেখিতে পাই। খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি হইতেই আমাদের দেহে তাপ (Heat) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের শক্তি সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমরা যখন হাঁটা-চলা ইত্যাদি কোন প্রকার কাজ করি তখন খাদ্যের এই রাসায়নিক শক্তির

কিছু অংশ কাজে (Work) এবং সঙ্গে কিছু অংশ তাপে (Heat) রূপান্তরিত হয়। দেখা গিয়াছে যে রাসায়নিক শক্তির শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ কাজে রূপান্তরিত হইতে পারে ; অবশিষ্ট ৮৫ ভাগই তাপে রূপান্তরিত হয়। মনে কর, এক ব্যক্তি ১২ ঘণ্টা লিখিবে। এই ১২ ঘণ্টা লেখা কাজের জন্য তাহার ১২×২০=২৪০ ক্যালোরী তাপের প্রয়োজন। এই ২৪০ ক্যাঃ তাপ ১৬০০ ক্যাঃ তাপমূল্যের খাদ্য হইতে পাওয়া যাইবে। কারণ, এই ১৬০০ ক্যাঃ তাপমূল্যের খাদ্যের মাত্র $\frac{১৫}{১০০}$ অংশ, অর্থাৎ ২৪০ ক্যাঃ কাজে পরিণত হইতে পারিবে। অবশিষ্ট $\frac{৮৫}{১০০}$ অংশ অর্থাৎ ১৩৬০ ক্যাঃ সঙ্গে সঙ্গে তাপে পরিণত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শারীরিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তাপও সৃষ্টি হয়। **এইজন্য কোন কাজ করিলে শরীর উত্তপ্ত হয়।** অত্যধিক শীতে যখন আমরা কাঁপিতে থাকি তখন এই কম্পনরূপ কাজের ফলে শরীর উত্তপ্ত হয় এবং শীত কম অনুভূত হয়।

প্রমাণ খাদ্য ও সুষম খাদ্য (Standard diet and Balanced diet):

কোন একজন ব্যক্তির খাদ্যে প্রত্যহ কত তাপমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন হইবে তাহা প্রধানত ঐ ব্যক্তির বয়স এবং শারীরিক পরিশ্রমের উপরেই নির্ভর করে। একটি শিশু অপেক্ষা একটি বালকের অধিক তাপমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন হয়। আবার একজন কেরানী অপেক্ষা একজন মজুরের খাদ্যের তাপমূল্য অধিকতর হওয়া আবশ্যক ; কারণ, মজুরের শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ কেরানী অপেক্ষা অনেক বেশী। কোন এক ব্যক্তির খাদ্যে যদি ঐ ব্যক্তির প্রয়োজনীয় তাপমূল্য সম্পূর্ণ বজায় থাকে তবে ঐ খাদ্যই ঐ ব্যক্তির পক্ষে **প্রমাণ খাদ্য** (Standard diet)। একজন প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাভাবিক পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক—

১০০ গ্রাম প্রোটিন,
১০০ গ্রাম স্নেহ,
৪০০-৫০০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট,
৩০ গ্রাম ধাতব লবণ,
এবং ৪-৪½ পাইণ্ট জল

প্রমাণ খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ, উক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য হইতে তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় তাপমূল্য পাওয়া যায়।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাভাবিক পরিশ্রমী ব্যক্তির দৈনিক প্রায় ৩০০০ ক্যালোরী তাপমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন হয়। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহই তাপ উৎপাদক খাদ্য। সুতরাং শুধু মাত্র ঐ তিন প্রকার খাদ্য খাইয়াই যদি ঐ ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনীয় তাপমূল্যের অভাব পূরণ করে তবে সে শীঘ্রই বেরিবেরি, স্কার্ভি, রক্তাল্পতা, শ্বাসকষ্ট, রাত্র্যান্ধতা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইবে। এইরূপ খাদ্যে শিশুদের দাঁত ও হাড় পরিপুষ্ট হইবে না এবং উহারা রিকেট্স্ রোগে আক্রান্ত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহ ছাড়াও এমন কতগুলি উপাদান থাকা অত্যাবশ্যক যাহাদের অভাবে শরীর উপরোক্ত বিভিন্ন রোগে সহজেই আক্রান্ত হয়। কোন এক বা একাধিক খাদ্যোপাদানের অভাবেই এই সকল রোগের উদ্ভব হয় বলিয়া উহাদের **অভাব-জনিত রোগ** (Deficiency diseases) বলে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভাইটামিন এবং ধাতব লবণের অভাবেই এই সকল রোগের সৃষ্টি। দুধ, ডিম, সবুজ শাক-সবজি, টমেটো ও বিভিন্ন প্রকারের ফল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন ও ধাতব লবণ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যহ এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলে অভাবজনিত রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অভাবজনিত রোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে বলিয়া এই সকল খাদ্যদ্রব্যকে **রক্ষাকারী খাদ্য** (Protective food) বলে।

সুতরাং খাদ্যে প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিবার জন্য যেমন প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থের প্রয়োজন, তেমনি শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য ভাইটামিন ও ধাতব লবণ উপযুক্ত পরিমাণে থাকা আবশ্যক। যে খাদ্যে শরীর সুস্থ এবং সবল থাকে তাহাকেই **যথোপযুক্ত খাদ্য** (Adequate diet) বলে।

প্রমাণ খাদ্য দেহে তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিয়া দেহে পুষ্টি, বৃদ্ধি ও কর্ম-ক্ষমতা অব্যাহত রাখে এবং যথোপযুক্ত খাদ্য দেহকে রোগমুক্ত করিয়া উহাকে সুস্থ এবং সবল রাখে। এই দুই প্রকার খাদ্যের মিলনেই **সুষম-খাদ্য** (Balanced diet) প্রস্তুত হয়। সুতরাং যে খাদ্য দ্বারা আমাদের দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং যাহা আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি

সরবরাহ করিয়া শরীর সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম রাখে তাহাকেই **সুষম খাদ্য** (Balanced diet) বলে। সুষম খাদ্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার উপাদানই উপযুক্ত পরিমাণে বর্তমান থাকে।

খাদ্যের বিভিন্ন বিভাগ
(Different groups of food)

তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ যে সুষম খাদ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ, ভাইটামিন এবং লবণ ইত্যাদির প্রত্যেকটিই উপযুক্ত অনুপাতে বর্তমান থাকা প্রয়োজন। এই সকল খাদ্যোপাদানসমূহ আবার বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে বিভিন্ন পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন কোন খাদ্যে একটি, আবার কোন কোন খাদ্যে একাধিক উপাদান দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ চিনি (Sugar) এবং দুধের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমটিতে কার্বোহাইড্রেট ছাড়া আর কোন খাদ্যোপাদানই নাই, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে প্রায় সকল উপাদানই বর্তমান। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যে সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে এই সকল খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে সাধারণ লোকের জ্ঞান খুবই সামান্য। এই জন্যই খাদ্য বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্যসমূহ নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যহ ঐ সকল বিভাগ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন, যাহাতে অতি সাধারণ লোকও তাহার খাদ্যে প্রত্যেকটি উপাদান পাইতে পারে।

খাদ্যের পাঁচটি বিভাগ (Five Groups of Food): খাদ্যদ্রব্যসমূহকে প্রয়োজনীয় পাঁচটি উপাদানের কোন একটির প্রাচুর্য অনুযায়ী পাঁচটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই পাঁচটি বিভাগ হইতেছে—

(১) **বিভিন্ন প্রকারের শস্যকণা ও তাহার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য** (Grain Products): যথা—চাউল, গম, যব, ভুট্টা, আটা, ময়দা, রুটি, ভাত ইত্যাদি। আমাদের দেহে কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করাই এই বিভাগীয় খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া কিছু কিছু প্রোটিন, ভাইটামিন 'বি' এবং লৌহও এই সকল খাদ্যে পাওয়া যায়। কার্বোহাইড্রেট আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন করে। সুতরাং এই শ্রেণীর খাদ্যের সাহায্যে খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করা যায়।

(২) **স্নেহ এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য** (Fats and Sugars) : যথা—ঘি, মাখন, মাছের তেল, বিভিন্ন জন্তুর চর্বি, সরিষার তেল, নারিকেল তেল ইত্যাদি ; চিনি, মধু, দুগ্ধ-শর্করা (Lactose), গ্লুকোজ ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর খাদ্যও আমাদের দেহে প্রধানত তাপই-সরবরাহ করে। প্রথম শ্রেণীর খাদ্য অপেক্ষা এই শ্রেণীর কয়েকটি খাদ্যের প্রতি একক ওজনে অধিকতর তাপ উৎপন্ন হয়। মাখন, চর্বি ইত্যাদি প্রাণিজ স্নেহের সাহায্যে দেহের ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'র অভাবও কিছু পরিমাণে পূরণ হয়।
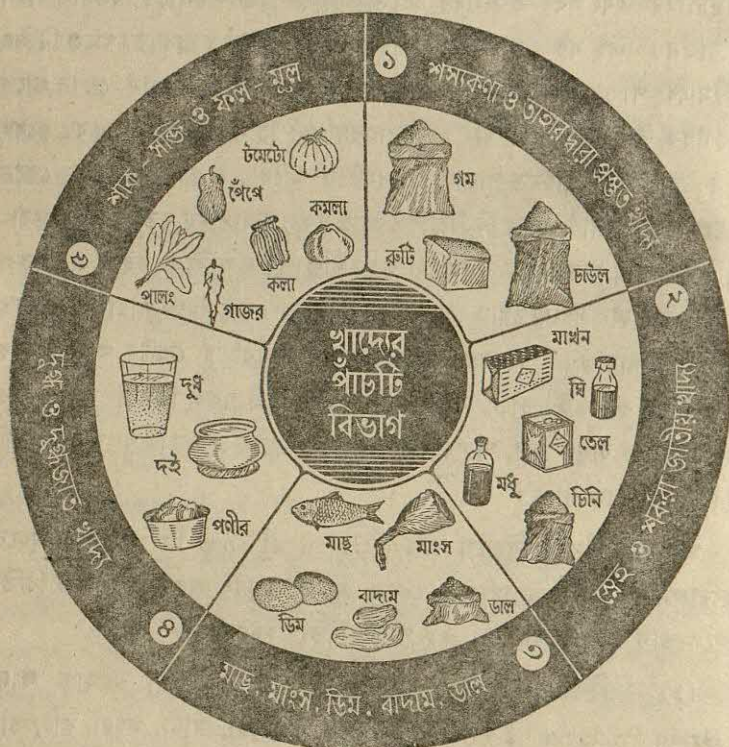
(৩) **মাছ, মাংস, ডিম, বাদাম ও ডাল** (Meat, fish, poultry, eggs, nuts and mature legumes) : খাদ্যে প্রোটিনের জোগান দেওয়াই এই শ্রেণীর খাদ্যের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া দেহের ভাইটামিনের অভাবও এই শ্রেণীর খাদ্যের দ্বারা অনেকটা পূরণ হয়।

(৪) **দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য** (Milk and its Products) : বিভিন্ন প্রাণীর দুধ, দৈ, পনীর, গুঁড়া দুধ ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর খাদ্যে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন এবং প্রচুর ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। দেহের অস্থি গঠনে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এইজন্য এই শ্রেণীর খাদ্য প্রত্যহই কিছু কিছু খাদ্য তালিকাভুক্ত করা কর্তব্য। ইহা ছাড়া অন্যান্য ভাইটামিন এবং ধাতব লবণও এই শ্রেণীর খাদ্য সরবরাহ করে।

(৫) **শাক-সবজি ও ফলমূল** (Vegetables and Fruits) : বিভিন্ন প্রকারের সবুজ শাক-সবজি, যথা—পালং শাক, লেট্যুস শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি এবং বিভিন্ন প্রকারের ফল ও কন্দ জাতীয় তরকারি, যথা—মূলা, শালগম, গাজর, টমেটো, কমলালেবু, পাতিলেবু, পেয়ারা, আনারস, আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, শশা ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্যের ভাইটামিন এবং ধাতব লবণের অভাব পূরণ করা। প্রথম চার শ্রেণীর খাদ্যের দ্বারা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থের অভাব পূরণ হইবে এবং যদিও এই সকল খাদ্যে কিছু কিছু ভাইটামিন পাওয়া যায় তবুও ভাইটামিনের চাহিদা পুরাপুরিভাবে এই সকল খাদ্যের দ্বারা মিটিবে না। এই জন্যই প্রতিদিন এই শেষোক্ত শ্রেণীর খাদ্য কিছু কিছু গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহা ছাড়া এই সকল খাদ্যের সেল্যুলোজ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া শরীর সুস্থ রাখে।

খাদ্যদ্রব্যসমূহ এমনভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে যে প্রত্যহ যদি প্রত্যেকটি বিভাগ হইতে কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য খাদ্যতালিকাভুক্ত করা হয় তাহা হইলে প্রয়োজনীয় সকল উপাদানসমূহই খাদ্যে বর্তমান থাকিবে।

খাদ্যের সাতটি বিভাগ (Basic seven groups) : খাদ্যের উপরোক্ত পাঁচটি বিভাগের পঞ্চম বিভাগে সকল প্রকার ভাইটামিনবহুল খাদ্যদ্রব্য একই সঙ্গে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। সুতরাং এই বিভাগ হইতে খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত সতর্কতার সহিত গ্রহণ না করিলে, খাদ্যে কোন কোন ভাইটামিনের অভাব হইতে পারে। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই বিভাগ হইতে কেবলমাত্র কলা, পেঁপে, শশা, লেট্যুস শাক ও আলু তাহার খাদ্যতালিকাভুক্ত করিয়া টমেটো, লেবু ইত্যাদি একেবারেই গ্রহণ করিল না। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির খাদ্যে ভাইটামিন 'সি'র অভাব হইবে। অপরপক্ষে সে যদি পালং শাক, লেট্যুস শাক ইত্যাদি

সবুজ শাক-সবজি তাহার খাদ্য হইতে বাদ দিয়া টমেটো, লেবু ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্যের সাহায্যে এই বিভাগের অভাব পূরণ করে তাহা হইলে তাহার খাদ্যে ভাইটামিন 'এ'র অভাব ঘটিবে। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে সকল প্রকার ভাইটামিনসমূহই উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যে থাকা আবশ্যক। এইজন্যই উপরোক্ত পাঁচটি বিভাগের প্রধানত পঞ্চম বিভাগটিকেই ভাইটামিনের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি বিভাগে ভাগ করিয়া মোট **সাতটি মূল বিভাগের** সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(১) **সবুজ ও পীত বর্ণের শাক-সবজি** (Leafy, green and yellow vegetables): যথা—পালং শাক, লেট্যুস শাক, নটে শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের সবুজ বর্ণের সবজি, গাজর, হলদে কুমড়া ইত্যাদি পীতবর্ণের তরিতরকারীও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই শ্রেণীর খাদ্য ভাইটামিন 'এ'-র অভাব পূরণ করে। ইহাতে ক্যারোটিন (carotine) নামক একপ্রকার ভাইটামিন 'এ' উৎপন্নকারী পদার্থ থাকে। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'সি'ও এই শ্রেণীর খাদ্যে পাওয়া যায়।

(২) **লেবু জাতীয় ফল** (Citrus Fruits): যথা—কমলালেবু, কাগজি লেবু, টমেটো ইত্যাদি।

খাদ্যে ভাইটামিন 'সি'র অভাব পূরণ করাই এই বিভাগের খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। ভাইটামিন 'সি' উত্তাপের সাহায্য নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এই বিভাগের খাদ্যদ্রব্য কাঁচা এবং টাট্‌কা অবস্থায় খাওয়াই ভাল। পেয়ারা (Guava) ভাইটামিন 'সি'র একটি অতি উৎকৃষ্ট উৎস। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'এ'-ও এই শ্রেণীর খাদ্যে পাওয়া যায়।

(৩) **অন্যান্য ফল ও কন্দজাতীয় তরি-তরকারী** (Other fruits and vegetables): যথা—আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, আঙ্গুর, বেদানা, আনারস, ন্যাশপাতি, লাউ, ঢেঁড়স, সজনা, মূলা, পেঁয়াজ, আলু, শালগম ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য কোন একটি নির্দিষ্ট ভাইটামিনের অভাব পূরণের জন্য গ্রহণ করা হয় না। সাধারণত খাদ্যের বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন এবং ধাতব লবণের অভাব পূরণে সাহায্য করাই এক বিভাগীয় খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

(৪) **মাখন ব্যতীত দুগ্ধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত খাদ্য** (Milk including all its recognised forms other than butter): যথা—বিভিন্ন প্রাণীর দুধ, দই, পনীর, ছানা, আইসক্রীম, গুঁড়াদুধ ইত্যাদি। মাখন, ঘি, দুগ্ধ-জাত হইলেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত নয়।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম সরবরাহ করাই এই শ্রেণীর
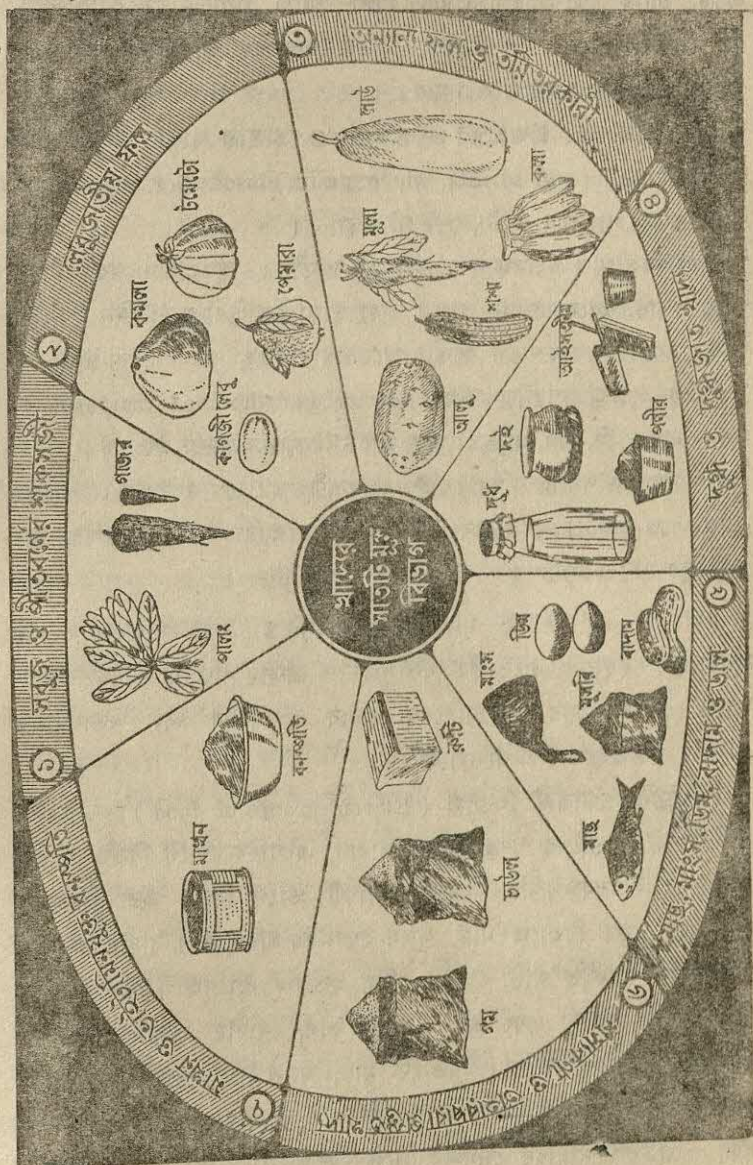
খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন এবং ধাতব লবণও এই শ্রেণীর খাদ্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

(৫) **মাছ, মাংস, ডিম, বাদাম ও ডাল** (Meats, fish, poultry, eggs, nuts and mature legumes)—খাদ্যে প্রোটিন সরবরাহ করাই এই শ্রেণীর খাদ্যের মূল উদ্দেশ্য, বিভিন্ন প্রকারের ভাইটামিন এবং ধাতব লবণও এই সকল খাদ্যে পাওয়া যায়।

(৬) **বিভিন্ন প্রকারের শস্যকণা ও তাহার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য** (Bread stuffs and cereals, whole grain, enriched or restored): যথা—চাউল, গম, যব, আটা, পাউরুটি ইত্যাদি।

এইসকল খাদ্য প্রধানত কার্বোহাইড্রেট জাতীয়। সুতরাং খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করাই ইহাদের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া প্রোটিন, ভাইটামিন 'বি' এবং ধাতব লবণের অভাবও এই জাতীয় খাদ্যের দ্বারা কিছুটা পূরণ হইয়া থাকে।

(৭) **স্নেহ জাতীয় খাদ্য** (Butter and fortified margarine): যথা—মাখন, ঘি, চর্বি, মাছের তেল, ভাইটামিনযুক্ত বনস্পতি ইত্যাদি।

খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করাই এই শ্রেণীর খাদ্যের মূল উদ্দেশ্য। প্রাণিজ স্নেহ খাদ্যে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি'ও সরবরাহ করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ স্নেহ এই দিক হইতে নিকৃষ্টতর।

খাদ্যের এই সাতটি মূল বিভাগ পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটি বিভাগ হইতে প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিলে খাদ্যে কোন প্রকার ভাইটামিনের অভাব হইবে না এবং অভাবজনিত রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

খাদ্যের এগারটি বিভাগ (Eleven groups of food): উপরোক্ত মূল সাতটি বিভাগের কয়েকটিকে আবার একাধিক ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যসমূহকে মোট এগারটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। উপরোক্ত পঞ্চম বিভাগে মাছ, মাংস ইত্যাদির সহিত ডাল, বাদাম প্রভৃতিও রহিয়াছে। প্রথমত মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রাণিজ খাদ্যের প্রোটিন অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং এই তুলনায় ডাল, বাদাম প্রভৃতির প্রোটিন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। দ্বিতীয়ত মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অতিশয় অগ্নিমূল্য, অপর পক্ষে ডাল, বাদাম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সস্তা। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ডাল ইত্যাদির সাহায্যেই অল্প ব্যয়ে অধিকাংশ প্রোটিনের অভাব পূরণ করা সহজসাধ্য। এই সকল কারণে ডাল ও বাদাম অন্যান্য প্রোটিনজাত খাদ্য হইতে পৃথক্ করিয়া একটি স্বতন্ত্র

বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভাত, রুটি ইত্যাদির সহিত প্রচুর পরিমাণে ডাল ও কিছু বাদাম গ্রহণ করিয়া অল্প ব্যয়ে দরিদ্র ব্যক্তি তাহার প্রোটিনের অধিকাংশ অভাব দূর করিতে পারে।

আবার প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে ডিম অন্যান্য প্রোটিনজাত খাদ্য হইতে একটু স্বতন্ত্র, কারণ ডিমে প্রচুর ভাইটামিন 'এ' পাওয়া যায়। এইজন্যই শুধু ডিমের সাহায্যেই একটি বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রত্যহ একটি করিয়া ডিম গ্রহণ করিলে ভাইটামিন 'এ'র অভাব যথেষ্ট পরিমাণে দূর হইবে।

উপরোক্ত সাতটি বিভাগের তৃতীয় বিভাগে অন্যান্য ফল ও তরি-তরকারির সহিত আলুও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আলু প্রধানত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। প্রত্যহ খাদ্যের সহিত আমরা যে পরিমাণ আলু গ্রহণ করিয়া থাকি তাহাতে আমাদের কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই পূরণ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'সি'র পরিমাণ আলুতে অল্প হইলেও প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণ আলু গ্রহণ করায় এই ভাইটামিনের অভাব অনেকটা এই খাদ্য হইতে পূরণ হইয়া থাকে। রাঙ্গা আলু (Sweet potatoes) শ্বেতসার জাতীয় উপাদান ছাড়াও ভাইটামিন 'এ'র একটি উৎকৃষ্ট উৎস। সুতরাং অল্প মূল্যে আলু ও রাঙ্গা আলু হইতে কার্বোহাইড্রেট, ভাইটামিন 'এ' ও 'সি'র অভাব অনেকটা পূরণ করা যাইতে পারে বলিয়া ইহাদের সাহায্যে একটি নূতন বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

তোমরা ভাল ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিবে উপরোক্ত মূল সাতটি বিভাগে চিনি, গুড়, মিছরি, সিরাপ ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্য স্থান পায় নাই। কিন্তু প্রত্যহই আমরা এই জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি এবং ইহারা খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। এইজন্য ইহাদের সাহায্যে একটি নূতন বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এইভাবে খাদ্যের মূল সাতটি বিভাগ হইতে যে এগারটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) **বিভিন্ন শস্যকণা ও তাহার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য** (Grain products) : যথা—চাউল, গম, যব, ভুট্টা, আটা, ময়দা, পাউরুটি ইত্যাদি। ইহারা খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করিয়া খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করে।

(২) **আলু ও রাঙ্গা আলু** (Potatoes and sweet potatoes) : ইহারা খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট এবং ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' সরবরাহ করে।

(৩) **বিভিন্ন প্রকারের ডাল ও বাদাম** (Dry mature beans, peas and nuts) : যথা—মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর ইত্যাদি ডাল এবং
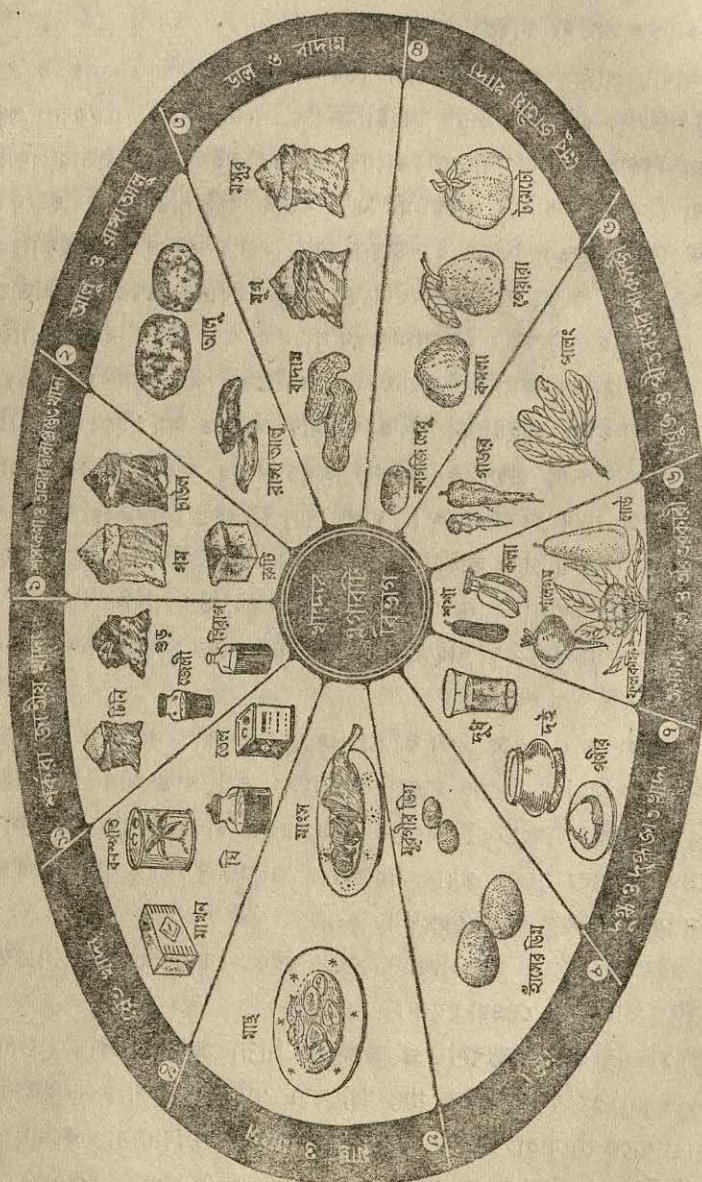
বাদাম প্রভৃতি। খাদ্যের প্রোটিন ও 'বি' ভাইটামিনের অভাব পূরণ করাই

এই শ্রেণীর খাদ্যের প্রধান কাজ। বাদাম জাতীয় খাদ্য স্নেহপদার্থের অভাবও কিছুটা পূরণ করিয়া থাকে।

(৪) **লেবু জাতীয় ফল** (Citrus Fruits) : যথা—কমলালেবু, কাগজিলেবু, টমেটো ইত্যাদি। এই শ্রেণীর খাদ্য আমাদের ভাইটামিন 'সি'র অভাবই প্রধানত পূরণ করিয়া থাকে।

(৫) **সবুজ ও পীতবর্ণের শাক-সবজি** (Green and yellow vegetables) : যথা—পালং শাক, লেট্যুস শাক, নটে শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি ; গাজর, হলদে কুমড়ো প্রভৃতি পীতবর্ণের তরকারী। খাদ্যে ভাইটামিন 'এ' সরবরাহ করাই ইহাদের প্রধান কাজ।

(৬) **অন্যান্য ফল ও তরিতরকারী** (Other fruits and vegetables) : যথা—আম, জাম, কাঁঠাল, আঙ্গুর, বেদানা, ন্যাশপাতি, কলা, শশা, লাউ, ঢেঁড়স, সজনা, শালগম, মূলা, পেঁয়াজ প্রভৃতি। ইহারা বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন ও ধাতব লবণ সরবরাহ করে।

(৭) **মাখন ব্যতীত দুগ্ধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত খাদ্য** (Milk and its products other than butter) : যথা—বিভিন্ন প্রাণীর দুধ, দই, গুঁড়া দুধ, ছানা, পনীর, আইসক্রীম ইত্যাদি। মাখন ও ঘি দুগ্ধজাত হইলেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম এই শ্রেণীর খাদ্য হইতে প্রধানত পাওয়া যায়।

(৮) **ডিম** (Eggs) : যথা—হাঁসের ডিম, মুর্গির ডিম ইত্যাদি। ইহা খাদ্যের প্রোটিন ও ভাইটামিন 'এ'-র অভাব প্রধানত পূরণ করিয়া থাকে।

(৯) **মাছ, মাংস ইত্যাদি** (Lean meat, poultry and fish) : এই শ্রেণীর খাদ্য প্রধানত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন সরবরাহ করে।

(১০) **স্নেহ খাদ্য** (Fats) : যথা—মাখন, ঘি, চর্বি, বনস্পতি, বিভিন্ন প্রকারের তেল ইত্যাদি। খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করাই ইহাদের প্রধান কাজ।

(১১) **শর্করা জাতীয় খাদ্য** (Sugars, syrups, molasses and preserves) : যথা—চিনি, গুড়, মিছরি, মধু, সিরাপ, জেলী ইত্যাদি। খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করাই ইহাদের কাজ।

এই এগারটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতেই দৈনিক কিছু কিছু করিয়া খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করিলে খাদ্যে কোন উপাদানেরই অভাব ঘটিবে না এবং দেহ সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম থাকিবে। সাধারণ লোকের পক্ষে এইজন্যই এই খাদ্য বিভাগ

বিশেষ উপকারী। তবে আমাদের মধ্যে অনেকেই নিরামিষাশী আছে যাহারা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাইতে পছন্দ করে না। সুতরাং তাহাদের খাদ্য হইতে উক্ত এগার প্রকার খাদ্যের অষ্টম এবং নবম শ্রেণীর খাদ্য বাদ দিতে হইবে। উক্ত দুই শ্রেণীর খাদ্য বাদ দিবার ফলে উহাদের খাদ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ডিম প্রধানত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন ও ভাইটামিন 'এ' এবং মাছ, মাংস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন খাদ্য সরবরাহ করে। সুতরাং এই সকল উপাদানের অভাব অন্যান্য খাদ্য হইতে পূরণ করিতে হইবে। দুধ, ছানা ইত্যাদি সপ্তম শ্রেণীর খাদ্যে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়। সুতরাং প্রোটিনের অভাব পূরণ করিবার জন্য এই ব্যক্তিকে অধিক পরিমাণে এই সকল খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। ভাইটামিন ''এ'র অভাব দুধ, ছানা ইত্যাদি হইতে পূরণ হইবে না। এইজন্য ঐ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে পঞ্চম শ্রেণীর খাদ্য অর্থাৎ সবুজ শাক-সবজি গ্রহণ করিয়া ভাইটামিন 'এ'র অভাব পূরণ করিতে হইবে। সুতরাং ঐ এগারটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতেই যে আমাদের প্রত্যহ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে এমন বাঁধাধরা কোন নিয়ম নাই। খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে প্রত্যেকের রুচি ও অভ্যাস অনুযায়ী আমরা অনায়াসেই ঐ বিভিন্ন বিভাগ হইতে ছাট-কাট করিয়া দৈনিক সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি।

এখন তোমরা বুঝিতে পারিলে যে খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই তাহারাও অনায়াসেই প্রত্যহ প্রত্যেকটি খাদ্যোপাদান উপরোক্ত খাদ্য বিভাগের সাহায্যে সহজেই পাইতে পারে। কিন্তু এই সকল খাদ্যোপাদান সমূহও আবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিবিশেষের খাদ্যে থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তির খাদ্যে এই সকল উপাদানসমূহ যে পরিমাণে থাকা প্রয়োজন তাহা 412 পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। এই সকল উপাদান কোন্ খাদ্যের কতটুকু হইতে পাওয়া যাইবে তাহা জানা থাকিলে গৃহিণীদের আর কোন অসুবিধাই থাকে না। মনে কর, তুমি একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমী সুস্থ পুরুষের সুষম খাদ্যের আয়োজন করিতে যাইতেছ। ঐ ব্যক্তির খাদ্যে যাহাতে সকল উপাদানই বর্তমান থাকে সেইজন্য তোমাকে খাদ্যের এগারটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতেই কিছু কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ বিভাগ হইতে কতটুকু খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে তাহা জানা না থাকিলে

ঐ ব্যক্তির খাদ্যে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। উদাহরণস্বরূপ ঐ ব্যক্তির প্রোটিনের প্রয়োজনের কথাই ধরা যাউক। উহার প্রায় ৭০ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন। এই প্রোটিন তোমাকে তৃতীয়, সপ্তম, অষ্টম ও নবম বিভাগের খাদ্য হইতেই পূরণ করিতে হইবে (খাদ্যের এগারটি বিভাগ লক্ষ্য কর)। এই সকল বিভাগের কোন্‌টি হইতে কতটুকু খাদ্য গ্রহণ করিয়া এই ৭০ গ্রাম প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করিবে ? তৃতীয় বিভাগের খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে এবং অপরাপর বিভাগ হইলে অল্প পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া এই ৭০ গ্রাম প্রোটিনের অভাব পূরণ করিলে খাদ্যে অত্যাবশ্যক প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের অভাব হইবে। কারণ; তৃতীয় বিভাগের খাদ্যে প্রধানত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনই পাওয়া যায়। ফলে দেহের যথাযথ বৃদ্ধি ও পুষ্টি ব্যাহত হইবে। সুতরাং উক্ত পরিমাণ প্রোটিনের চাহিদা উপরোক্ত কয়েকটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াই পূরণ করিতে হইবে। অতএব প্রত্যেকটি লোকের দৈনিক প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাদ্যোপাদান এই এগারটি বিভাগের খাদ্যদ্রব্যের ওজনের পরিমাপ জানা না থাকিলে গৃহিণীদের সুষম খাদ্য প্রস্তুতিতে অসুবিধা দেখা দিবে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য Bureau of Human Nutrition and Home Economics বিভিন্ন বয়সের লোকের **প্রতি সপ্তাহে** এই এগারটি বিভাগের প্রত্যেকটি বিভাগ হইতে যে পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা কর্তব্য তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত করিয়াছে। পর পৃষ্ঠায় এই তালিকাটি দেওয়া হইল।

খাদ্যের এগারটি বিভাগ হইতে বিভিন্ন বয়সের সাপ্তাহিক খাদ্যের আদর্শ পরিমাণ:

	সবুজ ও পীত-বর্ণের শাক-সবজি	লেবুজাতীয় ফল, টমেটো ইত্যাদি	আলু, রাঙ্গাআলু	অন্যান্য তরি-তরকারী ও ফল	দুধ (কোঃ=কোয়ার্ট)	মাছ, মাংস	ডিম	ডাল, বাদাম, মটরশুঁটি	শস্য-কণা	স্নেহ-পদার্থ	চিনি, সিরাপ, জেলী ইত্যাদি
	পা. আ.	পা. আ.	পা. আ.	পা. আ.	কোঃ	পা. আ.	সংখ্যা	পা. আ.	পা. আ.	পা. আ.	পা. আ.
শিশু :—											
৯—১২ মাস	১—৮	১—১২	০—৮	১—০	৬	০—৪	৫	০—১	০—১০	০—১	০—১
১—৩ বৎসর	১—১২	১—১২	১—০	১—০	৫.৫	০—৮	৫	০—১	১—৪	০—২	০—২
৪—৬ ,,	১—১২	১—১২	১—৮	১—৪	৫.৫	১—০	৫	০—২	১—১২	০—৬	০—৬
৭—৯ ,,	২—০	২—০	২—৮	১—৮	৫.৫	১—৮	৫	০—৪	২—৪	০—৮	০—১০
১০—১২ ,,	২—৪	২—৪	৩—০	১—১২	৬	১—১২	৫	০—৪	৩—৪	০—১২	০—১২
বালিকা :—											
১৩—১৫ বৎসর	২—৪	২—৪	৩—৪	১—১২	৬.৫	২—০	৫	০—৪	৩—৮	০—১২	০—১২
১৬—২০ ,,	২—৪	২—৪	৩—০	১—১২	৫	২—০	৫	০—৪	৩—৪	০—১২	০—১০
বালক :—											
১৩—১৫ বৎসর	২—৮	২—৮	৪—০	২—৪	৬.৫	২—০	৫	০—৮	৪—৮	১—০	০—১৪
১৬—২০ ,,	২—১২	২—৮	৫—০	২—৮	৬.৫	২—০	৫	০—৮	৫—১২	১—৬	১—০
স্ত্রীলোক :—											
অল্প পরিশ্রমী	২—৪	২—০	২—৪	১—১২	৫	২—০	৫	০—৪	২—০	০—১০	০—১০
স্বাভাবিক পরিশ্রমী	২—৪	২—০	৩—০	১—১২	৫	২—০	৫	০—৪	৩—৪	০—১২	০—১২
কঠিন পরিশ্রমী	২—৮	২—৮	৪—০	২—০	৫	২—০	৫	০—৬	৪—৪	১—০	১—০
গর্ভবতী	৩—০	২—৮	২—৮	২—০	৭.৫	২—৪	৭	০—৪	২—৮	০—১০	০—৮
স্তন্য-দানকারী	৩—৮	৩—১২	৪—০	২—৪	১০.৫	২—৮	৭	০—৪	৩—০	০—১০	০—৮
পুরুষ :—											
অল্প পরিশ্রমী	২—৪	২—০	৩—০	১—১২	৫	২—০	৫	০—৪	৩—৪	০—১২	০—১২
স্বাভাবিক পরিশ্রমী	২—৮	২—৮	৪—০	২—০	৫	২—০	৫	০—৬	৪—৪	১—০	১—০
কঠিন পরিশ্রমী	২—৮	২—৮	৬—০	২—৮	৫	২—০	৫	০—১০	৭—১২	১—১৪	১—০

শিশু, গর্ভবতী এবং স্তন্য-দানকারী নারীর ভাইটামিন 'ডি'-এর অভাব পূরণের জন্য কডলিভার অয়েল ইত্যাদি গ্রহণ প্রয়োজন। লৌহের অভাব পূরণের জন্য সপ্তাহে ২৷৩ দিন যকৃতের (liver) ব্যবস্থা থাকা ভাল। (খাদ্যদ্রব্যসমূহের কাঁচা অবস্থার ওজন দেওয়া হইয়াছে।)

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের উপর রন্ধনের প্রভাব

(Effect of Cooking on the Nutritive value of foods)

আমরা অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যই খাইবার পূর্বে রান্না করিয়া থাকি। রান্নার ফলে খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত এবং সুস্বাদু হয়। খাদ্যকে সুস্বাদু এবং নির্দোষ করিতে গিয়া অনেক সময় আমরা উহার খাদ্যমূল্য নষ্ট করিয়া ফেলি। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের উপর রান্নার প্রভাব জানা থাকিলে অনিচ্ছাকৃত এই অপচয় সহজেই বন্ধ করা যায়।

কার্বোহাইড্রেট—চাউল, গম, যব, আলু ইত্যাদি খাদ্যের প্রধান অংশই শ্বেতসার (starch)। এই শ্বেতসার স্বাভাবিক অবস্থায় একটি শক্ত আবরণে আবৃত থাকে। আমাদের দেহের জারক রস (Enzyme) এই শক্ত আবরণটি জীর্ণ করিতে পারে না। সুতরাং কাঁচা আলু, গম ইত্যাদি খাইলে পাকস্থলীর পক্ষে উহা হজম করা কষ্টকর হয়। রান্নার ফলে বাহিরের এই শক্ত আবরণটি ফাটিয়া যায় এবং শ্বেতসার আবরণমুক্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় উহা সহজেই পরিপাক করা যায়। ইহা ছাড়া উত্তাপের ফলে শ্বেতসারের কিছু অংশ সহজপাচ্য ডেক্সট্রিন (dextrin) কার্বোহাইড্রেটে পরিণত হয়। **এই কারণেই কাঁচা পাঁউরুটি (bread) অপেক্ষা সেঁকা পাঁউরুটি (toast) হজম করা সহজ।** সুতরাং রান্নার ফলে খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট সহজেই জীর্ণ ও পরিপাকযোগ্য হয়।

স্নেহ—তেল, ঘি, ডালডা ইত্যাদি স্নেহপদার্থের রান্নার ফলে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না, খাদ্যমূল্য প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। তবে অত্যধিক উত্তাপে স্নেহ পদার্থ ভাঙিয়া প্রথমে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারিন উৎপন্ন হয়। পরে এই গ্লিসারিন হইতে অ্যাক্রোলিন (acroline) নামক একটি বিষাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। সুতরাং অত্যধিক উত্তাপে স্নেহ জাতীয় পদার্থ বিষাক্ত হইতে পারে।

প্রোটিন—মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য কাঁচা অপেক্ষা রান্না করিয়া খাইবার রীতিই আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অল্প উত্তাপে প্রোটিন সঙ্কুচিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। এই অবস্থায় উহা সহজেই পরিপাক হয়। কিন্তু অত্যধিক উত্তাপে প্রোটিন শক্ত হইয়া যায় এবং তখন উহার খাদ্যমূল্যও অনেক কমিয়া যায়। এই জন্যই ডিম ভাজা অপেক্ষা

অর্ধ সিদ্ধ অবস্থায় খাওয়া বেশী উপকারী। আবার কখনও কখনও অধিক উত্তাপের ফলে কোন কোন প্রোটিনের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অল্প সিদ্ধ ডাল (pulses) অপেক্ষা অধিক সিদ্ধ ডাল হইতে শরীর অধিক পরিমাণে প্রোটিন গ্রহণ করিতে পারে। এই জন্যই ডাল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়।

ভাইটামিন—ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' জলে দ্রবণীয় নয়। এইজন্য খাদ্যদ্রব্য জলে সিদ্ধ করিলে বা সিদ্ধ জল ফেলিয়া দিলেও এই প্রকার ভাইটামিন নষ্ট হয় না। তবে অধিক উত্তাপে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বায়ুর সংস্পর্শে উত্তপ্ত করিলে এই সকল ভাইটামিন অনেকটাই নষ্ট হইয়া যায়।

ভাইটামিন 'বি' সাধারণত উত্তাপে সামান্যই নষ্ট হয়। তবে খাদ্যদ্রব্যে সোডা মিশ্রিত করিলে প্রায় সমস্ত ভাইটামিন 'বি'-টুকুই নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই ডাল রান্না করিবার সময় কখনও সোডা ব্যবহার করা উচিত নয়। এই জাতীয় ভাইটামিন জলে দ্রবণীয়, সুতরাং রান্না করা খাদ্য হইতে জল ফেলিয়া দিলে ভাইটামিনও অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়।

রান্না করিবার সময় ভাইটামিন 'সি' বাতাসের সংস্পর্শে সহজেই জারিত (oxidised) হইয়া যায়। এইজন্য ভাইটামিন 'সি'-যুক্ত খাদ্যদ্রব্য ঢাকিয়া রান্না করিতে হয়, ইহাতে অপচয় কম হয়। ভাইটামিন 'সি' জলে দ্রবণীয়, সুতরাং রান্না করা জল ফেলিয়া দিলে জলের সহিত অনেকটা ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। খাদ্যে সোডা মিশ্রিত করিলেও এই প্রকার ভাইটামিনের অপচয় ঘটে। বিভিন্ন তরি-তরকারির ভাইটামিন 'সি' রান্নার ফলে শতকরা ১০ হইতে ৬০ ভাগ পর্যন্ত নষ্ট হইতে পারে।

বিভিন্ন ধাতব লবণ—ধাতব লবণের রান্নার ফলে কোন অপচয়ই হয় না ; বরং রান্নার ফলে কোন কোন ধাতব লবণের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। লৌহ লবণ অনেক সময় রান্নার ফলে দেহের পক্ষে অধিকতর গ্রহণোপযোগী হইয়া ওঠে। ইহা ছাড়া অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যই জলের মাধ্যমে রান্না করা হয়। এই জল খর জল হইলে উহার ক্যালসিয়াম খাদ্যের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি করে। লবণ সমূহ জলে দ্রবণীয়। এইজন্য রান্নার জল ফেলিয়া দিলে প্রায় সমস্ত ধাতব লবণটুকুই নষ্ট হইয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বস্ত্র ধৌতিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

জামা কাপড় পরিষ্কার করিতে যে সমস্ত সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তাহার কথা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। উহা ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত দ্রব্যাদি বস্ত্র ধৌতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই কথাই এই অধ্যায়ে আলোচনা করিব। এই ধরনের দ্রব্যাদির মধ্যে (১) জল, (২) সাবান, সোডা, রিঠা ইত্যাদি, (৩) অ্যামোনিয়া, (৪) স্টার্চ, (৫) বোরাক্স, (৬) নীল, (৭) ভিনিগার, (৮) লবণ, (৯) গঁদ, (১০) মেথিলেটেড স্পিরিট ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

জল—বস্ত্র ধৌতিতে জলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ধাতব পদার্থের উপস্থিতি অনুযায়ী জলকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—মৃদু জল ও খর জল।

তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, কোন কোন জলে অল্প সাবানেই বেশ তাড়াতাড়ি ফেনা (lather) উৎপন্ন হয়। আবার এমন জলও দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে সহজে কোন ফেনার সৃষ্টি হয় না। অনেক সাবান গুলিলে তবেই ফেনা উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রকারের জলকে **মৃদু জল** (Soft water) এবং দ্বিতীয় প্রকারের জলকে **খর জল** (Hard water) বলে। বস্ত্র ধৌতিতে মৃদু জল খর জল অপেক্ষা অধিক উপযোগী। জামা-কাপড় উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইলে সর্বদাই খর জলকে মৃদু জলে রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। খর জল হইতে মৃদু জল প্রস্তুত করিবার প্রণালীটি বুঝিতে হইলে জলের খরতার (Hardness) কারণ সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন।

খর জল—জলে ধুলা, বালি প্রভৃতি ময়লা দ্রব্যাদি ছাড়াও সাধারণত বিভিন্ন ধাতব লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় বর্তমান থাকে। পুকুর বা টিউবওয়েলের জল দেখিতে খুব স্বচ্ছ, কিন্তু এই স্বচ্ছ জলেও ঐ সকল ধাতব লবণ অদৃশ্য অবস্থায় রহিয়াছে। এই জল একটি পরিষ্কার পাত্রে লইয়া উত্তাপের সাহায্যে বাষ্পীভূত করিলে পাত্রের তলায় এক প্রকার সাদা গুঁড়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইবে। এই সাদা গুঁড়াই জলের অদৃশ্য ধাতব লবণ। বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণের মধ্যে

ক্যালসিয়াম (Calcium), ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) এবং লৌহ (Iron) এই তিন প্রকার ধাতুর যে-কোন এক বা একাধিকটির ক্লোরাইড (Chlorides), সালফেট (Sulphates) বা বাইকার্বোনেট (Bicarbonates) লবণ জলে দ্রবীভূত থাকিলে জল খরতা প্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধাতু, যথা—সোডিয়াম (Sodium), পটাসিয়াম (Potassium) ইত্যাদির লবণ জলে খরতার সৃষ্টি করে না। সুতরাং যদি কোন জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা লৌহের ঐ সকল লবণ থাকে তাহা হইলে ঐ জলে সাবান গুলিলে সহজে ফেনা হইবে না, অযথা সাবানের অপচয় হইবে।

খর জলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) অস্থায়ী (Temporary);

(২) স্থায়ী (Permanent)।

অস্থায়ী খর জল—ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা লৌহের বাইকার্বোনেট লবণ বর্তমান থাকিলে জলকে অস্থায়ী খর জল বলে। অস্থায়ী খরতা ফুটাইয়া বা চুনের জলের সাহায্যে অতি সহজেই দূর করা যায়।

স্থায়ী খর জল—যে জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম অথবা লৌহের ক্লোরাইড বা সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকে তাহাকে স্থায়ী খর জল বলে। এই প্রকার জলের খরতা দূর করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। ফুটাইয়া বা চুনের জলের সাহায্যে এই খরতা দূর করা যায় না।

সুতরাং বস্ত্র ধৌতির জন্য জল যেভাবে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে তাহা হইতেছে নিম্নরূপ :
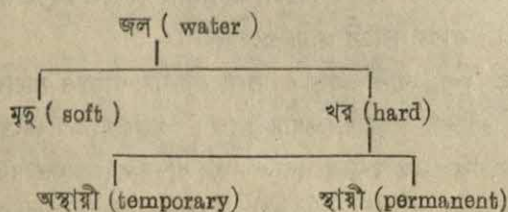
খর জল মৃদু জলে রূপান্তরিত করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি

অস্থায়ী খর জল—অস্থায়ী খরতার কারণ তোমরা পড়িয়াছ। দ্রবীভূত ধাতব বাই-কার্বোনেট সমূহকে কোন প্রকারে ধাতব কার্বোনেটে পরিণত করিলেই উহারা তলানিরূপে নীচে থিতাইয়া পড়িবে, কারণ, ঐ সকল ধাতব কার্বোনেট-সমূহ জলে অদ্রবণীয়। খর জলকে মৃদু জলে রূপান্তরিত করিবার ইহাই মূল কথা। সাধারণত দুইটি পদ্ধতিতে এই প্রকার খর জল মৃদু জলে পরিণত করা হইয়া থাকে—(১) ফুটান পদ্ধতি (Boiling process) এবং (২) ক্লার্কের পদ্ধতি (Clark's process)।

ফুটান পদ্ধতি—এই পদ্ধতিটি খুবই সহজ। একটি পাত্রে অস্থায়ী খর জল লইয়া কিছুক্ষণ ফুটাইতে থাক। ইহার ফলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং লৌহের বাই-কার্বোনেট লবণসমূহ ভাঙ্গিয়া ধাতব কার্বোনেটে পরিণত হইবে। ঐ সকল ধাতব কার্বোনেটসমূহ জলে অদ্রবণীয়। সুতরাং ফুটাইবার পর ঠাণ্ডা করিলেই জল হইতে ধাতব কার্বোনেটসমূহ তলানিরূপে পাত্রের নীচে পড়িয়া যায়। উপরের পরিষ্কার মৃদু জলটুকু ঐ তলানি হইতে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই প্রকারে মৃদু জল প্রস্তুত করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ, ইহাতে জ্বালানি খরচ বেশী পড়ে। বাড়িতে অল্প পরিমাণ মৃদু জল প্রস্তুত করিবার পক্ষে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী, ধোপাদের পক্ষে এই পদ্ধতি মোটেই লাভজনক নয়।

ক্লার্কের পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে খর জলের সহিত চুনের জল (slaked line) মিশ্রিত করিতে হয়। একটি পাত্রে কিছু চুন জলে গুলিয়া ঐ চুনের জল ধীরে ধীরে খর জলের সহিত মিশ্রিত করিলে জলের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং লৌহ ধাতুসমূহ কার্বোনেট এবং হাইড্রোক্সাইড (hydroxide) আকারে পাত্রের নীচে থিতাইয়া পড়ে। উপরের পরিষ্কার জল অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইতে হয়।

এই পদ্ধতিটি ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ লাভজনক, কারণ, ইহাতে খুব সামান্য ব্যয়ে অধিক পরিমাণ মৃদু জল পাওয়া যাইতে পারে। তবে এই পদ্ধতির একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে চুনের জল ঠিক পরিমাণ মত মিশাইতে হয়, অতিরিক্ত

চুনের জলে খরতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা প্রথমে জলের খরতা (hardness) নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। এই পরীক্ষা সাধারণত গৃহস্থ বাড়ীতে করা সম্ভব নয়, নিকটস্থ কোন রাসায়নিক পরীক্ষাগার হইতে করাইতে হয়।

স্থায়ী খর জল—জলের স্থায়ী খরতার কারণও তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং লৌহের ক্লোরাইড এবং সালফেট লবণসমূহকে অদ্রবণীয় তলানিরূপে থিতাইয়া এই প্রকার জল হইতে মৃদু জল প্রস্তুত করা হয়। জল ফুটাইলে কিংবা চুনের জল মিশ্রিত করিলে ঐ সকল ধাতব লবণসমূহ থিতাইয়া পড়িবে না। সাধারণত যে তিনটি পদ্ধতিতে এই খরতা দূর করা হয়, তাহা হইতেছে:—(১) **সোডা পদ্ধতি** (Sodium Carbonate Process); (২) **পারমুটিট পদ্ধতি** (Permutit Process) (৩) **ক্যালগন পদ্ধতি** (Calgon Process)।

সোডা পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে একটি পাত্রে কিছু কাপড় কাচা সোডা একটু গরম জলে গুলিয়া লইতে হয়। এই সোডার জল খর জলে ঢালিয়া একটি কাঠি দ্বারা নাড়িতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং লৌহ ধাতব লবণসমূহ কার্বোনেটরূপে পাত্রের নীচে থিতাইয়া পড়িবে। খর জল গরম করিয়া লইলে ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা তাড়াতাড়ি তলানি পড়িবে।

এই পদ্ধতিতে গৃহে অতি সহজেই মৃদু জল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কতটুকু জলে কতটুকু সোডা মিশ্রিত করিতে হয় তাহা জলের খরতা জানা না থাকিলে সঠিকরূপে বলা যায় না। জলের খরতা ১০ ডিগ্রী হইলে প্রতি ১০ গ্যালন জলে $\frac{1}{4}$ আউন্স সোডা মিশ্রিত করিতে হয়। জলের খরতা জানা না থাকিলে নিম্নলিখিত উপায়ে সোডার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যায়।

সোডার জল একটু একটু করিয়া খর জলে মিশাইয়া নাড়িতে থাকিবে। মাঝে মাঝে নাড়া বন্ধ করিয়া উপর হইতে একটু পরিষ্কার জল অন্য পাত্রে লইয়া উহাতে একটু স্বচ্ছ সোডার জল মিশ্রিত করিবে। যদি ইহাতে ঐ জল অস্বচ্ছ ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করে বা উহাতে তলানি পড়ে তবে খর জলে আরও সোডার জল লাগিবে বুঝিতে হইবে। যদি সোডার জল মিশ্রিত করিবার পর উহাতে কোন তলানি না পড়ে এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকে তবে খর জল মৃদু জলে পরিণত হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং ইহাতে আর সোডার জল ব্যবহার করিতে হইবে না।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে মৃদু জল প্রস্তুত করিবার সময় জলে সোডার পরিমাণ একটু বেশী হইলেও ঐ জলে সূতি এবং লিনেনের কাপড়ের কোন ক্ষতি হইবে না। রঙিন, ছাপা, রেশম এবং পশমের জামা কাপড় অতিরিক্ত সোডার সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় বস্ত্রাদিতে ব্যবহৃত জল মৃদু করিবার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। এই প্রণালীতে জলের স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয় প্রকার খরতাই দূরীভূত হয়।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শুধু সোডা ব্যবহার করিলে খরচ বেশী পড়ে। এইজন্য সোডার পরিমাণ কমাইয়া উহার সহিত সামান্য চুন এবং কখনও কখনও কষ্টিক সোডা (Caustic soda) ব্যবহার করা হয়। উহাতে অল্প খরচে উভয় প্রকার খরতাই দূর করা যায়।

পারমুটিট পদ্ধতি—ইহাই আধুনিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পারমুটিট নামে এক প্রকার কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। পারমুটিট প্রাকৃতিক জিওলাইটের (Zeolite) ন্যায় সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট (Sodium Aluminium Silicate) দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। পারমুটিট খর জলের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং লৌহজাত লবণসমূহ অনায়াসেই শোষণ করিয়া উহাকে মৃদু জলে পরিণত করিতে পারে।

পারমুটিট পদ্ধতিতে জল মৃদুকরণ

একটি গোল লম্বা পিপার মত পাত্রের তলদেশে কিছু পরিষ্কার ছোট ছোট পাথরের টুকরার উপরে পারমুটিটের একটি পুরু স্তর রাখিয়া উপরে আরও কিছু ছোট ছোট পাথরের টুকরা বিছাইয়া একটি পারমুটিট যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়। একটি নলের সাহায্যে খর জল এই যন্ত্রের মধ্যে উপর দিক হইতে চালিত করিতে হয়। উপর হইতে এই জল পারমুটিটের মধ্য দিয়া চুয়াইয়া পড়িবার (percolate) সময় মৃদু জলে পরিণত হইয়া তলদেশের একটি প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হয়।
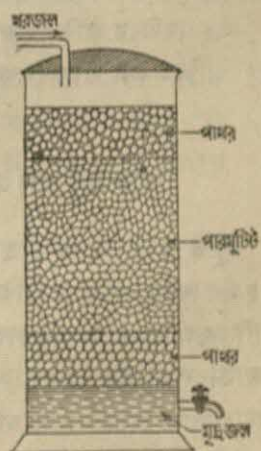
অনেক দিন ব্যবহার করিলে পারমুটিটের কার্যকারিতা নষ্ট হইয়া যায়। তখন উপরের নল হইতে খর জলের পরিবর্তে লবণ জল ঢালিতে হয়।

কিছুক্ষণ লবণ জল ঢালিলে পারমুটিটের কার্যক্ষমতা আবার ফিরিয়া আসে এবং পুনরায় খর জল হইতে মৃদু জল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

এই পদ্ধতিতে অতি সামান্য ব্যয়ে অধিক পরিমাণে মৃদু জল প্রস্তুত করিতে পারা যায়। সুতরাং ব্যবসার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ সুবিধাজনক। গৃহেও ছোটখাট একটি পারমুটিট যন্ত্র থাকিলে অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প ব্যয়ে মৃদু জল পাওয়া যাইতে পারে। অনেক ব্যবসায়ী পারমুটিট যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। তাহাদের নিকট হইতে তোমার প্রয়োজনমত একটি যন্ত্র কিনিয়া আনিতে পার। এই পদ্ধতিতে স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয় প্রকার খরতাই দূর করা যায়।

ক্যালগন পদ্ধতি—ক্যালগন একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ। ইহার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম হেক্সামেটাফসফেট (Sodium hexameta-phosphate)। খর জলে এই ক্যালগন দ্রবীভূত করিলে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উহা জলের খরতা দূর করে। অন্যান্য পদ্ধতির সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এই পদ্ধতিতে কোন প্রকার তলানি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং প্রয়োজনমত ক্যালগন ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া লইয়া সরাসরি ঐ জল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এই পদ্ধতিতে অতি সহজেই খর জল মৃদু জলে পরিণত করা যায়। এইজন্য ইহা বাড়িতে এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে মৃদু জল প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

গৃহে মৃদু জল প্রস্তুতির কয়েকটি সহজ প্রণালী

সূতি ও লিনেনের বস্ত্রাদির জন্য মৃদু জল প্রস্তুতি—খর জল হইতে মৃদু জল প্রস্তুত করিবার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি তোমরা পড়িলে। সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে জামা কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য যে মৃদু জল প্রয়োজন হয় তাহা **সোডা পদ্ধতিতে** প্রস্তুত করাই সর্বাপেক্ষা সহজ, কারণ, সোডা অতি অনায়াসলভ্য বস্তু এবং প্রস্তুত প্রণালীও তেমন কষ্টসাধ্য নয়। (প্রস্তুত প্রণালী পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে)।

ক্যালগন এবং পারমুটিট পদ্ধতিতেও গৃহে মৃদু জল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল দ্রব্যাদি সর্বত্র কিনিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র রাসায়নিক দ্রব্যাদি (Chemicals) বিক্রেতাদের নিকটেই উহা পাওয়া যায়।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এই সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার ঝামেলাটুকু পোহাইতে রাজী হইবে না। তাছাড়া পারমুটিট পদ্ধতিতে শুধু পারমুটিট হইলে চলিবে না, যন্ত্রটি প্রস্তুত করিয়া কার্যোপযোগী করিয়া তোলাও কষ্টসাধ্য। এইজন্য বাড়িতে মৃদুজল প্রস্তুত করিতে হইলে সোডা পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা সহজ।

রেশম ও পশম বস্ত্রাদির জন্য মৃদুজল প্রস্তুতি—রেশম, পশম এবং রঙিন জামা কাপড় ক্ষার দ্রব্যের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য এই সকল কাপড় ধুইবার জন্য মৃদু জল প্রস্তুতিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। অ্যামোনিয়া (Ammonia) এই প্রকার মৃদুজল প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ উপযোগী। ইহাতে জল অত্যধিক ক্ষারভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। একটি পাত্রে খর জল লইয়া উহাতে ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়া ঢালিতে হয়। অ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে জলের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং লৌহ লবণ সমূহ হাইড্রোক্সাইডরূপে নীচে থিতাইয়া পড়ে। উপরে পরিষ্কার মৃদুজল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয় প্রকার খরতাই দূর করা যায়।

কখনও কখনও **বোরাক্সের** (Borax) সাহায্যেও এই প্রকার মৃদু জল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বোরাক্স একটি রাসায়নিক পদার্থ। ইহার সাহায্যে জল মৃদু করিয়া রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান কাপড় ধুইতে পারা যায়। বোরাক্স প্রথমে একটু জলে গুলিয়া লইতে হয়। এই জল খর জলে মিশাইলে অনিষ্টকারী ধাতব লবণসমূহ তলানিরূপে নীচে পড়িয়া যায়। অত্যধিক খর জলেই বোরাক্স ব্যবহার করা হয়।

বাড়িতে মৃদু জলের একটি সহজতম এবং বড় উৎস হইল বৃষ্টির জল। তোমরা জান যে সমুদ্র, নদী, পুকুর, ডোবা ইত্যাদির জল সূর্যতাপে অনবরত বাষ্পীভূত হইয়া মেঘ সৃষ্টি করে। জলীয় বাষ্পের সহিত জলের দ্রবীভূত লবণসমূহ বাষ্পীভূত হইতে পারে না। সুতরাং মেঘ হইতে যখন বৃষ্টি হয় তখন সেই বৃষ্টির জলেও ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদির লবণ থাকে না। ফলে বৃষ্টির জল স্বাভাবিক উপায়েই মৃদু জল থাকিয়া যায়। বৃষ্টির জল তাই সকল প্রকার বস্ত্র ধৌতির পক্ষে উপযোগী।

মৃদু এবং খর জল চিনিবার উপায়—একটি বড় শিশি বা বোতলে কিছু জল লইয়া উহাতে সামান্য পরিমাণ সাবান মিশাইয়া জোরে ঝাঁকাইতে

থাক। যদি ইহাতে বোতলে ফেনা উৎপন্ন হয় তবে ঐ জল মৃদু জল। ফেনার পরিবর্তে যদি জলের উপরে ময়লার একটি স্তর ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায় তবে ঐ জল খর জল বলিয়া জানিবে।

বস্ত্র-ধৌতিতে মৃদু জল ব্যবহার করিবার কারণ—(১) মৃদুজলে অল্প সাবানেই ফেনা উৎপন্ন হয়। সুতরাং সাবান, সোডা ইত্যাদি কম খরচ হয়। (২) খর জলের লৌহ ধাতবলবণ কাপড়ে লালচে দাগের সৃষ্টি করিতে পারে। মৃদুজলে এই ধরনের কোন দাগ পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। (৩) খর জল অপেক্ষা মৃদু জলে তাড়াতাড়ি ফেনা উৎপন্ন হয়। সুতরাং মৃদু জলে কাপড় পরিষ্কার করিতে সময় ও পরিশ্রম কম ব্যয় হয়।

সাবান—ইহা একটি উৎকৃষ্ট পরিষ্কারক দ্রব্য। বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acids), যথা—পামিটিক অ্যাসিড (Palmitic acid), ওলেয়িক অ্যাসিড (Oleic acid) ইত্যাদির সহিত কষ্টিক পটাশ বা কষ্টিক সোডার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক প্রকার পটাশিয়াম বা সোডিয়াম ধাতুর লবণ প্রস্তুত হয়। এই লবণই সাবান নামে পরিচিত। সাধারণত ফ্যাটি অ্যাসিডের সহিত সরাসরি বিক্রিয়া না ঘটাইয়া বিভিন্ন প্রকার চর্বি এবং তেল, যথা—গরুর চর্বি, শুকরের চর্বি, নারিকেল তেল, বাদাম তেল ইত্যাদির সহিত কষ্টিক সোডার দ্রবণের রাসায়নিক সংযোগ ঘটান হয়। কষ্টিক সোডার দ্রবণকে 'লাই' (lye) বলে। একটি লোহার পাত্রে চর্বি, তেল ইত্যাদির সহিত পরিমাণমত 'লাই' মিশ্রিত করিয়া কয়েক ঘণ্টা উত্তপ্ত করিতে হয়। বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে উহাতে লবণ জল মিশাইতে হয়। শক্ত সাবান উপরে ভাসিয়া উঠে। উহা ছাঁকিয়া লইয়া শুকাইয়া বাজারে বিক্রি করা হয়। সাবান ছাঁকিয়া লইবার পর যে জলীয় অংশটুকু পড়িয়া থাকে উহা গ্লিসারিন। পরিশোধন করিয়া এই গ্লিসারিনও বাজারে বিক্রি হয়।

চর্বি+'লাই'=সাবান+গ্লিসারিন

বাজারে বিভিন্ন প্রকারের সাবান দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সাবানে কষ্টিক সোডার পরিমাণ এত বেশী থাকে যে কাপড় ধুইবার পক্ষে উহা মোটেই উপযোগী নয়। অনেক সময় সাবানে জলের পরিমাণ বেশী থাকে। এই প্রকার সাবান নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করা হয়। সাবানের ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবসায়িগণ উহাতে রজন (resin), সিলিকেট ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া

থাকে। রজনের সংস্পর্শে কাপড়ে হলদে দাগ পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। কাপড় **ধুইবার উপযোগী সাবানের নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণ থাকিবে:—**

(১) সাবান দেখিতে হলদে বা খুব গাঢ় রংয়ের হইবে না। পরিষ্কার ঈষৎ ফ্যাকাশে রংয়ের সাবানই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান।

(২) অঙ্গুলির সাহায্যে ঈষৎ চাপ দিলে শক্ত বলিয়া মনে হইবে, উহাতে কোন গর্ত হইবে না।

(৩) একখানি সাবান ওজন করিয়া একমাস ঘরে রাখিয়া দাও। এক মাস পরে আবার ওজন কর। যদি ওজন এক-পঞ্চমাংশের ($\frac{1}{5}$) বেশী হ্রাস পায় তবে উহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান।

(৪) সাবানের গায়ে গুঁড়া গুঁড়া পাউডারের মত ফুটিয়া উঠিলে উহাতে অত্যধিক ক্ষার আছে জানিবে। কাপড়ের পক্ষে এই জাতীয় সাবান ক্ষতিকারক।

কুচা সাবান (Soap flakes)—বাজারে আজকাল অনেক রকম কুচা সাবান কিনিতে পাওয়া যায়। এইগুলি অতি সাবধানতার সহিত প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং কোন ভেজাল বা অতিরিক্ত ক্ষার ইহাতে থাকে না। জলে গুলিলে ইহাতে প্রচুর ফেনা হয় এবং ঐ জলে কাপড়খানি আলগা হাতে রগড়াইলেই ময়লা বাহির হইয়া আসে। অতিরিক্ত ক্ষার না থাকায় রেশম, পশম ইত্যাদি জাতীয় বস্ত্রাদিই এই কুচা দ্বারা পরিষ্কার করা হইয়া থাকে।

গুঁড়া সাবান (Soap powders)—এই জাতীয় সাবানের পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা সাধারণত কুচা সাবান অপেক্ষা বেশী। তবে অনেক গুঁড়া সাবানেই অতিরিক্ত ক্ষার থাকে। ফলে ঐ সকল গুঁড়া সাবান দামী রেশম বা পশমের কাপড়ে ব্যবহার করা যায় না। গুঁড়া সাবানের প্যাকেটের গায়ে ব্যবহারের যে নির্দেশ থাকে তাহা হইতেই উহা কি প্রকার কাপড় ধুইবার উপযোগী তাহা জানিতে পারিবে। জলে পরিমাণমত গুঁড়া মিশাইয়া নাড়িলেই প্রচুর ফেনা উৎপন্ন হয়। কাপড়খানি ঐ জলে ভিজাইয়া রগড়াইলেই ময়লা বাহির হইয়া যায়।

সিন্‌থেটিক ডিটারজেণ্ট (Synthetic detergents)—পেট্রোলিয়াম হইতে প্যারাফিন ওয়াক্স (Paraffin Wax) বা মোম পাওয়া যায়। এই মোম হইতেই মোমবাতি (Candle) প্রস্তুত হয়। আজকাল এই প্যারাফিন ওয়াক্সের একটা অংশ হইতে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া উহার

থাক। যদি ইহাতে বোতলে ফেনা উৎপন্ন হয় তবে ঐ জল মৃদু জল। ফেনার পরিবর্তে যদি জলের উপরে ময়লার একটি স্তর ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায় তবে ঐ জল খর জল বলিয়া জানিবে।

বস্ত্র-ধৌতিতে মৃদু জল ব্যবহার করিবার কারণ—(১) মৃদুজলে অল্প সাবানেই ফেনা উৎপন্ন হয়। সুতরাং সাবান, সোডা ইত্যাদি কম খরচ হয়। (২) খর জলের লৌহ ধাতবলবণ কাপড়ে লালচে দাগের সৃষ্টি করিতে পারে। মৃদুজলে এই ধরনের কোন দাগ পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। (৩) খর জল অপেক্ষা মৃদু জলে তাড়াতাড়ি ফেনা উৎপন্ন হয়। সুতরাং মৃদু জলে কাপড় পরিষ্কার করিতে সময় ও পরিশ্রম কম ব্যয় হয়।

সাবান—ইহা একটি উৎকৃষ্ট পরিষ্কারক দ্রব্য। বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acids), যথা—পামিটিক অ্যাসিড (Palmitic acid), ওলেয়িক অ্যাসিড (Oleic acid) ইত্যাদির সহিত কষ্টিক পটাশ বা কষ্টিক সোডার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক প্রকার পটাশিয়াম বা সোডিয়াম ধাতুর লবণ প্রস্তুত হয়। এই লবণই সাবান নামে পরিচিত। সাধারণত ফ্যাটি অ্যাসিডের সহিত সরাসরি বিক্রিয়া না ঘটাইয়া বিভিন্ন প্রকার চর্বি এবং তেল, যথা—গরুর চর্বি, শুকরের চর্বি, নারিকেল তেল, বাদাম তেল ইত্যাদির সহিত কষ্টিক সোডার দ্রবণের রাসায়নিক সংযোগ ঘটান হয়। কষ্টিক সোডার দ্রবণকে 'লাই' (lye) বলে। একটি লোহার পাত্রে চর্বি, তেল ইত্যাদির সহিত পরিমাণমত 'লাই' মিশ্রিত করিয়া কয়েক ঘণ্টা উত্তপ্ত করিতে হয়। বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে উহাতে লবণ জল মিশাইতে হয়। শক্ত সাবান উপরে ভাসিয়া উঠে। উহা ছাঁকিয়া লইয়া শুকাইয়া বাজারে বিক্রি করা হয়। সাবান ছাঁকিয়া লইবার পর যে জলীয় অংশটুকু পড়িয়া থাকে উহা গ্লিসারিন। পরিশোধন করিয়া এই গ্লিসারিনও বাজারে বিক্রি হয়।

চর্বি+'লাই'=সাবান+গ্লিসারিন

বাজারে বিভিন্ন প্রকারের সাবান দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সাবানে কষ্টিক সোডার পরিমাণ এত বেশী থাকে যে কাপড় ধুইবার পক্ষে উহা মোটেই উপযোগী নয়। অনেক সময় সাবানে জলের পরিমাণ বেশী থাকে। এই প্রকার সাবান নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করা হয়। সাবানের ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবসায়িগণ উহাতে রজন (resin), সিলিকেট ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া

থাকে। রজনের সংস্পর্শে কাপড়ে হলদে দাগ পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। **কাপড় ধুইবার উপযোগী সাবানের নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণ থাকিবে :—**

(১) সাবান দেখিতে হলদে বা খুব গাঢ় রংয়ের হইবে না। পরিষ্কার ঈষৎ ফ্যাকাশে রংয়ের সাবানই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান।

(২) অঙ্গুলির সাহায্যে ঈষৎ চাপ দিলে শক্ত বলিয়া মনে হইবে, উহাতে কোন গর্ত হইবে না।

(৩) একখানি সাবান ওজন করিয়া একমাস ঘরে রাখিয়া দাও। এক মাস পরে আবার ওজন কর। যদি ওজন এক-পঞ্চমাংশের ($\frac{1}{5}$) বেশী হ্রাস পায় তবে উহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান।

(৪) সাবানের গায়ে গুঁড়া গুঁড়া পাউডারের মত ফুটিয়া উঠিলে উহাতে অত্যধিক ক্ষার আছে জানিবে। কাপড়ের পক্ষে এই জাতীয় সাবান ক্ষতিকারক।

কুচা সাবান (Soap flakes)—বাজারে আজকাল অনেক রকম কুচা সাবান কিনিতে পাওয়া যায়। এইগুলি অতি সাবধানতার সহিত প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং কোন ভেজাল বা অতিরিক্ত ক্ষার ইহাতে থাকে না। জলে গুলিলে ইহাতে প্রচুর ফেনা হয় এবং ঐ জলে কাপড়খানি আলগা হাতে রগড়াইলেই ময়লা বাহির হইয়া আসে। অতিরিক্ত ক্ষার না থাকায় রেশম, পশম ইত্যাদি জাতীয় বস্ত্রাদিই এই কুচা দ্বারা পরিষ্কার করা হইয়া থাকে।

গুঁড়া সাবান (Soap powders)—এই জাতীয় সাবানের পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা সাধারণত কুচা সাবান অপেক্ষা বেশী। তবে অনেক গুঁড়া সাবানেই অতিরিক্ত ক্ষার থাকে। ফলে ঐ সকল গুঁড়া সাবান দামী রেশম বা পশমের কাপড়ে ব্যবহার করা যায় না। গুঁড়া সাবানের প্যাকেটের গায়ে ব্যবহারের যে নির্দেশ থাকে তাহা হইতেই উহা কি প্রকার কাপড় ধুইবার উপযোগী তাহা জানিতে পারিবে। জলে পরিমাণমত গুঁড়া মিশাইয়া নাড়িলেই প্রচুর ফেনা উৎপন্ন হয়। কাপড়খানি ঐ জলে ভিজাইয়া রগড়াইলেই ময়লা বাহির হইয়া যায়।

সিন্‌থেটিক ডিটারজেণ্ট (Synthetic detergents)—পেট্রোলিয়াম হইতে প্যারাফিন ওয়াক্স (Paraffin Wax) বা মোম পাওয়া যায়। এই মোম হইতেই মোমবাতি (Candle) প্রস্তুত হয়। আজকাল এই প্যারাফিন ওয়াক্সের একটা অংশ হইতে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া উহার

সহিত সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় এই ডিটারজেণ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিক্রিয়ার পর অতিরিক্ত অ্যাসিড কষ্টিক সোডার সাহায্যে প্রশমিত করা হয়।

ডিটারজেণ্ট এক প্রকার ক্ষারবিহীন পরিষ্কারক দ্রব্য। ইহার পরিষ্কার করিবার ক্ষমতাও খুব বেশী। এই জন্যই রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্রাদি ইহার সাহায্যে নির্ভয়ে ধুইতে পারা যায়। রঙিন বস্ত্রাদির রং চটিয়া যাইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার আরও একটি সুবিধা এই যে, খর জল সাধারণ সাবানের ন্যায় ইহার সহিত অদ্রাব্য ময়লা (Scum) উৎপন্ন করে না।

কাপড় কাচিবার সোডা (Washing soda)—আগেকার দিনে গ্রামাঞ্চলে সাজিমাটি, কলা, বাসনার ছাই ইত্যাদি কাপড় পরিষ্কারে ব্যবহৃত হইত। উহাদের মধ্যে কিছু সোডা বা সোডিয়াম কার্বোনেট থাকে এবং উহাই কাপড় পরিষ্কার হইবার মূল কারণ। কাপড় কাচিবার সোডাকে সাধারণ লোকে শুধু সোডা এবং বিজ্ঞানিগণ সোডিয়াম কার্বোনেট বলিয়া থাকেন। উহা লবণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়।

সোডার জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয়। এইজন্য রেশম বা পশমের বস্ত্রাদি উহার সাহায্যে পরিষ্কার করা হয় না। কিন্তু সুতির বস্ত্রাদি সোডার সাহায্যে অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়। বিশেষত ইহার পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা খুব বেশী বলিয়া অধিক ময়লা বস্ত্রাদি সোডার সাহায্যেই পরিষ্কার করা হয়।

সোডা খর জল মৃদু করিতে এবং কখনও কখনও চা ও ফলের দাগ উঠাইতেও ব্যবহার করা হয়।

রিঠা (Rita nuts)—আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই এই রিঠা ফল রেশম এবং পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা এক প্রকার গাছের ফল। ইহার সাহায্যে দামী এবং মিহি কাপড় ধোওয়া হইয়া থাকে। রঙিন কাপড়ের রং ইহাতে মোটেই নষ্ট হয় না। উপরন্তু খর জলের খরতাও রিঠা ব্যবহারে তেমন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। রিঠার মধ্যে স্যাপোনিন (Saponin) নামে একটি পদার্থ আছে। এই স্যাপোনিনই কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করিয়া থাকে। রিঠার জল মৃদু আম্লিক (acidic)। স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজকরা বস্ত্রাদি এই রিঠার সাহায্যে খুব

ভাল পরিষ্কার হয়। রিঠা ফলের কোষগুলি একরাত্রি গরম জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। সকালে ঐ খোসাগুলি জলের মধ্যে ভাল করিয়া চটকাইলে অনেক ফেনার সৃষ্টি হয়। খোসাগুলি ফেলিয়া ঐ জলে ময়লা কাপড় ভিজাইয়া রগড়াইলে ময়লা উঠিয়া যায়। পরে কাপড়খানি ভাল করিয়া কয়েকবার ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

তুষের জল (Bran water)—তুষের জলও পরিষ্কারক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গমের বাহিরের অংশকে তুষ বা ভূষি বলে (388 পৃষ্ঠার চিত্রে 'c' অংশ দেখ)। ঐ তুষ একটি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় জড়াইয়া ঠাণ্ডা জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ধীরে ধীরে জল শোষণ করিয়া তুষগুলি ফুলিয়া উঠে। পরে ঐ অবস্থায়ই যতক্ষণ না জলের রং বাদামী বর্ণের হয় ততক্ষণ জল মৃদু তাপে ফুটাইতে হয়। এইবার ন্যাকড়াখানি উঠাইয়া জলটুকু ছাঁকিয়া লইবে। তুষের জল সিন্টজ (Chintz) এবং ক্রিটোন (Cretonne) জাতীয় ছাপা ও রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে কাপড়ে সামান্য কাঠিন্যভাব আসে এবং রঙিন বস্ত্রের রংয়ের কোন ক্ষতি হয় না। ক্রিটোন এবং সিন্ট্জ কাপড় ধুইতে হইলে তুষের জলে সমপরিমাণ ঈষদুষ্ণ গরম জল মিশাইয়া উহাতে সামান্য সাবান গুলিয়া লইতে হয়। কাপড়খানি ঐ জলে ভাল করিয়া রগড়াইলে ময়লা বাহির হইয়া যায়। ময়লা পরিষ্কার হইলে উহা ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইতে হয়। ঠাণ্ডা জলে একটু লবণ ও ভিনিগার মিশাইয়া লইলে কাপড়ের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

শুষ্ক ধৌতিতে (dry cleaning) তুষ ব্যবহার করা হয়।

বোরাক্স (Borax)—তিব্বত, পেরু, চিলি প্রভৃতি অঞ্চলে বোরাক্স পাওয়া যায়। আজকাল সোডিয়াম কার্বোনেট এবং বোরিক অ্যাসিড হইতেও কিছু পরিমাণ বোরাক্স প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোরাক্সের জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয়। ইহা খর জল মৃদু করিতে, কাপড়ে কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোরাক্সের সাহায্যে কাপড়ের কাঠিন্য ভাব বর্ষার দিনেও বজায় থাকে।

অ্যামোনিয়া (Ammonia)—ইহা একপ্রকার তীব্র গন্ধযুক্ত গ্যাস। সাধারণত জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ইহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এই জলীয় দ্রবণকে 'লিকর অ্যামোনিয়া' (liquor ammonia) বলে।

সাদা রেশম এবং পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার জন্য খর জল এই অ্যামোনিয়ার সাহায্যে মৃদু করা হইয়া থাকে। সাধারণত রঙিন বস্ত্রাদি এই প্রকার মৃদু জলে পরিষ্কার করা হয় না। কারণ, অ্যামোনিয়ার সাহায্যে রং চটিয়া যাইতে পারে। কখনও কখনও কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

স্টার্চ (Starch)—ইহা এক প্রকার শ্বেতসার জাতীয় দ্রব্য। চাউল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বস্ত্র ধৌতিতে চাউল হইতে প্রস্তুত স্টার্চই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কারণ, ইহা সহজেই কাপড়ে প্রবেশ করিতে পারে।

স্টার্চ ব্যবহারে কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য এবং ধবধবে ভাব ফিরিয়া আসে। ইহাতে কাপড় সহজে ময়লা হয় না। স্টার্চের দ্রবণ নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করা যায়।

গরম স্টার্চ (Boiling water starch)—বড় চামচের দুই চামচ স্টার্চ একটি পাত্রে লইয়া উহাতে চার চামচ ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া একটি লেই প্রস্তুত করিবে। ইহাতে ছোট চামচের এক চামচ বোরাক্স এবং ছোট এক টুকরা মোম মিশাইবে। বোরাক্সে কাপড়ের কাঠিন্য অনেক দিন বজায় থাকিবে এবং মোমের জন্য ইস্ত্রি করিতে সুবিধা হইবে। ঐ মিশ্রণে ধীরে ধীরে ফুটন্ত জল ঢালিয়া নাড়িতে থাকিবে যতক্ষণ না দ্রবণটি অর্ধ স্বচ্ছ দেখায়। এইবার ইহাতে সামান্য ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া ব্যবহার কর।

ঠাণ্ডা স্টার্চ (Cold water starch)—আবার কখনও কখনও ঠাণ্ডা জলে স্টার্চ গুলিয়া কাপড়ে ব্যবহার করা হয়। যে সকল কাপড়ে অতিরিক্ত কাঠিন্যের প্রয়োজন হয়, (যেমন—মসলিন কাপড়, নার্সদের মাথার ক্যাপ, জামার কলার, আস্তিন ইত্যাদি) কেবলমাত্র সেই সকল কাপড়েই এইরূপ স্টার্চের দ্রবণ ব্যবহার করিতে হয়। ইহা নিম্নলিখিতরূপে প্রস্তুত করা হয়।

চা-চামচের অর্ধ-চামচ বোরাক্স এবং সিকি চামচ মোম একটি পাত্রে লইয়া উহাতে বড় চামচের এক চামচ ফুটন্ত জল ঢালিয়া দ্রবীভূত কর। এই দ্রবণে বড় চামচের এক চামচ স্টার্চ মিশ্রিত করিয়া উহাতে প্রায় ১ পাইন্ট ঠাণ্ডা জল ধীরে ধীরে ঢালিয়া নাড়িতে থাক। কিছুক্ষণ পরে একটি কাপড়ের সাহায্যে ছাঁকিয়া লও। দ্রবণের ঘনত্ব সাধারণত কাপড়ের জমিন এবং প্রয়োজনীয় কাঠিন্যের উপর নির্ভর করে। মিহি কাপড়ে অত্যধিক কাঠিন্যের

প্রয়োজন হইলে গাঢ় দ্রবণই ব্যবহার করিতে হয়। মোটা জমিনের কাপড়ে লঘু দ্রবণেই ভাল কাঠিন্যের সৃষ্টি হয়।

এই প্রকার ঠাণ্ডা স্টার্চের দ্রবণ কাপড়ে ব্যবহার করিতে হইলে কাপড়খানি প্রথমে একেবারে শুষ্ক করিয়া ঐ দ্রবণে ডুবাইতে হয়। কিছুক্ষণ পরে নিংড়াইয়া কাপড় হইতে অতিরিক্ত স্টার্চের দ্রবণ বাহির করিয়া ঐ ভিজা অবস্থায়ই ইস্ত্রি করিয়া লইতে হয়।

নীল (Blue)—কাপড়ে ব্যবহারের জন্য আলট্রামেরাইন (ultramarine), প্রুসিয়ান (Prussian) এবং ইন্‌ডিগো ব্লু (Indigo blue) বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আলট্রামেরাইন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কাপড় পরিষ্কার করিবার সময় সাবান ব্যবহারের ফলে কাপড়ে একটু হলদে ভাব দেখা দেয়। নীল ব্যবহারে কাপড়ের এই হলদে ভাবটি কাটিয়া একটি সুন্দর ঈষৎ নীলাভ শুভ্রতা দেখা দেয়।

নীল একটি ন্যাকড়ায় পুরিয়া জলে বা কলপ মিশ্রিত জলে নাড়াইতে হয়। যখন কিছু জল হাতে করিয়া দেখিলে আকাশের মত নীল বলিয়া মনে হইবে তখন উপযুক্ত পরিমাণ নীল দ্রবীভূত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। নীল জল বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিতে নাই।

ভিনিগার (Vinegar)—আজকাল প্রায় ঘরেই এই দ্রব্যটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অ্যাসেটিক অ্যাসিডের (acetic acid) লঘু দ্রবণ। বস্ত্র ধৌতিতে ইহা কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া রঙিন কাপড়ের রং পরিষ্কার করিবার সময় চটিয়া গেলে জলে সামান্য ভিনিগার মিশাইয়া ঐ জলে কাপড়খানি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে রং ফিরিয়া আসে।

লবণ (Common salt)—লবণের সহিত আমরা সকলেই বিশেষভাবে পরিচিত। আমরা প্রত্যহই খাদ্যের সহিত লবণ খাইয়া থাকি।

রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার সময় সাবান জলে সামান্য লবণ গুলিয়া লইলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় না। ইহা ছাড়া কিছুক্ষণ লবণ-জলে রুমাল ভিজাইয়া রাখিলে নাকের শ্লেষ্মা (mucous) দ্রবীভূত হইয়া যায়। কাপড়ের দাগ তুলিতেও ইহা ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া **গঁদ** (Gum arabic) রেশম ইত্যাদি বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করিতে এবং **মেথিলেটেড স্পিরিট** (methylated spirit) বস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য আনিতে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

ফ্রেঞ্চ চক (French chalk) এবং **ফুলার্স আর্থ** (Fuller's earth) ইত্যাদি পাউডার জাতীয় দ্রব্যাদিও অনেক সময় তৈল জাতীয় ময়লা দূর করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পদ্ধতি
(Removal of Stains)

দাগ কাহাকে বলে ?—অপরিষ্কার জামা-কাপড় সাবান, সোডা ইত্যাদি সাধারণ পরিষ্কারক দ্রব্যাদির সাহায্যে ধুইলেই উহাদের ময়লা দূর হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কখনও জামাকাপড়ে কোন কোন দ্রব্যাদির সাহায্যে এমন একটি বিশেষ ধরনের রঙের বা চিহ্নের সৃষ্টি হয় যে স্বাভাবিক উপায়ে ধুইবার সময় উহা সহজে মিলাইয়া যায় না। উহা অপসারিত করিতে এক বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। জামা-কাপড়ের এই প্রকার রঙ বা চিহ্নকেই দাগ (stain) বলে। উপযুক্ত সময়ে এবং যথাযথ পদ্ধতিতে চেষ্টা না করিলে ঐ দাগ উঠানো অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। মনে রাখিবে পুরানো দাগ অপেক্ষা নতুন দাগ উঠানো অনেক সহজ। তাছাড়া দাগ অনেক দিন কাপড়ে থাকিলে কাপড়খানি নষ্ট হইয়া যাইবারও আশঙ্কা থাকে। সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা উঠাইবার চেষ্টা করিতে হয়।

দাগ উঠাইবার জন্য যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় তাহা মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) **উগ্র অপসারক দ্রব্যাদি,** যথা—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিডের গাঢ় দ্রবণ, কাপড় কাচা সোডা, জাভেলী-ওয়াটার, ক্লোরিন ইত্যাদি। ইহারা অনেকক্ষণ কাপড়ের সংস্পর্শে থাকিলে কোন কোন তন্তুর ক্ষতি করিতে পারে। সুতরাং সাবধানতার সহিত এই সকল দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হয়।

মৃদু অপসারক দ্রব্যাদি, যথা,—অক্সালিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ, ভিনিগার বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড, বেকিং সোডা, অ্যামোনিয়া, বোরাক্স, হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইত্যাদি।

এই সকল দ্রব্যাদি সাধারণত কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না। এই জন্য মিহি এবং দামী কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই জাতীয় দ্রব্যাদি নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য প্রথমেই উগ্র অপসারক ব্যবহার না করিয়া মৃদু অপসারক দ্রব্যাদি হইতেই আরম্ভ করা উচিত। ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড, উভয়েই কাপড়ের দাগ উঠাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু ক্লোরিন উগ্র বলিয়া প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্বারাই দাগ উঠাইবার চেষ্টা করা কর্তব্য। ইহাতে দাগ না উঠিলে তখন ক্লোরিন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আবার বিভিন্ন প্রকারের দাগ উঠাইবার পদ্ধতিও বিভিন্ন। যে প্রণালীতে রক্তের দাগ উঠানো হয় তাহা লোহার দাগ উঠাইবার উপযোগী নয়। সুতরাং কি ভাবে দাগ লাগিয়াছে জানিতে পারিলে দাগ অতি সহজেই দূর করা যায়। তাহা না হইলে একের পর এক বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হইবে যতক্ষণ না ঐ দাগ উঠিয়া যায়। ইহাতে কাপড়ের তন্তু নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

অপসারক দ্রব্যগুলি বিভিন্ন প্রকার তন্তুর উপর বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে। কোন কোন অপসারক সুতি এবং লিনেনের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু উহারা হয়তো রেশম এবং পশমের বস্ত্রাদি একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং দাগ উঠাইবার পূর্বে কাপড়খানি সুতি, রেশম, পশম প্রভৃতি কি প্রকার তন্তু দ্বারা প্রস্তুত তাহা সঠিকভাবে জানিতে হইবে।

সুতি বা লিনেনের উপর সাধারণত মৃদু ক্ষারের (যথা, সোডি-বাই-কার্ব বা খাইবার সোডা, অ্যামোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি) কোন প্রকার খারাপ ক্রিয়া হয় না। এমন কি কাপড়ে কাচা সোডা, সাবান ইত্যাদিও অনায়াসেই ব্যবহার করা চলে। অ্যাসিড কিন্তু এই জাতীয় কাপড়ের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। অ্যাসিডের গাঢ় দ্রবণ কোন ক্রমেই এই কাপড়ে ব্যবহার করা চলে না। এমন কি অক্সালিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করিলেও কাপড়খানি তখনই প্রচুর জলে ধুইয়া সমস্ত অ্যাসিড দূর করিতে হয়। একবার ঐ অ্যাসিড কাপড়ে শুকাইলে কাপড়খানি নরম হইয়া ঐ স্থানে ফাঁসিয়া যাইবে। ব্লিচিং পাউডার এবং ক্লোরিন খুব সাবধানতার সহিত এই জাতীয় কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পশম এবং রেশমের বস্ত্রাদি ক্ষারীয় অপসারক দ্রব্যাদিতে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি মৃদু ক্ষারীয় দ্রব্যাদিও (যথা, অ্যামোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি) সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়। গাঢ় অ্যাসিড ইহাদের তেমন ক্ষতি করিতে পারে

না এবং অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফুটন্ত এবং অত্যধিক গরম জলে এই জাতীয় বস্ত্রাদি ঈষৎ হরিদ্রাভ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ছাড়া পশমের আঁশগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কাপড় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং গরম বা ফুটন্ত জল ব্যবহার না করিয়া ঈষদুষ্ণ জলই ব্যবহার করা কর্তব্য।

রেয়ন বা আর্টিফিসিয়াল সিল্ক হইতে দাগ উঠাইবার জন্য গাঢ় অ্যাসিড বা ক্ষার ব্যবহার করা উচিত নয়। মৃদু অ্যাসিড এবং ক্ষার নির্ভয়ে উহাদের উপর ব্যবহার করা চলে। জলের সংস্পর্শে রেয়নের তন্তুগুলি সাধারণত দুর্বল হইয়া পড়ে। এই জন্য এই শ্রেণীর কাপড়ের দাগ উঠাইতে জল ব্যবহার না করাই ভাল। বোরাক্স এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। এমন কি ক্লোরিন এবং ব্লিচিং পাউডারের লঘু দ্রবণও সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। অ্যাসিটেট রেয়ন অন্যান্য রেয়ন হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইহা অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং গরম ইস্ত্রি ব্যবহারে গলিয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় অপসারক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিবার পূর্বে কাপড়খানি অ্যাসিটেট রেয়নে প্রস্তুত কিনা তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন।

নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি সিন্‌থেটিক তন্তু অ্যাসিড এবং ক্ষারে নষ্ট হয় না। সুতরাং এই প্রকার অপসারক দ্রব্যাদি প্রয়োগে কোন বাধা নাই। জলীয় বাষ্প এই জাতীয় তন্তুতে খুব কম শোষিত হয়। এই জন্য চা, কফি বা ফলের রস ইত্যাদি লাগিলে উহা তন্তুর মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময় জলে দুই একবার ধুইয়া ফেলিলেই ঐ দাগ উঠিয়া যায়। ভিনিয়নের বস্ত্র অ্যাসিটেট রেয়নের মত অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হইয়া যায়। এই জন্য এই প্রকার অপসারক দ্রব্য ভিনিয়ন বস্ত্রের দাগ উঠাইতে ব্যবহার করা যায় না। নাইলনের কাপড়ে অল্প গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যায়।

রঙিন বস্ত্রাদির দাগ উঠাইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, কারণ, অনেক সময় রঙিন বস্ত্রের রং চটিয়া যায়। অ্যাসিডে রং নষ্ট হইয়া গেলে অনেক ক্ষেত্রেই ঐ রং অ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণের সাহায্যে ফিরাইয়া আনা যায়। ক্লোরিন ব্যবহারে রং নষ্ট হইলে উহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না।

বস্ত্রাদি হইতে দাগ উঠাইবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে :—

(১) কাপড়খানি কোন্ শ্রেণীর তন্তু দ্বারা নির্মিত তাহা জানা কর্তব্য ; কারণ, অপসারক দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রকার তন্তুর উপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে।

(২) কি জাতীয় দাগ তাহাও জানা প্রয়োজন। ভুল অপসারক দ্রব্য ব্যবহারে অনেক সময় দাগ না উঠিয়া একেবারে স্থায়িভাবে বসিয়া যায়।

(৩) দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা উঠাইতে হয়। পুরানো দাগ উঠানো অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য।

(৪) কোনও অজানা দাগে কখনও গরম জল ব্যবহার করিবে না। গরম জলে কোন কোন দাগ স্থায়িভাবে বসিয়া যায়।

(৫) কোনও রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইবার পূর্বে অপসারক দ্রব্যটি ঐ রং নষ্ট করিয়া ফেলে কিনা তাহা দেখা কর্তব্য। কাপড়ের এক প্রান্তে সামান্য একটু অপসারক দ্রব্য লাগাইয়া এই পরীক্ষা করিতে হয়।

(৬) প্রথমে মৃদু অপসারক দ্রব্য ব্যবহার করিবে। দাগ না উঠিলে তবেই উগ্র অপসারক দ্রব্যের সাহায্য লইবে।

(৭) দাগ উঠিয়া গেলে কাপড় হইতে অপসারক দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিবে।

(৮) অপসারক দ্রব্য যদি অ্যাসিড হয় তবে দাগ উঠাইবার পর কোন লঘু ক্ষার দ্বারা প্রশমিত করিবে। অনুরূপভাবে কোন ক্ষারযুক্ত অপসারক দ্রব্য লঘু অ্যাসিড দ্বারা প্রশমিত করিতে হয়।

(৯) দাগ উঠাইবার পর তাড়াতাড়ি কাপড়খানি শুকাইয়া লইবে।

দাগের শ্রেণী বিভাগ

(Classification of stains)

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দাগের শ্রেণীবিভাগ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কোন কোন দাগ, যথা—ঘি, মাখন ইত্যাদি, যেমন চর্বি জাতীয় দাগের শ্রেণীভুক্ত, তেমনি উহারা প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদের প্রাণিজ-দাগ শ্রেণীভুক্তও করা যাইতে পারে। মোমের (Paraffin wax) কথাই ধরা যাউক। ইহা পেট্রোলিয়াম হইতে উৎপন্ন এবং বৈজ্ঞানিক মতে **চর্বি জাতীয় পদার্থ নয়।**

ইহা প্রাণিজও নয় এবং উদ্ভিজ্জও নয়; প্রকৃত পক্ষে ইহা খনিজ এবং এই শ্রেণীর দাগকে **খনিজ দাগ** বলাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ঘি, মাখন ইত্যাদি চর্বি জাতীয় দাগ যেভাবে উঠান হয়, ঠিক সেই পদ্ধতিতে ইহাও দূর করা যায় বলিয়া মোমের দাগকে চর্বি জাতীয় দাগ বলা হয়। আবার '**আয়োডিন**'-এর দাগকে অনেকে **ধাতব দাগ** বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞানিগণ ইহাকে অধাতু (non-metal) বলিয়া গণ্য করেন। সুতরাং আয়োডিন জাতীয় দাগ অধাতব দাগ—ইহাই বিজ্ঞানসম্মত।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার দাগগুলিকে ভাগ করিবার একটি পদ্ধতি দেখান হইল।

(১) **উদ্ভিজ্জ দাগ**—ইহারা উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে উৎপন্ন, যথা—

(ক) বিভিন্ন প্রকার পানীয়ের দাগ—চা, কোকো, কফি, মদ ইত্যাদি।

(খ) বিভিন্ন প্রকার ফলের দাগ—আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

(গ) কোন সবুজ পাতার দাগ—ঘাসের দাগ, পাতার দাগ ইত্যাদি।

(২) **প্রাণিজ দাগ**—ইহারা প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন; যথা—রক্ত, কফ, ডিম ইত্যাদির দাগ।

(৩) **তৈল বা চর্বি জাতীয় দাগ,** যথা—ঘি, মাখন, মোম, বিভিন্ন প্রকার তেল ইত্যাদির দাগ।

(৪) **রাসায়নিক পদার্থের দাগ**—রাসায়নিক দ্রব্যাদি হইতে এই দাগের সৃষ্টি হয়; যথা—সিলভার নাইট্রেট, আয়োডিন বা টিংচার আয়োডিন ইত্যাদির দাগ।

(৫) **রংয়ের দাগ,** যথা—লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রং, নেল পলিশ প্রভৃতির দাগ।

(৬) **বিশেষ ধরনের দাগ,** যথা—লোহা বা মরিচা, কালি, ঘাম ইত্যাদির দাগ।

বিভিন্ন প্রকার পানীয়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী—চা, কফি, কোকো, ইত্যাদি পানীয় দ্রব্যে ট্যানিন (tannin) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। কাপড়ে এই জাতীয় পানীয়ের দাগ সাধারণত ট্যানিন হইতেই উৎপন্ন হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ট্যানিনের দাগ প্রায় দেখা যায় না বলিলেই হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে উহা বাদামী রং ধারণ করে, বিশেষত সাবান জল দিয়া ঐ দাগ উঠাইবার চেষ্টা করিলে আরও স্থায়িভাবে কাপড়ে বসিয়া যায়।

গরম ইস্ত্রির সংস্পর্শেও এই দাগ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা উঠাইতে হয়।

প্রথমে দাগযুক্ত অংশটিকে একটি শুষ্ক কাপড়ের প্যাড-এর উপর টান করিয়া চাপিয়া ধর। অন্য একটি ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া এইবার ধীরে ধীরে ঐ দাগের উপর ঘষিতে থাক। দাগের বাহিরের দিক হইতে বৃত্তাকারে ঘষিতে ঘষিতে উহার কেন্দ্রের দিকে আসিতে হইবে। এইরূপ কয়েকবার ঘষিবার পরও যদি মিলাইয়া না যায় তবে ন্যাকড়াটি একটি সমপরিমাণ অ্যালকোহল ও জলের মিশ্রণে ভিজাইয়া পুনরায় ঐরূপে ঘষিতে থাক। কয়েকবার ঘষিবার পর কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন ঐ জায়গায় ঢালিয়া ভাল করিয়া হাত দিয়া রগড়াইয়া দাও। আধ ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেল। দাগ সম্পূর্ণ না মিলাইলে ফুটন্ত জল দাগের উপর ঢালিবে। বস্ত্রটি রেশম বা পশমের হইলে ফুটন্ত জল না ঢালিয়া ঈষদুষ্ণ জল প্রয়োগ করিবে। অনেক সময় ট্যানিনের দাগ উঠিয়া গিয়া জায়গাটিতে একটি তৈলাক্ত ভাব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে একটি ন্যাকড়ায় কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড মাখাইয়া ঘষিয়া দিলে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে। **এইভাবে সূতি, রেশম, পশম, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ উঠানো যায়।**

দাগ পুরানো হইলে অনেক সময় ব্লিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। **রেশম ও পশমের বস্ত্রে** ঐ দাগযুক্ত স্থানে একটি ন্যাকড়া হাইড্রোজেন পারক্সাইড-এ ভিজাইয়া কয়েকবার ঘষিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। ইহাতেও দাগ না উঠিলে দাগযুক্ত স্থানটি জলে ভিজাইয়া বোরাক্স পাউডার উত্তমরূপে মাখাইয়া প্রায় এক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেল।

রঙিন বস্ত্রে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বদলে শুধু বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া এক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ। ইহাতেই দাগ মিলাইয়া যাইবে। দাগ উঠিয়া গেলে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লও।

সূতি, লিনেন, রেয়ন ইত্যাদি কাপড়ের পুরানো দাগ—জাভেলী অপসারকের (Javelle water) মধ্যে এক মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে কাপড়খানি কিছুক্ষণ সোডিয়াম থায়োসালফেট বা 'হাইপো'র দ্রবণে রাখিলেই দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে। দাগ উঠাইবার পর কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

জাভেলী অপসারক কখনও রেশম, পশম বা রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করিবে না। কারণ, ইহাতে ক্লোরিন থাকে এবং ক্লোরিন ঐ জাতীয় কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলে।

জাভেলী অপসারক প্রস্তুতি—প্রায় আধ সের ঠাণ্ডা জলে এক পো কাপড়কাচা সোডা গুলিয়া উহাতে আধ পো ব্লিচিং পাউডার ধীরে ধীরে নাড়িয়া মিশাইয়া লও। দ্রবণটিকে একটি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া একটি আাঁট ছিপিযুক্ত বোতলে ভরিয়া রাখ।

সোডিয়াম থায়োসালফেট বা হাইপো দ্রবণ প্রস্তুতি—প্রায় এক পো জলে চা চামচের দুই চামচ ভিনিগার মিশ্রিত করিয়া উহাতে অর্ধ চামচ সোডিয়াম থায়োসালফেট বা 'হাইপো' দ্রবীভূত করিলেই এই দ্রবণ প্রস্তুত হইবে।

বিভিন্ন প্রকার ফলের দাগ উঠাইবার প্রণালী—ফলের রসের দাগ টাটকা থাকিতেই উঠাইতে হয়। অধিকাংশ ফলের দাগ ফুটন্ত জলেই উঠিয়া যায়। **কাপড়খানি সূতি বা লিনেনের হইলে,** একটি গামলার মুখে উহা আঁট করিয়া পাতিয়া উপর হইতে ঐ দাগের উপর ফুটন্ত জল ঢালিতে থাক; দাগ ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইবে। **পশম বা রেশমের বস্ত্রে ফুটন্ত জলের** পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ জল প্রয়োগ করিতে হয়। ফলের দাগ উঠাইতে সাবান ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ কোন কোন ফলের দাগ, যথা—জাম ফল সাবান ব্যবহারের ফলে স্থায়ী দাগে পরিণত হয়। আঙ্গুর, কমলালেবু বা সাইট্রাস ফলের (Citrus fruits) দাগ গরম সাবান জল ব্যবহারে অনায়াসেই উঠিয়া যায়। যে সকল ফলের দাগ গরম বা ফুটন্ত জলে উঠে না তাহা ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া গ্লিসারিন বা soapless shampoo ভাল করিয়া মাখাইয়া উত্তমরূপে রগড়াইতে হয়। কয়েক ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া কয়েক ফোঁটা ভিনিগার বা অক্সালিক অ্যাসিড মাখাইয়া দুই-এক মিনিট পরে ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেই দাগ উঠিয়া যায়। **সাদা, রঙিন, পশম, সূতি ইত্যাদি যে কোন প্রকার কাপড় হইতেই এইভাবে ফলের দাগ উঠান যায়।**

দাগ পুরানো হইলে ব্লিচিং অপসারক ব্যবহার করিতে হয়। পূর্ব বর্ণিত উপায়ে রেশম এবং পশমের বস্ত্রে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও বোরাক্স ব্যবহার করিয়া এবং রঙিন বস্ত্রে শুধু বোরাক্স ব্যবহার করিয়াই দাগ উঠাইতে পারা যায়। সূতি, লিনেন ও রেয়নের কাপড়ে ঐ একই উপায়ে জাভেলী অপসারক প্রয়োগ

করিতে হয়। ফলের দাগ উঠাইবার জন্য সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইট-এর দ্রবণও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই দ্রবণ এক-পো ঈষৎ গরম জলে চা চামচের দুই চামচ হাইড্রো সালফাইট গুলিয়া প্রস্তুত করা হয়। অনেক সময় ফলের রসে রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া যায়। সেইক্ষেত্রে ঐ রং চটা অংশটি অ্যামোনিয়ার একটি বোতলের খোলা মুখে ধরিলে রং ফিরিয়া আসে। অ্যামোনিয়ার পরিবর্তে ঐ অংশে খাইবার সোডার একটি লঘু দ্রবণ লাগাইলেও ঐ রং ফিরিয়া আসিবে।

ঘাস বা সবুজ পাতার দাগ উঠাইবার প্রণালী—যদি কাপড়খানি সুতি বা লিনেনের হয় তবে ঐ দাগটি সাবান এবং গরম জলে ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে। পুরানো দাগ সাবান জলে না উঠিলে ব্লিচিং অপসারক ব্যবহার করিবে। দাগটি প্রথমে জাভেলী দ্রবণে এবং পরে 'হাইপো'র দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। ইহাতেই **সুতি, লিনেন এবং রেয়নের কাপড় হইতে দাগ মিলাইয়া যাইবে।**

রঙিন কাপড়ের দাগ প্রথমে গরম জল এবং সিন্‌থেটিক ডিটারজেন্ট বা লাক্স পাউডার-এর সাহায্যে উঠাইতে চেষ্টা করিবে। দাগ না উঠিলে বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেল। অথবা বোরাক্স পাউডার একটু গরম জলে গুলিয়া উহাতে কাপড়খানি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ।

রেশম এবং পশমের কাপড়ে গরম জল ব্যবহার করা চলিবে না। সিন্‌থেটিক ডিটারজেন্ট বা লাক্স পাউডার এবং ঈষদুষ্ণ জলে প্রথমে দাগটি ধুইয়া ফেল। ইহাতে দাগ না উঠিলে প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং শেষে বোরাক্স পাউডার ব্যবহার করিবে।

রক্তের দাগ উঠাইবার প্রণালী—দাগযুক্ত কাপড়খানি কয়েকবার ঠাণ্ডা বা ঈষৎ গরম জলে ভাল করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া দাও। কখনও অত্যধিক গরম বা ফুটন্ত জল ব্যবহার করিবে না। টাটকা দাগ হইলে ইহাতেই উঠিয়া যাইবে। দাগটি পুরানো হইলে অ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। প্রায় পাঁচ সের জলে বড় চামচের দুই চামচ অ্যামোনিয়া মিশাইয়া এই লঘু দ্রবণ প্রস্তুত করিতে হয়। অ্যামোনিয়ার দ্রবণের পরিবর্তে প্রায় পাঁচ সের জলে দুই কাপ লবণ গুলিয়া ঐ জলেও কাপড়খানি ভিজাইতে পার। ইহাতে দাগটি আলগা ও নরম হইয়া আসিবে। এখন সাবান এবং ঈষৎ গরম জলে কাচিয়া

দিলেই দাগটি সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে। খুব পুরানো দাগ উঠাইতে অনেক সময় ব্লিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। একটি ন্যাকড়া হাইড্রোজেন পারক্সাইডে ভিজাইয়া ঐ দাগের উপর বৃত্তাকারে ঘষিয়া দাও। ইহাতেও দাগটি সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহাতে কিছু বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল। **রঙিন কাপড়ে** পারক্সাইডের পরিবর্তে বোরাক্স ব্যবহার করিবে। এইরূপে **সুতি, লিনেন, রেশম, পশম, সাদা, রঙিন যে কোন কাপড়ের দাগ উঠাইতে পারা যায়।**

কম্বল ইত্যাদি জলে ধোওয়া ঠিক নয়। উহাতে রক্তের দাগ লাগিলে স্টার্চ এবং ঠাণ্ডা জলের একটি মলম প্রস্তুত করিয়া ঐ জায়গায় লাগাইতে হয়। মলমটি শুকাইয়া আসিলে ধীরে ধীরে একটি ব্রাশ দ্বারা ঐ মলম পরিষ্কার করিতে হয়। এইভাবে কয়েকবার মলমটি লাগাইলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

তৈল বা চর্বিজাতীয় দাগ ধুইবার প্রণালী—সুতি এবং লিনেনের কাপড় হইলে দাগটি সাবান এবং গরম জল দিয়া ঘষিয়া দিলেই উঠিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শোষক দ্রব্যের (absorbents) সাহায্যেও এই জাতীয় দাগ উঠানো যাইতে পারে। দাগের উপর চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ ছড়াইয়া দাও। তৈল জাতীয় দ্রব্যটি ঐ পাউডারে শোষিত হইলে একটি ব্রাশ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ফেল। এইভাবে কয়েকবার পাউডার ব্যবহার করিলেই দাগটি প্রায় মিলাইয়া আসিবে। আবার ঐ দাগটি ব্লটিং পেপারের মধ্যে রাখিয়া একটি গরম ইস্ত্রি চাপিয়া ধরিলেও ঐ তৈল জাতীয় পদার্থটি ব্লটিং পেপারে চলিয়া আসিবে এবং দাগটি মিলাইয়া যাইবে। অ্যাসিটেট রেয়নে গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, পেট্রল এবং বেন্‌জিন দ্বারাও তৈল জাতীয় দাগ অনায়াসেই উঠানো যায়। দাগযুক্ত স্থানটি একটি পরিষ্কার ন্যাকড়ার প্যাডের উপর রাখিয়া আর একটি ন্যাকড়া উক্ত তরলে ভিজাইয়া ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে ঐ দাগের উপর ঘষিলেই দাগটি মিলাইয়া যাইবে। দাগটি তরলে ভিজাইয়া রাখিলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যায়। চকের গুঁড়া, গরম ইস্ত্রি ইত্যাদির সাহায্যে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে অবশিষ্ট দাগটুকু এই প্রকার তরলের দ্বারাই উঠাইতে হয়। **রেশম, পশম, সুতি, লিনেন, সাদা, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ উঠাইতে পারা যায়।**

আয়োডিন-এর দাগ উঠাইবার প্রণালী—সুতি এবং লিনেনের কাপড়ে আয়োডিনের দাগ লাগিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে সাবান জল দিয়াই উঠাইতে পারা

যায়। দাগ পুরানো হইলে বা রেশম এবং পশমের কাপড়ে লাগিলে একটি ন্যাকড়া অ্যালকোহলে ভিজাইয়া ঐ দাগের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘষিয়া উহার কেন্দ্রের দিকে আসিতে হয়। অ্যাসিটেট রেয়ন এবং রঙিন কাপড়ে অ্যালকোহলের লঘু দ্রবণ (একভাগ অ্যালকোহল দুইভাগ জল) ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহা একটি হাইপোর দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলেই সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইবে।

বিভিন্ন প্রকার রংয়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী—অধিকাংশ রংয়ের দাগই ঠাণ্ডা বা ঈষৎ গরম জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উঠিয়া যায়। সূতি এবং লিনেনের কাপড়ে সাবান জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে ব্লিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং পরে বোরাক্স ব্যবহার করিয়া দেখিবে। ইহাতে না উঠিলে জাভেলী দ্রবণ এবং 'হাইপো' ব্যবহার করিবে। রেশম, পশম ও রঙিন কাপড়ে জাভেলী দ্রবণ ব্যবহার করা যায় না।

নেল পলিশ (Nail Polish) উঠাইবার প্রণালী—একটি ন্যাকড়ায় অ্যাসিটোন মাখাইয়া ঐ দাগটি ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে ঘষিতে থাক। দেখিবে দাগটি মিলাইয়া যাইতেছে। অ্যাসিটেট রেয়ন এবং ভিনিয়নের কাপড়ে অ্যাসিটোন ব্যবহার করা চলিবে না। নিম্নলিখিত উপায়ে যে-কোন কাপড় হইতে দাগ অপসারিত করিতে পারা যাইবে।

দাগটিকে একটি কাপড়ের প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া প্রথমে কয়েক ফোঁটা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা পেট্রল এবং পরে কয়েক ফোঁটা অ্যামাইল অ্যাসিটেট দিয়া ভিজাইয়া একটি ন্যাকড়ার সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘষিয়া দিলেই উহা সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে।

লোহা বা মরিচার দাগ উঠাইবার প্রণালী—একটি ফুটন্ত জলের পাত্রের মুখে দাগ সমেত কাপড়খানি আঁট করিয়া পাতিয়া লও। একটি কাগজি লেবুর রস নিংড়াইয়া ঐ দাগের উপর দাও এবং কিছুক্ষণ পরে জলে ধুইয়া ফেল। এইভাবে কয়েকবার লেবুর রস দিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। এইভাবে দাগ উঠাইতে সময় বেশী লাগিলেও কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না। দাগ পুরানো হইলে উহাতে কিছু লবণ ও লেবুর রস মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লও। দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লও। ইহাতেও

দাগ না উঠিলে এক-পো জলে তিন চামচ অক্সালিক অ্যাসিড গুলিয়া গরম করিয়া লও এবং ঐ গরম দ্রবণে দাগটি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। দাগ উঠিয়া গেলে কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লও। রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া গেলে উহাতে অ্যামোনিয়া বা খাইবার সোডার লঘু দ্রবণ লাগাইলেই রং ফিরিয়া আসিবে।

এইরূপে রেশম, পশম, সাদা, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায়।

ঘামের দাগ উঠাইবার প্রণালী—অনেক সময় ঘামে জামা-কাপড়ে এক প্রকার দাগ পড়ে। দাগটি সঙ্গে সঙ্গে সাবান মাখিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে মেলিয়া রাখিয়া ভাল করিয়া সাবান দিয়া কাচিয়া দিলেই উঠিয়া যায়। পুরানো দাগ এইভাবে সম্পূর্ণ উঠিবে না। সে ক্ষেত্রে বোরাক্স পাউডার ঐ আর্দ্র দাগের উপর ছড়াইয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায়। বোরাক্সের পরিবর্তে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের লঘু দ্রবণেও দাগটি ভিজাইয়া রাখিলে উহা উঠিয়া যাইবে। **এইভাবে রেশম, পশম ইত্যাদি যে কোন কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায়।** সুতি এবং লিনেনের দাগ সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইটের দ্রবণে ভিজাইয়াও উঠাইতে পারা যায়।

অনেক সময় **রঙিন জামা কাপড়ে** ঘামের দাগ লাগিয়া রং উঠিয়া যায়। এক্ষেত্রে ঐ দাগটি জলে ভিজাইয়া অ্যামোনিয়ার বোতলের খোলা মুখের কাছে ধরিলেই রং ফিরিয়া আসিবে। দাগ পুরানো হইলে অ্যামোনিয়ার পরিবর্তে একটু ভিনিগার লাগাইতে হয়।

কালির দাগ উঠাইবার প্রণালী—বিভিন্ন কালির উপাদান বিভিন্ন। সুতরাং একই প্রণালীতে সকল প্রকার দাগ দূর করা সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক প্রণালীর সাহায্য লইতে হয়।

ইন্‌ডিয়া বা ড্রইং কালি (India or drawing ink) : দাগসমেত কাপড়খানি একটি ন্যাকড়ার প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া উহার উপর কয়েক ফোঁটা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা বেন্‌জিন দাও। একটি ন্যাকড়ার সাহায্যে দাগটি বৃত্তাকারে ঘষিয়া উহার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হও। কয়েকবার এইভাবে ঘষিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। পুরানো দাগ এইভাবে সম্পূর্ণ না উঠিলে উহা সিনথেটিক ডিটারজেন্ট ও জল দিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে। **এইরূপে রেশম, পশম, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড়ের দাগ**

উঠানো যায়। সুতি এবং লিনেনের কাপড়ের দাগ গাঢ় সাবানজল এবং অ্যামোনিয়ার দ্রবণে রগড়াইয়া দিলেও মিলাইয়া যায়।

ছাপার কালি (Printing ink): দাগসমেত কাপড়খানি তার্পিন তেলে (Oil of turpentine) কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। পরে কাপড়খানি নিংড়াইয়া দাগটি কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজিন বা পেট্রল-এর ন্যাকড়ায় ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দাও। **এইরূপে সকল প্রকার কাপড়ের কালির দাগ উঠানো যায়।**

চটের থলে হইতে এই দাগ উঠাইতে হইলে থলেটি কেরোসিন তেলের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে সাবান জলে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়।

লিখিবার কালি (Writing ink): কালি কাপড়ে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটি ব্লটিং পেপারে উহা যথাসম্ভব শুষিয়া লইতে হয়। পরে চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ পাউডার কয়েকবার ঐ দাগে লাগাইয়া একটি ব্রাশ দ্বারা ঝাড়িয়া ফেলিলেই কালি উঠিয়া যাইবে। দাগ একেবারে মিলাইয়া না গেলে উহাতে অ্যালকোহলের একটি মলম লাগাইতে হইবে। একভাগ জল এবং একভাগ অ্যালকোহলের মিশ্রণে চকের গুঁড়া বা টেলকম পাউডার মিশাইয়া একটি মলম প্রস্তুত কর। এই মলম দাগের উপর লাগাইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর এবং শুকাইয়া গেলে ব্রাস দিয়া পরিষ্কার করিয়া দাও। এই ভাবে কয়েকবার মলম লাগাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিলেই দাগ মিলাইয়া যাইবে। **এই প্রণালীতে সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ উঠানো যায়।**

সুতি এবং লিনেনের কাপড়ের দাগ গ্লিসারিন লাগাইয়া সাবান জলে রগড়াইলেও উঠিয়া যায়।

কোন কোন কালির দাগ উঠাইতে অক্সালিক অ্যাসিড ব্যবহার করিতে হয়। এক পো ফুটন্ত জলে তিন চামচ অক্সালিক অ্যাসিড গুলিয়া উহাতে দাগটি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া অ্যামোনিয়ার দ্রবণে প্রশমিত করিতে হয়। **এইরূপে রেশম, পশম, রঙিন বস্ত্রাদি হইতে কালির দাগ উঠাইতে পারা যায়।**

সূতি, লিনেন এবং রেয়নে কালির দাগ খুব দৃঢ়ভাবে বসিয়া গেলে জাভেলীর দ্রবণ ব্যবহার করিলেই উঠিয়া যাইবে। রঙিন সূতির বস্ত্রাদিতে এই দ্রবণ ব্যবহার করা চলিবে না। উহা অক্সালিক অ্যাসিডের সাহায্যেই উঠাইতে হয়।

রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইতে কয়েকটি সাবধানতা : তোমরা বিভিন্ন প্রকার কাপড় হইতে বিভিন্ন প্রকারের দাগ কি ভাবে উঠাইতে হয় পড়িলে। ইহাদের মধ্যে রঙিন কাপড় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কারণ দাগের সঙ্গে সঙ্গে অপসারক দ্রব্যসমূহ অনেক সময়ই কাপড়ের রং নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং কি কি অপসারক দ্রব্যাদি কাপড়ের রং নষ্ট করিতে পারে তাহা জানিলে তোমরা সহজেই সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিবে।

সাধারণত উগ্র-ক্ষারীয় দ্রব্যের সংস্পর্শে রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া যায়। তাই ক্ষারযুক্ত সাবান, সোডা ইত্যাদি ব্যবহার করিবার পূর্বে রঙিন কাপড়ের এক প্রান্তে ঐ সাবান বা সোডা ঘষিয়া দেখিবে যে রং উঠিয়া যাইতেছে কিনা। মৃদু সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট আজকাল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল ডিটারজেন্ট নির্ভয়ে রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শোষক দ্রব্যাদি, যথা—চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার, স্টার্চ ইত্যাদি রংয়ের কোন ক্ষতি করে না। সুতরাং সম্ভব হইলে ইহাদের সাহায্যে দাগ তুলিতে চেষ্টা করিবে। অপসারক তরল দ্রব্যের মধ্যে অ্যালকোহল, ইথার এবং অ্যাসিটোন ব্যবহারে কাপড়ের রং নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার না করাই ভাল। একভাগ অ্যালকোহল এবং দুইভাগ জল একত্রে ব্যবহার করিলে রং নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। পেট্রল, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজিন, তার্পিন তেল ইত্যাদিতে রং নষ্ট হয় না। সুতরাং রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই সকল অপসারক তরল ব্যবহার করা যাইতে পারে। দাগ উঠাইতে অনেক সময় বিভিন্ন অ্যাসিড ব্যবহার করা হইয়া থাকে। মৃদু অ্যাসিড সাধারণত রঙিন কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু বেশীক্ষণ ঐ অ্যাসিডের সংস্পর্শে থাকিলে রং নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। লেবুর রস, ভিনিগার বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদিতে রং চটিয়া গেলে কাপড়ের ঐ স্থানটি অ্যামোনিয়ার একটি খোলা বোতলের মুখের উপর ধরিলেই রং পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। লঘু বা মৃদু ক্ষার অল্পসময়ের মধ্যে রঙিন কাপড়ের

কোন ক্ষতি করে না। যদি রং উঠিয়া যায় তাহা হইলে ঐ জায়গায় একটু ভিনিগার লাগাইয়া দিলেই রং অনেক সময় ফিরিয়া আসে। বিভিন্ন ব্লিচিং অপসারকের মধ্যে জাভেলী অপসারক সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক। ইহা ব্যবহারে রং স্থায়িভাবে উঠিয়া যায়। রঙিন কাপড়ের পক্ষে বোরাক্সই সর্বাপেক্ষা বেশী নিরাপদ। ইহাতে রং চটিয়া যাইবার কোন আশঙ্কা নাই। হাইড্রোজেন পারক্সাইডের লঘু দ্রবণও অল্প সময়ের জন্য রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অপসারক দ্রব্যাদি ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা—ইথার ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখিও কাছাকাছি যেন কোনও অগ্নিশিখা না থাকে। ইহা সহজেই গ্যাস হইয়া যায়। তরল এবং গ্যাসীয় ইথার সহজেই জ্বলিয়া উঠে। পেট্রল, বেনজিন, তার্পিন তেল, অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন আগুনের সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। সুতরাং খুব সতর্কতার সহিত এই সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবে। বিভিন্ন অ্যাসিডের মধ্যে অক্সালিক অ্যাসিড বিষাক্ত এবং ইহা হাতে ধরিলে তৎক্ষণাৎ হাত ধুইয়া ফেলিবে।

বিভিন্ন প্রকার দাগ উঠাইবার জন্য যে যে দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

দাগ	দাগের অবস্থা	সুতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	সুতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা ও রঙিন)	রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি
পানীয়ের দাগ (চা, কফি, কোকো ইত্যাদি)	নূতন	(১) জল (২) জল ও অ্যালকোহলের মিশ্রণ (৩) গ্লিসারিন (৪) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড	(১) সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	(১) সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	সাদা বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) জাভেলী অপসারক ও 'হাইপো'	(১) বোরাক্স পাউডার	(১) হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও বোরাক্স পাউডার (সাদা বস্ত্রে) (২) বোরাক্স পাউডার (রঙিন বস্ত্রে)	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
বিভিন্ন প্রকার ফল, মদ (wine), ডাবের জল ইত্যাদির দাগ	নূতন	(১) ফুটন্ত জল (২) গরম সাবান জল (জাম ফলের দাগে সাবান ব্যবহার করিবে না) (৩) গ্লিসারিন এবং ভিনিগার বা অক্সালিক অ্যাসিড	(১) গরম জল (২) গ্লিসারিন এবং ভিনিগার বা অক্সালিক অ্যাসিড	(১) ঈষদুষ্ণ জল (২) গ্লিসারিন এবং ভিনিগার বা অক্সালিক অ্যাসিড	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	সূতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	সূতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা এবং রঙিন)	রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি
	পুরাতন	(১) জাভেলী অপসারক (২) সোডিয়াম হাইড্রো-সালফাইট	(১) বোরাক্স পাউডার	(১) হাইড্রোজেন পার-ক্সাইড ও বোরাক্স পাউ-ডার (সাদা বস্ত্রে) (২) বোরাক্স পাউডার (রঙিন বস্ত্রে)	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
ঘাস বা সবুজ পাতার দাগ	নূতন	(১) সাবান ও গরম জল	(১) গরম জল ও সিন্থে-টিক ডিটারজেণ্ট বা লাক্স পাউডার	(১) ঈষদুষ্ণ জল ও সিন্থেটিক ডিটারজেণ্ট	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) জাভেলী অপসারক ও 'হাইপো'	(১) বোরাক্স পাউডার	(১) হাইড্রোজেন পার-ক্সাইড (সাদা বস্ত্রে) ও বোরাক্স	
রক্তের দাগ	নূতন	(১) ঠাণ্ডা জল	(১) ঠাণ্ডা জল	(১) ঠাণ্ডা জল	(১) ঠাণ্ডা জল
	পুরাতন	(১) অ্যামোনিয়ার দ্রবণ বা লবণ জল (২) হাইড্রোজেন পার-ক্সাইড (৩) বোরাক্স পাউডার	(১) লবণ জল (২) বোরাক্স পাউডার	(১) লবণ জল (২) বোরাক্স পাউডার (যে সকল বস্ত্র জলে ধুইলে নষ্ট হইয়া যায় তাহাতে স্টার্চের মলম লাগাইতে হয়)	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	সুতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	সুতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা ও রঙিন)	রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি
তৈল বা চর্বি জাতীয় দাগ	নূতন	(১) গরম সাবান জল (২) চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ	সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	(১) চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার, বা স্টার্চ (২) নিউট্রাল ডিটারজেন্ট	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) ব্লটিং পেপার ও গরম ইস্ত্রি (২) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, পেট্রল, বেনজিন	সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	সুতি ও লিনেনের অনুরূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
আয়োডিনের দাগ	নূতন	(১) সাবান জল	(১) সাবান জল	(১) অ্যালকোহল	(১) অ্যালকোহলের লঘু দ্রবণ
	পুরাতন	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ
রংয়ের দাগ	নূতন	(১) সাবান জল	(১) সাবান জল	(১) ঈষৎ গরম জল ও নিউট্রাল ডিটারজেন্ট	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(২) জাভেলী দ্রবণ	(১) বোরাক্স পাউডার	(১) হাইড্রোজেন পারক্সাইড (২) বোরাক্স পাউডার	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	সুতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	সুতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা ও রঙিন)	রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি
নেল পলিশ	নূতন ও পুরাতন	(১) অ্যাসিটোন	অ্যাসিটোন	অ্যাসিটোন	অ্যাসিটোন, (অ্যাসিটেট রেয়ন ও ভিনিয়নের কাপড়ে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ও অ্যামাইল অ্যাসিটেট ব্যবহার করিতে হয়)।
লোহার দাগ	নূতন পুরাতন	(১) কাগজি লেবুর রস (১) লবণ ও কাগজি লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড	(১) কাগজি-লেবুর রস (১) লবণ ও কাগজি-লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড	(১) কাগজি-লেবুর রস (১) লবণ ও কাগজি লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড	(১) কাগজি লেবুর রস (১) লবণ ও কাগজি-লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড
ঘামের দাগ	নূতন পুরাতন	(১) সাবান ও রৌদ্র (১) বোরাক্স পাউডার (২) হাইড্রোজেন পারক্সাইড (৩) জাভেলী দ্রবণ	(১) প্রথমে অ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরপর লঘু হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং সোডিয়াম হাইপোসালফাইটএর দ্রবণে ভিজাইতে হইবে (নূতন ও পুরাতন) (২) বোরাক্স পাউডার ও রৌদ্র	সুতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্রের অনুরূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	সুতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	সুতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা ও রঙিন)	রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি
ইন্ডিয়া বা ড্রইং কালি	নূতন	(১) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা বেন্‌জিন	(১) সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	(১) সুতি ও লিনেনের বস্ত্রের অনুরূপ	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) গাঢ় সাবান জল ও অ্যামোনিয়া	(১) সাবান জল ও অ্যামোনিয়া	(১) ঈষদুষ্ণ গরম জলে সিন্‌থেটিক ডিটারজেন্ট	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
ছাপার কালি	নূতন ও পুরাতন	প্রথমে তার্পিন তেলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেন্‌জিন বা পেট্রল প্রয়োগ করিতে হয়।	সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	সুতি ও লিনেনের বস্ত্রের অনুরূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
লিখিবার কালি (লাল, নীল, কাল, সবুজ ইত্যাদি	নূতন	(১) ব্লটিং পেপার (২) চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ (৩) অ্যালকোহল ও টেলকম পাউডারের মলম	সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	সুতি ও লিনেনের বস্ত্রের অনুরূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) জাভেলী দ্রবণ।	(১) অক্সালিক অ্যাসিড (২) ব্লিচিং পাউডারের লঘু দ্রবণ।	(১) অক্সালিক অ্যাসিড (২) হাইড্রোজেন পারক্সাইড।	(১) অক্সালিক অ্যাসিড (২) হাইড্রোজেন পারক্সাইড।

N. B. কখনও কখনও হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বদলে সোডিয়াম পারবোরেটের জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সোডিয়াম পারবোরেট জলের সংস্পর্শে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সুতরাং ইহা হাইড্রোজেন পারক্সাইড অপেক্ষা উগ্রতর অপসারক।

বস্ত্রধৌতি

তোমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে একখানি কাপড় বা একটি ব্লাউজ কিছুদিন ব্যবহার করিলেই উহা ময়লা হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তখন উহা সাবান, সোডা বা অন্য কোন পরিষ্কারক দ্রব্য দ্বারা পরিষ্কার করিয়া তবেই ব্যবহার করিতে হয়। শুধু পরিষ্কার করিলেই হয় না, কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য ও চকচকে ভাবটি ফিরাইয়া আনিবার জন্য উহাতে নীল, কলপ ইত্যাদি লাগাইয়া ইস্ত্রি করিয়া লইতে হয়। সুতরাং বস্ত্রধৌতি বলিতে শুধুমাত্র সাবান, সোডা ইত্যাদির সাহায্যে বস্ত্রখানি পরিষ্কার করাই বুঝায় না; নীল দেওয়া, কলপ লাগান, ইস্ত্রি করা ইত্যাদি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া —যাহার সাহায্যে বস্ত্রখানির পূর্বের সৌন্দর্য ফিরাইয়া আনা হয়—সমস্তই বস্ত্রধৌতির অন্তর্গত। বস্ত্র ধৌতির মূল উদ্দেশ্য দুইটি—

(১) কাপড়ের ময়লা প্রভৃতি দূর করিয়া উহা পরিষ্কার করা (washing), এবং (২) পরিষ্কার কাপড়ে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরাইয়া আনিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন করা (Finishing)।

বস্ত্রধৌতি প্রণালীটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(১) বস্ত্রাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা (sorting), (২) রিফু বা সেলাই করা (mending), (৩) দাগ উঠান (stain removal), (৪) জলে ভিজানো (steeping), (৫) ময়লা দূর করা (cleansing), (৬) ফুটান (boiling), (৭) নীল দেওয়া (blueing), (৮) কলপ দেওয়া (starching), (৯) শুষ্ক করা (drying), (১০) আর্দ্র করা (Damping), (১১) ভাঁজ করা (Folding) (১২) ইস্ত্রি করা (Ironing) (১৩) বায়ু চালিত করা এবং তুলিয়া রাখা (airing and storing)।

সাদা সূতি ও লিনেনের বস্ত্র ধুইবার প্রণালী

বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা : পরিষ্কার করিবার সুবিধার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে জামা, কাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি একত্রিত করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে।

(ক) অল্প ময়লা বস্ত্রাদি—এই ধরনের অল্প ময়লা জামা, কাপড় ইত্যাদি অধিক ময়লা বস্ত্রাদি হইতে ভিন্ন করিয়া ধুইলে পরিশ্রমও কম হয় এবং খরচও বাঁচে।

(খ) মাঝারি ধরনের ময়লা বস্ত্রাদি—এই সকল বস্ত্রাদিও অধিক ময়লা বস্ত্রাদির সহিত একত্রে না ধুইয়া ভিন্ন ভাবে ধুইলে পরিশ্রম কম হয়।

(গ) অধিক ময়লা বস্ত্রাদি—এই জাতীয় বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতে সাধারণত বেশী পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এইজন্য ইহাদের আলাদা ভাবে পরিষ্কার করাই ভাল।

(ঘ) রুমাল প্রভৃতি ছোটখাট বস্ত্রাদি—অন্যান্য বস্ত্রাদির সহিত এইগুলি ধুইতে গেলে অনেক সময় হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, এইজন্য ইহাদের আলাদা করিয়া ধুইতে হয়।

রিফু বা সেলাই করা—বস্ত্রাদি অনেকদিন ব্যবহারের ফলে অনেক সময় একটু আধটু ফাঁসিয়া যায়। পরিষ্কার করিবার পূর্বে এই সকল ফাঁসিয়া যাওয়া বস্ত্রাদি প্রয়োজনমত রিফু এবং সেলাই করিয়া মেরামত না করিলে ধুইবার সময় আরও ফাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ফাঁসিয়া যাওয়া অংশ বড় হইলে সেলাইয়ের পরও সহজে নজরে পড়ে এবং বস্ত্রের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং বস্ত্র পরিষ্কার করিবার পূর্বেই ছোট খাট ফাঁসিয়া যাওয়া অংশগুলি ভাল করিয়া সেলাই করিতে হয়। ইহাতে সময়, পরিশ্রম এবং অর্থের অপচয় কম হইবে এবং বস্ত্রাদি অধিক দিন টিকিবে।

দাগ উঠান—বস্ত্রাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ ও প্রয়োজনমত রিফু এবং সেলাই করিবার পর উহাতে কালি, রক্ত, লোহা ইত্যাদি কোন কিছুর দাগ লাগিয়াছে কিনা লক্ষ্য করিতে হইবে। পরিষ্কার করিবার পূর্বেই ঐ দাগ না উঠাইলে ধুইবার সময় উহা একেবারে স্থায়িভাবে বসিয়া যাইতে পারে। একাধিক জামা একত্রে ধুইলে একটির দাগ অপরগুলিতে লাগিয়া যাইবারও আশঙ্কা থাকে। এই ভাবে লোহার দাগ এক কাপড় হইতে অন্য কাপড়ে লাগিয়া থাকে।

জলে ভিজানো—দাগ উঠাইবার পরও বস্ত্রাদি ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির ঢাকনা, ধুতি, সার্ট, পাজামা ইত্যাদি একত্রে একটি বড় পাত্রে রাখিয়া জল ঢালিয়া ডুবাইয়া রাখিবে। রুমালের মধ্যে অনেক সময় নাকের শ্লেষ্মা প্রভৃতি লাগিয়া থাকে। সুতরাং এইগুলি পৃথক্‌ভাবে লবণ জলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাতে লবণ দ্বারা শ্লেষ্মা দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। প্রায় ১০ ছটাক জলে বড় চামচের এক চামচ লবন ব্যবহার করিবে। জানালা, দরজার পর্দা ইত্যাদি যে সকল বস্ত্র খুব বেশী ময়লা হইয়াছে তাহা আলাদাভাবে একটি পাত্রে জলে ভিজাইতে হইবে। পূর্বেই জলে কিছু পরিমাণ সোডা গুলিয়া

লইবে। বস্ত্রের ময়লা অনুসারে সোডার পরিমাণ ঠিক করিবে। পরে ঐ সোডার জলে পর্দাগুলি ভিজাইয়া রাখিবে। সাধারণত এক রাত্রি ধরিয়া ভিজাইয়া রাখিবার নিয়ম। সময়াভাবে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা ভিজাইবে। কোন ক্ষেত্রেই খর জল ব্যবহার করা উচিত নয়। যেখানে মৃদু-জল সুলভ নয় সেখানে খর জলকে মৃদু করিয়া ব্যবহার করিবে। বৃষ্টির জলও সঞ্চিত করিয়া ব্যবহার করা চলিতে পারে। এইরূপে জলে বস্ত্রাদি ভিজাইয়া রাখিলে নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি হইবে—(১) তন্তুর মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া ধুলা, বালি ইত্যাদি ময়লা আলগা করিয়া দিবে। (২) ইহা ব্যতীত পূর্বে যে শ্বেতসার মাড় হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহাও আলগা হইয়া বাহির হইয়া আসিবে।

ময়লা দূর করা—এইবার একটি বড় পাত্রে কিছু গরম জল লইয়া উহাতে পরিমাণ মত সাবান গুলিয়া লও। সাবানের পরিবর্তে বাজারে যে সাবানের গুঁড়া বা 'নিউট্রাল ডিটারজেন্ট (Neutral detergent) পাওয়া যায় তাহাও ব্যবহার করা চলিতে পারে। মিহি কিংবা দামী কাপড় হইলে 'নিউট্রাল ডিটারজেন্ট' বা ভাল সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করাই বিধেয়। একটু মোটা (coarse) ধরনের কাপড়ে অথবা কাপড় বেশী ময়লা হইলে সাবানের সহিত সামান্য সোডাও মিশাইতে হয়। সর্বদাই মৃদু জল বা বৃষ্টির জল ব্যবহার করিবে। জল অত্যধিক গরম হইলে ময়লা দূর হইবে না, বরং আরও দৃঢ়ভাবে তন্তুর গায়ে লাগিয়া থাকিবে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ফুটন্ত জল অপেক্ষা অল্প গরম জলই ময়লা পরিষ্কার করিবার পক্ষে বেশী উপযোগী। বস্ত্রাদি গরম সাবান জলে ভাল করিয়া রগড়াইয়া ময়লা দূর করিবে। কোন অংশ খুব বেশী ময়লা বা অপরিষ্কার হইলে ঐ অংশে একটু সাবান মাখাইয়া দুই হাতে ভাল করিয়া ঘষিয়া ঐ ময়লা দূর করিবে। কখনও কখনও ধীরে ধীরে খুপিয়া কাচিলেও কাপড় ভাল পরিষ্কার হয়। ময়লা দূর হইলে কাপড়খানি গরমজলে বার বার ধুইবে যেন উহাতে একটুও সাবানজল লাগিয়া না থাকে। প্রথমে অপেক্ষাকৃত কম ময়লা বস্ত্রাদি গরমজলে ধুইবে। পরে ঐ জলেই প্রয়োজন বোধে আর একটু সাবান গুলিয়া অন্যান্য বস্ত্রগুলি একের পর এক এইভাবে ধুইবে। সর্বশেষে জানালা দরজা প্রভৃতির বেশী ময়লা পর্দাগুলি ধুইবে। যদি একবার বা দুইবার ব্যবহারের ফলেই সাবান জল অত্যধিক ময়লা হইয়া যায় তবে উহা ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া সাবান জল প্রস্তুত করিবে।

ফুটান—উপরোক্ত সাবান জলে ধোওয়ার ফলেই বস্ত্রাদির ময়লা দূর হইবে। ময়লা পরিষ্কারের পর কাপড়ের ধবধবে সাদা ভাবটি কিন্তু কাপড়ে ফুটিয়া উঠিবে না। বরং অনেক সময় একটা ম্যাটম্যাটে লালচে ভাব দেখা দিতে পারে। বস্ত্রাদির স্বাভাবিক ধবধবে ভাবটি ফিরাইয়া আনিবার জন্য উহা সাবানজলে ফুটাইতে হয়। একটি পাত্রে কিছু সাবান জল লইয়া গরম কর। ঐ গরমজলে এইবার বস্ত্রাদি পাঁচ হইতে দশ মিনিট পর্যন্ত ফুটাও। ফুটাইবার সময় মৃদু জল ব্যবহার করিবে। খর জলে কাপড়ে ময়লা জমিয়া উহা আরও অপরিষ্কার হইবে। ফুটানো হইয়া গেলে বস্ত্রাদি প্রথমে কয়েকবার গরম জলে ধুইয়া এবং পরে ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিবে।

বস্ত্রাদি রৌদ্রে বা ঘাসের উপর শুকাইলেও বস্ত্রের সাদা ধবধবে ভাবটি ফিরিয়া আসে। যেখানে কাপড় রৌদ্রে শুকাইবার কোন ব্যবস্থা নাই সেখানে অবশ্য উপরোক্ত পদ্ধতিতে ফুটানো বিধেয়।

নীল দেওয়া—সাবান ও সোডার ব্যবহারে সাদা বস্ত্রাদিতে যে হলদে ভাব দেখা দেয় তাহা দূর করিবার জন্য বস্ত্রাদি নীলের জলে ডুবানো হয়। এক টুকরা নেকড়ার মধ্যে কিছুটা নীল ভাল করিয়া জড়াইয়া একটি পুঁটলি করিয়া লও। বাজারে অনেক রকমের নীল কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে আলট্রামেরাইন ব্লু (Ultramarine Blue) এই কাজে বিশেষ উপযোগী। এইবার একটি পাত্রে কিছু ঠাণ্ডা জল লইয়া কাপড়ের পুঁটলিটি ঐ জলে ধীরে ধীরে নাড়াইতে থাকে যতক্ষণ না জল আকাশী-নীল (Sky-Blue) বর্ণ ধারণ করে। কাপড়ে ভাল ভাবে নীল দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে।

(১) কাপড় ডুবাইবার সময়ই নীল জল প্রস্তুত করিবে। ব্যবহারের অনেক পূর্বে নীল জল প্রস্তুত করিলে পাত্রের গায়ে গুঁড়াগুঁড়া নীল লাগিয়া থাকিবে। পরে কাপড় ঐ জলে ডুবাইলে কাপড়ে নীল দাগ হইয়া যাইবে।

(২) ডুবাইবার পূর্বে কাপড়খানি খুব ভাল করিয়া মেলিয়া লইবে যেন উহাতে কোন ভাঁজ না থাকে।

(৩) ডুবাইবার সময় নীল জল নাড়িয়া লইবে।

(৪) কাপড় বেশীক্ষণ ভিজাইবে না। তাহাতে কাপড়ে দাগ পড়িবার ভয় থাকে।

(৫) কাপড় জলে ভিজাইয়া কখনও জলে নীল গুলিবে না।

(৬) একবারে একটির বেশী কাপড় ভিজাইবে না।

কলপ দেওয়া—সুতি ও লিনেনের কাপড়ে সাধারণত কলপের সাহায্যে বস্ত্রের স্বাভাবিক কাঠিন্য ও চকচকে ভাব ফিরাইয়া আনা হয়। ফলে কাপড় খুব তাড়াতাড়ি ময়লা হইতে পারে না। অনেকে ভাতের মাড় কলপ হিসাবে ব্যবহার করেন। মাড়ের একটি স্বাভাবিক হলদেটে ভাব থাকে। তাই মাড় অপেক্ষা বাজারের 'স্টার্চ'-ই (Starch) উৎকৃষ্টতর কলপ।

বড় চামচের এক চামচ 'স্টার্চ' একটি পাত্রে লইয়া ঐ চামচের দুই চামচ ঠাণ্ডা জল উহাতে মিশাইয়া লেই (Paste) প্রস্তুত কর। এই লেইএ ধীরে ধীরে একটি কেট্‌লি হইতে ফুটন্ত জল ঢাল এবং উহা একটি চামচ দিয়া নাড়িতে থাক। যখন 'স্টার্চ' সম্পূর্ণ গুলিয়া যাইবে তখন আর জল ঢালিবে না। সবশুদ্ধ প্রায় ৪-৫ ছটাক দ্রবণ প্রস্তুত হইবে। এই দ্রবণে সমায়তন ফুটন্ত জল ঢালিয়া যে দ্রবণ প্রস্তুত হয় তাহাকে ১ : ১ দ্রবণ বলা হয়। এই দ্রবণে আরও ৪-৫ ছটাক জল ঢালিলে ১ : ২ দ্রবণ হইবে। এইরূপে ১ : ১ দ্রবণে, জল ঢালিয়া লঘু স্টার্চের দ্রবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিরূপ স্টার্চের দ্রবণ কলপ হিসাবে ব্যবহার করিবে তাহা কাপড়ে জমিনের উপর নির্ভর করে।

স্টার্চের দ্রবণে কাপড়খানি প্রায় মিনিট খানেক ভাল করিয়া ভিজাইয়া রাখ। এইবার নিংড়াইয়া অতিরিক্ত স্টার্চ বাহির করিয়া কাপড়খানি শুকাইতে দাও।

অনেক সময় নীল ও কলপ একই সঙ্গে গুলিয়া লইয়া ব্যবহার করা হয়।

শুষ্ক করা—বস্ত্রাদি সর্বদাই সম্ভব হইলে রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া উচিত। আজকাল ঘরের মধ্যেও গ্যাস ও ইলেকট্রিকের উত্তাপে বস্ত্রাদি শুকানো হয়।

রৌদ্রে শুকাইবার সুবিধা :

(১) কাপড় বেশ টাট্‌কা থাকে এবং কখনও খারাপ গন্ধ হয় না।

(২) কাপড়ের লালচে ভাব রৌদ্রের প্রভাবে দূর হইয়া যায়।

(৩) কাপড় ধবধবে সাদা হয়।

(৪) শুকাইবার জন্য অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হয় না।

ঘরে শুকাইবার অসুবিধা :

(১) অতিরিক্ত জ্বালানি খরচের প্রয়োজন হয়।

(২) কাপড়ে হলদে দাগ ধরিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

(৩) মাঝে মাঝে কাপড় এপিঠ ওপিঠ করিবার জন্য লোক লাগে।

(৪) কাপড়ে কোন কোন ক্ষেত্রে খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয়।

শুকাইবার সময় বস্ত্রাদি কখনও লোহার তারের উপর মেলিবে না। কারণ ইহাতে লোহার দাগ লাগিবার আশঙ্কা থাকে। কাঠের 'পেগ' (Peg)-এর সাহায্যে তার হইতে ঝুলাইয়া দিবে। সার্ট, পাজামা, প্যান্ট প্রভৃতি উল্টাইয়া ভিতরের দিকের সবচেয়ে পুরু অংশ পেগের সাহায্যে আটকাইতে হয়।

আর্দ্র করা : কলপ দেওয়া সূতি ও লিনেনের বস্ত্রাদি ভাল করিয়া শুকাইলে ঘরে আনিতে হয়। ইস্ত্রি করিবার পূর্বে কাপড়ের উপর জল ছিটাইয়া নরম করিয়া লইতে হয়। সার্টের কলার, আস্তিন ইত্যাদিতে আঙ্গুল দিয়া জল লাগাইতে হয়। জল ছিটাইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে কাপড় যেন একেবারে ভিজিয়া না যায় এবং কোন একস্থানে বেশী জল না পড়ে। সর্বত্র সমান ভাবে জল পড়িলে ইস্ত্রি সুন্দর হইবে। জল ছিটাইবার পর কাপড়গুলি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া একটি ভিজা তোয়ালেতে মুড়িয়া ১-২ ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হয়। এই সময় জল তন্তুর মধ্য দিয়া সর্বত্র পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট-সময় পরে কাপড়গুলি খুলিয়া এরূপভাবে ভাঁজ ছাড়াইতে হয় যেন উহারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে এবং পুরু অংশে কোন ভাঁজ না থাকে।
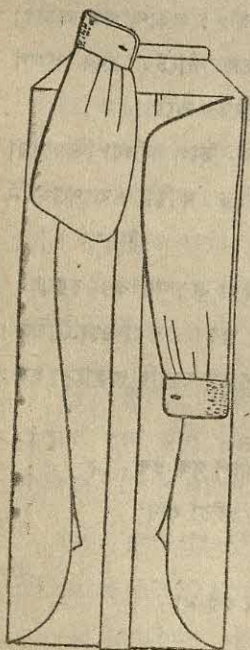
সার্ট ভাঁজ করিবার পদ্ধতি

ভাঁজ করা (Folding) : কাপড়গুলি ইস্ত্রি করিবার পূর্বেই যথাযথরূপে ভাঁজ করিয়া লইতে হয়। শাড়ী, ধুতি ইত্যাদি কাপড়গুলি আর্দ্র করিবার পর দুইজনে টানিয়া ধরিয়া পর পর ভাঁজ করিয়া ছোট করিয়া আনিতে হয়। সার্ট, পাঞ্জাবী, কোট, ফ্রক ইত্যাদিও ভাঁজ করিয়া ঐ ভাঁজের উপর ইস্ত্রি করিতে হয়। সার্ট ভাঁজ করিবার সময় কলার ও পুটের দুইদিকে কিছু অংশ ছাড়িয়া বরাবর লম্বালম্বি দুইদিকে ভাঁজ দিতে হয়। ইহার ফলে বুক সামনের দিকে থাকিবে এবং হাত পিছনদিকে ভাঁজ হইয়া থাকিবে। পাঞ্জাবী,

কোট, ইত্যাদিও ঐ একই ভাবে ভাঁজ করিতে হয়। কোট এবং সার্টের কলারটি আগে ভাঁজ করিয়া ইস্ত্রি করিতে হয়।

ইস্ত্রি করা : ইস্ত্রি করিবার জন্য একটি সমতল চৌকা টেবিলের প্রয়োজন। টেবিলটির উচ্চতা প্রায় কোমর পর্যন্ত হইবে এবং উহার উপরে একটি পরিষ্কার পুরু চাদর পাতিয়া টান করিয়া লইবে।

সাধারণ লোহার ইস্ত্রি হইলে উহা প্রথমে ছাই, বালি প্রভৃতি দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ইস্ত্রি কখনও সরাসরি আগুনের উপর বসাইয়া গরম করিতে নাই। ইহাতে ইস্ত্রির নীচে ময়লা লাগিয়া কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবে। দুইটি লোহার রড উনানের উপর একটু ফাঁক করিয়া রাখিয়া তাহার উপর ইস্ত্রি বসাইতে হয়।

সূতি ও লিনেনের বস্ত্রে ইস্ত্রি বেশ ভালভাবে গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়; তাহা না হইলে ইস্ত্রি ভাল হয় না। অতিরিক্ত গরম হইলে আবার কাপড় পুড়িয়া লালচে দাগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। দুই এক ফোঁটা জল গরম ইস্ত্রিতে ফেলিবার সাথে সাথে যদি উহা বাষ্পীভূত হয় তবে ইস্ত্রি বেশ গরম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কয়েকবার ব্যবহার করিলেই ইস্ত্রি প্রয়োজন মত গরম হইয়াছে কিনা বুঝিতে আর কোন অসুবিধা হইবে না। ইস্ত্রি করিবার পূর্বে কাপড়গুলিকে ঠিকমত ভাঁজ করিয়া লইতে হইবে। বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি থাকিলে ইলেকট্রিক ইস্ত্রি ব্যবহার করা ভাল। কারণ, ইহা ব্যবহার করা অনেক সহজ। ইস্ত্রি ব্যবহারের সাধারণ নিয়মগুলি হইতেছে,

(১) ইস্ত্রিটি বেশ পরিষ্কার হইবে, যেন উহা হইতে কাপড়ে দাগ না লাগে। (২) ইস্ত্রি যেন খুব কম বা খুব বেশী গরম না হয়। কম গরম হইলে ইস্ত্রি ভাল হইবে না, বেশী গরমে কাপড় পুড়িয়া যাইবে। (৩) সার্ট, প্যাণ্ট ইত্যাদির সেলাইয়ের উপর ভাল করিয়া ইস্ত্রি করিবে, যেন সেলাইয়ের সূতায় জল না থাকে। (৪) এমব্রয়ডারী (Embroidery) ইস্ত্রি করার সময় উল্টা পিঠে একখণ্ড ফ্লানেলের কাপড় পাতিয়া লইবে।

বায়ুচালিত করা এবং তুলিয়া রাখা : ইস্ত্রি করিবার পরই বস্ত্রাদি বাক্সে ভরিয়া রাখিবে না। তাহার পূর্বে কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে রাখিয়া দিবে। তাহা না হইলে কাপড়ে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহার ফলে কাপড়ের উপর একপ্রকার 'ফাঙ্গাস' (Fungus) জন্মিয়া Mildew সৃষ্টি করিবার আশঙ্কা থাকে। যেখানে এই 'ফাঙ্গাস' লাগিয়া থাকে সেখানে কাপড়ের তন্তুগুলি

খুব তাড়াতাড়ি ফাঁসিয়া যায়। নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্রাদি হাতের কাছেই রাখিবে এবং যেগুলি অনেকদিন পরে ব্যবহার করিবে তাহা ন্যাপথালিন দিয়া সুরক্ষিত ভাবে রাখিবে যেন পোকায় কাটিতে না পারে।

সুতি এবং লিনেনের ছাপা রঙিন বস্ত্রাদি ধুইবার পদ্ধতি

আজকাল রঙিন ও ছাপা বস্ত্রাদির প্রচলন প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সকল বস্ত্রাদি ধুইবার সময় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহাদের মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) পাকা রঙের বস্ত্রাদি, (২) কাঁচা রঙের বস্ত্রাদি। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে কোন কোন কাপড়ে সাবান ঘষিলে সহজে উহার রঙের কোনও পরিবর্তন হয় না; ইহাদের রঙ পাকা বলিয়া সহজে নষ্ট হয় না। এইজন্য এই সকল বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আবার এমন অনেক কাপড় আছে যাহাদের রং সামান্য সাবানজলে ধুইলেই উঠিয়া যায়। ইহাদের রং কাঁচা, সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিষ্কার করিতে হয়।

পাকা রঙের বস্ত্রাদি—এই সকল বস্ত্র ধুইবার প্রণালী অনেকটা সাদা বস্ত্র ধোওয়ার প্রণালীর অনুরূপ। প্রয়োজনমত রিফু বা সেলাই করিয়া কোন দাগ লাগিয়া থাকিলে তাহা উঠাইতে হয়। দাগ উঠানোর সময় সর্বদাই দাগ উঠাইবার দ্রব্যটি জলে গুলিয়া ব্যবহার করিবে। কখনও পাউডার বা গুঁড়া রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহাতে রঙ চটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ক্লোরিন বা এই ধরনের উগ্র ব্লীচিং দ্রব্যাদি কখনও রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করিবে না। অত্যধিক ময়লা হইলে কাপড়গুলি কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাতে ময়লা আলগা হইয়া আসিবে এবং পরিষ্কার করিতে সুবিধা হইবে। জলে ভিজাইবার সময় প্রতি ১০ ছটাক জলে বড় চামচের এক চামচ লবণ গুলিয়া লইবে। ইহাতে কাপড়ের রং স্থায়ী হইবে। সর্বদাই ঠাণ্ডা বা ঈষদুষ্ণ এবং মৃদু জল ব্যবহার করিবে। তেমন ময়লা না হইলে কাপড় জলে ভিজাইবার প্রয়োজন নাই। ঈষদুষ্ণ মৃদু জলে কিছু সাবান বা সাবানের গুঁড়া গুলিয়া ফেনা হইলে উহাতে এইবার কাপড়খানি ভিজাইবে। জলের উষ্ণতা যেন ১০০-১১০° ফাঃ-এর মধ্যে থাকে। ধীরে ধীরে রগড়াইয়া কাপড় হইতে ময়লা বাহির করিয়া দিবে। প্রয়োজন হইলে

খুপিয়া কাচিতেও পার। ময়লা উঠিয়া গেলে প্রায় ১০ ছটাক ঠাণ্ডা জলে বড় চামচের এক চামচ ভিনিগার গুলিয়া তাহাতে কাপড়খানি ২-৩ মিনিট ভিজাইয়া রাখ। ধুইবার সময় রং বিবর্ণ হইয়া গেলে ইহাতে আবার উহার ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে। কাপড়ের কাঠিন্যের জন্য এইবার ১ : ৪ বা ১ : ৬ স্টার্চের দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ডুবাইয়া লইবে। কাপড়ের জমিন সাদা হইলে উহা নীলজলে ডুবাইতে পার। ভিনিগারে ভিজাইবার পরই স্টার্চের সহিত নীল ব্যবহার করিবে। কাপড়ের জমিন সাদা না হইলে পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে না। কাপড় হইতে জল যথাসম্ভব নিংড়াইয়া ফেলিয়া উহাকে ছায়ায় শুকাইতে দিবে। রঙিন কাপড় রৌদ্রে শুকাইতে হয় না। শুকাইয়া গেলে ঘরে আনিয়া ইস্ত্রি করিবে। ইস্ত্রি করিবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্বে জল দ্বারা আর্দ্র (damping) করিয়া লইবে। খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে রঙ চটিয়া যাইতে পারে।

কাঁচা রঙের বস্ত্রাদি—কাঁচা রঙের কাপড় ধুইবার পূর্বে কখনও জলে ভিজাইয়া রাখিবে না। গরম জলের পরিবর্তে ঠাণ্ডা জলে সাবান গুলিয়া ফেনা প্রস্তুত কর। সাবানে যেন ক্ষার বেশী না থাকে (সাবান চিনিবার উপায় পূর্বেই বলা হইয়াছে)। তাহা হইলে রং চটিয়া যাইবে। খুব বেশী সাবান গুলিবে না এবং সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার করিবে। সাবান জলে অল্প লবণ গুলিয়া লইলে রং স্থায়ী হইবে। কাপড়খানি জলে ভিজাইবার পর রগড়াইয়া বা খুপিয়া ময়লা দূর কর। এইবার ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ভিনিগার মিশ্রণে ডুবাও। মিনিট কয়েক রাখিলে কাপড়ের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে। এখন ১ : ৪ বা ১ : ৬ স্টার্চের দ্রবণে ডুবাইয়া লও এবং কাপড় হইতে অতিরিক্ত জল নিংড়াইয়া ফেলিয়া ছায়ায় শুকাও। অল্পক্ষণ আর্দ্র করিয়া রাখিয়া ইস্ত্রি কর। অধিকক্ষণ আর্দ্র রাখিলে রং জলিয়া যাইবে।

রঙিন বস্ত্রাদি ধুইবার মূল কথাগুলি হইতেছে :—

(১) পাকা রঙের অল্প ময়লা কাপড় ও কাঁচা রঙের কাপড় ধুইবার পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিবে না।

(২) পাকা রংয়ের অত্যধিক ময়লা বস্ত্রাদি লবণজলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

(৩) পাকা রঙের কাপড় ঈষদুষ্ণ জল এবং কাঁচা রঙের কাপড় ঠাণ্ডা জলে ধুইবে।

(৪) যে সাবানে বেশী ক্ষার আছে তাহা ব্যবহার করিবে না।

(৫) সাবান জলে রঙিন বস্ত্রাদি বেশীক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে না।

(৬) সর্বশেষে ভিনিগারের জলে ভিজাইলে কাপড়ের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

(৭) রঙিন কাপড় ছায়ায় শুকাইতে দিবে।

(৮) অত্যধিক গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিও না। তাহাতে রঙ চটিয়া যাইবে।

(৯) এক একবারে একটি করিয়া বস্ত্র ধুইবে।

সাদা পশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি

পশমের বস্ত্রাদি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান এবং অসাবধানতার ফলে অতি সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। ধূলাবালি ইত্যাদি ময়লা গভীরভাবে এই সকল বস্ত্রে বসিতে পারে না। এইজন্য ধুইবার পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না, ঝাড়িয়া ফেলিলেই আলগা ময়লা বাহির হইয়া যায়। নূতন বস্ত্রাদি অবশ্য প্রায় আধঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলে ভাল হয়। জলে সামান্য বোরাক্স (Borax) বা অ্যামোনিয়া (Ammonia) গুলিয়া লইতে হয়। পশমের বস্ত্রাদি ধুইবার জন্য সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার করিবে। বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলই এই সকল বস্ত্র ধুইবার পক্ষে অনুপযোগী। জলের উষ্ণতা প্রায় ১০০° ফাঃ হওয়া উচিত। পশমের বস্ত্রাদি তাড়াতাড়ি ধুইতে হয়, কারণ ভিজা অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে পশম শক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। উষ্ণ জলে সামান্য অ্যামোনিয়া (এক গ্যালন জলে বড় চামচের আধ চামচ) এবং ভাল সাবান বা লাক্স (Lux) সাবানের গুঁড়া গুলিয়া ফেনা প্রস্তুত কর। মনে রাখিবে পশমের বস্ত্রে অত্যধিক ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। ডিটারজেণ্ট (Neutral Detergent), রিঠা প্রভৃতি এই জাতীয় বস্ত্র ধৌতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পশমের কাপড়খানি সাবানজলে ডুবাইয়া ধীরে ধীরে রগড়াইয়া উহার ময়লা দূর কর। কখনও ঘষিয়া পরিষ্কার করিবে

না, ইহাতে বস্ত্রটি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। এইবার উষ্ণ জলে (১০০° ফাঃ) বস্ত্রখানি কয়েকবার ভাল করিয়া ধুইয়া ঈষৎ চাপ দিয়া বস্ত্র হইতে জল বাহির করিয়া দাও। কখনও মোচড়াইয়া জল বাহির করিবে না। টার্কিশ তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া কিছুটা জল শুষিয়া লও এবং বস্ত্রখানি টান টান করিয়া মুক্ত বাতাসে ছায়ায় মেলিয়া দাও। ধুইবার সময় বস্ত্রের যে সঙ্কোচন হয়, শুকাইবার সময় বার বার টানিয়া দিলে উহা দূর হয় এবং বস্ত্রের স্বাভাবিক আকৃতি ও নম্রতা বজায় থাকে। বস্ত্রগুলি যখন সামান্য ভিজা থাকিবে তখন অল্প গরম ইস্ত্রি দ্বারা ভাঁজ করা অবস্থায় উল্টাপিঠে জোরে চাপিয়া দিতে হয়। শুকাইয়া গেলে একটি ভিজা মসলিন কাপড় উপরে রাখিয়া ইস্ত্রি করিবে। কখনও খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। ইস্ত্রির পর বায়ুতে ফেলিয়া রাখিবে।

রঙিন পশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি ঃ রঙিন বস্ত্রাদি ধোওয়ার পদ্ধতি প্রায় সাদা বস্ত্রের মতই। তবে এই ক্ষেত্রে কখনও অ্যামোনিয়া ব্যবহার করিবে না ; কারণ ইহা রঙিন পশমের ক্ষতি করে। সাবান জলে বস্ত্রাদি বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না এবং ময়লা পরিষ্কার হইলে উষ্ণজলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। ধুইবার সময় জলে একটু ভিনিগার ও লবণ মিশাইয়া লইবে (এক গ্যালন জলে বড় চামচের এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার)। ইহাতে বস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে। শুকাইবার সময় টানিয়া পূর্বাবস্থায় রাখিয়া শুকাইবে, তাহা হইলে আকৃতির কোন পরিবর্তন হইবে না। অল্প ভিজা থাকিতে ইস্ত্রি করিবে। শুকাইয়া গেলে ভিজা মসলিন কাপড় উপরে রাখিয়া ইস্ত্রি করিবে। খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। সর্বশেষে বায়ু চালনা (Airing) করিয়া Mildewর হাত হইতে রক্ষা করিবে।

পশমের বস্ত্র ধুইবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিবে ঃ—

(১) কখনও খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করিবে না।

(২) অত্যধিক ক্ষার জাতীয় সাবান বা সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করিবে না।

(৩) কখনও ঘষিয়া পরিষ্কার করিবে না।

(৪) ভিজা অবস্থায় বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না।

(৫) মোচড়াইয়া জল নিংড়াইবে না। ইহাতে তন্তুগুলি ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

(৬) সূর্যালোকে বা অত্যধিক গরম স্থানে শুকাইবে না।

(৭) অত্যধিক গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না।

(৮) ইস্ত্রি হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে বাক্সে তুলিয়া রাখিবে না। কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে রাখিয়া দিবে।

সাদা রেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি

পশমের মত রেশমেও ধূলা বালি ইত্যাদি একেবারে কাপড়ে বসিয়া যায় না। সুতরাং জলে ভিজাইয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। অনেক পুরানো ও অত্যন্ত বেশী ময়লা রেশমের বস্ত্র অবশ্য অল্পক্ষণ ঈষদুষ্ণ জল ও বোরাক্সের (Borax) দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিলে পরিষ্কার করিতে সুবিধা হয়। প্রথমে বস্ত্রখানি ঝাড়া দিয়া আলগা ময়লা যতদূর সম্ভব দূর কর। প্রয়োজনমত রিফু, সেলাই ইত্যাদি করিবার পর যদি কোন দাগ লাগিয়া থাকে তবে তাহা উঠাইতে চেষ্টা কর। সর্বদাই দাগ লাগামাত্র উঠাইতে হয়, পুরান দাগ রেশমের বস্ত্র হইতে উঠানো খুবই মুস্কিল। দাগ উঠাইয়া বস্ত্রখানি এইবার ঈষদুষ্ণ সাবান জলে ডুবাও। সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার করিবে। জল খুব গরম হইলে রেশমের ক্ষতি হইবে। নিউট্রাল ডিটারজেণ্ট (Neutral Detergent) রেশমের বস্ত্র ধুইবার পক্ষে খুবই উপযোগী। রিঠা, ভাল সাবান ও সাবানের গুঁড়াও ব্যবহার করা চলিতে পারে। অত্যধিক ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করিলে রেশমের ক্ষতি হইবে। ময়লা দূর হইলে বস্ত্রখানি ভাল করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া লইবে। সর্বশেষে একবার ঠাণ্ডা জলে ধুইবে। ইহাতে রেশমের কাঠিন্য কিছু ফিরিয়া আসিবে। রেশমের বস্ত্রাদিতে সাধারণত কলপ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। সামান্য ভিজা থাকিতে ইস্ত্রি করিলেই কাপড়ের কাঠিন্য ফিরিয়া আসে। প্রয়োজন মত গঁদের জল (Gum-water) কলপ হিসাবে ব্যবহার করিতে পার (৩ ছটাক জলে চা-চামচের এক চামচ গঁদের জল)। যদি রেশমের মধ্যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করিতে চাও তবে ৩ ছটাক জলে একটি বড় চামচের এক চামচ মেথিলেটেড স্পিরিট (Methylated Spirit) গুলিয়া উহাতে বস্ত্রখানি ডুবাইয়া লইবে। হাতে চাপিয়া যতদূর সম্ভব জল বাহির করিয়া দাও। কিছুক্ষণ ছায়ায় শুকাও। রৌদ্রে বা উচ্চ তাপে শুকাইলে অথবা অধিক উত্তপ্ত ইস্ত্রির সংস্পর্শে আসিলে **সাদা রেশমের কাপড়ে হলদে**

দাগ পড়ার আশঙ্কা থাকে। ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য অবশ্য বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে কিন্তু সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নাই।* রেশমের বস্ত্র একটু ভিজা অবস্থাতেই ইস্ত্রি করিতে হয়। কারণ একবার শুকাইয়া গেলে আর জল ছিটাইয়া আর্দ্র করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে বস্ত্রখানি পুনরায় ভিজাইতে হয়। রেশমে খুব বেশী গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে রেশম পুড়িয়া যাইবে। তসর (Tussore) এবং শ্যানটুং (Shantung) রেশম শুষ্ক অবস্থায় ইস্ত্রি করিতে হয়। ইস্ত্রির পর বায়ুচালিত করিয়া শুষ্ক করিবে।

রঙিন রেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি—ছাপা এবং রঙিন রেশমের বস্ত্রাদি অনেক সময়ে সাবান জলে ধুইলে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এইক্ষেত্রে জলের পরিবর্তে পেট্রল (Petrol) ব্যবহার করিবে। যদি সাবান জলে উহার রংয়ের বিশেষ কোন পরিবর্তন না হয়, তবে একটু সাবধানতার সহিত জলেই বস্ত্রখানি ধুইবে। সুতরাং প্রথমে বস্ত্রখানির এক কোণে একটু সাবানজল ঘষিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে। রঙিন বস্ত্রাদি ধুইবার জন্য ডিটারজেণ্টই বিশেষ উপযোগী। লাক্স পাউডার এবং রিঠাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্ষারজাতীয় দ্রব্যাদি কখনও ব্যবহার করিবে না, ইহাতে রং চটিয়া যাইবে। ঈষদুষ্ণ জলে লাক্স বা ডিটারজেণ্ট গুলিয়া ফেনা হইলে উহাতে বস্ত্রখানি ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি ময়লা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। বেশীক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে রং নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ময়লা পরিষ্কার হইলে বস্ত্রখানি প্রথমে একবার ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া লও। দ্বিতীয়বার ঠাণ্ডা জলে লবণ ও ভিনিগার (এক গ্যালন জলে বড় এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার) গুলিয়া উহাতে বস্ত্রখানি ধুইবে। ইহাতে রংয়ের চাকচিক্য ফিরিয়া আসিবে। অনেক সময় কাল রেশমের বস্ত্র ধুইবার ফলে সবুজ বা লালচে হইয়া যায়। এই সকল বস্ত্রাদি ধুইতে জলে সামান্য অ্যামোনিয়া মিশাইতে হয়। পরে পরিষ্কার বস্ত্রটি গাঢ় নীলজলে ডুবাইলেই

---

*বায়ুর (air) মধ্যস্থিত গন্ধকই এই হলদে বর্ণের কারণ—কাহারও কাহারও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। গন্ধক বা গন্ধকজাত কোন যৌগই (compound) বায়ুর স্বাভাবিক উপাদান নয়। তবে শিল্প এলাকায় গন্ধকের যৌগ বায়ুতে দূষিত গ্যাসরূপে কখনও কখনও দেখা যায়। কিন্তু অধিক উত্তপ্ত ইস্ত্রির সংস্পর্শে এবং যে সকল অঞ্চলে এই গন্ধকজাত যৌগ উৎপন্নকারী কোন শিল্পই নাই সেখানেও যখন সূর্যালোকে সাদা রেশম হলদে হইয়া যায় তখন একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ঐ গন্ধক বা গন্ধকজাত কোন যৌগই এই হলদে বর্ণ সৃষ্টির প্রকৃত কারণ নয়।

উহাতে কোন প্রকার দাগ দেখা যাইবে না। শুকাইবার এবং ইস্ত্রি করিবার প্রণালী সাদা রেশমের বস্ত্রাদির অনুরূপ। রেশমের বস্ত্র ধুইবার মূল কথাগুলি হইতেছে :—

(১) সাধারণত ধুইবার পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না।

(২) ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে এবং সর্বশেষে একবার ঠাণ্ডা জলে ধুইবে।

(৩) ক্ষারজাতীয় সাবান ব্যবহার করিবে না।

(৪) সর্বদা মৃদুজল ব্যবহার করিবে।

(৫) কখনও ঘষিয়া ময়লা পরিষ্কার করিবে না, ইহাতে তন্তু ছিঁড়িয়া যাইবে।

(৬) কখনও মোচড়াইয়া জল নিংড়াইবে না।

(৭) রঙিন ও ছাপা রেশম হইলে ধুইবার জলে লবণ ও ভিনিগার মিশাইবে।

(৮) কাঠিন্যের জন্য গঁদের জল কলপ হিসাবে ব্যবহার করিবে।

(৯) সর্বদা ছায়ায় শুকাইবে।

(১০) সামান্য ভিজা থাকিতেই ইস্ত্রি করিবে।

(১১) তসর (Tussore) ও শ্যান্টুং (Shantung) রেশম শুকাইয়া ইস্ত্রি করিবে।

কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র ধুইবার প্রণালী

রেয়ন প্রভৃতি কৃত্রিম রেশম ধুইবার প্রণালী প্রায় রেশমেরই অনুরূপ। লা বালি ইত্যাদি ময়লা কৃত্রিম রেশমে গভীর ভাবে বসিতে পারে না। অধিকক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে তন্তুগুলি পচিয়া যায়। এইজন্য কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রাদি জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না। সর্বদাই মৃদু ও ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। অত্যধিক ক্ষার জাতীয় দ্রব্যাদি বর্জন করিবে। লাক্স সাবানের গুঁড়া, নিউট্রাল ডিটারজেণ্ট, রিঠা প্রভৃতি ঈষদুষ্ণ জলে গুলিয়া কাপড়খানি উহাতে ভিজাইয়া আলগা হাতে রগড়াইয়া কাচিবে। কৃত্রিম রেশমে সাধারণত কোন কলপের প্রয়োজনই হয় না। অনেকদিনের ব্যবহারে যদি স্বাভাবিক কাঠিন্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে গঁদের জল কলপ হিসাবে ব্যবহার করিবে। হাতে চাপিলেই কৃত্রিম রেশম হইতে জলটুকু বাহির হইয়া যায়। একখানি টার্কিশ

তোয়ালেতে কাপড়খানি আঁট করিয়া জড়াইয়া রাখিলে অধিকাংশ জলই বাহির হইয়া যাইবে। এই সকল কাপড় কখনও রৌদ্রে শুকাইতে হয় না। একটা কাঠের ফ্রেমে কাপড়খানি টানিয়া পূর্বাকৃতিতে আনিয়া ছায়ায় শুকাইতে হয়। শুকাইবার সময় টানিয়া কাপড়খানিকে পূর্বাকৃতিতে না আনিলে কাপড়খানির আকৃতি নষ্ট হইয়া যাইবে। অল্প ভিজা থাকিতেই ইস্ত্রি করিয়া লইবে। খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে কৃত্রিম রেশম সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং ইস্ত্রি করিবার সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে। প্রায় অধিকাংশ কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রই উল্টাপিঠে ইস্ত্রি করিতে হয়।

নাইলন (Nylon), **টেরিলিন** (Terylene) বা **ডেক্রন** (Dacron) **প্রভৃতি ধুইবার প্রণালী**—এই সকল সিন্‌থেটিক (Synthetic) তন্তু জলে ভিজাইয়া রাখিলে সহজে নষ্ট হয় না। সুতরাং অত্যন্ত ময়লা বস্ত্রাদি ঈষদুষ্ণ সাবান জলে ভিজাইয়া রাখিলে সহজে পরিষ্কার হয়। নাইলন ইত্যাদিতে মৃদু ও ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। ভাল সাবানের গুঁড়া, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট, রিঠা প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। ধুইবার সময়ে কখনও মোচড়াইবে না, ইহাতে তন্তুগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। একখানি বড় তোয়ালেতে পরিষ্কার বস্ত্রখানি জড়াইয়া রাখিলে জলটুকু বাহির হইয়া যাইবে। একটি কাঠের ফ্রেমে বস্ত্রখানি টানিয়া স্বাভাবিক আকৃতিতে আনিয়া শুকাইতে দিবে। নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতির তন্তুগুলি এমনভাবে নির্মিত যে ইহাতে কোন ভাঁজ পড়ে না (anti-crease)। তাই উহাদের ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হয় না।

জর্জেট (Georgette) এবং **ক্রেপ ডি শীন** (Crape de Chine) **ধুইবার প্রণালী**—এই জাতীয় কাপড়ে ক্রেপ মিশ্রিত থাকে, তাই ধুইবার সময়ে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সাবধানতা অবলম্বন করিলে কোন কোন জর্জেট ও ক্রেপ ডি সীন জলেই ধুইতে পারা যায়। আবার এমন কাপড়ও আছে যাহা অতি সাবধানতার সহিত পরিষ্কার করিলেও কুঁচকাইয়া আকৃতি নষ্ট হইয়া যায়। এই সব কাপড় জলে পরিষ্কার না করিয়া ড্রাই-ওয়াশ (Dry-wash) করাইতে হয়। জলে ধুইবার উপযুক্ত জর্জেট ও ক্রেপ ডি সীন রেশমের কাপড় ধুইবার প্রণালীতে ধুইতে হয়। উৎকৃষ্ট সাবানের গুঁড়া, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ইত্যাদি পরিষ্কারক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করিবে। কখনও ঘষিয়া ময়লা দূর করিবে না, ইহাতে জমিন নষ্ট হইয়া যাইবে। আলগা হাতে রগড়াইয়া ময়লা বাহির করিয়া দিবে। শুকাইবার সময়েই সর্বাধিক সাবধানতা অবলম্বন

করিতে হয়। ধুইবার পূর্বে প্রস্থের মাপ একটি কাঠের লাঠিতে চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। ধুইবার পরে যাহাতে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ঠিক থাকে, সেইজন্য ভিজা কাপড়খানি ঐ কাঠের লাঠিতে জড়াইয়া লইতে হয়। জড়াইবার সময়ে কাপড়খানি টানিয়া প্রস্থের দাগের সহিত মিলাইয়া জড়াইবে এবং ঐ জড়ানো অবস্থাতেই কাপড়খানি শুকাইবে। উপরের কিছুটা অংশ শুকাইয়া গেলে উহা অন্য একটি লাঠিতে জড়াইয়া লইবে। এইভাবে কাপড়খানি ধীরে ধীরে শুকাইলে ইস্ত্রি করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। ভাঁজ করিয়া সামান্য গরম ইস্ত্রি দ্বারা চাপিয়া দিলেই ইস্ত্রির প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে।

অর্গাণ্ডি (Organdie) ধুইবার প্রণালী—অত্যন্ত মিহি এবং দামী সুতা হইতে এই কাপড় প্রস্তুত হয়। সাদা, ছাপা, রঙিন প্রভৃতি বহু প্রকার অর্গাণ্ডি পাওয়া যায়। ইহা ধুইবার প্রণালী ছাপা ও রঙিন সুতির কাপড় ধুইবার অনুরূপ। অত্যধিক ক্ষারজাতীয় সাবান বা সোডা ব্যবহার করা এবং জলে ফুটানো অর্গাণ্ডির পক্ষে ক্ষতিকর। নূতন কাপড়ে কলপ লাগে না। সামান্য ভিজা অবস্থায় ইস্ত্রি করিলেই স্বাভাবিক কাঠিন্য ফিরিয়া আসে। পুরানো কাপড়ে পাতলা স্টার্চের (starch) কলপ ব্যবহৃত হইতে পারে। খুব দামী ও মিহি জমিনের অর্গাণ্ডিতে গঁদের জল স্টার্চের বদলে কলপ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাদা কাপড়ের হলদেটে ভাব দূর করা

(Removal of Yellowish Colour from white clothes)

বস্ত্রধৌতির বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি তোমরা জানিলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সব রকম সাবধানতা সত্ত্বেও সাদা বস্ত্রাদি অনেকবার ধুইবার পর তাহাদের মধ্যে স্বভাবতই একটা হলদেটে রং দেখা দেয়। কাপড়ের এই হলদেটে ভাবটি বিভিন্ন ব্লিচিং অপসারকের সাহায্যে দূর করা যায়। বিভিন্ন ব্লিচিং অপসারকের মধ্যে ক্লোরিন সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী। কিন্তু ইহা অত্যন্ত উগ্র বলিয়া সুতি ও লিনেনের কাপড় বাদে অন্যান্য কাপড়ে ইহা ব্যবহার করিলে কাপড় ফাঁসিয়া যাইতে পারে। ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ এবং জাভেলী দ্রবণে এই ক্লোরিন থাকে বলিয়া কেবলমাত্র সুতি ও লিনেনের কাপড়েই এই দুই প্রকার দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। সালফার বা গন্ধক পোড়াইয়া যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহাকে সালফার

ডাই-অক্সাইড বলে। এই গ্যাসও এক প্রকার ব্লিচিং অপসারক। তবে ইহা ক্লোরিনের ন্যায় তত উগ্র নয়। সুতরাং ইহা নির্ভয়ে রেশম, পশম, নাইলন, রেয়ন, ডেক্রন ইত্যাদি কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং অক্সালিক অ্যাসিডেরও সামান্য ব্লিচিং করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই সকল দ্রব্যাদি ও রেশম, পশম ইত্যাদি দামী কাপড়ে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সূতি ও লিনেনের সাদা কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি

প্রাচীন পদ্ধতি—অতি প্রাচীন কাল হইতেই সূর্যের আলো, বায়ু, জলীয় বাষ্প ও সবুজ ঘাসের সাহায্যে সূতি ও লিনেনের সাদা কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতি এবং ইহাতে কোন অর্থেরও প্রয়োজন হয় না। কাপড়খানি পরিষ্কার করিয়া টান টান করিয়া খোলা জায়গায় সবুজ ঘাসের উপর মেলিয়া দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে কাপড়ের উপর জল ছিটাইয়া উহাকে আর্দ্র অবস্থায় রাখিতে হয়। বায়ুর অক্সিজেন, সবুজ ঘাস, জলীয় বাষ্প এবং রৌদ্রের সাহায্যে কাপড়ের হলদে রংটি দূর করিয়া উহাতে সাদা ধবধবে ভাবটি ফুটাইয়া তোলে।

আধুনিক পদ্ধতি—উপরের পদ্ধতির একটি অসুবিধা হইতেছে এই যে আকাশ যখন মেঘলা থাকে বা বর্ষার দিনে আকাশে যখন সূর্য দেখা যায় না
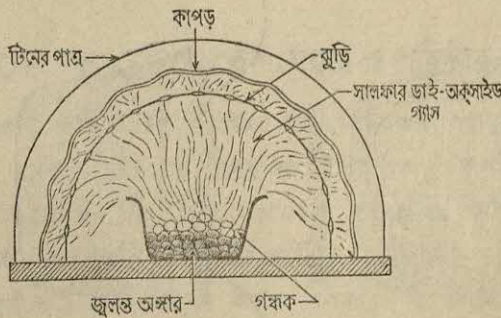
রেশম ও পশমের কাপড়ে হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি

তখন এই পদ্ধতি অচল হইয়া পড়ে। কিন্তু এই নূতন পদ্ধতি গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই প্রযোজ্য।

প্রথমে কাপড়খানি পরিষ্কার করিয়া ব্লিচিং পাউডারের একটি লঘু জলীয় দ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিতে হয় (ব্লিচিং পাউডারের পরিবর্তে জাভেলী

দ্রবণও ব্যবহার করা যাইতে পারে)। পরে কাপড়খানি ঐ দ্রবণ হইতে উঠাইয়া হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের অতি লঘু দ্রবণে আরও
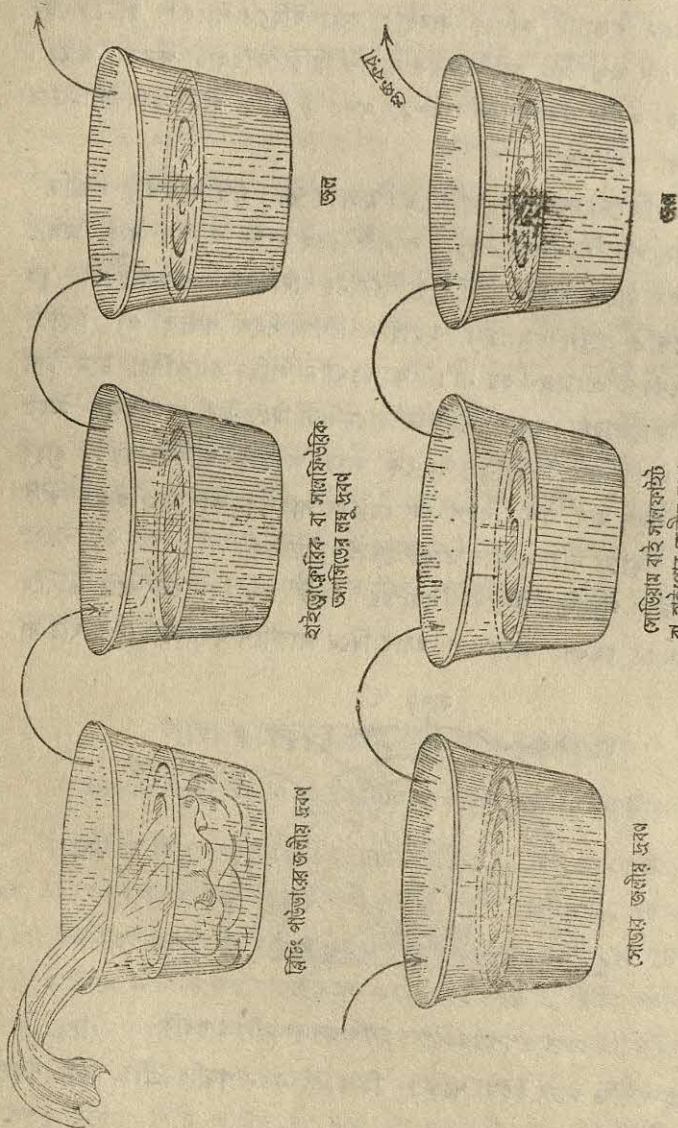
সুতি ও লিনেনের কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি

কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে কাপড়ের হলদেটে ভাবটি কাটিয়া উহাতে সাদা ধবধবে ভাবের সৃষ্টি হয়। এখন কাপড়খানি ভাল করিয়া জলে ধুইয়া

উহা হইতে অ্যাসিড সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে হয়, কারণ, সামান্য অ্যাসিডেও কাপড় ফাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কাপড়খানি এইবার প্রথমে সোডার জলীয় দ্রবণে এবং পরে সোডিয়াম বাই-সালফাইট অথবা 'হাইপো'র লঘু দ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া পরে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

রেশম, পশম ও অন্যান্য দামী কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি—এই সকল কাপড়ে উপরের কোন পদ্ধতিই প্রয়োগ করা যাইবে না। এই জাতীয় বস্ত্রে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস যেমন কার্যকরী তেমনি নিরাপদ।

একটি মাটির পাত্রে কিছুটা জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া উহাতে কয়েক টুকরা গন্ধক স্থাপন কর। পাত্রটি এখন একটি বড় বাঁশের বা বেতের ঝুড়ি দ্বারা ঢাকিয়া দাও। এই ঝুড়ির উপরে ঐ হলদে দাগওয়ালা পরিষ্কার কাপড়খানি ছড়াইয়া দাও এবং সমস্ত ঝুড়িটি আরেকটি বড় টিনের, কাঠের বা মাটির পাত্র দ্বারা এরূপ ভাবে ঢাকিয়া দাও যেন ঝুড়ি এবং ঐ পাত্রের মাঝে বেশ কিছুটা জায়গা থাকে। জ্বলন্ত অঙ্গারে গন্ধক পুড়িয়া সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইবে। এই গ্যাস ঝুড়ির ছিদ্র দিয়া কাপড়ের হলদে অংশের উপর ক্রিয়া করিবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উহাতে সাদা ধবধবে ভাব ফুটিয়া উঠিবে। এইবার কাপড়খানি ভাল করিয়া জলে ধুইয়া শুকাইয়া লও।

সেলাই কলের যত্ন, মেসিনে তেল দেওয়া ও পরিষ্কার করা

আজকাল প্রায় প্রতি গৃহেই সেলাইএর কল দেখা যায়। বাড়িতে একটি সেলাইএর কল থাকিলে গৃহকর্তার অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায়। কলটি যদি যত্ন সহকারে রাখা যায় তবে দীর্ঘদিন উহা ভাল থাকে। সেলাইএর কলে সেলাই করিবার সময় উহার কতকগুলি অংশের নাম জানিয়া রাখা ভাল।

একটি সেলাই কল চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত। ঐ প্রধান ভাগগুলি আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। আমরা এখানে কেবল কয়েকটি বিশেষ অংশের উল্লেখ করিতেছি।

(১) **হেড পার্টস** (Head Parts)—সেলাই কলের হেড পার্টসের মধ্যে নিডল্ বার (Needle bar); প্রেসার বার (Presser bar), প্রেসার ফুট (Presser foot), প্রেসার ফুট লিফটার (Presser foot lifter);

টেনসান পিন (Tension Pin); থ্রেড গাইড (Thread guide); রেগুলেটর স্ক্রু (Regulator Screw)-ই প্রধান।

(২) **আর্ম পার্টস** (Arm Parts)—এই অংশে টেক আপ লিভার (Take up lever); স্পুল পিন (Spull Pin); ফ্লাই হুইল (Fly wheel) প্রধান।

(৩) **ববিন উইণ্ডার পার্টস** (Bobbin Winder Parts)—ববিন উইণ্ডার (Bobbin Winder), স্কেল, স্ক্রু, স্টীচ রেগুলেটর (Stitch regulator with Scale, screw), ববিন উইণ্ডিং টেনসান এঙ্গেল (Bobbin winding tension angle) প্রধান।

(৪) **বেড প্লেট পার্টস** (Bed Plate Parts)—এই অংশে নিডল প্লেট (Needle Plate) ও স্লাইড প্লেট (Slide Plate) প্রধান।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক হস্তচালিত কলে (Hand machine) একটি হ্যাণ্ডেল ড্রাইভার এবং পদচালিত কলে (Foot machine) পাদানি, বেল্ট ইত্যাদি Treadle Parts থাকে। কলের আভ্যন্তরীণ অংশগুলির মধ্যে **শাটল রেস** সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সেলাই কলের সঠিক যত্ন লইতে হইলে সেলাই-এর কয়েকটি বিশেষ নিয়ম মানিয়া লইতে হয়। প্রথমেই সূঁচ কি প্রকারে লাগাইতে হয় জানিয়া রাখ।

প্রকারে লাগান হয়—ফ্লাই হুইল নিজের দিকে সামান্য ঘুরাইয়া নিডল বারকে উঁচু কর। তারপর ক্লাম্প স্ক্রুকে ঢিলা কর। এখন সূঁচের চ্যাপটা পিঠ ক্লাম্প স্ক্রুর দিকে রাখিয়া নিডল বারের খাটে প্রেসে পরাইয়া ক্লাম্প স্ক্রু কষিয়া দাও। ক্লাম্প স্ক্রু ঢিলা থাকিলে কিংবা সূঁচ ক্লাম্পের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ প্রবেশ না করিলে সূঁচ ভাঙ্গিয়া যাইবে। অবশ্য সূঁচ কাপড়ের অনুকূল না হইলে কিংবা বাঁকা বা ভোঁতা থাকিলেও সূচ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।
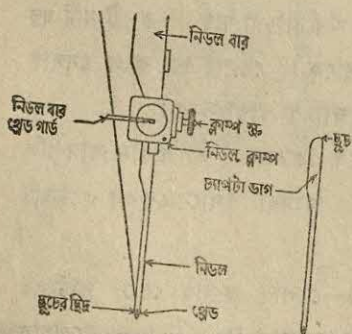
সূঁচে ঠিক ভাবে সূতা পরানো এবং সূতার টান ঠিক রাখার উপরও

সেলাই অনেকখানি নির্ভর করে। কি ভাবে সূঁচে সূতা পরাইতে হয় জানিয়া রাখ।

সূঁচে সূতা পরান—সূতার রীল কলের উপরকার স্পুল পীনে বসাইয়া দাও। সূতার অগ্রভাগ ফেস প্লেটের বাঁদিকের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করাইয়া টেনসান ডিস্কের মধ্য দিয়া নামাইয়া থ্রেড গার্ডের উপর আন। এখন থ্রেড টেক আপ স্প্রিং এবং ফাঁসের মধ্য দিয়া সূতা আনিয়া টেক আপ লেভারের ছিদ্রের মধ্য দিয়া সূতাকে ফেস প্লেটের আইলেট ও নিডল বারের আইলেটের ভিতর দিয়া নিয়া আন। এইবার নিডল বার সবচেয়ে উঁচু করিয়া সূতা সূঁচের ছিদ্রের মধ্যে পরাইয়া দাও।

A. ফেস প্লেট, B. টেনসান ডিস্ক, C. থেড গার্ড, D. থ্রেড টেক আপ স্প্রিং, E. টেক আপ লেভার, F. ফেস প্লেটের আইলেট, G. নিডল বারের আইলেট, H. নিডল বার, I. সূঁচ।

সূতার টান—উপর এবং নীচের সূতার টান সমান না হইলে সেলাই ভাল হয় না। সূতার অসমান টানের ফলে সেলাই ছিঁড়িতে পারে কিংবা কুঁচকাইয়া যাইতে পারে। অবশ্য ভাল সেলাইএর জন্য সূতা ও সূঁচ সর্বদা কাপড়ের অনুকূল হওয়া চাই।

প্রেসার ফুট উঠাইয়া রাখিলে সূতার টান ঢিলা হয়। থ্রেড টেনসানের লাগান নাট ঘুরাইয়া উপরের সূতার টান নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাঁ দিক হইতে ডান দিকে নাট ঘুরাইলে সূতার টান কমে। সেলাইয়ের গাঁঠ যদি ঠিক কাপড়ের মাঝখানে পড়ে তবে বুঝিবে উপর এবং নীচে সূতার টান সমান হইয়াছে।
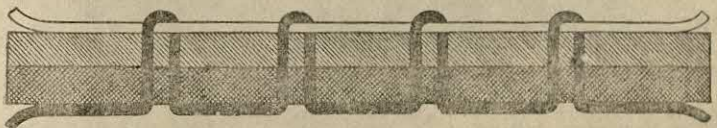
উপরের সূতার টান ঢিলা হইলে এইরূপ সেলাই হইবে
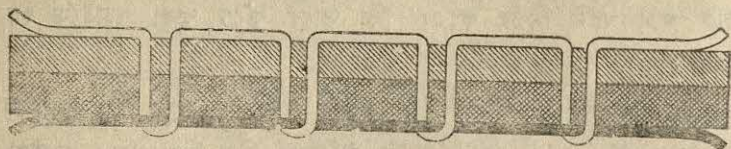
নীচের সূতার টান ঢিলা হইলে এইরূপ সেলাই হইবে।
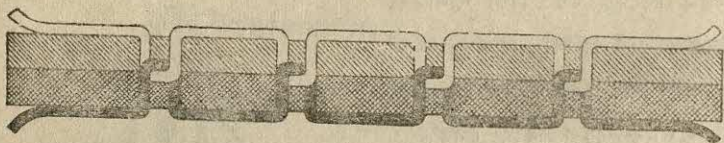
উপরের সূতা এবং নীচের সূতার টান সমান হইয়াছে।

উপরের সূতা ছিঁড়িবার কারণ—ঠিক মত সূঁচ পরান না হইলে কিংবা উপরের সূতার টান বেশী হইলে উপরের সূতা ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য উপরোক্ত কারণ ব্যতীত অন্য কারণেও উপরের সূতা ছিঁড়িতে পারে। যেমন, সূঁচ অনুযায়ী সূতা না হইলে, সূঁচ বাঁকা পরান হইলে, থ্রেড টেক আপ স্প্রিং লাফাইতে থাকিলে কিংবা উহা ভাঙ্গা থাকিলে অথবা স্পুল পিনে সূতা জড়াইয়া গেলেও সূতা ছিঁড়িতে পারে।

নীচের সূতা ছিঁড়িবার কারণ—উপরের সূতার মতই নীচের সূতাও
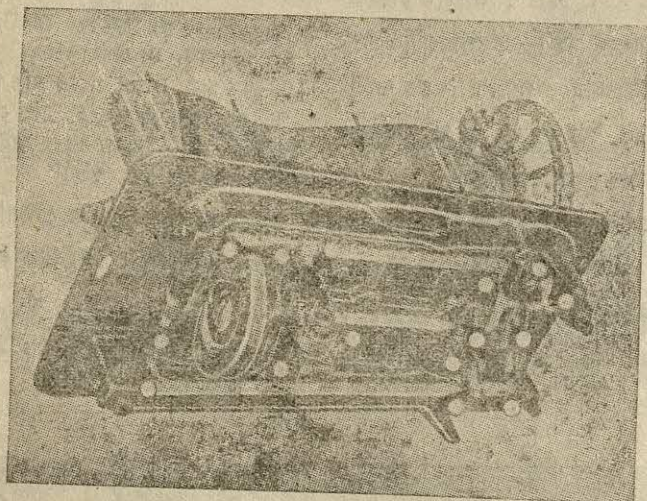
চিত্রে গোলচিহ্ন দ্বারা দেখান স্থানসমূহে তেল ঢাল

ছিঁড়িতে দেখা যায়। সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে নীচের সূতা ছিঁড়িতে পারে :—উপরের সূতার টান অধিক হইলে, ববিনে ঠিকভাবে সূতা পরান না

থাকিলে, সূঁচ বাঁকা থাকিলে কিংবা থ্রেড গার্ডে ধুলাবালি অথবা সূতার আঁশ জমা থাকিলে সূতা ছিঁড়িবার আশঙ্কা দেখা দেয়।

সেলাই কলে তেল দেওয়া—সেলাই কলটি যাহাতে ঠিকভাবে চলিতে পারে উহার জন্য কলে নিয়মিত তেল দেওয়া আবশ্যক। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে গোল চিহ্ন দ্বারা দেখান স্থানসমূহে তেল ঢাল। তেলদানী দিয়া কলে সাধারণ মাত্রায় তেল দিয়া কলটি কয়েক মিনিট তীব্র বেগে চালাও যাহাতে কলের সবত্র তেল ঢুকিয়া যায়। প্রতিদিন কল চালাইলে সপ্তাহে দুই দিন তেল দেওয়া আবশ্যক। স্ট্যাণ্ডে সপ্তাহে একদিন তেল দেওয়া উচিত।

সেলাই কল পরিষ্কার রাখা—নিয়মিত কলটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে ময়লা ও তেল কালি আটকাইয়া উহা সহজেই অকেজো হইয়া পড়ে। এইজন্য পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া কলের জোড়ার অংশগুলির ময়লা মাঝে মাঝে
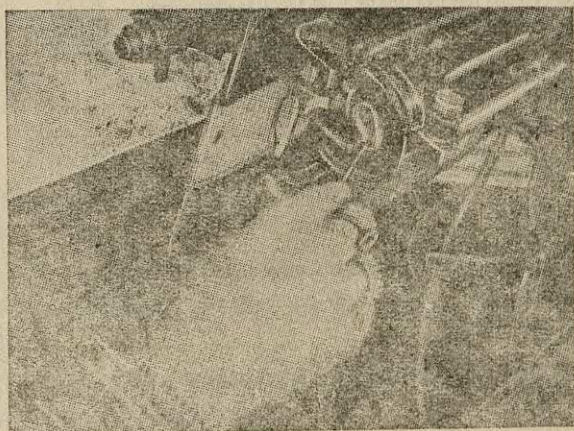
শাটল রেস পরিষ্কার করার উপায়

পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। পূর্বেই বলিয়াছি সেলাই কলের আভ্যন্তরীণ অংশগুলির মধ্যে শাটল রেসই হইল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশটি পরিষ্কার না থাকিলে সর্বদাই সেলাইএর কাজ ব্যাহত হয়। শাটল রেস পরিষ্কার করিবার জন্য :—সূঁচ সব চেয়ে উঁচু করিয়া ধর। পদচালিত কল হইলে বেল্ট খুলিয়া দাও এবং ধীরে ধীরে কলটি তোমার বিপরীত দিকে ঝুঁকাইয়া দাও। স্ক্রু খুলিয়া শাটল রেস কল হইতে বাহির করিয়া লও। তোমার বাঁ হাতে রেস বডি ধরিয়া ডান হাতের তিন আঙুল দিয়া শাটলকে নীচের দিকে ঘুরাইয়া বাহির

করিয়া আন। এখন পরিষ্কার কাপড় দিয়া শাটল রেস এমন ভাবে পরিষ্কার কর যেন সূতার আঁশ একটিও না লাগিয়া থাকে। কোথাও সূতার আঁশ জমিয়া থাকিলে আলপিন দিয়া উহা পরিষ্কার করিয়া ফেল। শাটল রেস কলের এমন অংশ যেখানে সামান্যতম ধূলিকণা কিংবা সূতার আঁশ লাগিয়া থাকিলে সেলাইএর কাজে বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

শাটল রেস পুনরায় যথাস্থানে বসাইবার সময় নিডল বার সবচেয়ে উঁচু করিয়া লও। শাটলকে রেসের ডান দিকে ঘোরাও এবং উহাকে এমন ভাবে বসাও যে শাটলের উভয় মাথা শাটল ড্রাইভারের মাথার সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং রেসটি রেস হোল্ডারের গর্তের মধ্যে ঠিক ভাবে বসে। দুই অঙ্গুষ্ঠ দিয়া উহাকে একটু চাপিয়া দাও এবং দুইটি স্ক্রু দিয়া টাইট করিয়া দাও। শাটল রেস খুলিতে বসাইতে কোন প্রকার অসুবিধা বোধ করিলে সঙ্গে সঙ্গে মেকানিকের সাহায্য লইবে, উহা বেশী নাড়াচাড়া করিবে না।

অনুশীলনী

প্রথম পত্র—প্রথম অধ্যায়—গণস্বাস্থ্য

1. What is community sanitation ? How can you improve the sanitation of a village without a municipality ?

2. What are the dangers of spitting ? Name any disease which is caused by careless spitting. What preventive measures do you suggest ?

3. Describe the system that is usually employed for the disposal of body-wastes in big cities like Calcutta. What are its advantages ? [S. F. 1952]

4. Describe the 'Water-carriage system' employed for the disposal of body-wastes. What are its advantages ?
[M. 1947], [S. F. 1954]

5. Describe with diagram the best arrangement for the disposal of night-soil in a village.

6. State briefly the common methods of disinfecting a room.
[C. U. 1946]

7. Describe how infectious diseases spread from man to man. What steps should be taken to prevent the spread of such diseases ?

8. What measures would you adopt in order to prevent the spread of an infectious disease when it takes the form of an epidemic ? [C. U. 1948]

9. What do you understand by immunity ? How can we develop immunity in our body ?

10. Write short notes on :—(a) Segregation, (b) Vaccination, (c) Isolation and (d) Inoculation.

11. Show how cleanliness in the home might prevent the spread of communicable diseases to other members of the family. How would you prevent the spread of small-pox if you have a case in your family ? [H. S. 1960]

12. Describe the methods of spread and prevention of tuberculosis.

13. What are the different kinds of dysentery ? What are the measures to be taken for its prevention ?

14. State what steps will you take for the prevention of cholera epidemic in a village.

15. State what preventive steps you should take if cases of cholera, dysentery and typhoid fever often occur in your neighbourhood.

[C. U. 1947]

16. Write in short some of the causes of Influenza and those of Measles.

17. What is Scabies ? Why is it so much hated by the people and how can it be prevented ?

18. Write what you know about Ringworm.

19. Discuss fully the points you should consider in nursing a sick person in your family.

[S. F. 1956]

20. "A sick person is usually more difficult to deal with than one in normal health." Do you agree ? If so, state your reasons.

[C. U. 1948]

21. What principles should guide you in selecting a room for a sick person ?

[C. U. 1947]

22. Prepare a list of furniture and equipments of a 'sick room'.

23. Describe with a sketch how and where you would place the bed of a patient in a sick room. State how would you change the bed sheets while the patient is lying on the bed.

24. State the processes you would follow in changing the undersheets of a patient's bed while the patient is unable to turn. What are the rules you should observe in bed-making ?

[C. U. 1949]

25. Describe the process you would follow while giving bath to a patient who is lying in bed. Prepare a list of articles that you need for the purpose.

[S. F. 1951]

26. What precautions would you take for preparing diet for the sick ? How would you serve diet to an invalid person ?

27. What are the common methods of disinfection by heat ? State how you would disinfect a pucca or brick-built room which was occupied by a small-pox patient ?

[C. U. 1947]

28. State the points you should remember with regard to the diet of a patient.

[C. U. 1948]

29. What precautions would you take for preparing invalid diet ? How would you serve food to a patient ? [S. F. 1953]

30. What points would you consider while administering medicine to a sick person ? What are the essential qualifications of a good nurse ? [C. U. 1947 ; S. F. 1954, and 1955]

31. What are the main causes of bed sore ? State the steps you would take in order to prevent it. [S. F. 1951]

32. Describe a clinical thermometer. How would you make a temperature chart of a typhoid patient ? [S. F. 1953]

33. What is a clinical thermometer ? What precautions will you observe in taking the temperature of a sick person ? [C. U. 1945]

34. Why are records important for nursing ? How should they be kept ?

35. Describe briefly the main factors that you should consider while nursing at home a patient suffering from high fever. [S. F. 1957]

36. What are the essential qualifications of a good nurse ? What precautions should she observe regarding her personal health while nursing a patient ?

প্রথম পত্র—দ্বিতীয় অধ্যায়—গৃহ পরিচালনা

1. What are the main principles of making a family budget ? What are the main factors that you should take into consideration in preparing such a budget ? [S. F. 1956 and '57]

2. How does the budget of a poor, a middle class and a rich family differ from one another ? What are the factors that influence the budget of a family ? [S. F. 1954]

3. Make a budget plan for a man with an income of Rs. 150 per month and say how much he ought to spend on clothes, food and education provided he has to support a family consisting of two children of school-going age, his wife and mother. How much should he save ? [C. U. 1950]

4. What are the benefits of saving ? In how many ways can you save your money ?

5. What are the different ways of saving money through bank ? State their advantages and disadvantages.

6. State the difference between a Current Account and a Savings Account in a Bank. Point out their advantages and disadvantages. [S. F. 1955]

7. What is a cheque ? What are its advantages ? [C. U. 1945]

8. Describe briefly about 'Bearer cheque' and 'Crossed cheque'. What are their advantages and disadvantages ?

9 State the difference between a Savings Account and a Current Account. Why should cheques always be made payable to some person ? How would you endorse a cheque ? [H. S. 1960]

10. What do you understand by 'Life Insurance' ? Wide-spread publicity of 'Life Insurance' is urgently needed among the middle class people in our country—why ?

11. State which form of Life Insurance you would prefer—Whole life or Endowments ? Justify your preference. [G. U. 1948]

12. Write short notes on :—

(a) National Savings Certificate, (b) Savings Bank Account.

13. Write a short essay on the National Savings Scheme of the Government of India.

14. State briefly how you would use your leisure time wisely.

15. Name and discuss some useful hobbies by which you can utilise your leisure to increase your family income.

দ্বিতীয় পত্র—প্রথম অধ্যায়—খাদ্য

1. How may foods be classified ? State what foods are used for repair and growth of body tissue. [C. U. 1947]

2. Explain why protein is so important for human nutrition. Name some foodstaff rich in protein.

3. State the chief functions of protein and mention the quantity required per head per day to maintain health.

4. What is called the best protein ? Describe the usefulness of protein diet.

5. Why is protein of special improtance in the diet ? What is the difference between protein from animals and from vegetable foods ? Which is the better source of protein, egg or dal, milk or wheat ? [S. F. 1953]

6. 'Carbohydrates should be cooked in plenty of water.'—Give reasons for your answer.

7. Give a comparative statement on the functions of carbohydrate and fat in the human body. How far can they supplement each other in a normal adult diet ? [S. F. 1956]

8. Make a list of food that supply energy to our body. Compare carbohydrate and fat as sources of calorie. [H. S. 1961]

9. What is the role of fat in human nutrition ? Name two soluble vitamins and mention in which food material they would be available. [S. F. 1958]

10. Compare pure ghee with vegetable ghee.

11. What are the functions of mineral elements in our body ? Name some of the important minerals that are present in milk and cereals. [H. S. 1961]

12. Name some mineral elements present in our diet. What purpose do they serve in the human body ? [S. F. 1954]

13. State the functions of calcium in the body.

14. What is the effect of too little calcium in diet ? What is the best way to supply it ? [C. U. 1946]

15. What is the effect of too little iron in diet ? What is the best way to supply it ?

16. What is Vitamin ? Name some common foods in which vitamin A and vitamin D predominate and state why these two vitamins are important for our body. [C. U. 1948]

17. What vitamins are readily lost during cooking ? What other nutrients may be affected by faulty cooking processes ? Suggest some measures by which such losses may be reduced.

18. Discuss the importance of fruits and vegetables in our daily diet ? State how you would proceed to cook vegetables preserving almost all the nutrients. [S. F. 1957]

19. Name the vitamin deficiency diseases and the vitamins which are responsible for these diseases.

20. What is the composition of milk ? State why milk is so essential in childhood. [C. U. 1946]

21. Eplain why milk is called a 'protective food'. Name all its good qualities. [C. U. 1947]

22. Draw up a table to illustrate the general composition of milk. What milk would you select for artificial feeding of an infant, and why ? [C. U. 1950]

23. Draw up a table to show the composition of milk. State how adulteration of milk may be detected. [S. F. 1954]

24. Draw up a table showing the composition of cow's milk. Discuss the importance of milk in the diet of a school-child. [S. F. 1958]

25. Write what you know about pasteurization of milk.

26. What do you understand by balanced diet ? [C. U. 1950]

27. What is a balanced diet ? What supplementary food can you suggest to enrich a diet low in protein and iron ? [H. S. 1961]

28. What do you mean by the 'calorie-value' of food ? Name the common ingredients of your diet rich in calorie-value.

দ্বিতীয় পত্র—দ্বিতীয় অধ্যায়—বস্ত্রধৌত

1. What do you mean by hard and soft waters ? What causes hardness and what are the evil effects of using such water in laundry work ? How can you overcome them ? [C. U. 1950 ; S. F. 1955]

2. What are the properties of a good laundry soap ? How does soap clean dirt from clothes ? [S. F. 1958]

3. Why are washing soda, ammonia and borax added sometimes to the soap as it is forming ? What are their effects on cotton, silk and wool ?

4. What causes hardness in water ? How would you test for it ? State the reaction of washing soda and hard-water while washing clothes. [H. S. 1962]

5. Discuss the action of soap and water in washing clothes. What would be the effect of using, (a) hot water on silk, (b) cold water on woollen and (c) hard-water on cotton garments ? [H. S. 1962]

6. Describe briefly the process of washing and finishing a coloured cotton sari. [C. U. 1947], [G. U. 1950]

7. Describe the method of washing white cotton clothes and state the effect of starch and blue on them. [C. U. 1946]

8. What are the effects of starch and blue on cotton clothes ? Describe briefly how cotton garments are starched and ironed. [C. U. 1948]

9. Describe briefly the process of washing and finishing the following garments :—

(a) A cream-coloured silk frock.

(b) One-coloured woollen jumper. [C. U. 1951]

10. Describe the washing process of dark blue cotton blouse. How would you proceed to iron out a man's shirt and a handkerchief ? [S. F. 1953]

11. Give reasons for the following :—

(a) White silk becomes yellow after wash. [C. U. 1950]

(b) Wool generally shrinks when washed. [S. F. 1954]

12. How would you proceed to wash and iron a woollen garment ?

13. What are the uses of starch on clothes ? Describe the process you would follow in stiffening a Nurse's cap or a petticoat. [S. F. 1956]

14. Narrate the effects of using soda and borax in the washing of a white cotton pillow case and a white silk blouse. [S. F. 1957]

15. What are the characteristics of silk fibre ? Describe briefly the method you would adopt for washing a silk garment. [H. S. 1960]

16. Describe the procedure you should follow in removing grease-stain from a cotton cloth. [C. U. 1947]

17. Describe briefly the procedure you should follow in one of the following :—

(a) Removing a grease-stain from a cotton sari.

(b) Removing a blood-stain from a coloured cotton frock.

18. What is a stain ? State the method you should follow while removing :—

(a) Ink stain from a coloured frock. (b) Tea stain from a silk sari. (c) Grease stain from a cotton table-cloth.

[H. S. 1960]

19. How may stains be classified ? Give an example of each group and state how you would proceed to remove them from a white cotton sari. [H. S. 1961]

একাদশ শ্রেণী

প্রথম পত্র

প্রথম ভাগ—স্বাস্থ্য-তত্ত্ব

দ্বিতীয় ভাগ—প্রাথমিক প্রতিবিধান

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব

অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ

স্যার প্যাট্রিক ম্যান্সন সর্বপ্রথম কীটপতঙ্গের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহারা নানাপ্রকার রোগের জীবাণু বহন করিয়া বেড়ায়। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, ডেঙ্গু, প্লেগ, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগ ছড়ায় কীটপতঙ্গ। কীটপতঙ্গের সঙ্গে বাস্তবিক আমাদের এক নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। গৃহপালিত পশু বাদ দিলে কীটপতঙ্গের মত আর অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বোধ হয় এমন ঘনিষ্ঠতা নাই। উহারা আমাদেরই আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও আসবাবপত্র খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। আমরাও অনেক কীটের দেহ দিয়া আমাদের বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া থাকি। সব পতঙ্গই যে মানুষের অনিষ্ট করে তাহা নয়, অনেকে আবার আমাদের উপকারও করিয়া থাকে। তবে অধিকাংশ পতঙ্গই অত্যন্ত বিপজ্জনক। উহারা রোগজীবাণু বহিয়া আনিয়া নানাভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রধানত মশা ও ইঁদুর-মাছি (Rat fleas) বলিয়া এক ধরনের ক্ষুদ্র মক্ষিকা ম্যালেরিয়া ও প্লেগের বীজ ছড়াইয়া যে কত লোকের প্রাণ নষ্ট করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কতকগুলি কীটপতঙ্গ রোগের নিষ্ক্রিয় বাহক মাত্র (passive agents)। ইহারা রোগীর মলমূত্র, কফ, থুথু ইত্যাদিতে বসিয়া রোগের জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাদ্য দূষিত করে। তারপর ঐ খাদ্য গ্রহণ করিয়া আমরা ঐ সব রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। কোন কোন কীটপতঙ্গ আবার সক্রিয়ভাবে রোগ ছড়ায়। ইহাদের বলে সক্রিয় বাহক (active agents)। ইহারা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পান করিয়া আপনাদের দেহে রোগের জীবাণু বহন করে এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহে দংশন করিবার সময় ঐ জীবাণু ঢালিয়া দেয়। রোগ-সংক্রমণ করা ব্যতীত অনেক কীটপতঙ্গ আমাদের আসবাবপত্র, পুস্তক ও পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি কাটিয়া কুটিয়া নষ্ট করে।

কীটপতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ—

উপরোক্ত তিন উপায়ে কীটপতঙ্গ আমাদের অনিষ্ট সাধন করে বলিয়া কীটপতঙ্গের আমরা তিনটি শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। নিম্নে এই শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হইল—

(১) **রক্ত চুষিয়া যেসব কীটপতঙ্গ আমাদের অনিষ্ট করে—**

(ক) **মশা**—মশা আমাদের রক্ত পান করিবার সময় আমাদের দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং আমাদের বাড়ির আশেপাশে যেখানেই জলাভূমি কিংবা একটু স্যাঁতসেঁতে জায়গা পায় সেখানেই ডিম পাড়িয়া বসে।

(খ) **বালু-মক্ষিকা**—ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও বালু-মক্ষিকা দেখা যায়। এই পতঙ্গ কামড়াইলে জ্বর হয়।

(গ) **ছারপোকা ও মক্ষিকা**—ইহারা আমাদের সঙ্গে আমাদের বাসগৃহেই ঘুমাইয়া থাকে এবং আমাদের রক্ত পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে ও বিভিন্ন রোগ ছড়ায়।

(ঘ) **উকুন**—মানুষের রক্ত পান করিয়া বাঁচে এবং নানারূপ রোগ ছড়ায়।

(২) **আমাদের খাদ্যের মধ্য দিয়া যেসব কীটপতঙ্গ রোগের জীবাণু ছড়ায়—**

(ক) **মাছি**—সমস্ত কীটপতঙ্গের মধ্যে মাছির মত বোধহয় মানুষের আর দ্বিতীয় শত্রু নাই। সব রকমের পেটের পীড়া সংক্রামিত হয় মাছির সাহায্যে।

(খ) **পিপীলিকা**—কদাচিৎ রোগের জীবাণু ছড়ায়। আমাদের খাদ্যে বসিয়া খাদ্য ধ্বংস করা ছাড়া ইহারা তেমন কোন অনিষ্ট করে না।

(গ) **আরশুলা** (cockroach)—মাছির মতই আরশুলা উহার দেহে রোগের জীবাণু লইয়া আমাদের খাদ্যের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায় এবং খাদ্য দূষিত করে।

(ঘ) **ইঁদুর**—ইঁদুর প্লেগ ছাড়াইতে সাহায্য করে।

(৩) **যে সমস্ত কীটপতঙ্গ আমাদের জিনিসপত্র নষ্ট করে—**

(ক) **ঘুণ** (moth)—ঘুণ আমাদের কাঠের আসবাব নষ্ট করে।

(খ) **সিলভার ফিস**—কৃত্রিম রেশমী কাপড়চোপড়, কলপ দেওয়া বস্ত্র এবং কাগজ নষ্ট করে।

(গ) **বইএর উকুন** (book lice)—বই কাটে।

(ঘ) **আরশুলা**—আমাদের বই, ছবি, রেশমী বস্ত্র ও চামড়ার জিনিস নষ্ট করে।

(ঙ) **ইঁদুর**—বস্ত্রাদি ও আসবাব কাটিয়া নষ্ট করে।

(চ) **ঝিঁঝি** (cricket), **বোলতা** (wasp) ও **উঁই** (white ant) —আমাদের কাঠের আসবাব নষ্ট করে।

কীটপতঙ্গের বৈশিষ্ট্য—

কীটপতঙ্গের দেহে একটি কঠিন আবরণ থাকে এবং সমস্ত শরীরটি তিন ভাগে বিভক্ত—(১) দুইটি শুণ্ডবিশিষ্ট মস্তিষ্ক। (২) তিন ভাগে বিভক্ত বক্ষঃস্থল। বক্ষঃস্থলে তিন জোড়া পা ও এক কিংবা দুই জোড়া ডানা থাকে। (৩) উদর সাধারণত নয় বা দশ ভাগে বিভক্ত। মানুষের মত কীটপতঙ্গের কোন ফুসফুস নাই। উহারা ফুসফুসের বদলে অন্য একটি অঙ্গ দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সমাধা করে। কীটপতঙ্গের মধ্যে নারী ও পুরুষের ভেদ সুস্পষ্ট। ডিম হইতে ইহাদের জন্ম হয়। কোন কীটপতঙ্গ কি কি রোগ ছড়ায় নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল—

(১) মশা (mosquito)—ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, পীতজ্বর ও ডেঙ্গু।

(২) উপমক্ষিকা (fleas)—বিউবোনিক প্লেগ, টাইফস ও কালাজ্বর।

(৩) উকুন (lice)—টাইফাস জ্বর ও ট্রেঞ্চ জ্বর।

(৪) গৃহমক্ষিকা (house flies)—টাইফয়েড, কলেরা ও আমাশয়।

(৫) বালু-মক্ষিকা (sand flies)—বালু-মক্ষিকা জ্বর ও কালাজ্বর।

কীটপতঙ্গের আক্রমণ এড়াইতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবশ্য পালন করিবে।

(১) বাসগৃহ যতদূর সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখিবে।

(২) বসতবাটির আশেপাশে কোথাও জল জমিয়া থাকিতে দিবে না। নিকটেই যদি পুষ্করিণী থাকে তবে উহাতে মশার ডিম (larvae) ধ্বংসকারী মাছ রাখিবে। যদি খানা, ডোবা কিংবা এঁদো পুকুর থাকে তবে উহাতে প্রতি সপ্তাহে কেরোসিন কিংবা ডি ডি.টি. ছড়াইবে।

(৩) যেখানেই ভাঙ্গা শিশি, কাচের বোতল ইত্যাদি পাইবে তাহা দূরে ডাস্টবিনে নিয়া ফেলিবে কারণ এই সব ভাঙ্গা শিশি বোতলেও বৃষ্টির জল জমিয়া মশার সৃষ্টি হইতে পারে।

(৪) খাটাল, গোশালা ও আস্তাবল পরিষ্কার ঝকঝকে রাখিবে।

(৫) ঘরের মেঝেতে, দেওয়াল কিংবা ছাতে কোথাও যদি কোন ফাটল কিংবা গর্ত থাকে তবে উহা তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া ফেলিবে। ইঁদুর, আরশুলা ও ছারপোকার বাসস্থান এই সমস্ত ফাটল।

(৬) মাঝে মাঝে বাড়ি চুনকাম করাইবে।

(৭) মাঝে মাঝে সমস্ত আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার ও খাট পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কোথাও ছারপোকা জন্মিয়াছে কিনা। এতদ্ব্যতীত আলমারির পশ্চাতে ও ঘরের অন্ধকার কোণগুলি সপ্তাহে অন্তত একবার করিয়া ঝাঁট দিবে। দিনের বেলায় মশা ও আরশুলা ঐসব স্থানে লুকাইয়া থাকে।

(৮) বাড়ির সমস্ত আবর্জনা, তরকারীর খোসা, মাছের আঁশ, ডিমের খোলা একটি ঢাকনাওয়ালা পাত্রের মধ্যে প্রথমে জমাইয়া রাখিবে। তারপর ঐগুলি একসঙ্গে পুড়াইয়া ফেলিবে।

(৯) ঘরের জানালায়, অন্তত রান্নাঘরের দরজা ও জানালায় মশা মাছি প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ সূক্ষ্ম জাল আঁটিয়া দিবে।

(১০) কোন খাদ্যই না ঢাকিয়া রাখিবে না।

(১১) বাড়িতে ইউক্যালিপটাস, নিম ও তুলসী গাছ পুঁতিয়া দিলে বায়ু বিশুদ্ধ হয়। তামাক গাছও রোগের জীবাণু ধ্বংস করে।

(১২) বাড়িতে নিম অথবা তামাক পাতা পোড়াইলে অথবা ধূপধুনা জ্বালাইলেও কীটপতঙ্গ দূর হয়। কাপড়চোপড় ও বইএর আলমারিতে শুকনো নিম পাতা ও তামাক পাতা দিয়া রাখিলে পোকা কাটিতে পারে না। কর্পূর অথবা নেপথালিন, ইউক্যালিপটাস তেল, পাইন ও দেবদারু কাঠ ঘরে রাখিয়া দিলে অথবা পোকামাকড়ের সম্ভাব্য বাসস্থানে পাইরেথ্রাম, সালফার, বোরাক্স, ফটকিরি কিংবা লঙ্কার গুঁড়া ছিটাইয়া দিলেও উহারা ধ্বংস হয়।

(১৩) জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিবে। সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইল পেট্রোল, কেরোসিন, সালফার গ্যাস ও ফরমালডিহাইড; কোন কোন ক্ষেত্রে নারিকেল তেলও কার্যকরী।

সাবান, গরম জল ও কেরোসিন তেলের মিশ্রণে এক প্রকার জীবাণুনাশক লোশন তৈয়ারী হয়। এই লোশন তৈয়ারীর উপাদান নিম্নরূপ—

সাবান	...	৩ ভাগ
গরম জল	...	১৫ ভাগ
কেরোসিন	...	৮২ ভাগ

প্রথমে গরম জলে সাবান বেশ ভাল করিয়া গুলিয়া নাও। তারপর একটি গরম জলের পাত্রের মধ্যে কেরোসিনের বোতলটি রাখিয়া কেরোসিন উত্তপ্ত করিয়া নাও। মনে রাখিবে আগুনের কাছে রাখিয়া কেরোসিন গরম করিতে নাই। এইবার উত্তপ্ত কেরোসিন সাবান মিশ্রিত গরম জলের সঙ্গে মিশাইয়া নাও। যে লোশন তৈয়ারী হইল উহা কোন বোতলে পূরিয়া রাখিবে। তারপর প্রয়োজনমত জলের সঙ্গে (লোশন ১ : জল ১০) মিশাইয়া ঘরে স্প্রে কর। ইহা অত্যন্ত সস্তা এবং কার্যকরী।

কীটপতঙ্গ এবং উহাদের বিনাশের উপায়

মশা—তিন রকমের মশা আছে—এনোফিলিস্ (Anopheles), কিউলেক্স (Culex) ও ষ্টেগোমায়া (Stegomyia)। ষ্টেগোমায়া নামক মশা বাঘ মশা নামে পরিচিত। ইহাদের গায় সাদা ও কালো ডোরাকাটা দাগ রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতের মশাই কোন-না-কোন রোগ ছড়ায়। এনোফিলিস ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। কিউলেক্সের দ্বারা ফাইলেরিয়া রোগ সংক্রামিত হয় এবং ষ্টেগোমায়া ডেঙ্গু জরের জীবাণু বহন করে।

পুরুষ মশা সাধারণত ঘাসপাতার রস খাইয়া জীবন ধারণ করে। স্ত্রী মশার মানুষের রক্ত না হইলে চলে না। ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী এনোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত কোন ব্যক্তির রক্ত পান করিবার সময় ঐ রোগের জীবাণুও খাইয়া ফেলে। সেখানে অনুকূল আশ্রয় পাইয়া জীবাণুগুলি বাড়িতে থাকে। তারপর দশ দিন পরে ঐসব জীবাণু সংক্রমণের উপযুক্ত হইয়া উঠে। তখন ঐ মশা যদি আর কোন সুস্থ দেহে দংশন করে, তবে হুলের ভিতর দিয়া লালার সঙ্গে ঐসব জীবাণু সুস্থ লোকটির দেহে চলিয়া যায়। এইভাবে মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায়। এনোফিলিস মশা যেভাবে ম্যালেরিয়া ছড়ায় কিউলেক্স ও ষ্টেগোমায়াও অনুরূপভাবে যথাক্রমে ফাইলেরিয়া ও ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়।

মশাদের স্বভাব হইল বদ্ধ জলাশয় পাইলেই সেখানে ডিম পড়িয়া রাখা। কিউলেক্স মশা সাধারণত এক সময় ৩০০ করিয়া ডিম পাড়ে। বর্ষাকালই মশাদের ডিম পাড়িবার উপযুক্ত সময়। কোথাও একটু বর্ষার জল জমিয়া থাকিলেই মশা আসিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। এই ডিমগুলি একসঙ্গে ভেলা পাকাইয়া থাকে। এনোফিলিস মশার ডিম অবশ্য পৃথক্‌ভাবে থাকে। প্রায়
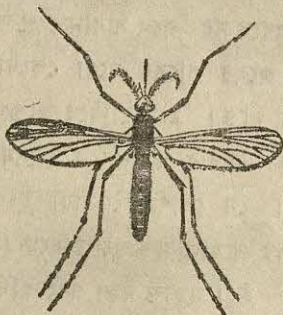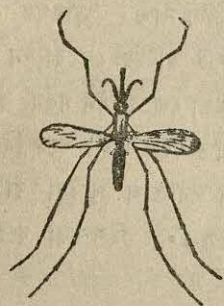
এনোফিলিস ও কিউলেক্স মশা

২০ ঘণ্টা পরে এই ডিমগুলি ফুটিয়া শূককীট (larvae) বাহির হয়। শূককীটগুলি বায়ু ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য শূককীটগুলি কিছুক্ষণ পর পরই জলের উপর ভাসিয়া ওঠে। ৭ হইতে ১৪ দিন এইভাবে থাকিবার পর শূককীটগুলি মূককীটে (pupa) পরিণত হয়। এই সময় উহাদের দেহের আকার বেশ বড় হয় এবং শরীরটি ঠিক কমার আকার ধারণ করে। তিন চারদিন পরে খোলস কাটিয়া ডানাযুক্ত মশা বাহির হইয়া আসে।

মশা চিনিবার উপায়

বাচ্চা—অনাবৃত স্থির জলে যে পোকা জন্মে সেগুলিই মশার বাচ্চা। ইহারা ১০-১২ দিন জীবিত থাকে। এনোফিলিস মশার বাচ্চারা জলের উপরেই সটান চিত হইয়া ভাসে এবং তাড়া দিলে খানিকটা পিছাইয়া যায়। কিউলেক্স মশার বাচ্চারা আড়ভাবে ভাসে এবং তাড়া দিলে আঁকিয়া বাঁকিয়া জলের নীচে চলিয়া যায়।

ধাড়ী—এনোফিলিসের পাখা দুইটিতে সাদা কালো চাকা চাকা দাগ থাকে এবং ইহারা সর্বদা সোজা হইয়া বসে। কিউলেক্স মশা সর্বদা কুঁজা হইয়া বসে। আমরা সচরাচর যে মশা দেখি তাহা প্রায়ই কিউলেক্স জাতীয়। এনোফিলিস মশা রাতের অন্ধকার না হইলে লোকালয়ে বাহির হইয়া আসে না।

কিরূপে মশার উচ্ছেদ সাধন করা যায় ?

(১) যে সমস্ত স্থানে মশার ডিম পাড়িবার সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত গর্ত, খানা, ডোবা, এঁদো পুকুর মাটি দিয়া ভরাট করিয়া ফেলিবে। বাড়ির আশে-পাশে ভাঙ্গা কাচের শিশি, বোতল ইত্যাদি জমিতে দিবে না।

(২) পুষ্করিণী, দীঘি, কূপ, নর্দমা, সমস্ত পরিষ্কার রাখিবে। পুষ্করিণীতে মাছ রাখিবে। মাছ মশার শূককীট খাইয়া ফেলিয়া মশা নিধনে সাহায্য করে।

(৩) শূককীট অবস্থায় মশা নিধনই প্রশস্ত। শূককীটগুলি বায়ু ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। কাজেই যে জলে মশা ডিম পড়িয়াছে, যদি ঐ জলে কিছু কেরোসিন ঢালিয়া দেওয়া যায় তবে দেখিবে জলের উপরে একটি পাতলা স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। শূককীটগুলি ঐ স্তর ভেদ করিয়া বায়ু গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং শীঘ্রই বায়ুর অভাবে উহারা মরিয়া যায়।

(৪) রাত্রে মশারি খাটাইয়া শয়ন করিবে। একান্তই যদি মশারি ব্যতীত শুইতে হয়, তবে দেহের সমস্ত খোলা জায়গায় ও বিছানায় তার্পিণ তেল বা কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপট্যাস ঢালিয়া দিবে।

(৫) অন্ধকার না হইলে এনোফিলিস মশা বাহির হয় না। সুতরাং অন্ধকার হইতে না হইতেই ঘরের দরজা জানালা ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখ। তবে আর মশা ঢুকিতে পারিবে না।

(৬) ডি.ডি.টি., গ্যামাক্সিন কিংবা কেরোসিন লোশন ঘরে স্প্রে করিয়া দিলেও মশা ধ্বংস হইবে। ঘরে নিমপাতা কিংবা ধূপ পোড়াইলেও মশা দূর হয়।

ছারপোকা (Bedbugs)

পোকামাকড়ের মধ্যে ছারপোকা বোধ হয় সবচেয়ে বিরক্তিকর এবং ঘৃণ্য জীব। শুধু মানুষের রক্ত পান করিয়াই ছারপোকা বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের মাথায় দুইটি শুঁড় আছে। মাথার নীচের দিকের একটি অঙ্গের সাহায্যে ছারপোকা রক্তপান করে। প্রতি পাঁচ দিন অন্তর ইহাদের একবার আহার দরকার। তবে খাদ্য না পাইলেও ইহারা একাদিক্রমে কয়েকমাস মরার মত পড়িয়া থাকিতে পারে। বাড়িতে একবার ছারপোকা সৃষ্টি হইলে দূর করা বড় কঠিন, কারণ ইহারা এত ক্ষুদ্র জীব যে সহজেই

ছারপোকা

আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। ছারপোকা ঘরের ফাটলে, মেঝেতে, খাট, বিছানা ও আসবাবপত্রে ডিম পাড়ে এবং ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয় খুব দ্রুত। ছারপোকার ডানা না থাকিলেও বাক্স, বিছানা ও কাপড় চোপড়ের মধ্যে এক বাড়ি হইতে সহজেই অন্য বাড়িতে যাইতে পারে। ছারপোকা কালাজ্বর ও প্লেগ ছড়ায় বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

ছারপোকা উচ্ছেদ করিতে চাহিলে

(১) বিছানাপত্র ও আসবাব সপ্তাহে অন্তত একবার রৌদ্রে দিবে।

(২) যে সমস্ত সম্ভাব্যস্থানে ছারপোকা জন্মিতে পারে সেই সব স্থানে গ্যামাক্সিন ও ডি.ডি.টি. ছড়াইবে এবং নারিকেল তেল, কেরোসিন তেল বা কেরোসিন তেলের লোশন স্প্রে করিবে।

(৩) ফুটন্ত জলে ছারপোকা বাঁচিতে পারে না। যে সমস্ত খাট, বিছানা ও আসবাবপত্রে ছারপোকা আছে সেগুলি গরম জলে বহুক্ষণ ধরিয়া ফুটাইয়া লও। যে সকল দ্রব্য ফুটানো সম্ভব নয় তাহাতে গরম জল ঢালিয়া দাও।

(৪) বাড়ি প্রতি বৎসর চুনকাম করাইবে।

উকুন (Lice)

উকুন একপ্রকার ডানাবিহীন ক্ষুদ্র পতঙ্গ। ইহারা মানুষের রক্ত পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সাধারণত তিন রকমের উকুন আছে—(১) মাথার উকুন (head lice), (২) দেহের উকুন (body lice) ও কাঁকড়া উকুন (crab lice)। মাথার ও দেহের উকুনের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

উকুন মাথার চুলে ডিম পাড়ে। ঐ ডিম ছয় সাত দিনের মধ্যে ফুটিয়া বাহির হয় এবং তারপরেই রক্ত খাইতে শুরু করে। দশ দিনের মধ্যে উকুন বেশ বড় হইয়া উঠে। সব রকমের উকুনেরই তিন জোড়া করিয়া পা আছে এবং পায়ের প্রান্তে থাবা থাকে।

কাঁকড়া উকুন অন্য দুই জাতীয় উকুন হইতে সহজেই পৃথক্ করা যায়। ইহাদের দেহটি প্রায় চতুষ্কোণ, দেহের তুলনায় পা-গুলি বড়। মাথার চুল ব্যতীত শরীরের অন্যান্য লোমশ স্থানগুলি ইহারা আশ্রয় করিয়া থাকে। তিন হইতে বার দিনের মধ্যে উকুন ৩০০ ডিম পাড়িতে পারে। ডিম ফুটিবার পর ইহারা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সাধারণত তিন বার খোলস বদলায়।

সাধারণত উকুনের সান্নিধ্যে না আসিলে উকুন জন্মায় না। তবে একবার নোংরা দেহে আশ্রয় পাইলে ইহারা দ্রুত বাড়িয়া ওঠে। শিশুরা সাধারণত স্কুল হইতে জামা কাপড়ে করিয়া উকুন নিয়া আসে। যে ব্যক্তির শরীরে উকুন আছে তাহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ও চিরুনি ব্যবহার করিলে কিংবা তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিলে এমনকি পাশাপাশি বসিলেও উকুন আসিতে পারে। কখনও কখনও প্রচণ্ড হাওয়ায় উড়িয়া এক জনের দেহ হইতে অপরের দেহে সহজেই উকুন যাইতে পারে। কুকুরও কখনও কখনও এক ব্যক্তির দেহ হইতে অপর ব্যক্তির দেহে উকুন ছড়ায়।

মশা ঠিক যেভাবে ম্যালেরিয়া ছড়ায় উকুনও সেই ভাবে টাইফাস জ্বর, ট্রেঞ্চ জ্বর ও পৌনঃপুনিক জ্বর (Relapsing fever) সংক্রামিত করে। টাইফাস রোগীর রক্ত পান করিবার সময় ঐ রোগের জীবাণু উকুনের পেটের ভিতর চলিয়া যায়। সেখানে অনুকূল আশ্রয় পাইয়া রোগ জীবাণুগুলি বাড়িতে থাকে। তারপর কোন সুস্থ ব্যক্তির রক্ত পান করিবার সময় উকুন কতকগুলি জীবাণু তাহার রক্তে ঢালিয়া দেয়। উকুন এইভাবে এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির দেহে টাইফাস রোগ সংক্রামিত করে। তবে টাইফাস রোগীর রক্ত পান করিবার পর অন্তত সাত দিন অতিক্রম না করা পর্যন্ত উকুনের রোগ সংক্রমণের ক্ষমতা জন্মায় না।

উকুন প্রতিরোধের উপায়—

(১) অন্তর্বাস ও বিছানাপত্র নিয়মিতভাবে গরম জলে ফুটাইয়া কাচিবে।

(২) যাহাদের শরীরে উকুন আছে তাহাদের সঙ্গ সর্বদা এড়াইয়া চলিবে। এইরূপ ব্যক্তির জামা, কাপড়, চিরুনি ইত্যাদি ব্যবহার করিবে না, এমনকি তাহাদের পাশেও বসিবে না।

(৩) উকুন আছে এরূপ লোকের সংস্পর্শে যদি আসিতেই হয় তবে সর্বদা অন্তর্বাসের সঙ্গে উকুনমারা ঔষধ ব্যবহার করিবে। অবশ্য লক্ষ্য রাখিবে এইরূপ ঔষধ ব্যবহার করিতে গিয়া শরীরের যেন ক্ষতি না হইয়া বসে।

উকুন মারিবার উপায়—

(১) এই সকল সাবধানতা সত্ত্বেও যদি উকুন সৃষ্টি হয় তবে সম্ভব হইলে মাথার চুল নেড়া করিয়া ফেলিবে নতুবা খুব ছোট করিয়া ছাঁটিয়া ফেলিবে। লম্বা চুল হইলে ভিনিগার ও কেরোসিন তেলের লোশন তৈয়ারী করিয়া মাথায়

মাথাইবে। তারপর ভাল করিয়া মাথা ঘষিয়া ফেলিবে। চুলে ডি.ডি.টি. কিংবা নেপথালিনের গুঁড়া মাথাইলেও উকুন ধ্বংস হয়।

(২) গরম জলে স্নান করিবে এবং সমস্ত জামা কাপড় নির্বীজিত করিয়া লইবে।

(৩) বিছানাপত্র গরম জলে ফুটাইয়া ফেলিয়া উহাতে নেপথালিন ছড়াইয়া দিবে।

(৪) জামা কাপড় ও বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড়ে গরম ইস্ত্রি চালাইবে।

উপমক্ষিকা (Fleas)

উপমক্ষিকা এক জাতীয় ক্ষুদ্র মাছি। অন্যান্য পতঙ্গের সঙ্গে উপমক্ষিকার পার্থক্য এই যে ইহাদের ডানা নাই। ইহারা নানাজাতের। মানুষ ব্যতীত ইহারা ইঁদুর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি পশুদেরও দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে এবং ইহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য এই যে মানুষের রক্ত না পাইলে ইহারা অন্য জন্তুর রক্ত খায়। মানুষ-উপমক্ষিকা (human flea) মানুষের দেহে রোগ ছড়ায়। কুকুর-উপমক্ষিকা (dog flea) সমস্ত গৃহপালিত পশুর মধ্যে রোগজীবাণু ছড়ায়। ইঁদুর-উপমক্ষিকা (rat flea) সাধারণত কাঠবিড়ালী ও ইঁদুরের গায় বসে। তবে ইহারা প্রধানত ইঁদুরের রক্ত পান করিয়াই জীবন ধারণ করে বলিয়া ইঁদুর-উপমক্ষিকা নামে পরিচিত। ইঁদুর-উপমক্ষিকা প্লেগ ছড়াইবার মূল কারণ। দেশে প্লেগ রোগের সূচনা প্রথমে ইঁদুরের মধ্যে দেখা দেয়। প্লেগ-রোগাক্রান্ত ইঁদুর মরিয়া গেলে উহার দেহ শীতল হইয়া যায় এবং ইঁদুর-উপমক্ষিকা আর উহার রক্ত পান করিতে চাহে না। তখন উপমক্ষিকা ঐ মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া মাটিতে ও দেয়ালে বসে এবং সুযোগ পাইলেই মানবদেহ দংশন করে। এই ভাবে প্লেগ ছড়াইতে থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে উপমক্ষিকা ধ্বংস করিতে পারিলে ইঁদুরদের যদি প্লেগ রোগাক্রান্ত ইঁদুরের সঙ্গে রাখা হয় তথাপি সুস্থ ইঁদুরের প্লেগ হয় না।
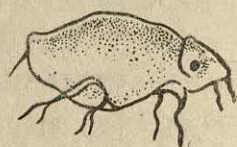
উপমক্ষিকা

উপমক্ষিকার জন্মবৃত্তান্ত—সব রকমের উপমক্ষিকা ডিম হইতে শূককীট ও মূককীট অবস্থা পার হইয়া পূর্ণমক্ষিকায় পরিণত হয়। সাধারণত ময়লা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ও ঘরের ফাটলে উপমক্ষিকা ডিম পাড়িয়া থাকে। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন গৃহেই ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত বাড়িতে

কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি উপমক্ষিকা-বাহক প্রাণী থাকিলে কিংবা নিকটে কোন আস্তাবল থাকিলে উপমক্ষিকার সৃষ্টি হয়।

উপমক্ষিকা প্রতিরোধের উপায়—বাড়িতে বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি উপমক্ষিকা-বাহক প্রাণী পুষিলে উহাদের সাবান ও কার্বলিক অ্যাসিড দিয়া স্নান করাইবে। গৃহে কোথাও জঞ্জাল জমিলে তৎক্ষণাৎ পোড়াইয়া ফেলিবে এবং কোন ফাটল দেখিলে উহা সঙ্গে সঙ্গে ভরাট করিবে। কাঠ কিংবা টালির বাড়ি হইলে কেরোসিন তেলের লোশন দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে। মাটির বাড়ি হইলে মেঝেতে বেশ কিছুটা লবণ ছড়াইয়া দিবে। তারপর চুনমিশ্রিত জল দিয়া মেঝে ভিজাইয়া দিবে। মুর্গীর শরীরে ইদুর-মাছির উপদ্রব হইলে মুর্গীর গায় প্রথমে লবণ মাখিয়া দিবে। তারপর চুনমিশ্রিত জল দিয়া স্নান করাইবে। কখনও কখনও বাড়ির লনেও উপমক্ষিকা ডিম পাড়িয়া থাকে। তখন লনের ঘাস খুব ছোট করিয়া ছাঁটিয়া দিবে। সূর্যালোক পড়িয়া ঐসব ডিম আপনিই মরিয়া যাইবে। বিছানায় উপমক্ষিকার উপদ্রব হইলে বিছানা রৌদ্রে দিবে। জামাকাপড়ে এবং বিছানায় নেপথালিন ছড়াইয়া ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত ঘর বন্ধ করিয়া রাখিবে। ডি.ডি.টি. ও গ্যামাক্সিন পাউডারও কার্যকরী।

* **গৃহমক্ষিকা বা মাছি** (House fly)—মাছি একপ্রকার ডানাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পতঙ্গ। কোন কোন জাতির মাছি মশার মতই মানুষের রক্ত পান করে। তবে অধিকাংশ মাছিই দংশন করে না। মানুষ ও পশুপাখীর মলমূত্র দেখিলে মাছি উহার উপর বসিয়া পড়ে। তারপর হাত পা ও বুকে করিয়া ঐসব রোগজীবাণু বহন করিয়া আমাদের খাদ্যের উপর বসে। মাছির আর একটি অভ্যাস খাদ্যের উপর বসিয়া বমন করা ও মলমূত্র ত্যাগ করা। স্বভাবতই দূষিত স্থানে বসে বলিয়া মাছির বিষ্ঠা ও বমন রোগজীবাণুতে পূর্ণ থাকে। টাইফয়েড, যক্ষা, কলেরা ও আমাশয় রোগ ছড়ায় মাছি। এতদ্ব্যতীত ক্ষত-স্থানে বসিয়া ডিম পাড়িয়া ক্ষত বিষাক্ত করিয়া তোলে এবং কখনও কখনও 'চোখ ওঠা' রোগেরও সৃষ্টি করে।

মাছির আকৃতি ও জন্মবৃত্তান্ত—আমাদের দেশের মাছিকে গৃহমক্ষিকা বলা হয়। দৈর্ঘ্যেও ইহারা সাধারণত এক ইঞ্চির এক-চতুর্থাংশ, গায়ের রং ইদুরের মত ধূসর এবং বক্ষঃস্থলে চারিটি কালো দাগ কাটা আছে।

* সিলেবাস বহির্ভূত

মাছি কখনও শুষ্ক স্থানে বসিয়া ডিম পাড়ে না। যেখানে কোন আর্দ্র ও মলাদিপূর্ণ আবর্জনা দেখে, মাছি সেখানে ডিম পাড়িয়া রাখে। বিশেষত ঘোড়ার মল মাছি জন্মাইবার পক্ষে আদর্শ স্থান। মানুষের মলমূত্রের উপরেও মাছি ডিম পাড়ে এবং এই মাছি সব মাছির চেয়ে ভয়ঙ্কর—কারণ মানুষের মলমূত্রের সঙ্গে যে সব রোগের জীবাণু থাকে মাছি সেগুলি বহন করিয়া আনিয়া সুস্থ দেহে সংক্রামিত করে। সমস্ত পেটের পীড়ার সংক্রমণ ঘটে মাছির সাহায্যে।

একটি মাছি একবারে ১২০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। চারটি স্তরে মাছির জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

(১) **ডিম্বাবস্থা**—মাছির ডিমগুলি দেখিতে চকচকে সাদা। দৈর্ঘ্যে এগুলি এক ইঞ্চির $\frac{১}{২৫}$ অংশ। ডিমগুলি সাধারণত উপর্যুপরি সাজান থাকে। মাছি সমস্ত জীবনে প্রায় পাঁচ ছয় বার ডিম পাড়িতে পারে।

(২) **শূককীট** (Larvae)—৮ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিমগুলি ছোট ছোট সাদা শূককীটে পরিণত হয়। শূককীটগুলি দিনের সূর্যালোক সহিতে পারে না। তাই দিনের বেলা উহারা গা ঢাকা দিয়া থাকে এবং রাত্রে বাহির হয়। শূককীটগুলি আবার শুষ্ক স্থান ব্যতীত মূককীটে পরিণত হইতে পারে না। তাই আর্দ্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া এইবার উহারা শুষ্কস্থানে আসে।

(৩) **মূককীট** (Pupa)—পাঁচ সাত দিনের মধ্যে শূককীটগুলি মূককীটে পরিণত হয়। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকিলে অবশ্য মূককীট অবস্থায় তিন চার সপ্তাহও থাকিতে পারে। প্রথমে ইহাদের বর্ণ হলুদ থাকে। তারপর যথাক্রমে লাল, বাদামী ও সর্বশেষে কাল বর্ণ ধারণ করে।

(৪) **পূর্ণ গৃহমক্ষিকা**—সাধারণত চার পাচ দিন পরে মূককীটগুলির খোলস ফাটিয়া যায় এবং তারপর ডানাযুক্ত ক্ষুদ্র মাছি বাহির হইয়া আসে। মাছিরা এই প্রথম অবস্থায় উড়িতে পারে না। ধীরে ধীরে উহাদের ডানা বড় হয়, পা শক্ত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মাছিতে পরিণত হয়।

মাছি উচ্ছেদের উপায়—(১) মাছি জন্মাইবার পর মাছির বংশ ধ্বংস করার চেয়ে মাছি যাহাতে না জন্মায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সহজ কাজ। ঘোড়ার পুরীষ ডিম পাড়িবার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত স্থান। সমস্ত পুরীষ পোড়াইয়া

বা মাটি চাপা দিয়া ফেলিবে এবং বাড়িতে কোথাও আবর্জনা জমিতে দিবে না।

(২) জনসাধারণকে খাদ্যদ্রব্য অনাবৃত রাখার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে। খাদ পায়খানা ব্যবহারের পর মাটি চাপা দিবে। খাটা পায়খানায় সর্বদা মাছি-নিবারক আসন (fly-proof seat) দিবে। গোমহিষাদির মলমূত্রের চেয়েও মানুষের মলমূত্র অধিক বিপজ্জনক, কারণ মানুষের মলমূত্রে তুলনায় অনেক বেশী রোগজীবাণু বর্তমান।

ধাড়ী মাছির উচ্ছেদ—সব রকম সাবধানতা সত্ত্বেও মাছি জন্মিতে পারে। ফর্মালিন, ডিডিটি ও পাইরেথ্রাম (pyrethrum) পাউডার ছড়াইয়া দিলে মাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত ফ্লাই-পেপার ও ফ্লাই-ট্র্যাপের সাহায্যে মাছি মারিয়া ফেলিবে। ফ্লাই-ট্র্যাপে মাছি ধরিয়া ধোঁয়া দিলে মাছি মরিয়া যাইবে। ঘোড়ার পুরীষে সোডিয়াম আর্সেনাইট মিশাইয়া রাখিলেও সেখানে মাছি জন্মিতে পারে না।

রেড়ীর তেল পাঁচ ভাগ ও রজন (Resin) ৮ ভাগ একত্রে ফুটাইয়া আঠা তৈয়ারী করিয়া কাগজে ছড়াইয়া রাখিলে মাছির পা আটকাইয়া যায়। তারপর ঐ কাগজগুলি জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

বালু-মক্ষিকা (Sand fly)—বালু-মক্ষিকা নামে পরিচিত একপ্রকার ক্ষুদ্র জীবের দংশনে জ্বর হইতে পারে। এই জ্বর চার পাঁচ দিন পর্যন্ত থাকে। ভারতবর্ষের বহু স্থানে বালু-মক্ষিকা দেখা যায়। কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পান করিবার সময় বালু-মক্ষিকা ঐ রোগের জীবাণু খাইয়া ফেলে। তারপর কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিবার সময় উহার মুখের লালার সঙ্গে রোগজীবাণু সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে। মশা যেরূপভাবে ম্যালেরিয়া ছড়ায়, বালু-মক্ষিকাও অনুরূপভাবে বালু-মক্ষিকা-জ্বর ছড়াইয়া থাকে।

ঘরের ভিতরে কোন নোংরা জায়গা পাইলে বালু-মক্ষিকা সেখানে ডিম পাড়িয়া রাখে। বালু-মক্ষিকার হাত এড়াইতে চাহিলে বাড়িতে কোন আবর্জনা জমিতে দিবে না, ঘরের সমস্ত ফাটল ভরাট করিয়া ফেলিবে এবং বাড়ির আশেপাশে জলাভূমি থাকিলে সেখানে নিয়মিতভাবে কেরোসিন লোশন ও ডিডিটি স্প্রে করিবে। বালু-মক্ষিকার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী হইলে রাত্রে খুবই সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট মশারি খাটাইয়া শুইবে। বালু-মক্ষিকা আকারে এত ক্ষুদ্র যে সাধারণ মশারির ছিদ্র দিয়া উহা অনায়াসে ভিতরে চলিয়া যাইতে পারে।

ইঁদুর (Rat)

ইঁদুরের দংশন ভয়াবহ বলিয়াই যে কেবল ইঁদুর হইতে সতর্ক থাকিতে হইবে তাহা নয়, ইহার সম্বন্ধে সবচেয়ে ভয়ের কথা এই যে ইঁদুর বাড়িতে প্লেগ রোগের বাহক উপমক্ষিকাকে আকর্ষণ করিয়া আনে। খাদ্যের লোভে ইঁদুর বাড়িতে আসিয়া উৎপাত শুরু করে এবং সাবান, মোমবাতি ইত্যাদি কাটিয়া নষ্ট করে।

বাড়ি পরিষ্কার ঝকঝকে রাখিলে এবং সমস্ত খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ইঁদুরের নাগালের বাহিরে রাখিতে পারিলে ইঁদুরের উৎপাত কমিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত বাড়িতে কুকুর ও বিড়াল পুষিলে ইঁদুর পালাইয়া যাইবে, কারণ ইহারা প্রধানত বিড়ালকে অত্যন্ত ভয় করে। বাজারে ইঁদুর ধরা ফাঁদও কিনিতে পাওয়া যায়। তবে ইঁদুর অত্যন্ত চালাক জীব। ইহারা সহজেই ফাঁদ এড়াইয়া চলিতে জানে। আটা বা ময়দার সঙ্গে ইঁদুর মারা বিষ মিশ্রিত করিয়া ড্যালা পাকাইয়া বাড়ির চতুর্দিকে ছড়াইয়া রাখিলে ইঁদুর ঐ বিষমিশ্রিত খাদ্য খাইয়া মরিয়া যাইবে। তবে গৃহে কোন ছোট শিশু থাকিলে ইঁদুর মারিবার জন্য এইরূপ মারাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন না করাই শ্রেয়।

আরশুলা (Cockroaches)

নানা কারণে আরশুলা সম্বন্ধে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত পতঙ্গ হিসাবে ইহারা সর্বভুক্। আমাদের খাদ্যবস্তু হইতে শুরু করিয়া ইহারা আমাদের বই, কাপড়চোপড় এবং চামড়ার জিনিসপত্র খায় এবং কাটিয়া কুচিকুচি করে। উপরন্তু ইহারা নানারকম রোগের বাহকও বটে। এই কারণে আরশুলা আরও বেশী বিপজ্জনক।

আরশুলা নর্দমার নোংরা এবং আবর্জনার স্তূপ ঘাটিয়া খায় এবং এই ভাবে সমস্ত দেহে নানারূপ রোগের জীবাণু বহন করিয়া বেড়ায়। তারপর ঐ জীবাণু লইয়া আবার আমাদের খাদ্যদ্রব্যে আসিয়া মুখ দেয়। রোগের সক্রিয় বাহক না হইলেও এইরূপে নিষ্ক্রিয়ভাবে ইহারা রোগ সংক্রমণে সহায়তা করে। এমিবাজনিত আমাশয়, পোলিওমাইলিটিস (Poliomyelitis) এবং ডিপথিরিয়া রোগ আরশুলার সাহায্যে এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত স্কারলেট জ্বর (Scarlet fever), হাম এবং

যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিষ্ঠীবন হইতে ঐসব রোগের জীবাণু সংগ্রহ করিয়া আরশুলা খাদ্যদ্রব্যে বসে। তারপর ঐ খাদ্য খাইয়া সুস্থ ব্যক্তিরও উল্লিখিত রোগ হইতে পারে।

আরশুলা প্রতিরোধের উপায়—আরশুলা নিবারণের একমাত্র উপায় হইল গৃহের পরিচ্ছন্নতা। ঘরের কোথাও একটুও খাবারের কুচি ফেলিয়া রাখিবে না। এতদ্ব্যতীত ঘরের কোণে, বইএর আলমারি কিংবা তাকে যেসব জায়গায় আরশুলার উপদ্রব হইতে পারে সেই সকল স্থানে বোরাক্স, পাইরেথ্রাম অথবা গন্ধক ছড়াইয়া রাখিবে।

কোন একটি ঘরে যদি আরশুলার উপদ্রব বাড়িয়া যায়, তবে সেই ঘরের দরজা খুব ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া পাইরেথ্রাম পুড়াইবে। পাইরেথ্রামের গন্ধে আরশুলা মৃতের মত পড়িয়া থাকে। এই সুযোগে উহাদের তুলিয়া নিয়া মারিয়া ফেলিবে।

সিলভার ফিস (Silver fish)

এই পতঙ্গের গায়ের বর্ণ রূপালী, আকৃতি ঠিক মাছের ন্যায় এবং দেহ অত্যন্ত মসৃণ। এই কারণে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে 'সিলভার ফিস' বা রূপালী মাছ। মাছি কিংবা ঝিঁঝি পোকা প্রভৃতি পতঙ্গের মত ইহারা উড়িতে বা লাফাইতে পারে না, তবে আঁকিয়া বাঁকিয়া খুব দ্রুত পলাইয়া যাইতে পারে। বস্ত্র, বিশেষ করিয়া কৃত্রিম রেশমী বস্ত্র ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। বস্তুত যে জিনিসে মাড়, বার্নিশ অথবা আঠা থাকে তাহাই ইহারা খাইয়া থাকে। বাঁধানো বই, ছবির ফ্রেম এবং মাড় দেওয়া কাপড়-চোপড়ের মধ্যে সিলভার ফিস দেখা যায়।
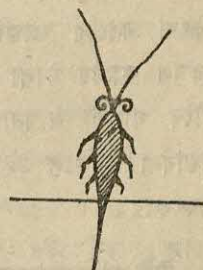
সিলভার ফিস

আলমারি কিংবা ঘরের অন্য কোথাও ইহাদের খাদ্য যদি কিছুদিন ধরিয়া অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তবে সিলভার ফিসের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এইজন্য মাঝে মাঝে এই সকল স্থানগুলি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে এবং বস্ত্রাদি রৌদ্রে দিবে। টাটকা পাইরেথ্রাম পাউডার ছিটাইয়া দিলে ইহাদের উপদ্রব কমে। এতদ্ব্যতীত ঘরে পাইরেথ্রাম কিংবা গন্ধক পুড়াইলেও সিলভার ফিস ধ্বংস হয়।

উই (White ants)

উই পিপীলিকা জাতীয় পতঙ্গ নয়। তবে পিপীলিকার মতই ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে। মাটি, কাঠ কিংবা গাছের উপর উই-ঢিবি সর্বদাই আমাদের চোখে পড়ে। উই-এর খাদ্য হইল কাঠ। ইহারা তাই কাঠ খাইয়া ধ্বংস করে। ডিম্বাবস্থা হইতে বাহির হইবার পর উই দুইটি স্তর অতিক্রম করে—প্রথমটি বাচ্চা অবস্থা এবং দ্বিতীয়টি পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় তিন শ্রেণীর উই দেখা যায়—(১) ডানাবিহীন নমনীয় দেহবিশিষ্ট শ্রমিক শ্রেণী। ইহারা মানুষের আসবাবপত্রের ক্ষতি করে। (২) সৈনিক শ্রেণী এবং (৩) ডানাবিশিষ্ট দল। ইহারা বৎসরের কোন নির্দিষ্ট সময় নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া আসে। শ্রমিক শ্রেণী আলো সহিতে পারে না এবং আর্দ্রতা ব্যতীত ঢিবি তৈয়ারী করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। এইজন্য ঢিবি তৈয়ারী করিবার জন্য ইহাদের ভূমি প্রয়োজন এবং কোন রকমে ভূমির সঙ্গে ঢিবির যোগ নষ্ট করিয়া দিতে পারিলে ঢিবি শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ঢিবি তৈয়ারী করিতে কোনরকম বাধা না পাইলে উই তিন চার তলা বাড়ির ছাত অথবা উচ্চ বৃক্ষের ডগা পর্যন্ত বাহিয়া উঠিতে পারে। উই গাছ নষ্ট করিতে এমন পটু যে ইহারা বড় বড় গাছের গুড়ি কিংবা কাঠের স্তম্ভের অভ্যন্তরভাগ খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে, বাহিরে কেবল কাঠের ফাঁপা খোলসটি দাঁড়াইয়া থাকে। তারপর একদিন ধীরে ধীরে গাছটি আপনার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কাঠ নাগাল পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে উই পাথর কিংবা কংক্রিটের উপরে ঢিবি নির্মাণ করিতে শুরু করে।

উই প্রতিরোধের উপায়—সমস্ত বাড়ি ঘুরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ উই কোথাও বাসা করিয়াছে কিনা। কোথাও কোন ক্ষুদ্র ঢিবি দেখিলে তৎক্ষণাৎ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। বাড়ির ফাটলে কেরোসিন ঢালিয়া দিবে এবং কোথাও ফাটল দেখিলে উহা ভরাট করিয়া ফেলিবে।

কাঠের বাড়ি তৈয়ারী করিতে হইলে নীচে সিমেণ্ট কিংবা পাথরের গাঁথুনি দিয়া লইবে। গাছে উই দেখিতে পাইলে কেরোসিন তেলের লোশন স্প্রে করিয়া দিবে। বাজারে পোকামাকড় ধ্বংস করিবার যে সব ঔষধ পাওয়া যায় তাহাও মাঝে মাঝে স্প্রে করিবে।

মথ (Moth)

মথ একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গ। ডিম্বাবস্থায় ইহারা আমাদের পশম বস্ত্র কাটিয়া কুচি কুচি করে। প্রাপ্তবয়স্ক মথ অতি নিরীহ প্রাণী এবং মানুষের কোন ক্ষতি করে না। তবে ইহারা পশম বস্ত্রের উপর ডিম পাড়িয়া রাখে এবং এই ডিমগুলি একটু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে পশম বস্ত্র কাটিতে শুরু করে। মথ নানা শ্রেণীর এবং উহাদের ডিমগুলির প্রকৃতিও তাই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এক জাতীয় মথের ডিম আপনার চারিপাশে গুটিকার মত ক্ষুদ্র আবরণ (case) তৈয়ারী করে। তারপর ঐ অবস্থায় দেওয়ালের ফাটল খুঁজিতে থাকে এবং ফাটলের মধ্যে আবরণ কাটিয়া বাহির হইয়া আসে। তারপর এক শ্রেণীর মথের ডিম হাঁটিয়া বেড়ায় না। মথ যে আলমারি কিংবা বাক্সে ডিম পাড়িয়া রাখে, খোলস কাটিয়া পূর্ণাঙ্গ মথরূপে বাহির হইয়া না আসা পর্যন্ত ডিমগুলি ঐ স্থানেই থাকিয়া যায়। ইহাদের চতুর্দিকে রেশমী আবরণ থাকে।

মথের হাত হইতে পশম বস্ত্র রক্ষা করিতে হইলে বস্ত্রগুলি মাঝে মাঝে নাড়িয়া চাড়িয়া রৌদ্রে দিবে, কারণ বেশীদিন অব্যবহৃত অবস্থায় একভাবে থাকিলে মথ আসিয়া বাক্সের ভিতর ডিম পাড়িয়া রাখিয়া যায়। সূর্যের প্রখর কিরণে ডিমগুলি মরিয়া যায়। যাহাদের বস্ত্রাদি রৌদ্রে দিবার সুবিধা নাই তাহারা পুরাতন খবরের কাগজে খুব ভাল করিয়া মুড়িয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিবে। বাক্সটিতে যেন অবশ্য বায়ু নির্গমনের পথ বন্ধ থাকে। অনেকের একটি ধারণা আছে বাক্সে নেপথালিন কিংবা কর্পূর দিয়া রাখিলেই মথের উপদ্রব এড়ান যায়। মথ নেপথালিন ও কর্পূরের গন্ধ পছন্দ করে না সত্য কিন্তু অন্য কোন উপযুক্ত স্থান না পাইলে নেপথালিনের গন্ধযুক্ত কাপড়ের মধ্যেই ডিম পাড়িয়া রাখে। একবার ডিম পাড়িলে বস্ত্রাদি ধ্বংস হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কাপড়চোপড় রাখিবার ভাল বাক্স না থাকিলে কেরোসিন তেলের লোশন অথবা অপর কোন জীবাণুনাশক ঔষধ স্প্রে করিবে।

জল পরিশোধন (Purification of drinking water)

জলের প্রয়োজনীয়তা—

জীবনধারণের পক্ষে বায়ুর ন্যায় জলও আমাদের জীবনস্বরূপ। আমাদের খাদ্যের শতকরা পঁচাশি ভাগই জল। আমাদের দেহের গঠনেও জল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের দেহের উপাদানের তিন ভাগের এক ভাগ জল। রক্তের উপাদানে জল রহিয়াছে, অস্থিমজ্জার ভিতরেও দেখি জল। দেহাভ্যন্তরস্থ এই জল প্রত্যহ ঘাম ও প্রস্রাবের আকারে বাহির হইয়া যাইতেছে। জলের এই ক্ষয় পূরণের জন্য আমরা জল পান করিয়া থাকি। তবে জল কেবল আমাদের দেহের জলীয় ভাগ পূরণেই সাহায্য করে না, জল আমাদের রক্তের তারল্যও রক্ষা করে; দেহাভ্যন্তরস্থ দূষিত পদার্থ অপসারণে সাহায্য করে। খাদ্য পরিপাকমূলক রসের সৃষ্টি করিয়া হজমে সাহায্য করে এবং দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের তৃষ্ণা-নিবারণ, স্নান, রন্ধন ও বস্ত্রাদি ধৌতকরণের জন্য ত জলের প্রয়োজন আছেই, উপরন্তু গোমহিষাদির পান ও স্নানের জন্যও জলের দরকার। বাগানের ফুল, ফল, তরিতরকারী জল ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। রাস্তাঘাট, নালা, নর্দমা, খাটাল ইত্যাদি পরিষ্কার করা, এক কথায় যাবতীয় ময়লা নিষ্কাশনের জন্য, অগ্নিদাহাদি দৈব-দুর্বিপাক নিবারণেন জন্য, বাণিজ্যের প্রসার ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য জলের প্রয়োজন। জীবন-ধারণের পক্ষে এমন অপরিহার্য বলিয়াই প্রকৃতি বোধ হয় পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ স্থানই জল দিয়া গড়িয়াছে।

মাথাপিছু জলের প্রয়োজনীয়তা—

পান, রন্ধন, স্নান, বাসনপত্র ও বস্ত্রাদি ধৌতকরণের জন্য দিনে খুব কম করিয়া অন্তত ৩০ গ্যালন জল দরকার। কলিকাতার অধিবাসীদের জন্য মাথাপিছু ৬০ গ্যালন জল নির্ধারিত আছে। একজন মানুষ দিনে কতটা জল ব্যবহার করিবে তাহা নির্ভর করে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভ্যাস ও আবহাওয়ার উপরে। যে ব্যক্তি নদী কিংবা পুষ্করিণীর জলে অবগাহন করিয়া অভ্যস্ত তাহাকে কলিকাতার ভাড়াটে বাড়ির চৌবাচ্চার জলে স্নান করিতে দিলে সে সবখানি জল নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে। ঋতুভেদেও মানুষ কম বেশী জল খরচ করে। গ্রীষ্মকালে অনেকেই দিনে দুই তিন বার করিয়া স্নান করে ও কাপড় কাচে, শীতের সময় সেই অনুপাতে জল কম খরচ হয়।

জলের অপচয় নিবারণ—একেইত জল মানুষের এত উপকারী, উপরন্তু আমাদের দেশে পানের উপযুক্ত পরিস্রুত জলের অভাবও রহিয়াছে প্রচুর। সুতরাং পরিস্রুত পানীয় জলের যাহাতে একটুও অপচয় না ঘটে সেইদিকে নজর রাখা দরকার। জলের অপচয় ঘটে নিম্নলিখিত কারণে—

(১) জল সরবরাহের পাইপে কোন ছিদ্র থাকিলে;

(২) প্রত্যহ অকারণে কিছুটা জল জমা করিয়া রাখিয়া পরদিন সেই জল ফেলিয়া দিলে;

(৩) অকারণে কলের মুখ খুলিয়া রাখিলে।

জলের উৎস—

জলের প্রধান উৎস হইল সমুদ্র। সূর্যকিরণে সমুদ্রের জল প্রতি বর্গমাইলে প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০০ গ্যালন হিসাবে বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়। এই বাষ্পই ক্রমে মেঘে পরিণত হয় এবং বৃষ্টি, বরফ ও শিশিরবিন্দুর আকারে পৃথিবীতে পুনরায় নামিয়া আসে। এই বৃষ্টির জলের কিছুটা সমুদ্র, নদী, নালা, পুষ্করিণীতে গিয়া পড়ে এবং কিছুটা আবার ভূগর্ভে গিয়া প্রবেশ করে। এই হিসাবে বিচার করিলে জলের উৎস হইল তিনটি—(১) বৃষ্টির জল, (২) ভূভাগের উপরিস্থিত জল ও (৩) ভূগর্ভস্থ জল।

(১) **বৃষ্টির জল** (Rain water)—সমুদ্র হইতে জল যখন বাষ্পাকারে উপরে উঠিয়া যায় তখন জলের লবণাংশ ও ধাতব পদার্থ সমস্তই নীচে পড়িয়া থাকে। বৃষ্টির জল তাই চোলাই করা স্বচ্ছ জল। অবশ্য পৃথিবীর বুকে নামিবার সময় বৃষ্টির জলের সঙ্গে বায়ুস্থিত অ্যামোনিয়া, কার্বলিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড এবং ধূলিকণা আসিয়া মিশে। ইহার ফলে বৃষ্টির জল দূষিত হইয়া পড়ে। এইসব অ্যাসিড ও ধূলিকণাস্থিত জীবাণুর হাত এড়াইতে হইলে প্রথম পশলা বৃষ্টির জল ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু তারপর কোন পাত্রে বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিয়া উহা অনায়াসে পানীয় জলরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(২) **ভূভাগের উপরিস্থিত জল** (Surface water)—বৃষ্টির জল যখন পৃথিবীর বুকে আসিয়া পৌছায় তখন সেই জলের কিছুটা সমুদ্র, নদী, পুষ্করিণী ও দীঘি প্রভৃতি স্থানে ভূভাগের উপরেই জমা হয়। সমুদ্র ও নদীর জল পরিস্রুত করিয়া শহরে পানীয় জলরূপে সরবরাহ করা হয়। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা অবশ্য নদী ও পুষ্করিণীর জল পানাহার প্রভৃতি যাবতীয় গৃহকর্মের জন্য ব্যবহার করে।

(৩) **ভূগর্ভস্থ জল** (Ground water)—(ক) **প্রস্রবণ :** জলের অপর উৎস হইল ভূগর্ভস্থ জল। প্রস্রবণ ও কূপের জলই ভূগর্ভের সঞ্চিত জল। বৃষ্টির জলের অনেকটা অংশ ভূগর্ভের অভ্যন্তরে চলিয়া যায়। মৃত্তিকা, বালু, কঙ্কর প্রভৃতি প্রবেশ্য স্তর ভেদ করিয়া জল অবশেষে অপ্রবেশ্য স্তরে গিয়া পড়িলে অপ্রবেশ্য স্তর জলের গতি রোধ করিয়া দাঁড়ায়। ঐ জল তখন প্রবেশ্য স্তরে সঞ্চিত হয় এবং যেদিকে ঢালু পায় সেই দিকেই গড়াইতে থাকে। তারপর বাহির হইবার কোন ছিদ্র বা ফাটল পাইলে মাটির উপরে নির্গত হইয়া আসে। এইভাবে প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়। প্রস্রবণ আবার নানা রকমের হইতে পারে, যথা—উপরের স্তরের প্রস্রবণ (surface spring), গভীর স্তরের প্রস্রবণ (main spring), সবিরাম প্রস্রবণ (intermittent spring), ধাতব প্রস্রবণ (mineral spring) ও উষ্ণ প্রস্রবণ (thermal spring)। গভীর স্তরের প্রস্রবণের প্রবাহ কখনও বন্ধ হয় না এবং এইরূপ প্রস্রবণের জল পানীয় জলরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। উপরের স্তরের প্রস্রবণের প্রবাহ গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। মাটির ঠিক একেবারে নীচেই এইরূপ প্রস্রবণের উৎস বলিয়া নানারূপ আবর্জনা মিশিয়া সহজেই ইহার জল দূষিত হয়। তাই উপরের স্তরের প্রস্রবণের জল পানীয় জলরূপে ব্যবহার করা উচিত নয়। ধাতব প্রস্রবণে অবগাহন করিলে অনেক রোগ সারিয়া যায়।

(খ) **কূপ :**—গোল করিয়া মাটি খুঁড়িয়া কৃত্রিম উপায়ে কূপ খনন করা হয়। আমাদের দেশে বহু পল্লী অঞ্চলে কূপই হইল জল সরবরাহের প্রধান উৎস। কূপ নানা রকমের হইতে পারে।

(অ) **অগভীর কূপ**—মাটির নীচে প্রথম অশোষক স্তরের উপরেই জল সঞ্চিত থাকে। মাটি খনন করিয়া এই প্রথম অশোষক স্তর পর্যন্ত যে কূপের সৃষ্টি হয় তাহাই হইল অগভীর কূপ। অগভীর কূপের জল জীবাণু-শূন্য নয়।

(আ) **গভীর কূপ**—প্রথম অশোষক স্তর ছাড়াইয়া আরও গভীর করিয়া মাটি খুঁড়িলে গভীর কূপের সৃষ্টি হয়। গভীর কূপের জল কখনও শুকায় না এবং ইহার জল পানীয় জলরূপে ব্যবহার করা যায়।

(ই) **নর্টনের আবিসিনিয় নলকূপ**—সাময়িক জলাভাব মিটাইবার জন্য নর্টনের অগভীর আবিসিনিয় নলকূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইরূপ নলকূপ সাধারণত ২০ হইতে ২৫ ফুট গভীর হয়।

(ঈ) **আর্টেজীয় কূপ**—এই কূপ তুইটি অশোষক স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফ্রান্সের আর্টয়স (Artois) প্রদেশে এইরূপ কূপের ব্যবহার ছিল বলিয়া ইহার নাম আর্টেজীয় কূপ।

জলের শ্রেণীবিভাগ—

বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে বিচার করিলে জল তিন শ্রেণীর—

(১) পরিস্রুত (clean) জল,

(২) মলিন (polluted) জল এবং

(৩) দূষিত (contaminated) জল।

স্বাস্থ্যতত্ত্বে মলিন ও দূষিত জলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। জলে নানারূপ ধাতব পদার্থ মিশ্রিত হইলে উহার স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বদলাইয়া যাইতে পারে এবং জল মলিন হইতে পারে। জল মলিন হইলেই যে জীবাণুমিশ্রিত হইবে এমন কোন কথা নাই। মলিন জল তাই মানুষের ব্যবহারের উপযুক্তও হইতে পারে। দূষিত জল কিন্তু সর্বদাই জীবাণুমিশ্রিত সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। রোগ পীড়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে হইলে অবশ্য দূষিত জল ও মলিন জল উভয়ই বর্জন করিয়া চলা উচিত।

দূষিত জল—

জল দূষিত হইতে পারে নানা কারণে। যে সমস্ত পদার্থ জলের সঙ্গে মিশিয়া জল দূষিত করে তাহা কখনও কখনও জলের মধ্যে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া যায়। কতকগুলি পদার্থ আবার জলে ভাসমান থাকে। যে সমস্ত পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় সেগুলির মধ্যে কতকগুলি গ্যাস জাতীয় পদার্থ, কতক আবার কঠিন পদার্থ। জলের ভাসমান পদার্থগুলিও তুই প্রকারের—জৈব ও অজৈব।

দ্রবণীয় গ্যাসীয় পদার্থ—অম্লজান, অঙ্গারাম্লজান, সালফেট ও অ্যামোনিয়া জাতীয় গ্যাস অধিক পরিমাণে জলে দ্রবীভূত হইয়া জল দূষিত করে। সাধারণত জল উৎস হইতে সংরক্ষিত জলাধারে (reservoir) আসিবার সময় নানা প্রকার গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয়।

দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ—ক্লোরাইডস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফেটস, লোহা ও সীসা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ জলের সহিত দ্রবীভূত হইয়া জল দূষিত করে। সাধারণত যে পাইপের মধ্য দিয়া জল সরবরাহ হয় উহাতে সীসা মিশ্রিত থাকিলে সীসা জলে দ্রবীভূত হইয়া জল দূষিত করে।

অদ্রবণীয় অজৈব পদার্থ—লবণ, কর্দম প্রভৃতি অজৈব পদার্থ জলে মিশিয়াও জল দূষিত করিতে পারে। সাধারণত বায়ুবাহিত ছিদ্র-বিশিষ্ট (porus) ঘড়া কিংবা কলসীতে জল রাখিলে ঘড়া ও কলসীর গায়ের ধুলাবালি একটু একটু করিয়া চুয়াইয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

অদ্রবণীয় জৈব পদার্থ—মানুষ ও গো-মহিষাদির মলমূত্র, আবর্জনা প্রভৃতি জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে। এই কারণে পানীয় জলের কূপ ও পুষ্করিণীর আশেপাশে গোরস্থান, নালানর্দমা ইত্যাদি রাখিতে নাই।
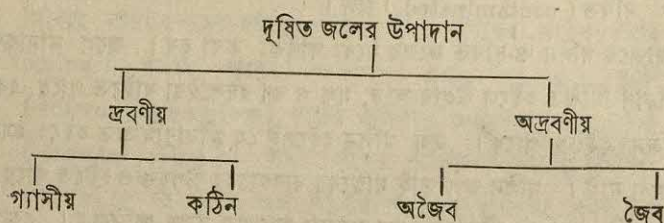
জলবাহিত ব্যাধি—

তরিতরকারি আমরা কাঁচা খাই না। রন্ধনের ফলে দুধ, মাছ ও তরকারির মধ্যে যে সব জীবাণু থাকে তাহা মরিয়া যায়। জলও যদি আমরা অনুরূপভাবে ফুটাইয়া পান করি তবে অনেক ব্যাধির আক্রমণ সহজেই এড়ান যায়। কাঁচা জলের মাধ্যমে নানা রোগ আসিয়া আমাদের দেহ আশ্রয় করে। তবে যাহারা বিশুদ্ধ জলের অভাবে বহুকাল ধরিয়া দূষিত জল পান করিয়া আসিতেছে তাহাদের মধ্যে একটি সহজ অনাক্রম্যতা বা রোগ-প্রতিরোধক শক্তি জন্মায়। কিন্তু সর্বদা বিশুদ্ধ জল পান করিয়াই যাহারা অভ্যস্ত, দূষিত জল পান করিলে সহজেই তাহারা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

(১) আমরা দেখিয়াছি জলে নানারূপ লবণ প্রভৃতি পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া জল দূষিত করে। জলে অধিক পরিমাণে সালফেট থাকিলে হজমের দোষ ও উদরাময় ঘটিতে পারে। আবার জিঙ্ক ও সীসার পরিমাণ বেশী থাকিলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও কলিকের ব্যথার সৃষ্টি হয়।

(২) কর্দম, বালি ও অভ্র প্রভৃতি পদার্থ জলে মিশিয়া উদারময় সৃষ্টি করে।

(৩) কলেরা, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি সমস্ত পেটের পীড়াই ছড়ায় জলের সাহায্যে। এতদ্ব্যতীত রাউণ্ড-ওয়ার্ম, হুক-ওয়ার্ম, থ্রেড-ওয়ার্ম, গিনি-

ওয়ার্মও জলবাহিত ব্যাধির অন্তর্গত। জলে আয়োডিন কম থাকিলে গলগণ্ড হয়। আবার, ক্লোরিন বেশী থাকিলে দাঁতের বর্ণ হলদে অথবা কালো হইতে পারে। জলে অল্প পরিমাণ লোহা থাকিলে দাঁতের রোগ (caries) হইতে পারে।

স্মরণ রাখিতে হইবে কতকগুলি জীবাণু আছে যেগুলি কেবল মানুষের দেহ আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠে এবং মানুষের মলমূত্রের সঙ্গে ঐ জীবাণু নির্গত হয়। এই সকল জীবাণু পশুপাখীর দেহে থাকে না কিংবা উহাদের কোন ক্ষতি সাধন করে না। সুতরাং মানুষ যাহাতে কূপ ও পুষ্করিণীর জল প্রভৃতি দূষিত না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। একেইত পল্লীগ্রামে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, স্নান করা ইত্যাদি নিত্য-কর্ম পুষ্করিণীতেই সমাধা হয়, উপরন্ত মলমূত্র ত্যাগ, শৌচাদি ক্রিয়া কিংবা অসুস্থ রোগীর কাঁথা কাপড় ধোয়ার স্থানও এই পুষ্করিণী। এই সমস্ত অভ্যাস পরিত্যাগ না করিলে জলবাহিত ব্যাধির প্রকোপ হইতে আমরা কোনদিনই নিস্তার পাইব না।

জল পরিশোধনের উপায় (Purification of water)

অপরিস্রুত জল পান করা কোন মতেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পানীয় জল যদি জীবাণুমুক্ত না হয় তবে উহা হইতে নানা রকম পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং পানীয় জল সর্বদাই বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত।

জল পরিস্রুত হইতে পারে দুইটি উপায়ে—(১) প্রাকৃতিক ও (২) কৃত্রিম। কৃত্রিম পদ্ধতি আবার তিন ভাগে বিভক্ত—ভৌতিক, রাসায়নিক ও ছাঁকন।

(১) প্রাকৃতিক পদ্ধতি

সংরক্ষণ (storage) ও **থিতান** (sedimentation) : প্রকৃতি জল বিশুদ্ধ করিতে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। নদীর জল সাধারণত প্রাকৃতিক উপায়েই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমত জলের মধ্যে যেসব আবর্জনা ও নর্দমার পচা জল নদীতে গিয়া পড়ে, স্রোতের মুখে উহারা এমনভাবে জলের মধ্যে মিশিয়া যায় যে রোগের জীবাণু তাহাতে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই মরিয়া যায়। দ্বিতীয়ত যেসব অজৈব পদার্থ জলের ভিতর দ্রবীভূত হইতে পারে না স্রোতের গতি মৃদু হইলে ঐসব পদার্থ ধীরে ধীরে জলের তলায় থিতাইয়া যায়। রোগের জীবাণুগুলি ঐ সঙ্গে থিতাইতে থাকে। তৃতীয়ত অতি বেগুনী আলোর (ultra-violet rays) সাহায্যে জীবাণু ধ্বংস করা যায়। তাছাড়া মাছও জীবাণুভুক্। জলে প্রচুর পরিমাণে মাছ থাকিলে জীবাণু খাইয়া

ফেলে। এইভাবে জল পরিশুদ্ধ হয়। অনেক শ্যাওলা (aquatic plant) জল বিশোধনের সাহায্য করে। প্রাকৃতিক উপায়ের মধ্যে সংরক্ষণ হইল জল বিশোধনের সবচেয়ে সহজ ও উৎকৃষ্ট পন্থা।

(২) **কৃত্রিম পদ্ধতি**

কৃত্রিম পদ্ধতিতে জল বিশোধনের অন্তর্গত অন্যতম পদ্ধতি হইল ভৌতিক পদ্ধতি (physical process)।

ভৌতিক পদ্ধতি—(ক) **স্ফুটন :** আগুনে পুড়িলে কোন প্রাণীই বাঁচিতে পারে না। জলকে যদি আগুনে বেশ টগবগ করিয়া ফুটাইয়া লও তবে জল-মধ্যস্থ সকল জীবাণুই মরিয়া যাইবে। জল ফুটাইবার একটি প্রধান অসুবিধা এই যে ইহাতে জলের ভিতরকার অঙ্গারাম্লজান গ্যাস আর থাকে না। তাই জল ফুটাইবার পর পাত্রের মুখ কিছুক্ষণ খোলা রাখিয়া দিলে বায়ুর অঙ্গারাম্লজান আসিয়া ফুটান জলে মিশ্রিত হয়। এইভাবে জল সহজে ঠাণ্ডা হইতে পারে এবং জলের স্বাভাবিক স্বাদও আবার ফিরিয়া আসে।

(খ) **চোলাইকরণ** (distillation) **:** জল ফুটাইয়া বাষ্পে পরিণত করিয়া ঐ বাষ্পকে আবার জলে পরিণত করার নামই চোলাইকরণ বা পাতন। প্রথমে একটি পাত্রে জল রাখিয়া ফুটাইয়া বাষ্পে পরিণত কর। তারপর একটি কাচের নলের সাহায্যে অপর একটি পাত্রে লইয়া যাও। যে নলের মধ্য দিয়া বাষ্প যাইতেছে উহার গায়ে আর একটি নল রাখিয়া তাহাতে ঠাণ্ডা জল ঢাল। ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে আসিয়া বাষ্প আবার জলে পরিণত হয়। জল বাষ্পে পরিণত হইয়া পুনরায় জলে রূপান্তরিত হয় বলিয়া উহা জীবাণুশূন্য থাকিবে। চোলাইকরণের অসুবিধা এই যে এই পদ্ধতিতে অনেক জল একসঙ্গে বিশুদ্ধ করা যায় না।

অবিচ্ছিন্নভাবে পাতনক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য বিজ্ঞানী লাইবিগ একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। উহাকে বলে লাইবিগের হিমকার বা Liebig condenser ; এই হিমকার যন্ত্রটি কাচের জ্যাকেট পরানো একটি নল। ভিতরের নল এবং জ্যাকেটের মাঝে কিছু ফাঁক থাকে এবং জ্যাকেটের উপরে ও নীচে দুইটি পার্শ্ব-নল থাকে। এই পার্শ্বনল দুইটিতে রবারের টিউব সংযুক্ত থাকে। জ্যাকেটের নীচের নলাকার ছিদ্রে লাগানো রবার টিউবটি একটি কলের জলের সঙ্গে লাগানো হয়। জলধারা এই টিউবের ভিতর দিয়া জ্যাকেটের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ভিতরের নলটিকে ঠাণ্ডা করিয়া ঐ জলধারা জ্যাকেটের উপরকার

পার্শ্বনল দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই জ্যাকেট পরানো নলটির নাম **লাইবিগের হিমকার**। যে পাত্রে জল বাষ্পীভূত করা হয় উহাকে বলে পাতন ফ্লাস্ক। হিমকার যন্ত্রটির একপ্রান্ত পাতন ফ্লাস্কের সঙ্গে এবং অপর প্রান্ত গ্রাহক ফ্লাস্কের
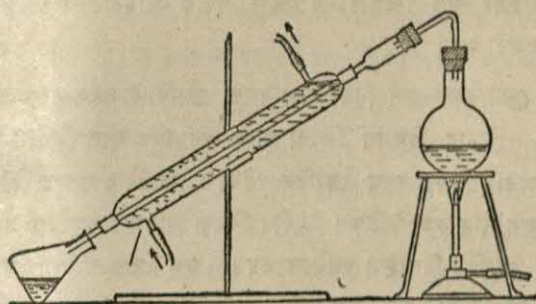
চোলাইকরণ

সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। পাতন ফ্লাস্কের জল একটি বার্ণারের সাহায্যে বাষ্পায়িত হইয়া পুনরায় হিমকারের ভিতর দিয়া ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে জলে রূপান্তরিত হইয়া গ্রাহক পাত্রে গিয়া পড়ে।

রাসায়নিক পদ্ধতি (chemical process)—জলের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থ মিশাইয়া জল নির্বীজিত করা যায়।

(ক) **ফটকিরি**—জল বিশোধনের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে ফটকিরি অন্যতম। গৃহস্থের পক্ষে ইহা একটি উত্তম বস্তু ; কারণ, ইহা ব্যবহার করা সহজ এবং দামেও সস্তা। ফটকিরি জলের অভ্যন্তরস্থ বালু, মাটি, কাদা ইত্যাদি অদ্রবীভূত পদার্থগুলি থিতাইতে সাহায্য করে। কতখানি জলে কতটা পরিমাণ ফটকিরি দেওয়া হইবে উহা জলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণত এক গ্যালন জলে ১ হইতে ৪ গ্রেন ফটকিরি দিলেই চলে। ফটকিরি অনেক জীবাণু নাশ করিতে পারিলেও কলেরা ও টাইফয়েডের জীবাণু ধ্বংস করিবার ক্ষমতা ইহার নাই।

(খ) **পটাস পারমাঙ্গানেট**—পটাশ পারমাঙ্গানেটের জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে। সাধারণত ২০০ গ্যালন জলে ১ ড্রাম পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশাইলেই জীবাণু মরিয়া যায়। তবে অত কড়াকড়ি হিসাব না করিয়া জলের রং সাধারণ ফিকে লাল হইলেই বুঝিবে পটাশ পারমাঙ্গানেটের পরিমাণ ঠিক হইয়াছে। ইহার ক্রিয়া অবশ্য ক্ষণস্থায়ী। সাধারণ লোকের পক্ষে এই রাসায়নিক পদার্থটি

ব্যবহার করা খুব সহজ। তবে ইহা একটু ব্যয়বহুল। পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশাইবার অন্তত ছয় ঘণ্টা পরে জল পান করিতে দেওয়া উচিত। সন্ধ্যাবেলা উহা জলে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রত্যূষে ঐ জল পান করিতে দিবে। পুষ্করিণীর জল বিশোধনের পক্ষে পটাশ পারমাঙ্গানেট সুবিধাজনক কিংবা কার্যকরী নয়।

(গ) **ক্লোরিন**—জল নির্বীজনের পক্ষে ক্লোরিনই হইল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। ইহা ব্লীচিং পাউডার হিসাবে কিংবা তরল অবস্থায়ও জলে মিশ্রিত করা যায়। থিতান কিংবা ছাঁকা জলে ক্লোরিন মিশ্রিত করিবার অন্তত তিরিশ মিনিট পরে সেই জল পান করা উচিত। নদীর কিংবা সাধারণ পুকুরের জলে অন্তত এক ঘণ্টা ক্লোরিন মিশাইয়া রাখিতে হয়। জল বিশুদ্ধ করিবার জন্য ক্লোরিন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকরী রাসায়নিক পদার্থ। তবে অনেক সময় ইহা জলের স্বাদ বিকৃত করিতে চায়। ক্লোরিনের পরিবর্তে ক্লোরামিন (অ্যামোনিয়া ও ক্লোরিনের সংমিশ্রণে লব্ধ এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ) ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্লোরামিন অবশ্য ক্লোরিনের মত কার্যকরী নয় এবং দামীও বটে, তবে উহা জলের স্বাদ ঠিক রাখে।

বড় পুকুরের সমস্ত জল বিশোধনের প্রয়োজন নাই। প্রথমে অল্প জলে ক্লোরিন গুলিয়া লইয়া বেশী জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর চারিপাশে দশ ফুট পর্যন্ত স্থানে ক্লোরিন জল ছড়াইয়া দিবে।

(ঘ) **চুন**—চুন এবং আয়োডিন জল পরিস্রুতিতে সাহায্য করে। লোহা থাকিলে চুন উহা থিতাইয়া দেয়।

(৩) **ছাঁকন** (Filtration)

জল ছাঁকিয়া লইবার উদ্দেশ্য জলের জীবাণুগুলিকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া। জল কেবল স্বচ্ছ দেখাইলেই চলিবে না, উহা জীবাণুশূন্যও হওয়া চাই। কেবলমাত্র স্বচ্ছ জল পানীয় জলরূপে ব্যবহারের যোগ্য নয়। আমাদের দেশে জল সরবরাহের প্রধান উৎস হইল নদী। নদীর জল জীবাণুবর্জিত করিবার জন্য দুই প্রকারের ছাঁকনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে—(ক) বালির বিলম্বিত ছাঁকন (slow sand filtration), (খ) যান্ত্রিক দ্রুত ছাঁকন (rapid or mechanical filtration)। এতদ্ব্যতীত ঘরোয়া পদ্ধতিতে তিন ঘড়ার সাহায্যে ছাঁকন আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে।

(ক) **বালির বিলম্বিত ছাঁকন** (Slow sand filtration)

প্রথমে পাম্পের সাহায্যে নদী হইতে জল তুলিয়া আনিয়া বৃহৎ জলাধারে (settling tanks) ভর্তি করা হয়। তারপর ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টাকাল ঐ ময়লা জল থিতাইতে দেওয়া হয়। জল থিতাইতে গিয়া জলের সমস্ত অদ্রবণীয় পদার্থ নীচে পড়িয়া যায় এবং জীবাণুরও প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ মরিয়া যায়। বর্ষাকালে জল যখন অত্যন্ত ঘোলা থাকে তখন জলে ফটকিরি মিশাইয়া দিলে জল তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া থিতাইয়া যায়। তারপর পাইপের সাহায্যে প্রথম জলাধার হইতে দ্বিতীয় জলাধারে থিতান জল নিয়া আসা হয়। এই দ্বিতীয় জলাধারকে বলা হয় ফিল্টার বেড। ফিল্টার বেডের মধ্যে উপর্যুপরি চারিটি স্তর সাজান থাকে। প্রায় ২½ হইতে ৩ ফুট পর্যন্ত প্রথম স্তরটি হইল মিহি বালির স্তর। আধ হইতে এক ফুট পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তরটি মোটা বালি দিয়া প্রস্তুত। তৃতীয় স্তরে এক ফুট পরিমাণ নুড়ি সাজান থাকে। একেবারে শেষের স্তরে থাকে ইট। মিহি বালির স্তরের উপরে দূষিত জল ঢালিয়া দিলে উহা যথাক্রমে মিহি বালি, মোটা বালি, নুড়ি ও ইটের স্তর ভেদ করিয়া চুয়াইয়া চুয়াইয়া নীচে গিয়া জমিতে থাকে। পরে এই জল একটি সরু পাইপের সাহায্যে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয় এবং জনসাধারণের ঘরে সরবরাহের পূর্বে ক্লোরিন মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এখানে লক্ষ্য করিবে মিহি বালির স্তরের উপর দিয়া জল অতিক্রম করিবার কালে বালির উপরে একটি পাতলা পর্দা পড়ে। এই পর্দাটি অনেক
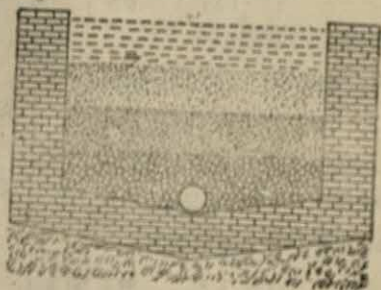
ফিল্টার বেড

দূষিত পদার্থ ও রোগবীজাণু আটকাইয়া রাখে। জীবাণুগুলি উপযুক্ত খাদ্য ও অক্সিজেনের অভাবে ঐখানে মরিয়া থাকে। এই পদার্থটি ফিল্টার বেডের প্রাণ-স্বরূপ। ইংরাজীতে ইহাকে বলে vital layer ; ভাইটাল লেয়ার প্রায় সাত আট সপ্তাহ কার্যক্ষম থাকে। তারপর ফিল্টার বেড পরিষ্কার করিয়া নতুন করিয়া সাজাইতে হয়। কলিকাতার অনতিদূরে পলতা নামক স্থানে কলিকাতা শহরের সমস্ত জল এই পদ্ধতিতে ছাঁকা হয়।

(খ) যান্ত্রিক দ্রুত ছাঁকন (Rapid or mechanical filtration)

প্রথমে পাইপের সাহায্যে নদী হইতে দূষিত জল আনিয়া বৃহৎ পাত্রে (collecting tank) রাখা হয়। তারপর উহা দ্বিতীয় পাত্রে লইয়া যাওয়া হয়। একটি বিশেষ পাইপের সাহায্যে ফটকিরির জল আনিয়া সেখানে নোংরা জলের সঙ্গে মিশান হয়। তারপর আবার একটি পাইপের মধ্য দিয়া ফটকিরি মিশ্রিত জল অন্য একটি ট্যাঙ্কে আনিয়া থিতাইতে দেওয়া হয়। থিতান জল তারপর ফিল্টার বেডে লইয়া আসা হয়। ফিল্টার বেডের চারিটি স্তর। ফিল্টার বেডটি যদি সম্পূর্ণ বদ্ধ (closed) থাকে তবে তাহাকে প্রেসার ফিল্টার বলে এবং উহাতে যদি হওয়া প্রবেশ করাইবার জন্য কোন পাইপ লাগানো থাকে তবে উহা গ্র্যাভিটি ফিল্টারে (gravity filter) পর্যবসতি হয়। ফিল্টার বেডের চারিটি স্তর অতিক্রম করিয়া জল নীচে জমিতে থাকে। তারপর একটি ছুঁচলো মুখওয়ালা ছাঁকনীর মত পাইপের মধ্য দিয়া ঐ জল বাহির করিয়া নিয়া অপর একটি ট্যাঙ্কে রাখা হয়। সেইখানে জলে ক্লোরিন মিশ্রিত করা হয়।

বিলম্বিত ছাঁকন ও যান্ত্রিক দ্রুত ছাঁকনের পার্থক্য

বিলম্বিত ছাঁকন	যান্ত্রিক দ্রুত ছাঁকন
১। ইংরেজী পদ্ধতি।	১। আমেরিকান পদ্ধতি।
২। ১৮৩০ সাল হইতে প্রচলিত।	২। অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ১৮৮৪ সাল হইতে প্রচলিত।
৩। দূষিত জলে ফটকিরি না মিশাইলেও চলে। তবে বর্ষার সময় ফটকিরি মিশ্রিত করা ভাল।	৩। অবশ্যই ফটকিরি মিশ্রিত করিতে হইবে।
৪। প্রাথমিক অবস্থায় থিতাইবার জন্য ট্যাঙ্ক দরকার (settling tank)।	৪। প্রাথমিক অবস্থায় থিতাইবার জন্য ট্যাঙ্কের (settling tank) প্রয়োজন নাই।
৫। ফিল্টার বেডের মধ্য দিয়া জল খুব ধীরে ধীরে অতিক্রম করে।	৫। ফিল্টার বেডের মধ্য দিয়া জল খুব দ্রুত চলিয়া যায়।
৬। ছাঁকিবার হার—প্রতি একর জমিতে প্রতি দিনে ২ হইতে ৩ মিলিয়ন গ্যালন জল ছাঁকা যায়।	৬। প্রতি একর জমিতে প্রতি দিনে ১০০ হইতে ২০০ মিলিয়ন গ্যালন জল ছাঁকা যায়।

বিলম্বিত ছাঁকন	যান্ত্রিক দ্রুত ছাঁকন
৭। ফিল্টার বেড় পরিষ্কার করিবার সময় ৩ দিন পর্যন্ত ছাঁকা বন্ধ রাখিতে হয়।	৭। মাত্র ১৫ মিনিটেই ছাঁকিবার যন্ত্র পরিষ্কার করা যায়।
৮। ভাইটাল লেয়ার দরকার।	৮। ভাইটাল লেয়ারের দরকার নাই।
৯। ভালটাল লেয়ার চাঁছিয়া ফেলিয়া ফিল্টার বেড পরিষ্কার করিতে হয় এবং বালু ইত্যাদিও বদলাইতে হয়।	৯। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেড পরিষ্কার করা হয় বলিয়া বালু ইত্যাদি বদলাইবার দরকার নাই।
১০। শতকরা ৯৯ ভাগ জীবাণু ধ্বংস করে।	১০। শতকরা ৯৫ হইতে ৯৮ ভাগ জীবাণু ধ্বংস করে।
১১। ঠাণ্ডা দেশে জল জমিয়া বরফ হইয়া ছাঁকার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে।	১১। জল জমিয়া বরফ হইতে পারে না।
১২। শ্যাওলা (algae) পড়িয়া ছাঁকার অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে।	১২। ফিল্টার বেডে শ্যাওলা জন্মাইতে পারে না।
১৩। প্রচুর জমি দরকার। আরম্ভের খরচ কম।	১৩। বেশী জমির প্রয়োজন নাই। আরম্ভের খরচ কম, তবে চালাইবার খরচ বেশী।
১৪। কর্মীদের দ্বারা জল দূষিত হইতে পারে।	১৪। জল দূষিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।
১৫। জৈব (biological), যান্ত্রিক (mechanical) ও রাসায়নিক (chemical) তিনটি ব্যবস্থাই অনুসৃত হয়।	১৫। শুধুমাত্র যান্ত্রিক উপায়ে ছাঁকা হয়।

(গ) ঘরে জল ছাঁকা—

আমাদের দেশে ঘরেই জল ছাঁকিয়া লইবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব বলিয়া চারিটি ঘড়ার সাহায্যে এক দেশী পদ্ধতিতে জল ছাঁকা হয়।

ঘড়া বা কলস ফিল্টার—একটি কাঠের মঞ্চ তৈয়ারী করিয়া তাহাতে উপর্যুপরি চারিটি ঘড়া কিংবা কলস সাজান হয়। উহাদের মধ্যে প্রথম তিনটির তলায় ছিদ্র থাকে এবং তাহাতে খড়ের পলিতা লাগানো হয়। সবচেয়ে উপরের ঘড়ায় নদী বা পুষ্করিণীর অপরিস্রুত জল ঢালা হয়। দ্বিতীয় ঘড়াতে রাখা হয় কয়লা এবং তৃতীয়টিতে থাকে নুড়ি এবং তাহার উপরে বালুকণা। প্রথম ঘড়া হইতে জল চুয়াইয়া চুয়াইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘড়ায় গিয়া পড়ে। মনে রাখিবে এইরূপ পদ্ধতিতে জল ছাঁকিলে জল স্বচ্ছ দেখায় বটে কিন্তু ইহাতে জলের জীবাণু ধ্বংস হয় না। পল্লী অঞ্চলে না ছাঁকিয়া ফুটাইয়া খাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ পন্থা। জল ফিল্টার করিবার জন্য আরও তিন রকমের যান্ত্রিক পদ্ধতি আছে—
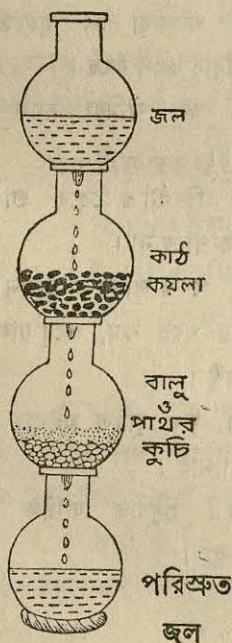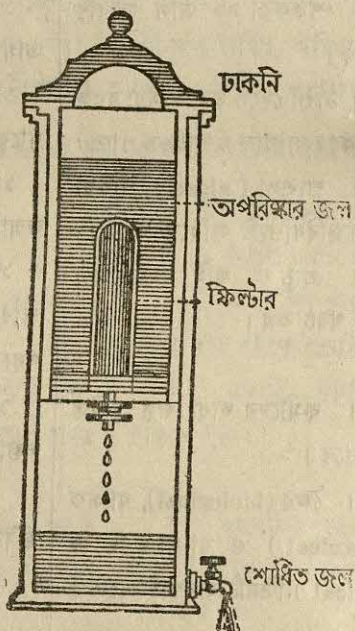
চারঘড়া ফিল্টার   বার্কফেল্ড ফিল্টার

বার্কফেল্ড ফিল্টার (Berkefeld filter)—পোরসিলিন বা লম্বা ধরনের আধার। ইহার উপর ঢাকনি দেওয়া থাকে এবং বোতলটি এক প্রকার বিশেষ ধরনের মাটি দিয়া তৈয়ারী। ইংরেজীতে উহাকে diatomaceous earth বলে। বোতলটিতে দুইটি প্রকোষ্ঠ থাকে। উপরের প্রকোষ্ঠে

ছোট বড় অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত একটি নল থাকে। ঐ ছিদ্রগুলি রোগের জীবাণু আটকাইয়া রাখে। তারপর পরিস্রুত জল নল বাহিয়া নীচের প্রকোষ্ঠে তলায় পড়ে। তখন ফিল্টার বোতলের কলের মুখ খুলিয়া জল বাহির করিয়া নেওয়া হয়।

পাস্তুর চেম্বারলেন ফিল্টার (Pasteur-Chamberlain filter)—পাস্তুর ফিল্টার বোতলটি চীনামাটি বা পোরসিলিন দিয়া তৈয়ারী।

কাতাদিন পদ্ধতি (Katadyn process)—

কোন কোন ধাতুর জীবাণু-ধ্বংসকারী ক্ষমতা আছে। বালুকণা কিংবা পোরসিলিন রূপার ভিতরে পূরিয়া পুঁতির মত তৈয়ারী করা হয়। এই পুঁতি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। একটি সরু রূপার তারের মধ্যে ঐ পুঁতিগুলি গাঁথিয়া মালা তৈয়ারী করিয়া ঐ মালা যে কোন পাত্রের জলে ডুবাইয়া রাখিলে জল পরিস্রুত হয়। একটি মালা বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। জল পরিস্রুত হইবার কারণ এই যে, রূপা খুব ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া জলে মিশ্রিত হইয়া আয়নের (ion) সৃষ্টি করে। ঐ আয়ন বায়ু হইতে অক্সিজেন টানিয়া আনিয়া জীবাণু ধ্বংস করে। কাতাদিন পদ্ধতিতে একসঙ্গে বেশী জল পরিস্রুত করা যায় না।

কাতাদিন পদ্ধতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক প্রতিবিধান

প্রাথমিক প্রতিবিধান কাহাকে বলে ?

কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিলে চিকিৎসক আসিবার পূর্বে যে জ্ঞানের দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে আহত ব্যক্তির জীবন-রক্ষা কিংবা আরোগ্যের পথ সুগম করা যায় তাহারই নাম প্রাথমিক প্রতিবিধান। বিপদের সময় হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী কখনও চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করিবে না। চিকিৎসক আসিলেই তাহার দায়িত্ব শেষ হইয়া যায়। তবে চিকিৎসক আসিবার পূর্বে তাহাকে রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া লইয়া কি পরিমাণ প্রতিবিধান প্রয়োজন এবং কতটা প্রতিবিধান দেওয়া সম্ভব স্থির করিতে হয়। কম্পন, অচৈতন্য অবস্থা, বিবর্ণতা, আঘাতের স্থানে স্ফীতি কিংবা রক্তজমা ইত্যাদি চিহ্নগুলি প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী নিজের চোখে দেখিয়া রোগ আন্দাজ করিয়া লইতে পারে। এতদ্ব্যতীত রোগীর শীত শীত ভাব, বমির ইচ্ছা, তৃষ্ণাবোধ অথবা ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ আছে কিনা তাহা সে রোগীর নিকট হইতেই জানিয়া লইতে পারে। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও উপস্থিতবুদ্ধি থাকা যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ শারীরবৃত্ত ও শুশ্রূষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কিছুটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আহত ব্যক্তি জীবিত কি মৃত সামান্য সন্দেহ থাকিলে চিকিৎসক আসা পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা চালাইয়া যাওয়া উচিত।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর কর্তব্য

১। দুর্ঘটনা গৃহেই ঘটুক কিংবা পথিপার্শ্বেই ঘটুক যাহা করণীয় তাহা অতি দ্রুত এবং শান্তভাবে করিয়া যাইবে।

২। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস আনয়নের ব্যবস্থা করিবে।

৩। রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবে।

৪। আহত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব কম নাড়াচাড়া করিবে এবং স্নায়বিক আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে।

৫। স্নায়বিক আঘাত পাইলে উহার চিকিৎসা চালাইবে।

৬। রোগীর চারিদিকে অযথা ভিড় জমিতে দিবে না।

৭। অযথা বস্ত্র অপসারণ করিবে না।

৮। রোগীকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট অথবা প্রয়োজন হইলে হাসপাতালে পাঠাইবে।

গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের আবশ্যক সরঞ্জাম

গৃহে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে কিংবা যে কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত রোগীর আরোগ্যলাভের পথ প্রশস্ত করা এবং তাহার অবস্থা যাহাতে আরও খারাপ হইয়া না পড়ে এইজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকেই প্রাথমিক প্রতিবিধানের কিছু কিছু সরঞ্জাম রাখিতে হয়। সরঞ্জামের তালিকা খুশিমত দীর্ঘ করা যায়, তবে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি প্রায় অপরিহার্য :—টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেঞ্জিন, কেটল, রবিক তুলা, ঔষধের গ্লাস, কাঁচি—তীক্ষ্ণ ও ভোঁতা, সেফ্‌টি-পিন, স্যালভোলেটাইল (Salvolatile) অথবা স্মেলিং সল্ট (Smelling salt), ঔষধের গ্লাস, এসপিরিন ট্যাবলেট, বার্নল, এক ইঞ্চি গুটান ব্যাণ্ডেজ, তিন ইঞ্চি গুটান ব্যাণ্ডেজ, ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ, গজ ও কয়েকপ্রকার ড্রেসিং, গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যাগ।

কি কি দুর্ঘটনা ও আকস্মিক পীড়ায় কিরূপ প্রতিবিধানের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

দাহ (Burns)

বাড়ীতে সচরাচর যেসব বিপদ ঘটে দাহ তাহাদের অন্যতম। শরীরের কোন অংশ পুড়িয়া গেলে সেই স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এই দাহজনিত ক্ষত দুই প্রকারের—(১) শুষ্ক তাপ কিংবা রাসায়নিক পদার্থঘটিত ক্ষত—এই ক্ষতকে পুড়িয়া যাওয়া (burn) বলে এবং (২) বাষ্পজাত তাপ কিংবা উত্তপ্ত আর্দ্র-বস্তুঘটিত ক্ষত—এইরূপ ক্ষত হওয়াকে ঝলসাইয়া যাওয়া (scald) বলে।

শুষ্ক তাপ বলিতে আগুন, উত্তপ্ত ধাতব পদার্থ, রৌদ্র, বৈদ্যুতিক তাপ, দ্রুত ঘূর্ণায়মান চক্র, দড়ি বা তারের ঘর্ষণজনিত তাপ বুঝায়। কতকগুলি

রাসায়নিক পদার্থ, যথা—সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রভৃতি অম্লদ্রব্য (acid) এবং কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাস, অ্যামোনিয়া, কুইকলাইম প্রভৃতি ক্ষার দ্রব্য-ঘটিত ক্ষতও শুষ্কতাপজনিত ক্ষতের অন্তর্গত। পরন্তু বাষ্পজাত তাপ বা আর্দ্রতাপ বলিতে ফুটন্ত জল, গরম বাষ্প, গরম পুলটিস, গরম তেল, ঘি, ভাতের মাড়, ডাল প্রভৃতির তাপ বুঝায়।

দাহের প্রতিক্রিয়া—শুষ্কদাহ অথবা আর্দ্রদাহের প্রতিক্রিয়া একই প্রকার। উভয় প্রকার দাহের ফলে চর্ম লাল বর্ণ ধারণ করিতে পারে কিংবা চর্মের ভিতরকার তন্তুগুলি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। দহনের সঙ্গে তীব্র বেদনাবোধ ও জ্বালা দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্নায়বিক আঘাত লাগাও অসম্ভব নয়।

দগ্ধস্থান জীবাণুমুক্ত রাখিতে হইবে এবং চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত ঐভাবে রাখিতে হইবে। দগ্ধস্থান জীবাণুমুক্ত করিয়া রাখা ভাল এবং যতদূর সম্ভব ঐ স্থান নাড়াচাড়া করিবে না। শিশুদের দেহ সামান্য পুড়িয়া গেলেও উহা গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের নিকট পাঠাইবে।

কোন ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগিয়া গেলে সাহায্যকারী ব্যক্তি আপনার আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইবে। সে তাহার সম্মুখে একটি কম্বল, কোট কিংবা পুরু টেবিল ঢাকনা লইয়া উহা দ্বারা জ্বলন্ত ব্যক্তিকে জড়াইয়া চিত করিয়া শোয়াইয়া ফেলিবে। একলা থাকিলে যদি আগুন লাগিয়া যায় তবে মেঝেতে গড়াইয়া হাতের নিকট যে আচ্ছাদন পাইবে তাহা দিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিবে এবং সাহায্যের জন্য লোকজন ডাকিবে। দেহে আগুন লাগিলে কদাপি দৌড়াইয়া উন্মুক্ত স্থানে যাইতে নাই। তাহাতে আগুন আরও বেশী জ্বলিয়া উঠে।

শুষ্কদাহ ও আর্দ্রদাহ প্রতিবিধানের সাধারণ নিয়ম—

১। দগ্ধস্থান অযথা নাড়াচাড়া করিও না।

২। দগ্ধস্থানে কোনরূপ লোশন লাগাইবে না।

৩। দগ্ধপোশাক অপসারিত করিবে না এবং ফোস্কা গালিয়া দিবে না।

৪। শুষ্ক জীবাণুশূন্য ড্রেসিং কিংবা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া দগ্ধস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিবে। ফোস্কা থাকিলে ব্যাণ্ডেজ আলগা রাখিবে নতুবা খুব দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে।

৫। সামান্য পুড়িয়া গেলে চিনি দিয়া হাল্কা চা প্রভৃতি গরম পানীয় প্রচুর পরিমাণে পান করিতে দিবে।

৬। দহন যদি গুরুতর হয় তবে সত্বর রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ কর। আহত ব্যক্তিকে অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। তাই মুখ দিয়া কিছু খাওয়াইবে না। যদি ঘন্টা চারেকের মধ্যেও চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায় তবে লবণ মিশ্রিত জল পান করিতে দিবে। দুই গ্লাস জলে আধ চামচ লবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে আধ চামচ সোডি বাইকারবোনেট মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

রাসায়নিক পদার্থে দগ্ধ হইলে উহার প্রতিবিধান

১। অম্লদ্রব্যে দগ্ধ হইলে :—

(ক) দগ্ধ অঙ্গ প্রচুর জলে ধুইয়া ফেল কিংবা ডুবাইয়া রাখ।

(খ) এক পাইন্ট গরম জলে চা-চামচের দুই চামচ সোডি বাই-কারবোনেট মিশ্রিত করিয়া লোশন প্রস্তুত কর এবং উহা দ্বারা আহত স্থান ধুইয়া ফেল।

২। চুন প্রভৃতি ক্ষার পদার্থে দগ্ধ হইলে :—

(ক) চুনে পুড়িয়া গেলে চুন ঝাড়িয়া ফেল।

(খ) আহত স্থান প্রচুর জলে ধুইয়া ফেল।

(গ) ভিনিগার অথবা লেবুর রস সমপরিমাণ গরম জলে মিশ্রিত করিয়া লোশন প্রস্তুত কর এবং লোশন দ্বারা ক্ষতস্থান ধুইয়া ফেল।

(ঘ) শুষ্কদাহের চিকিৎসা চালাও।

কাটিয়া যাওয়া ও কালশিরা পড়া (Cuts and Bruises)

আমাদের দেহচর্ম কোন ধারাল বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে কাটিয়া যাইতে পারে। এইভাবে শরীরের কোন অংশ আঁচড়াইয়া বা ছড়িয়া যাওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এইরূপ আঘাতের প্রতিবিধান খুবই সহজ। পরিষ্কার তুলা কিংবা বস্ত্রখণ্ডে আয়োডিন, বেঞ্জিন কিংবা ডেটল মাখাইয়া ক্ষতস্থানটিতে বুলাইয়া দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ক্ষতস্থানটি যদি অপরিষ্কার হয়, অথবা উহাতে ধারাল কাচ, পুরাতন ভাঙ্গা টিন কিংবা কোন কাঁটা ফুটিয়া থাকে তবে প্রথমে সন্তর্পণে ঐ বিজাতীয় বস্তুটি বাহির করিয়া লইয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড জলে

(ক) প্রেসার পয়েন্ট—রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার জন্য যেখানে কোন ধমনী কিংবা শিরাকে উহার ঠিক নীচেকার অস্থির উপর চাপিয়া ধরা যায় তাহাকে প্রেসার পয়েন্ট বলে।

(খ) কনষ্ট্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজ (Constrictive Bandage)—বহুক্ষণ ধরিয়া পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করিতে হইলে এইরূপ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ইহা এক প্রকার সরু ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ। ৪ ফুট লম্বা ও আড়াই ইঞ্চি চওড়া একটি রবার ব্যাণ্ডেজই কনষ্ট্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজরূপে ব্যবহার করা উচিত। ব্যাণ্ডেজটির প্রান্তে দুইটি সরু ফিতা লাগান থাকে। এই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অত্যন্ত সহজ। ক্ষতস্থানের চারিপাশ ঘিরিয়া খুব শক্ত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয়,
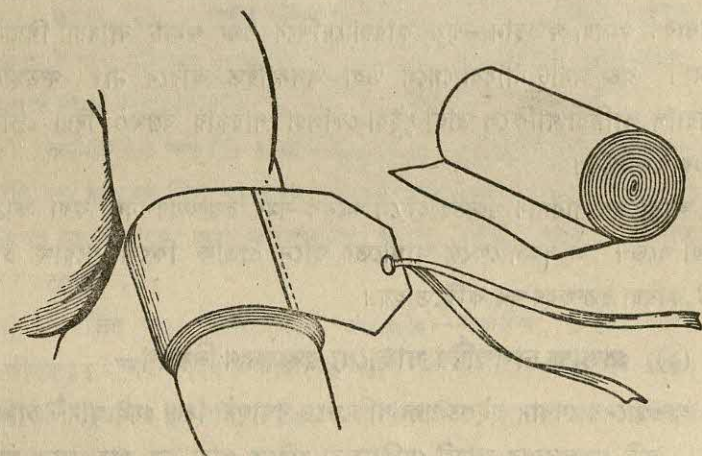
কনষ্ট্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজ

নতুবা রক্তক্ষরণ আরও বেশী হইবে। পনের মিনিট পর ব্যাণ্ডেজ আলগা করিয়া দেখিতে হয় রক্তক্ষরণ বন্ধ হইয়াছে কিনা, নতুবা আবার দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। রক্তক্ষরণ বন্ধ হইলে ব্যাণ্ডেজ ঢিলা করিয়া রাখিবে।

কনষ্ট্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজের পরিবর্তে টুর্নিকেটের (Tourniquet) সাহায্যেও পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করা যায়। শক্ত প্যাড-সংযুক্ত, এক প্রান্তে একটি বকলস ও কাঠি লাগানো দুই ইঞ্চি চওড়া একপ্রকার ব্যাণ্ডেজ বাজারে বিক্রয় হয়। এইরূপ ব্যাণ্ডেজই 'সেন্ট্ জন টুর্নিকেট' নামে পরিণত। তবে আকস্মিক প্রয়োজনে টুর্নিকেটের পরিবর্তে যে কোন শক্ত প্যাড, ফিতা ও একটি কাঠির সাহায্যে টুর্নিকেট প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। প্রথমেই ক্ষতস্থানের প্রেসার

পয়েন্টের উপর শক্ত প্যাড চাপিয়া ধরিবে। তারপর একটি সরু ফিতার কেন্দ্রস্থল প্যাডের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া প্রান্তদেশ দুইটি ঠিক বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া নিয়া একটি অর্ধগ্রন্থি (half-knot) রচনা করিবে। ঐ অর্ধ-গ্রন্থির উপরে একটি কাঠি রাখিয়া একটি রিফ-নট (reef-knot) দিবে। তারপর কাঠি ঘুরাইয়া টুর্নিকেট অর্থাৎ ব্যাণ্ডেজ আঁট করিয়া দিবে। ঘরে হাতের কাছে প্যাড প্রস্তুত না থাকিলে ব্যাণ্ডেজ কিংবা রুমালে একটি গেরো দিয়া লইয়া প্যাডের কাজ চালান যাইতে পারে। গেরোটি প্রেসার পয়েন্টের উপর রাখিয়া রুমাল বা ব্যাণ্ডেজের প্রান্ত দুইটি বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া নিয়া গ্রন্থি রচনা করিতে হয়।

আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ হইতে রক্তক্ষরণ—কেবল যে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কাটিয়া গিয়া, ছোরা ও গুলির আঘাত লাগিয়া কিংবা চাপ, ধাক্কা ইত্যাদির ফলে দেহস্থিত অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়া রক্তক্ষরণ হয় তাহাই নয়, অনেক সময় আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ হইতে রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। এই রক্তক্ষরণের কারণ চিকিৎসক ভিন্ন অপর ব্যক্তির নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ দুই রকমের—প্রকাশ্য (visible) ও গুপ্ত (concealed)। প্রকাশ্য রক্তক্ষরণের সময় মুখ দিয়া কিংবা মল মূত্রের সঙ্গে রক্ত বাহির হইয়া আসে। দেহের কোন্ অংশ হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে তাহা রক্তের রং দেখিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমানের সুবিধার জন্য নীচে একটি তালিকা দেওয়া গেল।

ফুসফুস হইতে—সফেন রক্ত কাশির সঙ্গে উঠিয়া আসে। ইহার বর্ণ উজ্জ্বল লাল।

পাকস্থলী হইতে—বমনের সহিত রক্ত বাহির হইতে থাকে। ইহা দেখিতে কফির গুঁড়ার মত।

অন্ত্রের ঊর্ধ্বাংশ হইতে—ক্ষরিত রক্তের বর্ণ আলকাতরার মত।

অন্ত্রের নিম্নাংশ হইতে—ক্ষরিত রক্তের বর্ণ স্বাভাবিক।

মূত্রগ্রন্থি হইতে—প্রস্রাবের সহিত রক্ত বাহির হয়। উহা ধোঁয়াটে অথবা লাল বর্ণের। এইরূপ রক্তক্ষরণের সময় মূত্রগ্রন্থির চারিপাশে ব্যথা অনুভূত হয়।

মূত্রাশয় হইতে—রক্ত প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয় এবং প্রস্রাবে কষ্ট-বোধ হয়।

পরন্তু যকৃৎ (Liver), প্লীহা (Spleen) কিংবা অগ্ন্যাশয় (Pancreas) হইতে যে রক্তক্ষরণ হয় তাহা বাহির হইতে প্রকাশ পায় না (concealed bleeding)। চোখে দেখা যায় না বলিয়া রক্তক্ষরণ বন্ধ হইতে বিলম্ব হয় এবং ফলে চিকিৎসারও বিলম্ব ঘটে। অপ্রকাশিত বা গুপ্ত রক্তক্ষরণ তাই বড় বিপজ্জনক।

গুপ্ত রক্তক্ষরণের লক্ষণসমূহ

(১) রোগী দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার মাথা ঘুরিতে পারে, কখনও বা মূর্চ্ছা দেখা দেয়।

(২) মুখ ও ঠোঁট পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে।

(৩) দেহচর্ম শীতল ও বিবর্ণ দেখায়।

(৪) ভীষণ তৃষ্ণাবোধ হইতে থাকে।

(৫) অস্থিরতা বাড়িয়া যায় এবং রোগী বেশী কথা বলিতে চেষ্টা করে।

(৬) নাড়ি ক্রমশ ক্ষীণ ও দ্রুত হয়। কখন কখন উহার স্পন্দন অনুভব করা যায় না।

(৭) শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর হয়। মাঝে মাঝে হাই ওঠে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

(৮) রোগী বায়ুর জন্য ব্যাকুল হয় (Air hunger)।

(৯) অচেতন হইয়া পড়িতে পারে।

বায়ুর জন্য ব্যাকুলতা, ভীষণ তৃষ্ণাবোধ এবং অস্থিরতা গুপ্ত রক্তক্ষরণ সূচনা করে। অন্যান্য লক্ষণগুলি স্নায়বিক আঘাতের ক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকে।

প্রতিবিধান

(১) রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ কর।

(২) কোন খাদ্য বা পানীয় দিও না।

কয়েকটি বিশেষ স্থান হইতে রক্তক্ষরণ

আমাদের গণ্ডদেশ, জিহ্বা, মাড়ি, দাঁতের গর্ত, নাক ও কান প্রভৃতি স্থান হইতেও মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। এই সমস্ত রক্তক্ষরণকে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বলিয়া ভুল করিও না।

গলার সম্মুখের অংশ কিংবা জিহ্বা হইতে রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড কিংবা তুলা দিয়া রক্তক্ষরণের স্থানটি চাপিয়া ধর। **দাঁতের মাড়ি** হইতে যদি রক্ত পড়ে তাহা হইলে অনুরূপভাবে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড বা তুলা দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা কর।

দাঁতের গর্তে যদি রক্তক্ষরণ হয় তবে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড বা তুলা দিয়া প্রথমে গর্ত বুজাইয়া দাও। তারপর গর্তের পরিমাণ এক টুকরা তুলা উহার উপর রাখিয়া রোগীকে দাঁত দিয়া স্থানটি চাপিয়া ধরিতে বল।

নাক হইতে রক্তক্ষরণ—(১) রোগীর মাথা সামনের দিকে ঝুকাইয়া রাখ এবং মুক্ত বায়ুতে রোগীকে বসাইয়া দাও।

(২) গায়ের আঁটসাট বস্ত্রাদি ঢিলা করিয়া দাও।

(৩) রোগীকে মুখ খুলিয়া রাখিতে বল এবং মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইতে বল।

(৪) রোগীর নাকের শক্ত অংশ নীচের দিকে জোর করিয়া ধরিতে বল।

(৫) রোগীর নাক ঝাড়িতে দিও না বা নাক বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিও না।

(৬) ইহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে বরফ আনিয়া রোগীর নাকে দাও অথবা খুব ঠাণ্ডা জল নাকের উপর ঢালিতে থাক। বরফ দিলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

অচৈতন্য রোগীর নাক দিয়া রক্তক্ষরণের প্রতিবিধান

(১) কাঁধ এবং মাথা উঁচু করিয়া রাখ।

(২) পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া দাও এবং নাকের উপরিভাগে ধীরে ধীরে বরফ বুলাইতে থাক।

(৩) মুখ দিয়া যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চালাইতে পারে এইজন্য মুখ খুলিয়া রাখ।

(৪) যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরিতেছে ততক্ষণ জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া রাখ। নতুবা জিহ্বা গলার ভিতরে আটকাইয়া গিয়া রোগীর নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

কান দিয়া রক্তক্ষরণ

(১) রোগীর মাথা সামান্য উঁচু করিয়া রাখিয়া যেদিকে আঘাত লাগিয়াছে সেইদিকে হেলাইয়া রাখ।

(২) কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিবার চেষ্টা করিও না।

(৩) একটি শুকনো ড্রেসিং দিয়া কানের উপর আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ কর।

করতল (Palm) হইতে রক্তক্ষরণ

কয়েকটি ধমনী আসিয়া করতলে মিশিয়াছে বলিয়া করতল হইতে রক্তক্ষরণ তীব্র হইতে পারে। করতলের ক্ষতে যদি কোন বাহিরের বস্তু না থাকে তবে ড্রেসিং ও প্যাড বসাইয়া আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দাও। এইবার একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া উহা বাঁধিয়া দাও।

স্ফীত (Varicose) শিরাসমূহ হইতে রক্তক্ষরণ

স্ফীত শিরা কাটিয়া গিয়া রক্তক্ষরণ হইতে পারে। তবে দেহের সমস্ত শিরা অপেক্ষা পায়ের শিরার রক্তক্ষরণই সবচেয়ে মারাত্মক। এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে না পারিলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

(১) আহত ব্যক্তির পা যথাসম্ভব উঁচু করিয়া তাহাকে চিত হইয়া শুইতে বল।

(২) একটি পরিষ্কার প্যাড দিয়া ক্ষতস্থানটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও।

(৩) পায়ে গার্টার জাতীয় শক্ত কিছু বাঁধা থাকিলে তাহা খুলিয়া ফেল।

বক্ষ বা উদরের ক্ষতকে গুরুতর আপৎকালীন অবস্থা বলিয়া গণ্য করিবে এবং শীঘ্র চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

স্নায়বিক আঘাত (Shock)

আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহারই নাম স্নায়বিক আঘাত। এই আঘাত গুরুতর হইলে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং পরিণামে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। মানসিক বিপর্যয়, দহন কিংবা অন্যান্য গুরুতর আঘাতের ফলে স্নায়বিক আঘাতের সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণও অনেক সময় স্নায়বিক আঘাত ঘটাইয়া থাকে। আঘাতের চিহ্ন যে সর্বদাই প্রকাশ পাইবে তাহা নয়, আঘাত বাহ্যত অপ্রকাশিত থাকিয়া গেলেও স্নায়বিক আঘাত লাগিতে পারে। কোন আঘাত, রক্তক্ষরণ কিংবা দহনের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক আঘাত সৃষ্টি হইতে পারে, আবার ধীরে ধীরেও উহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

স্নায়বিক আঘাতের লক্ষণসমূহ—রোগী আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে, তাহার দেহে শীত শীত ভাব, বমি ভাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়, গাত্রচর্ম পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে ও শীতল হইয়া যায়, নাড়ির গতি প্রথমে ক্ষীণ, পরে দ্রুত চলিতে থাকে। রোগী তারপর বমি করে এবং আঘাত গুরুতর হইলে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

সাধারণত দুই প্রকার স্নায়বিক আঘাত দেখা যায়—(১) স্নায়ুজনিত আঘাত (Nerve shock) ও (২) প্রতিষ্ঠিত স্নায়বিক আঘাত (Established shock)।

স্নায়ুজনিত আঘাত—প্রত্যেক আঘাতের ফলে কোন না কোন স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। আঘাত প্রবল হইলে রক্তের চাপ হঠাৎ হ্রাস পায় এবং মস্তিষ্কে উপযুক্ত রক্তাভাব ঘটে এবং উহার ফলে স্নায়বিক আঘাতের সৃষ্টি হয়।

প্রতিষ্ঠিত আঘাত—যতখানি আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, আঘাত যখন তাহার চেয়ে অনেক গুরুতর হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহাকে প্রতিষ্ঠিত আঘাত বলে। আঘাত বা ক্ষত যদি গভীর হয় এবং রক্তক্ষরণ গুপ্ত থাকে তবে আহত ব্যক্তির অবস্থা বিপজ্জনক। প্রতিষ্ঠিত আঘাতের ফলে আহত ব্যক্তির রং ধূসর বর্ণ ধারণ করে এবং নাড়ী ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসে।

স্নায়বিক আঘাতের প্রতিবিধান—

(১) রোগীর মনে উৎসাহ দিবে।

(২) রোগীকে পাশ ফিরাইয়া শোয়াইয়া দিবে এবং তাহার মাথা ও কাঁধ উঁচু করিয়া রাখিবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন কষ্ট দেখা দিলে কিংবা রোগী

তিন-চতুর্থাংশ উবুড় করিয়া শোয়াইবার প্রণালী

বমি করিয়া থাকিলে তাহাকে চার ভাগের তিন ভাগ অংশ উবুড় করিয়া শোয়াইবে।

(৩) গায়ের বস্ত্র ঢিলা করিয়া দিবে।

(৪) কম্বল দিয়া রোগীকে মুড়িয়া দিবে কিন্তু দেহে অন্য কোন উত্তাপ দিবে না কিংবা গরম জলের বোতল ব্যবহার করিবে না।

(৫) রোগীর তৃষ্ণা পাইলে তাহাকে চা, কফি বা দুধ পান করিতে দিবে। কোন মাদক দ্রব্য পান করিতে দিবে না।

প্রতিষ্ঠিত আঘাতের চিকিৎসা—

আঘাত যদি গুরুতর হয় এবং গুপ্ত রক্তক্ষরণ হইতেছে বলিয়া আশঙ্কা হয়, তবে—

(১) রোগীর মাথা শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে সামান্য নীচু করিয়া রাখ।

(২) রোগীকে কোন খাদ্য বা পানীয় দিও না।

(৩) দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ কর।

কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া (Artificial Respiration)

আমাদের ফুসফুস যখন যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ হইতে বঞ্চিত হয়, তখন দেহের প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি এবং মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুকেন্দ্রগুলি অম্লজান হইতে বঞ্চিত হয়। দেহের এই অবস্থাকে এসফিক্সিয়া (Asphyxia) বলে। কাহারও বহুক্ষণ ধরিয়া এসফিক্সিয়া চলিতে থাকিলে পরিণামে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। এসফিক্সিয়া রোগীর জীবন রক্ষা করিতে হইলে তাহার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কৃত্রিম উপায়ে সঞ্চালিত করিয়া শ্বাসক্রিয়া পুনরায় চালু করিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া বলে। নানা কারণে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া চালাইবার প্রয়োজন হইতে পারে, যেমন—জলমগ্ন ব্যক্তি, বৈদ্যুতিক আঘাতপ্রাপ্ত, অগ্নিদাহের ফলে স্নায়বিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং গলায় কোনরকম চাপ বা ফাঁস লাগিয়া শ্বাসক্রিয়া রোধ হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তিদের ফুসফুসে অম্লজান সরবরাহ করিবার জন্য কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন দেখা যায়।

শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে সাধারণত চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শ্বাসকার্য ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করা যায় –(১) হলজার নিলসেন পদ্ধতি ; (২) শেফারের পদ্ধতি। (৩) সিলভেস্টার পদ্ধতি এবং (৪) ইভস্ রকিং পদ্ধতি।

হলজার নিলসেন পদ্ধতি (Holger Nielsen method)

রোগীর অবস্থান—প্রথমে সমতল মেঝের উপর আহত ব্যক্তিকে উবুড় করিয়া শোয়াও। রোগীর কপালের নীচে তাহার একটি হাতের উপর আর একটি হাত রাখ। মাথা একদিকে সামান্য কাত করিয়া রাখ যাহাতে নাক ও মুখ খোলা থাকে।

প্রতিবিধানকারীর অবস্থান—রোগীর গলার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ডান হাঁটুটি এমনভাবে মুড়িয়া বসিবে যেন উহা আহত ব্যক্তির মাথা হইতে অনধিক ১২ ইঞ্চি দূরে থাকে। বাম পাটি গোড়ালির উপর ভর করিয়া আহত ব্যক্তির
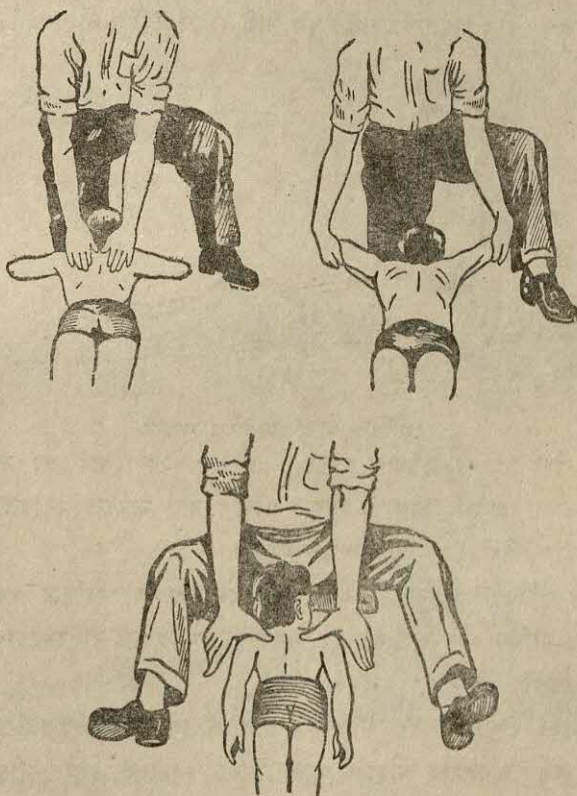
হলজার নিলসেন পদ্ধতি (শিশুদের ক্ষেত্রে)

কনুইর নিকটে রাখিবে। প্রতিবিধানকারী এইবার আহত ব্যক্তির পিঠে এমনভাবে হাত দুইখানি রাখিবে যাহাতে তাহার হাতের গোড়ালি রোগীর কাঁধের উপর থাকে।

সঞ্চালন—হাত দুইখানি সোজা রাখিয়া প্রতিবিধানকারী ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিবে, তাহার দেহের সকল ভার হাতের উপর ন্যস্ত হওয়া চাই। এইরূপভাবে দুই সেকেণ্ড সঞ্চালন চলিবে এবং প্রতিবিধানকারী মুখে 'এক', 'দুই' গুণিবে। চাপের ফলে আহত ব্যক্তি নিঃশ্বাস ত্যাগ (Expiration) করিবে।

প্রতিবিধানকারী এক সেকেণ্ডের ভিতর 'তিন' গুণিয়া লইয়া পিছনে হেলিবে এবং আহত ব্যক্তির কনুইর নিকট বাহুর উর্ধ্বাংশ ধরিবে। মুখে 'চার', 'পাঁচ' গুণিয়া লইয়া আপনার বাহুদ্বয় সোজা ও দৃঢ় রাখিয়া আহত ব্যক্তির বাহু টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। তবে এই বাহু টানিয়া তুলিবার সময় প্রতিবিধানকারী সর্বদা সতর্ক থাকিবে যাহাতে রোগীর বুক মাটি হইতে উঠিয়া না পড়ে। এইরূপ
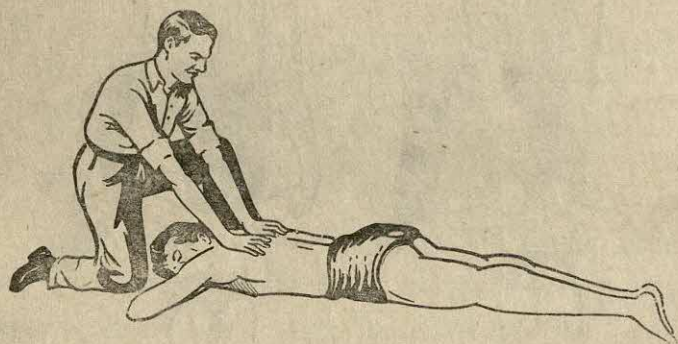
রোগীর ও প্রতিবিধানকারীর অবস্থান

সঞ্চালন শ্বাস গ্রহণের সহায়ক হইবে। এইবার এক সেকেণ্ডের মধ্যে 'ছয়' গুণিয়া লইয়া প্রতিবিধানকারী আহত ব্যক্তির বাহু মাটিতে নোয়াইয়া দিবে এবং পুনরায় প্রথম হইতে সঞ্চালন শুরু করিবে।

সমস্ত প্রক্রিয়াটি একবার চালাইতে ছয় সেকেণ্ড সময় লাগিবে এবং যতক্ষণ না আহত ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়া শুরু হয় অথবা চিকিৎসক মৃত বলিয়া ঘোষণা করে, ততক্ষণ এই ক্রিয়া চালাইয়া যাইতে হইবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে কাঁধের উপর কম চাপ প্রয়োগ করিতে হয় এবং হাতের তালুর বদলে কেবলমাত্র আঙ্গুলের মাথা দিয়া চাপ দিলেই চলে। পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুর মাথার নীচে একটি বালিশ দিতে হয় এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপ দিলেই চলে। শ্বাস ত্যাগের জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া কাঁধের উপর দুই সেকেণ্ড ধরিয়া চাপ দিবে এবং তারপর আবার শ্বাস গ্রহণের জন্য কাঁধ তুলিয়া ধরিবে।

হলজার নিলসেন পদ্ধতিতে সঞ্চালন ক্রিয়া—

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে মিনিটে ১০ বার

পাঁচ বৎসরের অধিক শিশুদের ক্ষেত্রে মিনিটে ১২ বার

অনধিক পাঁচ বৎসর বয়স্কদের ক্ষেত্রে মিনিটে ১৫ বার
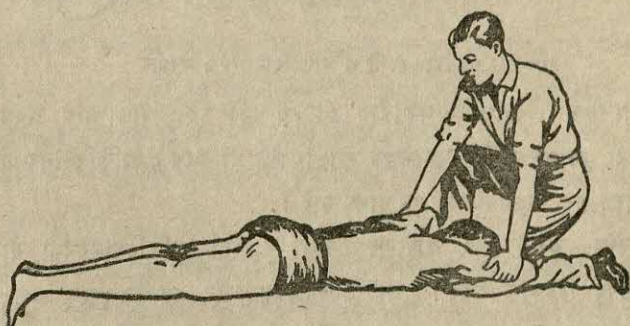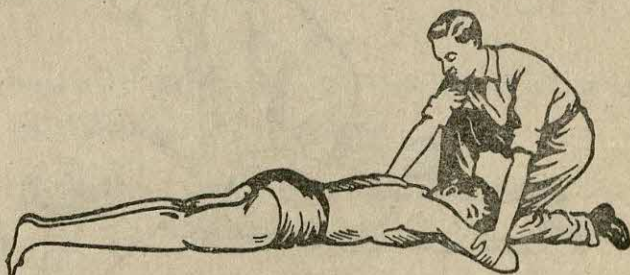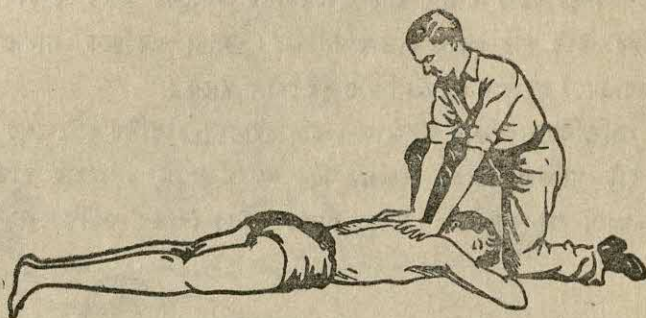
উপরে প্রথম সঞ্চালন, মধ্যে দ্বিতীয় সঞ্চালন, শেষে তৃতীয় সঞ্চালন

হলজার নিলসেন পদ্ধতিতে চাপের পরিমাণ—

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ২৪-৩০ পাউণ্ড

কিশোর ও রোগা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ১২-১৪ পাউণ্ড

শিশুদের ক্ষেত্রে ২-৪ পাউণ্ড চাপ দিতে হয়।

শেফারের পদ্ধতি (Schafer's method)

রোগীর অবস্থান—প্রথমে গলায় আঙ্গুল দিয়া গলগহ্বর পরিষ্কার কর। তারপর রোগীর মুখ নীচের দিকে করিয়া তাহাকে উবুড় করিয়া শোয়াও। বুকের নীচে একটি বালিশ রাখ এবং রোগীর কপালের নীচে তাহার একটি হাতের উপর আর একটি হাত স্থাপন কর। মাথা একদিকে সামান্য কাত করিয়া দিতে হইবে যাহাতে নাক ও মুখ খোলা থাকে।

প্রতিবিধানকারীর অবস্থান—প্রতিবিধানকারী রোগীর কটিদেশের নিকটে দুই হাঁটু গাড়িয়া বসিবে। রোগীর নিম্ন পঞ্জরাস্থির উপর তাহার হাত দুইটি এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে উহা রোগীর শ্রোণীচক্রের উপরে
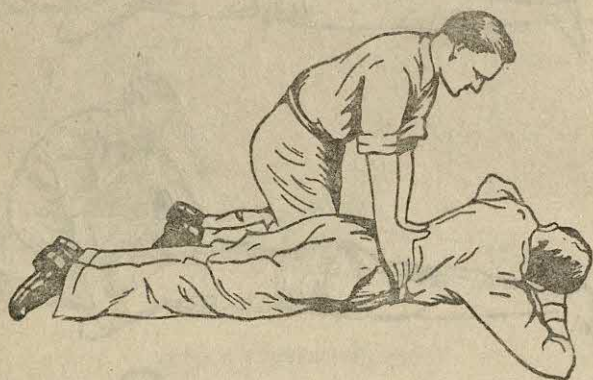
শেফারের পদ্ধতিতে রোগী ও প্রতিবিধানকারীর অবস্থান

আসিয়া না পড়ে। প্রতিবিধানকারীর হাতের কব্জি দুইটি পাশাপাশি অবস্থান করিবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটিও যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকিবে। প্রতিবিধানকারীর কনুই সোজা এবং অগ্র বাহুদ্বয় দৃঢ় থাকা চাই।

সঞ্চালন—কনুই এবং কটিদেশ সোজা রাখিয়া প্রতিবিধানকারী ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিবে। তাহার শরীরের ভারে রোগীর দেহে তলপেটে এবং মধ্যচ্ছদায় (diaphragm) চাপ পড়িবে। দুই সেকেণ্ড ধরিয়া এইরূপ চাপ পড়িবে এবং চাপ পাইয়া রোগীর ফুসফুসে জল থাকিলে জল এবং তৎসঙ্গে বায়ুও বাহির হইয়া যাইবে এবং রোগী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে।

প্রতিবিধানকারী এইবার ধীরে ধীরে পিছনের দিকে হেলিয়া পায়ের গোড়ালির উপর বসিয়া তিন সেকেণ্ড ধরিয়া চাপ শিথিল করিতে থাকিবে।

এই চাপ শৈথিল্যের ফলে তলপেটের যন্ত্রগুলি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং মধ্যচ্ছদা অবনত হইবে। ইহার ফলে শ্বাসক্রিয়া শুরু হইবে। ১৫ হইতে
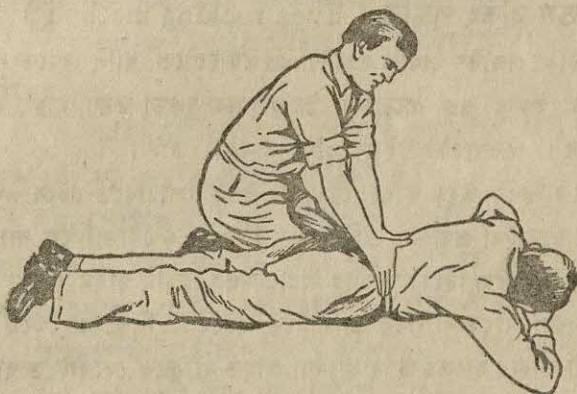
শেফারের পদ্ধতি

১৮ বার সঞ্চালন কার্য চালাইবে। জলমগ্ন ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়া চালু করিবার পক্ষে শেফারের পদ্ধতিই সবচেয়ে কার্যকরী ও উৎকৃষ্ট পন্থা।

সিলভেস্টার পদ্ধতি (Silvester's method)

রোগীকে যখন কোন কারণে উবুড় করা অসম্ভব তখন সিলভেস্টারের কৃত্রিম পদ্ধতি অনুযায়ী শ্বাসক্রিয়া ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে।

আহত ব্যক্তির অবস্থান—সমতল স্থানে আহত ব্যক্তিকে চিত করিয়া শোয়াও এবং তাহার পিঠের নীচে এমনভাবে একটি বালিশ কিংবা বস্ত্রখণ্ড ঠেস দিয়া রাখ যাহাতে তাহার মাথা পিছনের দিকে হেলিয়া থাকে। রোগীর জিহ্বা উল্টাইয়া গিয়া শ্বাসনালী অবরুদ্ধ হইতে পারে তাই রোগীর জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া রাখ।

সঞ্চালন—রোগীর মাথার নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার অগ্রবাহু দুইটি বুকের উপর রাখ এবং কনুইর নীচে বাহু দুইটি ধর। তারপর তীব্রবেগে বাহুদ্বয় এইরূপভাবে টান যাহাতে আহত ব্যক্তির কনুই দুইটি ভূমি স্পর্শ করে। এইরূপ সঞ্চালনের ফলে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করিবে।

এইবার রোগীর ভাঁজ করা বাহু দুইটি ভিতরে আনিয়া বাহুদ্বয় ও কনুই দৃঢ়ভাবে দুই দিক হইতে বক্ষাস্থির উপরে চাপিয়া ধর। ইহাতে ফুসফুস হইতে বায়ু নির্গত হইয়া যাইবে।

সমস্ত প্রক্রিয়াতে মোট ৫ সেকেণ্ড সময় লাগিবে—প্রথম সঞ্চালনে ৩ সেকেণ্ড এবং দ্বিতীয় সঞ্চালনে দুই সেকেণ্ড।

ইভস্ রকিং পদ্ধতি (Eve's rocking method)

ইভস্ রকিং পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা এই যে ইহাতে খালি হাতে সঞ্চালন সম্ভব নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন স্ট্রেচার অথবা চওড়া তক্তা, মাচা, ব্যাণ্ডেজ এবং প্যাডিং। এতদ্ব্যতীত দুইজন প্রতিবিধানকারী চাই।

আহত ব্যক্তিকে উবুড় করিয়া স্ট্রেচারের উপর শোয়াইতে হইবে এবং হাত দুইটি মাথা ছাড়াইয়া প্রসারিত করিয়া দিবে। কব্জি ও গোড়ালিকে প্যাড দিয়া স্ট্রেচারের সঙ্গে বাঁধিয়া দিবে। তারপর মাচার উপর স্ট্রেচার স্থাপন করিয়া মিনিটে ১২ বার করিয়া আহত ব্যক্তিকে দোলাইতে হইবে। শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি-বিধানকারী তাহার হাতের উপর রাখিয়া আহত ব্যক্তিকে দোলাইতে পারে।

জলে ডোবা (Drowning)

জলমগ্ন ব্যক্তির প্রথমেই উপরে কথিত যে কোন একটি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া চলিতে থাকাকালে পার্শ্ববর্তী লোকদের রোগীর দেহ হইতে সিক্ত বস্ত্র অপসারণ করিয়া উহা শুষ্ক বস্ত্রে আবৃত করিয়া দিতে বলিবে। সিক্ত বস্ত্র অপসারণ করিবার জন্য কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া বন্ধ রাখিবে না।

মচকাইয়া যাওয়া ও মাংসপেশীতে টান পড়া (Sprains and strains)

মচকাইয়া যাওয়া আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দেহের বিভিন্ন সংযোগস্থল, যেমন—পায়ের গোড়ালি, হাতের কব্জি, হাতের আঙ্গুল ইত্যাদি আমাদের মাঝে মাঝে মচকাইয়া থাকে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে মচকাইয়া যাওয়া কাহাকে বলে? কোন আকস্মিক আঘাতের ফলে আমাদের হাড়ের সন্ধিস্থানের চারিদিককার স্নায়ুতন্তুর উপর অত্যধিক টান পড়িয়া স্নায়ুতন্তুগুলি অথবা সন্ধিবন্ধনীগুলি (Ligaments) ছিঁড়িয়া যায়। হাড় যদি না ভাঙ্গে অথবা স্থানচ্যুত না হয় তবে হাড়ের সংযোগস্থলের এই তন্তুগুলি ছিঁড়িয়া যাওয়াকেই বলে মচকান (Sprain)।

মচকাইবার লক্ষণ—(১) সন্ধিতে ব্যথা অনুভূত হইবে।

(২) সন্ধি নড়াইবার চেষ্টা করিলে ব্যথা লাগিবে।

(৩) মচকানো স্থানটি স্ফীত ও বিবর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রতিবিধান—(১) রোগীকে মচকানো স্থানটি সামান্য তুলিয়া ধরিতে বল এবং উহা নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ কর।

(২) মচকানো স্থানটি উন্মুক্ত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধ।

(৩) ব্যাণ্ডেজ ভিজাইয়া বাঁধিবে এবং শুকাইয়া আসিলে পুনর্বার ভিজাইয়া দিবে।

(৪) বাড়ির বাহিরে পায়ের গোড়ালি মচকাইলে জুতা না খুলিয়া বাংলা ৪ সংখ্যার মত দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাও।

মাংসপেশীতে টান পড়া (Strains)—মচকান ভিন্ন কখনও কখনও মাংসপেশীতে টান পড়িতেও দেখা যায়। হার্নিয়া হইলে কিংবা অন্য কোন কারণে কুচকিতে যে টান পড়ে তাহা মাংসপেশীর এই টান হইতে স্বতন্ত্র।

মাংসপেশীতে টান পড়িবার লক্ষণ—(১) তীব্র বেদনা অনুভূত হইবে।

(২) মাংসপেশী স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে।

(৩) পিঠের পেশীতে টান পড়িলে আহত ব্যক্তি মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

প্রতিবিধান—(১) রোগীকে আরামদায়ক অবস্থায় রাখিতে চেষ্টা কর।

(২) আহত অঙ্গ ঠেস দিয়া রাখিতে বল।

অস্থিভঙ্গ (Fracture)

আকস্মিক কোন আঘাতে বা চাপে হাড় ভাঙ্গিয়া বা ফাটিয়া যাওয়ার নাম অস্থিভঙ্গ বা 'ফ্রাকচার'। বিভিন্ন কারণে অস্থি ভাঙ্গিতে পারে। অস্থি ভাঙ্গিবার কারণ :—

(১) অস্থিতে প্রত্যক্ষভাবে কোন আঘাত লাগিলে উহা ভাঙ্গিতে পারে। পতনের ফলে, চাকায় পিষিয়া কিংবা কোন ভারি জিনিসের আঘাত লাগিয়া ইত্যাদি নানাভাবে প্রত্যক্ষ উপায়ে অস্থি ভাঙ্গিতে পারে।

(২) পরোক্ষ আঘাতেও অস্থি ভাঙ্গিতে পারে। যে স্থানে আঘাত লাগিয়াছে সেখানে না ভাঙ্গিয়া যদি অন্য স্থানের অস্থি ভাঙ্গে তবে তাহাকে পরোক্ষ উপায়ে অস্থি ভাঙ্গা বলে। পায়ের উপর ভর দিয়া পতনের ফলে যদি হাঁটুর অস্থি ভাঙ্গে তবে উহা পরোক্ষ অস্থিভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে।

(৩) এতদ্ব্যতীত পৈশিক ক্রিয়ার ফলে অঙ্গের সংলগ্ন মাংসপেশীগুলির প্রবল সঙ্কোচন হয় এবং তাহার ফলে অস্থি ভাঙ্গিতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের অস্থিভঙ্গ—অস্থি সর্বদা একরূপে ভাঙ্গে না। অস্থি-ভঙ্গের প্রকার ভেদ আছে।

(১) **সরল অস্থিভঙ্গ** (Simple or closed)—এইরূপ ভঙ্গে শুধু অস্থি ভাঙ্গিয়া থাকে, আঘাতের স্থানে কোন ক্ষত থাকে না।
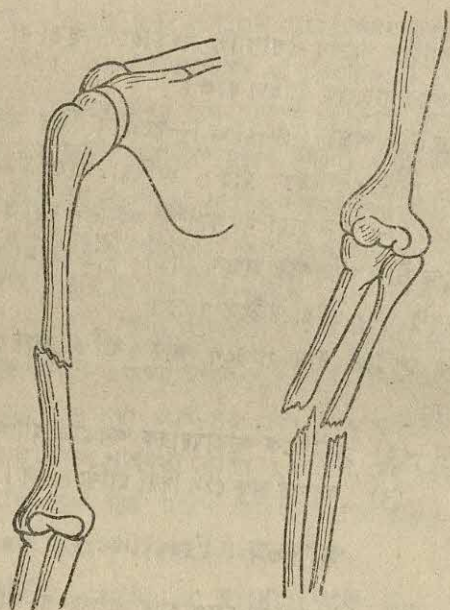
সরল অস্থিভঙ্গ মিশ্র অস্থিভঙ্গ

(২) **মিশ্র ভঙ্গ** (Compound or open)—এইরূপ ক্ষেত্রে অস্থি ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন স্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় এবং বাহিরের রোগ-জীবাণু ঐ ক্ষতস্থান দিয়া সহজেই আহত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে।

(৩) **জটিল ভঙ্গ** (Complicated)—এইরূপ ক্ষেত্রে অস্থিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শারীরযন্ত্র, যথা—মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি আহত হয়। জটিল অস্থিভঙ্গ সরল কিংবা মিশ্র হইতে পারে।

(৪) **বহু ভঙ্গ** (Comminuted)—একই অস্থি, কয়েকটি টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

(৫) **পরস্পর সংবিদ্ধ অস্থিভঙ্গ** (Impacted)—ভগ্ন অস্থির অগ্রভাগ অপর অস্থির মধ্যে প্রবেশ করে।

(৬) **গ্রীনস্টিক ফ্রাকচার** (Green stick fracture)— অস্থি না ভাঙ্গিয়া বাঁকিয়া অথবা ফাটিয়া যায়। সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটে।

(৭) **ডিপ্রেস্‌ড ফ্রাকচার** (Depressed fracture)—মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া নীচের দিকে বসিয়া যাওয়াকে বলে ডিপ্রেসড ফ্রাকচার।

অস্থিভঙ্গের লক্ষণ—অস্থি ভাঙ্গিলে আঘাতের স্থানটিতে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইবে এবং স্থানটি নাড়াচাড়া করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইবে। ভগ্ন অস্থি-র চারিপাশে ফুলিয়া উঠিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ভগ্ন অস্থি স্থানভ্রষ্ট হয় বলিয়া স্থানটি অসম ও অস্বাভাবিক দেখায়।

অস্থিভঙ্গের প্রতিবিধান—অস্থিভঙ্গে প্রতিবিধানকারীর প্রথম কাজ হইল আহত অঙ্গটি স্বাভাবিকভাবে স্থাপন করা। স্বাভাবিকভাবে সংস্থাপন করিতে পারিলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা সহজ হয়। ব্যাণ্ডেজ ও স্প্লিন্ট এই দুইটি জিনিসের সাহায্যে ভগ্ন অস্থিকে স্থিতিশীল রাখা যাইতে পারে।

ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার—ঠিক অস্থিভঙ্গের স্থানটিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে না। ব্যাণ্ডেজ কখনও এমনভাবে আঁট করিয়া বাঁধিবে না যাহাতে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হইতে পারে। গোড়ালি ও হাঁটু একসঙ্গে বাঁধিতে হইলে প্রথমে প্যাড দিয়া লইবে।

স্প্লিন্টের ব্যবহার—অভগ্নাস্থির উপরের ও নীচের সন্ধিস্থল মিলাইয়া বাঁধিবার জন্য স্প্লিন্ট (splint) ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। ভগ্নস্থানের বস্ত্রের উপর স্প্লিন্ট বাঁধিবে এবং সম্ভব হইলে আহত অঙ্গ ও স্প্লিন্টের মাঝখানে প্যাড বা পটি দিয়া লইবে। স্প্লিন্ট যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া উচিত। ছাতা, লাঠি, কাঠের টুকরা বা কার্ডবোর্ড ইত্যাদি যে কোন শক্ত জিনিসই স্প্লিন্টরূপে ব্যবহার করা চলে।

দেহের বিভিন্ন অংশের অস্থিভঙ্গ

মাথা, হাত, পা, কোমর, মেরুদণ্ড, বুকের পাঁজরা ইত্যাদি দেহের নানা অংশ নানাভাবে ভাঙ্গিতে পারে। অস্থিভঙ্গের পূর্ণ চিকিৎসা প্রতিবিধানকারীর পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। ইহার জন্য সর্বদা চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হয়। তবে চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার পূর্ব পর্যন্ত রোগীর অবস্থার যাহাতে অবনতি না ঘটে সেইজন্য পার্শ্ববর্তী লোকেদের চেষ্টা করা উচিত। দেহের কোন্ অংশের অস্থিভঙ্গের কিরূপ প্রতিবিধান দেওয়া যায় সেই সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা হইল। প্রথমেই ধর মস্তক ভঙ্গের কথা।

হস্ত-ভঙ্গ—আমরা সচরাচর হাত ভাঙ্গার ঘটনা শুনিতে পাই। হাতকে আমরা মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—অগ্রবাহু ও উর্ধ্ববাহু।

অগ্রবাহু-ভঙ্গ (Fracture of the Forearm)—অগ্রবাহুতে একটি বা একাধিক অস্থি ভাঙ্গিতে পারে। একাধিক অস্থি না ভাঙ্গিলে আঘাতের স্থানে অসমতা প্রকাশ পায় না।

উর্ধ্ববাহু-ভঙ্গ (Fracture of the Upper Arm)—উর্ধ্ববাহু তিন জায়গায় ভাঙ্গিতে পারে—কাঁধের নিকট, মধ্যস্থলে এবং কনুই অথবা কনুইর নিকটে।

অগ্রবাহুর অস্থিভঙ্গের প্রতিবিধান—অগ্রবাহু ভঙ্গের ক্ষেত্রে বাহু স্থিতিশীল রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। উর্ধ্ববাহুর সঙ্গে সমকোণ করিয়া বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাতখানি স্থাপন কর। কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত অগ্রবাহুর সামনে ও পশ্চাতে একটি স্প্লিণ্ট দিয়া লইতে পার। তারপর দুইটি ব্যাণ্ডেজ—একটি ভগ্ন অস্থি-র উপর দিয়া এবং অপরটি কব্জি জড়াইয়া বাংলা ৪ সংখ্যার মত হাত ও কব্জি জড়াইয়া বাঁধিয়া দাও। তারপর একটি শ্লিংএর সাহায্যে হাতটি ঝুলাইয়া রাখ।

উর্ধ্ববাহু ভঙ্গের প্রতিবিধান—উর্ধ্ববাহু ভাঙ্গিলে সর্বপ্রথমে তাহার কনুই মুড়িয়া দিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হাতটি তাহার বুকের উপর এমনভাবে রাখ যাহাতে আঙ্গুলগুলি বিপরীত দিকের কাঁধ স্পর্শ করিতে পারে। জামাকাপড় অপসারণের প্রয়োজন নাই। উর্ধ্ববাহু ও বুকের মাঝখানে প্যাডিং দিয়া দুইটি চওড়া ব্যাণ্ডেজ দিয়া হাতটি বুকের সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধ। তারপর কলার ও কাফ শ্লিং দিয়া হাতটি এমনভাবে ঝুলাইয়া দাও যাহাতে কব্জিতে চাপ না পড়ে। কব্জির নিকটে অস্থি ভাঙ্গিলে কনুই মুড়িয়া দিয়া উপরোক্ত পদ্ধতিতে প্রতিবিধান চালাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে শ্লিং দিয়া হাতটি ঝুলাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রোণীচক্র ভঙ্গ (Fracture of the Pelvis)—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকার আঘাতে এই অস্থি ভাঙ্গিতে পারে। শ্রোণীচক্র ভাঙ্গিলে দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি বিশেষত মূত্রাশয় ও মূত্রনালী প্রভৃত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। ইহা ভাঙ্গিলে নিতম্ব ও কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হয়। নড়াচড়া ও কাশিতে এই যন্ত্রণা বাড়ে। রোগী দাঁড়াইতে পারে না এবং তাহার

আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হইতে পারে। রোগীর প্রস্রাবের ইচ্ছা জাগে এবং রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে প্রস্রাবের রং কালো দেখায়।

প্রতিবিধান—রোগীকে হাঁটু সোজা রাখিয়া চিত করিয়া শোয়াও। রোগী হাঁটু মুড়িতে চাহিলে হাঁটুর নীচে একটি কম্বল ভাঁজ করিয়া দিবে। প্রস্রাবের বেগ প্রবল না হইলে প্রস্রাব করিতে দিও না। সত্বর চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

নিম্ন উপাঙ্গ (Lower Limb) **ভঙ্গ**—উর্ধ্ব উপাঙ্গের (upper limb) মতই নিম্ন উপাঙ্গ ভঙ্গের ঘটনা বিরল নয়। উরু (thigh bone), জানুফলক (knee-cap), পদ (leg) এবং পায়ের অঙ্গুলি (foot)—এই চার স্থানে নিম্ন উপাঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে।

উরুভঙ্গ—উরুর অস্থি যে কোন স্থানে ভাঙ্গিতে পারে। উরুর অস্থিভঙ্গ গুরুতর আপৎকালীন অবস্থা বলিয়া ধরিবে, কারণ, ইহাতে গুরুতর স্নায়বিক আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে। এই অস্থি ভাঙ্গিলে পা কাঁধ হইতে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত ছোট হইয়া যাইতে পারে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সহজেই উরুর অস্থি ভাঙ্গিতে পারে।

জানুফলক ভঙ্গ—জানুফলক ভাঙ্গিয়া দুইভাগে বিভক্ত হয় এবং উহাদের মাঝখানে ফাঁক অনুভব করা যায়। আহত স্থানটি স্ফীত ও অসম হইয়া উঠে।

পদ ভঙ্গ—পায়ের এক বা একাধিক অস্থি ভাঙ্গিতে পারে। দুইটি অস্থি ভাঙ্গিলে তবেই অস্থিভঙ্গের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায়। গোড়ালির দুই তিন ইঞ্চি উপরের অস্থি ভাঙ্গিলে গোড়ালি মচকাইয়াছে বলিয়া ভুল হইতে পারে।

পিষ্ট পদ (Crushed foot)—পায়ের উপর কোন ভারি জিনিস পতনের ফলে অঙ্গুলি পিষ্ট হইয়া বা থেঁতলাইয়া যাইতে পারে এবং অঙ্গুলির হাড় ভাঙ্গিতে পারে।

উরু, পদ কিংবা জানুফলক ভাঙ্গিলে আহত ব্যক্তিকে চিত করিয়া শোয়াইবে। তারপর আঘাতের স্থানে স্প্লিন্ট লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। ভগ্নস্থান নিয়া বেশী নাড়াচাড়া করিও না। সত্বর চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

পিষ্ট পদের প্রতিবিধান—

পদ পিষ্ট হইয়া ক্ষতের সৃষ্টি হইতে পারে। ক্ষত দেখা দিলে প্রথমেই পায়ের জুতা মোজা খুলিয়া ফেলিবে। জুতা খুলিতে অসুবিধা হইলে উহা কাটিয়া ফেলিবে। তারপর আহত পাখানি তুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে এবং ক্ষতের চিকিৎসা চালাইবে। পা স্থিতিশীল রাখিবার জন্য একটি স্প্লিন্ট লাগাইয়া বাংলা ৪ সংখ্যার মত একটি ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ কর।

পায়ে ক্ষত সৃষ্টি না হইলে জুতা মোজা খুলিবার প্রয়োজন নাই। আহত পাখানি উঁচু করিয়া রোগীকে আরামদায়ক ভঙ্গীতে রাখিতে বল।

সন্ধিচ্যুতি (Dislocation)

দেহের কোন সন্ধিস্থল হইতে কোন অস্থি স্থানভ্রষ্ট হইলে তাহাকে বলে সন্ধিচ্যুতি। সাধারণত কনুই, কাঁধ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গুলি ও নিম্ন চোয়ালে সন্ধিচ্যুতি ঘটিতে দেখা যায়। সন্ধিচ্যুতি ঘটিলে সন্ধির উপরে বা নিকটে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। সন্ধিতে আড়ষ্টভাব দেখা দেয় এবং রোগীর সন্ধি নাড়াইতে কষ্ট হয়। অঙ্গের গঠনে অসমতা দেখা দেয় এবং বিকৃতি প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত সন্ধিস্থান স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে।

প্রতিবিধান—স্থানভ্রষ্ট অস্থি স্বস্থানে রাখিবার চেষ্টা করিও না। রোগীর যেভাবে আরাম হয় সেইভাবে তাহাকে শোয়াইয়া দাও। আহত অঙ্গটি বালিশে ঠেস দিয়া রাখিবার ব্যবস্থা কর এবং চিকিৎসকের সাহায্য লও।

আঘাত (Injury)

কোন বিজাতীয় বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া যে শারীরিক বিপর্যয় ঘটে তাহারই নাম আঘাত। কাটিয়া গিয়া, অস্থি ভাঙ্গিয়া, মাংসপেশী মচকাইয়া বা ছিঁড়িয়া গিয়া ইত্যাদি নানাভাবে আমরা আঘাত পাইয়া থাকি। এই সকল আঘাত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক আঘাত (Electric injury) এবং পিষ্ট হইবার ফলে আঘাতের (crush injury) আলোচনা করিব।

বৈদ্যুতিক আঘাত—বিদ্যুৎ প্রবাহ দেহে প্রবেশ করিয়া গুরুতর আঘাতের সৃষ্টি করিতে পারে। অনাবৃত ও সতেজ বৈদ্যুতিক তার, কেব্‌ল

(cable) অথবা বজ্রপাতের সংস্পর্শে আসিলে শরীরে বৈদ্যুতিক আঘাত লাগে। এই আঘাত মৃদু কিংবা গুরুতর হইতে পারে। বিদ্যুৎ প্রবাহের তীব্রতার উপরেই আঘাতের গুরুত্ব নির্ভর করে। তীব্র বৈদ্যুতিক আঘাত আহত ব্যক্তির প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া লোক দগ্ধও হইতে পারে।

বৈদ্যুতিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতিবিধানকারীর অত্যন্ত তৎপরতা ও উপস্থিতবুদ্ধি থাকা চাই। কেননা তাড়াহুড়া করিয়া অরক্ষিত অবস্থায় রোগীকে বিদ্যুতের সংস্পর্শ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে প্রতিবিধানকারীরও মৃত্যু ঘটিতে পারে।

বৈদ্যুতিক আঘাতের প্রতিবিধান—

(১) প্রতিবিধানকারী প্রথমেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিবে। তাড়াতাড়ির সময় সুইচ খুঁজিয়া না পাইলে এবং সহজেই বাঁকানো যায় এইরূপ তারের (flexible wire) মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে প্লাগ অপসারিত করিয়া অথবা জোরে টান দিয়া তার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিন্ন করিয়া দিবে। ছুরি কিংবা কাঁচি প্রভৃতি বিদ্যুৎ আকর্ষক বস্তু দিয়া কথনও তার কাটিবার চেষ্টা করিবে না।

(২) অনেক সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সংস্পর্শ হইতে আহত ব্যক্তিকে অপসারণ করিতে হইবে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তির ছোঁয়া লাগিয়া প্রতিবিধানকারী নিজেও যাহাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট না হইয়া বসে সেইজন্য সে রবারের দস্তানা (gloves) পরিয়া অথবা রবারের সোল দেওয়া জুতা পরিয়া লইয়া বিদ্যুৎ অপরিবাহী যন্ত্র, যথা—কাঠের শুষ্ক লাঠি, শুষ্ক বোর্ড অথবা শুষ্ক দড়ির সাহায্যে রোগীকে মুক্ত করিয়া লইবে। রবারের জুতা তৎক্ষণাৎ না পাওয়া গেলে কাঠের টুল, কার্পেট, কম্বল অথবা সংবাদপত্রের মোড়কের উপর দাঁড়াইয়া লইয়া বিদ্যুৎ অপরিবাহী যন্ত্রের সাহায্যে রোগীকে মুক্ত করা যায়।

(৩) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তির অনেক সময় শ্বাসক্রিয়া রোধ হইয়া যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে স্নায়বিক আঘাত দেখা দেয়, কাহারও বা অঙ্গ পুড়িয়া যায়। এই অবস্থায় সর্বপ্রথম রোগীর স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্য কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবে। প্রয়োজন হইলে স্নায়বিক আঘাতের চিকিৎসা চালাইবে এবং দেহের কোন অংশ পুড়িয়া গেলে দহনের চিকিৎসা করিবে।

(৪) আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠাইবে অথবা কোন চিকিৎসক দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লইবে। কারণ, বাহ্যত রোগীকে সুস্থ বলিয়া মনে হইলেও পুনরায় রোগীর দেহে আঘাতের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

পিষ্ট হইবার ফলে আঘাত (Crush injury)

দেহের উপর কোন ভারী জিনিসের পতনের ফলে পিষ্ট অঙ্গের মাংসপেশীতে গুরুতর আঘাতের সৃষ্টি হইতে পারে এবং অস্থিভঙ্গ না হইলেও আঘাতের স্থানের নরম তন্তুগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আঘাত গুরুতর হইলে ক্ষতিগ্রস্ত মাংসপেশী হইতে একপ্রকার বর্জ্য পদার্থের (waste product) উৎপত্তি হয়। ঐ পদার্থসকল মূত্রগ্রন্থির সমূহ ক্ষতিসাধন করে। চিকিৎসকের সাহায্য পাইতে বিলম্ব ঘটিলে প্রতিবিধানকারী প্রথমেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রোগীকে প্রচুর জল পান করিতে দিবে। বমি ভাব দেখা দিলে বমি রোধ করিবার জন্য চা, কফি কিংবা দুধ ধীরে ধীরে পান করিতে দেওয়া চলিতে পারে। আহত অঙ্গে কোনরূপ গরম সেঁক দিবে না এবং আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটি উঠাইয়া রাখিবে।

অজ্ঞান অবস্থা, মূর্চ্ছা ও তড়কা (Fainting, Fits and Convulsion)

অজ্ঞান অবস্থা (Fainting)—

অনেক সময় অত্যধিক গরম, ক্ষুধা, ক্লান্তি বা দুর্বলতাবশত মস্তিষ্কে রক্তের সরবরাহ কমিয়া যায়। মস্তিষ্কে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত সরবরাহ না হইলে কিংবা রক্তের চাপ কমিয়া গেলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ভয় পাইলে বা হঠাৎ কোন দুঃসংবাদ শুনিলে অথবা দেহে কোন ভীষণ বেদনা উপস্থিত হইলে রক্তের চাপ কমিয়া যাইতে পারে। উত্তপ্ত বা বদ্ধস্থানে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে কিংবা কোন কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হইলেও লোক অজ্ঞান হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত মৃগী রোগেও অজ্ঞান অবস্থা দেখা যায়।

অজ্ঞান অবস্থার লক্ষণসমূহ—অজ্ঞান হইবার পূর্বে রোগীর মাথাধরা ও চলাফেরায় কষ্ট প্রকাশ পাইতে পারে। অজ্ঞান হইবার পরে মুখমণ্ডল সাধারণত রক্তশূন্য ও পাণ্ডুর দেখায়। দেহচর্ম ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে। নাড়ি দুর্বল ও মন্থর গতিতে চলে এবং শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

প্রতিবিধান—কোন ব্যক্তি অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিলে তাহার মাথা দ্রুত নীচের দিকে নামাইয়া দিবে। রোগী যদি বসিয়া থাকে তবে হাঁটুর

মধ্যে মাথা রাখিয়া পা পর্যন্ত ঝুলাইয়া দিবে। স্মেলিং সল্ট প্রয়োগ করিবে। রোগীর গলা, বুক ও কোমরের কাপড় ঢিলা করিয়া দিবে এবং রোগীর মুখে কৃত্রিম দাঁত থাকিলে তাহাও খুলিয়া ফেলিবে। রোগী যাহাতে যথেষ্ট মুক্ত বায়ু পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। অত্যধিক ভিড়ের চাপে রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে ভিড় সরাইয়া দিবে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হইতে রোগীকে অপসারিত করিয়া যেখানে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যাইতেছে সেখানে নিয়া আসিবে। আরোগ্যলাভের পর রোগীকে সামান্য গরম পানীয় দাও।

রক্তক্ষরণহেতু রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে প্রথমেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চেতনা ফিরাইয়া আনিবার প্রতিবিধান চালাইবে।

মূর্চ্ছা (Fits)—মূর্চ্ছা যাইবার নানাবিধ কারণ আছে—মৃগীরোগ তাহাদের অন্যতম। মৃগীরোগ দুই ধরনের—সামান্য (minor) ও গুরুতর (major)। সামান্য রকম মৃগী রোগে চোখের তারা স্থির হইয়া যায় এবং রোগী সাময়িক-ভাবে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয়। গুরুতর মৃগীরোগের মূর্চ্ছা বহুক্ষণ ধরিয়া থাকে। রোগী নিজেই বুঝিতে পারে সে মূর্চ্ছা যাইবে। রোগীর মাথাধরা, উত্তেজনা ও অবসাদ দেখা দেয়। মূর্চ্ছিত অবস্থায় রোগীর চারিটি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়—

(১) রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে থাকে।

(২) রোগী প্রথমে কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া শক্ত হইয়া থাকে এবং তাহার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করে।

(৩) অতঃপর তড়কা (convulsion) শুরু হয়। মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হয় এবং রোগী মলমূত্রের বেগ ধারণে অক্ষম হয়। এইরূপ অবস্থায় রোগী আপনার জিহ্বা কামড়াইতে পারে এবং হাতের নিকট কোন জিনিস পাইলে তাহার দ্বারা নিজেকে আঘাত করিয়া বসিতে পারে।

(৪) কিছুক্ষণ পরে তড়কা বন্ধ হইয়া গেলে রোগী হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং অস্বাভাবিকভাবে হাত পা ছুঁড়িতে থাকে।

মৃগীরোগ ব্যতীত কোন মানসিক উত্তেজনার ফলেও রোগীর কার্যকলাপ সাময়িকভাবে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। সাধারণত দুর্বলচিত্ত লোকদের এইরূপ মানসিক আবেগে মূর্চ্ছা যাইতে দেখা যায়। এই ধরনের মূর্চ্ছাকে বলে

এবং কয়েকবার এইভাবে নীচের পাতা বুলাইয়া আনিলে পদার্থটি বাহির হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল না হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিবিধান কর :—

আহত ব্যক্তিকে আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসাও এবং তাহার মাথা তোমার বুকের উপর চাপিয়া ধর। এইবার এক হাতে একটি দেশলাই-এর
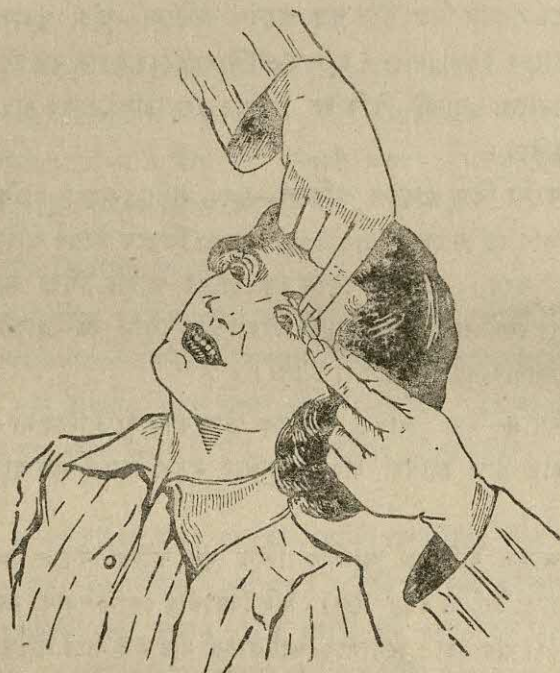
চোখের মধ্যে কিছু বিজাতীয় পদার্থ পড়িলে এইরূপে উহা বাহির করিবে

কাঠি উপরের পাতার উপর এক কিনারায় চাপিয়া ধর এবং অন্য হাত দিয়া উপরের পাতা উল্টাইয়া দাও। তারপর রুমালের কোণ জলে ভিজাইয়া বস্তুটি বাহির করিয়া আন।

(ঘ) অনেক সময় বিজাতীয় বস্তুটি চলিয়া গেলেও চোখের ভিতর একটা দারুণ অস্বস্তি হইতে থাকে। এইরূপ অস্বস্তি বোধ করিলে এবং চোখের ভিতর কোন পদার্থ না দেখা গেলে চোখে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দাও।

(ঙ) চোখে এলকালি (Alkali) অথবা দাহক অ্যাসিড (corrosive acid) পড়িলেও চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিতে হইবে। তারপর নরম

তূলার প্যাড দিয়া চোখে আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ করিয়া আহত ব্যক্তিকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর।

কানে কিছু প্রবেশ করিলে—কোন কীটপতঙ্গ প্রবেশ করিলে কানে খানিকটা অলিভ অয়েল, স্যালাড অয়েল অথবা সার্জিকাল স্পিরিট ঢালিয়া দাও। ইহাতে পতঙ্গটি ভাসিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া আসিবে। অন্য কোন কঠিন দ্রব্য প্রবেশ করিলে উহা বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া আহত ব্যক্তিকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর।

নাকের ভিতর কিছু প্রবেশ করিলে—আহত ব্যক্তিকে মুখ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাইতে বলিবে এবং বাহ্য পদার্থটি বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর।

পাকস্থলীর ভিতর কোন বস্তু প্রবেশ করিলে—অনাবধানতাবশত টাকা. পয়সা, বোতাম, আলপিন, সূঁচ ইত্যাদি পেটের ভিতর চলিয়া যাইতে পারে। রোগীকে তখন কোন কিছু খাইতে দিবে না এবং চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করিবে। মসৃণ কোন পদার্থ গিলিয়া ফেলিলে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। মলের সঙ্গে উহা বাহির হইয়া যাইবে।

গলায় মাছের কাঁটা আটকাইলে—গলায় মাছের কাঁটা আটকাইলে দারুণ অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। কখনওবা বমি হইতে পারে। মাছের কাঁটা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

শ্বাসনালীর ভিতর বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ করিলে—শ্বাসনালীর ভিতর কোন খাদ্যকণা কিংবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বস্তু আটকাইয়া যাইতে পারে। এইরূপ দুর্ঘটনা গুরুতর আপৎকালীন ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিবে কারণ, বস্তুটি শীঘ্র বাহির হইয়া না আসিলে রোগী শ্বাসরোধ হইয়া মারা যাইবে। তাই দুর্ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ করিবে। আহত ব্যক্তি যদি শিশু হয়, তবে চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার পূর্বে তাহার পা দুইখানি ধরিয়া মাথাটি নীচের দিকে রাখিয়া দেখ বস্তুটি বাহির হইয়া আসে কিনা।

জন্তু জানোয়ার ও কীট পতঙ্গের দংশন (Bites and Stings)

কুকুর, শৃগাল, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ঘোড়া, বাঁদর প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারের দংশন অত্যন্ত বিপজ্জনক কেননা এই সমস্ত পশু জলাতঙ্ক নামে একপ্রকার মারাত্মক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত কোন

পশু মানুষকে দংশন করিলে দংশিত ব্যক্তিরও ঐ রোগ হইবে। উপরোক্ত সকল পশুরই জলাতঙ্ক রোগ ছড়াইবার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু মানুষ সমস্ত পশুর তুলনায় কুকুরের সংস্রবেই বেশী আসিয়া থাকে। তাই সাধারণত কুকুরের দ্বারা মানুষের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ সংক্রামিত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পালিত কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ঘটনা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়, তবে শীতপ্রধান দেশে পালিত কুকুরকেও মানুষকে কামড়াইতে দেখা যায়। গৃহপালিত কুকুরের দংশনেও বিষ থাকে। সুতরাং প্রত্যেক কুকুর-পালকেরই নিজ নিজ কুকুর সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত।

কুকুরের দংশনের প্রতিবিধান—

(১) দংশিত ব্যক্তিকে অবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে পাঠাইবে।

(২) রক্তক্ষরণ হইতে দিবে, কেননা ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ফলে বিষ স্নায়ু বরাবর কেন্দ্রীয় স্নায়বিক প্রণালীতে চলিয়া যায়।

(৩) দংশিত স্থান নীচু করিয়া রাখিবে।

(৪) পটাশ পারমাঙ্গানেট জলের সঙ্গে মিশাইয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দাও।

(৫) যদি শীঘ্র চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায় এবং ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় তবে অবিলম্বে ক্ষতস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। তীব্র কার্বলিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিডই ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ঔষধ। দেশলাই-এর কাঠি বা অন্য কোন ছুঁচলো কাঠি অ্যাসিডে ডুবাইয়া ক্ষতস্থানের চারিপার্শ্বে বুলাইয়া দিবে। ঘটনাস্থলে অ্যাসিড না পাওয়া গেলে একটি তপ্ত শলাকা দিয়া দংশিত স্থান পোড়াইয়া দিবে। তবেই ভাইরাস ধ্বংস হইয়া যাইবে। তবে দংশনের পর আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেলে আর দগ্ধ করিবার সার্থকতা নাই।

(৬) শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া ক্ষতস্থান ড্রেসিং করিয়া দাও।

কুমীর, হাঙ্গর ও সর্পের দংশনের প্রতিবিধান—

আমাদের দেশে কুমীর, হাঙ্গর কিংবা সর্পের দংশনের ঘটনা বিরল নয়। কুমীর ও হাঙ্গরের দংশনের ফলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কি দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে পারে।

কুমীর ও হাঙ্গরের দংশনে—

(১) রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে।

(২) স্নায়বিক আঘাতের (shock) চিকিৎসা করিবে।

(৩) ক্ষতস্থান ভাল করিয়া ড্রেস করিয়া দিবে।

সর্প দংশন ঃ পৃথিবীতে প্রায় সতের শত রকমের সাপ আছে। উহাদের মধ্যে ৩৫০ শত রকমের সাপ আবার বিষধর সাপ বলিয়া গণ্য। বিষধর সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। তবে বিষধর সাপ সাধারণত লোকালয় বর্জন করিয়া চলে। যে সব সাপ সচরাচর আমরা দেখিতে পাই উহাদের দংশন মারাত্মক হয় না। তবে অত্যন্ত ভয় পাইবার ফলে দংশিত ব্যক্তির দেহে অনেক সময় স্নায়বিক আঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিষাক্ত সাপ কামড়াইলে সেই বিষ যাহাতে সমগ্র শরীরে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে সেজন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

(১) সাপ কামড়াইলে উহার বিষ রক্ত সঞ্চালনের মধ্য দিয়া সমগ্র দেহে ছড়াইয়া পড়ে। তাই প্রথমেই রক্ত চলাচল বন্ধ করিবার জন্য বাহু কিংবা উরুতে দংশিত স্থান ও হৃদ্‌যন্ত্রের মাঝামাঝি কোন স্থান খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। অগ্রবাহু বা পায়ের উপরে কখনো বাঁধিবে না। প্রায় বিশ মিনিট পর্যন্ত এই বন্ধন রাখিয়া এক মিনিট আলগা দিয়া পরক্ষণেই আবার টানিয়া বাঁধিয়া দিবে। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত এইভাবে কাজ চালাইয়া যাও।

(২) চাপিয়া বাঁধিবার পর ক্ষতস্থান পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশ্রিত জল দিয়া ধৌত করিয়া দিবে। তারপর দংশিত স্থানটির কাছাকাছি কোথাও তীক্ষ্ণ ছুরি, ক্ষুর, কিংবা ব্লেড দিয়া ¼ ইঞ্চি গভীর করিয়া চিরিয়া ফেল এবং ঐ স্থানে পটাশ পারমাঙ্গানেটের গুঁড়া ঘষিয়া দাও। যে ছুরি অথবা ব্লেড দিয়া ক্ষতস্থান চিরিবে তাহা আগুনে পোড়াইয়া লইবে কিংবা কিছুক্ষণ স্পিরিটে ভিজাইয়া লইবে।

(৩) দংশিত ব্যক্তির দেহ উত্তপ্ত রাখ এবং তাহাকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দাও।

(৪) গরম পানীয়, যথা—কড়া চা, কফি কিংবা দুধ খাইতে দাও। এই সময় মাদক দ্রব্য পান করিতে নাই।

(৫) দংশিত ব্যক্তির মন প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে। ভয় পাইলে তাহার স্নায়বিক আঘাতের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৬) যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় তবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস আনিবে।

রক্তশোষক জোঁক : জলাশয় ও জঙ্গলই হইল রক্তশোষক জোঁকের আস্তানা। রক্ত খাইয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকে। সুযোগ পাইলেই ইহারা মানুষ কিংবা জন্তুজানোয়ারের দেহ এমনভাবে কামড়াইয়া ধরে যে উহাদের ছাড়ান কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

প্রতিবিধান : (১) দেহ হইতে জোঁক ছাড়াইবার জন্য উহার শরীরে জ্বলন্ত দেশলাই বা সিগারেট চাপিয়া ধর। লবণ, চুন, পেট্রোল অথবা প্যারাফিন ঢালিয়া দিলেও জোঁক ছাড়িয়া যায়।

(২) মেথিলেটেড স্পিরিটে তুলা ভিজাইয়া দংশিত স্থান ভাল করিয়া পরিষ্কার কর।

(৩) বাই-কার্বোনেট অব সোডা, অ্যামোনিয়া অথবা কোন লোশন দিয়া জ্বালা দূর করিতে চেষ্টা কর।

(৪) শুষ্ক ড্রেসিং প্রয়োগ কর।

কীটপতঙ্গের হুল বিদ্ধ করা : পিঁপড়া, শুঁয়াপোকা, বিষাক্ত মাকড়সা, মৌমাছি, ভীমরুল, কাঁকড়া-বিছা ইত্যাদি কীট মানুষের দেহে হুল বিদ্ধ করে। এইসব কীট যে স্থানে হুল বিদ্ধ করে সেই স্থান ফুলিয়া উঠে এবং তখন স্নায়বিক আঘাতের সৃষ্টি করে। শিশুদের পক্ষে এইরূপ হুল মারাত্মক হয়। কাঁকড়া-বিছার কামড় অত্যন্ত মারাত্মক। ইহাদের হুলে হাতে পায় খিল ধরিতে পারে।

প্রতিবিধান : (১) যে স্থানে হুল বিদ্ধ হইয়াছে সেখানে বাই-কার্বনেট অব সোডা, তরল অ্যামোনিয়া অথবা এন্টিহিস্টামাইন (antihistamine) মলম লাগাও।

(২) কাঁকড়া-বিছা দংশন করিলে Scorpion antitoxin ইনজেক্‌শন দেওয়া হয়। তবে কেবল অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই ইহা দিতে পারেন।

(৩) স্নায়বিক আঘাত প্রতিরোধের চেষ্টা কর।

(৪) আমাদের দেশে বোলতা হুল ফুটাইলে ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ মধু কিংবা গোময় প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৫) শুঁয়াপোকা কামড়াইলে আহত স্থানে চুন লাগাইয়া-কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও। তারপর একটি ছুরি দিয়া ধীরে ধীরে চাঁছিয়া ফেল। দেখিবে সমস্ত হুল উঠিয়া আসিয়াছে।

বালির মাছি (Chiggers)—বালুকাময় অঞ্চলে চিগারস্ নামে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্রকায় পিঙ্গলবর্ণের মাছি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যে কোন প্রাণীর রক্ত খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং স্ত্রী-মাছিগুলি ডিম পাড়িবার জন্য গায়ের চামড়া ভেদ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে।

প্রতিবিধান—(১) কীটের উপর পেট্রোল, প্যারাফিন অথবা ক্লোরোফরম প্রয়োগ কর।

(২) একটি স্থঁচ আগুনে পোড়াইয়া কাঁটা তুলিবার মত মাছিটি বাহির করিয়া আন।

(৩) মেথিলেটেড স্পিরিট লাগাইয়া শুষ্ক ড্রেসিং কর।

ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ (Mites)—ইহাদের দংশনে গায়ে ঘামাচির মত চুলকানি বাহির হয়। সাধারণত ঘাসে এবং শস্যক্ষেত্রে ইহাদের দেখা যায় বলিয়া ইংলণ্ডে এই ধরনের কীট হারভেস্টারস্ (harvesters) নামে পরিচিত। সাধারণত দেহের নিম্নভাগে অর্থাৎ হাঁটু, পায়ের গোড়ালি ও পায়েই ইহারা দংশন চালায়।

প্রতিবিধান—(১) দেহের নিম্নভাগ ঢাকিয়া রাখ।

(২) দংশন করিলে দংশিত স্থান সাবান জলে ধুইয়া ফেলিয়া এন্টিহিস্টা-মাইন (antihistamine) মলম লাগাও।

(৩) জামাকাপড় বদলাইয়া ফেল।

(৪) বাড়িতে ডি.ডি.টি ছড়াইলে এই সকল পতঙ্গের উৎপাত কমিয়া যায়।

দেহ অসাড় হইয়া যাওয়া (Frost bite)

প্রচণ্ড শীতে দেহের কোন কোন অংশ, যেমন—হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি অসাড় হইয়া যায়। অসাড় স্থানটি প্রথমে মোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং পরে রক্তাধিক্যহেতু বেগুনী বর্ণ ধারণ করে। অনুভূতি হারাইয়া যায় বলিয়া নিকটবর্তী লোকেরা না বলিয়া দিলে রোগী নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

প্রতিবিধান—আঘাতের স্থান ঢাকিয়া দিবে এবং আঘাতের স্থানে বরফ ঘষিবে না। রোগীকে উত্তপ্ত স্থানে স্থানান্তরিত করিবে না কিংবা রোগীর দেহে বাহির হইতে উত্তাপ প্রয়োগ করিবে না। দেহের উত্তাপের সাহায্যে রোগীকে উত্তপ্ত করিয়া তোলাই সমীচীন। শীঘ্র চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সুপরিকল্পিত গৃহ-পরিচালনা

গৃহস্থালীর কাজে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা—

একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা ব্যতীত গৃহ কখনও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। পরিকল্পনা শব্দটির আজকাল বহুল প্রচলন দেখা যায়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ইত্যাদি বহু সরকারী পরিকল্পনার কথাই তোমরা শুনিয়া থাক। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য পূর্ব হইতে একটি কর্মসূচী বা কর্মপন্থা অবলম্বনের নামই পরিকল্পনা। স্বল্প সময়ের মধ্যে গৃহস্থালীর সমুদয় কাজ গুছাইয়া করিতে হইলে গৃহিণীরও একটি কার্যসূচী থাকা প্রয়োজন। কি কাজ, কতখানি সময়ের মধ্যে উহা শেষ করিতে হইবে, কাহার উপর কোন্ কাজের ভার দেওয়া হইবে এ সমস্তই গৃহস্থালীর পরিকল্পনার অন্তর্গত। গৃহিণীর কর্মপরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থান পাইবে—

(১) কাজের ধরন এবং পরিমাণ,
(২) শ্রমবিভাগ,
(৩) কাজের স্থান,
(৪) কাজের সময়,
(৫) কাজের নিয়ম।

(১) গৃহে কতখানি এবং কি ধরনের কাজ সম্পন্ন হইবে—

গৃহে কতখানি ও কি ধরনের কাজ সম্পন্ন হইবে তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে কতগুলি কাজের লোক পাওয়া যাইতেছে তাহার উপর। যে গৃহের গৃহিণীকে একাই সবদিক সামলাইতে হয় তিনি যদি গৃহের পরিজনদের জন্য প্রতিদিন পঞ্চ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা করেন কিংবা তাহার গৃহ যদি অতিরিক্ত পোশাক পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্রের ভারে ভারাক্রান্ত থাকে, তবে শুধু রান্নাঘরেই সমস্ত দিন অতিবাহিত হইবে নতুবা বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন রাখিতেই সময় চলিয়া যাইবে। বস্তুত আমাদের দেশে এরূপ গৃহিণী বিরল নয়। তাহারা নিজেদের দেহের উপর এত বেশী অত্যাচার করেন যে অচিরেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া আপনার

এবং পরিবারের বোঝা হইয়া দাঁড়ান। মোটের উপর গৃহিণীর যদি গৃহকাজে অপর কোন সাহায্যকারী না থাকে তবে তিনি তাহার পরিকল্পনায় দৈনন্দিন অতি আবশ্যক কাজগুলি ব্যতীত অন্যান্য জাজ যথাসম্ভব কমাইয়া দিবেন।

তোমরা জান প্রত্যেক গৃহিণীকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিশুপালন ও পরিবারের লোকদের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান এই পাঁচটি কাজ করিতে হয়। ইহাদের সবগুলিই আবার প্রাত্যহিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। কাজের গুরুত্ব অনুসারে গৃহিণী তাহার পরিকল্পনায় অতি আবশ্যক বিষয়গুলি দৈনন্দিন কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবেন, কতকগুলি নির্দিষ্ট যতি রাখিয়া সপ্তাহ বা পক্ষকাল অন্তর করিবেন এবং কতকগুলি কাজ আবার তাহাকে অনিয়মিতভাবে করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গৃহিণী কোন আকস্মিক কাজের জন্যও প্রস্তুত থাকিবেন।

(ক) **দৈনন্দিন কাজ** (Daily routine work)—

প্রত্যেক পরিবারেরই কতকগুলি দৈনন্দিন কাজ থাকে যেগুলি কোনমতেই পরের দিনের জন্য ফেলিয়া রাখা চলে না। প্রত্যহের দুই বেলার আহার্য ও জলখাবার প্রস্তুত করা, সাধারণ ধোয়ামোছার কাজ, প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জামাকাপড় কাচা, বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো না থাকিলে লণ্ঠন পরিষ্কার করা, তেল ভরা, শিশুপালন এবং গৃহে কোন পালিত পশুপাখী থাকিলে উহাদের তত্ত্বাবধান এ সমস্তই দৈনন্দিন কাজের অন্তর্গত।

(খ) **নিয়মিত যতিময় কাজ** (Regular periodic work)—

গৃহস্থালীর কতকগুলি কাজ আছে যেগুলি দৈনন্দিন কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত নয় তথাপি নিয়মিতভাবে সপ্তাহ কিংবা পক্ষকাল অন্তর, কোন কোন ক্ষেত্রে মাসে একবার করিতেই হয়। এই কাজগুলির মধ্যে পড়ে :—

(১) সাপ্তাহিক ময়লা কাপড় কাচা ও ইস্ত্রি করা। বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়ার প্রভৃতি বস্ত্রাদি সাধারণত প্রত্যহ কেহ কাচে না। তবে বিছানাপত্র সপ্তাহে একবার করিয়া কাচাই সুবিধাজনক। অনেকের আবার অভ্যাস সপ্তাহের ব্যবহৃত সমস্ত জামাকাপড় জমাইয়া রাখিয়া ছুটির দিনে কাচিয়া ইস্ত্রি করিয়া ফেলা। এইভাবে সপ্তাহের জামাকাপড় একদিনে কাচিতে গেলে অবশ্য বেশী খাটুনি পড়ে। সেই হিসাবে নিত্য ব্যবহার্য জামাকাপড় ও বাহিরের পোশাক প্রত্যহ স্নানের সময় কিছু কিছু কাচিয়া ফেলাই বোধহয় সুবিধাজনক। তবে এই ব্যাপারে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক পরিবার আপন আপন সুবিধা অনুযায়ী বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবে।

(২) গৃহের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা নিয়মিত যতিময় কাজের অন্তর্গত। আমরা প্রতিদিন যে ঘর ধোয়া মোছা করি তাহাতে গৃহের যাবতীয় ময়লা দূর হয় না। ঘরের দেওয়ালে এবং কোণগুলিতে, আলমারির পশ্চাদ্ভাগে ধূলাবালি, মাকড়সার জাল ইত্যাদি জমিয়া থাকে। তাই প্রতি পক্ষকাল অন্তর কিংবা মাসে একবার সমস্ত বাড়িঘর ধোয়াইয়া ঝুল ঝাড়িয়া গৃহের প্রতিটি কোণ পরিষ্কার করা উচিত।

(৩) মশা মাছি প্রতিরোধের জন্য নালা, নর্দমাতে নির্বীজক ঔষধ ঢালিয়া দিবে, বাড়ির কোথাও জল জমিয়া থাকিলে সেখানে কেরোসিন বা ডিডিটি ছড়াইবে। এতদ্ব্যতীত বাড়ির যাবতীয় ময়লা প্রতি পক্ষকালে অন্তত একবার করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৪) মাসে অন্তত একবার গৃহের পুরাতন বস্ত্রাদি রিফু করিতে হয়।

(৫) সমস্ত ধাতব পদার্থ ও কাঁসা পিতলের অব্যবহৃত বাসন কোসন ইত্যাদি মাসে একবার করিয়া পরিষ্কার করিবে।

(৬) প্রত্যেক সুগৃহিণীকে মাসে অন্তত একবার করিয়া গৃহের প্রতিটি কক্ষ, জলের কল, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু পরিদর্শন করিয়া দেখিতে হয়। কোথাও কোন জিনিস মেরামতের প্রয়োজন হইলে তিনি অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

(গ) **যতিহীন কাজ** (Occasional work)—

নিয়মিত যতিময় কাজ ব্যতীত গৃহে কতকগুলি অনিয়মিত অথচ বাঁধাধরা কাজ অনুষ্ঠিত হয়। এইগুলির মধ্যে পড়ে :—

(১) ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন ফলের জ্যাম, জেলী, আচার তৈয়ারী করা, ফল কাটিয়া শুকাইয়া রাখা ইত্যাদি।

(২) বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন কীট পতঙ্গের উৎপাত নিবারণ করা, যেমন, গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে মাছি, শীতকালে মশা প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(৩) মাঝে মাঝে বিভিন্ন ব্রত ও পার্বণ অনুষ্ঠান করা।

(৪) বৎসরের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি নির্মাণ করা, বাড়ির সমস্ত ঘড়িগুলি মেরামতের জন্য পাঠান, বাড়ি চুনকাম করা ইত্যাদি।

(৫) সমস্ত আসবাব ও বাসনপত্র একবার করিয়া পালিশ করান, ভাঙ্গা জিনিস মেরামত করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত অনিয়মিত কাজগুলি বাঁধাধরা কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই সকল কাজ অবহেলিত হইলেও জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় না বটে, কিন্তু ধর, বৎসরের যে ঋতুতে যে সকল ফল পাওয়া যায় গৃহিণী যদি ঐগুলি সস্তা দরে কিনিয়া নানারকম খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তুলিয়া রাখেন তবে পরিবারের লোকেরা অসময়ে ঐ সকল বস্তু তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিতে পারে, আবার সস্তার সময় কেনা ছিল বলিয়া গৃহের কিছু অর্থ সাশ্রয় হয়। এদিকে বাড়িঘর চুনকাম করান কিংবা তৈজসপত্র মেরামতের কাজ বৎসরের পর বৎসর ফেলিয়া রাখিলে গৃহস্বামীর শেষে এককালীন বহু টাকা ব্যয় হইয়া যায়। এইজন্যই গৃহিণীকে অনিয়মিত কাজগুলিও সময় ও সুযোগ বুঝিয়া করিয়া ফেলিতে হয়।

(১) **আকস্মিক কাজ** (Unforeseen work)—

সংসারে মাঝে মাঝে নানারকম আকস্মিক ও অতিরিক্ত কাজ দেখা দেয়, যেমন বাড়িতে হঠাৎ কোন অতিথি অভ্যাগত আসিতে পারেন, কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে কিংবা দৈব দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। এতদ্ব্যতীত গৃহে মাঝে মাঝে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি আকস্মিক কোন আনন্দ-বেদনার কারণ দেখা দিতে পারে। এই সকলই আকস্মিক ও অতিরিক্ত কাজের মধ্যে গণ্য কারণ, গৃহের সাধারণ বাঁধাধরা কাজের মধ্যে এইগুলি পড়ে না। কিন্তু গৃহিণীকে এই সকল কাজের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়।

(২) **শ্রম বিভাগ**—

গৃহিণী তাহার কর্মপরিকল্পনায় পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের সময়, দক্ষতা, বয়স ও রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রমবিভাগ করিয়া দিবেন। এইরূপ শ্রমবিভাগের ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে গৃহের প্রত্যেকটি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং কাহারও উপর কাজের অতিরিক্ত চাপ পড়ে না। প্রত্যেক সুগৃহিণীই তাই গৃহপরিচালনার সময় পরিবারের সকলের মধ্যে কাজের ভার বণ্টন করিয়া দেন।

(৩) **কাজের স্থান**—

গৃহস্থালীর পরিচালনার জন্য যেমন একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ প্রত্যেকটি কাজের জন্য উপযুক্ত স্বতন্ত্র স্থান থাকা বাঞ্ছনীয়। কাজের স্থান নির্বাচনও প্রকৃতপক্ষে গৃহপরিকল্পনার অন্তর্গত কারণ, ইহার দ্বারা গৃহিণীর সময় ও শ্রম লাঘব হইয়া থাকে। গৃহ নির্মাণের সময় পরিবারের লোক সংখ্যা অনুযায়ী শয়নঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া

লওয়া উচিত। ভাড়াটে বাড়িতে থাকিলে গৃহের আয়তন দেখিয়া লইয়া গৃহিণী আপনার সুবিধামত রন্ধন, সেলাই, বস্ত্রাদি ধৌতি ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করিবেন।

(৪) **কাজের সময়—**

যে সকল গৃহিণী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল কাজ সমাধা করিতে চান তাহাদের পরিকল্পনায় অবশ্যই একটি সময়-তালিকা থাকা উচিত। কাজের সময়-তালিকা প্রস্তুত করার সময় গৃহিণীর সময়-জ্ঞান থাকা দরকার। সময় জ্ঞান বলিতে একদিকে কোন্ কাজ আগে করা উচিত এবং কোন্‌টি পরে করিলে চলে এই জ্ঞান বুঝায়, অপরদিকে কোন্ কাজ করিতে কতখানি সময় লাগে তাহাও বুঝায়। সময়-জ্ঞানের অভাববশতই গৃহে শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়। অনেক গৃহিণীকে বলিতে শুনিবে—আজ যাহা ভাবিয়াছিলাম উহার অর্ধেক কাজও শেষ করিতে পারি নাই। ইহার অর্থ গৃহিণীর একেবারেই সময়-জ্ঞান নাই।

কাজের সময়-জ্ঞান থাকিলে গৃহিণীরা একসঙ্গে কয়েকটি কাজের পরিকল্পনা করিতে পারেন এবং তাহাতেও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না। ধর, যেদিন কাপড় কাচিবে স্থির করিয়াছ সেদিন সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই সমস্ত ময়লা কাপড় গরম সাবান জলে ডুবাইয়া দাও। এদিকে ডাল, ভাত, মাংস কুকারে চাপাইয়া দাও। যতক্ষণ ঐগুলি সিদ্ধ হইতেছে ততক্ষণ ছেলেমেয়েদের পড়া বলিয়া দিতে পার, নয়ত বাজারের হিসাবপত্র মিলাইয়া লইতে পার। খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া আসিলে কুকার হইতে নামাইয়া যাহারা অফিসে কিংবা স্কুল কলেজে যাইবে তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া ফেল, এদিকে কাপড় গুলিও ভিজিতে থাকুক। সকলে নিজ নিজ কাজে বাহির হইয়া গেলে তুমি এইবার ময়লা বস্ত্রাদি কাচিতে বস। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা হয়ত বলিবেন একসঙ্গে একটির বেশী কাজে মনোযোগ দিতে গেলে সব কাজই পণ্ড হইবে। গৃহস্থালীর কাজে কিন্তু এই নিয়ম খাটে না। এখানে গৃহিণীর সময়-জ্ঞান থাকিলে একসঙ্গে দুই তিনটি কাজ হাতে নেওয়াই সঙ্গত।

(৫) **কাজের নিয়ম—**

গুরুত্ব অনুসারে কোন্ কাজ আগে এবং কোন্ কাজ পরে হইবে এ সম্বন্ধে প্রত্যেক গৃহিণীরই এক একটি নিজস্ব পরিকল্পনা থাকে। তবে গৃহিণীর এই কর্মসূচী অফিস কিংবা স্কুল কলেজের রুটিনের মত ছকে বাঁধা নয়, প্রয়োজন হইলে

উহার অদলবদল করিতে হয়। গৃহিণী যেদিন স্থির করিয়াছেন সমস্ত বাড়িঘর পরিষ্কার করিবেন, সেদিন হয়ত একটি ছেলে অসুস্থ হইয়া পড়িল। এইরূপ ক্ষেত্রে সকল কাজ ফেলিয়া রুগ্ন সন্তানের পরিচর্যা হইবে তাহার সর্বপ্রধান কাজ। তেমনি আবার একটি কাজের দিনে হঠাৎ কোন বন্ধু বা আত্মীয় আসিয়া হাজির হইল। বহুদিন পরে দেখা। সুতরাং সমস্ত কাজ ফেলিয়াও তাহার সঙ্গে একটু গল্পগুজব, আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইতে হয়। জীবনে এইরূপ আকস্মিক আনন্দ-বেদনার অবকাশ ঘটে। গৃহিণীকে তখন হাতের সমস্ত কাজ ফেলিয়া, সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা অগ্রাহ্য করিয়া জীবনের উপস্থিত দাবি মিটাইতে হয়। আমাদের জীবন মোটের উপর একটি ছকে বাঁধা অব্যর্থ গতিতে চলে না—মাঝে মাঝে উহার ছন্দপতন ঘটিতে পারে, গৃহিণীকে উহার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়, এবং প্রয়োজনবোধে কাজের ধারা বদলাইতে হয়।

গৃহস্থালীর কাজে শ্রমবিভাগ

শ্রমবিভাগের পরিকল্পনা প্রত্যেক সভ্য সমাজেই গৃহীত হইয়াছে। সমাজের ছোট বড় প্রত্যেকটি কাজের ভার বিভিন্ন লোকের উপর অর্পিত হইয়া থাকে। এই সকল লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ কাজ করিয়া যায় বলিয়াই সমাজব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। চাষী, মজুর, তাঁতী, মেথর, ধোপা ইহাদের কেহ যদি আপন কার্য সাধনে বিরত হয়, তবে সমগ্র সমাজে একটা দারুণ গোলযোগ দেখা দিবে। বস্তুত সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেকটি লোকের সহযোগিতার উপর দাঁড়াইয়া আছে।

পরিবার হইল সমাজেরই একক। সমাজের মতই পরিবারও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি লোকের শক্তি, দক্ষতা, বয়স ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী এই কর্ম বিভাগ হওয়া উচিত।

শ্রমবিভাগের উদ্দেশ্য—পরিবার যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন কোন গৃহিণীর পক্ষেই পরিবারের সমস্ত কাজ এক হাতে করিয়া ওঠা সম্ভব নয়। কাজেই প্রত্যেকের বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মবিভাগ করিয়া দিলে এক জনের উপর অযথা কাজের চাপ পড়ে না, উপরন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে গৃহের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। কর্ম বিভাগের ফলে প্রথমত গৃহের প্রত্যেকটি লোকই বিশ্রাম পায় এবং অতিরিক্ত কাজের ভারে কাহারও স্বাস্থ্য অচিরে ভাঙ্গিয়া পড়ে না। এতদ্ব্যতীত এই কর্মবিভাগের ফলে গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি

আপন আপন কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়া উঠে এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। কর্মবিভাগের অপর উদ্দেশ্য হইল অনাবশ্যক গল্পগুজব (gossip) এড়ান। হাতে কোন কাজ না থাকিলে আমরা অধিকাংশ সময়ই গল্পগুজব এবং পরচর্চায় রত হই। ইহাতে যে সময়েরই অপব্যবহার হয় তাহা নয়, উপরন্তু আমাদের নিজেদেরও চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। এই সকল কারণে শিশুদেরও তাহাদের নিজ নিজ সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যহ কিছু কাজের ভার দেওয়া উচিত। এইরূপ কাজ করার ফলে তাহাদের দেহ সুগঠিত হইবে, আপন আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে তাহারা অবহিত হইবে এবং এইভাবে ভবিষ্যতে সুনাগরিক হইয়া উঠিবার প্রথম শিক্ষা তাহাদের গৃহেই শুরু হইতে পারে।

গৃহস্থালীর শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে কোন একটি ছকে বাঁধা নীতি অনুসরণ করা কোনমতেই সম্ভব নয় কারণ, প্রত্যেকটি পরিবারের লোক সংখ্যা ও কর্মদক্ষতা স্বতন্ত্র। একটি গৃহের সঙ্গে অপরটির মিল নাই, সুতরাং এক গৃহের ব্যবস্থা অন্য গৃহের ক্ষেত্রে খাটে না। তথাপি আমাদের দেশের সমস্ত গৃহকে মোটামুটি তিনটি ছাঁচে ঢালিতে পারি—(১) স্বল্পপরিজন লইয়া গঠিত ক্ষুদ্র পরিবার। এইরূপ গৃহের গৃহিণী সাধারণত আপন পুত্র কন্যার সাহায্য লইয়া যাবতীয় গৃহকর্ম নিজেই সমাধা করেন। (২) মাঝারি যৌথ-পরিবার—এখানে গৃহিণী অপর পরিজন যেমন শাশুড়ী অথবা পুত্রবধূ, ননদ, জা কিংবা অপর কোন আত্মীয়া, ঠিকে ঝি বা ভৃত্যের সাহায্য পান। (৩) বৃহৎ পরিবার—বহু দাসদাসী দিয়া এইরূপ পরিবারের যাবতীয় কাজ করান হয়, কেবল পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনার ভার থাকে গৃহিণীর উপরে। এখন দেখা যাউক পরিবারের বিভিন্ন লোকের মধ্যে কিরূপ শ্রমবিভাগ হওয়া সম্ভব।

গৃহিণীর কাজ—পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা প্রত্যেক গৃহিণীর অবশ্য কর্তব্য এবং প্রত্যেক সুপরিচালিত গৃহের গৃহিণী এই দুইটি কাজের ভার নিজের হাতে রাখেন। প্রত্যেক গৃহিণীই যে নিজের হাতে সকল কাজ করেন তাহা নয়, বড় ঘরের গৃহিণীরা রন্ধন, শিশুপালন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ দাসদাসীদের উপরেই ছাড়িয়া দেন। তথাপি গৃহের ব্যবস্থাপনার ভার তাহার নিজের হাতেই তুলিয়া লওয়া উচিত। তিনিই মাসের বাজেট করিবেন, আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন। প্রতিদিনকার খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা, অসুস্থ ব্যক্তির পথ্যের নির্দেশ দেওয়া, কোন জিনিস ফুরাইয়া গেলে তাহা আনাইবার ব্যবস্থা

করা সমস্তই গৃহিণীর কাজ। মোটের উপর গৃহের সমস্ত কর্ম গৃহিণীর নির্দেশে পরিচালিত হইবে এবং গৃহের প্রতিটি জিনিস তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত থাকিবেন। সকল পরিজন এমন কি ভৃত্যদের সমস্ত অসুবিধাও তাহাকেই বুঝিতে হইবে। গৃহিণী এমনভাবে সকলের মধ্যে কাজ বণ্টন করিয়া দিবেন যাহাতে কাহারও উপর কাজের বেশী চাপ না পড়ে, প্রত্যেকটি লোকই বিশ্রামের সুযোগ পায় অথচ কাজগুলিও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি গৃহে ব্যবস্থাপনা ব্যতীত গৃহিণী নিজের হাতে রন্ধন ও পরিবেশনের ভার রাখিবেন। তোমরা জান খাদ্যের মধ্য দিয়াই অধিকাংশ রোগের জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে। সুতরাং খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য-তত্ত্বের প্রধান মূলনীতি। ভৃত্যরা অজ্ঞতাবশত খাদ্যের যথাযথ পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতে পারে না, উপরন্তু খাদ্যমূল্য বজায় রাখিয়া রন্ধনেও তাহারা পারদর্শী নহে। রন্ধনের মতই পরিবেশনের ব্যাপারটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশনে পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন ত আছেই, এতদ্ব্যতীত গৃহে প্রত্যেকটি লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া খাদ্য বণ্টন করিতে হয়। ভৃত্যের দ্বারা ইহাদের একটিও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা কম। এই সমস্ত কারণে গৃহিণী আপন হাতে রন্ধন ও পরিবেশনের ভার রাখিবেন। অনেক চাকুরে গৃহিণীদের পক্ষে রান্নার কাজ করা কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে। তবে মিতশ্রম যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা অনায়াসে রন্ধনের কাজটি সমাধা করিতে পারেন।

গৃহিণীর অন্যতম কাজ হইবে শিশুপালন। এখানেও শ্রমবিভাগের সময় গৃহিণী শিশুদের পরিচর্যার ভার প্রধানত শিশুদের খাদ্য নিজের হাতে রাখিবেন। খাদ্যের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন শিশু-বৃদ্ধ সকলের ক্ষেত্রে সমান অনুভূত হয়। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে এই পরিচ্ছন্নতার আরও বেশী দরকার, কারণ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা শিশুদের নাই বলিলেই চলে। দাসদাসীদের হাতে শিশুর খাদ্য পরিবেশনের ভার দিবার একটি বিপদ এই যে, যে-সকল শিশু খাইতে চায় না কিংবা খাইতে বসিয়া নানারকম বায়না করে ভৃত্যরা কাজ সংক্ষেপ করিব্যর জন্য তাহাদের হয়ত আধপেটা করিয়া খাওয়াইয়া রাখে, আবার শান্ত কিংবা ভোজনপ্রিয় শিশুদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাইতে দেয়।

ভৃত্যদের হাতে শিশুদের ভার তুলিয়া দিবার আরও একটি বিপদ এই যে ভৃত্যরা সাধারণত অজ্ঞ এবং শিশুরাও অনুকরণপ্রিয়। ভৃত্যদের অমার্জিত ভাষা, অপরিচ্ছন্ন স্বভাব এবং ধূমপান ইত্যাদি নানারূপ বদভ্যাসগুলি শিশুমনকে

সহজেই প্রভাবিত করে। পরন্তু শিশুরা মায়ের সাহচর্য যেরূপ পছন্দ করে, মায়ের শিক্ষা ও নির্দেশ যত সহজে গ্রহণ করে অপর কাহাকেও তাহারা সাধারণত সেরূপ পছন্দ করে না। এই সকল কারণে প্রত্যেক গৃহিণী অন্যান্য কাজ কমাইয়া দিয়াও রন্ধন, পরিবেশন ও শিশুপালন এই কয়টি কাজের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন।

যৌথ পরিবারে অন্যান্য বর্ষিয়সী মহিলাদের কাজ—

গৃহিণী কাজ বণ্টনের সময় প্রত্যেকের রুচি ও দক্ষতার প্রতি নজর রাখিয়া কর্মবিভাগ করিয়া দিবেন এবং নিজেও যে কাজে দক্ষ কেবল সেই কাজগুলির ভার লইবেন। গৃহিণী নিজে যদি রন্ধননিপুণা না হন তবে অপর কোন বর্ষিয়সী মহিলার উপর ঐ কাজের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিবেন এবং আপনি শিশুপালন, সেলাই ইত্যাদি কাজের ভার লইবেন। যৌথ পরিবারের বধূরা অনেক সময়ে শাশুড়ীর হাতে সন্তান পালনের ভার দিয়া সংসারের অন্যান্য যাবতীয় কর্ম নিজের হাতে করেন। বৃহৎ পরিবারের গৃহিণী অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে পালা করিয়া রন্ধনের কাজ করেন এবং একজনের উপর প্রাতরাশ ও বৈকালিক জলযোগের ভার, অতিথি অভ্যাগতের যত্ন, রোগী, বৃদ্ধ ও শিশুর পরিচর্যা ইত্যাদি কাজ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপ শ্রমবিভাগ মন্দ নয়। ইহাতে পরিবারের সকলেই বিশ্রাম পায় এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ করিবার অবসর লাভ করে।

কন্যাদের কাজ—

অনেক গৃহে গৃহিণী এবং বধূ ব্যতীত অনেক সময় উপযুক্ত কন্যাও থাকে। এই সকল কন্যারা অনায়াসে সংসারের নানা ক্ষুদ্র দায়িত্ব বহন করিতে পারে। বিশেষত যে গৃহে গৃহিণীর অপর কোন সাহায্যকারী নাই সেখানে একমাত্র কন্যাদের উপরই তাহার নির্ভর করিতে হয়। ঘরে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী থাকিলে সে-ই ছোট ছোট ভাইবোনদের শিক্ষা ও সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভার লইতে পারে। প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া তাহাদের হাতমুখ ধোয়ানো, জলখাবার দেওয়া, পড়া বলিয়া দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি কন্যারা করিতে পারে। পিতার সাধারণ কাজগুলিও, যেমন, অফিসে যাইবার পূর্বে জুতা, জামা, ব্যাগ ও জলখাবারের কৌটাটি গুছাইয়া দেওয়া কিংবা কর্মক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাকে জলপিঁড়ি দেওয়া, পাখা করিয়া পিতার শ্রান্তি অপনোদন করা ইত্যাদি কাজের ভারও কন্যার উপর থাকিতে পারে। জননীর গৃহকর্মের একমাত্র ভরসা এই কন্যা। আপনার পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সে মায়ের সাধারণ টুকিটাকি

কাজগুলি করিতে পারে। বাড়িতে দাসদাসী না থাকিলে ছুটির দিনগুলিতে ভাইবোন ও পিতার জামাকাপড় কাচিয়া মাড় দিয়া ইস্ত্রি করিয়া দিতে পারে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ দুইবেলা ঘর ঝাঁট দেওয়া, সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালা, পিতার শয্যা রচনা করার ভারও জননী কন্যার উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন। বহু পরিবারে হিসাব নিকাশের ভারও কন্যার উপর থাকে। ইহাতে সে পিতামাতার সঙ্গে সংসারের দায়িত্ব লইতে শেখে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার নিজ সংসারে কিরূপে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেও বাস্তব শিক্ষা পাইবার সুযোগ লাভ করে। বস্তুত গৃহিণী ও কন্যার যৌথ প্রচেষ্টাতেই সংসারের শান্তি, শৃঙ্খলা ও শ্রী ফুটিয়া উঠিতে পারে।

শিশুদের কাজ—

পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের মত শিশুদের মধ্যেও কিছু কিছু কাজ বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। ছোটখাট কাজের মধ্য দিয়া তাহারা একাধারে শিক্ষা ও আনন্দলাভের সুযোগ পায়, উপরন্তু অঙ্গচালনার ফলে দেহও সুস্থ এবং সুগঠিত হইয়া উঠে। বস্তুত শিশুদের দেহে ও মনে যে অফুরন্ত শক্তি ও কর্মের উৎস থাকে শিশুকাল হইতে উহা যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে শিশুদের মনে দায়িত্ববোধ জাগে, তাহারা আপনার প্রতি নির্ভরশীল হইতে শেখে এবং সর্বোপরি তাহারা শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে।

বলা বাহুল্য, শিশুদের উপর কোন কঠিন কিংবা ভারি কাজ দেওয়া উচিত নয়। তাহারা নিজ নিজ জিনিসপত্র অর্থাৎ জামা, জুতা, বই, পড়ার টেবিল ইত্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিবে। যে সকল গৃহে দাসদাসী নাই সেই সকল গৃহে শিশুদের উপর নিজ নিজ থালাবাসন মাজা, বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজগুলির ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যাহাদের দাসদাসী আছে তাহারাও ছুটির দিনে কিংবা ভৃত্যদের অসুস্থতার সময় আপন আপন ছোটখাট কাজগুলি করিয়া লইবে। এতদ্ব্যতীত বাড়ীর শিশুদের দিয়া প্রতি সপ্তাহে বাড়ির সকল আবর্জনা এক জায়গায় জড় করাইবে। তারপর জ্যেষ্ঠদের তত্ত্বাবধানে উহা আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। গৃহে কোন অতিথি আসিলে তাহাদের পরিচর্যার ভারও শিশুদের উপর আংশিক ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

ভৃত্যদের কাজ—

ভৃত্যদের উপর বাড়িঘর ধোয়ামোছা ইত্যাদি সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ, বস্ত্রাদি ধৌতি ও ইস্ত্রি করা, কয়লা ভাঙ্গা, উনুন ধরান, বাসন মাজা, মশলা

পেষা ইত্যাদি যাবতীয় মোটা ও শ্রমবহুল কাজগুলি ছাড়িয়া দেওয়া যায়। কোন কোন পরিবারে পাচকদের উপর রন্ধনের ভার থাকে। কোন কারণে গৃহিণী যদি রন্ধনের ভার না লইতে পারেন তবে তিনি দায়িত্বশীল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি দেখিয়া পাচকের পদে নিযুক্ত করিবেন এবং আপনার নির্দেশে রন্ধনের কাজ করাইয়া লইবেন।

এতদ্ব্যতীত গৃহের বয়স্ক ছেলে ও গৃহকর্তার উপরও কিছু কিছু কাজের ভার থাকা উচিত। তাহারা ইচ্ছা করিলে বাড়ির দৈনন্দিন বাজারহাট করা, বাড়ি ভাড়া, ইলেকট্রিকের বিল ও লাইফ ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেওয়া প্রভৃতি কাজের ভার অনায়াসে লইতে পারেন।

শ্রম-লাঘবের উপায়

জীবনযাত্রা জটিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাজের পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে স্বভাবতই স্বল্প পরিশ্রমে মাপা সময়ের মধ্যে তাহাকে যাবতীয় কাজ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের জীবনে এই শ্রম লাঘবের প্রয়োজন আরও বেশী, কারণ তাহাদের জীবন আর গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতেছে না। আজকাল প্রায় প্রত্যেক গৃহিণীকেই অর্থোপার্জনের চেষ্টায় ঘরের বাহিরে আসিতে হইতেছে। অথচ ঘরের কাজগুলিও তাহারা কোনমতে ফেলিয়া রাখিতে পারেন না। নানাকারণে আজকাল ভৃত্য রাখাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত কারণে গৃহিণী যদি স্বল্প পরিশ্রমে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে গৃহের যাবতীয় কাজ সমাধা করিতে পারেন তবে তাহার ঘর এবং বাহির দুই কূলই রক্ষা হয়। শ্রম-লাঘব করিতে হইলে সময়, পরিশ্রম এবং অঙ্গচালনা এই তিনটি জিনিসের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার এবং এইজন্য নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি অনুসরণ করিয়া চলিবে :—

(১) **সময়-তালিকার সাহায্যে শ্রম-লাঘব**—একটি সময়-তালিকা প্রস্তুত করিয়া লইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহিণী অনেক কাজ করিয়া উঠিতে পারেন। সময়-তালিকা প্রস্তুত করার সময় কোন কাজ করিতে কতটা সময় লাগিতে পারে এবং কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী কোন্ কাজ আগে এবং কোন্ কাজ পরে করিতে হইবে সে সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার। স্বভাবতই প্রত্যেকটি কাজ করিবার সময়ের আন্দাজ না থাকিলে পরের কাজটি সর্বদা

পিছাইয়া যাইবে এবং এইভাবে সারাদিনের কাজে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সময়-তালিকায় শুধুমাত্র দৈনন্দিন কাজগুলি নয়, সেই সঙ্গে নিয়মিত যতিময় কাজ ও যতিহীন কাজগুলিও স্থান পাইবে। এই সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) **শ্রম-বিভাগের দ্বারা শ্রম-লাঘব**—শ্রম-বিভাগের সাহায্যে শ্রম-লাঘব করা যায়। গৃহের প্রত্যেকটি লোকের রুচি, দক্ষতা ও বয়স-অনুযায়ী কাজ বণ্টন করিয়া দিলে সময় ও শ্রমের লাঘব হয়। যাহার যে কাজ পছন্দ তাহাকে সেই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করিলে ঐ ব্যক্তির সেই কাজে দক্ষতা জন্মায় এবং স্বভাবতই অল্প সময়ের মধ্যে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

(৩) **গৃহের নক্শা ও অন্যান্য পরিকল্পনার সাহায্যে শ্রম-লাঘব**—গৃহের নক্শা ও পরিকল্পনাও মেয়েদের শ্রম বাঁচাইতে অনেকখানি সহায়তা করে। গৃহ নির্মাণের সময়ই পরিবারের লোকসংখ্যা ও তদনুযায়ী শয়ন ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া লওয়া উচিত, কারণ বিভিন্ন কক্ষের অবস্থান ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের উপর গৃহিণীর অনেকখানি সময় ও শ্রম লাঘব নির্ভর করে। ভাঁড়ার ঘরটি যদি রান্নাঘরের সংলগ্ন না হয় তবে জিনিসপত্র আনিবার জন্যও বারবার হাঁটাহাঁটি করিতে অযথা সময় ও শ্রমের অপব্যয় হয়। তেমনি খাবার ঘরটি রান্নাঘরের পাশাপাশি না হইলে পরিবেশনেরও অসুবিধা ঘটে। আবার যে গৃহিণীকে রান্না ও কাপড় কাচা উভয়ই নিজহস্তে সম্পন্ন করিতে হয় তাহার রান্নাঘরের পাশেই কাপড় কাচার স্থানটি নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। রান্নাঘরটি নির্মাণকার্যেও যথেষ্ট নিপুণতার প্রয়োজন। ঘরের মেঝে ও দেওয়াল এইরূপভাবে প্রস্তুত হইবে যাহাতে গৃহপরিষ্কার করিতে বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকটি কক্ষে জলনিঃসৃত হইবার জন্য একটি নর্দমা থাকিবে। রান্নাঘরে একটি বড় সিঙ্ক থাকিলে হাত ধুইবার জন্য গৃহিণীদের অনাবশ্যক ছুটাছুটি করিতে হয় না। খাবার টেবিল ও সিঙ্ক পোরসিলিনের তৈয়ারী হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ উহা অল্পায়াসে পরিষ্কার করা যায়। রান্নাঘরের দেওয়ালে কাচের আলমারি থাকিলে গৃহিণী এক নজরে সকল জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন। উপযুক্ত বাসনপত্র নির্বাচন করিতে পারিলেও অনেক শ্রম বাঁচিয়া যায়। কাঁসা বা পিতলের বাসনের চেয়ে কাচ ও স্টেনলেস স্টীলের বাসনপত্র পরিষ্কার করা অনেক সহজ। পালিশ করিবার প্রয়োজন হয় না, শুধু ঝাড়িয়া ফেলিলেই চলে এরূপ কাঠের আসবাব ক্রয় করিবে।

(৪) **কাজের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও বস্তু সন্নিবেশের ফলে শ্রম-লাঘব**—কাজের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং জিনিসপত্র রাখিবার কৌশলের উপরেও গৃহিণীর অনেক সময় ও শ্রম লাঘব হইতে পারে।

রান্নাঘর নির্বাচন—জীবনযাত্রার প্রথম কাজই হইল রন্ধন। প্রথমেই রান্নাঘরটি প্রশস্ত হওয়া চাই। এখানে বসিয়া গৃহিণী যাহাতে রন্ধনের যাবতীয় সরঞ্জাম হাতের কাছে পাইতে পারেন সেরূপভাবে সবকিছু গুছাইয়া রাখিবেন। মশলাপাতি হইতে শুরু করিয়া বাসনকোসন ইত্যাদি সমুদয় সামগ্রী রান্নাঘরের আলমারি কিংবা তাকের উপর রাখিতে পারিলে গৃহিণীকে জিনিসপত্র আনিবার জন্য অযথা ছুটাছুটি করিতে হয় না।

সেলাইএর স্থান নির্বাচন—গৃহিণীর আর একটি প্রধান কাজ হইল সেলাই। শয়ন ঘরটি প্রশস্ত হইলে সেখানেই সেলাইএর কল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গুছাইয়া একটি ক্ষুদ্র বাক্সে ভরিয়া রাখা চলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পুরাতন বস্ত্রাদি যেগুলি সেলাই করা কিংবা রিফু করা দরকার সেগুলির জন্যও একটি স্বতন্ত্র ঝুড়ি বা বাক্স রাখা উচিত। জামাকাপড় কাচা হইয়া গেলে গৃহিণী ছেঁড়াফাটা কাপড় বাছিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িতে আলাদা করিয়া রাখিবেন যাহাতে অবসর সময় ঐগুলি রিফু করিতে পারেন। নতুবা সেলাই করিবার সময় ছেঁড়া জামাকাপড় খুঁজিতেই অনেক সময় অতিবাহিত হয়। মোটের উপর গৃহিণীর সামান্য তৎপরতাতে অনেক অযথা পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়।

বস্ত্রাদি ধোলাই-এর স্থান নির্বাচন—গৃহের আর একটি কাজ হইল বস্ত্রাদি ধোলাই। ভারতবর্ষের প্রায় কোন গৃহেই কাপড় কাচা এবং ইস্ত্রির জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে কাপড় কাচার সরঞ্জাম রাখিবার জন্য গৃহিণী একটি মনোমত কোণ বাছিয়া লইয়া সেখানেই যাবতীয় সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখিবেন। ময়লা কাপড়-চোপড় রাখিবার জন্য স্নানাগার এবং শয়ন ঘরের এক কোণে একটি বাক্স কিংবা ঝুড়ি রাখা যাইতে পারে। ঐ ঝুড়ি হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ ময়লা বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কাচিয়া ফেলিতে পারে। কাপড় কাচার মতই ইস্ত্রির জন্য কোন স্বতন্ত্র কক্ষ থাকে না। গৃহিণী এখানে আপনার সুবিধামত একটি স্থান বাছিয়া লইয়া একটি টেবিলের উপর ইলেকট্রিক ইস্ত্রি রাখিয়া দিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত গৃহিণী গৃহ পরিষ্কারের সমুদয় সামগ্রী, সবজি বাগানের যন্ত্রপাতি অথবা বাড়ির কলকব্জা মেরামতের সাধারণ যন্ত্রপাতি উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইয়া রাখিবেন। শয়ন ঘরে কিংবা সংলগ্ন বারান্দায় কোন আলমারীর উপরে প্রাথমিক প্রতিবিধানের সমস্ত সরঞ্জাম ও নির্বীজক ঔষধ গুছাইয়া রাখা উচিত। গৃহ-পরিচালনায় আলো আর একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকিলেও কোন আকস্মিক পরিস্থিতির জন্য গৃহে টর্চ, মোমবাতি, হারিকেন ইত্যাদিও একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখিতে হয়। গৃহ ক্ষুদ্রই হউক কিংবা বৃহৎই হউক গৃহিণী যদি গৃহস্থালীর প্রত্যেকটি বস্তু সর্বদা নির্দিষ্ট স্থানে গুছাইয়া রাখেন তবে খোঁজাখুঁজির জন্য অযথা শ্রমের অপচয় ঘটে না। ভাবী গৃহিণীরা স্মরণ রাখিও গৃহস্থালীর প্রত্যেকটি বস্তু এমনভাবে নির্দিষ্ট স্থানে গুছাইয়া রাখিতে হয় যাহাতে তোমাদের মস্তিষ্ক চরণ দুইখানিকে একটু বিশ্রামের সুযোগ দিতে পারে।

মিতশ্রম যন্ত্রের সাহায্যে শ্রম লাঘব (Labour-saving devices)—পাশ্চাত্যদেশে আজকাল ভৃত্য পাওয়া যায় না। সে দেশের গৃহিণীরা মিতশ্রম যন্ত্রের সাহায্যে যাবতীয় গৃহকর্ম নিজের হাতেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও আজকাল উপযুক্ত ভৃত্য কিংবা পাচক রাখা অতিশয় কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখানেও তাই ক্রমশ মিতশ্রম যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাইতেছে। রান্না, কাপড়কাচা ও গৃহ পরিষ্কার—গৃহকর্মের এই তিনটি ক্ষেত্রে মিতশ্রম যন্ত্রের সাহায্যে আমরা শ্রমলাঘব করিতে পারি।

ঘরোয়া কাজের মধ্যে রান্নার কাজই হইল প্রথম ও প্রধান কাজ। একটি **ইকমিক কুকার** কিংবা একটি **প্রেসার কুকার** থাকিলে অল্প শ্রমে রান্নার কাজ সমাপ্ত করা যায়। ইকমিক কুকারে ভাত, ডাল, মাংস, পুডিং প্রভৃতি চাপাইয়া দিয়া কাপড় কাচা, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান, সেলাই ইত্যাদি অনেক কাজ সারিয়া লওয়া যায়। প্রেসার কুকার আবার শ্রমের মতই সময় লাঘব করে।

রান্নার কাজে শ্রমলাঘবের আর একটি বস্তু হইল স্টোভ। যে কোন ধরনের স্টোভই কয়লা কিংবা কাঠের উনুন অপেক্ষা ব্যবহার করা সহজ। স্টোভ ধরাইতে সময় কম লাগে এবং ইহাতে কয়লা ভাঙ্গা প্রভৃতি শ্রমবহুল কাজগুলির হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। ইলেকট্রিক কিংবা গ্যাস আভেনগুলি অবশ্য

স্টোভের চেয়েও অধিক শ্রমলাঘবকারী। পাশ্চাত্যদেশে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মধ্যে রুটি সেঁকার হিটার এবং ডিস ধোওয়ার যন্ত্রও রান্নাঘরে ব্যবহার করা হয়।

রন্ধনের ক্ষেত্রে আধুনিক মিতশ্রম যন্ত্রগুলির মধ্যে রেফ্রিজারেটারের নাম উল্লেখযোগ্য। গৃহে একটি রেফ্রিজারেটার থাকিলে গৃহিণী প্রত্যহ বাজার করা, দুই বেলা রান্না করা প্রভৃতি কাজগুলিকে সহজেই সংক্ষেপ করিতে পারেন। পরন্তু ইহার সাহায্যে অনেক খাদ্যদ্রব্য অপচয়ের হাত হইতেও রক্ষা পায়। এই সকল যন্ত্রপাতি ব্যতীত রান্নার কাজে শ্রমলাঘবের জন্য, তরকারির খোসা ছাড়াইবার যন্ত্র (Vegetable Peeler), ডিম ফেটাইবার যন্ত্র (Egg Beater), মাংসের কিমা করিবার যন্ত্র (Mincing Machine), সবজি কুরাইবার যন্ত্র (Grater) প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গৃহস্থালীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল কাপড় কাচা। পাশ্চাত্যদেশের গৃহিণীরা নানা ধরনের কাপড় কাচা মেশিন, রিংগার ও ম্যাঙ্গলস্ ইত্যাদি মিতশ্রম যন্ত্রের সাহায্যে বিনা পরিশ্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাপড় ধোওয়া, কাপড় নিংড়ানো এবং জামাকাপড় ইস্ত্রি করা প্রভৃতি কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এই সকল যন্ত্রপাতির এখনও বহুল প্রচলন হয় নাই, তবে আমরা পাত কিংবা কয়লার ইস্ত্রির পরিবর্তে আধুনিক বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ব্যবহার করিয়া কিছুটা সময় এবং শ্রম লাঘব করিতে পারি।

পাশ্চাত্যদেশে গৃহ-পরিষ্কারের কাজে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার নামক মিতশ্রম যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। মোটা গদি, পুরু কার্পেট, সোফা, গদি আঁটা চেয়ার ও পালঙ্ক প্রভৃতি ভারী জিনিসগুলি পরিষ্কার করা কিরূপ কঠিন এবং শ্রমসাধ্য তোমরা সকলেই জান, কিন্তু ভ্যাকুয়াম ক্লীনার অতি সহজেই কোন ভারী জিনিসের মধ্যে হইতে ময়লা টানিয়া বাহির করিয়া আনে। ফলে বিরাট ও ভারী জিনিসগুলি টানাটানি করিয়া ধুলা না ঝাড়িয়া অতি অল্প পরিশ্রমে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার দ্বারা পরিষ্কার করা যায়।

এতদ্ব্যতীত গৃহে একটি সেলাইয়ের কল থাকিলেও অনেক সময় ও শ্রম বাঁচানো যায়।

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম ভাগ—খাদ্যতত্ত্ব

দ্বিতীয় ভাগ—বস্ত্রশিল্প

প্রথম অধ্যায়

বিভিন্ন বয়সের উপযোগী সুষম খাদ্য

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্য

(Diet for the adult)

একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী এবং পুরুষের খাদ্যের মোট তাপমূল্য এবং বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ ৪১২ পৃষ্ঠার চার্ট হইতে সহজেই নির্ণয় করা যায়। সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে শুধু এই সকল উপাদানের পরিমাণ জানিলেই হইবে না, কোন্ কোন্ খাদ্যবস্তুর কতটুকু হইতে এই সকল উপাদান গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বিভিন্ন খাদ্য-বিভাগ এবং খাদ্য-মূল্য তালিকার সাহায্যে হিসাব করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। এই হিসাব করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং ধৈর্য অধিকাংশ গৃহিণীরই নাই। সুতরাং এই সকল উপাদান বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর ওজনের পরিমাপে প্রকাশ করিয়া গৃহিণীদের হাতের কাছে যদি এমন একটি মূল-খাদ্য-তালিকা (Basic dietary pattern) তুলিয়া ধরা যায় যে যাহার সহিত সামান্য কিছু যে-কোন প্রকার খাদ্য যোগ করিলেই প্রাপ্তবয়স্ক যে-কোন নারী বা পুরুষের সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিতে আর কোন অসুবিধা হইবে না। নিম্নে এইরূপ একটি মূল-খাদ্য-তালিকা দেওয়া হইল। এই খাদ্যে কেবলমাত্র ক্যালোরী বাদে অন্য সকল উপাদানই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সুষম খাদ্যে যে পরিমাণে থাকা প্রয়োজন সেই পরিমাণেই রহিয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী যে-কোন প্রকার খাদ্য হইতে এই অবশিষ্ট ক্যালোরীর অভাব পূরণ করিলেই এই খাদ্য ঐ ব্যক্তির পক্ষে সুষম খাদ্যে পরিণত হইবে।

একটি মূল-খাদ্য-তালিকার নমুনা

ভাত	৩½ আউন্স
রুটি	৩½ „
ডাল	২ „
মাছ, মাংস	৩ „
দুধ	১৭ „

একটি মূল-খাদ্য-তালিকার নমুনা (contd.)

ডিম	... ...	১ টি
আলু	... ...	১ টি (৫ আউন্স প্রায়)
সবুজ শাকসবজি	... ...	৫ আউন্স
অন্যান্য ফল ও তরিতরকারি	...	১০ „
লেবু জাতীয় ফল	...	৩½ „
মাখন, ঘি ইত্যাদি	...	১ „

এই খাদ্যের মোট তাপমূল্য প্রায় ১৭০০ ক্যালোরী এবং ইহাতে প্রোটিন, ভাইটামিন ও ধাতবলবণ সমূহের পরিমাণ যে-কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে যথোপযুক্ত। এই খাদ্য তালিকা প্রস্তুতিতে খাদ্যের এগারটি বিভাগের (৪২৮ পৃষ্ঠা দেখ) শেষ বিভাগটি ছাড়া অন্যান্য সকল বিভাগ হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং সুষম খাদ্যের সকল উপাদানই এই খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু যে-কোন একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষের খাদ্যের প্রয়োজনীয় তাপমূল্য এই ১৭০০ ক্যালোরী অপেক্ষা অধিক। মূল-খাদ্য গ্রহণ করিবার পর এই অতিরিক্ত ক্যালোরী যে-কোন প্রকার খাদ্যের সাহায্যেই পূরণ করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে ডাঃ McCollum-এর একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে,—"Eat what you want after you have eaten what you should." একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক পরিশ্রমী পুরুষের দৈনিক ৩০০০ ক্যাঃ তাপ বা শক্তির প্রয়োজন হয় এবং এই পরিমাণ তাপের জন্য তাহার দৈনিক ৩৩০০ ক্যাঃ তাপমূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য (৪২০ পৃষ্ঠা দেখ)। সুতরাং উপরোক্ত মূল-খাদ্য গ্রহণ করিবার পর ঐ ব্যক্তি অবশিষ্ট ৩৩০০—১৭০০ বা ১৬০০ ক্যাঃ তাপের অভাব তাহার ইচ্ছামত যে কোন খাদ্য দ্বারাই পূরণ করিতে পারে। ভাত, রুটি, আলু, চিড়া, মুড়ি, খৈ, চিনি, গুড়, মাখন, ঘি, জেলী, বিস্কুট, সরবৎ ইত্যাদি সমস্তই তাপ উৎপাদক খাদ্য। সুতরাং ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী এই সকল খাদ্য হইতে অবশিষ্ট ক্যালোরীর অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। যদি শুধু ভাতের সাহায্যেই অবশিষ্ট ১৬০০ ক্যাঃ তাপের অভাব পূরণ করিতে হয় তবে আরও $\frac{১৬০০}{৪}$ = ৪০০ গ্রাম = ১৪ আউন্স (প্রায়) ভাত তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং মূল-খাদ্যের সহিত এই ১৪ আউন্স ভাত যোগ করিলেই একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমী, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দৈনিক সুষম খাদ্যের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। যদি ঐ ব্যক্তি

প্রত্যহ ২ আউন্স চিনি বা গুড় খাইতে পছন্দ করে তাহা হইলে শ্বেতসারের পরিমাণ দুই আউন্স কমাইয়া উহার পরিবর্তে ২ আউন্স চিনি বা গুড় যোগ করিলেই হইবে। সুতরাং এই প্রকার রুচিসম্পন্ন একজন প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাভাবিক পরিশ্রমী পুরুষের সুষম খাদ্যের তালিকা নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ভাত … … …	১৫½ আউন্স
রুটি … … …	৩½ "
ডাল … … …	২ "
মাছ, মাংস … … …	৩ "
দুধ … … …	১৭ "
ডিম … … …	১টি
আলু … … …	১টি (৫ আউন্স প্রায়)
সবুজ শাকসবজি … …	৫ আউন্স
অন্যান্য ফল ও তরিতরকারি …	১০ "
লেবু জাতীয় ফল … …	৩½ "
মাখন, ঘি ইত্যাদি … …	১ "
চিনি, গুড় ইত্যাদি … …	২ "

এই সুষম খাদ্যের তালিকায় খাদ্যের এগারটি বিভাগের প্রত্যেকটি বিভাগ স্থান পাইয়াছে।

এইরূপে মূল-খাদ্যের সহিত বিভিন্ন পেশা ও রুচির প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের অতিরিক্ত ক্যালোরী মূল্যের খাদ্য যোগ করিয়া সুষম খাদ্যের আদর্শ-তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়।

অল্প মূল্যের সুষম খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতি—উপরে যে সুষম খাদ্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছে অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেই ঐ খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। অধিকাংশ ভারতবাসীই অত্যন্ত দরিদ্র। তাহাদের পক্ষে দৈনিক ঐ পরিমাণ দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি অগ্নিমূল্য প্রোটিন-বহুল খাদ্য সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। এইজন্য খাদ্যে এই সকল দুর্মূল্য প্রাণিজ প্রোটিনের পরিমাণ কমাইয়া ঐ প্রোটিনের অভাব কোন অল্প মূল্যের খাদ্যের দ্বারা পূরণ করিতে পারিলে খাদ্যের মূল্য কম হইবে। খাদ্যের মূল্য কমাইবার জন্য উপরোক্ত সুষম খাদ্যের উপাদান সমূহ বাদ দেওয়া বা কমানো চলিবে না। উপরোক্ত সুষম

খাদ্যের উপাদানসমূহ অল্পমূল্যের খাদ্য হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করাই অল্পমূল্যের সুষম খাদ্য প্রস্তুতির মূল কথা। ডাল প্রাণিজ প্রোটিন-বহুল খাদ্য অপেক্ষা অনেক সস্তা এবং ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। ডিম, দুধ হইতেও ডালে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী (৩৯২ পৃষ্ঠা দেখ)। সুতরাং সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তির খাদ্যে ডালের পরিমাণ বাড়াইয়া মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি দুর্মূল্য খাদ্যের পরিমাণ কমাইতে হইবে। কিন্তু দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য প্রাণিজ প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এইজন্য মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি খাদ্য হইতে একেবারে বর্জন করা চলিবে না। সয়াবীনে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়, যদিও এই প্রোটিনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। সুতরাং প্রাত্যহিক খাদ্যে সয়াবীন অন্তর্ভুক্ত করিলেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনের অভাব অনেকটা পূরণ হইতে পারে। কুনুরের (দক্ষিণ ভারতে) ন্যাশন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী আমাদের দেশের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যথেষ্ট সতর্কতার সহিত যে পরিমাণ খাদ্য একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমী, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সুষম খাদ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

খাদ্যশস্য (ভাত, রুটি ইত্যাদি) … …	১৪ আউন্স
ডাল … … … …	৩ ”
সবুজ শাক-সবজি … … …	৪ ”
কন্দজাতীয় সবজি (root vegetables) … …	৩ ”
অন্যান্য সবজি … …	৩ ”
ফল … …	৩ ”
দুধ … …	১০ ”
চিনি, গুড় … …	২ ”
ঘি, বনস্পতি … …	২ ”
মাছ, মাংস … …	৩ ”
ডিম … ..	১টি

এখানে দুধের পরিমাণ কমাইয়া ঐ প্রোটিনের অভাব ডালের পরিমাণ বাড়াইয়া পূরণ করা হইয়াছে। তরিতরকারি বা সবজির পরিমাণও উপরোক্ত খাদ্য হইতে কিছু কমানো হইয়াছে। সুতরাং এই প্রকার খাদ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হইবে। ভাত, রুটি ইত্যাদির পরিমাণ কমাইয়া ঐ তাপমূল্যের হ্রাস ঘি,

ডালডা ইত্যাদি বাড়াইয়া পূরণ করা হইয়াছে। কিন্তু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য স্নেহ-প্রধান খাদ্যের তুলনায় সস্তা। সুতরাং আর্থিক দিক হইতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমাইয়া স্নেহ পদার্থের পরিমাণ বাড়াইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বলা বাহুল্য, যদিও এই খাদ্যের মূল্য পূর্বোক্ত খাদ্য হইতে অপেক্ষাকৃত কম তবুও সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে এই পরিমাণ খাদ্যও আয়ত্তের বাহিরে। কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রাণিজ প্রোটিনের পরিমাণ আরও কমাইলে খাদ্যের সুষমতা বজায় থাকিবে না।

দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত বাঙালীর দৈনিক খাদ্যের যে আভাস আমরা পাই তাহা এই পরিমাণ খাদ্য অপেক্ষাও অনেক কম। প্রাণিজ প্রোটিনের অভাব এই খাদ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এইজন্যই মধ্যবিত্ত, দরিদ্র বাঙালীর স্বাস্থ্য এত দুর্বল ও অপুষ্ট।

গর্ভবতী নারীর খাদ্য

(Diet during Pregnancy)

শিশু গর্ভে আসিবার পূর্ব হইতেই নারীকে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে হয়। রুগ্ন ও দুর্বল নারী কখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের মা হইতে পারে না। গর্ভকালে যাহাদের ওজন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম থাকে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহাদের অকালে গর্ভপাত হয় এবং তাহারা টক্সেমিয়া (toxemia) ও ইক্ল্যাম্প্‌সিয়া (Eclampsia) নামক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে গর্ভবতী নারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং সন্তান গর্ভে আসিবার প্রাক্কালে নারীর দেহের স্বাভাবিক ওজন রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইবে গর্ভস্থ ভ্রূণের। ইহার ফলে অপরিণত, বিকলাঙ্গ এমনকি মৃত সন্তানও জন্মিতে পারে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যেমন ইক্ল্যাম্প্‌সিয়া রোগ সৃষ্টি হইতে পারে তেমনি অধিক পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রভাবেও ঐ রোগ দেখা দিতে পারে। গর্ভবতী নারীর দেহের ওজন হইতেই সে তাহার উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে পারা যায়। সন্তান গর্ভে আসিবার সময় হইতেই দেহের ওজন ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবে। গর্ভের প্রথম তিনমাসে ৫ পাউণ্ড, দ্বিতীয় তিনমাসে ৮ পাউণ্ড এবং শেষের তিনমাসে ১০ পাউণ্ড—মোটামুটি এই হারে দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইলেই গর্ভবতী নারী তাহার যথোপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে বলিয়া

ধরা যাইতে পারে। দৈনিক খাদ্যের ক্যালোরী বা তাপমূল্য কমাইয়া বা বাড়াইয়া দেহের ওজনের এই হার রক্ষা করা যাইতে পারে।

খাদ্যের তাপমূল্য (Caloric allowance)—গর্ভের প্রথম কয়েকমাসে সাধারণত খাদ্যের তাপমূল্য স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃদ্ধি করিবার তেমন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গর্ভবতী নারীর দেহের ওজন যদি স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকে (underweight) তাহা হইলে খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করিয়া ওজন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। গর্ভের নবমমাসে মেটাবলিজম্ (Metabolism) বৃদ্ধি পায় এইজন্ত এই সময় অধিক তাপমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন হয়। কিন্তু গর্ভের শেষের দিকে গর্ভিণীর হাটা-চলা ইত্যাদি শারীরিক পরিশ্রমের কাজও অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং এই সকল শারীরিক কাজের জন্য পূর্বে যে পরিমাণ তাপ বা শক্তি ব্যয় হইত, গর্ভের শেষের দিকে এই তাপই মেটা-বলিজম্-এর জন্য অতিরিক্ত তাপের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে পারে। এইজন্য গর্ভাবস্থায় খাদ্যের তাপমূল্য স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃদ্ধি না করিলেও চলিতে পারে। একজন অল্প পরিশ্রমী ১০০ পাঃ ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক নারীর স্বাভাবিক অবস্থায় দৈনিক প্রায় ২১০০ ক্যালোরী তাপের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ঐ নারীর গর্ভা-বস্থায়ও দৈনিক ২১০০ ক্যালোরী হইলেই চলিবে।

প্রোটিন (Protein allowance)—নিজের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের পরিপুষ্টির জন্য গর্ভাবস্থায় নারীর প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এই সময় প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইয়া প্রায় ৯০ গ্রাম করা কর্তব্য এবং উক্ত প্রোটিন প্রাণিজ প্রোটিন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং গর্ভিণীর খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ছানা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন থাকিলে টক্সেমিয়া রোগের সম্ভাবনাও কম থাকিবে।

ধাতব লবণ (Mineral allowance)—ভ্রূণের অস্থি-র পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ঘটিত ধাতব লবণের প্রয়োজন। সুতরাং গর্ভিণীর খাদ্যে ঐ সকল ধাতব লবণ ঘটিত খাদ্যদ্রব্য যাহাতে প্রচুর পরিমাণে থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। লৌহঘটিত লবণের অভাব হইলে গর্ভবতী নারীর রক্তাল্পতা (anemia) রোগ হইবার আশংকা থাকে। সুতরাং দৈনিক খাদ্যে যথেষ্ট লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্যেরও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দুধ, ডিম, মাছ ইত্যাদি হইতে এই সকল ধাতব লবণ পাওয়া যাইতে পারে।

ভাইটামিন (Vitamin allowance)—ক্যালসিয়ামের যথাযথ ব্যবহারের জন্য খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভাইটামিন 'ডি'-এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইহার অভাবে ভ্রূণের অস্থি পরিপুষ্ট হইবে না। সুতরাং এই সময় ভাইটামিন 'ডি' যুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিয়া এই ভাইটামিনের অভাব পূরণ করিতে হইবে। মাখন, ডিম, কডলিভার অয়েল, শার্কলিভার অয়েল, ইলিশ মাছ ইত্যাদিতে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়।

অন্যান্য ভাইটামিনঘটিত খাদ্যদ্রব্যও এই সময় খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকা উচিত। ভাইটামিন 'এ' ও 'বি$_2$'-র অভাবে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় শরীর সুস্থ রাখিতে ভাইটামিন বি-কমপ্লেক্স (B-Complex), বিশেষত ভাইটামিন 'বি$_1$' বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। খাদ্যে এই সকল ভাইটামিন উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলে গা-বমি করা, পেটে বেদনা অনুভব করা ইত্যাদি সাধারণ অসুস্থতার লক্ষণগুলি দেখা যায় না। এই ভাইটামিন কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করিয়া শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বোধ বৃদ্ধি করে। গর্ভের শেষ মাসে গর্ভিণীর খাদ্যে ভাইটামিন 'কে'-যুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

একজন গর্ভবতী নারীর গর্ভাবস্থায় প্রত্যহ নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য অথবা ইহার সমান খাদ্যমূল্য-বিশিষ্ট অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

খাদ্য-শস্য (ভাত, রুটি ইত্যাদি)	...	...	১১ আউন্স
দুধ	...	...	২০ ,,
মাছ, মাংস	...	...	৪-৫ ,,
সবুজ শাক-সবজি	...	...	৫ ,,
অন্যান্য তরিতরকারি	...	...	৮ ,,
লেবু জাতীয় ফল	...	...	৫ ,,
মাখন ইত্যাদি	...	...	১ ,,
ডিম	...	...	২টি

ভাইটামিন 'ডি'-এর অভাব পূরণের জন্য প্রত্যহ কয়েক ফোঁটা করিয়া কডলিভার অয়েল বা শার্কলিভার অয়েলও এই খাদ্যের সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্যালাড হিসাবে প্রত্যহ কিছু সবুজ শাক-সবজি ও ফলমূল কাঁচা ও টাটকা অবস্থায় খাওয়া ভাল।

উপরোক্ত খাদ্যে প্রায় ৯৫ গ্রাম প্রোটিন, ১'৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম, ১৬ মিঃ গ্রাম লৌহ, ১৩২০০ আই. ইউ. ভাইটামিন 'এ', ১'৬ মিঃ গ্রাম ভাইটামিন

'বি১,' ২.৯ মিঃ গ্রাম ভাইটামিন 'বি২', ১৩ মিঃ গ্রাম নায়াসিন, ১৭০ মিঃ গ্রাম ভাইটামিন 'সি' পাওয়া যাইবে। এই খাদ্যের তাপমূল্য প্রায় ২১০০ ক্যালোরী। গর্ভিণীর খাদ্যের তাপমূল্য ও উপাদান সমূহের যে আদর্শ পরিমাণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য কর (৪১২ পৃষ্ঠা দেখ)। এই খাদ্যে ঐ উপাদান-সমূহ যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খাদ্যের তাপমূল্য বাড়াইতে বা কমাইতে হইলে খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ পদার্থের পরিবর্তনের সাহায্যেই তাহা করিতে হয়। প্রোটিনের অংশ হইতে কিছু বাদ দিয়া ক্যালোরী মূল্য কমাইলে গর্ভিণীর এবং ভ্রূণের ক্ষতি হইবে।

অনেক গর্ভিণীর গর্ভের প্রথমাবস্থায় গা-বমির ভাব দেখা দেয়। সকালে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যথা—রুটি, জেলী, চিনি, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি গ্রহণ করিলে এই অসুবিধা দূর হয়।

স্তন্যদানকারী নারীর খাদ্য

(Diet for the nursing mother)

জন্মের পর অনেকদিন পর্যন্ত শিশু মায়ের স্তন্য পান করিয়াই বাঁচিয়া থাকে, খাদ্যের জন্য মায়ের উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। শিশুর এই খাদ্যের জন্য মায়ের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। এই সময় নারী যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তাহা প্রধানত দুইটি উদ্দেশ্যে : (১) তাহার নিজের দেহের অভাব পূরণের জন্য এবং (২) শিশুর খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য। শিশুর জন্য মায়ের স্তনে যে দুধের সৃষ্টি হয় উহাতে অন্যান্য দুধের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন থাকে। একগ্রাম দুধের প্রোটিন প্রায় দুই গ্রাম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যের প্রোটিন হইতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং শিশুর খাদ্য এই দুধ প্রস্তুত করিবার জন্য মায়ের খাদ্যে মাছ, মাংস ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রাণিজ প্রোটিনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম এবং লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্য এই সময় প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতে হয়। এই সময় নারীর ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। ১০০ সি. সি. দুধ উৎপন্ন করিতে প্রায় ১৩০ ক্যালোরী তাপের প্রয়োজন হয়। সুতরাং একজন নারী তাহার শিশুকে দৈনিক কতটা দুধ পান করাইবেন তাহার উপরই তাহার প্রয়োজনীয় ক্যালোরীর পরিমাণ নির্ভর করে। দৈনিক একটি শিশুকে ১ পাউণ্ড দুধ পান করাইলে ঐ দুধ উৎপন্ন করিতে প্রায় ৬০০ ক্যালোরী তাপ বা শক্তির প্রয়োজন

হইবে। ১০০ পাউণ্ড ওজনের একজন প্রাপ্তবয়স্ক অল্প পরিশ্রমী নারীর এই সময়ে দৈনিক প্রায় ২৭০০ ক্যাঃ তাপ বা শক্তির প্রয়োজন হয়।

গর্ভবতী নারীর যে খাদ্য তালিকা দেওয়া হইয়াছে উহার সহিত আরও এক পো (৪ ছটাক) দুধ গ্রহণ করিলে এই অতিরিক্ত প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির অভাব পূরণ হইবে। অতিরিক্ত তাপ বা শক্তির অভাব পূরণের জন্য মা তাহার নিজের রুচি অনুযায়ী ভাত, রুটি, মাখন, জেলী ইত্যাদি যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে।

শিশুকে স্তন্যদান বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নারীর এই খাদ্য পরিবর্তন করিয়া স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাহার দেহে মেদ এবং চর্বির সৃষ্টি হইবে এবং Obesity রোগের লক্ষণ দেখা দিবে।

শিশুর খাদ্য

(Diet for the Baby)

উপযুক্ত খাদ্য না হইলে সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান শিশু গড়িয়া তোলা যায় না। জন্মের পরে অন্ততপক্ষে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মাতৃ-দুগ্ধই শিশুর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ খাদ্য। এই সময় অন্যান্য কৃত্রিম খাদ্যের পরিবর্তে মাতৃ-দুগ্ধ পান করাইলে শিশু স্বাস্থ্যবান ও নীরোগ হয়। অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা মাতৃ-দুগ্ধে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) শিশুর খাদ্য অত্যধিক গরম বা ঠাণ্ডা হইলে চলিবে না। সাধারণত শরীরের যে উত্তাপ সেই উত্তাপের খাদ্যই শিশুর পক্ষে উপকারী। মাতৃ-দুগ্ধ সর্বদাই এই উত্তাপে থাকে বলিয়া শিশুর বিশেষ উপযোগী।

(২) অন্যান্য খাদ্য রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত হইবার আশঙ্কা থাকে। মাতৃ-দুগ্ধে এই আশঙ্কা নাই।

(৩) অন্যান্য খাদ্য স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুর পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। এইজন্য এই সকল খাদ্য বিভিন্ন ভাবে প্রস্তুত করিয়া শিশুর উপযোগী করিয়া লইতে হয়।

মাতৃ-দুগ্ধে এইরূপ কোন পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। ইহার উপাদান-গুলি এইরূপে বর্তমান যে শিশুর পরিপাক শক্তির কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

(৪) অন্যান্য খাদ্য গ্রহণে শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য ও নানারূপ ব্যাধির সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। মাতৃ-দুগ্ধে এই সকল রোগ হইবার সম্ভাবনা অনেক কম।

শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করাইবার নিয়ম—শিশুর জন্মের পর মা ও শিশু উভয়েরই কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম প্রয়োজন। সুতরাং জন্মের পর-মুহূর্তেই শিশুকে দুধ পান করাইতে নাই। সাধারণত জন্মিবার ৬ ঘণ্টা পর শিশুকে স্তন্য পান করান উচিত। এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজন হইলে ফুটান জল পান করান যাইতে পারে। দুধ যাহাতে শিশু ভালভাবে হজম করিতে পারে সেইজন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করাইতে হয়। শিশু কাঁদিয়া উঠিলেই উহার ক্ষুধা পাইয়াছে এইরূপ ধারণা ভুল। ক্ষুধা বোধ ছাড়াও শারীরিক অসুস্থতা, বেকায়দায় শোওয়া, অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা লাগা, পেটে বায়ু হইবার ফলে তলপেটে বেদনা অনুভব করা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে শিশু কাঁদিতে পারে। সুতরাং কাঁদিয়া উঠিলেই শিশুকে স্তন্য পান করান উচিত নয়। শিশু দিনে কয়বার খাইবে এবং কতক্ষণ অন্তর খাইবে তাহা নির্ভর করিতেছে শিশুর বয়সের উপর। প্রথম দুইমাস ৩ ঘণ্টা অন্তর মোট ৭ বার, ২ মাস হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৩½ ঘণ্টা অন্তর মোট ৬ বার, ছয় মাসের পর হইতে ৪ ঘণ্টা অন্তর মোট ৫ বার স্তন্য পান করাইতে হয়।

রাত্রে শিশু এবং মা উভয়েরই বিশ্রামের প্রয়োজন। সুতরাং রাত্রে যত কম বার স্তন্য পান করান যায় ততই ভাল। রাত্রে মাঝে মাঝে শিশু জাগিয়া উঠিলে ফুটান জল দেওয়া যাইতে পারে।

উভয় স্তনই অদল-বদল করিয়া শিশুকে পান করান উচিত ; শুধু মাত্র একটি স্তনই চুষিতে দেওয়া উচিত নয়। শিশু প্রতিবারে সাধারণত ১০ হইতে ১৫ মিনিট সময় স্তন্য পান করে। কখনও এই সময় ২০ হইতে ২৫ মিনিট কালও হইতে পারে।

শিশু উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে কিনা তাহা বুঝিবার উপায়—

(১) স্তন্য পান করাইবার পর যদি শিশুকে তৃপ্ত বলিয়া মনে হয় তবে সে তাহার উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে। (২) ইহা ছাড়া স্তন্য পান করিবার পর সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িবে এবং নির্বিঘ্নে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইবে। (৩) উপযুক্ত খাদ্য পাইলে প্রতি সপ্তাহে শিশুর ওজন বৃদ্ধি পাইবে।

শিশুর জন্মের পর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ৫ হইতে ৮ আউন্স এবং পরবর্তী ৬ মাসের প্রতি সপ্তাহে ৪ আউন্স করিয়া ওজন বৃদ্ধি পাইলে সে মাতৃ-স্তন্য হইতে উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

শিশুর জন্মের পর প্রথম ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার দেহের ওজন ও উচ্চতা যেই হারে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

বয়স	গড় উচ্চতা
জন্মিবার সময়	৫১ সেঃ মিঃ বা ২০ ইঞ্চি
প্রথম ৩ মাসে বৃদ্ধি	১০ " " বা ৪ "
দ্বিতীয় ৩ মাসে বৃদ্ধি	৭ " " বা ২$\frac{৩}{৪}$ "
তৃতীয় ৩ মাসে বৃদ্ধি	৪ " " বা ১$\frac{১}{২}$ "
চতুর্থ ৩ মাসে বৃদ্ধি	৩ " " বা ১$\frac{১}{৪}$ "
১ম বৎসরে মোট বৃদ্ধি	২৪ " " বা ৯$\frac{১}{২}$ "
১-২ " " "	১০ " " বা ৪ "
২-৩ " " "	৮ " " বা ৩$\frac{১}{৪}$ "
৩-৫ বৎসরের মধ্যে প্রতিবৎসরে বৃদ্ধি	৬ " " বা ২$\frac{১}{২}$ "

বয়স	গড় ওজন
জন্মিবার সময়	৭$\frac{১}{২}$ পাঃ
৪ মাসে	জন্মিবার সময় ওজন × ২ = ১৫ পাঃ
১ বৎসরে	জন্মিবার সময় ওজন × ৩ = ২২$\frac{১}{২}$ পাঃ
২$\frac{১}{২}$ বৎসরে	জন্মিবার সময় ওজন × ৪ = ৩০ পাঃ
৪ বৎসরে	জন্মিবার সময় ওজন × ৫ = ৩৭$\frac{১}{২}$ পাঃ

মাতৃস্তন্য হইতে উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে, (১) স্তন্য পানের শেষে সে মোটেই তৃপ্ত হইবে না, সর্বদাই নানাভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিবে। (২) মেজাজ খিটখিটে হইবে এবং স্তন্য পান করিবার অব্যবহিত পরেই ঘুমাইয়া পড়িবে না। (৩) ঘুম অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না এবং মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিবে। (৪) সন্তোষজনকরূপে তাহার দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইবে না। এই অবস্থায়

মাতৃস্তন্যের সহিত শিশুকে অন্যান্য খাদ্য খাওয়াইয়া তাহার উপযুক্ত পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিশুকে মাই ছাড়ান (weaning the baby)—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে ধীরে ধীরে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করাইয়া অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত করিতে হয়। ৬ মাস বয়স হইতেই এই অভ্যাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হয় এবং ১২ মাস বা ১ বৎসর বয়সের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উহাকে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করাইয়া অন্য খাদ্য দেওয়া উচিত। মাতৃদুগ্ধ আদর্শ খাদ্য হইলেও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃদুগ্ধের সহিত অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য কিছু কিছু না খাওয়াইলে শিশুর পরিপূর্ণ পুষ্টি হয় না। এইজন্য ২।৩ মাস বয়স হইতেই শিশুকে ফলের রস দেওয়া উচিত। সুতরাং বলিতে গেলে এইসময় হইতেই শিশুর বদলী খাদ্য খাইবার অভ্যাস আরম্ভ হয়। প্রথমে চায়ের চামচের সিকি (¼) চামচের রস দিয়া শুরু করিয়া ৪।৫ মাস বয়সে ২।৩ চামচ এবং ৬ মাস বয়সে বড় চামচের ২।৩ চামচ দিতে হয়। গাজরের রস, কমলা লেবুর রস. টমেটোর রস বিশেষ উপকারী। তিন মাস বয়স হইতে সিরিয়াল জাতীয়, খাদ্য-দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমে দুধ ও সুজির পাতলা মণ্ড এবং অভ্যস্ত হইবার পর ঐ মণ্ড ঘন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমে অল্প পরিমাণে মণ্ড দিয়া শুরু করিতে হয় (দৈনিক ১ চামচ হইতে ২ চামচ)। ১০।১২ দিনের মধ্যে পরিমাণ বাড়াইয়া দৈনিক ৬ আউন্স করা যাইতে পারে। প্রথম বৎসরের শেষের দিকে যখন শিশু ৪ ঘণ্টা অন্তর খাদ্য খাইবে তখন ৬ আউন্স বা এক গ্লাস মণ্ড খাওয়ান চলিতে পারে। এই প্রকার মণ্ড অভ্যস্ত হইলে পরে জল না মিশাইয়া খাঁটি দুধেই নানা রকম মণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে পারা যায়। সিরিয়ালে অভ্যস্ত হইবার পরে পাঁচ মাস বয়স হইতে শিশুকে সিদ্ধ তরকারী ভাল করিয়া চট্‌কাইয়া খাইতে দেওয়া ভাল। ৭-৮ মাসের শিশুকে টোস্ট তরকারি এবং মাছ-মাংসের স্যুপ দেওয়া যায়। ৯-১০ মাসের শিশুকে সুসিদ্ধ মাছ বা মাংস ভাল করিয়া চট্‌কাইয়া একদিন অন্তর একদিন ½ হইতে ১ আউন্স করিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। মাছ-মাংসের বদলে ২০ হইতে ৩০ গ্রাম ছানাও দেওয়া চলে।

শিশুকে নূতন খাদ্য দেওয়া শুরু করিলে স্তন্যপান বারে কমাইয়া দিতে হয়। প্রথম বৎসরের শেষভাগে শিশুকে ২ হইতে ৩ আউন্স ফল বা বিভিন্ন শাক-সবজির রস এবং ১ হইতে ৩ গ্লাস ফুটান জল পান করান দরকার।

শিশুর প্রথম বৎসরের কয়েকটি খাদ্য প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি।

সুজির মণ্ড (পাতলা)—একটি গ্লাসের ¾ ভাগ জল একটি প্যান বা কড়াইতে ঢালিয়া অল্প আঁচে উনানে চাপাও, ইহাতে সামান্য একটু লবণ দাও। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে ছোট চামচের দুই চামচ সুজি জলে মিশাইয়া অনবরত নাড়িতে থাক। মণ্ড ঘন হইয়া উঠিলে (১০-১৫ মিঃ) আধ গ্লাস দুধ ঢালিয়া নাড়িতে থাক। একটু ফুটিবার পর এক চামচ চিনি দিয়া নাড়িয়া নামাইয়া ফেল।

সুজি ও দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অপেক্ষাকৃত ঘন মণ্ড প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ভাতের মণ্ড—বড় চামচের এক চামচ চাউল ভাল করিয়া ধুইয়া এক গ্লাস জলের সহিত একটি প্যান বা কড়াইতে লইয়া উনানে প্রায় ৪০-৫০ মিনিট ফুটাইতে হইবে। জল শুকাইয়া গেলে প্রয়োজন মত জল মিশাইয়া লইবে। ভাত সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতেই উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। এইবার একটি পরিষ্কার ন্যাকড়া বা ছাঁকনির সাহায্যে ছাঁকিয়া উহার সহিত আধ গ্লাস গরম দুধ, সামান্য একটু লবণ এবং এক চামচ (ছোট) চিনি মিশাইয়া আবার একটু ফুটাইয়া লইবে। উনান হইতে নামাইয়া ইহার সহিত ছোট চামচের আধ চামচ মাখন মিশাইলেই মণ্ড প্রস্তুত হইবে।

ফল ও সবজির রস—ফলের রস প্রস্তুত করিতে কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(১) হাত ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

(২) রস প্রস্তুত করিবার বাসনপত্র, যথা—প্লেট, পেয়ালা, চামচ, ন্যাকড়া, ছাঁকনি ইত্যাদি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া শেষবার গরম জল দ্বারা ধুইয়া লইতে হইবে।

(৩) ফলের রস প্রস্তুত করিতে এক প্রকার পেষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্রটি রস প্রস্তুত করিবার পর উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া রাখিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন কোন ফলের টুকরা ঐ যন্ত্রে লাগিয়া না থাকে।

(৪) ব্যবহারের পর সমস্ত বাসনপত্র উত্তমরূপে ধুইয়া, শুকাইয়া এমন স্থানে রাখিতে হইবে যেন তাহাতে মাছি উড়িয়া না বসে।

(৫) ফলের রস কখনও পূর্বে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে নাই। শিশুকে খাইতে দিবার সময়ই ঐ রস প্রস্তুত করিতে হয়।

কমলা লেবুর রস—প্রথমে ঠাণ্ডা জল এবং পরে গরম জল দ্বারা কমলা লেবুর বাহিরের দিকটা ভাল করিয়া ধুইয়া খোসা ছাড়াইয়া কোয়াগুলি একটা প্লেটে পরিষ্কার ন্যাকড়ার উপর রাখ। ন্যাকড়ার মধ্যে কোয়াগুলি মোচড়াইয়া বাহির হইতে বড় চামচের সাহায্যে চাপিয়া রস বাহির কর। এইবার রসটুকু পেয়ালায় ঢালিয়া লও।

টমেটোর রস প্রস্তুত করিতে হইলে টমেটো চাক্‌চাক্ করিয়া কাটিয়া ন্যাকড়ার সাহায্যে উপরোক্ত উপায়ে প্রস্তুত করিতে হয়।

গাজরের রস—গাজরগুলি ভাল করিয়া ধুইয়া খোসা ছাড়াইয়া ফেল। তারপর আবার ভাল করিয়া গরম জলে ধুইয়া পেষণ যন্ত্রে পিষিয়া ন্যাকড়ার সাহায্যে কমলা লেবুর রসের ন্যায় রস প্রস্তুত কর।

খাইবার পরে ফলের রস দিতে পারিলেই ভাল। তবে যদি কোন শিশু খাইবার পরে রস খাইতে না চায় তবে তাহাকে খাইবার পূর্বেই ঐ রস দিতে হইবে।

আলুর হালুয়া—সাধারণ আকারের তিনটি আলু জলের সহিত একটি প্যান বা কড়াইতে লইয়া উনানে চাপাইয়া প্রায় আধ ঘণ্টা ফুটাইবে। সিদ্ধ হইলে খোসা ছাড়াইয়া একটি চামচের সাহায্যে ভাল করিয়া পিষিয়া ফেল। তারপর আধ গ্লাস গরম দুধ এবং সামান্য লবণ মিশাইয়া একটু ফুটাইয়া লও। আলুর শক্ত টুকরা যেন না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। ছোট চামচের আধ চামচ মাখন অথবা ডিমের হলুদ অংশ ইহার সহিত মিশাইয়া লইলেই উত্তম হালুয়া প্রস্তুত হইবে।

তরকারির ঘন স্থুপ—তরকারিগুলি (আলু, গাজর, বাঁধাকপি ইত্যাদি) ভাল করিয়া ধুইয়া খোসা ছাড়াইয়া ফেল। তারপর ছোট ছোট টুকরা করিয়া প্রয়োজন মত জলের সহিত একটি প্যান বা কড়াইতে করিয়া উনানে চাপাইয়া দাও। প্যানের মুখটি একটি ঢাক্‌না দ্বারা ঢাকিয়া দাও। ভাল করিয়া সিদ্ধ হইলে নামাইয়া প্রয়োজন মত লবণ দাও। এইবার একটি চামচের সাহায্যে তরকারিগুলি ভাল করিয়া পিষিয়া উহাতে একটু মাখন এবং মটরশুঁটি বাটা মিশাইয়া লও।

এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে কোন মশলা বা মশলা মিশ্রিত খাদ্য-দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নয়।

ছানা প্রস্তুত—দুধ ফুটাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে দুই সের দুধে একটা গোটা লেবুর রস দাও। দুধটা কাটিয়া গেলে একটা ন্যাকড়ায় করিয়া ছানাটা ছাঁকিয়া লও। ছানাসহ ন্যাকড়াটি ঝুলাইয়া রাখিলে অবশিষ্ট জল ঝরিয়া ছানা প্রস্তুত হইবে।

শিশুর খাদ্য তালিকা

১ম মাস—	স্তন্য পান—৩ ঘণ্টা অন্তর, দিনে ৭ বার। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে স্তন্য পানের শেষে ২।১ ফোঁটা করিয়া কড লিভার অয়েল বা-শার্ক লিভার অয়েল খাওয়াইতে অভ্যাস করিবে। শিশু খাইতে না চাহিলে স্তনের দুধের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। তৃতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহে এই পরিমাণ ২।১ ফোঁটা হইতে বাড়াইয়া অর্ধ চামচ (ছোট) করিতে হয়। তৃতীয় সপ্তাহে শিশুকে স্তন্য পান করাইবার ১½ ঘণ্টা পরে ½ চামচ কমলালেবুর রসের সহিত ½ চামচ ফুটান জল মিশাইয়া পান করিতে দাও। ৪র্থ সপ্তাহে ইহা বাড়াইয়া ২ চামচ করিতে পার। কডলিভার অয়েল পেটে সহ্য না হইলে (বিশেষ করিয়া গরমের সময়) কোন ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া ভাইটামিন জাতীয় ঔষধ খাওয়ান যাইতে পারে।
২য় মাস—	স্তন্য পান—দিনে ৬ বার ৩½ ঘণ্টা অন্তর। কড লিভার অয়েলের পরিমাণ বাড়াইয়া ¾ চামচ কর। এই অয়েল ২।৩ বারে খাওয়াইবে। কমলালেবুর রসের পরিমাণ বাড়াইয়া ২ আঃ বা ১ ছটাক কর। ইহা সমপরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া ৩।৪ বারে দুধ খাইবার ১½ ঘণ্টা পর পর খাওয়াইবে। কমলালেবুর বদলে টমেটোর রস খাওয়াইলে দ্বিগুণ পরিমাণ দিবে।
৩য় মাস—	স্তন্য পান—দিনে ৬ বার, ৩½ ঘণ্টা অন্তর। কড লিভার অয়েলের পরিমাণ বাড়াইয়া ১ চামচ (ছোট) কর। ৩।৪ বার দিবে। কমলালেবুর রস বাড়াইয়া ৩ আঃ বা ১½ ছটাক কর। মাঝে মাঝে জল ছাড়া শুধু রস খাওয়াইবে। ৩য় মাস হইতে সিরিয়াল দিতে পার।

শিশুর খাদ্য তালিকা

৪র্থ মাস—	স্তন্য পান—দিনে ৬ বার, ৩½ ঘণ্টা অন্তর। কড লিভার ও কমলালেবুর রস ৩য় মাসের ন্যায়। আগে সিরিয়াল না দিয়া থাকিলে এই সময় পাতলা সুজির মণ্ড খাওয়াইতে অভ্যাস করাইতে হইবে। দিনে একবার প্রথমে ১ চামচ (ছোট), ধীরে ধীরে বাড়াইয়া ২।৩ চামচও করা যাইতে পারে।
৫ম মাস—	রাত্রি দশটার পরে মাতৃ-স্তন্য বন্ধ করিয়া দাও। রাত্রে শিশু জাগিয়া উঠিলে দুধের পরিবর্তে ফুটান জল খাইতে দিবে। কড লিভার অয়েল এবং কমলালেবুর রস পূর্বের ন্যায়। গাজর, পালং, লেট্যুস, বাঁধাকপি ইত্যাদি উত্তমরূপে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দাও। সিদ্ধ করিবার সময় প্যান বা কড়াইয়ের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে, যাহাতে ভাইটামিন নষ্ট হইতে না পারে। সিদ্ধ সবজিগুলি থেঁতলাইয়া একটু লবণের সহিত মিশাইয়া দিলে প্রথমে ২ চামচ এবং পরে বাড়াইয়া ৩।৪ চামচ করা যাইতে পারে।
৬ষ্ঠ মাস—	মাতৃস্তন্য, কড লিভার অয়েল, কমলালেবুর রস ও শাক-সবজির রস ৫ম মাসের ন্যায়।
৭ম মাস—	স্তন্য পান প্রয়োজন মত কমাইতে পার। কড লিভার অয়েল, কমলালেবুর রস পূর্বের ন্যায়। এই সময় সিদ্ধ শাক-সবজি ব্যতীত দিনে একবার তরকারির সুপও খাওয়াইবে। সিদ্ধ ডিমের কুসুম (সাদা অংশ বাদে) বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। প্রথমে ১ চামচ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে বাড়াইবে। সাত আট মাসের শিশুকে টোস্ট এবং মাছমাংসের সুপও দেওয়া যায়।

শিশুর খাদ্য তালিকা

৮ম মাস—	কড লিভার অয়েল, কমলালেবুর রস পূর্বের ন্যায়। শাক-সবজির পরিমাণ বাড়াও। আলুর হালুয়া, ভাত ও আলু চটকান ইত্যাদি দাও। ডিমের পরিমাণ বাড়াইয়া প্রত্যহ ১টি করিয়া কুসুম খাওয়াইবে। সুজির মণ্ড জল না মিশাইয়া শুধু দুধের সাহায্যে প্রস্তুত কর এবং ইহার পরিমাণ বাড়াও।
৯ম—১২শ মাস	আহারের সময় পরিবর্তন কর। দিনে ৪ বার খাওয়াইবে ; সকাল ৬টায়, সকাল ৭½টায়, দুপুর ১২টায় এবং সন্ধ্যা ৬টায়।
সকাল ৬ টায়—	কমলালেবুর রস—৩ আঃ বা ১½ ছটাক। পাকা কলা চট্‌কান—১টি।
সকাল ৭½ টায়	প্রাতরাশ—গরুর দুধ ৮ আউন্স, এক টুকরা পাঁউরুটি, শাক-সবজি বা তরকারির সুপ ১-২ চামচ (বড় চামচের), কড লিভার অয়েল ১ চামচ (ছোট)।
দুপুর ১২ টায়—	মধ্যাহ্ন ভোজন—১টি কুসুম, ২-৪ চামচ (বড়) ভাত এবং আলু সিদ্ধ, ২-৪ চামচ তরকারির সুপ, ৮ আউন্স দুধ।
সন্ধ্যা ৬ টায়—	সান্ধ্য ভোজন—ভাত এবং আলু সিদ্ধ—২-৪ চামচ (বড়), দুধ—৮ আউন্স, আপেল, আম ইত্যাদি বিভিন্ন ফল নরম করিয়া ১-২ চামচ (বড়)।

প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণ ফুটান জল পান করান উচিত। আহারের অন্তত একঘণ্টা পর জল দিবে।

শিশুর অন্যান্য খাদ্য—অনেক সময় মা অসুস্থ হইলে বা অন্যান্য কারণে শিশুকে স্তন্য পান না করাইয়া গরুর দুধ, জমানো টিনের দুধ বা বোতলের খাদ্য ইত্যাদি খাওয়াইতে হয়। যে সকল কারণে শিশুকে এই বদলী খাদ্য খাওয়াইতে হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) মা যখন টাইফয়েড, যক্ষা, রক্তাল্পতা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে অনেক দিন হইতেই ভুগিতে থাকে,

(২) মাতৃ-দুগ্ধের স্বল্পতা ঘটিলে,

(৩) মা দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হইলে,

(৪) মাকে বাহিরের কাজে যাইতে হইলে,

এই সকল বিভিন্ন অবস্থার উদ্ভব হইলে শিশুকে মাতৃ-দুগ্ধের বদলে বা মাতৃ-দুগ্ধের সহিত অন্যান্য খাদ্যও খাওয়াইতে হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতৃ-দুগ্ধের পরিবর্তে গরুর দুগ্ধই খাওয়ান হইয়া থাকে, কারণ, ইহা সহজলভ্য। গরুর দুগ্ধে নানা দূষিত পদার্থ থাকিতে পারে। সুতরাং না ফুটাইয়া কখনও উহা শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নয়। গরুর দুগ্ধের উপাদানসমূহ মাতৃ-দুগ্ধের অনুরূপ নয়। এই কারণে উহার সহিত পরিমাণ মত জল মিশাইয়া শিশুকে খাওয়াইতে হয়। জলশূন্য টাট্‌কা দুধ প্রথম প্রথম শিশুর পেটে সহ্য হইবে না। উভয় প্রকার দুধের প্রতি ১০০ গ্রামের উপাদানসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল।

উপাদান	গরুর দুগ্ধ	মাতৃ-দুগ্ধ
প্রোটিন	৩·৩ গ্রাম	১·২ গ্রাম
স্নেহ	৩·৮ ,,	৩·৮ ,,
কার্বোহাইড্রেট	৪·৮ ,,	৭·০ ,,
তাপশক্তি	৬৯ ক্যালোরী	৭১ ক্যালোরী
ক্যালসিয়াম	১২৬ মিঃ গ্রাম	৩৪ মিঃ গ্রাম
ফস্‌ফরাস	৯৯ ,, ,,	১৬ ,, ,,
লৌহ	·১৩ ,, ,,	০·২১ ,, ,,
ভাইটামিন 'এ',	৩৭ মাইক্রো গ্রাম	৬৪ মাইক্রো গ্রাম
ক্যারোটিন	৩৯ ,, ,,	৩২ ,, ,,
ভাইটামিন 'বি১',	৪২ ,, ,,	১৫ ,, ,,
,, 'বি২'	১৫৮ ,, ,,	৪৭ ,, ,,
নায়াসিন	৮৫ ,, ,,	১৭২ ,, ,,
ভাইটামিন 'সি'	১·৮ মি. গ্রাম	৪·৪ মিঃ গ্রাম

উভয় দুগ্ধেই স্নেহ পদার্থের পরিমাণ সমান। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ মাতৃ-দুগ্ধে বেশী বলিয়া গরুর দুগ্ধ অপেক্ষা মাতৃ-দুগ্ধের মোট ক্যালোরী মূল্য বেশী। প্রোটিন মাতৃ-দুগ্ধ অপেক্ষা গরুর দুগ্ধেই বেশী। গরুর দুগ্ধের প্রধান প্রোটিন ক্যাসিন এবং মাতৃ-দুগ্ধের প্রধান প্রোটিন ল্যাক্টো-অ্যালবুমিন। এইজন্য গরুর দুগ্ধ হজম করা শিশুর পক্ষে কষ্টসাধ্য। অস্থি গঠনের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস—মাতৃ-দুগ্ধ অপেক্ষা গরুর দুগ্ধেই বেশী। লৌহের পরিমাণ উভয় দুগ্ধেই কম এবং প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

গরুর দুগ্ধ ছাড়াও অন্যান্য খাদ্য, যথা—ছাগলের দুগ্ধ, টিন ও বোতলের খাদ্য শিশুকে খাওয়ান হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার টিনের খাদ্যের মধ্যে ল্যাক্টোজেন, ল্যাক্টোডেক্স, গ্লাক্সো ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল খাদ্য নির্দোষ এবং প্রস্তুত প্রণালীও সহজ।

বিদ্যালয়ের শিশুদের খাদ্য

(Diet for the school-going children)

দেহের প্রতিনিয়ত পুষ্টি ও বৃদ্ধি ছাড়াও লেখাপড়া প্রভৃতি স্নায়বিক পরিশ্রমের জন্য বিদ্যালয়ের শিশুর খাদ্যে অধিক পরিমাণে প্রাণিজ প্রোটিনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই শ্রেণীর শিশুর খাদ্যে প্রোটিন এবং ভাইটামিনের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। শিশুকে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট ও অবসাদগ্রস্ত দেখিলে তাহার খাদ্যে উপযুক্ত প্রোটিন, শাক-সবজি ও ফলমূলের অভাব হইতেছে বুঝিতে হইবে। লেখাপড়া ছাড়াও এই সময় শিশু খেলাধূলা প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ যথেষ্টই করিয়া থাকে। সুতরাং খাদ্যে উপযুক্ত ক্যালোরীর ব্যবস্থা না থাকিলে তাহার দেহের ওজন কমিয়া যাইবে। উপযুক্ত পরিমাণ তাপ ও শক্তির জন্য কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহজাতীয় খাদ্যদ্রব্য, যথা—ভাত, রুটি, মাখন ইত্যাদিও প্রয়োজনীয় পরিমাণে শিশুর খাদ্যে স্থান পাইবে। যাহারা সকাল দশটা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টা স্কুলে থাকে তাহাদের জন্য মাঝে একবার ভাল টিফিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কোন কোন জায়গায় স্কুল হইতেই এই টিফিনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যদি স্কুলের টিফিন পর্যাপ্ত না হয় অথবা স্কুল হইতে টিফিনের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে বাড়ী হইতেই ইহা লইয়া যাইতে হইবে। এই টিফিনে মাখন, রুটি, ডিম, কিছু ছানা বা পনীর, কিছু ফল এবং দুধের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। শিশুর প্রাত্যহিক খাদ্যে সকল উপাদানই যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, সেইজন্য

ঐ খাদ্য তালিকা প্রস্তুতিতে খাদ্যের বিভিন্ন বিভাগের (৪২৩ পৃষ্ঠা দেখ) সাহায্য লইতে হয়। নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য বিদ্যালয়ের শিশুর খাদ্যে অবশ্যই থাকিবে :—

দুধ ··· ··· ৮ ছটাক

ডিম··· ··· ১টি

মাছ, মাংস ··· ··· ১½—২½ আউন্স

সবুজ শাক-সবজি ··· ··· ৩—৪ আউন্স

ইহার সহিত কিছু ফল, যথা—কলা, আপেল, আম ইত্যাদি, কিছু মাখন এবং ১টি টাটকা ও কাঁচা টমেটো বা কমলালেবু।

বিভিন্ন শিশুর প্রাত্যহিক ক্যালোরীর প্রয়োজনের পরিমাণ বিভিন্ন। পূর্ব বর্ণিত তালিকা হইতে (৪১২ পৃষ্ঠা দেখ) ঐ ক্যালোরীর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া শিশুকে উপরের খাদ্যের সহিত প্রয়োজনমত ভাত, রুটি, আলু, বনস্পতি প্রভৃতি তাপ উৎপাদক খাদ্য দিতে হইবে। মাঝে মাঝে শিশুর দেহের ওজন লইয়া সে তাহার উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে কিনা দেখিবে।

স্কুল টিফিন
(School Tiffin)

স্কুলের টিফিনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে এ পর্যন্ত বড় একটা দেখা যায় নাই। ছেলে মেয়েরা বাড়ী হইতে ৯-১০টায় খাইয়া স্কুলে যাইত এবং স্কুলের শেষে ৪।৫টায় বাড়ী ফিরিয়া খাইতে পাইত। মাঝে এই দীর্ঘ ৬।৭ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে স্কুলে তাহাদের খাইবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এই ব্যবস্থা যেমন বিদ্যাশিক্ষার প্রতিকূল তেমনি অস্বাস্থ্যকর। তাই অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আজকাল এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহারা ইহার সুব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন।

ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুষ্ঠু বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুলে টিফিনের বন্দোবস্ত করা যে অপরিহার্য একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সাধারণত স্কুলে যাইবার সময় ব্যস্ততার জন্য অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক কম খায়। এই খাদ্য পেটে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী থাকে না। সুতরাং যে দীর্ঘ সময় তাহারা স্কুলে থাকে সেই সময়ের মধ্যে একবার খাদ্যের ব্যবস্থা না করিলে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। স্বাস্থ্যের কথা বাদেও ক্ষুধার জন্য মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হইবে এবং সুষ্ঠুভাবে মস্তিষ্ক চালনা করা

সম্ভব হইবে না। ফলে বিদ্যাশিক্ষার কাজেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে। সুতরাং বিদ্যার্থীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিদ্যাশিক্ষার কাজটি যথাযথরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করিতে হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকটাই আগে চিন্তা করিতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে মস্তিষ্কের কাজই সর্বাপেক্ষা বেশী, সুতরাং এই মস্তিষ্ক চালনার কাজটি সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্য উহাদের টিফিনে প্রধানত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন, ভাইটামিন এবং ধাতব লবণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট প্রোটিন ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে স্কুলে ডিম এবং দুধের ব্যবস্থা করাই সুবিধাজনক। একটি করিয়া অর্ধ সিদ্ধ ডিম বা এক পো দুধ দেওয়া যাইতে পারে। ডিমের মধ্যে ভাইটামিন 'এ' থাকে। সুতরাং এই সঙ্গে ভাইটামিন 'এ'-র অভাবও পূরণ হইবে। দুধের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন বাদে প্রচুর ক্যালসিয়ামও পাওয়া যায়। ছেলে-মেয়েদের দেহের হাড় গঠনে এই ক্যালসিয়াম যথেষ্ট সহায়তা করে। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'বি'-র অভাবও ইহাতে অনেকটা পূরণ হইয়া থাকে। ডিম এবং দুধের সহিত ধাতব লবণ ও ভাইটামিন সরবরাহের জন্য এই সঙ্গে ফলের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বিভিন্ন ফলের মধ্যে স্কুলে কলা, কমলালেবু ইত্যাদি অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য ভাইটামিনের সহিত প্রধানত ভাইটামিন 'সি' কমলালেবু হইতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং স্কুলের টিফিনে ডিম, দুধ, কলা, কমলা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ছেলে-মেয়েরা ক্লাশের সময় ঘরে আবদ্ধ থাকিলেও টিফিনের সময় খেলা-ধূলা ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজ করিয়া থাকে। এইজন্য তাহাদের টিফিনে কিছুটা উচ্চতাপ মূল্যের খাদ্যও থাকা প্রয়োজন। সুতরাং উপরের খাদ্যের সহিত কিছু কেক, পুডিং, আইসক্রীম ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিম্নে এইরূপ একটি টিফিনের নমুনা দেওয়া হইল।

দুধ ··· ··· ১ পো,
কেক ··· ··· ১ টুকরা,
কলা ··· ··· ১ টি,
কমলালেবু ··· ··· ১ টি,

মাঝে মাঝে দুধের বদলে ডিম এবং কেক-এর বদলে পুডিং, আইসক্রীম-এর

ব্যবস্থা করিয়া টিফিনে বৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে। যেখানে স্কুলে টিফিনের কোন ব্যবস্থা করা হয় না সেখানে বাড়ী হইতেও এই টিফিন লইয়া যাইতে পারা যায়।

কিশোর কিশোরীর খাদ্য

(Diet for Adolescent children)

শৈশব হইতে কৈশোরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বালক-বালিকার দেহে ও মনে অপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় দেহের মেটাবলিজম্ (Metabolism) বৃদ্ধি পায়। এইজন্য খাদ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়। বালিকারা এই সময় খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে। সুন্দর এবং কৃশ (slim) হইবার জন্য অনেক সময় তাহারা খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ খাদ্য হইতে বাদ দেয়, ফলে রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ে। এই সকল কিশোরী ভবিষ্যতে কখনই সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান শিশুর মা হইতে পারে না। সুতরাং কিশোর অপেক্ষা কিশোরীদেরই খাদ্য সম্বন্ধে অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এই সময় খাদ্যে অধিক পরিমাণ প্রোটিন, ভাইটামিন, ক্যালসিয়াম এবং কিশোরীদের খাদ্যে যথেষ্ট লৌহের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রতিদিন অন্তত আধসের দুধ গ্রহণ করিলে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, ভাইটামিন 'বি' এবং প্রোটিনের অভাব পূরণ হইতে পারে। ক্যালসিয়ামের যথাযথ ব্যবহারের জন্য ভাইটামিন 'ডি'-যুক্ত খাদ্য দ্রব্যও ঐ সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব-বর্ণিত (৪১২ পৃষ্ঠা দেখ) তালিকা হইতে প্রাত্যহিক ক্যালোরীর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন খাদ্য বিভাগের সাহায্যে একটি সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য একজন কিশোর কিশোরীর প্রত্যহ অবশ্যই গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আধ সের (৮ ছটাক) দুধ,

১টি ডিম,

২½—৫ আঃ মাছ, মাংস,

৯—১০ আঃ সবুজ শাক-সবজি ও তরিতরকারি,

৫—৬ আঃ বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল। এই ফলের মধ্যে টমেটো, কমলালেবু ইত্যাদি ভাইটামিন 'সি'-যুক্ত খাদ্য অবশ্যই থাকিবে,

কিছু মাখন।

প্রয়োজনীয় ক্যালোরীর জন্য এই খাদ্যের সহিত ভাত, রুটি, আলু, চিনি, গুড়, ঘি ইত্যাদির ব্যবস্থাও করিতে হইবে। প্রতি সপ্তাহে ওজন লইয়া উপযুক্ত ওজন রক্ষা করিবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে হইবে। এই সময় অত্যধিক রোগা বা মোটা হইলে পরবর্তী জীবনে তাহার কুফল ভুগিতে হইবে। সুতরাং খাদ্য-দ্রব্যের উপর এই সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

বৃদ্ধের খাদ্য

(Diet for older people)

বৃদ্ধ বয়সে দেহযন্ত্রের প্রতিটি অংশেরই কার্যক্ষমতা কমিয়া যায়। সুতরাং খাদ্যের পরিমাণও এই সময় কমাইতে হয়। শিশুর খাদ্য ব্যবস্থায় যেমন উহার দৈহিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, তেমনি বৃদ্ধের খাদ্য ব্যবস্থায় উহার দৈহিক্ ক্ষয় পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। পঁচিশ বৎসরের উর্ধ্বে যতই বয়স বৃদ্ধি পায় ততই খাদ্যের তাপমূল্য ধীরে ধীরে কমাইতে হয়। এই সময় শুধু দেহের ক্ষয় পূরণের জন্যই প্রোটিনের প্রয়োজন হয় বলিয়া খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ সামান্য হ্রাস করিতে হয়। স্নেহপদার্থ হজমের শক্তিও এই বয়সে অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং খাদ্যে স্নেহের পরিমাণ কমাইয়া সহজপাচ্য স্নেহজাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করিলে পেটের গণ্ডগোল লাগিয়া থাকিবে। দুধের স্নেহ সহজপাচ্য সুতরাং স্নেহের অভাব তেল, ডালডা ইত্যাদি খাদ্যের বদলে দুধ, মাখন প্রভৃতি হইতে পূরণ করাই ভাল। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণও এই বয়সে কমাইতে হয়। বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট, যথা—চিনি, মিশ্রি ইত্যাদি কম খাইয়া রুটি, ভাত (অন্ন), ইত্যাদির সাহায্যেই কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ করা কর্তব্য। বিভিন্ন ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় লবণ। খাদ্যে উপযুক্ত ক্যালসিয়াম থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যৌবন কাল অধিক দিন স্থায়ী হয়। এইজন্য দুগ্ধ বৃদ্ধের খাদ্যের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া গণ্য করা হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৃদু রক্তাল্পতাও দেখা দেয়। সুতরাং লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধের খাদ্যের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা উচিত। মাঝে মাঝে যকৃতের ব্যবস্থা করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব সূচিত করে। সুতরাং বৃদ্ধের খাদ্যে প্রচুর

পরিমাণ ফলের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। শাক-সবজির পরিমাণ একটু কমাইয়া দেওয়া ভাল, কারণ শাক-সবজির দুষ্পাচ্য সেল্যুলোজ (Cellulose) অজীর্ণ ও বদহজমের সৃষ্টি করিতে পারে। ফলমূল এবং বিভিন্ন খাদ্য-শস্যের (cereals) অপেক্ষাকৃত মৃদু সেল্যুলোজই বৃদ্ধের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া শরীর সুস্থ রাখিবে। এই সকল খাদ্যের সহিত প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ জল পান করিতে হইবে।

শারীরিক সুস্থতার জন্য বৃদ্ধকে নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যহ গ্রহণ করিতে হইবে।

এক পো হইতে আধ সের দুধ,
৩—৪ আঃ বিভিন্ন ফল,
৩—৪ আঃ তরি-তরকারি,
একদিন অন্তর একদিন ১টি করিয়া ডিম, কিছু মাছ, মাংস,
টমেটো, কমলা ইত্যাদি, ভাইটামিন 'সি' জাতীয় ফল,
সামান্য মিষ্টি, চা ও কফি (অভ্যাস অনুযায়ী),

শরীরের ওজন ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজনমত ভাত, রুটি, মাখন ইত্যাদি।

শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং অজীর্ণতা নিম্নলিখিত উপায়ে দূর করা যাইতে পারে :—

(১) শাক-সবজি বা ফলের পরিবর্তে ইহার স্যুপ খাইয়া,
(২) খাদ্য-দ্রব্য গরম অবস্থায় খাইয়া,
(৩) খাদ্য-দ্রব্য তিন বারের পরিবর্তে ৪।৫ বারে অল্প অল্প করিয়া খাইয়া,
(৪) রাত্রিতে অল্পপরিমাণ এবং সহজপাচ্য খাদ্য খাইয়া,
(৫) রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে ১ গ্লাস গরম দুধ পান করিয়া।

স্নেহজাতীয় খাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের ভাজা, কেক, পুডিং ও অত্যধিক মিষ্টি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে এই সকল খাদ্যদ্রব্য খাদ্য হইতে বাদ দিতে হইবে।

স্থূলকায় ব্যক্তির খাদ্য

(Diet during overweight and obesity)

অত্যধিক মোটা এবং অত্যধিক ওজনবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে বিরল নয়। ইহা অস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। দেহের অত্যধিক ওজনে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ, বহুমূত্র, বাত ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। মোটা লোক

অল্পতেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং প্রায়ই তাহাদের পিঠ ব্যথা, পা ব্যথা, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শারীরিক অসুবিধার কথা বলিতে শুনা যায়। সুতরাং অত্যধিক মোটা হওয়া মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বয়স এবং উচ্চতা অনুযায়ী শরীরের ওজন ঠিক রাখিতে পারিলেই দেহ সুস্থ ও সুন্দর হইবে। স্বাভাবিক ওজনের (Normal weight) শতকরা ১০ ভাগ কম বা বেশী ওজন অস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয় না। শতকরা ১০ ভাগের বেশী ওজন বৃদ্ধি পাইলেই শরীর অসুস্থ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ওজন কমাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে চেষ্টা করিতে হয়। শতকরা ২০ ভাগ ওজন বৃদ্ধিকেই obesity নামক রোগের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়।

অতিরিক্ত মোটা বা ওজন বৃদ্ধি হওয়ার কারণ—অনেকের ধারণা এই যে, মোটা হওয়া একটি বংশগত ধারা। আসলে কিন্তু বংশের সহিত মোটা হওয়ার কোন সম্বন্ধই নাই। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে কোন পরিবারে আবহমান কাল হইতেই মাখন, ঘি, চিনি ইত্যাদি অত্যধিক তাপমূল্যের খাদ্য বহুল পরিমাণে খাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য মোটা হওয়া প্রায় বংশগত পর্যায়ে দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু আসল কারণ হইতেছে প্রয়োজনের অধিক তাপমূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা।

আবার অনেক সময় পেশা পরিবর্তন করায়ও লোক অত্যধিক মোটা হইয়া যায়। যদি একজন কাঠুরিয়া কাঠ কাটা পরিত্যাগ করিয়া দর্জির কাজ গ্রহণ করে এবং তাহার দৈনিক খাদ্য তালিকার কোনরূপ পরিবর্তন না করে তবে সে অচিরেই অত্যধিক মোটা হইয়া obesity রোগে আক্রান্ত হইবে। একজন কাঠুরিয়ার দৈনিক প্রায় ৫১০০ ক্যালোরী খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একজন দর্জির দৈনিক ২৫০০ ক্যালোরী তাপমূল্যের খাদ্য হইলেই চলিতে পারে। সুতরাং পূর্ব খাদ্য-তালিকার কোন পরিবর্তন না করিলে প্রত্যহ (৫১০০—২৫০০) ২৬০০ ক্যালোরীর খাদ্যদ্রব্য তাহার দেহে মেদ বা চর্বিতে পরিণত হইয়া জমিতে থাকিবে। ফলে তাহার দেহ যেমন মোটা হইবে তেমনি ওজনও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। দৈনিক ১০০ ক্যালোরীর খাদ্যদ্রব্য দেহে জমা হইতে থাকিলে এক সপ্তাহে প্রায় ৭৮ গ্রাম মেদ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একবৎসরে ৯পাউণ্ড ওজন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দৈনিক ২৬০০ ক্যালোরী তাপমূল্যের খাদ্য-দ্রব্য দেহে উদ্বৃত্ত হইতে থাকিলে বৎসরের শেষে দেহের যে অবস্থা হইবে তাহা চিন্তা করিতেও ভয় হয়।

অনেকে আবার যৌবনের খাদ্য বৃদ্ধ বয়সেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং যৌবনের অভ্যাস পরিত্যাগ না করিলে বৃদ্ধ বয়সে অতিরিক্ত খাদ্যের জন্য দেহ স্থূলকায় হইয়া পড়িবে।

কেহ কেহ আবার বাড়ীতে কম খায়, কিন্তু হোটেল, রেস্তোরায় মাখন, টোস্ট, মাংস, আইসক্রীম, কেক, রুটি, মোগলাই পরটা, জেলী, সরবৎ ইত্যাদি উচ্চ তাপমূল্যের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে। তাহারা প্রায়ই এই ভাবিয়া আশ্চর্য হয় যে অল্প খাইয়াও কি করিয়া দিন দিন মোটা হইতেছে।

সুতরাং প্রয়োজনের অধিক তাপ-মূল্যের খাদ্য-দ্রব্য প্রত্যহ গ্রহণ করিবার অভ্যাসই অত্যধিক মোটা হইবার বা ওজন বৃদ্ধি পাইবার সর্বপ্রধান কারণ।

আবার অনেক সময় থাইরয়েড(Thyroid) এবং পিটুইটারী(Petuitary)গ্রন্থি হইতে উপযুক্ত পরিমাণে হরমোন (Hormone) নিঃসৃত না হওয়ায় মেটাবলিজম্ (metabolism) ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। ফলে দেহ স্থূলকায় হয় এবং ওজন বৃদ্ধি পায়। তবে এই কারণে মোটা হওয়া লোকের সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগেরও কম।

সুতরাং অতিরিক্ত মোটা হইবার দ্বিতীয় কারণ দেহে প্রয়োজনীয় হরমোনের অভাব।

চিকিৎসা—দেহের মেদ বা ওজন কমাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে দৈনিক খাদ্য তালিকার পরিবর্তন করিয়া প্রয়োজনীয় ক্যালোরী অপেক্ষা প্রত্যহ কিছু কিছু কম ক্যালোরী বা তাপমূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা। দৈনিক প্রয়োজনীয় মোট ক্যালোরী হইতে ৮০০—১০০০ ক্যালোরী বাদ দিলে মাসে প্রায় ৬—৮ পাউণ্ড ওজন হ্রাস পাইবে। এই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। দ্রুত ওজন কমাইবার জন্য অত্যধিক ক্যালোরী হ্রাস করিলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। প্রতি সপ্তাহে ওজন লইয়া দেখিতে হইবে যে দেহের ওজন নির্দিষ্ট অনুপাতে হ্রাস পাইতেছে কিনা। অনেক সময় শরীরে জল জমিবার জন্য পর পর ২।৩ সপ্তাহ দেহের কোন ওজন হ্রাস পাইতে দেখা যায় না। এইজন্য অনেকেই নিরাশ হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে নিরাশ না হইয়া ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করিতে হয়।

খাদ্য-তালিকার পরিবর্তনের সাথে সাথে শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণও একটু বাড়াইয়া দেওয়া ভাল। ইহাতে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়।

অনেকে ওজন হ্রাস বা অতিরিক্ত মেদ হ্রাস করিবার জন্য নানাপ্রকার ঔষধের সাহায্য লইয়া থাকে। এক্ষেত্রে তাহাদের মনে রাখা উচিত যে খাদ্য তালিকার পরিবর্তন না করিয়া শুধু ঔষধ গ্রহণ করিলে কোন সুফল ফলিবে না। কিছুদিন পূর্বে ডাইনাট্রো ফেনল (Dinitro Phenol) অতিরিক্ত মেদ কমাইবার জন্য ব্যবহার করা হইত। ইহা দেহের মেটাবলিজম (metabolism) বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত মেদ কমাইতে সাহায্য করে। কিন্তু এই ঔষধের অত্যধিক বিষক্রিয়ার জন্য আজকাল আর উহা ব্যবহার করা হয় না। অ্যাম্‌ফেটামাইন (Amphetamine) এই জাতীয় আর একটি ঔষধ এবং ইহাও বিষাক্ত। শরীরকে অত্যধিক উত্তেজিত করিয়া ইহা ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া পেটের নানাপ্রকার রোগও এই ঔষধ ব্যবহারে দেখা দেয়। অন্যান্য যে সকল ঔষধ প্রচলিত আছে তাহার সমস্তই শরীরে নানাপ্রকার বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সুতরাং ঔষধের সাহায্যে মেদ বা ওজন হ্রাস করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার নীতি—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে খাদ্যের ক্যালোরী মূল্য কমাইয়া খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ উপাদানই দেহে তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সাধারণত খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ পদার্থের পরিমাণ কমাইয়াই ক্যালোরীর পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়। খাদ্যের ক্যালোরী হ্রাস করিবার জন্য প্রোটিনের পরিমাণ কমানো চলিবে না। প্রোটিন দেহ নির্মাণ এবং দেহের ক্ষয় পূরণের শ্রেষ্ঠ উপাদান। সুতরাং প্রোটিনের অভাব হইলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ছাড়া প্রোটিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেটে থাকে বলিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেও ইহা সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি বিশেষ কমানো চলিবে না। খাঁটি দুধ অপেক্ষা মাখন তোলা দুধ এই সময় বেশী উপকারী। অনেকে স্নেহ পদার্থ খাদ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন। কিন্তু সামান্য স্নেহ পদার্থ খাদ্যে থাকিলে খাদ্য খাইয়া তৃপ্তি হয় এবং ইহার সহিত কিছু ভাইটামিনও পাওয়া যায়। তেল, ঘি, বনস্পতি বাদ দিয়া সামান্য মাখন খাওয়া যাইতে পারে। তবে এই মাখনের পরিমাণও পূর্বাপেক্ষা কমাইতে হইবে। চিনি, গুড়, মিষ্টান্ন, আলু, রুটি, জেলী, মিশ্রি, কেক, যে কোন ভাজা দ্রব্য একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। চকলেট, আইসক্রীম ইত্যাদিও উচ্চ তাপমূল্যের খাদ্য। সুতরাং ঐ সকল বর্জনীয়।

খাদ্যের ভাইটামিন ও ধাতব লবণের পরিমাণ কোন প্রকারেই কমানো চলিবে না। ইহাদের অভাব হইলে শরীর রুগ্ন ও অসুস্থ হইবে এবং দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। খাদ্যের ক্যালোরী হ্রাস করিবার ফলে যদি ভাইটামিন এবং ধাতব লবণের হ্রাস ঘটে তবে ঐ অভাব অন্য প্রকার খাদ্য হইতে পূরণ করিতে হইবে। সুতরাং খাদ্যে তরি-তরকারি, শাক-সবজি ও ফলমূলের পরিমাণ হ্রাস না করিয়া বরং এই সময় বাড়াইতে হয়। ক্যালোরী কমাইবার জন্য অনেক সময় ক্ষুধাবোধ হইতে পারে। ক্ষুধাবোধ হইলে ফলমূল, তরি-তরকারির সাহায্যেই তাহা পূরণ করিতে হইবে।

নীচে একজন মেদ-বহুল ব্যক্তির খাদ্যের নমুনা দেওয়া হইল।

মাখন তোলা দুধ	৩ কাপ,
ডিম	১ টি,
স্বল্প মেদযুক্ত (lean) মাছ, মাংস	৩—৪ আউন্স,
ভাত, রুটি	পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কম,

শাক-সবজি, তরি-তরকারি, ফলমূল ইত্যাদি স্বাভাবিক পরিমাণ,

চা, কফি ইত্যাদি প্রয়োজন হইলে চিনি এবং দুধ বাদে গ্রহণ করিতে হইবে।

কৃশ ব্যক্তির খাদ্য

(Diet during underweight)

অতিরিক্ত মোটা হওয়া যেমন অস্বাস্থ্যের লক্ষণ তেমনি অতিরিক্ত কৃশ হওয়া বা দেহের অতিরিক্ত ওজন কমিয়া যাওয়াও অস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। দেহের স্বাভাবিক ওজন অপেক্ষা শতকরা দশভাগের বেশী ওজন হ্রাস পাইলেই ইহা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। অতিরিক্ত ওজন হ্রাস পাইলে শরীর যক্ষ্মা ইত্যাদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। নিম্নলিখিত কারণে দেহের ওজন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হইতে পারে।

(১) যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইলে দেহের ওজনের হ্রাস ঘটে। (২) কখনও কখনও থাইরয়েড গ্রন্থির (Thyroid gland) কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবার জন্য দেহের ওজন হ্রাস পায়। (৩) পরিপাক যন্ত্র ঠিকমত কাজ না করিলে দেহ প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্যও দেহের

ওজন হ্রাস পাইতে পারে। (৪) নিদ্রাহীনতা, অনিয়মে খাওয়া, অথবা উপযুক্ত খাদ্যের অভাবেও ওজন হ্রাস ঘটিতে পারে।

খাদ্য-ব্যবস্থা—যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জন্য ওজন হ্রাস ঘটিলে প্রথমে ঐ রোগ আরোগ্য করিতে হইবে। রোগ আরোগ্য হইলে খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তন করিলেই ওজন বৃদ্ধি পাইবে। খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে যেন দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরী অপেক্ষাও খাদ্যে প্রায় ৫০০ ক্যালোরী অধিক তাপ বা শক্তি থাকে। প্রতিদিন এইভাবে ৫০০ ক্যালোরী অতিরিক্ত তাপমাত্রার খাদ্য গ্রহণ করিলে সপ্তাহে প্রায় ১ পাউণ্ড ওজন বৃদ্ধি পাইবে। প্রতি সপ্তাহে দেহের ওজন পরিমাপ করিয়া প্রয়োজনীয় ক্যালোরী খাদ্য হইতে পাওয়া যাইতেছে কিনা দেখিতে হইবে।

প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় স্বাভাবিক রাখিলেই চলিবে। যদি এই সময় কোন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে তবে ঐ রোগের ক্ষয় ক্ষতি পূরণের জন্য প্রোটিনের পরিমাণ কিছু বাড়াইতে হইবে।

ভাইটামিন এবং ধাতব লবণের অভাব যদি পূর্বে লক্ষিত হইয়া থাকে তবে শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদি দ্বারা উহা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বাড়াইয়াই ক্যালোরীর পরিমাণ বাড়াইতে হয়। সুতরাং **মোটা ব্যক্তির খাদ্যে যে সকল খাদ্য-দ্রব্য পরিত্যজ্য কৃশ ব্যক্তির খাদ্যে তাহাই আদর্শ বলিয়া গণ্য**। এই জন্যই ওজন বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে ভাত, রুটি, আলু, বিভিন্নপ্রকার মিষ্টান্ন, চিনি, গুড়, জেলী, চিড়া, মুড়ি, মাখন, ঘি, বনস্পতি ইত্যাদি খাওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় কম ওজনের ব্যক্তিদের ক্ষুধাবোধ হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ কমাইয়া বেশী করিয়া মিষ্টি এবং বিভিন্ন ফল খাইতে দেওয়া উচিত।

খাদ্যের ক্যালোরী বৃদ্ধি করিবার সাথে সাথে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ঐ ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া এই ক্যালোরীর অপচয় না করে। সুতরাং পূর্ণ বিশ্রাম, ঘুম ইত্যাদির সাহায্যে তাহার শ্রমের মাত্রা কমাইতে হইবে।

নিম্নলিখিত খাদ্য-দ্রব্য একজন কৃশ লোকের পক্ষে আদর্শ স্থানীয় :

৩—৪ কাপ দুধ,

১ কাপ ক্রীম,

৪—৬ আউন্স মাছ, মাংস,

২টি ডিম,

৩—৪ আউন্স সবুজ শাক-সবজি,

৬—৮ আউন্স তরি-তরকারি, ফলমূল,

১—২টি কমলা লেবু বা টমেটো,

২টি আলু,

৪ চামচ (বড়) মাখন ও বনস্পতি,

উপযুক্ত পরিমাণে ভাত, রুটি।

ইহার সহিত মাঝে মাঝে কেক, পুডিং, আইসক্রীম, মধু, সিরাপ ইত্যাদি দিতে হইবে।

রোগীর খাদ্য
(Sick diet)

সর্দি জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের প্রকাশ সাধারণত আমরা দেহের উত্তাপের পরিবর্তন দেখিয়াই নির্ণয় করি—দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেই উহা জ্বরের লক্ষণ বলিয়া মনে করি। সকল রোগেই যে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় তাহা নয়। এমন অনেক রোগের নাম করা যাইতে পারে যাহাতে দেহের উত্তাপের কোন পরিবর্তনই হয় না। তবে সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জ্বর হইলে দেহ হইতে প্রচুর ঘাম নির্গত হয় এবং এই ঘামের সহিত দেহ হইতে প্রচুর জল ও লবণ বাহির হইয়া যায়। রোগীর পথ্যে এই জল ও লবণ পূরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই সময় পরিপাক শক্তি অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং কঠিন ও গুরুপাক খাদ্য দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। এই জন্যই জলীয় লঘুপাক খাদ্য রোগীর প্রধান পথ্য হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। এই সময় আমাদের দেহের মজুত খাদ্য গ্লাইকোজেন অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়া যায়। সুতরাং রোগীর পথ্যে কার্বোহাইড্রেটের ব্যবস্থা করিয়া এই ক্ষয় পূরণ করিতে হয়। সেল্যুলোজ

কার্বোহাইড্রেট এই সময় রোগী হজম করিতে পারে না। এইজন্য সেল্যুলোজ বিবর্জিত কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ বার্লি-ওয়াটারই রোগীর প্রধান পথ্য। কখনও কখনও রোগী এই বার্লির জলও হজম করিতে পারে না। তখন তাহাকে বার্লির পরিবর্তে গ্লুকোজের জল খাইতে দেওয়া হয়। গ্লুকোজ হজম করিতে হয় না, উহা সরাসরি দেহের কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে; রোগীকে একবারে বেশী না খাওয়াইয়া ২—৩ ঘণ্টা অন্তর বারে বারে অল্প অল্প করিয়া খাওয়াইতে হয়। এইসময় সাধারণত দেহের মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়। এইজন্য রোগীর পথ্যে ভাইটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি'-র ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং কমলালেবু বা ঐ ধরনের ফলের রস রোগীকে মাঝে মাঝে দেওয়া কর্তব্য। এই সঙ্গে দেহ হইতে অপসারিত জলের অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণ জলও রোগীকে পান করান উচিত।

রোগীর দেহের উত্তাপ খুব বেশী হইলে এই খাদ্য ব্যবস্থাই চালাইতে হইবে। উত্তাপ কমিয়া আসিলে উহার পথ্যের প্রোটিন ও ক্যালোরী মূল্য বাড়াইবার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। রোগে ভুগিলে দেহ ক্ষয় হইয়া ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং খাদ্যে সহজপাচ্য ও উৎকৃষ্ট প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইয়া এই ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা করিতে হয়। এইজন্য প্রথমে বার্লি জলের সঙ্গে একটু একটু করিয়া দুধ মিশাইয়া পথ্য প্রস্তুত করিবে। ক্রমান্বয়ে এই দুধের পরিমাণ বাড়াইয়া পরে দুধের সঙ্গে বার্লির পরিবর্তে কর্ণ ফ্লেক্স (Corn flakes), ওটস্ (Oat meal) প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। ধীরে ধীরে এই খাদ্যের সঙ্গে ডিমের ব্যবস্থা করিয়া প্রোটিন এবং ভাইটামিন 'এ'র অভাব পূরণ করিতে হয়। এই সময় রোগীর প্রতিদিন প্রায় ১০০—১৫০ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। খাদ্যের ক্যালোরীমূল্য বাড়াইবার জন্য উহার খাদ্যে ক্রীম, মাখন ইত্যাদি তাপ উৎপাদক এবং সহজ-পাচ্য স্নেহ খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে। জ্বর কমিয়া গেলে সরু চাউলের ভাত খুব নরম করিয়া খাইতে দিবে এবং ক্রমান্বয়ে উহার স্বাভাবিক খাদ্যে ফিরিয়া আসিবে।

[প্রাচীন কালে রোগীর খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কড়াকড়ি ছিল। তখন রোগীকে লঘু খাদ্য দিবার বা প্রায় অনশনে রাখিবার নীতিই প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের চিকিৎসকগণ এই নীতির বিরোধী। তাহাদের মতে এই সময় রোগীকে প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন—ডিম, দুধ ইত্যাদি দেওয়া আবশ্যক। এই সময় রোগীর ক্যালোরীর চাহিদা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক বাড়িয়া যায়। সুতরাং চিনি, গ্লুকোজ, ল্যাক্টোজ ইত্যাদি উচ্চ তাপমূল্যের খাদ্যের

সাহায্যে রোগীর এই অতিরিক্ত ক্যালোরীর চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজন। এই সঙ্গে সহজপ্রাচ্য ক্রীমও দেওয়া যাইতে পারে। রোগী এই সকল খাদ্য সরাসরি খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে কমলালেবু, কাগজিলেবু, ইত্যাদি ফলের রসের সহিত সরবৎ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তবে রোগীর পরিপাক ক্রিয়ায় যাহাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।]

পরিবারের খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতির পদ্ধতি

সংসারের ব্যয়ের সীমার মধ্যে পরিবারের প্রতিটি লোকের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী উপযুক্ত সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করাকেই 'খাদ্য-পরিকল্পনা' বলে। খাদ্য পরিকল্পনার সময় দৈহিক পুষ্টি, পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি এবং ব্যক্তিগত রুচি এই তিনটি দিকই বিবেচনা করিতে হয়। প্রথমেই পুষ্টির কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

পুষ্টির দিক :—যে কোন পরিবারের খাদ্য-পরিকল্পনার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে গৃহের প্রত্যেকটি লোকের যেন প্রয়োজনীয় দৈহিক তাপ ও শক্তি রক্ষিত হয়। খাদ্য পরিকল্পনায় এই পুষ্টির দিকটি সর্বাপেক্ষা প্রথম বিবেচনার বিষয়। পরিবারের পুষ্টি বজায় রাখিতে হইলে খাদ্যতালিকা প্রস্তুতির পূর্বে প্রত্যেক পরিবারে কতখানি খাদ্য-উপাদান দরকার তাহা জানা উচিত।

আমরা জানি যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম ব্যক্তির দৈনিক প্রায় ৩০০০ ক্যালোরী খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই পরিমাণ খাদ্যকে খাদ্যের (standard diet) একক ধরিয়া একটি পরিবারের বিভিন্ন বয়সী নারী ও পুরুষের খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এবং উক্ত পরিমাণ খাদ্যকে **এক ব্যক্তি-মূল্য** (Man-value) বলে। একজন ভিন্ন বয়সী নারী ও পুরুষের দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন ঐ মাপকাঠিতে প্রকাশ করিলে উহাই ঐ নারী বা পুরুষের ব্যক্তি-মূল্য (Man-value, Factor, index or Co-efficient) বলিয়া ধরা হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ এবং স্বাভাবিক কর্মক্ষম নারীর প্রায় ২৫০০ ক্যালোরী খাদ্যের প্রয়োজন হয় এবং ইহা ৩০০০ ক্যালোরী খাদ্যের প্রায় ০.৮৩ অংশ $\left(\frac{২৫০০}{৩০০০}=\frac{২৫}{৩০}=\frac{৫}{৬}=০.৮৩\right)$। সুতরাং একজন নারীর ব্যক্তি-মূল্য বা factor হইতেছে ০.৮৩।

এইরূপে বিভিন্ন বয়সী নারী ও পুরুষের দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য ব্যক্তি-মূল্যের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল।

	ব্যক্তি-মূল্য (man-value)
একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক, স্বাভাবিক কর্মক্ষম পুরুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	১·০
একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক, স্বাভাবিক কর্মক্ষম নারীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৮৩
১৪ বৎসরের উপরে একজন বালকের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৮৩
১৪ বৎসরের উপরে একজন বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	১·০
১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৯
১০ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৮
৮ হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৭
৬ হইতে ৮ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৬
৩ হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৫
২ হইতে ৩ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৪

একটি পরিবারের দৈনিক মোট খাদ্যের পরিমাণ ঐ পরিবারের মোট ব্যক্তি-মূল্যের (Total man-value) সাহায্যে নির্ণয় করিতে হয়। পরিবারের লোকসংখ্যা এবং তাহাদের বয়স জানা থাকিলে ইহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। মনে কর, একটি পরিবারে স্বামী, স্ত্রী এবং ৫, ৭ ও ১০ বৎসরের তিনটি বালক-বালিকা আছে। এই পরিবারের খাদ্যের মোট ব্যক্তি-মূল্য নিম্নরূপ :—

স্বামীর	প্রয়োজনীয়	খাদ্যের	পরিমাণ	১'০	ব্যক্তি-মূল্য (Man-value)
স্ত্রীর	"	"	"	০'৮৩	" "
৫ বৎসরের বালক-বালিকার			"	০'৫	" "
৭	"	"	"	০'৬	" "
১১	"	"	"	০'৮	" "
	মোট খাদ্যের পরিমাণ			৩'৭৩	" "

এই ব্যক্তি-মূল্য হইতে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি-মূল্যের খাদ্যে ১০০ গ্রাম প্রোটিন, ১০০ গ্রাম স্নেহপদার্থ এবং ৪৫০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। এই হিসাবে ৩'৭৩ ব্যক্তি-মূল্যের খাদ্যে,

প্রোটিনের পরিমাণ ১০০ × ৩'৭৩ = ৩৭৩ গ্রাম

স্নেহপদার্থের " ১০০ × ৩'৭৩ = ৩৭৩ "

কার্বোহাইড্রেটের " ৪৫০ × ৩'৭৩ = ১৬৭৮'৫ "

অর্থাৎ ঐ পরিবারের দৈনিক মোট ৩'৭৩ × ৩০০০ ক্যাঃ বা ১১১৯০ ক্যাঃ তাপ-মূল্যের খাদ্যের প্রয়োজন এবং ঐ খাদ্যে ৩৭৩ গ্রাম প্রোটিন, ৩৭৩ গ্রাম স্নেহপদার্থ এবং ১৬৭৮'৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকিবে। এই পরিবারের খাদ্য প্রস্তুতির সময় লক্ষ্য করিবে যেন খাদ্য-দ্রব্যে উক্ত পরিমাণ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থ বর্তমান থাকে। এই সকল খাদ্যোপাদান এক প্রকার খাদ্য হইতে গ্রহণ না করিয়া বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য হইতে গ্রহণ করিলে দেহ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ধাতব লবণসমূহ স্বাভাবিক উপায়েই ঐ খাদ্যে বর্তমান থাকিবে এবং কখনও উহাদের অভাব হইবে না। এইজন্যই খাদ্য তালিকা প্রস্তুতিতে প্রধানত খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ-পদার্থের পরিমাণই নির্ণয় করিতে হয়।

তোমরা জান প্রোটিনের আবার শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের চেয়ে প্রাণিজ প্রোটিনই শ্রেষ্ঠ এবং দেহ গঠনের সমস্ত উপাদান প্রাণিজ প্রোটিনেই বর্তমান রহিয়াছে। এইজন্য প্রত্যেকের খাদ্য তালিকায় কিছুটা প্রাণিজ প্রোটিন অন্তর্ভুক্ত করিবে।

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য নির্বাচন প্রোটিন নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়, তথাপি এই বিষয়েও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। উল্লিখিত পরিবারের মোট ১৬৭৮'৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের অভাব যদি শুধু চিনি,

মিছরি প্রভৃতি বিশুদ্ধ শর্করা জাতীয় দ্রব্যাদির সাহায্যে পূরণ করা হয় তাহা হইলে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া উদরাময় রোগের সৃষ্টি হইবে। তাই ভাত, রুটি, চিনি, মিছরি, আলু ইত্যাদি বিভিন্ন মিশ্র খাদ্যের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজনীয়তা মিটাইলে ঐ সকল খাদ্যের অন্যান্য উপাদানসমূহও দেহের কাজে আসিবে।

স্নেহপদার্থ নির্বাচনেও একটু সতর্ক হইলে ঐ স্নেহপদার্থের সঙ্গে সঙ্গে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি'র অভাবও কিছু কিছু পূরণ হইতে পারে।

প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থ নির্বাচন করিয়া খাদ্যের ভাইটামিনের কথা বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ, বিভিন্ন ভাইটামিনের অভাবে বিভিন্ন অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য হইতে খাদ্যের ঐ প্রধান তিনটি উপাদান নির্বাচন করিলে ভাইটামিনের অভাব অনেকটা এমনিতেই পূরণ হইয়া যায়। অবশিষ্ট ভাইটামিনের জন্য সবুজ শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদিও দৈনন্দিন খাদ্যের তালিকাভুক্ত করা কর্তব্য।

উপরোক্ত খাদ্যোপাদান ব্যতীত খাদ্য পরিকল্পনায় জলেরও স্থান নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। জল আমাদের রক্তের তারল্য বজায় রাখে, দেহের উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করে এবং হজমে ও দেহের ক্লেদ নিঃসরণে সহায়তা করে।

আর্থিক দিক—খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতির সময় সর্বদা আর্থিক সঙ্গতির কথা স্মরণ রাখিবে। বস্তুত প্রত্যেক পরিবারে আথিক সঙ্গতির উপরেই খাদ্য-তালিকা নির্ভর করে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি প্রাণিজ প্রোটিনবহুল খাদ্যগুলি সাধারণ পরিবারের প্রায় আয়ত্তের বাহিরে। এই ক্ষেত্রে গৃহিণী ডাল, বাদাম, সয়াবিন প্রভৃতি অল্প মূল্যের বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে প্রোটিনের অভাব পূরণ করিতে পারেন। অবশ্য এই শেষোক্ত খাদ্যগুলি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন নয় এবং এই জন্যই দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টি ও বৃদ্ধি এই জাতীয় প্রোটিনের সাহায্যে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। দেহের যথাযথ পুষ্টির জন্য অবশ্যই কিছু পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি গ্রহণ করা কর্তব্য। তবে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের এক-তৃতীয়াংশ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন হইতে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট প্রোটিনের অভাব অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হইতে সহজেই পূরণ করা যায়।

প্রোটিনের মতই স্নেহপদার্থও দুই শ্রেণীর—প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ। উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ স্বভাবতই প্রাণিজ স্নেহের তুলনায় সস্তা। এইক্ষেত্রেও সাধারণ

পরিবারের লোকেরা শুধুমাত্র প্রাণিজ স্নেহের সাহায্যে স্নেহপদার্থের অভাব পূরণ না করিয়া উদ্ভিজ্জ স্নেহের সাহায্য লইতে পারেন। মাখন, ঘি, মাছের তেল ইত্যাদির সঙ্গে কিছু তেল, ডালডা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ স্নেহ গ্রহণ করিলে সস্তায় স্নেহপদার্থের অভাব পূরণ করা যায়।

রুচির দিক—খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতির অন্যতম লক্ষ্য হইবে খাদ্যে বৈচিত্র্য আনা। একই খাদ্য প্রতিদিন আহার করিলে খাদ্য একঘেয়ে লাগে এবং আহারে অরুচি জন্মায়। অরুচিকর খাদ্য হজমেও ব্যাঘাত জন্মায়। সুতরাং রন্ধনে বৈচিত্র্য আনা একান্ত প্রয়োজন। উত্তম ও বিভিন্ন প্রকারের পদ দেখিলে আপনা হইতেই আহারের ইচ্ছা তীব্র হয়। খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ বদলাইয়া আহারে বৈচিত্র্য আনা যায়। আহার্য বস্তু পর পর দুইটি যেন এক জিনিস দিয়া কিংবা একই পদ্ধতিতে রান্না না হয়। যেদিন আলু পটলের ডালনা হইল সেইদিনই আবার মাছের ঝোলে আলু পটল দেওয়া উচিত নয়। তেমনি আবার এক বেলার আহার্যে দুইটি ডালনা জাতীয় তরকারি থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। প্রতিদিন এক ধরনের ডাল না খাইয়া বদলাইয়া রান্না করা চলে। অনুরূপভাবে শাক-সবজি, মাছ ও আনাজ প্রত্যহ নতুন নতুন পরিবেশন করা যায়। বস্তুত প্রতিদিন এক ধরনের খাদ্য গ্রহণ করাও উচিত নয়। খাদ্যের উপাদানগুলি সকল বস্তুতে এক পরিমাণে উপস্থিত থাকে না। একটু সতর্কতার সঙ্গে বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করিলে প্রয়োজনীয় সব রকমের উপাদানই পাওয়া যায়। দেহের এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও খাদ্যে বৈচিত্র্য আনা দরকার।

ভোজনে আসক্তি ও খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার কুফল (Food fads and fallacies)—প্রত্যেক দেশেই এমন অনেক ভোজনবিলাসী ব্যক্তি আছে যাহাদের কোন কোন খাদ্যের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকে। এই অতিরিক্ত আসক্তির ফলে তাহারা শুধু রুচিকর খাদ্য ব্যতীত অন্য সব রকমের খাদ্য বর্জন করিয়া থাকে। ইহাতে তাহারা দেহের প্রয়োজনীয় খাদ্য হইতে সর্বদাই বঞ্চিত হইয়া থাকে। ফলে ঐ সকল ব্যক্তি কখন অতিরিক্ত মেদবহুল হইয়া পড়ে, কিংবা তাহাদের ওজন হ্রাস পাইতে থাকে। কখনও বা তাহারা অভাবজনিত রোগের কবলেও পড়ে। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তির খাদ্য-তালিকা এরূপভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার যে প্রত্যেকেই যেন প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ, ধাতব লবণ ও ভাইটামিন পাইতে পারে।

ইহাদের কোন একটিরও অভাব হইলে দেহ সুস্থ থাকিতে পারে না। তাই খাদ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আসক্তি দূর করা উচিত।

খাদ্যে আসক্তির মতই খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণাও রহিয়াছে। সেগুলিও দূর হওয়া উচিত। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা মাংস এবং দুধ এক সঙ্গে আহার করিতে নাই। মাংস এবং দুধ উভয়ই প্রাণিজ প্রোটিন এবং উভয়ের খাদ্যোপাদানগুলি মোটেই বিপরীতধর্মী নহে। সুতরাং মাংস এবং দুধ একসঙ্গে আহার করা অনুচিত ইহা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। তবে কেহ যদি অধিক পরিমাণে এই দুইটি খাদ্য গ্রহণ করে তবে তাহার হজমের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

দেহের মাংসপেশী গঠনের জন্য মাংস আহার করা উচিত ইহাও অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা। কোন বিশেষ পেশী গঠনের জন্য কোন বিশেষ খাদ্য গ্রহণ করা দরকার খাদ্য বিশেষজ্ঞগণ তাহা মোটেই স্বীকার করেন না। পরন্তু যে সকল ব্যক্তির পাকস্থলীতে মাংস হজম করিবার মত যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (Proteolytic enzyme) এবং অ্যাসিড জুস (Acid juice) নাই সেই সকল ব্যক্তি যদি মাংস আহার করে তবে ঐ মাংস দেহে টক্সিন (Toxin) সৃষ্টি করিবে। একই কারণে যে-কোন ব্যক্তিরই অত্যধিক মাংস আহার করা অনুচিত।

মাছে ফসফরাস রহিয়াছে বলিয়া মাছ আমাদের মস্তিষ্ক (brain) তৈয়ারী করে ইহা আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি। আমাদের এই ধারণাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রথমত ব্রেনের জন্য শুধুমাত্র ফসফরাসই যথেষ্ট নহে। ফসফরাস ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যোপাদানও চাই। দ্বিতীয়ত মাছ ব্যতীত ডিম, দুধ, পনীর, মাংস এবং শস্যকণাতেও (whole grains) যথেষ্ট ফসফরাস থাকে। সুতরাং মস্তিষ্কের জন্য মাছ আহার করা একান্ত প্রয়োজন একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। তবে মাছের ফসফরাস আমাদের দেহ খুব সহজেই গ্রহণ করিতে পারে তাহা ঠিক।

রাত্রে শাকপাতা, তিতা ও ফল খাওয়া নিষেধ ইহাও একটি ভ্রান্ত ধারণা। সকালবেলা বাজার হইতে শাকপাতা কিনিয়া আনিয়া ফেলিয়া রাখিলে উহার খাদ্যমূল্য অবশ্যই কমিয়া যাইবে। কিন্তু কেহ যদি বাগানের টাট্কা শাক-সবজি তুলিয়া আনিয়া রাত্রিবেলা রান্না করেন তবে উহার পূর্ণ খাদ্যমূল্য বজায় থাকিবে এবং ঐরূপ শাক-সবজি আহারে কোন দোষ নাই। অনুরূপভাবে রাত্রিতে টক খাওয়াও স্বাস্থ্যবিরোধী নহে।

প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন ও নৈশভোজনের খাদ্য পরিকল্পনা

প্রাতরাশ (Breakfast)—প্রাতরাশ দিয়াই দিনের খাদ্যপরিকল্পনা আরম্ভ করা উচিত। প্রাতরাশের গুরুত্ব কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত রাত্রি অনাহারে থাকার পর প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। পাশ্চাত্ত্যদেশের আহার্য তালিকায় প্রাতরাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। সেখানে দিনের আহার্যকে প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন এবং নৈশভোজন এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। সকাল আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে সকলে পূর্ণ প্রাতরাশ খাইয়া কাজে বাহির হয়। তারপর একটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা শেষ করে এবং রাত্রি আটটার মধ্যেই তাহারা নৈশভোজন সমাধা করে। বিকালে সাড়ে তিনটার সময় একবার এবং রাত্রিবেলা শয়নের পূর্বে সাধারণত পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ের ব্যবধান যদি বেশী হয় তবে সকালবেলা অবশ্যই পূর্ণ প্রাতরাশ গ্রহণ করা উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে পূর্ণ প্রাতরাশে অবশ্যই কিছু প্রোটিন এবং সাইট্রাস জাতীয় ফল থাকা দরকার। সকালবেলা রক্তে শর্করার (blood sugar-level) মাত্রা কমিয়া যায়। এই শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে শরীর ম্যাজম্যাজ করে। দেহে ক্লান্তি বোধ হয়, ক্ষুধা লাগে এবং স্বভাবতই কোন কাজে মন লাগে না। রক্তের শর্করার পরিমাণ স্থির রাখার জন্যই প্রাতরাশে প্রোটিন থাকা দরকার। সাইট্রাস জাতীয় ফলের গুণ অনেক। প্রথমত ইহা সারাদিনের ক্ষুধা বাড়ায় এবং খাদ্য হজমে সাহায্য করে। এতদ্ব্যতীত এসকরবিক অ্যাসিড (ascorbic acid) অর্থাৎ ভাইটামিন সি'রও পরিমাণ বাড়ায় এই সাইট্রাস ফল। এই সকল কারণে প্রোটিনের সঙ্গে সাইট্রাস জাতীয় ফলও অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গতি থাকিলে একটি ডিম, রুটি, মাখন, একটি সাইট্রাস জাতীয় ফল এবং এক কাপ দুধই হইল আদর্শ প্রাতরাশ।

আমাদের দেশের আহার্য পরিকল্পনা পাশ্চাত্ত্যদেশ হইতে কিছু স্বতন্ত্র। এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন এবং নৈশ ভোজন এই দুইটি পর্যায়ে খাদ্য বিভাগ করা হয় এবং আহার্য পরিকল্পনায় প্রাতরাশ ও বৈকালিক জলযোগের স্থান কিছুটা তাহারা অধিকাংশ ভারতবাসীই সকালবেলা সাধারণত এক কাপ চা এবং তালিকা এরূপ খাইয়া প্রাতরাশ সমাধা করে। ভারতবাসীদের খাদ্য পরিকল্পনায় প্রোটিন, কা স্থান গৌণ হইবার একটি প্রধান কারণ আমাদের প্রাতরাশ ও

মধ্যাহ্নভোজনের সময়ের ব্যবধান খুবই কম। কিন্তু তথাপি আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থাকে কিছুটা উন্নত করা অবশ্য প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদের মত পূর্ণ প্রাতরাশ না করিয়া আমরা অনায়াসে এক কাপ দুধ কিংবা একটি অর্ধসিদ্ধ ডিম এবং একটি মাখন মাখান টোস্ট দিয়া প্রাতঃকালীন জলযোগের ব্যবস্থা করিতে পারি। সঙ্গতি না থাকিলে অঙ্কুরিত ছোলা বা বাদাম এবং সামান্য মুড়ি ও নারিকেল দিয়া জলযোগ করা যায়। শিশুদের জন্য দুধ, মুড়ি, কলা কিংবা নারিকেল ইত্যাদি খাদ্যবস্তু দ্বারা প্রাতরাশের ব্যবস্থা করা উচিত।

মধ্যাহ্ন ভোজন—এই যন্ত্র সভ্যতার যুগে আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলকেই আজকাল ঘরের বাহিরে যাইতে হয়। এই কারণে মধ্যাহ্নভোজনের গুরুত্ব এখন সব দেশেই কমিয়া আসিতেছে। স্বক্তো, সামান্য ভাজাভুজি, মাছের ঝোল ও ডালই এখন অধিকাংশ গৃহের মধ্যাহ্নভোর্জনের তালিকায় স্থান লাভ করিতেছে। তবে শাকপাতা, টক প্রভৃতি পদগুলিও মধ্যাহ্ন ভোজনের তালিকায়ই স্থান পাওয়া উচিত। যাহারা দিনের বেলা গৃহে বিশ্রামলাভের সুযোগ পান তাহাদের পক্ষে মধ্যাহ্ন ভোজনটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যাইবার তাড়া থাকিলে মধ্যাহ্নভোজন যতদূর সম্ভব হাল্কা এবং পুষ্টিকর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা মধ্যাহ্নভোজনের শেষে অনায়াসে একটু ফ্রুট স্যালাডের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

নৈশ ভোজন—রাত্রিবেলা আহারের পর প্রত্যেকেই আমরা ঘুমাইয়া পড়ি। রাত্রে তাই খাদ্যবস্তু হজমে অধিক বিলম্ব ঘটে। এই কারণে মধ্যাহ্ন ভোজনের তুলনায় নৈশভোজন লঘু হওয়া উচিত। কিন্তু দিনের বেলা যাহারা ভাল করিয়া আহার করিতে পারেন না তাহাদের নিকট মধ্যাহ্ন ভোজনের তুলনায় নৈশভোজনের গুরুত্ব অধিক। এইরূপ ব্যক্তিদের জন্য মাছ, মাংস প্রভৃতি প্রোটিনবহুল খাদ্যগুলি মধ্যাহ্ন ভোজনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া ডালনা, দম, ঘণ্ট প্রভৃতি যে সব মুখরোচক খাদ্য দুপুরবেলা বাদ পড়িয়াছে সেগুলি নৈশভোজনের জন্য রাখিতে হয়। রাত্রে যাহাদের ভাতের পরিবর্তে আটা খাইবার অভ্যাস তাহাদের পক্ষেও এই ব্যবস্থা অধিক উপযোগী, কার ায় থাকিবে মাংসের চেয়ে আটার সঙ্গে নিরামিষ তরকারি বেশী মুখরোচক। রাত্রিতে টক ইত্যাদি দিনের বেলায় অধিক সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয়। কোন f দিয়া নৈশ ভোজনের পরিসমাপ্তি ঘটা মন্দ ব্যবস্থা নয়। পাশ্চাত্ত্যদে

আইসক্রীম প্রভৃতি নৈশভোজনের শেষে পরিবেশন করা হয়। সঙ্গতি থাকিলে আমরাও এই ধরনের কিছু মিষ্টি খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারি। নৈশভোজনের পালা শেষ করিয়া যাহারা অধিক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা বা অন্য কিছু কাজকর্ম করিতে চান তাহারা শয়নের পূর্বে এক পেয়ালা দুধ কিংবা অন্য কোন পুষ্টিকর পানীয় গ্রহণ করিতে পারেন।

চা এবং জলখাবারের পরিকল্পনা

চা একপ্রকার ছোট গাছের শুকনো পাতা। সাধারণত পার্বত্য প্রদেশে বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে চা জন্মায়। আমরা যে চা পান করি উহা নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া রূপান্তরিত হইয়া আমাদের কাছে আসিয়া পৌছায়।

চা প্রস্তুত প্রণালী—চায়ের ভালমন্দ শুধুমাত্র চায়ের গুণাগুণের উপরই নির্ভর করে না, চা প্রস্তুত প্রণালীর উপরেও চায়ের স্বাদ বহুলাংশে নির্ভর করে। চায়ের জল ভাল করিয়া না ফুটাইলে চা ভাল হয় না, আবার চা ভাল না ভিজিলে কিংবা জলের তুলনায় চায়ের পরিমাণ কম হইলে চা যেমন পানসে লাগে, তেমনি অনেকক্ষণ চা ভিজিলে কিংবা জলের পরিমাণে চা বেশী হইলে চা তিতা লাগে; ভাল চা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে টি-পটটি গরম জলে ধুইয়া লইবে। তারপর যত কাপ চা হইবে টি-পটে চা চামচের তত চামচ এবং অতিরিক্ত এক চামচ চা দিবে এবং ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিবে। অন্তত পাঁচ মিনিটকাল চা ভিজিবার পর কাপে চা ছাঁকিয়া লইয়া রুচিমত দুধ ও চিনি মিশাইয়া দিবে। টি-পটের মতই চায়ের কাপগুলিও গরম জলে ধুইয়া লইবে। উষ্ণ থাকিতেই সর্বদা চা পরিবেশন করিবে।

চায়ের গুণাগুণ—চা শীতল দেশের অন্যতম উষ্ণ পানীয়। ভারতবর্ষেরও প্রতি ঘরে ঘরে এখন চা আদৃত হইতেছে। প্রায় সকলেই আজকাল প্রাতরাশের সঙ্গে এবং বৈকালিক জলযোগের সঙ্গে দুই বেলা দুই কাপ চা পান করিয়া থাকেন। অল্পক্ষণের জন্য শরীরের ক্লান্তি কাটাইয়া দেহকে একটু চাঙা করিয়া তুলিতে চা আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু তথাপি চা-কে ঠিক আমাদের দেশের উপযোগী পানীয় বলা চলে না। ইহার কারণ তামাকের মধ্যে যেমন 'নিকোটিন' বিষ আছে, চায়ের মধ্যেও 'ক্যাফিন' (caffeine) নামক অনুরূপ বিষ আছে। চায়ের ক্যাফিন বিষ জঠরাগ্নিকে দুর্বল করে, ক্ষুধা

নষ্ট করে এবং যকৃত ও প্লীহার ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে দুর্বল করিয়া দেয়। দেহের এই মহা উপকারী যন্ত্র দুইটি দুর্বল ও অকর্মণ্য হইলে স্বাস্থ্য-রক্ষার আর কোন উপায়ই থাকে না। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চা পানকে বিষপানের তুল্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসক জে, ব্যাটিটিউক বলেন, "ব্রাণ্ডির বোতল অধিক ক্ষতিকর না চায়ের পেয়ালা অধিক অনিষ্টকারী তাহা এখনও মীমাংসিত হয় নাই।" বস্তুত চা খাদ্য নহে, ইহার ভিতরকার ট্যানিক অ্যাসিড মাদক দ্রব্যের মত উত্তেজক গুণবিশিষ্ট। অধিক পরিমাণে চা পান করিলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হয়, স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়, পরে উহা হইতে বুক ধড়ফড়ানি, অজীর্ণতা, দুর্বলতা ও দৃষ্টিক্ষীণতা রোগের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক চায়ের পেয়ালায় আড়াই গ্রেন ক্যাফিন থাকে, ইহার প্রতিক্রিয়া বিষের মত ভয়ঙ্কর। চা হইতে অজীর্ণ, অনিদ্রা, রক্তাল্পতা ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগ উৎপন্ন হয়। দুধের জীবনীশক্তি চায়ের ক্যাফিন বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিতে পারে। যাহারা প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুধ পান করিতে পারেন শুধু মাত্র তাহারাই দিনে দুই পেয়ালা চা খাইতে পারেন। ভারতের মত দরিদ্র দেশে চা আসিয়া প্রাতরাশের মধ্যে প্রধান স্থান দখল করায় আমরা দেশী সুলভ প্রোটিন খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছি। আমাদের চা পানের অভ্যাস পরিত্যাগ করাই উচিত।

জলখাবার—সকাল এবং বিকালবেলা আমরা যে খাদ্য খাইয়া থাকি তাহাই জলখাবার বা টিফিন নামে অভিহিত। প্রত্যেক পরিবারেরই আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী বিশেষ সতর্কতার সহিত জলখাবারের পরিকল্পনা করা উচিত। আমাদের দেশে মধ্যাহ্নভোজন ও নৈশভোজনের সময়ের ব্যবধান এত দীর্ঘ যে উহাদের মাঝখানে জলযোগের ব্যবস্থা না করিলে পাকস্থলী বহুক্ষণ ধরিয়া খালি পড়িয়া থাকে। পেট খালি থাকিলে দেহ সহজেই অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ফলে নানারকম রোগাক্রমণ ঘটে। জলখাবারে একদিকে যেমন খাদ্যমূল্য থাকা দরকার, অপরদিকে তেমনি বৈচিত্র্যও থাকা চাই। সকাল বেলার জলখাবার বা আদর্শ প্রাতরাশ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাতরাশের মতই বৈকালিক জলখাবারেরও খাদ্য-মূল্য থাকা প্রয়োজন। বিশেষত ছাত্রছাত্রী, চাকুরে ও কর্মীদের জীবনে প্রাতরাশের চেয়ে বৈকালিক জলযোগের গুরুত্ব অধিক বলিয়া বৈকালিক জলখাবার প্রাতরাশের চেয়ে পরিমাণে বেশী এবং স্বাদে, গন্ধে ও বৈচিত্র্যে উৎকৃষ্টতর হওয়া প্রয়োজন। সারাদিনের খাদ্যে যে

সকল খাদ্যোপাদান বাদ পড়ে তাহা এই জলখাবারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার।

ঋতুভেদে বৈকালিক জলখাবারের একটি পরিকল্পনা দেওয়া হইল :—

গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল

সোমবার	দই, চিঁড়া, কলা, চিনি
মঙ্গলবার	শশা, মুড়ি, ছোলাসিদ্ধ
বুধবার	দুধ, কলা, মুড়ি, পাটালি
বৃহস্পতিবার	কলা, কাঁঠাল, দুধ, চিঁড়া, চিনি
শুক্রবার	ঘোলের সরবত, সন্দেশ, পেঁপে
শনিবার	আম, মুড়ি, দুধ ও গুড়
রবিবার	কচি তাল, জাম ও লিচু

সকাল বেলার জলখাবারে লেবুজাতীয় ফল রাখিয়া ঋতুর অন্যান্য ফল বৈকালিক জলযোগের সঙ্গে দিবার ব্যবস্থা করিবে। বর্ষার শেষে আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল মহার্ঘ হইয়া উঠিলে তাহার পরিবর্তে মাঝে মাঝে কচুরি, ডালপুরী, তরকারি ইত্যাদি দেওয়া যায়। সঙ্গতি না থাকিলে উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসরণ না করিয়া বিকালে শশা, বাদাম, মুড়ি অথবা দই চিঁড়া প্রভৃতি জলযোগ হিসাবে ব্যবহার করা চলিতে পারে। প্রচণ্ড বর্ষায় মাঝে মাঝে মুড়ির সঙ্গে ঘরে তৈরী তেলে ভাজা দেওয়া যায়।

শরৎ ও হেমন্তকাল

সোমবার	সাগু, নারিকেল কোরা ও চিনি
মঙ্গলবার	পরোটা, তরকারি ও বাতাবিলে
বুধবার	মুড়ি ও তালক্ষীর
বৃহস্পতিবার	ডালপুরী ও তরকারি
শুক্রবার	তালের রুটি ও দুধ
শনিবার	ডালপুরী ও তরকারি
রবিবার	সন্দেশ, নিমকি

শীত ও বসন্তকাল

সোমবার	আলু ও মটরশুঁটির তরকারি, পাঁউরুটি
মঙ্গলবার	কেক, কলা ও দুধ
বুধবার	মটরশুঁটির কচুরি
বৃহস্পতিবার	গাজরের হালুয়া ও দুধ
শুক্রবার	ফুলকপির সিঙ্গাড়া, কালজাম
শনিবার	রুটি, ডিমের ডালনা
রবিবার	লুচি, ফুলকপি ভাজা

বসন্তকালে শীতের প্রায় সব তরকারিই পাওয়া যায়। অবশ্য ঐ সকল তরকারির স্বাদ আর শীতের তরকারির মত থাকে না। শীত ঋতুর খাদ্য-তালিকায় ফুলকপি, আলু, মটরশুঁটি, গাজর প্রভৃতি তরকারির প্রাধান্য রাখিবে এবং বসন্তের শেষে বৈকালিক জলযোগে মাঝে মাঝে হালুয়া, নিমকি, রুটি ও ছক্কা ইত্যাদি দেওয়া চলিতে পারে। উহাতে খরচও বেশী পড়ে না এবং খাদ্যেও বৈচিত্র্য আসে।

খাদ্য সংরক্ষণ

খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা—খাদ্যদ্রব্যের খাদ্যমূল্য বজায় রাখিয়া উহাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সঞ্চয় করাকেই বলে খাদ্য-সংরক্ষণ। খাদ্য-সংরক্ষণের উপরই মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা নির্ভর করে। আদিম মানুষের এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকাই ছিল বিড়ম্বনা। বন হইতে প্রত্যহ ফলমূল, কন্দ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া নতুবা মৎস্য মাংস শীকার করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইত। যেদিন খাদ্য মিলিত সেদিন রাত্রে তাহাদের ভোজের উৎসব লাগিয়া যাইত। আবার যেদিন সারাদিন চেষ্টা করিয়াও কিছু মিলিত না সেদিন সকলকে উপবাসে কাটাইতে হইত, কারণ, খাদ্য সংরক্ষণের গোপন রহস্য তাহাদের জানা ছিল না। কৃষি আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসিল। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও সে শিখিল। খাদ্যের ব্যবস্থা হইবার ফলে তাহার যাযাবর বৃত্তি ঘুচিল। শস্য মানুষের প্রধান খাদ্য বলিয়া বহুদিন পর্যন্ত কেবল শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ফলমূল, শাক-সবজি কিংবা মাছ, মাংস পাত্রে পুরিয়া সংরক্ষণের পদ্ধতি খুব বেশী দিন চালু হয় নাই। নেপোলিয়ানের সময় সর্ব

প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে টিনের পাত্র করিয়া খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। ১৭৯৫ সালে নিকোলাস এপার্ট নামক এক বৈজ্ঞানিক কাচের পাত্রে ফল সংরক্ষণ সম্ভব কিনা তাহা লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইতে থাকেন। তারপর লুই পাস্তুরের গবেষণার ফলে আজ সুষ্ঠুরূপে খাদ্য সংরক্ষণের কাজ সম্ভব হইতেছে।

ভবিষ্যতের খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্যই খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতি বৎসরে কিংবা প্রতি দেশে প্রকৃতির দান একরূপ নয়। সুসময়ের উদ্বৃত্ত খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাহা দ্বারা অজন্মার দিনে কিংবা খাদ্যাভাব-ক্লিষ্ট দেশগুলির খাদ্যাভাব সহজেই মিটান যায়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ঋতুর নিজস্ব ফলমূল দামেও সস্তা থাকে। সুলভে কিনিয়া রাখিয়া পরে যখন উহা আর পাওয়া যায় না তখন গৃহিণীরা স্বল্প ব্যয়ে আহার্য তালিকায় সহজেই বেশ নতুনত্ব আনিতে পারেন।

খাদ্য নষ্ট হইবার কারণ—গাছ হইতে পাড়িবার পর ফল ও শাক-সবজি বেশীদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে না। কয়েক দিন পরেই উহারা পচিতে শুরু করে। এই পচন ক্রিয়া দুইটি কারণে সংঘটিত হয়।

(১) ফলের মধ্যে এক প্রকার **জারক দ্রব্য** (enzyme) সৃষ্টি হয় এবং এই জারক দ্রব্যের সাহায্যে ফল পাকিতে আরম্ভ করে। পাকিবার সময় ফলের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ফলের শ্বেতসার জাতীয় উপাদান এই জারক দ্রব্যের দ্বারা বিভিন্ন শর্করায় পরিণত হয়। এই জন্যই কাঁচা ফল অপেক্ষা পাকা ফল অধিকতর মিষ্ট। এই পাকিবার কাজটি যদি অধিক দিন ধরিয়া চলিতে থাকে তাহা হইলে ফল মূল জারক দ্রব্যের দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং খাদ্যের জারক দ্রব্য (enzyme) কখনও কখনও খাদ্য-দ্রব্য নষ্ট করিয়া থাকে।

(২) কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য-বস্তুই কোন না কোন **জীবাণু** দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। এক খণ্ড মাংস কয়েক দিন উন্মুক্ত অবস্থায় বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইবে এবং উহার মধ্যে জীবাণু জন্মিয়া উহাকে খাদ্যের অযোগ্য করিয়া ফেলিবে। সাধারণত **ইস্ট** (yeast), **ছত্রক** (mould) এবং **ব্যাক্‌টেরিয়া** (bacteria) এই তিন প্রকার জীবাণু দ্বারা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইয়া থাকে।

বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই জীবাণুদের চাই **উত্তাপ, আর্দ্রতা ও বায়ু।** নিরুত্তাপ, শীতল ও বায়ুহীন স্থানে কিংবা শুষ্ক খাদ্যে ইস্ট, ছত্রক কিংবা

ব্যাক্‌টেরিয়ার বৃদ্ধি লাভ সাধারণত সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত খাদ্য-বস্তুতে সংরক্ষণ গুণবিশিষ্ট পদার্থ (preservatives) মিশ্রিত করিয়া দিলেও ঐ খাদ্য পচনের হাত হইতে রক্ষা পায়।

ইস্ট—ইস্টের বৃদ্ধির জন্য চাই কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। কোন গাঁজান ফলের রসের তলায় যে চকের গুঁড়ার মত সাদা কিংবা ধূসর বর্ণের তলানি পড়ে উহা দেখিয়াই ইস্টের উপস্থিতি ধরা যায়।

ছত্রক—ছত্রক বা ছাতা এক জাতীয় ফাঙ্গাস। লক্ষ্য করিয়া দেখিও স্যাঁতসেঁতে স্থানে অনেক সময় এক প্রকার সাদা, ধূসর কিংবা বাদামী রংয়ের নরম তুলার মত পদার্থ জন্মায়। উহাকেই বলে ছত্রক। জলীয় পদার্থযুক্ত বস্তু ছত্রকের খাদ্য। কোন কোন শ্রেণীর ছত্রক তুলা, পশম ও চামড়া পর্যন্ত খাইয়া থাকে। ছত্রক খাদ্যবস্তুর স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ নষ্ট করে এবং শেষ পর্যন্ত খাদ্য পচাইতে শুরু করে। ছত্রকের বিস্তার রোধ করিতে পারিলে খাদ্য বহু দিন ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে। শুষ্ক, ঠাণ্ডা, আলোকযুক্ত স্থান এবং বায়ুবিহীন পাত্রে খাদ্য রাখিলে ছাতা ধরিতে পারে না।

ব্যাক্‌টেরিয়া—ব্যাক্‌টেরিয়া নামক জীবাণু খাদ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহা পচাইতে শুরু করে। ব্যাক্‌টেরিয়া অত্যন্ত মারাত্মক জীবাণু। উহা কখনও কখনও খাদ্যবস্তুতে বিষ ঢালিয়া দিয়া মানুষের প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। ইস্ট এবং ছত্রকের চেয়ে ব্যাক্‌টেরিয়া ধ্বংস করা কঠিন কাজ। ব্যাক্‌টেরিয়ার বংশ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন জাতের ব্যাক্‌টেরিয়ার বহুদিন পর্যন্ত সুপ্তাবস্থায় লুকায়িত থাকিবার ক্ষমতা আছে।

বিভিন্ন প্রকার সংরক্ষণ পদ্ধতি—

আমরা দেখিয়াছি ইস্ট, ছত্রক এবং ব্যাক্‌টেরিয়া এই তিন প্রকার জীবাণু দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের গুণ নষ্ট হয় এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইহাদের প্রয়োজন (ক) উত্তাপ, (খ) বায়ু ও (গ) আর্দ্রতা। এই কারণে খাদ্যদ্রব্য হইতে এই তিনটি অপসারিত করিতে পারিলে খাদ্য সংরক্ষণ সম্ভব হয়।

(ক) **নিরুত্তাপ বা শীতল পদ্ধতি**—জীবাণুদের বৃদ্ধির জন্য এবং এনজাইমগুলি সক্রিয় থাকিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট উত্তাপ প্রয়োজন। খাদ্য-দ্রব্যকে কোন নিরুত্তাপ শীতল কক্ষে (cold store) রাখিলে জীবাণুগুলি

স্তিমিত হইয়া আসে এবং এনজাইমের ক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। একই কারণে খাদ্যবস্তুতে বরফ দিয়া রাখিলেও কয়েক দিন পর্যন্ত উহা বেশ টাট্‌কা অবস্থায় থাকে। শীতল কক্ষের উত্তাপ সর্বদা এক মাত্রায় রাখিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে শীতল কক্ষের প্রচলন অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। অধুনা আমাদের দেশেও এইরূপ শীতল কক্ষের ব্যবহার দেখা যাইতেছে। ঘরোয়া সংরক্ষণের জন্য শীতল কক্ষ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। প্রথমত একটি শীতল কক্ষে যতটা পরিমাণ খাদ্যবস্তু রাখা যায় একটি পরিবারের পক্ষে তাহা কখনই প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। শুধুমাত্র ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই শীতল কক্ষের ব্যবহার সম্ভব। নিত্য ব্যবহার্য ফলমূল ও মাছ মাংস প্রভৃতি ঘরোয়া খাদ্য সংরক্ষণের জন্য রেফ্রিজারেটার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী।

গ্যাস—গ্যাসের সাহায্যে খাদ্য সংরক্ষণ আর একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে ব্যবহৃত হয়। গাছ হইতে তুলিয়া আনিবার পরেও ফল ও সবজির মেটাবলিজম ক্রিয়া চলিতে থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংস্পর্শে আসিলে খাদ্য-বস্তুর মেটাবলিজম ক্রিয়া স্তিমিত হয় এবং ফল পাকিতে বিলম্ব ঘটে।

শীতল কক্ষের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে ইহাতে ডিম রাখিলে ডিমে একটা **ছাতা পড়া গন্ধ** আসে এবং খাদ্য হিসাবে শীঘ্রই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া ওঠে। ডিম সংরক্ষণের জন্য গ্যাস সমধিক উপযুক্ত।

পাস্তরাইজেসন (Pasteurization)—আজকাল প্রায় সকল দেশেই এই পদ্ধতি দুধ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ফলের রসও এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়।

পাস্তরাইজেসন পদ্ধতির উদ্দেশ্য প্রধানত দুইটি :

(১) দুধের মধ্যে টাইফয়েড, যক্ষ্মা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগজীবাণু ধ্বংস করা এবং

(২) দুধের অধিকাংশ ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড (Lactic acid) উৎপাদনকারী জীবাণু বিনাশ করা। এই পদ্ধতিতে খাদ্য-দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করা যায় না। উপরোক্ত জীবাণুর ধ্বংস দ্বারা খাদ্যদ্রব্য বিশুদ্ধ করিয়া উহার পচন ক্রিয়া মন্দীভূত করাই এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য।

পাস্তরাইজেসন পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তুকে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া রোগজীবাণুসমূহ ধ্বংস করা হয়। উষ্ণতা এবং সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী ইহা দুই প্রকারের হইতে পারে।

(১) হোল্ডার পদ্ধতি (Holder Process)—এই পদ্ধতিতে খাদ্য-দ্রব্য ১৪৫° ফাঃ উষ্ণতায় ৩০ মিনিট ধরিয়া উত্তপ্ত করিতে হয়।

(২) ফ্ল্যাশ পদ্ধতি (Flash Process)—এই পদ্ধতি অনুযায়ী খাদ্য-দ্রব্য অধিক উষ্ণতায় অর্থাৎ ১৬২° ফাঃ উষ্ণতায় ১৫-১৬ মিনিট ধরিয়া উত্তপ্ত করিতে হয়।

উভয় পদ্ধতিতেই দুধ নির্দোষ করা হইয়া থাকে। ফ্ল্যাশ পদ্ধতিতে অল্প সময় উত্তাপ প্রয়োগ করা হয় বলিয়া অধিকতর নিপুণতার প্রয়োজন। সুদক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এই পদ্ধতি পরিচালিত না হইলে দুধ সম্পূর্ণ দোষমুক্ত হয় না। অল্প সময় উত্তপ্ত করিতে হয় বলিয়া আজকাল হোল্ডার পদ্ধতি অপেক্ষা ফ্ল্যাশ পদ্ধতিই দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

পাস্তরাইজেসনে দুধের খাদ্যমূল্যের কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় না, পরন্তু উহাতে দুধ সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়। ভাইটামিন, 'এ', 'বি' এবং 'ডি' সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে। শুধু ভাইটামিন 'সি'র শতকরা ২০ ভাগ এবং ভাইটামিন 'বি'র ১০ ভাগ নষ্ট হয়। তবে দুধে ভাইটামিন 'বি' এবং 'সি'র পরিমাণ অল্প বলিয়া এই দুই প্রকার ভাইটামিনের অভাব অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হইতে পূরণ করা হয়। সুতরাং দুধ পাস্তরাইজেসান করিয়া ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত।

(খ) **ক্যানিং এবং বটলিং** (Canning and Bottling)—খাদ্যদ্রব্য টিনের পাত্র (Can) কিংবা কাচের বোতলে (Bottle) পূরিয়া সংরক্ষণ করার নাম যথাক্রমে ক্যানিং এবং বটলিং। উত্তাপের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য আংশিক ভাবে জীবাণুমুক্ত করিয়া একটি বিশুদ্ধ বদ্ধ পাত্রে বায়ু ও জীবাণুর হাত হইতে খাদ্যবস্তু রক্ষা করাই এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য। নেপোলিয়ানের সময় ফরাসী অধিবাসী নিকোলাস এপার্ট (Nicholas Appert) সর্বপ্রথম এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আজকাল বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য এইভাবে সংরক্ষিত হয়। ফল সংরক্ষিত করিতে কখনও সিরাপ বা চিনির জলও মিশানো হয়। তবে অ্যাসিডযুক্ত ফলে সিরাপ মিশাইতে হয় না, ফলের অ্যাসিডই সংরক্ষণে সহায়তা করে। টমেটোতে জলের সঙ্গে লবণ (আধ সের জলে ১ চামচ লবণ) মিশাইতে হয়। মাছ, মাংস ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে

লবণ জল (brine) মিশাইতে হয়। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে ক্যানিং এবং বটলিং-এ খাদ্যবস্তু আংশিকরূপে জীবাণুমুক্ত করা হয়। সুতরাং অবশিষ্ট জীবাণুর ক্রিয়া মন্দীভূত বা বন্ধ করিবার জন্যই খাদ্যবস্তুর সহিত সিরাপ, চিনি, লবণজল ব্যবহার করিতে হয়।

কাচ এবং টিন উভয় প্রকার পাত্রেরই সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। টিনের পাত্রে অ্যাসিডযুক্ত খাদ্যবস্তু সংরক্ষিত করিলে পাত্রের সহিত অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গ্যাস উৎপন্ন হইতে পারে এবং ইহাতে খাদ্যবস্তু দূষিত কিংবা বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও খাদ্যের রং বদলাইতে পারে। কিন্তু এই পাত্রের সুবিধা এই যে ক্যানিংএর সময় উত্তাপ পাত্রের মধ্যস্থিত খাদ্যবস্তুর সর্বত্র দ্রুত পরিচালিত হয়। জীবাণু ধ্বংস করিবার পক্ষে তাই ইহা বিশেষ উপযোগী। সুতরাং কাচ পাত্র অপেক্ষা টিনের সংরক্ষিত খাদ্য অধিকতর নিরাপদ। কাচের পাত্রের সুবিধা এই যে পাত্রটি ভাঙ্গিয়া কিংবা ফাটিয়া না গেলে চিরদিন ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে এবং অ্যাসিডযুক্ত খাদ্যবস্তু পাত্রের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইতে পারে না। কিন্তু কাচ তাপ-কুপরিবাহী, সুতরাং বটলিং পদ্ধতিতে উত্তাপ অনেক সময় ভিতরের খাদ্যবস্তুতে পৌছায় না। ফলে কাচ পাত্রে সংরক্ষিত খাদ্য দ্রুত নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে।

দুইটি উপায়ে ক্যানিং বা বটলিং পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু সংরক্ষিত করা যায়।

(১) **Open Kettle Method**—এই পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু একটি খোলা পাত্রে লইয়া ফুটন্ত জলের মধ্যে বসাইয়া উত্তপ্ত করিতে হয়। উত্তপ্ত করিবার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া লইতে হয়। কাচের বা টিনের পাত্রটি পূর্ব হইতেই ভাল করিয়া ফুটন্ত জল দ্বারা ধুইয়া যথাসম্ভব জীবাণুমুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। ফুটন্ত জলের উত্তাপ প্রায় ১০০° সেঃ হয়। এই উত্তাপে খাদ্য-বস্তুর অধিকাংশ জীবাণুই ধ্বংস হইয়া যায়। ইহা ছাড়া খাদ্যের জারক দ্রব্যাদিও (Enzymes) উত্তাপের ফলে নষ্ট হয়। সুতরাং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ এবং বর্ণ নষ্ট হইবারও আশঙ্কা থাকে না। এই সময় সিরাপ, চিনির জল, লবণজল, ইত্যাদি উত্তমরূপে ফুটাইয়া খাদ্যের সহিত মিশাইয়া লইতে হয়। এইবার ঐ উত্তপ্ত খাদ্যবস্তু পূর্বের বোতল বা টিনের পাত্রে ভরিয়া উহার মুখটি দ্রুত বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

এই পদ্ধতিতে অ্যাসিড জাতীয় খাদ্যবস্তু, টমেটো প্রভৃতি সংরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যে সকল খাদ্যদ্রব্য অ্যাসিডযুক্ত নয়, যথা—মাছ, মাংস এবং

কোন কোন তরিতরকারি, ফল প্রভৃতি, তাহা এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত করা মোটেই নিরাপদ নয়। অতি উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিলেও বোতল বা টিনের পাত্রের মধ্যে কিছু বায়ু থাকিয়া যায়। তাছাড়া জলের ১০০° সেঃ উত্তাপে খাদ্যের সকল জীবাণু ধ্বংসও হয় না। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই ঐ খাদ্য বিষাক্ত হইয়া যায়। এই ধরনের খাদ্য হইতে বটুলিজম (Botulism) রোগের সৃষ্টি হইতে পারে।

(২) **Can Cooked Method**—এই পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু ১০০° সেঃ-এর অধিক উত্তাপে উত্তপ্ত করা হয়। এই জন্য জলের পরিবর্তে জলীয় বাষ্পের সাহায্যে উত্তাপ প্রয়োগ করা হয়। চাপ বাড়াইলে জলীয় বাষ্পের উত্তাপ ১০০° সেঃ অধিক করা যায়। প্রেসার কুকার ইত্যাদিতে এইভাবে চাপ বাড়াইয়া জলীয় বাষ্পের চাপ বৃদ্ধি করা হয়। কত চাপে কত উষ্ণতা তাহা ঐ কুকারের গায়ে একটি যন্ত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। খাদ্যবস্তু প্রথমে ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার টিন বা কাচের পাত্রে পূরিতে হয়। পাত্রটি কিছুক্ষণ ফুটন্ত জলের মধ্যে বসাইয়া গরম করিতে হয়। ইহাতে খাদ্যের মধ্যস্থিত বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং উহা আয়তনে কমিয়া আসে। ইহা ছাড়া খাদ্যের জারক দ্রব্যাদিও নষ্ট হইয়া যায় এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ অবিকৃত থাকে। এই উত্তপ্ত করার পদ্ধতিকে Blanching বলে। এই সময়ই সিরাপ, চিনি বা লবণ জল ইত্যাদি গরম অবস্থায় খাদ্যের সহিত মিশাইয়া উহার মুখটি ভাল করিয়া ক্যানিং যন্ত্র দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এইবার ঐ মুখ বন্ধ করা পাত্রটি প্রেসার কুকারের জলের উপরে একটি তারের ফ্রেমের মধ্যে বসাইয়া কুকারের মুখটি বন্ধ করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। কুকারের মধ্য হইতে সমস্ত বায়ু বাহির হইয়া গেলে মুখটি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া উচ্চ চাপে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত করিতে হয়। চাপ এবং সময়ের পরিমাণ খাদ্যবস্তুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। উত্তাপ প্রয়োগের পর পাত্রটিকে দ্রুত ঠাণ্ডা করিতে হয়।

এই পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা নিরাপদ, Blanchingএর সাহায্যে পাত্রের ভিতরের বায়ু বাহির করিয়া দেওয়ায় খাদ্যবস্তু বায়ুর জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে না। অধিক উত্তাপের ফলে বটুলিজম প্রভৃতি মারাত্মক রোগের জীবাণু সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস হইয়া যায়। মাছ, মাংস এবং যে সকল তরি-তরকারি, ফল প্রভৃতি অ্যাসিডযুক্ত নয় তাহা এই পদ্ধতিতেই উত্তমরূপে সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

ক্যানিং পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাদ্যবস্তুর খাদ্যমূল্য—ক্যানিং পদ্ধতিতে খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। ভাইটামিন 'এ' সম্পূর্ণরূপেই সংরক্ষিত হয়, কিন্তু ভাইটামিন 'বি' এবং 'সি' সামান্য নষ্ট হইয়া যায়। মাংস অপেক্ষা তরি-তরকারি এবং ফল-মূলে এই সকল ভাইটামিনের ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম হয়। খাদ্যদ্রব্য এই পদ্ধতিতে গৃহে সংরক্ষিত হইলে উপযুক্ত সতর্কতার অভাবে অধিক ভাইটামিন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ক্যানিং পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাদ্যবস্তুর পচন—মাঝে মাঝে এই ধরনের সংরক্ষিত খাদ্যেও ছাতা পড়িতে দেখা যায়। এই ছাতা ফাঙ্গাস প্রভৃতি জীবাণুর একটি আস্তরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। Open Kettle Method-এ সংরক্ষিত খাদ্যই এইরূপে নষ্ট হয়, কারণ, পাত্রের ভিতরে কিছু বায়ু আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং এই বায়ুর জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বটুলিজম নামক রোগও এই প্রকারে সংরক্ষিত খাদ্য হইতেই বিস্তার লাভ করে। ইহা এক প্রকার জীবাণু (clostridium botulism) হইতেই সৃষ্টি হয়। এই জীবাণু ১১৪° সেঃ তাপের কমে ধ্বংস হয় না। খাদ্যের টক টক গন্ধ ও গ্যাস সৃষ্টি এবং গলিয়া যাওয়ার অবস্থাই এই জীবাণুর উপস্থিতি নির্দেশ করে। অনেক সময় এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইলেও খাদ্যের গন্ধ এবং আকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় না।

কখনও কখনও সংরক্ষিত খাদ্যবস্তু টক (sour) হইয়া যায়। সংরক্ষণের সময় পাত্রটি উত্তমরূপে ফুটন্ত জলের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করিয়া না লইলে এই ধরনের পচনক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় খাদ্যবস্তুর সিরাপ বা চিনির জল হইতেও এই ধরনের পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। Can cooking methodএ উত্তাপের পর পাত্রটিকে ঠাণ্ডা করিতে বিলম্ব করিলেও এই ধরনের পচন হইতে পারে।

কখনও কখনও পাত্রের ভিতরে গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং পাত্রের একদিক উঁচু হইয়া উঠে। অ্যাসিড জাতীয় খাদ্যদ্রব্য টিনের পাত্রের সংস্পর্শে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে এবং এই হাইড্রোজেন হইতে এই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে তবে ইহাতে খাদ্যদ্রব্যের কোন ক্ষতি হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে পাত্রের মুখ ভালরূপে বন্ধ না করিলে বাহির হইতে জীবাণু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন করিয়াও এই অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে।

কখনও কখনও এই ধরনের সংরক্ষিত খাদ্যে একটি ধাতব গন্ধ (metallic flavour) পাওয়া যায়। অ্যাসিড জাতীয় খাদ্যদ্রব্য টিনের পাত্রে সংরক্ষণ করিলে খাদ্যের অ্যাসিড পাত্রের টিন এবং লোহার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই সকল ধাতব গন্ধ উৎপন্ন করে। ইহাতে খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত হয় না।

কখনও কখনও খাদ্যদ্রব্যের রংয়ের পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। খাদ্যের ট্যানিন এবং অন্যান্য পদার্থ উহার জারক দ্রব্যের (Enzyme) সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইয়া এই রং পরিবর্তন করিয়া থাকে। সংরক্ষণের সময় ঠিক ভাবে উত্তাপ প্রয়োগ না করিলে খাদ্যের এই সকল জারক দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় না। আধুনিক যুগে খাদ্যের সহিত কিছু ভাইটামিন 'সি' মিশাইয়া এই প্রকার পচনক্রিয়া বন্ধ করা হয়।

(গ) **শুষ্ককরণ** (Drying)—পরিপূর্ণ পুষ্টিলাভের পর ফল ও শাকসবজির বৃদ্ধির সকল সম্ভাবনা যখন তিরোহিত হয় তখন অনিবার্য ক্ষয় ও পচনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রকৃতি উহাদের অনেককে শুকাইয়া ফেলে এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। মানুষের দুইটি প্রধান খাদ্যদ্রব্য—শস্য ও ডাল—না শুকাইলে কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি শুষ্ক ফল যেমন খেজুর ও কিশমিশ আমাদের অতি পরিচিত এবং প্রিয় খাদ্য। আর্দ্রতা ব্যতীত জীবাণু বাঁচিতে পারে না বলিয়া খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত ভাবে শুকাইতে পারিলে পচে না এবং সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করিলে সহজেই কীটপতঙ্গের হাত হইতে রক্ষা করা যায়।

ফল ও সবজি সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতি হইল রৌদ্রে শুকান। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শুকাইবার খরচ নাই বলিলেই চলে, কারণ, সূর্যের তাপে সুচারু রূপে শুকাইবার কাজ সম্পন্ন হয়; আমাদের দেশের অনেক গৃহিণীই আম, চালতা ইত্যাদি ফল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া অসময়ের জন্য তুলিয়া রাখেন। হরীতকী, আমলকী, বহেরা, কুল প্রভৃতি ফল ত আস্তই শুকান হয়। এতদ্ব্যতীত কুষ্মাণ্ড, মিষ্টি কুমড়া, কচু প্রভৃতি সবজিও গৃহে সংরক্ষণের বিধি আছে। অনেকে আবার বাঁধাকপি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া অসময়ের জন্য বোতলে পূরিয়া রাখেন। আলু জলে সামান্য সিদ্ধ করিয়া লইয়া খোসা ছাড়াইয়া পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে চমৎকার আলু চিপস্ তৈয়ারী হয়। আমসত্ব, আমচুর, বড়ি, পাপর যে

উৎকৃষ্ট শুষ্ক খাদ্য তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এতদ্ব্যতীত রন্ধনের যাবতীয় মশলাও রৌদ্রে শুকান হয়।

শুষ্ক খাদ্যের গুণ—খাদ্য শুকাইলে উহার ওজন বহুগুণে কমিয়া হাল্কা হইয়া যায়। সংরক্ষণ ও বিদেশে প্রেরণের পক্ষে এইরূপ শুষ্ক খাদ্য সুবিধাজনক। উপরন্তু টাটকা ফলের সকল গুণই শুষ্ক খাদ্যে বর্তমান থাকে, শুধুমাত্র খাদ্যবস্তুর জলীয় অংশ এবং কিছুটা সুগন্ধি নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাদ্য শুকাইবার কোন খরচই নাই। তবে খাদ্য শুকাইবার সময় দেখিতে হইবে উহা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না শুকাইয়া যায়। অতিরিক্ত শুষ্ক সবজি ভাল সিদ্ধ হইতে চাহে না, ইহার স্বাদও খারাপ হইয়া যায়। আবার কম শুষ্ক খাদ্যও পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। খাদ্যবস্তু কাটিয়া উহার ভিতরে যখন আর কোনরূপ জলীয় পদার্থ পাওয়া যাইবে না তখনই উহা সংরক্ষণের উপযোগী হইয়াছে বুঝিতে পারিবে।

রৌদ্রে শুকাইবার অসুবিধা—বাংলা ও আসামের মত বৃষ্টিবহুল দেশে শুধুমাত্র রৌদ্রের উপর নির্ভর করিয়া খাদ্যদ্রব্য শুকান অসুবিধাজনক, কারণ, যে কোন সময় বৃষ্টি নামিয়া বসিলে অর্ধশুষ্ক খাদ্যবস্তু নষ্ট হইয়া যাইবে। এইজন্য গৃহে একটি শুকাইবার যন্ত্র (home drier) রাখিলে ভাল হয়। এইরূপ যন্ত্র দামেও সস্তা।

লবণের সাহায্যে সংরক্ষণ (Salting)—

চিনির মতই লবণেরও খাদ্য সংরক্ষণ করিবার গুণ রহিয়াছে। লবণের সাহায্যে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শাক-সবজি ও মাছ, সাধারণত ইলিশমাছ লবণ দিয়া সংরক্ষণ করা হয়। স্বল্প কিংবা বেশী পরিমাণ দুইভাবেই লবণ প্রয়োগ করা যায়। খাদ্যবস্তুতে স্বল্প পরিমাণ লবণ ব্যবহার করিলে উহা ঈষৎ গাঁজাইয়া উঠিতে চায়। অধিক পরিমাণে লবণ ব্যবহার করিলে খাদ্যবস্তু টাটকা থাকে বটে কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের লবণাক্ত ভাব দূর করা কোন কোন ক্ষেত্রে কঠিন হইয়া পড়ে।

অধিক পরিমাণে লবণ ব্যবহারের নিয়ম—যে সকল সবজি সংরক্ষণ করিতে চাও তাহা একটি পাত্রে রাখিয়া খুব ভাল করিয়া লবণ মাখাইবে। তারপর যে পাত্রে সংরক্ষিত হইবে উহার তলায় এক প্রস্থ লবণ রাখিয়া দুই ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করিয়া সবজি বিছাইয়া দিবে। তারপর উহার উপর আবার লবণ

ছড়াইয়া দিবে এবং লবণের উপর পুনরায় সবজি বিছাইবে। এইভাবে সমস্ত পাত্রটি ভর্তি করিয়া ফেলিবে।

লবণ দিয়া ইলিশ মাছ সংরক্ষণ করিতে হইলে কয়েকটি টাটকা মাছ প্রথমে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া মাছগুলি ওজন করিয়া লও। তারপর মাছের ওজনের দশভাগের এক ভাগ পরিমাণ লবণ কাটা মাছগুলির উপর ছড়াইয়া দাও, সামান্য লেবুর রস, হলুদের গুড়াও দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে মাছের গন্ধ ভাল থাকে। ইলিশ ব্যতীত অন্যান্য অনেক মাছ রৌদ্রে শুকাইয়া রাখা হয়। এইরূপ মাছকে শুটকি মাছ বলে।

রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে সংরক্ষণ

চিনি, লবণ, ভিনিগার, সরিষা বা অন্য কোন মিঠা তেল ও মশলার খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ, যথা—বেনজৈক অ্যাসিড (Benzoic acid), বেনজোয়েটস (Benzoates), বোরিক (Boric) অ্যাসিড ও সালফাইটস (Sulphites) মিশ্রিত করিলে খাদ্যদ্রব্য বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। এইভাবে চিনির সাহায্যে আমরা জ্যাম, জেলী, লবণ ও মশলার সাহায্যে আচার, বেনজৈক ও বেনজোয়েটস-এর সাহায্যে ফলের রস, বোরিক অ্যাসিডের দ্বারা ক্রীম এবং সালফাইটসের সাহায্যে টাট্‌কা ফল সংরক্ষণ করিতে পারি।

খাদ্য সংরক্ষণের আধুনিকতম পদ্ধতি—খাদ্যদ্রব্যের খাদ্যমূল্য, বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদ সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া সংরক্ষণ করিবার জন্য আজকাল এন্‌টি-বায়টিক (antibiotics), ক্যাথোড রশ্মি (Cathode Ray) এবং আলট্রা-ভায়লেট রশ্মি (Ultra-violet ray) ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলিতেছে। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে সাব্‌টিলিন (Subtilin) নামক এন্‌টিবায়টিকের সাহায্যে তরি-তরকারির বর্ণ এবং গন্ধ অবিকৃত রাখা যায়। সামান্য পরিমাণ সাবটিলিন খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা একটি পাত্রে পূরিতে হয়। অধিকাংশ জীবাণুই এই সাবটিলিনের সংস্পর্শে ধ্বংস হইয়া যায় কিন্তু খাদ্যের জারকরস সমূহের (Enzymes) উপর এবং কোন কোন ইস্ট ও ছত্রকের উপর ইহার কোন ক্রিয়া নাই। এইজন্যই পাত্রটিকে ভালভাবে সীল করিয়া ও ৫ হইতে ১০ মিনিট পর্যন্ত ২১২° ফাঃ উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া ঐ জারক রস, ইস্ট এবং ছত্রকসমূহ বিনাশ করা হয়।

ক্যাথোড রশ্মি মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই খাদ্যের জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে এবং ইহার সাহায্যে ভাইটামিন ও প্রোটিনের মোটেই অপচয় হয় না। এইজন্য আজকাল এই রশ্মির সাহায্যেও খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই পদ্ধতির একটি বড় অসুবিধা হইতেছে এই যে এই রশ্মি প্রয়োগে খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে।

আলট্রা-ভায়লেট রশ্মিও জীবাণু ধ্বংস করিতে বিশেষ কার্যকরী। মাংস সংরক্ষণে এই রশ্মি আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে।

এই আধুনিক পদ্ধতিসমূহ এখনও পূর্ণ সফলতা অর্জন করে নাই। এখনও গবেষণাগারে ইহাদের উপর পরীক্ষা চলিতেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইহারা খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করিবে।

খাদ্য সংরক্ষণের কয়েকটি সাধারণ ঘরোয়া পদ্ধতি

প্রতি গৃহেই কিছু না কিছু খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন ফলের জ্যাম, জেলী, মোরব্বা, আচার ইত্যাদি প্রধান।

জ্যাম ও জেলী—ভারতবর্ষের বহু ফল দিয়া উৎকৃষ্ট জ্যাম ও জেলী প্রস্তুত হয়। পেকটিন (Pectin), অ্যাসিড ও চিনি এই তিনটি বস্তুর সাহায্যে জ্যাম ও জেলী থকথকে ভাব ধারণ করে। চিনির অন্যতম গুণ হইল সংরক্ষণ শক্তি।

পেকটিন ও অ্যাসিড—পেকটিন শ্বেতসার জাতীয় বস্তু। ইহা ফলের কোষের গায় সংলগ্ন থাকে। কমলালেবু, লেবু, আপেল, প্লাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলে প্রচুর পরিমাণে পেকটিন বর্তমান। আবার স্ট্রবেরী, পীচ, তরমুজ, ন্যাশপাতি, আনারস ইত্যাদি ফলে পেকটিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার চেয়ে শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলে পেকটিনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। পেকটিন ব্যতীত জেলীর জন্য ফলে অ্যাসিডও থাকা চাই। যে সকল ফলে পেকটিন কিংবা অ্যাসিডের অভাব থাকে উহাদের দ্বারা জেলী করিতে হইলে স্বতন্ত্র পেকটিন ও অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। লেবু জাতীয় ফল, আপেল, প্লাম, আম ও আঙ্গুরে প্রচুর অ্যাসিড বর্তমান থাকে। পরন্তু স্ট্রবেরী, তরমুজ, পীচ, ন্যাশপাতি, কলা ও পেয়ারাতে অ্যাসিড নাই বলিলেই চলে। লেবু বা জামীর জাতীয় ফল (citrus fruits) জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া ঘরেই পেকটিন প্রস্তুত করা যায়।

চিনি—জ্যাম ও জেলী কেবল মিষ্টি করিবার জন্যই চিনির প্রয়োজন হয় না, ইহার অন্যতম কাজ হইল খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ। জ্যাম কিংবা জেলীতে কম পরিমাণ চিনি প্রয়োগ করিলে ঐ খাদ্য বেশীদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। আবার চিনির পরিমাণ বেশী হইয়া গেলে জ্যাম ও জেলীর স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ ছাপাইয়া গিয়া চিনির স্বাদ প্রবল হইয়া ওঠে। এইজন্য জ্যাম ও জেলীতে সর্বদা চিনির পরিমাণ পরিমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। চিনি ব্যবহারের একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল ফলে পেকটিন কম থাকে সেই সকল ফলের জেলীতে ফলের রসের ¾ অংশ চিনি দিতে হয় এবং যে সকল ফলে পেকটিনের মাত্রা বেশী থাকে সেই সকল ফলে চিনি ও ফলের রসের পরিমাণ অবশ্যই সমান হইবে।

পেকটিন পরীক্ষার নিয়ম—জেলী প্রস্তুত করিবার জন্য ফল সিদ্ধ করিয়া যে ঘন রস বাহির হইবে উহা হইতে এক চামচ রস লইয়া দুই চামচ পরিমাণ মেথিলেটেড স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া রাখ। ফলের রস যদি জমাট বাঁধিয়া গিয়া একটি চাকায় পরিণত হয় তবে বুঝিবে ফলের রসে পেকটিনের ভাগ বেশী। পরন্তু মেথিলেটেড মিশ্রিত রস যদি জমাট বাঁধিয়া না গিয়া দুই তিনটি ছোট ছোট ড্যালায় পরিণত হয় তবে জানিবে ফলের রসে পেকটিনের ভাগ অল্প।

জ্যাম ও জেলী প্রস্তুতের নিয়ম—জ্যাম প্রস্তুত করিতে হইলে ফলগুলি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া লইয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। শক্ত ফল হইলে সিদ্ধ করিবার সময় সামান্য জল দিয়া লইবে, নতুবা বিনা জলে সিদ্ধ করিবে। তারপর উহাতে চিনি এবং প্রয়োজন বোধে সাইট্রিক অ্যাসিড কিংবা লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া অর্ধঘন্টা রাখিয়া দিবে এবং ফুটাইয়া ঘন করিয়া লইবে।

জেলী প্রস্তুতের বেলা ফলগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে কেবল রসটুকু ছাঁকিয়া লইবে এবং ছিবড়েগুলি ফেলিয়া দিবে। এইজন্য জেলীর চেয়ে জ্যামে ফলের অপচয় কম ঘটে। অবশ্য পেয়ারা প্রভৃতি ফলের জ্যাম প্রস্তুত করা যায় না। এইবার ছাঁকা ফলের রসের পেকটিন পরীক্ষা করিয়া লইয়া উহাতে প্রয়োজন মত চিনি মিশাইয়া ফুটাইবে। রস বেশ ঘন হইয়া আসিলে পেকটিন অথবা অ্যাসিড যে ক্ষেত্রে যাহা প্রয়োজন তাহা মিশাইয়া নামাইবে।

মোরব্বা প্রস্তুতের প্রণালী

উপকরণ—আম, আনারস, কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি ফলই মোরব্বার পক্ষে উৎকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত চিনি এবং টক ফলের ক্ষেত্রে চুন।

ফলটি টক হইলে খোসা ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া চুনের জলে দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। তারপর সমস্ত জল ফেলিয়া দিয়া ঠাণ্ডা জলে কাটা ফলগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া নিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া লও। এইবার ঐ সিদ্ধ জল ফেলিয়া দিয়া ফলগুলি ছাঁকিয়া নাও তারপর চিনির রস করিয়া সিদ্ধ ফলের টুকরাগুলি অল্প আঁচে ধীরে ধীরে ফুটাইতে থাকে। রস বেশ ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া ফেল। ফল টক না হইলে চুনের জলে ভিজাইবার প্রয়োজন নাই। অন্যান্য প্রক্রিয়া একরূপ।

আচার—বাংলাদেশে কাঁচা আম, পাকা কুল ও তেঁতুল, লেবু, লঙ্কা, ফুলকপি প্রভৃতির আচার সর্বাধিক প্রচলিত। আচার দুই প্রকারের—টক ও মিষ্টি। যে সকল ফল দিয়া টক আচার তৈয়ার হয় সেগুলি প্রথমে ভাল করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া কাটিয়া লইয়া লবণ মাখাইয়া একদিন কোন ক্ষেত্রে দুই চারিদিন প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। তারপর তেল কিংবা ভিনিগারে ডুবাইয়া রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। আম প্রভৃতি টক ফল তেলে ডুবান হইয়া থাকে। আচারে নানাবিধ মশলা ব্যবহার করা চলে। মিষ্টি এবং টক উভয় প্রকার আম আচারের পক্ষে উপযুক্ত। তেঁতুল এবং কুল দিয়া কেবল মিষ্টি আচারই প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পাকা তেঁতুল জলে গুলিয়া এবং কুল চটকাইয়া লইয়া খোসা এবং বিচিগুলি প্রথমে ফেলিয়া দিতে হয়। অনেকে তেঁতুলের আঁশ এবং বিচি রাখা পছন্দ করেন। এইবার ফলের চটকান রস কিছুদিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া উহাতে গুড়, মশলা এবং তেল মাখাইয়া আবার শুকাইতে দিতে হয়। আচার অতি উৎকৃষ্ট এবং মুখরোচক খাদ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বস্ত্রশিল্প

কৃত্রিম তন্তু (Artificial Fibres)

তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতি প্রকৃতিজাত তন্তু হইতেই আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্বপ্রথম প্রস্তুত করা হইত। আজকাল কিন্তু এই সকল প্রকৃতিজাত তন্তু ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রকারের তন্তুদ্বারা প্রস্তুত কাপড় বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন নূতন এই সকল তন্তু মানুষ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় সৃষ্টি করিয়াছে। মনুষ্য নির্মিত এই সকল তন্তুকেই কৃত্রিম তন্তু (Artificial fibres) বলে। যেমন—নাইলন, ডেক্রন, ভিনিয়ন, সরণ ইত্যাদি এই শ্রেণীর কৃত্রিম তন্তু। এইসকল তন্তুর মধ্যে নাইলন, ডেক্রন, ভিনিয়ন, সরণ ইত্যাদিকে সাংশ্লেষিক তন্তু (Synthetic Fibres) বলা হয়, কারণ গবেষণাগারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি (Laboratory chemicals) হইতেই এই সকল তন্তু নির্মিত হইয়া থাকে। রেয়নকে ঠিক সাংশ্লেষিক তন্তু বলা চলে না; কারণ উহা প্রকৃতিজাত সেল্যুলোজ হইতেই বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রেয়ন (Rayon)—রেয়নই মনুষ্য নির্মিত সর্বপ্রথম কৃত্রিম তন্তু। ঔজ্জ্বল্যে এবং চাকচিক্যে ইহা প্রায় প্রকৃতিজাত রেশম তন্তুর মতই। এইজন্যই রেয়নকে কৃত্রিম রেশম (Artificial silk) বা 'আর্ট সিল্ক' বলা হয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে রবার্ট হুক (Robert Hooke) সর্বপ্রথম কৃত্রিম তন্তু প্রস্তুতির কথা তাহার 'মাইক্রোগ্রাফিয়া' (Micrographia) নামক পুস্তকে উল্লেখ করেন। কিন্তু এই তন্তু প্রস্তুতির পণ্য-পদ্ধতি (Commercial method) ইহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত মানুষের অজানা ছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট হিলারী (Count Hilaire de Chardonnet) ফরাসী দেশে কৃত্রিম উপায়ে পণ্য পদ্ধতিতে রেয়ন প্রস্তুত করেন। তাহাকেই রেয়ন শিল্পের জনক (Father) বলা যাইতে পারে। ইহার পরে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায়ও রেয়ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়।

তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ যে তুলার সকল আঁশের দৈর্ঘ্য সমান নয়। ইহার মধ্যে বড় আঁশগুলি সূতিবস্ত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ছোট ছোট আঁশগুলি ঐ বস্ত্র প্রস্তুতির কাজে লাগে না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত

তুলা (Cotton linters) এবং বিশুদ্ধ উদ্ভিদ্ মণ্ডই (Wood pulp) উৎকৃষ্ট রেয়ন প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক পদ্ধতির ফলে তুলার আঁশে ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য সৃষ্টি হয় এবং রেশম বলিয়া মনে হয়। রেয়ন প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা—(১) ভিসকোস (Viscose), (২) কিউ-প্রামোনিয়াম (Cuprammonium), (৩) সেল্যুলোজ অ্যাসিটেট (Cellulose acetate), এবং (৪) সেল্যুলোজ নাইট্রেট (Cellulose nitrate)। ইহার মধ্যে ভিসকোস এবং কিউপ্রামোনিয়াম পদ্ধতিতে প্রস্তুত রেয়নে তুলার কোন রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত রেয়ন বিশুদ্ধ সেল্যুলোজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এইজন্যই এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত রেয়নকে regenerated cellulose বলে। সেল্যুলোজ অ্যাসিটেট এবং সেল্যুলোজ নাইট্রেট পদ্ধতিতে প্রস্তুত রেয়ন কিন্তু বিশুদ্ধ সেল্যুলোজ নয়। ইহারা সেল্যুলোজ হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন যৌগ (Compound)। পূর্বে এই চার প্রকার পদ্ধতিতে প্রস্তুত তন্তুকেই রেয়ন বলা হইত। কিন্তু ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর Federal Trade Commission তন্তুর নামকরণের যে নূতন নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে কেবলমাত্র regenerated সেল্যুলোজকেই অর্থাৎ ভিসকোস এবং কিউপ্রামোনিয়াম পদ্ধতিতে প্রস্তুত তন্তুকেই 'রেয়ন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেল্যুলোজ অ্যাসিটেট এবং সেল্যুলোজ নাইট্রেট তন্তু দেখিতে রেয়ন তন্তুর ন্যায় হইলেও ইহাদের প্রকৃত পক্ষে রেয়ন বলা হয় না। মোট উৎপন্ন রেয়নের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ কিউপ্রামোনিয়াম পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়, অবশিষ্ট রেয়ন ভিসকোস পদ্ধতিতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিসকোস রেয়ন—এই পদ্ধতিতে তুলা (Cotton linters) অথবা উদ্ভিদ্জাত বিশুদ্ধ সেল্যুলোজের পাতাগুলি ৩০ মিনিট হইতে ৬০ মিনিট পর্যন্ত কষ্টিক সোডার দ্রবণে ভিজাইয়া রাখা হয়। ইহাতে সেল্যুলোজ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যালকালি সেল্যুলোজে (alkali cellulose) পরিণত হয়। ইহার পর এই অ্যালক্যালি সেল্যুলোজ হইতে অতিরিক্ত কষ্টিক সোডা হাইড্রলিক যন্ত্রের (hydraulic machine) সাহায্যে চাপিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং অন্য একটি যন্ত্রের (shredding machine) সাহায্যে এই সেল্যুলোজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়। এখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি কার্বন ডাই-সালফাইডের (carbon disulphide) দ্রবণে ডুবানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইহা সেল্যুলোজ জানথেট (cellulose xanthate)

পরিণত হয় এবং সমগ্র পদার্থটি গাঢ় কমলা বর্ণ হইয়া যায়। এইবার এই কমলা বর্ণের পদার্থটি লঘু কষ্টিক সোডার দ্রবণে দ্রবীভূত করা হয়। এই দ্রবণকে ভিসকোস দ্রবণ (viscose solution) বলে। রেয়ন তন্তুর ঔজ্জ্বল্য কমাইতে হইলে এই দ্রবণের সহিত সাধারণত টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড (Titanium dioxide) মিশাইতে হয়। এই অবস্থায় ৪-৫ দিন রাখিয়া পরে দ্রবণ হইতে অদ্রাব্য পদার্থ সমূহ ছাঁকিয়া দূর করিতে হয়। এই বিশুদ্ধ দ্রবণ এখন একটি সরু চালুনীর মত যন্ত্রের (spinnerettes) মধ্য দিয়া পাম্পের সাহায্যে একটি সালফিউরিক অ্যাসিড (sulphuric-acid) বাথের মধ্যে চালনা করা হয়। এই চালুনীটি (spinnerette) সাধারণত প্লাটিনাম জাতীয় মূল্যবান ধাতুর দ্বারা তৈরী এবং ইহার প্রতিটি ছিদ্রের
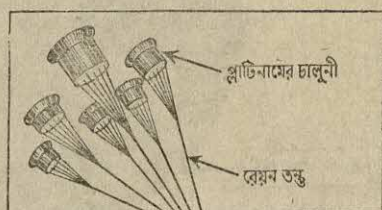
ব্যাস প্রায় ০'০০২ ইঞ্চি হইতে ০'০০৫ ইঞ্চি। সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সেলুলোজ জানথেট রেয়নে পরিণত হয়।

প্রকৃতি—লম্বালম্বিভাবে দেখিলে রেয়নতন্তু অনেকটা চওড়া ফিতার মত বলিয়া মনে হয়। আড়াআড়িভাবে কাটা তল অসমান ধারবিশিষ্ট পাতার মত দেখায়। নিম্নে উহাদের চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল।
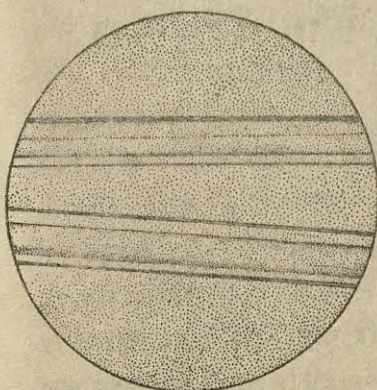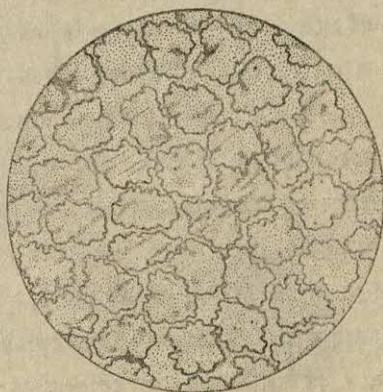
রেয়ন তন্তু　　রেয়ন তন্তু (আড়াআড়িভাবে কাটা তল)

কিউপ্রামোনিয়াম তন্তুর আড়াতাড়ি কাটা তল দেখিতে বৃত্তাকৃতি। জলে ভিজাইলে এই রেয়ন তন্তু শতকরা ২৫ হইতে ৪০ ভাগ জল শোষণ

করে এবং জোর অনেক কমিয়া যায়। ঠাণ্ডাজল অপেক্ষা গরম জল হইতে ইহা বেশী জল শোষণ করে। এই জন্যই রেয়ন বস্ত্র গরমজলের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ
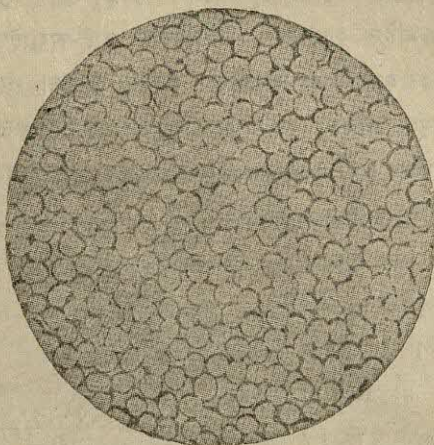
কিউপ্রামোনিয়াম তন্তুর আড়াআড়ি কাটা তল

গরম জলে ধুইতে হয়। কিন্তু শুষ্ক রেয়ন বস্ত্রে আবার পূর্ব জোর ফিরিয়া আসে। ভিজা অবস্থায় রেয়ন বস্ত্রের আকৃতির কোন রকম পরিবর্তন হইলে শুষ্ক অবস্থায় ঐ আকৃতি আর ফিরিয়া আসে না। এই জন্যই রেয়নের জামা কাপড় খুব সাবধানে যত্নের সহিত ধুইতে হয়। আজকাল অবশ্য রেয়ন তন্তুর অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং জলে ভিজাইলেও এখন আর তন্তুর জোর কমিয়া যায় না। আজকাল রেয়নের তোয়ালে (towel) এবং রুমালও ব্যবহৃত হইতেছে।

রেয়নতন্তু সেল্যুলোজ হইতেই প্রস্তুত। সুতরাং সুতির বস্ত্রে যে সকল রং ধরে তাহাদের সাহায্যে রেয়ন বস্ত্রও রং করা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে সুতির বস্ত্র অপেক্ষা রেয়ন বস্ত্র রং করা অনেক সহজ। পূর্বেই বলিয়াছি অ্যাসিটেট রেয়ন বিশুদ্ধ সেল্যুলোজ নয় এবং ইহাকে প্রকৃতপক্ষে রেয়নও বলা চলে না। এইজন্য এই জাতীয় কাপড়ে রং ধরান অনেক কষ্টসাধ্য। সুতির বস্ত্রের ন্যায় ইহাও অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। তবে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে মৃদু অ্যাসিড প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মৃদু ক্ষার জাতীয় দ্রব্যে রেয়নের কোন ক্ষতি হয় না। রেয়নবস্ত্রে সুতির বস্ত্রের মতই গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে অত্যধিক গরম ইস্ত্রি ব্যবহারে পোড়া দাগ পড়িতে পারে। রেয়নতন্তু আগুনে সুতির মতোই শিখাসহ পুড়িতে থাকে।

নাইলন (Nylon)—নাইলন প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যসৃষ্ট প্রথম সাংশ্লেষিক তন্তু। ১৯৩৮ খৃঃ আমেরিকার Du Pont Company অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে কয়েকটি তন্তুর ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত করে। ইহার মধ্যে Fibre—66এ স্বাভাবিক তন্তুর প্রায় সকল গুণই দৃষ্ট হয়। এই
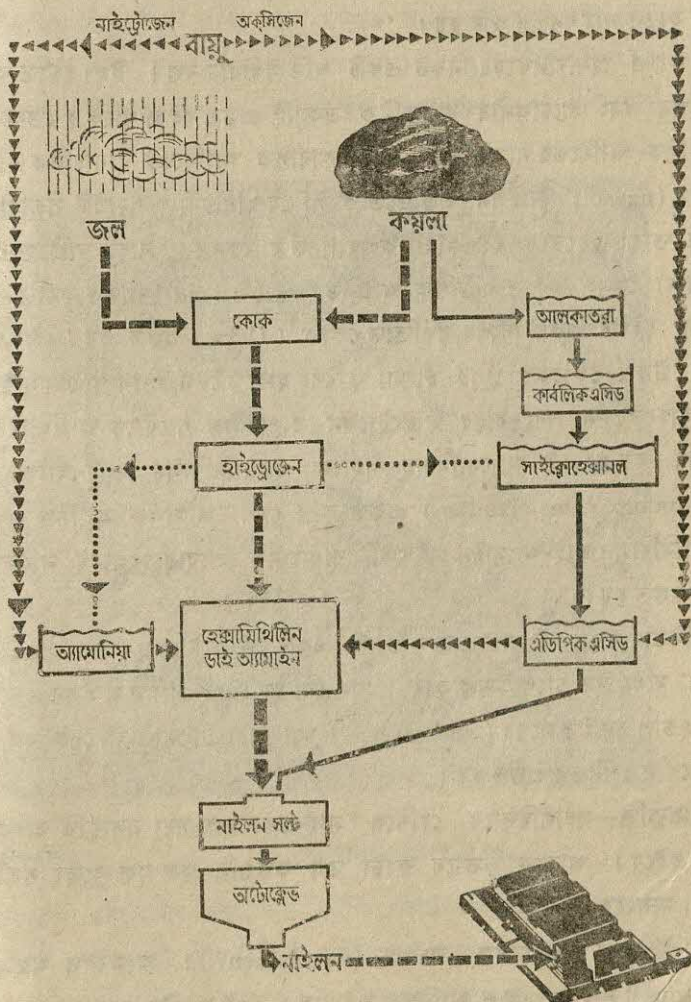
নাইলন প্রস্তুতি

Fibre—66-ই পরে নাইলন নামে পরিচিত হয়। তখন এই নাইলন টুথ ব্রাস প্রস্তুতিতেই ব্যবহৃত হইত। ক্রমশ গবেষণার ফলে ইহার আরও

উন্নতি হয় এবং ১৯৪০ খৃঃ সর্বপ্রথম নাইলন তন্তু কাপড় বুনিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

নাইলন তন্তু দুইটি ধাপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে কয়লা, জল এবং বায়ুর সাহায্যে নাইলনের কুচি (Flakes) প্রস্তুত হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে এই কুচি হইতে নাইলনতন্তু সৃষ্টি হয়।

কয়লা রাসায়নিকদের নিকট একটি অতি মূল্যবান বস্তু। ইহা হইতে বহু মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তোমরা কার্বলিক অ্যাসিডের নাম শুনিয়াছ। এই কার্বলিক অ্যাসিডের রাসায়নিক নাম ফেনল (phenol)। নাইলন প্রস্তুতিতে কয়লা যে রাসায়নিক পদার্থটি সরবরাহ করে তাহা হইতেছে এই কার্বলিক অ্যাসিড বা ফেনল। বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে ফেনল হইতে এডিপিক অ্যাসিড (adipic acid) প্রস্তুত করা হয়। কয়লা হইতে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কোক (Coke) প্রস্তুত হয়। জলীয় বাষ্প উত্তপ্ত কোকের উপর চালনা করিয়া হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায়। এই হাইড্রোজেন এবং বায়ুর নাইট্রোজেন রাসায়নিক সংযোগে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। এই অ্যামোনিয়ার সাহায্যে হেক্সামিথিলিন ডাই-অ্যামাইন (Hexamethylene diamine) প্রস্তুত করা হয়। এডিপিক অ্যাসিড এবং হেক্সামিথিলিন ডাই-অ্যামাইন এই দুইটি রাসায়নিক দ্রব্যের মিলনেই নাইলন কুচি প্রস্তুত হয়।*

দ্বিতীয় ধাপে এই নাইলনের কুচিগুলি একটি বড় অটোক্লেভ (Autoclave) যন্ত্রের মধ্যে উচ্চ চাপে উত্তপ্ত করিয়া গালানো হয়। এই গলিত নাইলন একটি ধাতব চালুনির মত যন্ত্রের (spinnerette) মধ্য দিয়া চালনা করিলেই বায়ুর সংস্পর্শে নাইলনতন্তু প্রস্তুত হয়।

প্রকৃতি—লম্বালম্বিভাবে দেখিলে নাইলনের তন্তু লম্বা নলাকৃতি বলিয়া মনে হইবে। আড়াআড়িভাবে কাটা তল কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়।

নাইলনতন্তু সাধারণত অর্ধস্বচ্ছ (tranlsucent)। আজকাল অস্বচ্ছ (opaque) নাইলন তন্তুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় তন্তু খুব শক্ত, ইলাষ্টিক এবং টিকসই। নাইলনের জল শোষণ করিবার ক্ষমতা খুবই সামান্য।

*ছয় অণু এডিপিক অ্যাসিড এবং ছয় অণু হেক্সামিথিলিন ডাই-অ্যামাইন মিলিত হইয়া একটি নাইলনের অণু প্রস্তুত হয়। এইজন্যই নাইলনকে প্রথমে Fibre—66 বলা হইত।

আজকাল এই তন্তুর উপর একপ্রকার প্রলেপ লাগাইয়া জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ানো হইয়াছে। নাইলন তন্তু ৪৮০° ফাঃ উত্তাপে গলিয়া যায়। সুতরাং সাধারণ উত্তাপে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। ইহা আগুনের সংস্পর্শে শিখাসহ জ্বলে না, গলিয়া যায়। জল বা ড্রাইক্লিনিংএ ব্যবহৃত তরল পদার্থে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। মৃদু ক্ষারে এবং উষদুষ্ণ জলে এই জাতীয় বস্ত্রাদি অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়। মৃদু অ্যাসিড নাইলনের কোন ক্ষতি করে না। শতকরা ৩ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণ নাইলনের
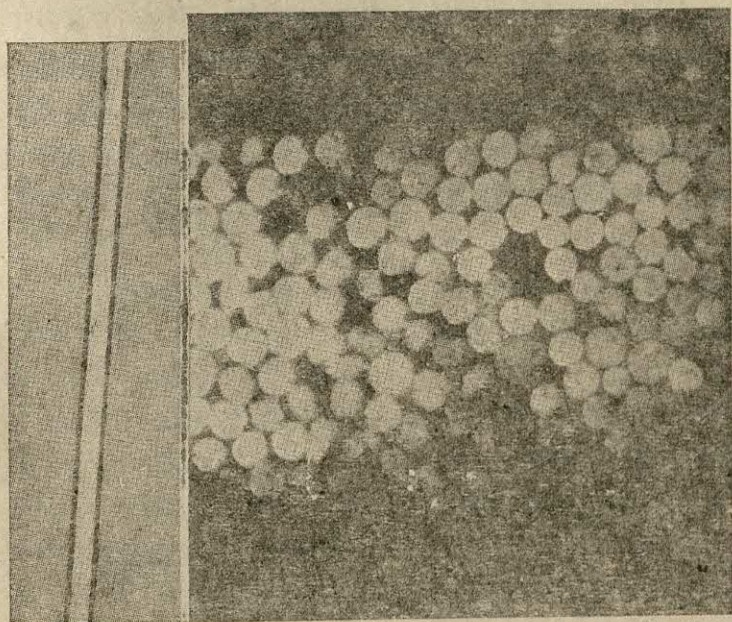
নাইলন তন্তু আড়াআড়িভাবে কাটা তল

পক্ষে ক্ষতিকর। ক্লোরিনের ন্যায় উগ্র ব্লিচিং পদার্থ নাইলনের বস্ত্রে ব্যবহার করিতে নাই। অপেক্ষাকৃত মৃদু ব্লিচিংই নাইলনের পক্ষে নিরাপদ। সূর্যের আলোতে এই জাতীয় তন্তু নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং নাইলনের বস্ত্রাদি ছায়ায় শুকাইতে হয়। এই জাতীয় বস্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা হইতেছে যে ইহা কোন পোকায় কাটিতে পারে না। অবশ্য নাইলনের সহিত পশম মিশানো থাকিলে উহা পোকায় কাটিতে পারে।

ডেক্রন (Dacron)—১৯৪৬ খৃঃ ব্রিটেনে টেরিলিন (Terylene) নামক এক প্রকার নূতন তন্তু আবিষ্কৃত হয়। এই টেরিলিন ইথিলিন গ্লাইকল (Ethylene glycol) এবং ডাই-মিথাইল টেরেথ্যালেট (Dimethyl terephthalate) হইতে প্রস্তুত হইত। আমেরিকার Du Pont কোম্পানী ঐ বৎসরেই টেরিলিনের সর্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার আরও উন্নতির জন্য গবেষণা কার্য চালাইতে থাকে। এই কোম্পানী অবশেষে ঐ তন্তুকেই ডেক্রন নাম প্রদান করে।

প্রকৃতি—ডেক্রনের সহিত অ্যাসিটেট তন্তুর কিছুটা মিল দেখা যায়। ডেক্রনের তন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে প্রায় নাইলনের মতই।

আগুনের সংস্পর্শে ইহা গলিয়া শক্ত দানাতে পরিণত হয়। ডেক্রনের কাপড় ঘামে বা জলে কুচকাইয়া যায় না এবং ইহার ভাঁজও নষ্ট হয় না। ডেক্রন-উপাদানে প্রস্তুত জামা কাপড়ের ইস্ত্রি করার কোন প্রয়োজন হয় না। এইজন্য ইহার প্রচলন দিন দিনই বাড়িতেছে। মৃদু অ্যাসিড এবং ক্ষার ডেক্রন তন্তুর কোন ক্ষতি করে না। ব্লিচিং দ্রব্যাদি এই জাতীয় তন্তুতে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নাইলনের মত ডেক্রন তন্তুও পোকায় কাটিতে পারে না। আজকাল অনেক প্রকার রঙিন ডেক্রন দেখিতে পাওয়া যায়। ডেক্রন পুড়িবার সময় কালো ধোঁয়া (dark-smoke) বাহির হয়। নাইলন পুড়িবার সময় ধূসরবর্ণের (whitish gray) ধোঁয়া বাহির হয়। এই পরীক্ষার সাহায্যে ডেক্রন ও নাইলনের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।
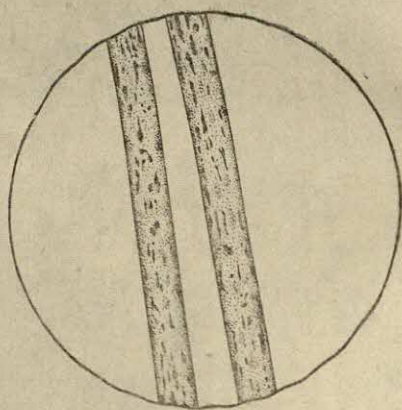
ডেক্রন তন্তু

আজকাল আরও নূতন নূতন অনেক তন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ওরলন (Orlon), সরণ (Saran), ভিনিয়ান (Vinyon) ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। মনুষ্যসৃষ্ট সর্বাধুনিক তন্তু হইতেছে টেফলন (Teflon)। ইহা ১৯৫৪ খৃঃ আমেরিকার Du Pont Company কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খনিজ তন্তু (Mineral Fibres)

খনিজ তন্তুসমূহ তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; অ্যাসবেসটস, গ্লাস এবং ধাতব। এই সকল তন্তু বস্ত্রশিল্পে খুব বেশী ব্যবহৃত হয় না।

অ্যাসবেসটস (Asbestos)—ইহা একপ্রকার প্রাকৃতিক তন্তু, খনিতে বিভিন্ন প্রকার অপদ্রব্যের (impurities) সহিত ইহা আকরিক হিসাবে পাওয়া যায়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে অপদ্রব্যসমূহ দূর করিয়া এই তন্তু প্রস্তুত করা হয়।

প্রকৃতি—অ্যাসবেসটস তন্তু লম্বায় ৩/৮ ইঞ্চি হইতে ৩/৪ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ইহাদের ব্যাস অত্যন্ত ছোট। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই তন্তু মসৃণ, সরল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ডের মত দেখায়। শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ সূতি মিশাইয়া এই তন্তুর সাহায্যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। এই তন্তু তাপের কুপরিবাহী বলিয়া ইহার সাহায্যে অগ্নিনির্বাপক দলের পোশাক, দস্তানা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। পরীক্ষাগারেও অ্যাসবেসটসের পাত উত্তপ্ত বীকার ইত্যাদি ঠাণ্ডা করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ্লাস (Glass) —১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো সহরে লিবি গ্লাস কোম্পানী (Libbey Glass Company) প্রথম গ্লাস এবং রেশম তন্তুর সংমিশ্রণে একটি আলো আচ্ছাদনী (lamp shade) প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করে। একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী ঐ আচ্ছাদনী দেখিয়া উহার সাহায্যে একটি পোশাক প্রস্তুত করেন। জানা যায় যে স্পেন দেশের রাজকন্যাও বহু অর্থব্যয়ে গ্লাস তন্তুর একটি পোশাক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই পোশাকের একটি অসুবিধা ছিল এই যে ইহা ভাঁজ করা যাইত না। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দেই প্রথম বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হইবার মত উন্নত ধরনের গ্লাস তন্তু উৎপন্ন হয়। গ্লাসের মার্বেল (marbles) হইতেই এই তন্তু প্রস্তুত করা হয়। ইলেকট্রিক চুল্লিতে প্রায় ২৪০০° ফাঃ উত্তাপে এই ম্যর্বেলগুলি গালাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া চালনা করা হয়।

প্রকৃতি—গ্লাসের তন্তুসমূহ স্বচ্ছ, মসৃণ ও সরু সরু দণ্ডের ন্যায়। আড়াআড়ি ভাবে কাটা তল কতগুলি বৃত্তের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়।

গ্লাসতন্তু আগুন বা অ্যাসিডে নষ্ট হয় না এবং পোকায় কাটিতে পারে না। সূর্যের আলোতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। জলে ধুইলে ইহার আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। তবে খুব সতর্কতার সহিত ধুইতে হয়। যেন মোচড়ান

বা রগড়ান না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মোচড়াইলে গ্লাসতন্তুগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। এই কারণেই এই তন্তুর বস্ত্রশিল্পে বহুল প্রচলন নাই।

জানালা-দরজার নকশার কাজে এই তন্তুর প্রচলন বেশ দেখা যায়। ধুলা-বালি ইত্যাদি এই ধরনের তন্তুতে লাগিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং এইসকল পর্দা সহজে ময়লা হয় না। কোট, জ্যাকেট ইত্যাদিতেও আজকাল এই তন্তু ব্যবহৃত হইতেছে।
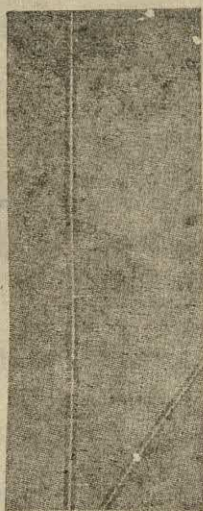
গ্লাস তন্তু আড়াআড়িভাবে কাটা তল
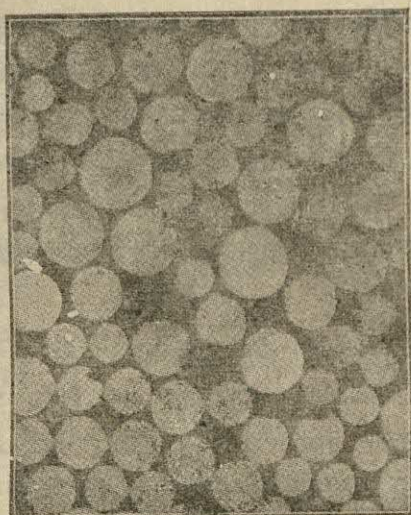
ধাতব তন্তু (Metal Fibres)—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও বিভিন্ন শঙ্কর ধাতু (alloys) আজকাল বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই সকল ধাতব তন্তু প্রধানত কাপড়ের উপর নকশা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও কখনও সুতি, লিনেন, রেয়ন ইত্যাদি তন্তুর উপরে এই সকল ধাতুর আবরণে একপ্রকার নূতন তন্তু সৃষ্টি করিয়া কাপড় প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের কাপড়ের ধাতু কিছুদিন পরে ক্ষয় হইয়া কাপড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া ফেলে। কিছুদিন যাবৎ অ্যালুমিনিয়াম ধাতু হইতেও তন্তু প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার করা হইতেছে।

কয়েকটি প্রধান প্রধান তন্তুর তুলনামূলক আলোচনা

(Comparative study of a few important fibres)

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
যে মৌলিক পদার্থে গঠিত (Elements present)	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার (গন্ধক)	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন	কার্বন, হাইড্রোজে[illegible] অক্সিজেন, নাইট্রোজে[illegible]
রাসায়নিক প্রকৃতি (Chemical Nature)	সেল্যুলোজ	সেল্যুলোজ	প্রোটিন	প্রোটিন	সেল্যুলোজ	প্রোটিন
আঁশের দৈর্ঘ্য (Length of the fibre)	½ ইঞ্চি হইতে 2½ ইঞ্চি	½ ইঞ্চি হইতে 2 ইঞ্চি	800 গজ হইতে 1800 গজ	1½ ইঞ্চি হইতে 14 ইঞ্চি	—	—
আঁশের আকৃতি (Shape of the fibre)	মোচড়ান ফিতার মত,	নলের মত, মাঝে মাঝে বাঁশের গাটের মত বন্ধনীযুক্ত	নলের মত, একপ্রান্ত সরু, কোন বন্ধনী নাই, মসৃণ	মাছের আঁশের মত উপরে খোলস থাকে	অনেকটা রেশমের মত কিন্তু উহা অপেক্ষা প্রায় চারগুণ মোটা এবং গায়ে লম্বালম্বি রেখা দেখা যায়।	প্রায় রেয়নের মত,
আঁশের প্রস্থচ্ছেদের আকৃতি (Shape of cross section)	একদিক অবতল অপরদিক উত্তল,	দেখিতে এক একটি বহুভুজের মত	দেখিতে ত্রিভুজের মত	বৃত্তাকৃতি, আঁশযুক্ত ধার	ভিসকোস—পাতার মত, কিউপ্রামোনিয়াম —বৃত্তাকৃতি, অ্যাসিটেট—পাতার মত	বৃত্তাকৃ[illegible]
কুঞ্চন (Shrinkage)	আঁশের কোন কুঞ্চন নাই, কিন্তু বুননের জন্য কাপড় থাপিয়া যায়।	সাধারণত কুঞ্চন হয় না।	কুঞ্চন হয় না	তাপ, চাপ এবং জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে ইহা কুঞ্চিত হয় (Felting)	কুঞ্চন হয়।	কুঞ্চন হয়।
চাকচিক্য (Lusture)	চাকচিক্য নাই।	চাকচিক্য আছে।	অত্যন্ত চকচকে।	চাকচিক্য নাই।	অত্যন্ত চকচকে।	চাকচিক্য আছে।

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
জলীয় বাষ্প শোষণ ক্ষমতা (Moisture absorbency)	জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে পারে. কিন্তু ধারণ করিবার শক্তি কম, এইজন্য বর্ষাকালে সুতির কাপড় স্যাঁত-সেঁতে মনে হয় (feels damp)	সুতি অপেক্ষা জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেশী।– ইহা সহজেই জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। এইজন্য তোয়ালে এবং রুমাল প্রস্তুতিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।	জলীয় বাষ্প শোষণ ও ধারণ করিবার ক্ষমতা সুতি ও লিনেন অপেক্ষা বেশী।	সকল তন্তুর চেয়ে অধিক জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে পারে। ইহা নিজের ওজনের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে এবং ইহাতে পশম ভিজা (wet) মনে হইবে না।	সুতি ও লিনেন অপেক্ষা অধিকতর জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে পারে, কিন্তু এই বাষ্প উহাদের মত তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিতে পারে না।	জলীয় বাষ্প শোষণ ক্ষমতা কম। এইজন্য নাইলন পোশাকে তেমন আরাম বোধ হয় না।
জোর (Strength)	সুতির আঁশ বেশ শক্ত এবং জলে ভিজাইলে ইহার জোর শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বাড়িয়া যায়। এইজন্যই এই জাতীয় বস্ত্রাদি জলে রগড়াইয়া পরিষ্কার করিলে কোন ক্ষতি হয় না	ইহা সুতির তন্তু অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ শক্ত। প্রকৃতপক্ষে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত তন্তুর মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা শক্ত তন্তু। সুতির ন্যায় জলে ভিজাইলে ইহার জোর বাড়িয়া যায়।	ইহা সুতি অপেক্ষা অধিকতর শক্ত, কিন্তু জলে ভিজাইলে ইহার জোর অনেক কমিয়া যায়।	পশম-তন্তু অত্যন্ত দুর্বল। জলে ভিজাইলে ইহার শক্তি আরও কমিয়া যায়। এইজন্য পশমের বস্ত্রাদি ধুইবার সময় রগড়াইতে হয় না।	পশম অপেক্ষা শক্তি-শালী কিন্তু সুতি অপেক্ষা দুর্বল। জলে ভিজাইলে জোর কমিয়া যায়।	নাইলনও খুব শক্ত তন্তু। কিন্তু লিনেন অপেক্ষা ইহার জোর কম, জলে ভিজাইলে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।
স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity and Resiliency)	স্থিতিস্থাপকতা শক্তি কম। এইজন্য সুতির কাপড়ে ভাঁজ পড়িলে বা কুচকাইয়া গেলে উহা সহজে মিলাইয়া যায় না।	লিনেন তন্তুর স্থিতি-স্থাপকতা শক্তি সর্বা-পেক্ষা কম।	সুতি ও লিনেন অপেক্ষা অধিকতর স্থিতিস্থাপক	অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক, ইহাতে কোন ভাঁজের দাগ পড়ে না। ভিজা অবস্থায় এই স্থিতিস্থাপ-কতা গুণ কিছুটা কমিয়া যায়।	স্থিতিস্থাপকতাশক্তি রেশম ও পশম হইতে কম।	অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক এবং ইহাতে সহজে ভাঁজের দাগ পড়ে না।

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
তাপ পরিবাহিতা (Heat Conductivity)	তাপ সুপরিবাহী। এই জন্য গ্রীষ্মকালে সুতির বস্ত্রে আরাম বোধ হয়।	সুতি অপেক্ষা অধিকতর তাপ সুপরিবাহী।	তাপ কুপরিবাহী, এই জন্য রেশম বস্ত্রে গরম বোধ হয়।	তাপ কুপরিবাহী, এই জন্য শীতকালে পশমের বস্ত্র ব্যবহার করা হয়।	সুতি অপেক্ষাও অধিকতর তাপ সুপরিবাহী।	তাপ সুপরিবাহী।
তাপের প্রভাব (Effect of heat)	স্বাভাবিক তাপে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্যই সুতির বস্ত্র সোডা বা সাবান জলে ফুটাইয়া পরিষ্কার করা যায় এবং গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা চলে।	সুতির তন্তুর মতই স্বাভাবিক তাপে কোন ক্ষতি হয় না।	উত্তাপ প্রয়োগে হলদে হইয়া যায়।	বেশী উত্তাপে তন্তুর নমনীয়তা হ্রাস পায় এবং পোড়া দাগ পড়ে।	সুতি এবং লিনেনের মতই রেয়ন তন্তুর সাধারণ উষ্ণতায় কোন ক্ষতি হয় না। ইহাতে গরম ইস্ত্রি প্রয়োগ করা যায়। তবে খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে পোড়া দাগ পড়িয়া যায়। (অ্যাসিটেট রেয়নে গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে গলিয়া যায়।)	নাইলন তন্তু উত্তাপ প্রয়োগে নষ্ট হইয়া যায়। তবে উষ্ণ বা সামান্য গরম জলে নাইলন বস্ত্র পারিষ্কার করা চলে।
রং ধারণ ক্ষমতা (Affinity to dyes)	লিনেন অপেক্ষা রং ধারণ ক্ষমতা বেশী, কিন্তু রেশম এবং পশম অপেক্ষা কম। Mordantএর সাহায্যে রং করা অপেক্ষাকৃত সহজ।	এই প্রকার তন্তুতে সহজে রং ধরে না, সুতরাং রং করা অপেক্ষাকৃত কঠিন।	অতি সহজেই রং করা যায়।	অতি সহজেই রং করা যায়।	সুতি এবং লিনেনে যে সকল রং ব্যবহার করা হয় সেই সকল রং অতি সহজেই রেয়ন তন্তু ধারণ করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সুতি অপেক্ষা রেয়ন তন্তু রং করা অনেক সহজ। (অ্যাসিটেট তন্তু সুতি ও লিনেনে ব্যবহৃত রং ধারণ করিতে পারে না।)	নাইলন তন্তু সহজেই রং করা যায়, কিন্তু এই রং তেমন পাকা হয় না। সূর্যের আলো এবং পরিষ্কার করিবার সময় এই রং কিছুটা নষ্ট হইয়া যায়।

অ্যাসিডের ক্রিয়া (Action of Acids)	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
	গাঢ় অ্যাসিডের সংস্পর্শে সুতির তন্তু দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। লঘু অ্যাসিডে তন্তু দুর্বল হইয়া যায় এবং ইহা কাপড়ে শুকাইয়া গেলে কাপড় ফুটো হইয়া যায়।	সুতির তন্তুর অনুরূপ।	গাঢ় অ্যাসিডে ইহা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু লঘু অ্যাসিডে ইহার কোন ক্ষতি হয় না।	গাঢ় অ্যাসিডে পশম নষ্ট হইয়া যায়। লঘু অ্যাসিড এই তন্তুর কোন ক্ষতি করে না।	অ্যাসিড রেয়ন তন্তুর ক্ষতি সাধন করে। এমন কি লঘু অ্যাসিডেও এই সকল তন্তু দুর্বল হইয়া পড়ে। (অ্যাসিটেট তন্তু অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং ফরমিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া যায়)	লঘু অ্যাসিডে নাইলন তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু গাঢ় অ্যাসিডে ইহা নষ্ট হইয়া যায়।
ক্ষারের ক্রিয়া (Action of Alkalis)	সুতির তন্তুতে যে কোন প্রকার ক্ষার নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে, ক্ষার ইহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।	লিনেনের তন্তুতে নির্ভয়ে যে কোন প্রকার ক্ষার ব্যবহার করা চলে। তবে সুতির তুলনায় লিনেনের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।	রেশমতন্তু তীব্র ক্ষারের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু মৃদু ক্ষার, যেমন বোরাক্স, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।	রেশমের ন্যায় পশম তন্তুও তীব্র ক্ষারের প্রভাবে নষ্ট হইয়া যায়। তবে বোরাক্স, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করা চলে।	সুতি এবং লিনেন অপেক্ষা ইহার ক্ষার প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কম। এইজন্য গাঢ় ক্ষার এই তন্তুতে ব্যবহার করা চলে না, লঘু ক্ষার সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে।	নাইলন তন্তুর ক্ষার প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে, সুতরাং লঘু ক্ষার ইহার কোন ক্ষতি করে না।
ব্লিচিং দ্রব্যাদির ক্রিয়া (Effect of bleaching agents)	সুতির তন্তু ব্লিচিং দ্রব্যাদিতে নষ্ট হয় না। সুতরাং সকল প্রকার ব্লিচিং দ্রব্যাদিই সাদা সুতিতে ব্যবহার করা চলে।	সুতির তন্তুর ন্যায় যে কোন প্রকার ব্লিচিং দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা চলে। তবে প্রতিরোধ ক্ষমতা সুতির তুলনায় কম।	ক্লোরিন ব্লিচ অর্থাৎ ব্লিচিং পাউডার, হাইপোক্লোরাইট বা জাভেলী দ্রবণ রেশমতন্তু নষ্ট করিয়া ফেলে, মৃদু ব্লিচিং দ্রব্যাদি যথা হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইত্যাদি নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।	রেশমতন্তুর মতোই উগ্র ক্লোরিনজাত ব্লিচ ব্যবহার করা চলিবে না। হাইড্রোজেন পারক্সাইড, ইত্যাদি মৃদু ব্লিচিং দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যায়।	উগ্র ক্লোরিন ব্লিচ রেয়ন তন্তুর ক্ষতি করে। সুতরাং হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইত্যাদি মৃদু ব্লিচিং দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে হয়।	রেয়ন তন্তুর অনুরূপ

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
দাহ্যতা (Inflammability)	সুতির তন্তু সহজেই জ্বলিয়া উঠে এবং শিখা-সহ জ্বলিতে থাকে। পুড়িবার সময় কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হয় এবং শেষে হাল্কা ছাই পড়িয়া থাকে।	সুতির তন্তুর অনুরূপ।	এই তন্তু ধীরে ধীরে জ্বলে এবং পুড়িবার সময় পালকপোড়া গন্ধ বাহির হয়।	রেশমের ন্যায় ধীরে ধীরে জ্বলে এবং পালক পোড়া গন্ধ বাহির হয়। দাহ্যতা কম বলিয়া পশমের কম্বল আগুন নিভাইতে ব্যবহার করা হয়।	সুতি ও লিনেনের অনুরূপ। (অ্যাসিটেট তন্তু পুড়িবার সময় গলিয়া শক্ত কালো দানা প্রস্তুত হয়।)	নাইলন তন্তুতে আগুন ধরে না, আগুনের প্রভাবে ইহা গলিয়া যায়।
পোকায় কাটা (Action of Moths, mildew and other insects)	সুতির তন্তু মথ (moth) পোকায় কাটে না। কিন্তু ইহা mildew এবং ছত্রকের (mold) দ্বারা নষ্ট হইতে পারে, mildew ও ছত্রকের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য, জলীয় বাষ্প এবং উত্তাপের প্রয়োজন। সুতরাং কাপড় বিনা কলপে শুষ্ক স্থানে তুলিয়া রাখিলে mildew এবং ছত্রকের হাত হইতে রক্ষা পায়।	সুতির তন্তুর অনুরূপ, তবে সুতি অপেক্ষা প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।	রেশম তন্তু মথ পোকায় কাটে না, কিন্তু ইহা mildew এবং ছত্রকের দ্বারা নষ্ট হইতে পারে।	পশম তন্তুর বড় শত্রু হইতেছে মথ পোকা। সুতরাং ইহা খুব সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে হয়। এই প্রকার তন্তু mildew এবং ছত্রকেও আক্রমণ করিতে পারে।	সুতির তন্তুর অনুরূপ। (অ্যাসিটেট তন্তু mildew দ্বারা আক্রান্ত হয় না।)	নাইলন তন্তু মথ, mildew এবং ছত্রক ইত্যাদি কোনপ্রকার পোকা দ্বারাই আক্রান্ত হয় না।

তন্তু চিনিবার উপায়

(Identification of Fibres)

তোমরা পূর্বেই বিভিন্ন প্রকারের তন্তু প্রস্তুতি এবং উহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে পড়িয়াছ। এখন একখানি কাপড় কি প্রকার তন্তু দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কোন একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা একখানি কাপড়ের তন্তুর প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। সাধারণত একাধিক পরীক্ষার সাহায্যেই উহা স্থির করা হয়। এইজন্য যে সকল পরীক্ষার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে তাহা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা--

(১) **ভৌত পরীক্ষা** (Physical test) (২) **রাসায়নিক পরীক্ষা** (Chemical test) (৩) **আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা** (Microscopic test).

ভৌত পরীক্ষা—এই সকল পরীক্ষার উপর খুব বেশী নির্ভর করা চলে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহারা তন্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে আভাস দেয় মাত্র, সঠিকরূপে প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে পারে না। ভৌত পরীক্ষাগুলি নিম্নরূপ :—

ভাঁজ করা (Creasing)—একখানি কাপড় দুই ভাঁজ করিয়া আঙ্গুলের সাহায্যে চাপিয়া ধর। লিনেনের কাপড় হইলে ভাঁজের দাগ বেশ সুস্পষ্ট হইবে এবং এই দাগ সহজে মিলাইয়া যাইবে না। সূতির কাপড়েও ভাঁজের দাগ পড়িবে, কিন্তু এই দাগ লিনেনের মত এত সুস্পষ্ট হইবে না এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না। কাপড়ে খুব বেশী কলপ দেওয়া হইলে এই পরীক্ষার সাহায্যে লিনেন ও সূতির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হইবে না। রেশম ও পশমের কাপড়ে এই পরীক্ষায় কোন ভাঁজ পড়িবে না।

সুতরাং এই পরীক্ষার সাহায্যে সূতি, লিনেন এবং রেশম বা পশমের মধ্যে পার্থক্য করা যাইতে পারে।
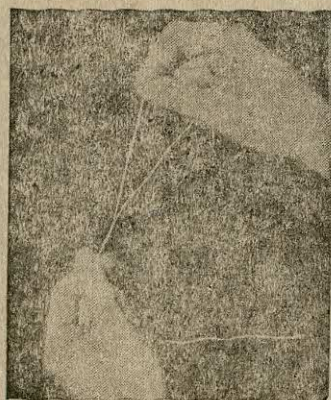
সূতার পাক খোলা
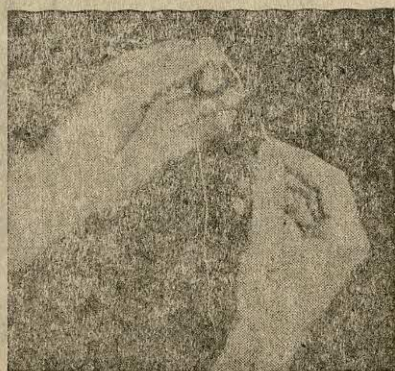
দুই ভাগে ভাগ করা

পাক খোলা (Untwisting the Fibre)—কাপড় হইতে কয়েকটি সূতা বাহির করিয়া উহাদের পাক খুলিয়া ফেল। কাপড়খানি পশমদ্বারা নির্মিত হইলে ঐ সূতায় পশমের ন্যায় স্বাভাবিক ভাঁজ দেখা যাইবে। সূতির বা অন্য কোন কাপড়ে এই ভাঁজ দেখা যাইবে না। এইবার পাকখোলা সূতার একটি দুইহাতে টানিয়া দুইভাগে বিভক্ত কর। যেখানে তন্তুটি ছিঁড়িয়া যাইবে সেই অগ্রভাগ যদি দেখিতে সূচের ন্যায় সরু হয়, তবে উহা লিনেনের দ্বারা প্রস্তুত বুঝিতে হইবে। অন্যথায় যদি অগ্রভাগ দেখিতে একটি তুলির অগ্রভাগের ন্যায় মোটা হয় তবে উহা সূতি তন্তু বলিয়া জানিবে।

সিক্ত করা (Moisture test)—এই পরীক্ষার সাহায্যে লিনেন অন্যান্য তন্তু হইতে সহজেই চিনিতে পারা যায়। একটি অঙ্গুলি জলে ভিজাইয়া কাপড়-খানির উপরে রাখ। যদি সহজেই জল অঙ্গুলি হইতে কাপড়ে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তবে কাপড়খানি লিনেন দ্বারা প্রস্তুত বুঝিতে হইবে।

পোড়ান (Burning test)—যে কাপড়খানি পরীক্ষা করিবে তাহা হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া একটি জলন্ত শিখায় ধর। পশম ও রেশম ধীরে ধীরে পুড়িবে এবং পালক পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে। পুড়িবার পর একটি কাল গুটি বা দানা প্রস্তুত হইবে। সূতির তন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন
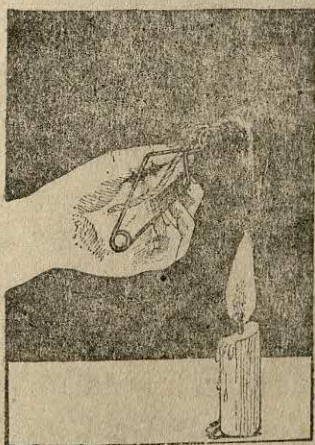
রেশম ও পশমের তন্তু পোড়া হইতেছে

সূতির তন্তু পোড়া হইতেছে।

ভাবে পোড়ে। ইহা শিখাসহ জলিতে থাকে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হয়। পুড়িবার পর একটু হালকা ছাই পড়িয়া থাকে। অ্যাসিটেট তন্তু ছাড়া অন্যান্য রেয়ন তন্তু সূতির ন্যায় পোড়ে। অ্যাসিটেট তন্তু আগুনে ধরিলে গলিয়া একটি শক্ত গুটি বা দানা প্রস্তুত হয়। পশম বা রেশমের গুটির মত এই গুটি সহজে ভাঙ্গা যায় না। এই পরীক্ষার ফলাফল পর-পৃষ্ঠার চার্টখানিতে দেওয়া হইল।

পোড়ানো পরীক্ষা (Burning test)
কয়েকটি তন্তু প্রজ্বলিত শিখায় ধর
জ্বলে
শিখাসহ জ্বলে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হয়। পুড়িবার পর ধূসর বর্ণের হালকা ছাই পড়িয়া থাকে।
(১) সুতি
(২) লিনেন,
(৩) রেয়ন (অ্যাসিটেট নয়)
(৪) র‍্যামি
(৫) পাট।
পুড়িবার সময় গলিয়া শক্ত, কালো দানা বা গুটি প্রস্তুত হয় এবং ভিনিগারের গন্ধ বাহির হয়।
(১) অ্যাসিটেট রেয়ন
ধীরে ধীরে জ্বলে এবং জ্বলিবার সময় চুল পোড়া বা পালক পোড়া গন্ধ বাহির হয়। শেষে গুটি-মত কাল ছাই পড়িয়া থাকে। হাতে ধরিলে ঐগুলি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়।
(১) পশম,
(২) রেশম।
গলিয়া শক্ত তামাটে রংয়ের গুটি প্রস্তুত হয় এবং পুড়িবার সময় রাসায়নিক গন্ধ বাহির হয়।
(১) নাইলন,
(২) ডেক্রন।
জ্বলে না
(১) গ্লাস,
(২) অ্যাসবেসটস্
(৩) ধাতু।
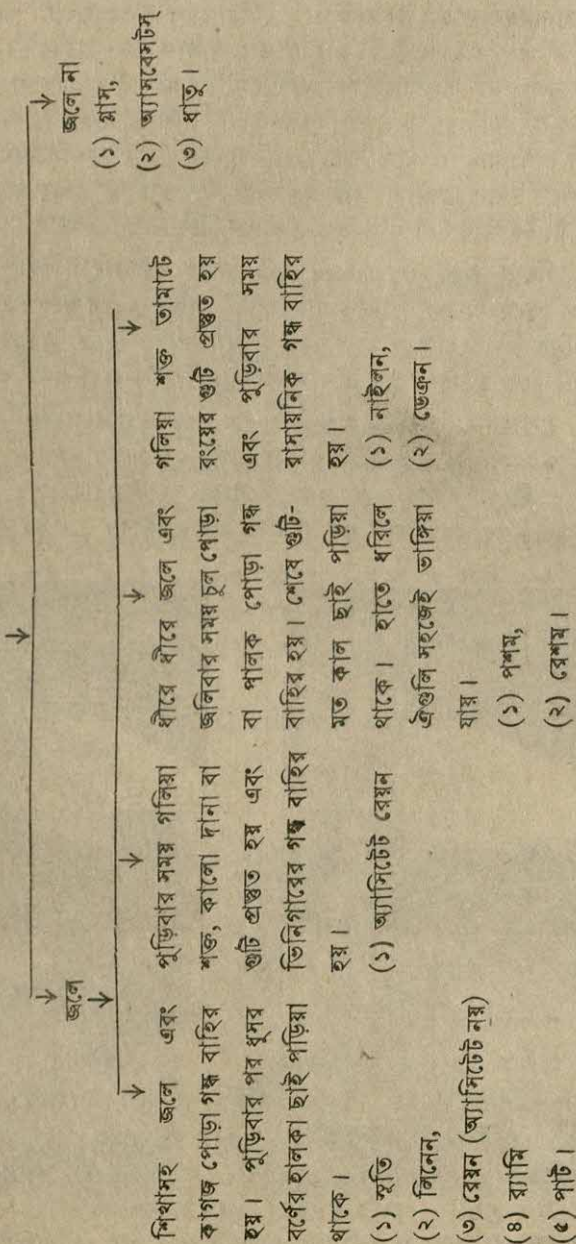
গরম ইস্ত্রি দ্বারা পরীক্ষা (Hot iron test)—এই পরীক্ষার সাহায্যে অ্যাসিটেট, নাইলন ও ডেক্রন তন্তু অন্যান্য তন্তু হইতে পৃথক্ করা যায়।

একটি ইস্ত্রি খুব গরম করিয়া কাপড়গুলির উপর চাপিয়া ধর। যদি কাপড়খানি অ্যাসিটেট, নাইলন বা ডেক্রন তন্তুর হয় তবে উহা একেবারে গলিয়া যাইবে। সূতি, লিনেন, রেশম, পশম বা রেয়নের কাপড়ে লালচে পোড়া দাগ পড়িবে, গলিয়া যাইবে না।

রাসায়নিক পরীক্ষা—ভৌত পরীক্ষা অপেক্ষা এই সকল পরীক্ষাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। রাসায়নিক পরীক্ষাগুলি নিম্নরূপ :—

'লাই' পরীক্ষা (Lye test)—এই পরীক্ষার সাহায্যে নিশ্চিতরূপে রেশম ও পশম, সূতি ও লিনেন হইতে পৃথক্ করা যায়।

একশত সি.সি. জলীয় দ্রবণে ৫ গ্রাম কষ্টিক সোডা বা কষ্টিক পটাশ দ্রবীভূত করিয়া 'লাই' প্রস্তুত করা হয়।

একটি কাচের পাত্রে বা এনামেলের পাত্রে কাপড়ের টুকরাখানি 'লাই' দ্রবণের সহিত ১০ মিনিট ফুটাও। ফুটাইবার সময় পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

রেশম ও পশম সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। সূতি ও লিনেন অবিকৃত থাকিবে। কাপড়খানি যদি সূতি এবং পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে তবে উহা হইতে পশমের অংশটুকু দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রের তলায় কতগুলি সূতির তন্তু পড়িয়া থাকিবে। **এইরূপে একখানি মিশ্র তন্তুর কাপড় এই পরীক্ষা দ্বারা চিনিতে পারা যায়।** নাইলন তন্তু 'লাই' দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না।

সূতি ও পশমের তন্তু দ্বারা প্রস্তুত কাপড়ে 'লাই' পরীক্ষায় কয়েকটি সূতির তন্তু পড়িয়া থাকে
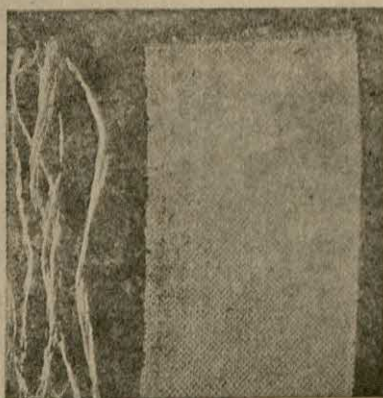
অ্যাসিড পরীক্ষা (Acid test)—একশত সি. সি. জলীয় দ্রবণে দুই সি. সি. ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া একটি অ্যাসিড দ্রবণ প্রস্তুত কর।

প্রথমে একটি টেবিলের উপর একখানি কাগজ পাতিয়া উহার উপর কাপড়খানি রাখ। একটি কাচের নলের সাহায্যে এক ড্রপ অ্যাসিড দ্রবণ ঐ কাপড়ের

উপরে ফেল। এইবার একখানি কাগজ উপরে রাখিয়া একটি গরম ইস্ত্রি ঐ কাগজের উপর চাপিয়া ধর। কিছুক্ষণ পরে কাপড়খানি বাহির করিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার কর।
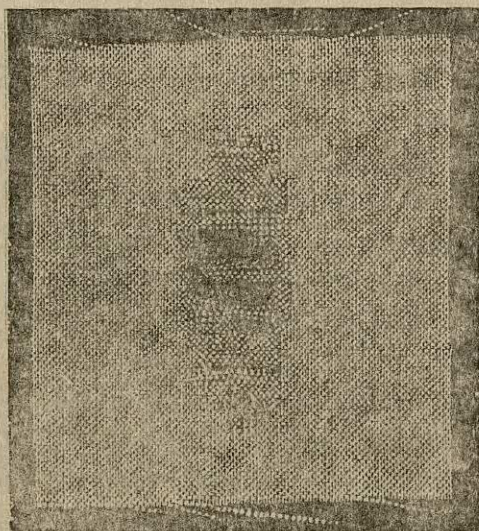
ঐ অ্যাসিডযুক্ত স্থানে একটি ফুটো দেখিতে পাইবে

কাপড়খানি সূতি বা রেয়নের প্রস্তুত হইলে ঐ অ্যাসিডযুক্ত স্থানে একটি ফুটো দেখিতে পাইবে। ইহাতে পশম বস্ত্রের কোন ক্ষতি হইবে না। কাপড়খানি সূতি ও পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইলে সূতি দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পশম অবিকৃত থাকিবে। ফলে কাপড়খানি ফুটো ফুটো মনে হইবে।
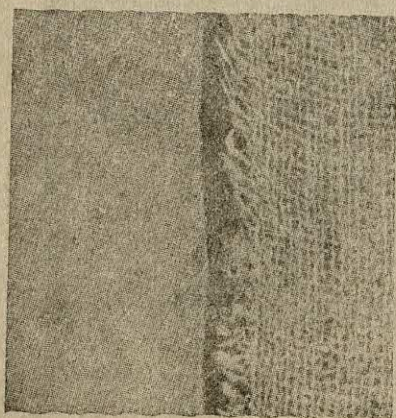
বাঁয়ে পরীক্ষার পূর্বে সূতি ও পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত কাপড়ের অবস্থা। ডাইনে অ্যাসিড পরীক্ষার পর ঐ কাপড়ের অবস্থা

দ্রাবক পরীক্ষা (Solvent test)—সাধারণত বিভিন্ন তন্তু বিভিন্ন দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। যেমন, অ্যাসিটেট তন্তু গ্ল্যাসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হয়। অন্যান্য

তন্তু উক্ত দ্রবণে দ্রবীভূত হইবে না। সুতরাং কোন একটি অজ্ঞাত তন্তু অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হইলে উহা অ্যাসিটেট তন্তু বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অনেক সময় একই দ্রাবক একাধিক তন্তু দ্রবীভূত করে; যেমন—সুইডজার দ্রাবক রেয়ন. সুতি ও রেশম দ্রবীভূত করে। এইরূপ ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার সহিত অন্যান্য পরীক্ষা করিয়া উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হয়। নিম্নে কয়েকটি তন্তু এবং উহাদের যে যে দ্রাবক দ্রবীভূত করিতে পারে তাহাদের নাম দেওয়া হইল।

অ্যাসিটেট তন্তু—অ্যাসিটোন, গ্ল্যাসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড।

ভিসকোস এবং কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন—সুইডজার দ্রবণ।

কিউপ্রামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

সুতি— ঐ

রেশম— ঐ

পশম—২০% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট

নাইলন—৯০% কার্বলিক অ্যাসিড বা ফেনল

ভিনিয়ন—ক্লোরোফরম্

ইহা ছাড়া কখনও কখনও কতগুলি বিশেষ রাসায়নিক পরীক্ষার সহায়তায় তন্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করা হইয়া থাকে।

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা—এই পরীক্ষাটি বস্ত্রশিল্পে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার সাহায্যে অতি সহজেই বিভিন্ন প্রকারের তন্তু চিনিতে পারা যায়। যখন একখানি কাপড় বিভিন্ন প্রকার তন্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় তখন রাসায়নিক পরীক্ষা অপেক্ষা আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

এই পদ্ধতিতে কাপড় হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 'স্লাইডে' পরীক্ষা করিতে হয়। 'স্লাইডে' একবারে চার-পাঁচটির বেশী তন্তু রাখিতে হয় না।

তোমরা বিভিন্ন প্রকার তন্তু দেখিতে কিরূপ তাহা পূর্বেই পড়িয়াছ। সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিয়া উহাদের সহজেই চিনিতে পারিবে। লিনেন তন্তু চিনিবার জন্য এই পরীক্ষাটিই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। লিনেন তন্তু দেখিতে সোজা এবং লম্বা, মাথার দিকটা ধীরে ধীরে সরু হইয়া সুঁচের মত হয়। মাঝে মাঝে বাঁশের মত গাঁট দেখিতে পাওয়া যায়। র‍্যামী তন্তু দেখিতে অনেকটা লিনেনের মতই। তবে লিনেন অপেক্ষা ইহা আরও মোটা এবং অসমাঙ্গ (irregular)। রেশম তন্তু দেখিতে একটি কাচের শলাকার মত। উপরটা বেশ মসৃণ এবং

উহা হইতে আলো বিকীর্ণ হয়। বন্য রেশম কৃত্রিম রেশম অপেক্ষা মোটা এবং উহা কতকগুলি সমান্তরাল রেখার সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। রেয়ন তন্তু দেখিতে রেশমের মত হইলেও উহা রেশম অপেক্ষা প্রায় চারগুণ মোটা এবং উহার গায়ে লম্বালম্বি কতকগুলি সমান্তরাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। নাইলন, ভিনিয়ন দেখিতে অনেকটা রেয়নের মতই। সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহাদের চিনিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন প্রকার তন্তুর ছবি নিম্নে দেখান হইল।
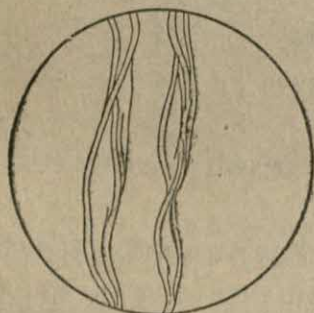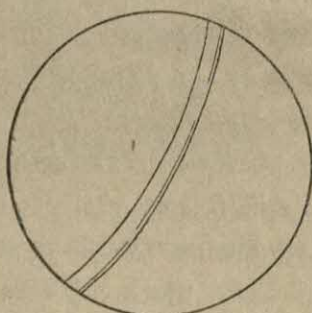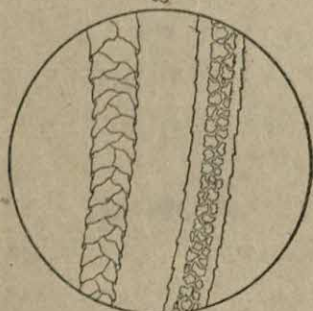
সুতি — রেশম — পশম — বন্য রেশম
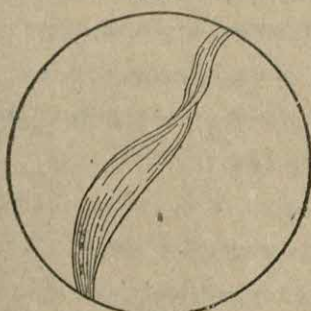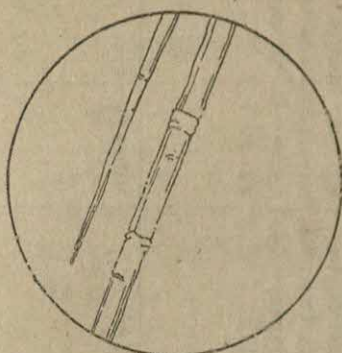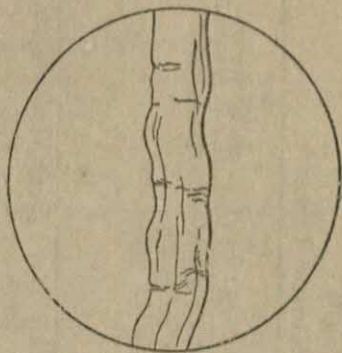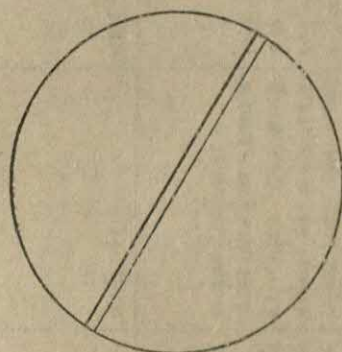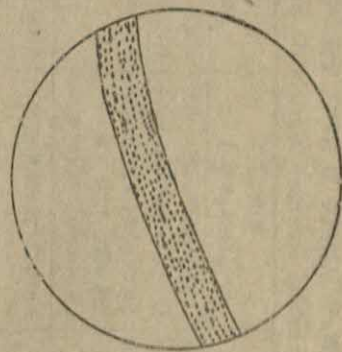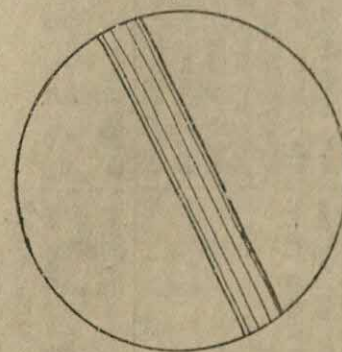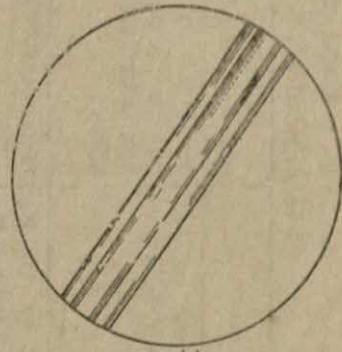
লিনেন
র‍্যামী
গ্লাস
নাইলন
রেয়ন
অ্যাসিটেট তন্তু

উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ, সাংশ্লেষিক ও খনিজ তন্তু নির্ণয় পদ্ধতি

(Identification of Vegetable, Animal, Synthetic and Mineral Fibres)

পরীক্ষা	উদ্ভিজ্জ (সুতি, লিনেন, র‍্যামী ইত্যাদি)	প্রাণিজ (রেশম, পশম)	সাংশ্লেষিক (নাইলন, ডেক্রন)	খনিজ (গ্লাস ও অ্যাসবেসটস্)
(১) কয়েকটি তন্তু একটি জ্বলন্ত শিখায় ধর।	শিখাসহ জ্বলিবে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হইবে। ধূসর বর্ণের হালকা ছাই পড়িয়া থাকিবে।	পুড়িবার সময় পালক পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ বাহির হইবে। শেষে কালো গুটিমত ছাই পড়িয়া থাকে এবং হাতে ধরিলে সহজেই ভাঙিয়া যায়।	গলিয়া শক্ত তামাটে গুটি বা দানা প্রস্তুত হয় এবং পুড়িবার সময় রাসায়নিক গন্ধ বাহির হয়।	মোটেই জ্বলিবে না।
(২) একটি খুব গরম ইস্ত্রি তন্তুর উপর চাপিয়া ধর।	লালচে পোড়া দাগ পড়িবে।	লালচে পোড়া দাগ পড়িবে।	গলিয়া যাইবে।	কোন পরিবর্তন হইবে না।
(৩) একটি তন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা কর।	পাক দেওয়া ফিতার মত—সুতি। মাথার দিকটা সরু সূঁচের মত, মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধনী—লিনেন। দেখিতে অনেকটা লিনেনের মত, কিন্তু আরও মোটা এবং অসমাঙ্গ—র‍্যামী।	দেখিতে একটি মসৃণ কাচের শলাকার মত, আলো বিকীর্ণ হয়—রেশম। তন্তুর উপরটি মাছের আঁশের মত একপ্রকার আবরণে ঢাকা—পশম।	নাইলন ও ডেক্রন তন্তু দেখিতে মসৃণ শলাকার মত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে উহাদের পার্থক্য বোঝা যায় না।	ক্ষুদ্র, সরু, সরল ও মসৃণ শলাকার মত—অ্যাসবেসটস্। সরু, মসৃণ এবং স্বচ্ছ শলাকার মত—গ্লাস।
(৪) শতকরা ৫ ভাগ কষ্টিক সোডা জলে গুলিয়া একটি দ্রবণ প্রস্তুত কর এবং ইহাতে কয়েকটি তন্তু ফেলিয়া নাড়।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে না।

সূতি ও লিনেনের তন্তু চিনিবার পদ্ধতি

(Identification of Cotton and Linen Fibres)

পরীক্ষা	সূতি	লিনেন
(১) একখানি কাপড় দুই ভাঁজ করিয়া অঙ্গুলির সাহায্যে জোরে চাপিয়া ধর।	অস্পষ্ট ভাঁজের দাগ পড়িবে এবং এই দাগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না। [কাপড়ে কলপ থাকিলে সুস্পষ্ট ভাঁজের দাগ পড়িবে]	সুস্পষ্ট ভাঁজের দাগ পড়িবে এবং এই দাগ সহজে মিলাইয়া যাইবে না।
(২) একটি তন্তু দুই হাতে টানিয়া দুই ভাগ কর এবং উহাদের ছিন্ন অগ্রভাগ লক্ষ্য কর।	অগ্রভাগ তুলির অগ্রভাগের ন্যায় মোটা।	অগ্রভাগ দেখিতে সূঁচের ন্যায় সরু।
(৩) কয়েকটি তন্তু জলে কিছুক্ষণ ফুটাইয়া সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণে দুই মিনিটকাল ফেলিয়া রাখ।	দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।	অপরিবর্তিত থাকিবে।
(৪) সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে থায়োসালফেটের জলীয় দ্রবণ মিশাইয়া একটি পরিষ্কার দ্রবণ প্রস্তুত কর। উক্ত দ্রবণে কষ্টিক সোডার দ্রবণ মিশাইলে **রোডাই দ্রবণে** (Rohdai Solution) পাওয়া যাইবে। এই রোডাই দ্রবণে কয়েকটি তন্তু ভাল করিয়া নাড়।	বেগুনী বর্ণ ধারণ করিবে।	বেগুনী-নীল (Violet-Blue) বর্ণ ধারণ করিবে।

রেশম ও পশম চিনিবার পদ্ধতি
(Identification of Real Silk and Wool)

পরীক্ষা	রেশম	পশম
(১) কাপড় হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া উহাদের পাক খুলিয়া ফেল।	তন্তু সরল মনে হইবে, উহাদের মধ্যে কোন ভাঁজ দেখা যাইবে না।	তন্তুর মধ্যে কোঁকড়ান চুলের মত ভাঁজ দেখা যাইবে।
(২) কয়েকটি তন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা কর।	মসৃণ কাচের শলাকার মত আলো বিকীরণ করে। আড়াআড়িভাবে কাটা তল সমবাহু ত্রিভুজের মত।	উপরিভাগ মাছের আঁশের মত আবরণে ঢাকা। আড়াআড়িভাবে কাটা তল বৃত্তাকার।
(৩) ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবণে কয়েকটি তন্তু আধ মিনিটকাল সিদ্ধ কর।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।

রেশমের বস্ত্রাদি তাহাদের স্বাভাবিক মসৃণতা এবং চাকচিক্য হইতে সহজেই চিনিতে পারা যায়। পশমের বস্ত্রাদিতে রেশমের চাকচিক্য দেখা যায় না।

খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশম চিনিবার পদ্ধতি
(Identification of Real Silk and Art Silk)

পরীক্ষা	খাঁটি রেশম	কৃত্রিম রেশম (ভিসকোস ও কিউপ্রামোনিয়াম)
(১) কয়েকটি তন্তু একটি জ্বলন্ত শিখায় ধর।	পুড়িবার সময় পালক পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে।	পুড়িবার সময় কাগজ পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে।
(২) কয়েকটি তন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা কর।	মসৃণ কাচের শলাকার মত আলো বিকীরণ করে।	দেখিতে অনেকটা খাঁটি রেশমের মতই কিন্তু উহা অপেক্ষা চারগুণ মোটা এবং গায়ে কতকগুলি সমান্তরাল রেখা দেখা যায়।
(৩) শতকরা ৫ ভাগ কষ্টিক সোডা জলে গুলিয়া একটি দ্রবণ প্রস্তুত কর এবং ইহাতে কয়েকটি তন্তু ফেলিয়া নাড়।	দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।
(৪) সোডিয়াম নাইট্রাইট (Sodium Nitrite) এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঠাণ্ডা দ্রবণে কয়েকটি তন্তু কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। পরে ঐ তন্তু অন্য একটি পাত্রে রক্ষিত বিটান্যাপথল (Bita Napthol) এবং কষ্টিক সোডার দ্রবণে ভাল করিয়া নাড়। এই পরীক্ষাকে **কাপলিং** (Coupling) **পরীক্ষা** বলে।	লাল বর্ণ ধারণ করিবে।	হলুদ বর্ণ ধারণ করিবে।

বিভিন্ন প্রকার রেয়ন ও অ্যাসিটেট তন্তু চিনিবার উপায়

(Identification of Rayon and Acetate Fibres)

পরীক্ষা	ভিসকোস	কিউপ্রামোনিয়াম	অ্যাসিটেট
(১) একটি তন্তুকে আড়াআড়ি ভাবে কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহা পরীক্ষা কর।	অসমান ধারবিশিষ্ট পাতার মত।	বৃত্তাকৃতি	অসমান ধারবিশিষ্ট পাতার মত।
(২) এক টুকরা কাপড়ের উপর একটি খুব গরম ইস্ত্রি রাখ।	লালচে পোড়া দাগ পড়িবে।	লালচে পোড়া দাগ পড়িবে।	গলিয়া যাইবে।
(৩) একখানি কাপড় হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া একটি অগ্নিশিখার উপরে ধর।	সূতির ন্যায় শিখাসহ পুড়িবে এবং হালকা ছাই পড়িয়া থাকিবে। কাগজ পোড়া গন্ধ পাইবে।	সূতির ন্যায় শিখাসহ পুড়িবে এবং হালকা ছাই পড়িয়া থাকিবে। কাগজ পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে।	গলিয়া কালো শক্ত গুটির মত দানা প্রস্তুত হইবে। ভিনিগারের গন্ধ পাওয়া যাইবে।
(৪) কয়েকটি তন্তু ঘন অ্যাসেটিক অ্যাসিডের (Glacial acetic Acid) মধ্যে ফেলিয়া ভাল করিয়া নাড়।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে।
(৫) উপরোক্ত পরীক্ষায় ঘন অ্যাসেটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে কিউপ্রামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (Cuprammonium hydroxide) ব্যবহার কর।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।
(৬) একটি পাত্রে কিছু অ্যাসিটোন (Acetone) লইয়া উহাতে কয়েকটি তন্তু উত্তমরূপে নাড়।	তন্তু দ্রবীভূত হইবে না।	তন্তু দ্রবীভূত হইবে না।	তন্তু সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইবে।
(৭) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং আয়োডিন সমপরিমাণে মিশাইয়া উহাতে কয়েকটি তন্তু ফেলিয়া নাড়।	তন্তু ঘন নীল বর্ণ ধারণ করিবে।	তন্তু হালকা নীল বর্ণ ধারণ করিবে।	তন্তু হলুদ বর্ণ ধারণ করিবে।

উপরের পরীক্ষা হইতে লক্ষ্য করিবে যে অণুবীক্ষণ পরীক্ষার সাহায্যে ভিসকোস এবং কিউপ্রামোনিয়াম রেয়নের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। সপ্তম পরীক্ষাটিও এই বিষয়ে সাহায্য করিবে। অন্যান্য পরীক্ষাগুলি অ্যাসিটেট তন্তু হইতে এই সকল রেয়নের তন্তু চিনিবার উপায় মাত্র।

রেয়ন, নাইলন ও ডেক্রন চিনিবার পদ্ধতি
(Identification of Rayon, Nylon and Dacron Fibres)

পরীক্ষা	রেয়ন	নাইলন	ডেক্রন
(১) কয়েকটি তন্তু একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় ধর।	শিখাসহ জ্বলিবে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে। পুড়িবার পর হালকা ধূসর বর্ণের ছাই পড়িয়া থাকিবে।	গলিয়া ট্যান রংয়ের (Tan Colour) শক্ত দানা প্রস্তুত হইবে। পুড়িবার সময় রাসায়নিক গন্ধ পাওয়া যাইবে এবং ধূসর বর্ণের ধোঁয়া বাহির হইবে।	নাইলনের মতই গলিয়া ট্যান রংয়ের দানা প্রস্তুত হইবে এবং পুড়িবার সময় রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই জাতীয় তন্তু পুড়িবার সময় কালো ধোঁয়া বাহির হয়।
(২) একটুকরা কাপড়ের উপর একটি খুব গরম ইস্ত্রি চাপিয়া ধর।	লালচে পোড়া দাগ পড়িবে।	গলিয়া স্বচ্ছ কাচের মত হইবে।	গলিয়া স্বচ্ছ কাচের মত হইবে।
(৩) একটি তন্তু আড়াআড়িভাবে কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে দেখ।	(a) ভিসকোস—পাতার মত (b) কিউপ্রামোনিয়াম—বৃত্তাকার (৬৩৭ ও ৬৩৮ পৃষ্ঠা দেখ)	বৃত্তাকার (৬৫১ পৃষ্ঠা দেখ)	বৃত্তাকার
(৪) কিউপ্রামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রাবকে কয়েকটি তন্তু উত্তমরূপে নাড়।	দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে না।
(৫) জলের সহিত শতকরা ৯০ ভাগ কার্বলিক অ্যাসিড মিশাইয়া একটি দ্রবণ প্রস্তুত কর এবং এই দ্রবণে কয়েকটি তন্তু উত্তমরূপে নাড়।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।

প্রথম পরীক্ষার সাহায্যে নাইলন ডেক্রনের পার্থক্য ধরা যাইতে পারে। পুড়িবার সময় নাইলন তন্তু হইতে ধূসর বর্ণের ধোঁয়া এবং ডেক্রন হইতে কালো ধোঁয়া বাহির হইবে। পঞ্চম পরীক্ষার সাহায্যেও নাইলন ডেক্রন হইতে চিনিয়া বাহির করা যাইবে। ভিসকোস ও কিউপ্রামোনিয়াম রেয়নের পার্থক্য তিন নম্বর পরীক্ষার সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়।

শুষ্ক ধোলাই

(Dry Cleaning)

তোমরা বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রাদি ধুইবার পদ্ধতি পূর্বেই পড়িয়াছ। সেখানে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে কোন কোন বস্ত্র ধুইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। জর্জেট, ক্রেপ-ডি-সীন, বিভিন্ন প্রকার রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি জলে ধুইবার সময় এই অসুবিধা প্রায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল বস্ত্রাদি ধুইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে উহাদের আকৃতি বদলাইয়া যাইবে। আবার রঙিন এবং ছাপার কাপড়ের রং অনেক সময় সাবান জলে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং, এই জাতীয় বস্ত্রাদির স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিয়া পরিষ্কার করিতে হইলে শুষ্ক ধোলাই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে,—

(১) বস্ত্রাদি কুঁচকাইয়া বা সঙ্কুচিত হইয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না,

এবং

(২) রঙিন ও ছাপা কাপড়ের রং চটিয়া বা নষ্ট হইয়া যায় না।

সাধারণত রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি, ভেলভেট ও অন্যান্য রঙিন এবং ছাপা বস্ত্রাদিই শুষ্ক ধোলাইয়ের বিশেষ উপযোগী।

সকল তরল পদার্থই শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহার করা যায় না। কোন কোন তরলে কাপড়ে খারাপ গন্ধ হয়। সুতরাং শুষ্ক ধোলাইয়ের পক্ষে ঐ তরল অনুপযোগী। একখণ্ড ছোট কাপড় তরলে ধুইয়া খোলা ঘরে শুকাইতে দাও। শুকাইবার পর যদি কাপড়ে গন্ধ থাকে তবে ঐ তরল ব্যবহারের অনুপযোগী। আবার কোন কোন তরল অতিশয় উদ্বায়ী এবং মুক্ত অবস্থায় রাখিলে উড়িয়া যায়। এই ধরনের তরলে ধোলাই করিলে খরচ বেশী পড়ে। আবার তরল যদি খুব কম উদ্বায়ী হয় তাহা হইলে কাপড় শুকাইতে অনেক অসুবিধা হয়। সুতরাং মাঝামাঝি উদ্বায়ী (moderately volatile) তরলই শুষ্ক ধোলাইয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আবার কোন কোন তরল দ্রব্য বাষ্পীভূত করিলে পাত্রের নীচে তলানী পড়িয়া থাকে। এই শ্রেণীর তরলে কাপড়ে দাগ লাগিবার সম্ভাবনা থাকে। শুষ্ক ধোলাইয়ের ব্যবহৃত আদর্শ তরলের নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণ থাকিবে :—

(১) ইহাতে কাপড় সঙ্কুচিত বা রঙিন কাপড়ের রং নষ্ট হইবে না।

(২) কাপড় হইতে দ্রুত ময়লা দ্রবীভূত করিবে।

(৩) বাষ্পীভূত করিলে নীচে কোন তলানী পড়িয়া থাকিবে না।

(৪) মাঝারী রকমের উদ্বায়ী হইবে।

(৫) ব্যবহারে কাপড়ে কোন গন্ধ হইবে না।

(৬) অদাহ্য বা সামান্য দাহ্য হইবে।

(৭) বিষাক্ত হইবে না।

(৮) সহজলভ্য এবং সস্তা হইবে।

অনেক সময় কোন একটি তরল অপেক্ষা একাধিক তরল একত্রে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ভাল ধোলাই হয়। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এবং বেনজিন একত্রে ব্যবহার করিলে যে কোন একটি তরল অপেক্ষা ভাল ধোলাই হইবে। বেনজিন, পেট্রল ইত্যাদির সহিত আজকাল বেনজিন সাবানও (Benzene soaps) ব্যবহার করা হয়। ইহাতে ময়লা বস্ত্রাদি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়। বিভিন্ন প্রকারের বেনজিন সাবান বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে স্যাপোনিন (Saponine), লিকুইড সোপ (Liquid soap) এবং ওয়ারলিন (Weralin) বিদেশে প্রস্তুত কয়েকটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান।

পরিষ্কারক দ্রব্যাদি—যে সকল তরল শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) দাহ্য, যথা—পেট্রল, বেনজিন ইত্যাদি,

এবং

(২) অদাহ্য, যথা—কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ট্রাইক্লোরোইথিলিন ইত্যাদি। নিম্নে শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত কয়েকটি তরলের উল্লেখ করা হইল।

পেট্রলিয়াম ইথার (Petroleum ether)—ইহা অতিশয় উদ্বায়ী তরল। মুক্ত অবস্থায় বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়। ইহা একটি সহজ দাহ্য তরল। সুতরাং ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

টারপেনটাইন (Turpentine)—ইহা ময়লা দূর করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এই তরল ব্যবহারে কাপড়ে একটি বিশ্রী গন্ধের সৃষ্টি হয়। ইহা একটি দাহ্য তরল। এই সকল কারণে শুষ্ক ধোলাইয়ে টারপেনটাইন ব্যবহার করা উচিত নয়।

কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (Carbon tetrachloride)—ইহা একটি অদাহ্য তরল পদার্থ। সুতরাং কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। রঙিন কাপড়ের

রংও ইহাতে নষ্ট হয় না বা কাপড়ে কোন খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং ইহা একটি আদর্শ পরিষ্কারক দ্রব্য। কিন্তু এই তরলটি অপেক্ষাকৃত ব্যয়-সাপেক্ষ।

বেনজল (Benzol)—পরিষ্কারক দ্রব্যাদির মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা খুব বেশী উদ্বায়ী নয়, অথচ বস্ত্রাদি হইতে সহজেই বাষ্পীভূত হয় এবং কাপড়ে কোন খারাপ গন্ধের সৃষ্টি করে না। এই তরল ব্যবহারে রঙিন কাপড়ের রং সম্পূর্ণই অবিকৃত থাকে।

বেনজিন (Benzene)—ইহাও একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পরিষ্কারক দ্রব্য এবং শুষ্ক ধোলাইয়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা একটি দাহ্য তরল এবং ধোলাইয়ের সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

পেট্রল (Petrol)—শুষ্ক ধোলাইয়ে এই তরলটিই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য তরল পদার্থের তুলনায় ইহা অনেক সস্তা। ইহাও একটি দাহ্য তরল। সুতরাং ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। সাধারণ ধোলাইয়ের পক্ষে এই তরলটি বিশেষ উপযোগী।

ইহা ছাড়া আধুনিক যুগে **ট্রাইক্লোরোইথিলিন** (Trichloroethylene) এবং **পারক্লোরোইথিলিন** (Perchloroethylene) এই দুইটি তরলও প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের সুবিধা এই যে ইহারা আগুনের সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে না এবং অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী, ফলে কাছাকাছি আগুন থাকিলেও ভয়ের কোন কারণ থাকে না এবং কম উদ্বায়ী বলিয়া খরচও অপেক্ষাকৃত কম পড়ে।

ধৌত প্রণালী—প্রথমে কাপড় হইতে আল্‌গা ধুলা বা ময়লা ঝাড়িয়া বা ব্রাশ করিয়া যথাসম্ভব দূর কর। কাপড়ে জল বা জলীয় বাষ্প থাকিলে পরিষ্কারক তরলের সাহায্যে ময়লা দ্রবীভূত করিতে অসুবিধা হয়। সুতরাং কাপড় ভিজা থাকিলে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। পরিষ্কারক তরলটিও একেবারে জলশূন্য হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় ঐ তরলে জল থাকিবার জন্যই কাপড় ভাল পরিষ্কার হয় না। একখণ্ড শুকনো তুলা তরলে ভিজাইয়া রাখিলে উহা তরল হইতে জল শোষণ করিয়া লইবে। এইরূপে জলশূন্য তরল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তিন-চারিটি তরলের পাত্র পরপর সাজাইয়া লও। প্রথম পাত্রে একটু বেনজিন সাবান গুলিয়া লইলে ভাল হয় (প্রতি ৪০ গ্যালনে ১ পাউণ্ড সাবান)। প্রথমে কাপড়খানি এই সাবান গোলা তরলে ভাল করিয়া

রগড়াইয়া ময়লা দূর কর। যখন অধিকাংশ ময়লা দ্রবীভূত হইবে, তখন কাপড়খানি হাতে চাপিয়া যথাসম্ভব তরল বাহির করিয়া দাও। এইবার দ্বিতীয় পাত্রে কাপড়খানি ডুবাইয়া অবশিষ্ট ময়লা দূর কর। ময়লা দূর হইলে কাপড়খানি পরপর তৃতীয় এবং চতুর্থ পাত্রে রক্ষিত তরলে ভাল করিয়া ধুইয়া লও। ধুইবার পর ভাল করিয়া হাতে চাপিয়া তরলটুকু কাপড় হইতে বাহির করিয়া একটি খোলা ঘরে বা ছায়ায় শুকাইতে দাও। শুকাইবার সময় মাঝে মাঝে টানিয়া উহার পূর্বাকৃতিতে আনিয়া শুকাইবে। তাহা হইলে কুঁচকাইয়া আকৃতি নষ্ট হইবে না। বস্ত্রাদি শুকাইবার পর ভাল করিয়া ভাঁজ করিয়া একটি ভিজা কাপড় মাঝখানে রাখিয়া ইস্ত্রি করিবে। খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। কোন কোন রেশম এবং পশমের কাপড় ভাঁজ করিয়া ভাল করিয়া চাপিয়া লইলেই হয়, ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হয় না।

শুষ্ক ধোলাইয়ের সময় নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করিবে :—

(১) যে ঘরে কাপড় ধুইবে তাহাতে যেন ভালভাবে বাতাস চলাচল করে।

(২) ঘরে বা কাছাকাছি যেন কোন খোলা আগুন না থাকে।

(৩) কাপড়খানি এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে লইবার সময় তরল পদার্থ যেন মেঝেতে না পড়ে।

অনুশীলনী

প্রথম পত্র—প্রথম অধ্যায়—স্বাস্থ্য-সমস্যা

1. Make a list of household pests that you have studied. Arrange them according to the dangers they cause to human beings.

2. Name some of the diseases caused by house-flies and mosquitoes. How can the home-maker fight against these insect enemies. [H. S. 1961]

3. Name some diseases caused by flies and cockroaches. How can you fight against these insect enemies ?

4. How would you get rid of bed-bugs and cockroaches ?

5. A book-case in your reading room is badly infested by white ants. How would you treat it and what measures would you adopt to prevent future attack ? [H. S. 1960]

6. State the different ways by which impure water may be purified. Describe in detail the method which is prevalent in a big city. [H. S. 1961]

প্রথম পত্র—দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রাথমিক প্রতিবিধান

1. State the duties of a first-aider. What first-aid would you render to a person who has fracture in the fore-arm ?

2. What is 'First-Aid' ? What is the difference between Sprain and Fracture ? State the different types of Fracture.

3. How would you save a girl whose sari has caught fire and who is found running ? What first-aid would you render after she has been saved from the fire ?

4. What is bleeding ? How do you control bleeding from an artery ?

5. How would you render first-aids in accidents of bleeding and burning ?

6. How would you stop nose bleeding on an unconscious patient ?

7. Describe in detail how you would render first-aid to a person who has been rescued from drowning in the river and is in an unconscious state.

8. What is Fracture ? What are the different types of fracture ?

9. What is shock? What caution should be given to a patient who had suffered an electric shock? How would you give first aid to a person who has sprained his ankle?

10. Define fainting. State signs, symptoms and treatment of fainting.

11. State the general rules for removing a foreign body from the eye.

12. What is the difference between bite and sting? What first-aid would you render to a person bitten by rabid dog?

প্রথম পত্র—তৃতীয় অধ্যায়—গৃহ-পরিকল্পনা

1. Briefly discuss labour saving devices and techniques in home. How can labour be saved under present conditions of a family living in India? Illustrate your answer. [H S. 1962]

2. What do you understand by 'simple labour-saving devices at home'? Suggest some possible ways of saving labour and time without using mechanical appliances at home. [H. S. 1961]

দ্বিতীয় পত্র—প্রথম অধ্যায়—খাদ্য

1. What are the principles you should consider while planning menu for your home? What do you understand by the calorie-value of food? [S. F. 1952]

2. What do you understand by the term 'menu planning'? What points should you consider in planning a day's menu for a middle-class family?

3. Plan meals for a child under twelve.

4. What are the factors which determine the amount of food you need?

5. Plan a day's diet for an old lady who is slightly fat and is suffering from diabetes.

6. What should be the schedule of diet for a man of abnormal weight?

7. What factors should guide you when planning meals for (a) a sick person, (b) a young child, (c) a man doing hard physical work? Suggest a simple menu for main meal of the day for one of these types of persons. [H. S. 1960]

8. State the factors that you should consider while preparing diet for the sick.

9. What is food? Why do men need more food than women? Is tea with milk a food? [S. F. 1953]

10. Describe the procedure you would follow in preparing tea. What are its effects on human system ? [M. 1948]

11. How can food be preserved ?

12. What are the causes of deterioration in food ? What are the means of preventing deterioration in food ?

13. State the precautions which should be taken to prevent souring of milk.

14. State how you will prepare a mango murrabba.

15. State what principles should guide you in planning the daily family menu. How would you prepare the four meals—morning tea or breakfast, midday meal, tiffin or afternoon tea, evening meal ?

16. State what principles should guide you in planning the daily family menu. [M. 1947]

17. What do you understand by a balanced diet ? State briefly the principles you would follow while planning meals for your people at home. [M. 1951, 1952]

18. What are the points you should consider while planning menu for your home ? What do you understand by the calorie-value of food ? [S. F. 1952]

19. State the procedure you would follow in preparing coffee. What are the effects of tea and coffee on human system ? [M. 1949, 1950]

20. What is a 'basic dietary pattern' ? State its importance in the preparation of a balanced diet for an adult.

21. Do you think that a pregnant woman needs a diet of higher calorie-value than that of her normal time ? Give reasons for your answer.

22. What do you mean by the 'calorie-value' of food ? Name the common ingredients of your diet rich in calorie-value. Why does a nursing mother require more food ? What kind of diet would you prescribe for her ? [S. F. 1955]

23. Special care should be taken on the quality of proteins and supply of various vitamins in a diet of school going children —Discuss.

24. What are the causes and symptoms of obesity ? Prepare a list of foods, giving reasons, for a person suffering from obesity.

25. "The control of body-weight is essentially a matter of proper balance between what is taken as food and what is burnt as fuel."—Explain what kind of diet would you suggest in obesity.

26. It is dangerous to make a cut in the daily allowance of proteins and vitamins to become slim.—Discuss.

27. What are the methods that are available for reducing the extra-weight of your body ? Which one do you consider to be the best and why ?

28. State the points that you should remember with regard to the diet of a patient. [M. 1948]

29. What are the causes of spoilage of foods ? What method would you adopt to prevent the spoilage of butter and milk at your home ?

30. How are milk and vegetables preserved industrially ? Discuss the nature of spoilage of canned foods.

31. Write notes on :—

(*a*) Canning and Bottling, (*b*) Pasteurization, (*c*) Preservation by antibiotics.

32. Discuss the different methods of food preservation and their effect on the nutritive value of foods.

দ্বিতীয় পত্র—দ্বিতীয় অধ্যায়—বস্ত্রধৌতি

1. How are textile fibres classified ? Mention the identification tests for natural fibres. Use diagrams where necessary. [H. S. 1962]

2. What are the physical properties of silk ? How does artificial silk react chemically ?

3. What are the characteristics of rayon fibre ? How do they differ from those of natural silk ?

4. How would you distinguish pure silk and aritificial silk, pure wool and wool mixed with cotton ?

5. Make a list of articles that you would require for dry cleaning a woollen coat. Describe briefly the method you would adopt for the work. [H. S. 1961]

6. Describe the different methods of washing woollen garments. Why white silk becomes yellow after wash ?

7. What tests will you do to differentiate the following fibres :—

(*a*) Silk, (*b*) Cotton ?

8. What principles will you follow while using a sewing machine ? How do you oil and clean a sewing machine ?

9. Describe a simple method of dry cleaning at home.

10. Give the names of a few liquids which are commonly used for dry cleaning purposes. Which of these liquids do you consider to be the best and why ?

11. How would you proceed to dry-wash a garment at your home ? State the precautions which you should observe during the process of washing.

12. Which clothes need dry washing and why ? How would you remove the dirt from a blanket ?

পরিশিষ্ট

পাচনতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া

(Digestive system and digestion)

আমাদের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্য হইতে খুব সামান্য কয়েকটি দ্রব্যই (যেমন, গ্লুকোজ, ধাতব লবণ ইত্যাদি) দেহ সরাসরি গ্রহণ করিয়া আপন কাজে লাগাইতে পারে। অবশিষ্ট অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যই যতক্ষণ না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয় ততক্ষণ শরীরের কোন কাজেই লাগে না। ভাতের প্রধান অংশ শ্বেতসার (starch), কিন্তু এই শ্বেতসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যতক্ষণ না গ্লুকোজে (Glucose) পরিণত হইতেছে, ততক্ষণ শরীরের কোন উপকারেই আসিবে না। শ্বেতসার গ্লুকোজে পরিণত হইলেই দেহ ঐ গ্লুকোজ শোষণ করিয়া উহা হইতে তাপ বা শক্তি উৎপন্ন করিতে পারিবে। এইরূপে খাদ্যের প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডে এবং স্নেহপদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty acids) ও গ্লিসারিনে (glycerine) পরিণত হইলেই ঐ সকল উপাদান দেহের উপকারে আসিবে।

খাদ্যদ্রব্যের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হওয়াকেই পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়া (Digestion) বলে। খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া দেহের যে অংশে সম্পন্ন হয় তাহাকে পাচনতন্ত্র (Digestive system) বলে। মুখ-গহ্বর (mouth), অন্ন-নালী (aeso phagus), পাকস্থলী (stomach), ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) এবং বৃহদন্ত্র (large intestine) লইয়া এই পাচনতন্ত্র সংগঠিত। খাদ্য-দ্রব্য পাচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হইয়া অবশেষে রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়।

মুখ-গহ্বরে পরিপাক—আমাদের মুখ-গহ্বরে সর্বদাই লালা (saliva) নিঃসৃত হইতেছে। এই লালা প্যারটিড (Parotid), সাব-লিংগুয়াল (Sublingual) এবং সাব-ম্যাকসিলারী (Sub-maxillary) নামক তিনটি বিভিন্ন গ্রন্থি (gland) হইতে আসে। ইহার বেশীর ভাগই জল। এই জল ছাড়াও অ্যামাইলেস বা টায়ালিন (amylase or ptyalin) নামক এক প্রকার জারক পদার্থ (Enzyme), মিউসিন (mucin) এবং কিছু ধাতব

লবণ এই লালার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণত মৃদু ক্ষারধর্মী।
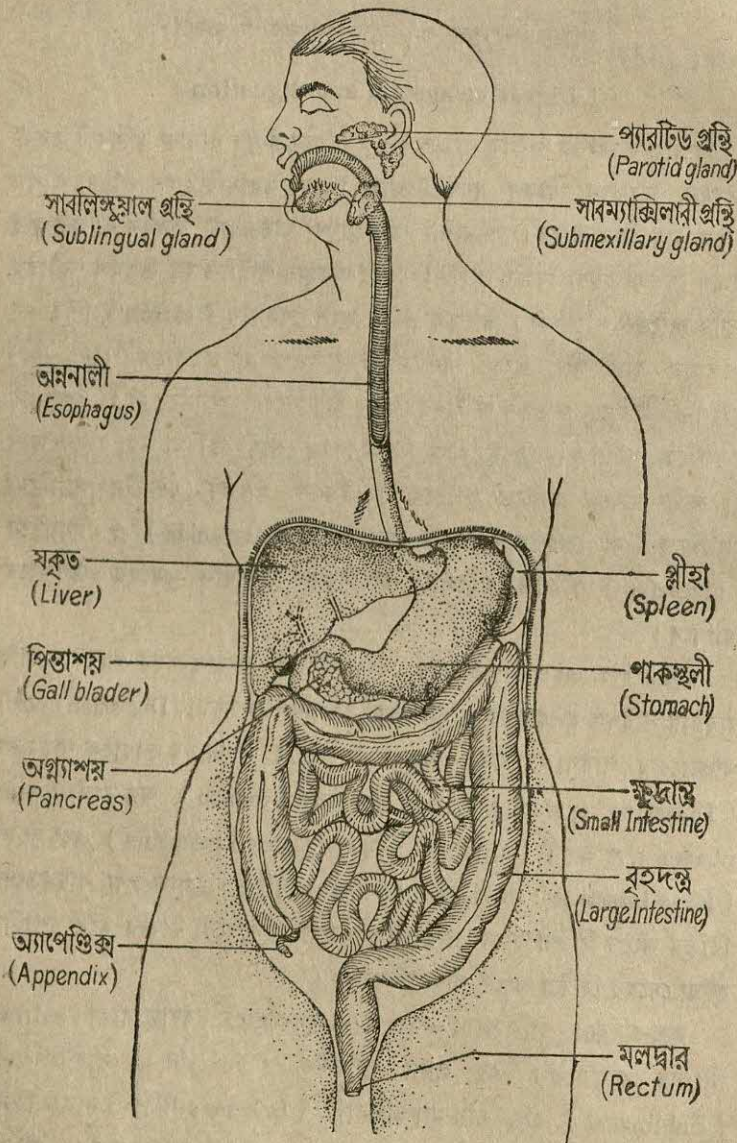
পাচন তন্ত্র

দৈনিক প্রায় 1000 সি, সি, হইতে 1500 সি. সি. লালা একজন ব্যক্তির মুখে নিঃসৃত হয়।

লালা আমাদের খাদ্য-দ্রব্যকে সিক্ত ও নরম করে। ইহার মিউসিন ভুক্ত-দ্রব্যকে পিচ্ছিল করিয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে পৌছাইতে সাহায্য করে। অ্যামাইলেস বা টায়ালিন খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় পদার্থকে ভাঙ্গিয়া মলটোজ-এ (Maltose) পরিণত করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া মুখ-গহ্বরেই প্রথম শুরু হয়। শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ যাহাতে উত্তমরূপে টায়ালিনের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে সেইজন্য খাদ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া চর্বণ করা প্রয়োজন। অতি অল্প সময় খাদ্য-দ্রব্য মুখ-গহ্বরে থাকে বলিয়া সামান্য পরিমাণ শ্বেতসার মলটোজে পরিণত হয়। কাঁচা শ্বেতসার (uncooked) জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের মুখে কোন পরিবর্তন হয় না।

পাকস্থলীতে পরিপাক—মুখ-গহ্বর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত খাদ্য-দ্রব্যসমূহ লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া আমাশয় বা পাকস্থলীর মধ্যে পৌছে। অন্ন-নালী মুখ-গহ্বর হইতে শ্বাসনালীর পিছন দিক দিয়া বরাবর নিচে নামিয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই অন্ন-নালীর মুখ বন্ধ থাকে। শুধু ভুক্ত-দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময়ই উহা খুলিয়া যায়। দৈর্ঘ্যে উহা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। অন্ন-নালীর শেষ প্রান্ত হইতে পাকস্থলী আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সংযোগস্থলকে আগমদ্বার (cardiac end) বলে। পাকস্থলীর শেষপ্রান্ত নির্গমদ্বার (pylorus end) দ্বারা ডিওডেনামের (duodenum) সহিত যুক্ত। ইহা প্রায় 12 ইঞ্চি লম্বা এবং 5 ইঞ্চি চওড়া। পাকস্থলীর ভিতরের প্রাচীর এক প্রকার শ্লৈষ্মিক পদার্থের আবরণে ঢাকা থাকে। এই আবরণের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ছিদ্রগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের মুখ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলগুলি এক একটি গ্রন্থির সহিত সংযুক্ত থাকে। এই সকল গ্রন্থি হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয় যাহাকে আমাশয় রস (gastric juice) বলে।

পাকস্থলীর একেবারে উপরের অংশকে ফাণ্ডাস (fundus) বলে। খাদ্য-দ্রব্য মুখ-গহ্বর হইতে আসিয়া এই ফাণ্ডাসে প্রায় $\frac{1}{2}$—2 ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করে। এই সময় লালার টায়ালিন বা অ্যামাইলেস খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় উপাদানের আরও কিছু অংশ মলটোজে পরিণত করিবার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে খাদ্য-দ্রব্য ফাণ্ডাস হইতে পাকস্থলীর অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আমাশয় রসের সহিত (gastric juice) মিশ্রিত হইতে থাকে।

আমাশয় রস প্রধানত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, প্রো-রেনিন (pro-renin), পেপসিনোজেন (pepsinogen) এবং লাইপেস (lipase) দ্বারা গঠিত। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রো-রেনিন এবং পেপসিনোজেন হইতে যথাক্রমে রেনিন ও পেপসিন উৎপন্ন করে। রেনিন, পেপসিন এবং লাইপেস এই তিনটি আমাশয় রসের জারক পদার্থ (enzyme)। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জন্য আমাশয় রসটি তীব্র আম্লিক (acidic)। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (১) খাদ্যের
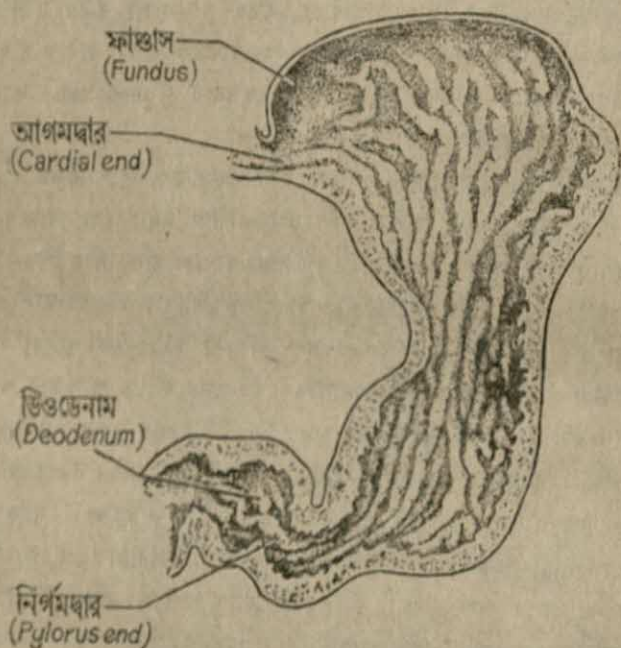
পাকস্থলীর লম্বালম্বি কাটা অংশ

প্রোটিন নরম করিয়া পরিপাকে সহায়তা করে। (২) ইহার সাহায্যে প্রো রেনিন এবং পেপসিনোজেন হইতে যথাক্রমে রেনিন এবং পেপসিন উৎপন্ন হয়। (৩) খাদ্যের ইক্ষু শর্করা (cane sugar) এই অ্যাসিডের সাহায্যে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে (fructose) পরিণত হয়। (৪) খাদ্য-দ্রব্যের সহিত কোন দূষিত জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে ইহা ঐ জীবাণু তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া (৫) নির্গমদ্বার (pylorus end) খুলিতে এবং (৬) খাদ্যের লৌহ জাতীয় পদার্থ শোষণেও এই অ্যাসিড সহায়তা করিয়া থাকে।

পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য কতক্ষণ অবস্থান করিবে তাহা উহার পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তরল খাদ্যদ্রব্য 15 মিনিট হইতে আধঘণ্টার বেশী অবস্থান করে না। এইজন্যই তরল খাদ্য-দ্রব্যে আমাদের তাড়াতাড়ি ক্ষুধার উদ্রেক হয়। স্নেহজাতীয় খাদ্য-দ্রব্য সর্বাপেক্ষা বেশী সময় পাকস্থলীতে অবস্থান করে। সাধারণত 4 হইতে 5 ঘণ্টা কাল খাদ্য-দ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে পেপসিন খাদ্যের প্রোটিন হইতে প্রোটিয়োস্ (proteoses) এবং পেপটোন (peptone) উৎপন্ন করে। রেনিন দ্বারা দুধ ছানায় পরিণত হয়। লাইপেস ডিম এবং ক্রীমের স্নেহপদার্থের সামান্য কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) এবং গ্লিসারিনে পরিণত করে। অধিকাংশ স্নেহপদার্থেরই পাকস্থলীতে কোন পরিবর্তন হয় না। এইভাবে বিভিন্ন জারক রসের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া সর্বশেষে একটি পাতলা মণ্ডের (chyme) আকার ধারণ করে। এই মণ্ড ধীরে ধীরে পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন এবং বিস্তারের ফলে নির্গমদ্বার দিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে (small intestine) প্রবেশ করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক—খাদ্যের সর্বাপেক্ষা বেশী পরিবর্তন হয় এই ক্ষুদ্রান্ত্রে। প্রায় 5 ঘণ্টাকাল খাদ্য-দ্রব্য এই ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থান করে। কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থায় মোট পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রায় 9 ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়।

পাকস্থলীর পিছনের দিকে প্রায় 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি অগ্ন্যাশয় (pancreas) আছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র নলের দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত যুক্ত। খাদ্য-দ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিলে এই অগ্ন্যাশয় হইতে এক প্রকার ক্লোম রস (Pancreatic juice) বাহির হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এই ক্লোম রসে অ্যামাইলোপসিন (amylopsin), স্টিয়াপসিন (steapsin), ট্রিপসিন (trypsin) এবং কাইমো-ট্রিপসিন chymo-trypsin) নামক প্রধান প্রধান চারিটি জারক পদার্থ থাকে। ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিন প্রথমে ট্রিপ-সিনোজেন এবং কাইমোট্রিপসিনোজেন আকারেই অগ্ন্যাশয় হইতে নির্গত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক আবরণ হইতে এন্টারোকাইনেস (enterokinase) নামক এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহা ট্রিপসিনোজেন হইতে ট্রিপসিন উৎপন্ন করে। এই ট্রিপসিন আবার কাইমোট্রিপসিনোজেন হইতে কাইমো-ট্রিপসিন প্রস্তুত করে। এই ক্লোম রস ক্ষারধর্মী (basic)। উহা খাদ্য-দ্রব্যের আম্লিক (acidic) ভাব প্রশমিত করিয়া মৃদু ক্ষারত্ব প্রদান করে।

অ্যামাইলোপসিন খাদ্যের অবশিষ্ট শ্বেতসার মলটোজে (maltose) পরিণত করে। ইহা কাঁচা শ্বেতসার (uncooked) হইতেও মলটোজ উৎপন্ন করিতে পারে। ট্রিয়াপসিন স্নেহপদার্থ হইতে গ্লিসারিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) উৎপন্ন করে। যে সকল প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই তাহা এইখানে ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিন দ্বারা প্রধানত প্রোটিয়োস্ (proteoses) এবং পেপটোনে (peptone) পরিণত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজে যকৃত (liver) সহায়তা করে। যকৃত হইতে পিত্তরস (bile) উৎপন্ন হইয়া পিত্তাশয়ে (gall bladder) সঞ্চিত হয়। একটি ক্ষুদ্রনলের সাহায্যে এই পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবাহিত হয়। ইহা স্নেহপদার্থ পরিপাকে সহায়তা করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক আবরণ হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয়। এই রসকে সাকাস এন্টেরিকাস (succus entericus) বলে। এই রসে ইরেপ্‌সিন (erepsin), সুক্রেস (sucrase), মল্‌টেস্ (maltase) এবং ল্যাক্টেস্ (lactase) নামক চারিটি জারক পদার্থ থাকে। ইহা ছাড়া এন্টারোকাইনেস্ (enterokinase) নামক আরও একটি পদার্থ এই রসে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইরেপ্‌সিন প্রোটিয়োস্ (proteose) এবং পেপটোন peptone) ভাঙ্গিয়া অ্যামিনো অ্যাসিড (amino acids) প্রস্তুত করে। সুক্রেস্ খাদ্যের
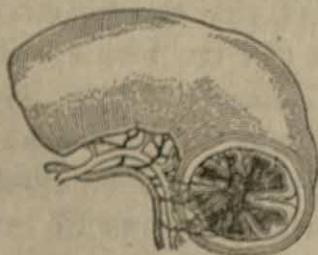
ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুলের ন্যায়
একপ্রকার অভিক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়

ইক্ষু শর্করা (cane sugar) হইতে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ (fructose) উৎপন্ন করে। মল্‌টেস্ এবং ল্যাক্টেস্ যথাক্রমে মল্‌টোজ (maltose) এবং

দুগ্ধ শর্করা (lactose) ভাঙ্গিয়া প্রথমটি হইতে গ্লুকোজ এবং শেষেরটি হইতে গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ (galactose) প্রস্তুত করে।

এইরূপে ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

পরিপাক প্রাপ্ত হইবার পর খাদ্যদ্রব্যসমূহ রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। এই শোষিত হইবার কাজটুকু প্রায় সম্পূর্ণরূপেই এই ক্ষুদ্রান্ত্রে হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙ্গুলের ন্যায় একপ্রকার অভিক্ষেপ (projections) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অভিক্ষেপ সমূহকে ভিলাই (villi) বলে। ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক রক্তবহানলী (capillary blood vessels) আছে। ইহাদের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে পারিচালিত হয়।

বৃহদন্ত্রের কাজ—ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে ভুক্তদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ বৃহদন্ত্রে পরিচালিত হয়। বৃহদন্ত্র হইতে প্রধানত খাদ্যের জলীয় অংশটুকু দেহ শোষিত হইয়া বাকী অংশ মলে পরিণত হয়। এই মল প্রতি 24 ঘণ্টা অন্তর দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া কর্তব্য। শাক-সব্জি ও তরিতরকারির ছিবড়া সেলুলোজ পেশীর সংকোচনের সৃষ্টি করিয়া বৃহদন্ত্র হইতে এই মল নিষ্কাশিত করিতে সহায়তা করে। **এইজন্যই খাদ্য-দ্রব্যে প্রচুর সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ থাকা উচিত।**

পরিপাকের সহায়ক এনজাইমসমূহ

(Digestive Enzymes)

খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক করিতে যে সকল জারকরস (enzyme) অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাদের নাম, উৎপত্তি ও কাজ নিম্নে দেওয়া হইল।

জারক পদার্থ (Enzyme)	যে গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয় (Secreted by)	যাহার উপর ক্রিয়া করে (Substance acted upon)	খাদ্যের পরিণতি (Products of Enzyme activity)
টায়ালিন বা অ্যামাইলেস্	লালাগ্রন্থি	পরিপক্ক (cooked) শ্বেতসার	মলটোজ
রেনিন	পাকস্থলীর গ্রন্থি	দুধের প্রোটিন	ছানা প্রস্তুতি
পেপসিন	,, ,,	প্রোটিন	প্রোটিয়োস এবং পেপটোন
লাইপেস্	,, ,,	স্নেহ	গ্লিসারিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড
ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন	প্রোটিয়োস্ এবং পেপটোন
কাইমো-ট্রিপসিন্	,, ,,	প্রোটিন	প্রোটিয়োস এবং পেপটোন
অ্যামাইলোপ্সিন্	,, ,,	শ্বেতসার	মল্‌টোজ
?পসিন্	,, ,,	স্নেহ	গ্লিসারিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড
এন্টারোকাইনেস্	ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক আবরণ	ট্রিপসিনোজেন	ট্রিপসিন
ইরেপসিন	,, ,,	প্রোটিয়োস এবং পেপটোন	অ্যামিনো অ্যাসিড
সুক্রেস্	,, ,,	ইক্ষু-শর্করা	গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ
মল্‌টেস্	,, ,,	মল্‌টোজ	গ্লুকোজ
ল্যাক্টেস্	,, ,,	দুগ্ধ শর্করা	গ্লুকোজ এবং গ্যালাক্টোজ

HIGHER SECONDARY QUESTIONS
ON
ELEMENTS OF HOME SCIENCE—1960

FIRST PAPER

GROUP A

1. "Health is not merely absence of disease". Explain. State briefly the factors that contribute to good physical health.

2. What are the effects of breathing confined air ? What arrangements could be made for properly ventilating a room ?

3. Describe the process you would follow in changing the sheets of a weak patient's bed ? What precautions are to be taken to prevent bed-sores ?

4. How would you save a girl whose sari has caught fire and who is found running ? What first aid would you render after she has been saved from the fire ?

5. Show how cleanliness in the home might prevent the spread of communicable diseases to other members of the family. How would you prevent the spread of small-pox if you have a case in your family ?

6. A book-case in your reading-room is badly infested by white ants. How would you treat it and what measures would you adopt to prevent future attack ?

GROUP B

7. *Either*, What is an ideal home ? Name the duties that mother has to perform in a home. What are your responsibilities at home ?

Or, In planning a new house should you give special thought to the following ?—(*a*) structure, (*b*) ventilation, (*c*) drainage arrangement. Give reasons for your answer.

8. *Either*, What are the basic principles of decorating a room ? Make a list of articles that you should keep in your drawing-room. What part does curtains play in interior decoration ?

Or, State the difference between a Savings Account and a Current Account. Why should cheques always be made payable to some person ? How would you endorse a cheque ?

9. What is leisure ? Discuss the value of spending one's leisure on books, music and painting. What else can one do with leisure ?

10. Describe how you would clean and polish *any one* :—

(*a*) A wooden chalr. (*b*) A steel knife with a bone handle. (*c*) An ornamental piece of copper.

SECOND PAPER

GROUP A

1. *Either*, Name the classes of food substances found in (*a*) meat, (*b*) cereals, (*c*) green vegetables. State the nutritive importance of each class.

Or, What do you understand by calorific value of foods ? Give four examples of foods which are good sources of calorie. State with reasons, what other foods should be included in a day's meal to give a balanced diet.

2. *Either*, What factors should guide you when planning meals for (*a*) a sick person, (*b*) a young child, (*c*) a man doing hard physical work ? Suggest a simple menu for main meal of the day for any one of these types of persons.

Or, How are vitamins classified ? Give two examples of each group. Indicate their important sources, and the daily requirements of an adult. Which vitamins are destroyed during cooking of food ?

3. *Either*, State the advantages of stewing as a method of cooking. What foods may be cooked by this method ?

Or, What are the causes of deterioration of food ? State the precaution which should be taken to prevent souring of milk.

4. *Either*, What kinds of kitchen equipment and cooking utensils would you select for your kitchen ? Give reasons for your choice.

Or, Why are the following practices important in cookery ?—

(*a*) Frying the basic ingredients to make a curry. (*b*) Heating fat correctly before frying. (*c*) Sieving floor. (*d*) Slow cooking of meat. (*e*) Standing the dough before making chapati.

5. *Either*, Name the natural fibres used in the textile industry and indicate their sources. How would you distinguish these fibres ?

Or, What are the characteristics of silk-fibre ? Describe briefly the method you would adopt for washing a silk garment.

6. *Either*, What is a stain ? State the method you should follow while removing :—

(*a*) Ink stain from a coloured frock. (*b*) Tea stain from a silk sari. (*c*) Grease stain from a cotton table-cloth.

Or, Make a list of equipment that is necessary for laundry work. How would you take care of the equipment ?

7. *Either*, What are the functions of soap and water in washing clothes ? What would be the effects of using, (*a*) hot water for silk, (*b*) cold water for woollens, and (*c*) hard water for cotton ?

Or, By means of diagrams and brief notes show how the machine stitches would appear on material in the following cases :—

(*a*) Top thread is too tight.
(*b*) Under thread is too tight.

8. Explain the causes *any two* of the following and suggest how it may be prevented :

(*a*) The formation of scum while washing.

(*b*) Rust marks after ironing.

ELEMENTS OF HOME SCIENCE—1961

First Paper

Group A

1. Justify the statement "the home-maker is responsible for the health of the family."

2. What is personal hygiene ? Explain why fresh air and sunshine are so important for health.

3. What are the essential qualifications of a good nurse ? What precautions should she observe regarding her personal health while nursing a patient ?

4. Describe in detail how you would render first aid to a person who has been rescued from drowning in the river and is in an unconscious state.

5. Name some of the diseases caused by house flies and mosquitoes. How can the home-maker fight against these insect enemies ?

6. State the different ways by which impure water may be purified. Describe in detail the method which is prevalent in a big city.

Group B

7. What do you understand by 'family budget'? What facts should you consider while planning it?

8. "The words, beauty, comfort and convenience seem to belong to a happy well-ordered home." Discuss.

9. State the different ways of saving money. Which one do you think is the best for a middle class family? State reasons.

10. What do you understand by 'simple labour-saving devices at home'? Suggest some possible ways of saving labour and time without using mechanical appliances at home.

11. Explain with reasons how any *one* of the following may be prevented :—

(*a*) Rusting of iron, (*b*) Tarnishing of brass.

Second Paper

Group A

1. Explain why protein is so important for human nutrition. Name some foodstuff rich in protein.

2. What are the functions of mineral elements in our body? Name some of the important minerals that are present in milk and cereals.

3. What is a balanced diet? What supplementary food can you suggest to enrich a diet low in protein and iron?

4. Make a list of foods that supply energy to our body. Compare carbohydrate and fat as sources of calorie.

5. State the effect of dry and moist heat on rice, meat and leafy vegetables. Which method of cooking do you think would be best for preserving their food values?

6. Write short notes on any *two* of the following :—
   (*a*) Smokeless chula.
   (*b*) Kitchen garden.
   (*c*) Food preservation.

Group B

7. How may stains be classified ? Give an example of each group and state how you would proceed to remove them from a white cotton sari.

8. State what you know about woollen fibre. How does it differ from silk ?

9. What do you mean by 'hard and soft water' ? How would you soften water for washing silk germents ?

10. Make a list of articles that you would require for *dry cleaning* a woollen coat. Describe briefly the method you would adopt for the work.

11. Write short notes on any *one* of the following :—
(*a*) Darning. (*b*) Detergents.

ELEMENTS OF HOME SCIENCE—1962

First Paper

Group A

1. What do you understand by the term 'good health' ? Name some of the important factors which contribute to good physical health.

2. What is the difference between a fracture and a dislocation ? What first aid would you render to a boy who has broken his thigh-bone just above the knee and is bleeding ?

3. What are the important factors that you should consider while choosing a room for a sick person who is suffering from an infectious disease ? Give a list of articles you should require for the patient.

4. Name four of the household pests which are most common in the house. Describe briefly how to get rid of those pests.

5. Write short notes on any *one* of the following :—
(*a*) Dangers of spitting everywhere. (*b*) Causes of diarrhoea.
(*c*) Importance of cleanliness.

Group B

6. When could you say that a home is successfully managed ? What are the essential qualities of a good house-wife ?

7. State the factors that you should consider while buying :—
   (*a*) A piece of furniture.
   (*b*) A lamp or a lightning fixture.
   (*c*) A picture for a study room.

8. What are the principles of decorating a room ? Why colour plays an important part in interior decoration ?

9. What is a family budget ? How does it help family finance ? How would you adjust your budget if your income (*a*) increases by 20% and (*b*) decreases by 20% ? Give reasons for your answer.

10. Select the suitable cleansing agents for each of the articles from the list given against them :—

Articles	*Cleansing agents*
(*a*) Ornamental silver tray	—Silvo, lemon, soapy water.
(*b*) Porcelain flower vase	—Washing soda, vim powder, ash.
(*c*) Cut glass tumblers	—Bran water, ammonia, soapy water.
(*d*) Brass cooking spoons	—Washing soda, tamarind, brasso.
(*e*) Enamelled mixing bowls	—Fine sand, vim powder, soapy water.

SECOND PAPER

GROUP A

1. State briefly the function of carbohydrate in human body. Name any other food constituent that can replace carbohydrate.

2. Write what you know about the composition of milk. Discuss the importance of milk and milk products in the diet of a child.

3. To what dietary factors are the following deficiency diseases related ?—

(*a*) Scurvy. (*b*) Anaemia. (*c*) Rickets. (*d*) Goitre.

Name the foods you would recommend to those suffering from the above diseases.

4. What is food ? State the factors you should consider while planning a day's meal.

5. What are the principles of cooking cereals and vegetables ? Indicate the precautions that you should take for preserving their nutritive values while cooking.

6. Write short notes on any *two* of the following :—

(*a*) Sick diet. (*b*) Vegetable salad. (*c*) School tiffin. (*d*) Smokeless chula.

Group B

7. Discuss the functions of soap and water in washing of clothes. How would you wash a silk frock ?

8. What are the different types of fibres used in the textile industry ? How is silk fibre distinguished from a cotton fibre ?

9. Name three reagents that are used for removing the following stains : Coffee, rust, egg. Indicate the use of each of these agents in removing stains from cotton dresses.

10. What is the difference between dry-cleaning and washing ? Why woollen garments are generally dry-cleaned ? Make a list of the equipment needed for dry-cleaning. Give a brief outline of the dry-cleaning process.

11. Write notes on any *one* of the following :—
(*a*) French Seam, (*b*) Hard water, (*c*) Starching.

ELEMENTS OF HOME SCIENCE—1963

First Paper

Group A

1. When can you say that a person is maintaining good health ? Describe the importance of cleanliness and fresh air on health.

2. What is a Tourniquet ? How is it used ? A boy is bleeding profusely from his wrist. What first aid would you render him ?

3. What is impure air ? What arrangements would you make to have proper ventilation in a room ?

4. How would you treat your old books which are infested by white ants ? What preventive measures would you take against those insects ?

5. How do infectious diseases spread ? State the preventive measures that you would take when one of your sisters is suffering from influenza.

6. Write short notes on :—

(*a*) Causes and prevention of scabies.
(*b*) Importance of sunshine on health.

Group B

7. What do you meen by essential needs ? State the principles of planning family budget. How would you adjust (*a*) a 20 per cent increase and (*b*) a 20 per cent decrease of family income in the budget plan.

8. As a housewife, what are the points that you should consider while dividing work among family members ? Give reasons for your answer.

9. Discuss briefly the effects of colour and design in interior decoration. Illustrate your answer with suitable examples.

10. How can labour be saved in a kitchen ? Mention three mechanical labour-saving devices that could be used in a middle class Indian family.

11. Write short notes on :—

(*a*) Effects of using washing soda on aluminium.

(*b*) Effects of using hard abrasives on soft metal.

Second Paper

Group A

1. What are the functions of carbohydrates in human body ? Discuss the drawbacks of taking only carbohydrate foods in our diet.

2. State the composition of cow's milk. Why is milk so important in our daily diet ?

3. Name the minerals and vitamins that are present in the following :—

(*a*) Codliver oil, (*b*) Cereal grain, (*c*) Orange, (*d*) Fish.

Discuss the effects of deficiency of *any one* of the above minerals and vitamins.

4. What are the main principles that you should follow while serving food to your guest ? Write briefly the method of one egg preparation that you can serve in a most attractive way.

5. What are the causes of food deterioration ? Mention the different methods by which you can preserve food in your home.

6. Write short notes on :—

(*a*) Steaming, (*b*) Types of fuels.

GROUP B

7. State what you know about cotton fibres. How does it differ from linen ?

8. Prepare a list of laundy equipment and state how you would take care of the equipment. How can labour be saved in laundry work ?

9. What are the physical and chemical properties of woollen fibres ?

9. Describe the washing and finishing process of a silk blouse.

11. Write short notes on :—

(*a*) Hard and soft water.
(*b*) Dry cleaning at home.

ELEMENTS OF HOME SCIENCE—1964

FIRST PAPER

GROUP A

1. Discuss the values of exercise and organised games on health and mind. When can you say that a person has deveploped good habits in taking exercise ?

2. What are the causes of bedsore ? As a good nurse what assistance can you give to such a patient ? State how bedsore can be prevented.

3. What do you mean by infectious diseases ? What measures should be taken for the prevention and cure when a person is afflicted by (*a*) influenza ; (*b*) cholera ?

4. Describe in detail how you would render first aid to a little boy bleeding profusely from his injured arm.

5. Discuss the use of insecticides in the prevention and control of household pests. Name *three* commercial insecticides and mention how they are used for controlling :

(*a*) Bed Bugs. (*b*) Cockroaches. (*c*) Rats.

6. Write short notes on any *one* of the following :—

(*a*) Community Sanitation. (*b*) Personal Hygiene.

Group B

7. State the significant factors that are to be considered while selecting a site for a residential building. Explain *two* devices that may be adopted for lighting and ventilating the rooms.

8. Why do you want friends ? Make a list of qualities you think are important in making friendships more satisfying and lasting and say why you think so.

9. What do you mean by warm and cool colours ? Using those colours develop a colour scheme for a drawing-room or a bedroom with reference to its walls, floor, upholstery, curtains, linens and pictures.

10. What should be your primary purpose in choosing a hobby ? Mention the factors that are to be considered while developing a hobby for supplementing family income.

11. Write short notes on any *one* of the following :—

(*a*) Maps and Dusters. (*b*) Cleaning and Polishing.

Second Paper

Group A

1. Which of the following functions of food may be attributed to vitamins and minerals ?—

(*a*) Build and repair tissues. (*b*) Provide energy. (*c*) Regulate body processes. (*d*) Maintain body temperature. (*e*) Protect the body against disease.

How would you cook vegetables to preserve their nutritive values ?

2. A friend of yours wishes to lose weight. Which course of action listed below should she follow if she is to lose weight and maintain good health.

(*a*) Omit breakfast. (*b*) Eliminate bread and potatoes from her diet. (*c*) Omit lunch. (*d*) Eat an adequate diet, but decrease her caloric intake.

Name the major components of food and maintain their importance in daily diet.

3. What would be your recommended daily allowances in the following cases ?—

(*a*) Protein for young children 6 to 12 years of age.
(*b*) Calcium for expecting mothers.

How can these allowances be met from different foodstuffs ?

4. Which of the given nutrients frequently deficient in the diet may be supplied in an adequate amount by the addition of a quart of milk daily ?—

(*a*) Iodine. (*b*) Iron. (*c*) Thiamine. (*d*) Calcium. (*e*) Ascorbic acid.

Discuss the importance of milk in our daily diet.

5. Which of the following are caused by deficiencies of nutrients ?—

(*a*) Pellegra. (*b*) Sugar diabetes. (*c*) Rickets. (*d*) Scurvy. (*c*) Colds.

Which one is most common among children ? What are its signs and symptoms ? What type of food would you recommend for a child suffering from that disease ?

6. Write short notes on any *one* of the following :—

(*a*) Balanced diet. (*d*) Calorific value of food.

GROUP B

7. Fill up the gaps :—

(*a*) Cotton is ironed at a temperature over — . (*b*) Boiling temperature of water is —. (*c*) Silk is ironed at a temperature below — . (*d*) The temperature of lukewarm water is — .

What would be the effect of heat on washing and finishing of different fabrics ?

8. A housewife wants to buy fabrics made of pure wool and linen. What advice can you give her so that she can easily distinguish between pure and artificial fabrics ? Why are cotton fabrics widely used in tropical countries ?

9. Briefly explain the following :—

(a) Why is soft water the most useful kind for washing clothes ? (*b*) Why is soap used for washing clothes ? (*c*) Why are some clothes starched ?

How can you treat a cushion cover with coloured embroidery without spoiling the embroidery ?

10. You have to make a child's frock. Which of the following seems would you do ?

(*a*) Run and fell seam. (*b*) French seam. (*c*) Flat seam.

Draw a clear diagram of the seam that you think suitable and give reasons for its advantage over other seams. What stiches are used for that seam ?

11. Write short notes on any *one* of the following :—

(*a*) Removing of rust stain from a white cotton blouse.

(*b*) Softening of permanent hardness of water.

ELEMENTS OF HOME SCIENCE—1965

First Paper

Group A

1. What is community hygiene ? How does personal hygiene affect community hygiene ?

2. What preventive measures should you take against typhoid fever ? How would you nurse a typhoid patient in your home ?

3. Name the diseases caused by mosquitoes and rats. How can you get rid of these pests from your house ?

4. What are the different ways of purifying impure water ? Describe in detail the method prevalent in a big city for purifying drinking water.

6. A friend of yours has caught fire while cooking on a kerosene stove. What first aid would you render ?

6. Discuss the importance of rest and sleep on health.

Group B

7. What is an ideal home ? What are the duties of a homemaker ? What are your responsibilities towards making a happy home ?

8. What do you understand by labour saving devices ? Suggest some possible ways of saving labour and time without using mechanical appliances at home. Name *three* labour saving equipment that you like to have in your home and say why.

9. State the different ways of saving money. Which one do you think is the best for a middle class family ? Give reasons.

10. What are principles of interior decoration ? What part does curtain play in interior decoration ? You want to give a spacious look to a small room—what will you do ?

11. Write short notes on any *one* of the following :—

(*a*) Hobbies. (*b*) Choosing friends.

Second Paper

Group A

1. Define and classify food with reference to its functions in the human body. Name *two* chief sources of each.

2. Discuss the nutritive value of rice. How can it be improved ?

3. What are the different methods of cooking food ? How does cooking affect the following foodstuffs :

(*a*) Egg. (*b*) Green vegetables. (*c*) Potatoes.

4. Discuss the common types of accidents that take place in the kitchen. What are the common fuels used in our country ? Describe brifly their advantages and disadvantages.

5. What are the causes of food deterioration ? How can you preserve food in home ? Give examples.

6. Fill up the gaps :—
(*a*) —— should be taken fresh and raw.
(*b*) Milk is called a — —.
(*c*) Carbohydrates should be cooked in plenty of —.
(*d*) High fibre diet should be given in case of —.
(*e*) The recommended daily protein allowance of a 19-year old boy is — gm.
(*f*) — gm. of calcium is needed for a pregnant mother.

Group B

7. Write short notes on any *three* :—

(*a*) Cellulose. (*b*) Sericine. (*c*) Suction washer. (*d*) Ink stain on cotton. (*e*) Tea stain on cotton.

8. What are the principles you would follow while using a sewing machine ? How would you oil and clean a sewing machine ?

9. How would you classify textile fibres ? Mention some special properties of wool for which it is used in the Textile Industry.

10. What causes hardness of water ? How would you render hard water suitable for laundering purposes ?

ELEMENTS OF HOME SCIENCE—1965 (Compt.)

First Paper

Group A

1. What is personal hygiene ? Describe the importance of fresh air and sunshine on health.

2. State the procedure you should follow while changing sheets of a weak patient's bed. How would you give bath to that patient ?

3. What is the relation of height to body weight ? What should be the weight of a person who is 5′ tall at the age of 25, 30 and 35 years ?

4. If a girl catches fire on her sari and starts running, how would you save her ? What first aid would you render her ?

5. If your silk garments are infested with moths, how would you treat them ? What precautions would you take to prevent future attack ?

6. Write short notes on any *one* of the following :—

(*a*) Vaccination. (*b*) Danger of throwing garbage everywhere.

Group B

7. While planning a house, what are the special points that you should consider regarding drainage, water supply and sanitation ?

8. Name three different types of hobbies and explain how you can supplement family income through those hobbies.

9. How can you save your time, effort and movement in your kitchen by good planning ?

10. What should be the duties and responsibilities of a girl of your age ?

11. Write short notes on any *one* of the following :—

(*a*) Cleaning and polishing of an aluminium saucepan.
(*b*) Labour saving devices.

Second Paper

Group A

1. Discuss the importance of carbohydrate in our diet. Name foods rich in carbohydrate. Name the carbohydrates that are present in milk.

9. Why are protein foods important in the diet of growing children ? Name four protein foods that you think best for them. What other major consituents have they ?

3. Discuss the functions of (*a*) Vitamin D and (*b*) Iron. Mention their sources in our diet. What are the effects of their deficiency ?

4. What is the importance of fruits in our diet ? What makes citrous fruits more important than others ?

5. Write briefly the principles of planning diet for adequate nutrition. What is the effect of overeating ?

6. Write short notes on any *one* of the following :—

(*a*) Cleanliness of kitchen utensils. (*b*) Art of serving food.

GROUP B

7. What are the physical and chemical properties of a cotton ?

8. What do you mean by hardness of water ? How would you make this water suitable for laundry work ? What are the disadvantages of using hard water for washing garments ?

9. How do the washing and finishing methods of a cotton garment differ from those of a silk garment ? How would you store garments ?

10. Describe briefly the method of dry cleaning in the home. What are its advantages and disadvantages ?

11. Write short notes on *any one* of the following :
(*a*) Blueing. (*b*) Patching.

ELEMENTS OF HOME SCIENCE—1966

FIRST PAPER

GROUP A—(Answer *any four* questions)

1. Discuss the importance of breathing in fresh air. How fresh air may be circulated in a bed room ?

2. What do you understand by good health ? State briefly the factors that contribute to good physical health

3. State the preventive measures you should take if cases of cholera and dysentery often occur in your neighbourhood.

4. How would you treat your book-case which is badly infested by white ants ? What measures would you adopt to prevent future attack ?

5. How would you render first aid to a person who has been rescued from drowning in the river and is in an unconscious state ?

6. What are the essential qualifications of a good nurse ?

GROUP B—(Answer Question 11 and *any two* of the rest)

7. State the significant factors that are to be considered while selecting furniture for your sitting room. Describe briefly how you would arrange furniture in a sitting room.

8. What are the essential qualities of a good homemaker ? When can you say that a home is successfully managed ?

9. State the difference between a Current account and a Savings account. Point out their advantages and disadvantages. How would you endorse a cheque ?

10. What do you understand by the term leisure ? How can you supplement family income by wise use of leisure ?

11. Write short notes on *any one* of the following :—
   (*a*) Labour saving devices in home.
   (*b*) Interior decoration.
   (*c*) House-hold account.

SECOND PAPER

GROUP A—(Answer *questions* 6 and *any three* of the rest)

1. Define and classify Protein. Describe the functions of protien in the body. Mention the quantity required per head per day to maintain health.

2. Why should green leafy vegetables be included in the daily diet ? What precautions should you take to preserve their food values during cooking ?

3. Describe a well-equipped scientific kitchen you would iike to have in your home.

4. What is a balanced diet ? Plan a balanced diet for a vegetarian pregnant mother.

5. Name the vitamins that are present in the following :—
   (*a*) Cod-liver oil. (*b*) Yeast. (*c*) Orange. (*d*) Rice.

Discuss the effects of deficiency of *any one* of the above vitamins.

6. (*a*) Which is the better source of protein ?
   (*i*) egg or cheese ; (*ii*) peanuts or cabbage ; (*iii*) white flour or whole meal flour ; (*iv*) milk or meat.
   (*b*) Which requires more calories ?
   (*i*) walking or running ; (*ii*) sitting or sleeping.
   (*c*) Why is a hard-boiled egg hard ?
   (*d*) Why does exercise make you hot ?
   (*e*) What happens to people who eat more calories than they need ?

GROUP B—(Answer *question* 10 and *any two* of the rest)

7. What are the properties of a good soap ? How does soap clean clothes ?

8. What do you mean by the term Dry Cleaning ? How would you dry-clean a woollen coat ?

9. Classify textile fibres according to their sources. How would you identify them ?

10. Write short notes on *any three* :—
   (*a*) Mercerisation. (*b*) Detergents. (*c*) Patching.
   (*d*) Seams. (*e*) Artificial silk.

ELEMENTS OF HOME SCIENCE—1967

FIRST PAPER

Group A (Answer *any four* questions)

1. Describe briefly the importance of cleanliness in keeping good health.

2. What are the general rules of taking exercise ? What are the evil effects of over-exercise ?

3. State the relation between height and weight in human structure and health. At what age do boys and girls increase in their height and weight most rapidly ?

4. Describe the dangers of spitting. Name some of the diseases which are caused by it. What preventive measures should be adopted against them ?

5. What is the difference between a fracture and a dislocation ? How would you render first aid to a person who has broken an arm ?

6. Write short notes on *any two* of the following :—

(*a*) Feeding the sick. (*b*) Good health. (*c*) Causes of prevention of tuberculosis.

Group B

(Answer Question 11 and *any two*)

7. What are the points you should consider in selecting a house ? When would you call a home health one ?

8. What are the general principles of decorating a room ? How would you decorate your drawing room ?

9. What is a cheque ? How many kinds of cheques are there ? Briefly describe their advantages and disadvantages ?

10. Why do we need friends ? How would you make friendship and make it a lasting one ?

11. Write short notes on *any one* of the following :—

(*a*) Family budget.

(*b*) Labour saving devices.

(*c*) Hobbies.

SECOND PAPER

Group A

(Answer question 1 and *any three* of the rest)

1. Write short notes on *any three* of the following :—

(*a*) Calorie. (*b*) Types of fuels. (*c*) Ricket. (*d*) Essential fatty acids. (*e*) Milk.

2. What do you mean by 'Balanced diet'? Plan a suitable low-cost balanced deit for a Labourer.

3. Discus the part played by the important minerals in human nutrition.

4. Prepare a list of equipments which you like to have in your Kitchen for saving of your time and labour.

5. What are the signs and symptoms of a person who is suffering from Vitamin C deficiency? Mention three common foodstuffs rich in this Vitamin.

6. Describe the common methods of food preservation at home.

Group B

(Answer question 7 and *any two* of the rest)

7. State in brief the process of removing *any two* of the following stains :—

(*a*) Grass stain on Silk Sari. (*b*) Tea stain on Cotton Shirt. (*c*) Iron rust on Cotton Shirt. (*d*) Ink stain on Silk Blouse.

8. State briefly the physical and chemical characteristics of cotton.

9. What is Saponification? What are the properties of a good soap?

10. Mention some special properties of wool for which it is used in the Textile Industry. How wool felts?

ELEMENTS OF HOME SCIENCE—1968

FIRST PAPER

GROUP A—(Answer *any four* questions)

1. Describe how the community hygiene is affected by the personal hygiene.

2. Write what you know about the importance of fresh air and sunshine in keeping good health.

3. What are the principles that you should follow while selecting a patient's room ? Describe briefly the arrangements of furniture in the patient's room.

4. Name five of the most common household pests. What harm they do to us ?

5. What precautions would you take when nursing a patient at home who is suffering from small pox.

6. Write short notes on any *two* of the following :—

(*a*) Throwing of garbage anywhere.
(*b*) Infectious disease.
(*e*) Artificial Respiration.

GROUP B

(Answer question 11 and *any two* from the rest)

7. Describe briefly what should be the duties and resposibilities of a girl to her family.

8. What are the main principles of preparing a family budget ? How does the budget of a poor, a middle class and a rich family differ from one another ?

9. What do you understand by labour saving devices ? Make a list of labour saving devices which are available in the market. How can you save time and labour without using those labour saving devices ?

10. Write short notes on *any two* of the following :—

(*a*) Importance of savings.
(*b*) Planning in home management.
(*c*) Fixed deposit.

11. How would you clean and polish the following articles

(*a*) Tarnished brass utensils.
(*b*) Steel utensils with iron rust

SECOND PAPER

GROUP A

(Answer Question 1 and *any three* of the rest)

1. Write short notes on *any three* of the following :—
   (*a*) School Tiffin
   (*b*) Balanced diet
   (*c*) Essential amino acids
   (*d*) Art of serving food.

2. Describe an ideal well-equipped kitchen. Discuss the common types of accidents that may take place in the kitchen.

3. What is the composition of cow's milk ? Discuss the importance of milk in our daily diet.

4. Describe the functions of carbohydrate in the body. Name four foods rich in carbohydrate.

5. While planning food for the family, what are the special points that you should consider.

GROUP B

(Answer *any three* questions)

6. Prepare a list of equipment that is necessary for laundry work and state how you would take care of the equipment. How can labour be saved in laundry work ?

7. What do you mean by hardness of water ? How would you make this water suitable for washing linen and cotton clothes ? What are the disadvantages of using hard water for washing garments ?

8. Make a list of articles that you would require for dry cleaning. Describe briefly the method you would adopt for the work.

9. Write notes on the following :—
   (*a*) Oiling and cleaning a sewing machine.
   (*b*) Ink stain on cotton.

FOOD-VALUE CHART

FOOD VALUES

Composition per 100 grammes (=3½ oz.)   (28 grammes=1 oz.=½ Chatak.)

ABBREVIATIONS

Protein, Fat, Carbohydrate, Calcium and Phosphorus are expressed in grammes (Gm.).

Iron, Niacin and Vit. C in milligrammes (mg).   Vit. A. in International Units (I.U.)

Vit. B_1 & B_2 in microgrammes (mc.g.)   Iron means total Iron.

* indicates 'Nil'.   — indicates reliable data not available.

tr. indicates 'trace.'

Foodstuffs.		Calories.	Protein. Gm.	Fat. Gm.	Carbo-hydrate. Gm.	Calcium. Gm.	Iron. mg.	Phosphorus. Gm.	Vit. A. I.U.	Vit. B-1 mc.g.	Vit. B-2 mc.g.	Vit. Niacin. mg.	Vit. C. mg.
CEREALS & PRODUCTS													
Wheat Flour	(whole-Atta)	353	12.1	1.7	72.2	0.04	7.3	0.32	—	—	—	—	—
do.	(Refined)	349	11.0	0.9	74.1	0.02	1.0	0.09	—	120	—	0.9	—
do.	Cream of (Suji) ..	336	10.5	1.7	69.3	0.04	1.0	0.05	—	90	35	1.8	—
do.	Bread, white loaf ..	255.5	8.05	0.7	52.5	0.01	0.7	0.045	—	63	35	0.7	*
do.	Chapati	350	9.1	3.5	68.6	—	—	—	—	—	—	—	—
do.	fried in ghee (luchi) ..	450	7.3	22.4	49.7	—	—	—	—				
do.	Biscuits	406	10.1	7.3	72.8	0.02	1.4	0.08	*	294	105	1.05	*

do. Barley, Powder ..	339.5	7.7	1.75	71.05	0.01	0.7	0.21	*	119	35	2.4	—
Maize Flour	355	0.6	0.5	87.0	0.02	5.3	0.32	—	—	—	—	—
Oatmeal	374	13.6	7.6	62.8	0.05	3.8	0.38	tr.	975	—	1.1	—
Rice, parboiled (milled)	346	6.4	0.4	79.1	0.01	2.2	0.15	—	210	—	3.8	—
Rice Raw (milled)	348	6.9	0.4	79.2	0.01	1.0	0.11	—	60	80	1.2	—
Rice Raw (Home pounded)	351	8.5	0.6	78.0	0.01	2.8	0.17	4	180	120	2.4	—
Rice, cooked (Bhat)	269.5	4.9	1.05	58.45	—	—	—	—	—	—	—	—
Rice Flakes (Chira)	350	6.6	1.2	78.2	0.02	8.0	0.22	—	210	—	4.0	—
Rice Puffed (Muri)	328	7.5	0.1	74.3	0.02	6.2	0.16	—	210	—	4.1	—
LEGUMES DRIED WITHOUT HUSK (PULSES)												
Bengal Gram (Chola) (with Husk) ..	361	17.1	5.3	61.2	0.19	9.8	0.24	316	300	—	2.6	—
Green Gram (Mung)	334	24.0	1.3	56.6	0.14	8.4	0.28	158	465	—	2.0	—
Black Gram (Mash Kalai)	350	24.0	1.4	60.3	0.20	9.8	0.37	64	420	—	2.0	—
Red Gram (Arahar)	333	22.3	1.7	57.2	0.14	8.8	0.26	220	450	—	2.4	—
Khesari	351	28.2	0.6	58.2	0.11	5.6	0.50	200	—	—	—	—
Lentils (Musur)	346	25.1	0.7	59.7	0.13	2.0	0.25	450	450	—	1.5	—
Peas, Split	315	19.7	1.1	56.6	0.07	4.4	0.30	—	450	—	1.3	—
Soya Bean	432	43.2	19.5	20.9	0.24	11.5	0.69	710	900	—	2.4	—

Food values (contd.)

Foodstuffs.	Calories.	Protein. Gm.	Fat. Gm.	Carbo-hydrate. Gm.	Calcium. Gm.	Iron. mg.	Phosphorus. Gm.	Vit. A. I.U.	Vit. B-1 mc.g.	Vit. B-2 mc.g.	Vit. Niacin. mg.	Vit. C. mg.
VEGETABLES LEAFY												
Amaranth, tender (Lal sak, Nate sak) ..	47	4.9	0.5	5.7	0.50	21.4	0.10	2,500 —11,000	30	100	0.9	173
Bengal gram leaves ..	87	7.0	1.4	11.7	0.34	23.8	0.12	—	—	—	—	—
Cabbage	33	1.8	0.1	6.3	0.03	0.8	0.05	2,000	150	30	0.4	124
Ipomoea leaves (Kalmi sak)	32	2.9	0.4	4.3	0.11	3.9	0.05	3,300	87	120	0.6	137
Lettuce	23	2.1	0.3	3.0	0.05	2.4	0.03	2,070	280	120	0.4	15
Rape Leaves (Sarsou Sak)	52	5.1	0.4	7.1	0.37	12.5	0.11	—	—	—	—	—
Spinach (Palang)	32	1.9	0.9	4.0	0.06	5.0	0.01	3,000	210	60	0.5	48
Beet	62	1.7	0.1	13.6	0.20	1.0	0.06	tr.	210	90	0.4	88
Carrot	47	0.9	0.2	10.7	0.08	1.5	0.53	3,000	180	20	0.4	3
Colocasia (Man Kachu)	101	3.0	0.1	22.1	0.04	2.1	0.14	40	240	30	0.4	3
Onion, big	51	1.2	0.1	11.6	0.18	0.7	0.05	—	120	10	0.5	11
" small	61	1.8	0.1	13.2	0.04	1.2	0.06	25	120	—	0.5	—
Potato	99	1.6	0.1	22.9	0.01	0.7	0.03	40	60	10	1.2	17
Radish (Pink)	35	0.6	0.3	7.4	0.05	0.5	0.02	3	180	—	0.4	17
do. (White)	21	0.7	0.1	4.2	0.05	0.4	0.03	3	180	—	0.4	17

Food												
Sweet Potato	131	1.2	0.3	31.0	0.02	0.8	0.05	10	—	40	0.7'	24
Yam (elephant) (Ol)	79	1.2	0.1	18.4	0.05	0.6	0.02	434	60	70	0.7	tr.
Yam (Ordinary) (Ratalu)	115	1.4	0.1	27.0	0.06	1.3	0.02	—	72	—	0.7	tr.
OTHER VEGETABLES												
Ash Gourd (Chalkumra)	15	0.4	0.1	3.2	0.03	0.5	0.02	tr.	63	—	0.4	1
Bitter Gourd (Karela)	25	1.6	0.2	4.2	0.02	2.2	0.07	210	72	90	0.5	88
Bitter Gourd small (Uoche)	60	2.9	1.0	9.8	0.05	9.4	0.14	210	72	—	—	—
Brinjal	34	1.3	0.3	6.4	0.02	1.3	0.06	5	45	90	0.8	23
Broad Beans (Makhan sim)	59	4.5	0.1	10.0	0.05	1.6	0.06	—	—	—	0.8	12
Calabash Cucumber (Kadu, Lau)	13	0.2	0.1	2.9	0.02	0.7	0.01	tr.	—	10	—	—
Cauli-flower	39	3.5	0.4	5.3	0.03	1.3	0.06	38	330	80	0.9	66
Colocasia (Kachu)	21	0.3	0.3	4.2	0.06	0.5	0.02	—	—	—	—	—
Cucumber	14	0.4	0.1	2.8	0.01	1.5	0.08	tr.	90	—	—	7
Drum stick (Sajne)	26	2.5	0.1	3.7	0.03	5.3	0.11	184	—	5	0.3	14
French Bean	26	1.7	0.1	4.5	0.05	1.7	0.03	221	78	—	—	—
Jack-Fruit (Tender)	51	2.6	0.3	9.4	0.03	1.7	0.04	—	—	—	—	—
do. (seeds)	184	6.6	0.4	38.4	0.05	1.2	0.13	—	—	—	—	—
Knol-khol (Olkapi)	30	1.1	0.2	5.9	0.02	0.4	0.04	36	—	—	0.5	85

Food values (contd.)

Foodstuffs.	Calories.	Protein. Gm.	Fat. Gm.	Carbo-hydrate. Gm.	Calcium. Gm.	Iron. mg.	Phosphorus. Gm.	Vit. A. I.U.	Vit. B-1 mc.g.	Vit. B-2 mc.g.	Vit. Niacin. mg.	Vit. C. mg.
Ladies Finger	41	2.2	0.2	7.7	0.09	1.5	0.08	58	63	—	—	16
Mango (Green)	99	0.7	0.1	8.8	0.01	4.5	0.02	150	—	—	0.2	3
Onion Stalks	41	0.9	0.2	8.9	0.05	7.5	0.05	—	—	—	—	—
Parwar (Patal)	18	2.0	0.3	1.9	0.03	1.7	0.04	—	—	—	—	—
Peas, English	109	7.2	0.1	19.8	0.02	1.5	0.08	139	360	10	0.8	9
Pink Beans	36	2.4	0.2	6.2	0.04	1.2	0.04	—	—	—	—	28
Plantain Flower (Mocha)	28	1.5	0.2	5.0	0.03	0.1	0.05	—	—	—	0.6	—
do. Green	66	1.4	0.2	14.7	0.01	0.6	0.03	50	45	20	0.3	24
do. Stem	42	0.5	0.1	9.7	0.01	1.1	0.01	0	—	—	0.2	—
Pumpkin	28	1.4	0.1	5.3	0.01	0.7	0.03	84	60	40	0.5	2
Ridge Gourd (Torai, Jhinga) ..	18	0.5	0.1	3.7	0.04	1.6	0.04	56	66	—	—	—
Waterchest nut (Singara, Paniphal) ..	117	4.7	0.3	23.9	0.02	0.8	0.15	20	—	10	0.6	—
Tinde (Tender)	29	1.7	0.1	5.3	0.02	0.9	0.03	28	—	—	—	—
Tomato, Green	27	1.9	0.1	4.5	0.02	2.4	0.04	320	69	—	0.4	31
Turnip (Shalgam)	34	0.5	0.2	7.6	0.03	0.4	0.04	tr.	120	40	0.5	43
Vegetable Marrow	20	0.5	0.1	4.3	0.01	0.6	0.03	tr.	—	—	—	18

NUTS												
Almond	655	20.8	58.9	10.5	0.23	3.5	0.49	tr.	240	—	2.5	—
Cashew Nut	596	21.2	46.9	22.3	0.05	5.0	0.45	100	—	190	2.1	—
Cocoanut	444	4.5	41.6	13.0	0.01	1.7	0.24	tr.	45	100	0.8	1
,, tender	40	0.9	1.4	6.3	0.01	0.9	0.03	—	—	—	—	2
,, ,, water	17	0.1	0.1	4.0	0.02	0.5	0.01	—	—	—	—	—
Groundnut	549	26.7	40.1	20.3	0.05	1.6	0.39	63	900	300	14.1	—
,, (Roasted)	561	31.5	39.8	19.3	0.05	0.3	0.44	—	—	—	—	—
Pistachio	626	19.8	53.5	16.2	0.14	13.7	0.43	240	—	—	1.4	—
Walnut	687	15.6	64.5	11.0	0.10	4.8	0.38	10	450	—	1.6	—
CONDIMENTS, SPICES ETC.												
Asafoetida	297	4.0	1.1	67.8	0.69	22.2	0.05	—	—	—	—	—
Cardamon	229	10.2	2.2	42.1	0.13	5.0	0.16	—	—	—	—	—
Chillies, Green	41	2.9	0.6	6.1	0.03	1.2	0.08	454	—	180	0.5	111
do. dry	246	15.9	6.2	31.6	0.16	2.3	0.37	576	—	—	—	50
Cloves	293	5.2	8.9	47.9	0.74	4.9	0.10	—	—	—	—	—
Coriander	288	14.1	16.1	21.6	0.63	17.9	0.37	1570	—	—	1.1	tr.
Cumin (Zira)	356	18.7	15.0	36.6	1.08	31.0	0.49	870	—	—	2.6	3

Food values (contd.)

Foodstuffs.	Calories.	Protein. Gm.	Fat. Gm.	Carbo-hydrate. Gm.	Calcium. Gm.	Iron. mg.	Phosphorus. Gm.	Vit. A. I.U.	Vit. B-1 mc.g.	Vit. B-2 mc.g.	Vit. Niacin. mg.	Vit. C. mg.
Fenugreek (Methi)	333	26.2	5.8	44.1	0.16	14.1	0.37	160	—	—	1.1	—
Garlic	142	6.3	0.1	29.0	0.03	1.3	0.31	—	—	—	0.4	13
Ginger	67	2.3	0.9	12.3	0.02	2.6	0.06	67	—	—	0.6	6
Omum (Ajwan)	379	15.4	18.1	38.6	1.42	14.6	0.30	—	—	—	—	—
Pepper (dry)	305	11.5	6.8	49.5	0.46	16.8	0.20	—	—	—	1.4	—
Tamarind, Pulp	283	3.1	0.1	67.4	0.17	10.9	0.11	100	—	—	0.6	3
Turmeric	349	6.3	5.1	69.4	0.15	18.6	0.28	50	—	—	2.3	—
Apple	56	0.3	0.1	13.4	0.01	1.7	0.02	tr.	120	30	0.2	2
Banana	153	1.3	0.2	36.4	0.01	0.4	0.05	tr.	150	30	0.3	1
Figs (Raw)	283	3,0	0.2	67.3	0.07	10.6	0.08	600	90	30	0.8	tr.
Figs (Ripe)	75	1.3	0.2	17.1	0.06	1.2	0.03	270	—	50	0.6	2
Guava, Country	66	1.5	0.2	14.5	0.01	1.0	0.04	tr.	—	30	0.2	299
Jack-fruit	84	1.9	0.1	18.9	0.02	0.5	0.03	540	—	—	0.4	10
Jambu (Kal Jamum)	83	0.7	0.1	19.7	0.02	1.0	0.01	—	—	—	—	—
Lemon (Kagchi Lebu)	57	1.0	0.9	11.1	0.07	2.3	0.01	tr.	—	4	0.1	39 (Juice)

Lime (Mosumbe)	59	1.5	1.0	10.9	0.09	0.3	0.02	26	—	—	0.1	63 (Juice)
Mango (Ripe)	50	0.6	0.1	11.8	0.01	0.3	0.02	4800	—	50	0.3	13
Watermelon	17	0.1	0.2	3.8	0.01	0.2	0.01	tr.	—	—	0.2	1
Orange	49	0.9	0.3	10.6	0.05	0.1	0.02	350	120	60	—	68
Palmyra Tender (Talsash)	28	0.6	0.1	6.5	0.01	0.5	0.02	—	—	—	—	4
Jamrul (Pannir Koya)	43	0.7	0.2	9.7	0.01	0.5	0.03	—	—	50	—	—
Papayya (Ripe)	40	0.5	0.1	9.5	0.01	0.4	0.01	2020	—	25	0.2	46
Peaches	38	1.5	0.2	7.6	0.01	1.7	0.03	tr.	—	—	0.2	1
Pears, country (Nashpati)	47	0.2	0.1	11.5	0.01	0.7	0.01	14	—	30	0.2	tr.
do. Real (English)	57	0.9	0.2	12.9	0.01	0.8	0.02	80	90	—	0.2	—
Pineapple	50	0.6	0.1	12.0	0.02	0.9	0.01	60	—	120	—	63
Plantain (Champa)	104	1.1	0.1	24.7	0.01	0.5	0.03	124	—	170	0.3	6
do. Red	101	1.6	0.1	23.4	0.01	0.6	0.02	350	—	—	—	—
Pomegranate	65	1.6	0.1	14.6	0.01	0.3	0.07	—	—	10	—	16
Raisins	319	2.0	0.2	77.3	0.10	4.0	0.08	—	225	—	0.5	tr.
Custard Apple	105	1.6	0.3	23.9	0.02	1.0	0.04	tr.	—	—	—	—
Tomato (Ripe)	21	1.0	0.1	3.9	0.01	0.1	0.02	320	120	60	0.4	32
Woodapple (Kath Bael)	97	7.3	0.6	15.5	0.13	0.6	0.11	—	—	170	—	—
Zizypus (Baer, Kul)	55	0.8	0.1	12.8	0.03	0.8	0.03	70	—	—	—	—

Food values (contd.)

Foodstuffs.	Calories.	Protein. Gm.	Fat. Gm.	Carbo-hydrate. Gm.	Calcium. Gm.	Iron. mg.	Phosphorus. Gm.	Vit. A. I.U.	Vit. B-1 mc.g.	Vit. B-2 mc.g.	Vit. Niacin. mg.	Vit. C. mg.
MEAT (Bone Free) **FISH and EGGS**												
Beef	114	22.6	2.6	—	0.01	0.8	0.19	tr.	150	40	6.4	2
Chicken	112	26.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Duck	130	21.6	4.8	—	0.01	—	0.24	—	—	—	—	—
Fowl	109	25.9	0.6	—	0.03	—	0.25	—	—	—	—	—
Goat	190	18.6	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mutton	194	18.5	13.3	—	0.15	2.5	0.15	31	180	270	6.8	—
do. Liver	150	19.3	7.5	1.4	0.01	6.3	0.38	22300	360	1700	17.6	20
Pigeon	138	23.3	4.9	—	0.01	—	0.29	—	—	—	—	—
Pork	114	18.7	4.4	—	0.03	2.3	0.20	tr.	540	90	2.8	2
Fish, Bhetki	66	13.7	1.1	—	0.13	—	—	33	—	—	—	—
do. Hilsa	270	21.8	19.4	—	0.48	—	—	4	—	—	—	—
do. Kai	142	14.8	8.8	—	0.21	—	—	20	—	—	—	—
do. Magoor	71	15.0	1.0	—	0.61	—	—	10	—	—	—	—
do. Rohit	81	16.6	1.4	—	0.68	—	—	83	—	—	—	—
do. Singhi	99	22.8	0.6	—	0.67	—	—	25	—	—	—	—

do. Mangalore (big)	91	22.6	0.6	—	0.02	0.9	0.19	26	—	—	1.0	—
do. do. (Small)	100	21.5	1.6	—	0.06	2.3	0.41	26	—	—	3.9	—
Pomfrets	76	19.1	—	—	0.20	0.9	0.29	—	—	—	—	—
Prawn (Mussel)	86	20.8	0.3	—	0.09	0.8	0.24	tr.	90	100	—	—
Eggs, Duck	180	13.5	13.7	.7	0.07	3.0	0.26	1200	—	—	0.2	—
do. Fowl	173	13.3	1.33	—	0·06	2.1	0.22	1200	—	—	tr.	—
DAIRY PRODUCTS												
Milk, cow	65	3.3	3.6	4.8	0.12	0.2	0.09	180	51	200	0.1	2
do. Buffalo	117	4.3	8.8	5.1	0.21	0.20	0.13	162	—	—	—	—
do. Goat	84	3.7	5.6	4.7	0.17	0.3	0.12	182	—	40	—	—
do. Skimmed	29	2.5	0.1	4.6	0.12	0.2	0.09	—	—	—	0.1	1
do. Butter	15	0.8	1.1	0.5	0.03	0.8	0.03	tr.	—	—	—	—
Butter	716	0.6	81.0	0.4	0.02	—	0.016	3300	tr.	tr.	0.1	—
Cheese	368	21.5	30.5	2.0	0.3	—	.39	1240	—	—	—	—
Curds	51	2.9	2.9	3.3	0.12	0.3	0.09	130	—	60	—	—
Cheddar	398	25.0	32.2	2.1	0.7	1.0	.4	1400	—	—	tr.	—
Cream, light	204	2.9	20.2	4.0	0.09	0.10	0.07	850	—	—	.1	1

Food values (contd.)

Foodstuffs.	Calories.	Protein. Gm.	Fat. Gm.	Carbo-hydrate. Gm.	Calcium. Gm.	Iron. mg.	Phosphorus. Gm.	Vit. A. I.U.	Vit. B-1 mc.g.	Vit. B-2 mc.g.	Vit. Niacin. mg.	Vit. C. mg.
MISCELLANEOUS												
Oil, Codliver	900	—	100	—	—	—	—	60,000 to 200,000	—	—	—	—
do. Halibut	900	—	100	—	—	—	—	390,000	—	—	—	—
do. Palm (Red)	900	—	100	—	—	—	—	50,000	—	—	—	—
do. Ghee	885.5	—	98.3	4.9	—	—	—	1225	—	73.5	—	—
do. Cooking (Mustard)	920	—	98.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pappads (Paper)	288	18.8	0.3	52.4	0.08	17.2	0.30	tr.	—	—	—	—
Sugar, Refined	392	—	—	98.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Jaggerry	383	0.4	0.1	95.0	0.08	11.4	0.04	250	—	—	1.0	—
Sugar Cane Juice	39	0.1	0.2	9.1	0.01	1.1	0.01	10	—	40	—	—
Toddy sweet	15	0.1	0.1	3.5	0.04	1.0	0.01	—	15	—	—	—
Sandesh	420	17.8	19.6	39.9	—	—	—	—	—	—	—	—
Betel Leaves	44	3.1	0.8	6.1	0.23	5.7	0.04	9600	—	30	0.7	5

(Honey contains about 80% of sugars, principaliy Fructose and Glucose. It may contain little Vit. C. but no other Vitamins)